CSSSC

RECORD NO. CSS 56	CONDITION O.K.
TITLE রংমশাল (Rangmasal	COLOUR B & W ; Coloured illustrations.
PERIODICITY Monthly	SIZE 18 X 23.5 cms.
PLACE(S) OF PUBLICATION Calcutta.	VOLUMES IN RECORD Vol. 2-10 (1344-52 B.S.) [1937-45]
EDITOR(S) Hemendra Kumar Ray (1344-50 B.S) [1937-43] Kamakshiprasad Chattopadhyay & Debiprasad Chattopadhyay (1351-52 B.S.) [1944-45]	

রংমশাল :: সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৪৫, (ষাণ্মাসিক)

ষয়	লেখক লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
মকাণ্ডের কাহিনী	...	৪১৩
ভুত সংবাদ	নিখিল কুমার চক্রবর্ত্তী	৩৪২
মরলতা	সতীকান্ত গুহ	৮
বসর	শিবানী সরকার	২৭১
শনি, কুলিশ ও মেঘ গর্জ্জন	অবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়	২০৪
মাকাশ পারে	সতীকান্ত গুহ	২৪৩
াকাশের খেলাধূলা	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৮
াজব কথা শুনি	কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২০২
াজব পাখী		৪৬
াবদার	অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত	৪১৫
ামাদের লাইব্রেরী		১৬৭
ইয়েস্ স্যার্	মেঘেন্দ্র লাল রায়	৩১৫
এক পাতার গল্প :		..
তিন বাঁকা	সুকুমার দে সরকার	১৬৪
বুদ্ধির অঙ্ক	শ্রীধর	২৭৬
ভাড়াটে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২১২
মাকষা ও মাছি	বসুধা সেন	৩৪৬
ও রজনী গন্ধা	প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস	৩৪৭
লটু বাঘ	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়	৩২৩
ক্কের ধোয়া	নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য	২৮১
কু ঘুমোয় ঘুমোয় না	পূর্ণেন্দু নারায়ণ সেন	২২১
কু তুমি একটু থামো	"স"	৩৫
কুর রান্না	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৯৯
াজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক		১০৭
লন্তিকা		৯১, ১৪৭, ২২৯, ২৮৬, ৩৫১, ৪২৫
এসেছে চাঁদ হেসেছে	সতীকান্ত গুহ	১৫৩
দের দেশে যায়রে ভেসে	"স"	১২৭
দের দেশের মেয়ে	সত্য চক্রবর্ত্তী	৩৯৩
ঠির বাক্স	দিদিভাই	৮৮, ২৩৬, ২৯৮, ৩৫৮, ৪২৯
ষি কাঠি	সমরেন্দ্র নাথ সেন	৬৫

বিষয়	লেখক লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ	শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত	৩৯১
ছন্দরবি স্তোত্র	সতীকান্ত গুহ	৩২৫
ছায়ামূর্ত্তি	কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৮
ছবিতোলা	সুবিনয় রায়চৌধুরী	১৪৪
ছুটির ঘণ্টা	বি, সি,	১০৫, ১৫৬, ২৯৩
জঙ্গল	সুকুমার দে সরকার	২৭, ১১৫, ১০৪, ২১৩, ৩৩১, ৪০৪
টি; বি, সম্বন্ধে দু একটি কথা	শ্রীমতী সুজাতা রক্ষিত	২৭২
ডাইনি বুড়ী	কান্তলাল	৩৫৫
তালপাতার সেপাই	সুকুমার দে সরকার	২৪৪,৩১৩
দত্যিরাজ	সতিকান্ত গুহ	৩৬৯
দূরের আলো :		
সোনার ডাক	...	৫৯
মৃত্যুমুখী সূর্য্য	...	২৯০
দৃষ্টিহারার দেশে	পুষ্প চট্টোপাধ্যায়	৪১৮
দেশ বিদেশের হ্যাচ্চো	অজয়শঙ্কর ভাদুড়ী	৩৩৯
ধাঁধা		৯৬,১৬৯,২৪১, ৩০৩,৩৬৭,৪৩৩
ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		১৬৮,১৬৯,২৪২, ৩০৪,৩৬৮,৪৩৪
নটরাজের চোখ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৬
নতুন রামায়ণ	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	২৭৯
নীলকণ্ঠ পাখী	অখিল নিয়োগী	৩৭৭
পদ্মরাগ বুদ্ধ	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৭৩
পাথুরে চীনে মানুষ	প্রত্নতাত্ত্বিক	১৬৮
পিঁপড়ে	অনুবীক্ষন	৬৮
পৃথিবী ছাড়িয়ে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৫৯
প্যারাডাইস লষ্ট	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৭২,২৫১
প্রতিযোগিতা		৯৬,৯৮,১৬৯,২৪১,৪৩৩
প্রতিযোগিতার ফলাফল		৯৬,১৬৮,২৪১,৪৩২
প্রতিহিংসা	শিশির চট্টোপাধ্যায়	২১৩
বনমালী	হিমাংশু ভূষণ সেনগুপ্ত	৩৯৯
বাউল	প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস	২৭৫
বাদশাহী গল্প	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৪,১০২,১৭৯,৩০৫,৪০৯
বাহিরে যাহারে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩
বাঁশবেড়ের দহ	সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৬
বীর স্যামসন	বসন্তকুমার আঢ্য	৩৭১
বেলফুল	রথীন্দ্রনাথ মল্লিক	২৮২

বিষয়	লেখক লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
ব্যাঙের পাতা		১১২,২৮৪
ভদ্রতা কাকে বলে	বুদ্ধদেব বসু	১৯১
ভাটিয়ালী	প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস	২১৬
ভুতুড়ে দোকান	ধর	৪
মঙ্গলগ্রহে প্রাণী	কমলেশ রায়	৩২৮
মিষ্টিমুখ		৯৩,১৬?,২১৮
যবদ্বীপের নর বানর	প্রত্নতাত্ত্বিক	২১৮
যাঁরা আমাদের স্মরণীয়	আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	২২৪
রংমশাল বৈঠক		২৩২,২৯৫,৩৬৩
রুশ দেশের গোগল	সুধীরচন্দ্র রাহা	৩৪৩
শীতের ভোরে	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৯
শের আমি	কান্ত লাল	৪৭
শ্বেত বামন আর লোহিত দানব	কমলেশ রায়	৩৮৮
সত্যি নাকি :		১২৮,২১০,২৭৭,৪২৪
সমুদ্রের জন্ম	ধরণী সেন	৪০১
সহজ ব্যাখ্যা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৭১
সাত বছর পরে	কামাক্ষা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৫৯
সারথিস্থর বন্দর	নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য	১২০
সেন্ট নেভিল ও ড্রাগন	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১৫১
সোডার বোতল		১১৪
স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে	ধরণী সেন	১৯৮

ছেলেদের হাতে দিবার মতো

রবীন্দ্রনাথের

কয়েকখানি বই

খাপছাড়া

ছড়ার বই, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মজার ছবি মূল্য-৩৲, ৩।।০, ভাল কাগজে রঙীন কালিতে ছাপা, মূল্য-৫৲

ছড়ার ছবি

ছড়ার বই—৩৯টি মজার ছবি চমৎকার বাঁধাই। সুদৃশ্য পছন্দসই মূল্য—১।।০, বোর্ডে বাঁধাই মূল্য—২৲

সে

—ছেলে বুড়ো সবাইএর পরম উপভোগ্য বই—

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত বিচিত্র বর্ণের বহু ছবি সহ মূল্য—২।।০

চমৎকার বাঁধাই মূল্য—৩৲

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

খেলাঘরের মা

শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

রংমশাল

তৃতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৪৫

বাহিরে যাহারে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে,
পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে
কত রূপে রূপে কত না অলঙ্কারে,
অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে,
বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

শ্রীমতী ভক্তি চৌধুরীর অটোগ্রাফ খাতা থেকে

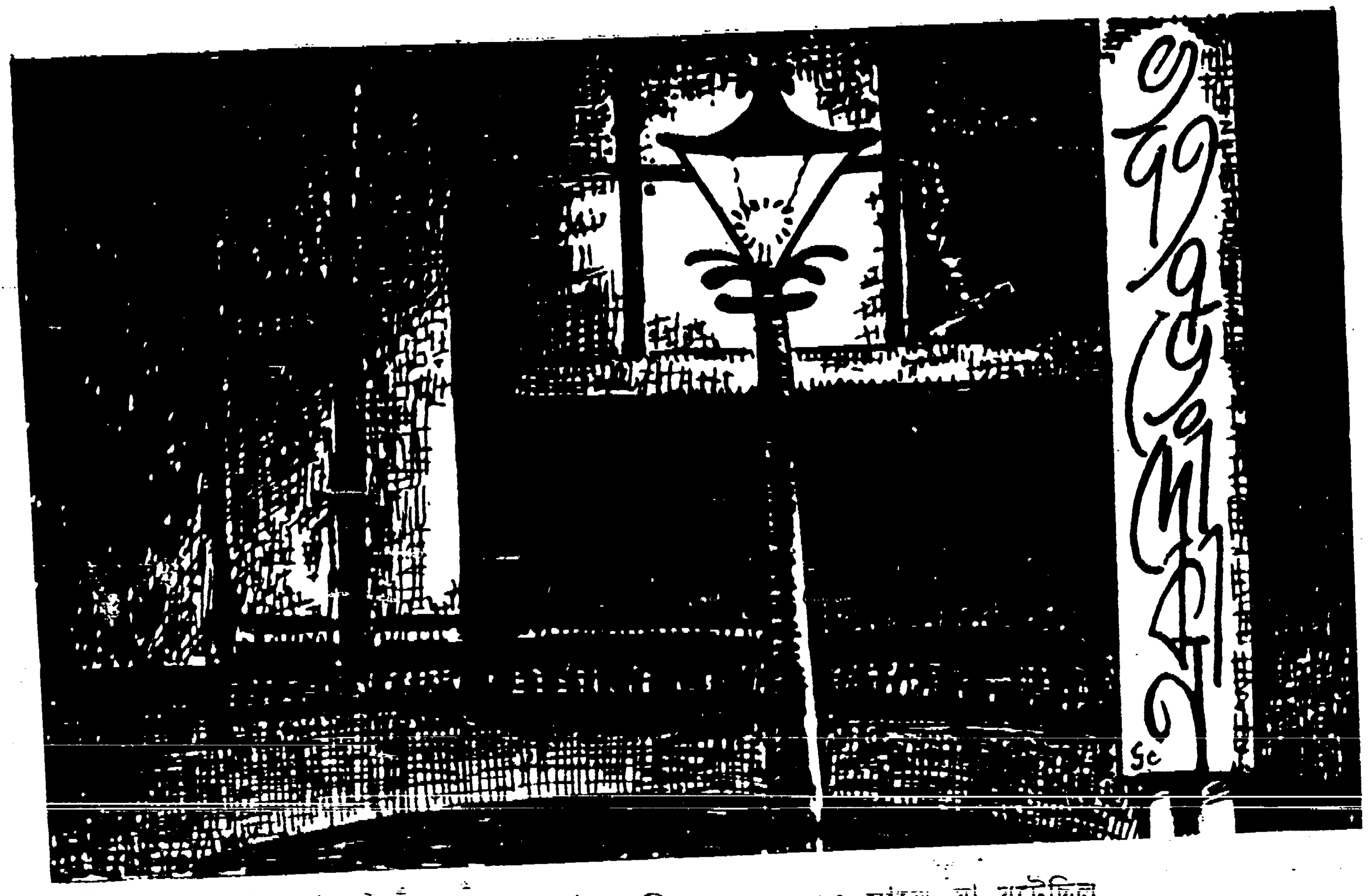

১৯৮৮ সালের ঘটনা নিয়ে ১৯৩৭-৪৩ সালে যা ঘটেছিল

শ্রীধর

১৯৮৮ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখের
"নূতন বিশ্ব মনস্তত্ত্ব সমালোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত ঃ

নিম্নলিখিত চিঠিটি একটি পুরাতনী পুঁথিপত্রের দোকানে পাওয়া যায়। চিঠিটি থেকে সুকুমার চিত্ত পাঠকরাও বুঝতে পারবেন, পৃথিবীতে এমন অনেক বই প্রকাশিত হয় যার লেখকেরা একেবারেই নকল! সে সব বইর আসল লেখকরা বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

চিঠিটি এই :

প্রিয় চিরু,

তোমার কাছে ভাই আজ আমার একটা অপরাধ স্বীকার করার আছে। তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই তোমাকে ছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে এক বড় জোচ্চুরী, সবচেয়ে বড় এক দুঃখের কাহিনী আর কাকে বলব! ভয় হয় তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করবে, হয়ত উড়িয়েই দেবে। কিন্তু বন্ধু, যদি তোমার এতটুকু বিশ্বাস হয়, সমস্ত পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ো, কারণ তুমি যখন ভাই এ চিঠি পড়বে, জীবনের সমস্ত দুঃখ ভোগ থেকে আমি তখন চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছি। না, না, ভয় পেয়ো না বন্ধু! ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার জীবন বেশ ভালই কেটেছে এবং আমি বেশ বড় রকম সাফল্য লাভ করেছি।

কিন্তু শোনো আগে আমার কাহিনী। তোমাকে না বলে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না, যে আমি একটা প্রকাণ্ড শঠ। জোচ্চোর আমি! আমি অন্যের বিদ্যে ও বুদ্ধি চুরি করে নিজের বলে চালিয়েছি! যদিও আমার এই ব্যবসার ধরণটা বেশ একটু অদ্ভুত ও আজব রকমেরই ছিল। কিন্তু যা হোক, পার্থিব সুখ যাকে বলে তার সব স্বাদ আমি পেয়েছি। আর আমি নিজেকে বলি—হাঁ লোকে আমাকে বলে বটে আমি নাকি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বলে আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরলিপিকার। কিন্তু—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—আমি একবর্ণ গল্প রচনা করতে জানি না, স্বরলিপির একটা চিহ্নও বেরোয় না আমার হাত দিয়ে! কিন্তু এসমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।......

তুমি জানো ১৯৩৭ সালে আমি এক ব্যাঙ্কে সামান্য কেরাণীর কাজ করতাম। কোন রকমে কায় ক্লেশে আমার জীবন কাটত। ঠিক এই সময়ে এমন একটা অদ্ভুত দোকানের দেখা পেলাম আমি, যাতে করে আমার সমস্ত জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেল।

সেদিন ছিল একটা শনিবার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আটটা প্রায় বাজে। বাজারের রাস্তা দিয়ে আমি একমনে চলেছি। হঠাৎ ডান দিকে একটা দোকানে আমার চোখ পড়ল। উজ্জ্বল আলোকে দোকানটা ঝলমল করছে। আশ্চর্য্য! এর আগে তো কখনও দোকানটা আমার চোখে পড়েনি! দোকানটার মাথায় সাইন-বোর্ডে ইংরাজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ঃ

THE ANTIQUE SHOP

কি যেন, কে যেন—আমাকে দোকানের ভেতর টেনে নিয়ে গেল। Antique shop যে এমন অদ্ভুত হতে পারে কোনদিন আমার ধারণা ছিল না। দোকানটা আগাগোড়া ক্রোমিয়ম দিয়ে মোড়া। ঘরটা মৃদু আলোকিত কিন্তু আলো যে কোথায় বোঝবার উপায় নেই। তবুও আমার আশ্চর্য্য হবার কথা নয়; দোকানের বাইরেটাই ছিল যথেষ্ট রকম অদ্ভুত।

আমি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে হঠাৎ বন্দুক ছোড়ার মত একটা আওয়াজ আমার কানে তীব্র আঘাত করলে ঃ

"—মহাশয়ের কি চাই?"

চমকে উঠে আমি 'কাউন্টার'এর দিকে তাকালাম। দেখলাম আশ্চর্য্য রকম এক জোয়ান পুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে। তীব্র চোখ দুটো তার জল জল করছে। পরণে তার রবারের মত একটা জিনিষের তৈরী—দুভাগে বিভক্ত এক বিচিত্র পোষাক!

"ওঃ—ইয়ে—এই আমি একটু দেখছি।" কোনরকমে ঢোক গিলে গলা দিয়ে আমার স্বর ফুটল।

সে অদ্ভুত লোকটি তখন একটু হেসে বললে, "বেশ, বেশ।"

দেয়ালের একটা বিচিত্র ঘড়ির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল—"উঃ এযে আটটা বেজে গেছে। এখনই ট্রেন ধরতে হবে আমাকে—! কিছু জিনিষপত্রও কেনবার আছে।"

কতকগুলি পুঁথিপত্র থেকে একটা প্রাচীন হাত-লেখা বই তুলে নিয়ে বললাম—

"এর দাম কত—?"

"দু'টাকা। দাম হয়ত একটু বেশী মহাশয়। কিন্তু এ বইটি চল্লিশ বছর আগের লেখা।"

"দাম বেশী বলছেন,—কৈ?"—আমি অবাক হয়ে বলি।

"হাঁ, তাতো বটেই—কিন্তু এটা খুব—"

আর কোন কথা না বলে আমি তাড়াতাড়ি দাম ফেলে দিয়ে সে অদ্ভুত দোকানটা থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে এলাম।

ট্রেনে ভালভাবে বসে চেয়ে দেখি বইর মলাটের ওপর লেখা ঃ

জীবনের মহৎ দুঃখ—জ্ঞান চৌধুরী ১৯৮৮

বারে, বড় মজার ত! নিশ্চয় ১৮৯৯ হবে, ভুল করে লিখেছে ১৯৮৮!

আশ্চর্য্য বই, অপরূপ লেখা!
দিন তিনেক বাদে বইটা খুলে মন দিয়ে পড়তে বসেছি। কি সুন্দর ও কি নূতন গল্প! না.
কি অদ্ভুত ষ্টাইল ও ভাষা! পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু এরকম বইর লেখক আজও
আধুনিক বইর মত মোটেই নয়। হাঁ এ একটা প্রকৃত শ্রেষ্ঠ রচনা বটে। মনে মনে ঠিক করলাম, এই লেখকের সব বই আমি পড়ব।
পৃথিবীতে নাম করেন নি কেন—? তারা আমার কথা শুনে তো অবাক!

পরের দিন ‘পাবলিক লাইব্রেরী’তে অনুসন্ধান করাতে বড় আশ্চর্য্য লাগল।
এরকম লেখকের নাম কোন জন্মে নাকি তারা শোনে নি! এই লেখকটির খোঁজ

তার পরের দিনই আমি আবার সেই দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। দোকান বন্ধ, ভেতরে
আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু দোকানটার সামনে গিয়ে দেখি এক জায়গায় লেখা:
সাজান হচ্ছে।

শেষে শনিবার এলে মনে করলাম সাজান
দিন চারেক পরে আবার গেলাম, তখনও ঐ অবস্থা। তীব্র আলো বাইরে
নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গিয়ে থাকবে। গিয়ে দেখি ঠিক, দোকানে সে আগেকার মতই সাজান—সেই যেমন
ঝলমল করছে। আমি একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোথায়
দেখেছিলাম তেমনি তো রয়েছে সব ঠিক!

“—নমস্কার। দোকনে তো কিছু সাজান দেখছি না।”

“—সাজান? বলেন কি মহাশয়—? সাজান কৈ আমরা তো কিছু করিনি—আপনি ভুল
করেছেন বোধহয়—।”

“কিন্তু—আমি যে নিজের চোখে……”

তার সে হাসিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাব দেখে আমি
হঠাৎ দেখি লোকটা মৃদু মৃদু হাসছে।
অন্য কথা পাড়লাম।

এই লেখকের সম্বন্ধে আমি কোন খবরই পাচ্ছি না।
“মহাশয়, এ বইটির বিষয়ে এসেছি আমি।
আপনি যদি দয়া করে কিছু খবর আমাকে দেন—”

লোকটি খুব আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে চায়, তারপর বলে:

—“মহাশয়, জ্ঞান চৌধুরীর নাম শোনেন নি—বড় তাজ্জব তো!”

“না মহাশয়, শুধু আমি নয়, এ দেশে আর কেউ ঐ লেখকের নাম পর্য্যন্ত শোনে নি।”

আমার কেমন করে উঠল।
লোকটা তখন এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে সমস্ত শরীরটা
একটু থেমে সে বললে:

এ বইটি যখন তিনি
“—কেন? তাঁর লেখা তো মহাশয় এ দেশের সর্ব্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়।
লেখেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮। লেখক ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।”

দোকানদার কিন্তু
“কি—!! ১৯৭০—??” গলা দিয়ে আমার আর কথা বেরোয় না।
বলে চলে:

“হাঁ মহাশয়। ২৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সে বড়ই দুঃখের বিষয় মহাশয়—তিনি আত্মহত্যা
করেন।”

হঠাৎ চেয়ে দেখি টেবিলে
একি রহস্য! আমার শরীর ভয়ে কি রকম যেন ছমছম করে উঠল।
যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র ছড়ান রয়েছে—তার প্রত্যেকটিতেই অনাগত ভবিষ্যতের কোন না কোন একটা

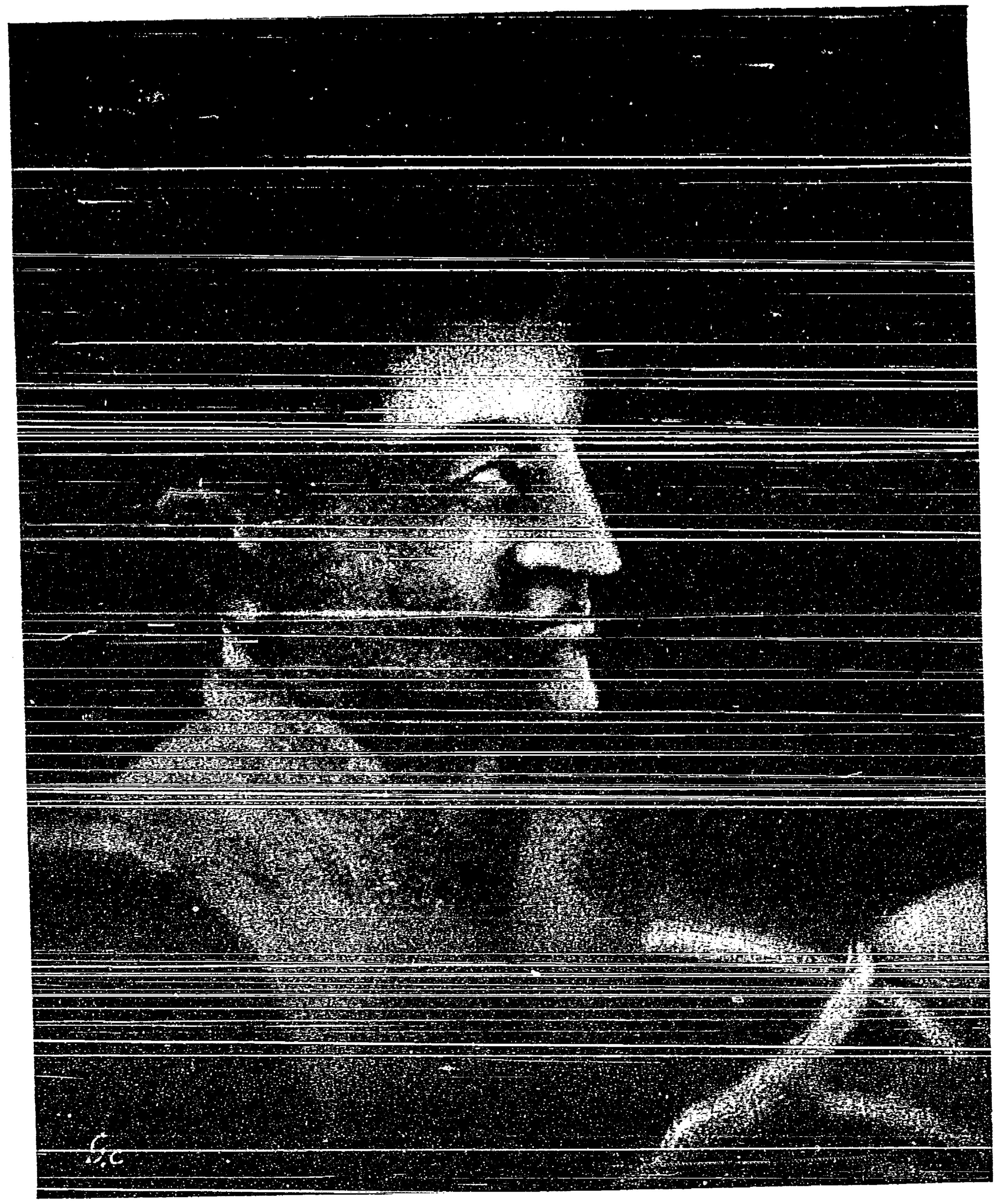

এক আশ্চর্য্য জোয়ান পুরুষ

সালের তারিখ লেখা! ভাবলাম হয় আমি বদ্ধ পাগল—নয়ত এই লোকটা! যাই হোক এ রহস্যময় দোকান থেকে এখন সরে পড়াই নিরাপদ।

কয়েকটা টাকা ফেলে দিয়ে কোনরকমে কতকগুলি পুঁথি ও স্বরলিপি নিয়ে আমি ঝড়ের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘাম মুছতে গিয়ে দোকানে আমার রুমালটা পড়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি দোকানের সামনের ফুটপাথে রুমালটা পড়ে—কিন্তু দোকান কৈ? ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। দোকানটা কোথায়? একি ভুতুড়ে কাণ্ড! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, এইত আমার হাতে দোকানের পুঁথিপত্র রয়েছে! তবে—? অজানা ভয়ে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম আমি।

বাড়ী ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম: দোকানটা কি তাহলে মানুষের বোধগম্যের অতীত কোন অলৌকিক শক্তিতে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে (আমার বর্ত্তমান) কালান্তরিত হয়েছে! না আমিই পাগল। কিন্তু আমি তো বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি। তা হলে একি স্বপ্ন নয়? সত্যিই কি কোন অলৌকিক শক্তিবলে দোকানটা সুদূর ভবিষ্যৎ থেকে তার অতীতে এ স্থানে চলে এসেছে!

৫ই জুলাই আমার মাথায় কিন্তু হঠাৎ এক দুষ্ট বুদ্ধি চাপল্। হয়ত এটা দোষণীয়, হয়ত নয়। কিন্তু এটা অন্তত: আইনের এলাকার বাইরে নয়। ভয় ভাবনা আমার তখনকার মত উবে গেল। মনে মনে আমি তর্ক করতে লাগলাম: এই বইগুলো এখনও ছাপা হয়নি—আমি কেন প্রকাশকদের কাছে এগুলো আমার লেখা বলে চালাই না!······হাঁ, তুমি জানো তাই আমি করেছি। তাই করে আজ আমি পৃথিবীর সাহিত্যরথীদের মধ্যে, পৃথিবীর স্বরলিপিকারদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছি!···

এরপর কয়েক বছর সকলের অজান্তে আমি প্রতি শনিবার রাতে আটটা থেকে নটার মধ্যে ঐ ভুতুড়ে দোকানটায় যেতাম। এ এক রকম আমার নিত্য অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কিছু আমি গ্রাহ্য করতাম না. যা পছন্দমত পুঁথিপত্র দেখতাম, কিনে নিয়ে সোজা বাড়ী চলে আসতাম।

হাঁ, কয়েক বছর—১৯৪৩ সাল জুন মাস পর্য্যন্ত বেশ এরকম চলল। আর এই সময়ের মধ্যে আমি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হলাম। কিন্তু তারপরই···তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এল আমার সবচেয়ে বড় "শক্"—! যেমন আমি অভ্যাসমত দোকানে যাই সেদিনও গিয়ে তেমনি পুঁথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—হঠাৎ······হঠাৎ তার মধ্যে আমার নিজেরই হাতের সই দেখতে পেলাম! হাঁ, এই চিঠির তলায়—দেখে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি! একটা অদ্ভুত ভয়ে আমার শরীর একেবারে কাঠ হয়ে গেল!

* * * * *

বাড়ী ফিরে এসে আমার অদম্য ইচ্ছে হল—এই সমস্তটা আমি আবার লিখি!

* * * * *

তারপর······এখন আমি মৃত্যুর পথে মুক্তি পেতে চলেছি।

ইতি তোমার—

মুকুল

একটি ১৫ বৎসরের বালকের ইংরাজি রচনার ভাবানুবাদ

উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

মহর্ষি পিঙ্গলের গুপ্তকোঠায় সে রাতের কথা আমি ভুলবনা।

দুঃখের হাসি হেসে মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অমরলতার ইতিহাসে বজ্রনাথের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজ আমায় লোহার শিকল উপহার দিতে এসেছিলেন বজ্রনাথ।"

দেখলাম, মহর্ষির পায়ের তলায় পাষাণ মেঝেয় একটা লোহার শিকল পড়ে আছে!

মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অমরলতার সাধনা অহঙ্কারের সাধনা নয়। তলোয়ারের কোপে এখানে বড় ছোটর মীমাংসা করতে এলে সাধনায় বাধা পড়বে।" তারপর বজ্রনাথের দিকে ফিরে মহর্ষি বললেন, "বজ্রনাথ, তুমি তো জানো, মহর্ষি পিঙ্গল তুচ্ছ হতে পারেন, কিন্তু তপস্যা তাঁর তুচ্ছ নয়। এসো তুমি তাঁর চেয়ে মহৎ তপস্যা নিয়ে, মহর্ষি পথ ছেড়ে দেবেন তোমায়। পথ ছেড়ে দেবেন কি, পথ তাঁকে তখন ছেড়ে দিতেই হবে—অমরলতা চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঋষি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর। এখানে দয়া মায়া স্নেহের স্থান নেই।"

মেঘের গম্ভীর করুণ আওয়াজের মত বজ্রনাথের কণ্ঠ শোনা গেল, "মহর্ষি ভুল বুঝেছেন আমায়। মহর্ষির তপস্যায় আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু সবুজ দ্বীপে অভিযান যাচ্ছে, সেই অভিযানের নায়ক হতে চেয়েছিলাম আমি। সেখানে মহর্ষি বোম্বেটে কালী-ভূষণকে আনছেন টেনে। কেন? বজ্রনাথ কি হীন? অন্ত্যজ? অভিযানের অযোগ্য?"

সেই মশালের আলোয় বজ্রনাথের দুটি চোখের কোণায় দেখলাম দুফোঁটা জল। অভিমানে বজ্রনাথের কণ্ঠরোধ হল।

মহর্ষি বললেন, "বজ্রনাথ, আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য তুমি। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর কালীভূষণ! তাকে পথ না ছেড়ে দিয়ে উপায় কি বজ্রনাথ! কেন তুমি অমরলতার তপস্যায় বাধা হবে?"

কিন্তু বজ্রনাথের মন বুঝছেনা। গম্ভীর মুখে তিনি বারবার মাথা নাড়লেন। বারবার তাঁর হাত তলোয়ারের বাটে মুঠ হয়ে এল। মহর্ষির মুখে গভীর দুঃখ অপার করুণা ফুটে উঠল। মহর্ষি বললেন, "বুঝেছি বজ্রনাথ, অভিযানের নায়ক তোমার না হলেই নয়। কিন্তু উপায় নেই আমার। কালীভূষণ আমার ধ্যানে ফুটে উঠেছে, ধ্যানে দেখেছি অসংখ্য সমুদ্র পার হয়ে সে সবুজ দ্বীপে ফুল তুলছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখি সে সাধ্য আমার নেই। ঈশ্বর হুকুম করেন, মহর্ষি সেই হুকুম তামিল করেন, এইমাত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চাকর এই মহর্ষিরা।"

বজ্রনাথ হঠাৎ মুখে তুলে তাকালেন, পাষাণ দেয়ালে কাঠের ফলকে যেখানে অমরলতার চিহ্ন সবুজ সোনালীতে আঁকা ছিল সে দিকে তাকিয়ে তাঁর দুচোখ প্রখর কঠিন হয়ে এলো। অদ্ভুত একটা রহস্য-হাসি ছায়ার মত হঠাৎ তাঁর মুখে নেমে এল। হঠাৎ খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বজ্রনাথ ছুঁড়ে দিলেন, চক্ষের পলকে মশালের আলোয় একটা ঝিলিক দিয়ে সেই তলোয়ার অমরলতার সবুজ সোনালী চিহ্ন বিঁধে দিলে।

মহর্ষি একখানা পাষাণ মূর্ত্তির মত হয়ে গেলেন। বজ্রনাথের কণ্ঠ দূর আকাশের বজ্রের মত বেজে উঠল, "অমরলতা! অমরলতা!" তারপর একটু স্থির হোয়ে বজ্রনাথ বললেন, "রঙিলা, জানিনা অদৃষ্ট কোথায় আমায় ডাকছে! কিন্তু ভুলোনা, কথা দিয়েছ, অমরলতার অভিযান আমার হবে।"

আমি কী একটা কথা বলতে গেলাম, ধমক দিয়ে বজ্রনাথ বললেন, "চুপ্ রঙিলা। কথা ফিরিয়ে নিওনা। আমার হাতের ঘি চন্দন আঁকা ফল তুমি নিয়েছ, নিজ হাতে সেই ফল ফিরিয়ে দিয়েছ আমায়। আমার পূজো গ্রহণ করেছ তুমি, বর দিয়েছ আমায় 'তথাস্তু।' মনে রেখো রঙিলা।"

বজ্রনাথ চুপ হলেন। মহর্ষি পিঙ্গল তখন বজ্রনাথের দিকে এগিয়ে এলেন। বজ্রনাথের সামনে এসে হাত পেতে তিনি বললেন, "দাও বজ্রনাথ।" বজ্রনাথ একবার মহর্ষির পানে তাকালেন, তাঁর মুখে তখন গভীর হতাশা ফুটে উঠেছে। মহর্ষির ইঙ্গিত তিনি বুঝেছেন, বুঝেছেন অমরলতার খাতা থেকে তাঁর নাম কাটা গেল। তাঁর দুটি হাত কাঁপতে থাকল, কোন রকমে গলা থেকে অমরলতার হার খুলে নিয়ে মহর্ষির হাতে দিলেন। মহর্ষি আস্তে আস্তে ডাকলেন, "সুকণ্ঠ!" সুকণ্ঠ কাছে আসতে মহর্ষি বজ্রনাথের হার তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "বজ্রনাথ গেলেন। আজ হতে আমার সবচেয়ে আপন হলে তুমি!" সুকণ্ঠ যেন কেঁপে উঠল। একবার বজ্রনাথের পানে তাকাতে গিয়ে তার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বজ্রনাথের দলের লোক সুকণ্ঠ, মহর্ষি কি জানেন না? সুকণ্ঠের কপালে এক ফোঁটা দু ফোঁটা

কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল। শুধু বজ্রনাথের মুখে বাঁকা হাসি খেলে গেল। মহর্ষি তখন গম্ভীর স্বরে বললেন, "যাও বজ্রনাথ। অমরলতা তোমায় ছুটি দিচ্ছে। যাও তুমি, বাহুবলে পৃথিবীতে সাম্রাজ্য জয় কোরো, দেখো তাতে পিপাসা মেটে কিনা। অমরলতার ঋষি আমি. আর তুমি অমরলতাকে আজ তলোয়ার দিয়ে বিঁধে দিয়েছ। তোমায় আশীর্ব্বাদ করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলে। যাও, যে পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী আজ তোমার সঙ্গে কেল্লায় হানা দিয়েছে, তাদেরও মুক্তি দিলেম আমি। পঞ্চাশ হাজার তলোয়ার সঙ্গে পেলে, তাদের নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হও তুমি।"

তলোয়ার হাতে জাহাজে চাপলেম

মহর্ষির ইঙ্গিতে সবুজ সন্ধানীরা পথ ছেড়ে দিলে। মাথা হেঁট করে বজ্রনাথ বার হয়ে গেলেন। সেই রাত্রেই পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী নিয়ে বজ্রনাথ অমরলতার রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন।

তারপর কয়েকটা দিন। অমরলতার রাজ্যে একটা চুপচুপ ভাব। বজ্রনাথের চলে যাওয়ার পর থেকে মহর্ষি যেন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছেন, গভীর রাত পর্য্যন্ত তাঁর সাধন চলছে। নানা রকম গল্প শোনা যেতে লাগল। দুটি সবুজ সন্ধানী মহর্ষির তপস্যাকোঠা পাহারা দেয়। তারা বললে, তারা স্পষ্ট দেখেছে মহর্ষি যজ্ঞ করছিলেন, সেই যজ্ঞের আগুনের আলোয় আর ধোঁয়ায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল এক অসুর মূর্ত্তি, হাতে তলোয়ার.

দুটি চোখ আগুনের ফুলকির মত। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কঠিন কঠোর একটা ভাব চেহারায়।

এমনি যখন গুজব আর রটনায় চারিদিক ছেয়ে গেছে তখন একরাতে মহর্ষি আমায় ডেকে পাঠালেন।

গুপ্ত কোঠায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। মহর্ষি মাথা হেঁট করে কী একটা ভাবনায় তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। পাষাণ মেঝেয় আমার পায়ের ছোঁয়া লাগতে মহর্ষি মাথা তুললেন।

আমি মহর্ষির সামনে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করলাম। মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অভিযানের লগ্ন এগিয়ে এলো। সবুজ দ্বীপ ধ্যানে ধরা দিয়েছে। পথের মানচিত্র আঁকা শেষ আমার। এখন তোমাকে দিয়ে আমার বড় দরকার।"

মহর্ষি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "এসো।"

গুপ্ত কোঠার একদিকে দেয়ালে একটা মানচিত্র টাঙানো দেখলাম। মহর্ষি বললেন, "মানচিত্রখানা মন দিয়ে দেখো, রঙিলা। এই যে ভারতবর্ষ, আর এই লঙ্কা দ্বীপ। এদিকে ভারত সাগর, তারই এধারে দেখছ আরব সমুদ্র। আরব সমুদ্রে শুক্লতিথিতে দুপুর রাতে কালীভূষণের দুখানা বোম্বেটে জাহাজ দেখবে। বোম্বেটে জাহাজের হাতে ধরা দেবে তুমি, দেখো তাদের চোখে পড়া চাই। পালানোর ভাণ করবে। তা হলেই বোম্বেটেরা আপনা থেকেই এসে জাহাজ ঘেরাও করবে।"

আমি একটু ভয় পেয়ে বললাম, "বোম্বেটে! বোম্বেটেরা জাহাজ পুড়িয়ে দিতে পারে, মাঝি মাল্লাদের মেরে ফেলতে পারে।"

মহর্ষি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "জাহাজ পোড়াক, মানুষ মারুক, তাতে কী যায় আসে!"

আমার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে মহর্ষির মুখ মৃদু হাসিতে ভরে গেল। মহর্ষি বললেন, "যাদুকর সুশং যাচ্ছেন সঙ্গে। আসল জাহাজ মাঝি মাল্লা যেমন তেমন থাকবে। বোম্বেটেদের তলোয়ারে যারা কাটা পড়বে তারা ছায়া সৈন্য, ছায়া মাঝিমাল্লা, যাদুকর সুশংয়ের ভেল্কিতে জন্ম যাদের।"

আমি বললাম, "বুঝেছি।"

মহর্ষি বললেন, "অমরলতার পুঁথি থাকবে তোমার হাতে। এতে সবুজ দ্বীপের ঠিকানা, পথের মানচিত্র আছে, অমরলতা কোন্ লক্ষণ মিলিয়ে চিনতে হবে—সেই সব সঙ্কেত আছে। সবুজ দ্বীপে প্রায় পাঁচশো লতা আছে অমরলতার মতন দেখতে। কোন্টি আসল অমরলতা চিনে নেওয়া কঠিন। এই পুঁথি কাছে না থাকলে অমরলতা চিনে নেওয়া অসম্ভব। এই পুঁথি তুমি বোম্বেটে কালীভূষণকে দেবে।"

মহর্ষি একটা বিচিত্র কারুকুরি করা বাক্স আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর মহর্ষি হাতে তালি দিতেই ঘরের অন্ধকার এক কোণ থেকে বারোটি মূর্ত্তি সামনে এগিয়ে এসে মহর্ষিকে প্রণাম করলে। মহর্ষি বললেন, "এই বারোজন—সবুজ সন্ধানীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ

এরা। এরাই একদিন মিশর থেকে তোমাকে হিন্দুস্থানে নিয়ে এসেছিল। এরা থাকবে তোমার সঙ্গে। তোমার হুকুম, তা যতই অসম্ভব হোক না কেন, এরা তামিল করবে। ধরো তুমি যদি অমরলতার পুঁথি নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলো, এরা মুখ ফুটে 'না' বলবে না। তুমি যদি কালীভূষণকে মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে বলো, তোমার হুকুম তামিল না করে এদের উপায় নেই।"

শেষ কথা বলে মহর্ষি হেসে দিলেন।

শুক্ল তিথি। জ্যোৎস্না আকাশে রূপো ঢেলে দিয়েছে। শেষরাতে আরব সমুদ্রে রওণা হতে হবে। ঘাটে জাহাজ বাঁধা আছে। সন্ধানীরা সাঁজোয়া পরে জাহাজে চেপে বসে আছে। যাতুকর সুশং শেষ রাতের আগেই এসে পৌঁছবেন, সংবাদ এসেছে।

আমি আমার সাদাচূড়ো দালানের কোঠায় ব'সে আছি। আকাশ পাতাল ভাবছি। শেষ রাতে রওণা হতে হবে—আরবসমুদ্র আর বোম্বেটে কালীভূষণের কথা ভেবে এক একবার শিউরে উঠছি। কিন্তু তখনই মনে পড়ছে মহর্ষির অভয়, যাতুকর সুশঙের ভেল্কি।

আমার কোঠার বাইরে বারোজন সন্ধানী পাহারা দিচ্ছে। মহর্ষির আদেশ, ছায়ার মত তারা আমাকে অনুসরণ করবে, আমার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেবে।

মাঝরাতে চোখের পাতা যেন জড়িয়ে আসছে, একটু হয়তো ঝিমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ খুট্ করে একটা আওয়াজ হল। চমকে চোখ মেলে চাইতে দেখি, দেয়ালে ছায়ার সঙ্গে মিশে কে যেন এগিয়ে আসছে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "কে?" "চুপ্। আমি সুকণ্ঠ" বলে ছায়ামূর্ত্তি সামনে এলো।

সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা। জরুরী কাজে এসেছি।"

"কিন্তু আমি শেষরাতে চলে যাচ্ছি সুকণ্ঠ," আমি বললাম।

"সেই খোঁজ পেয়েই এসেছি।" সুকণ্ঠ বললে।

আমি হেসে বললাম, "ফুল এনেছো বুঝি।"

"ফুল? হ্যাঁ, ফুল এনোছ রঙিলা, এই নাও"—

আমি চমকে উঠলাম। এযে বজ্রনাথের চিহ্ন-আঁকা ফুল! সুকণ্ঠ বললে, "বজ্রনাথ পাঠিয়েছেন আমায়, তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন, একদিন তুমি ঘি-চন্দন আঁকা ফল তাঁর হাত থেকে নিয়েছিলে, বলেছিলে অভিযান তাঁর হবে।"

হ্যাঁ, বলেছিলাম তথাস্তু। "কিন্তু"—বললাম "সুকণ্ঠ আমি অমরলতার পুঁথি যে কালীভূষণকে দিতে যাচ্ছি। অমরলতার পুঁথি না পেলে সবুজদ্বীপের অভিযানে যাওয়া চলে না। বজ্রনাথকে বোলো, রঙিলার কোনই উপায় নেই।"

"উপায় নেই! উপায় করে নাও রঙিলা। বজ্রনাথকে কথা দিয়ে ফিরিয়ে নিওনা। ঐ পুঁথি বজ্রনাথকে দাও।"

"অসম্ভব! কোঠার চারিদিকে সন্ধানীরা পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া মহর্ষির আদেশ, পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে।"

"এখানে না দাও, আমি লুকিয়ে জাহাজে চাপবো। একফাঁকে পুঁথির বাক্স জাহাজে আমার হাতে তুলে দিও। মাঝসমুদ্রে রাতের ছায়ায় ছায়ায় আমি নেমে পড়বো। সমুদ্র সাঁতার দিয়ে পার হয়ে পুঁথির বাক্স বজ্রনাথকে পৌঁছে দেব। কথা দাও রঙিলা।"

আমি বললাম, "মহর্ষির আদেশ পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে।"

সুকণ্ঠ বললে, "কিন্তু বজ্রনাথকে কথা দিয়েছ তুমি।"

আমি বললাম, "কথা ফিরিয়ে নিলে পাপ হবে আমার। পাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মহর্ষির চোখে আমি ধূলো দিই কী করে, সুকণ্ঠ!"

সুকণ্ঠ মাথা নীচু করলে, কী কথা খানিকক্ষণ সে ভাবলে। তারপর সে আস্তে আস্তে বললে, "রাগ কোরোনা রঙিলা। বজ্রনাথ একটা কথা বলে দিয়েছেন, আমার নিজের কথা নয়। আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো না।"

আমি বড় দুঃখে হেসে ফেললাম। বললাম, "আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারিনা সুকণ্ঠ। বজ্রনাথ কী বলেছেন বলো।"

সুকণ্ঠ নখ দিয়ে পাষাণ মেঝেয় আঁচড় কাটতে কাটতে বললে, "বজ্রনাথ বলেছেন, পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে, এই শুধু মহর্ষির আদেশ। কিন্তু পুঁথি পেয়েও কালীভূষণ পুঁথি যেন না পায়।"

"অর্থাৎ"—

"কালীভূষণের হাত পা বেঁধে নৌকো ভাসিয়ে দিও। সেই সঙ্গে নৌকোয় পুঁথি তুলে দিও।"

আমি শিউরে উঠলাম। সুকণ্ঠও যেন কেঁপে উঠল। আমি বললাম, "এতে বজ্রনাথের লাভ কী—কালীভূষণ মরবে, সেইসঙ্গে অমরলতার পুঁথিও যে ঢেউয়ের তলায়"—

সুকণ্ঠ বললে, "কালীভূষণ সরে দাঁড়ালেই বজ্রনাথ অভিযানের নায়ক হতে পারেন। আর পুঁথি—মহর্ষির গুপ্ত কোঠায় গুপ্ত সিন্দুকে আরো একখানা পুঁথি আছে। সেই পুঁথি নিয়ে বজ্রনাথ বার হতে পারবেন।"

আমি হাত নিঙরে বললাম, "সুকণ্ঠ। বজ্রনাথ পাগল হয়েছেন। তাছাড়া কালীভূষণকে বাঁধবে কে?"

সুকণ্ঠ কাছে সরে এসে বললে, "মহর্ষির গুপ্ত কোঠায় আমি লুকিয়ে ছিলেম রঙিলা। শুনেছি, সন্ধানীরা তোমার হুকুম যতই অসম্ভব হোকনা কেন, একটি কথা না কয়ে' তামিল করবে। তুমি হুকুম দেবে, কালীভূষণকে তারাই বেঁধে ফেলবে।"

সর্ব্বনাশ! সুকণ্ঠ বলে কী!

সুকণ্ঠ তখনও থামেনি। সুকণ্ঠ বললে, "তুমি ভাবছো," কালীভূষণকে বাঁধা এতই অসম্ভব। শোনো রঙিলা, মহর্ষির আদেশ—তোমার কথা সবাই যেন মাথা পেতে নেয়। তুমি হুকুম দেবে, দেখবে যাদুকর সুশং কালীভূষণের চোখে মায়াঘুম এনেছেন। ঘুমন্ত বোম্বেটেকে হাত পা বেঁধে মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়।"

আমি বললাম, "অসম্ভব। আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারবো না। তুমি যাও সুকণ্ঠ। মহর্ষি নিজহাতে তোমার গলায় শ্রেষ্ঠশিষ্যের হার পরিয়ে দিয়েছেন, তুমি তার এই প্রতিদান দিতে চলেছ!"

সুকণ্ঠের মুখ কালো হয়ে গেল। ধরাগলায় সে বললে, "বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি আমি, আমার আর উপায় নেই রঙিলা। বজ্রনাথের বিশ্বাস রাখতে গিয়ে মহর্ষির কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে হচ্ছে আমায়।"

সুকণ্ঠের পানে তাকিয়ে আমার মন কেঁদে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে তার—ছুটি চোখ কোটরে বসেছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সুন্দর টিকলো নাক তার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা, বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি। কথা রাখতে হবে। তাঁর জন্যে যদি দরকার হয়, প্রাণ দেবো। শোনো রঙিলা, বজ্রনাথকে আমি কথা দিয়েছি, তুমিও দিয়েছ। মহর্ষিকে মুখফুটে কোনো কথা আমি দিইনি, কিন্তু তার দেওয়া হার গলায় পরেছি, কথা দেওয়ার চেয়ে এতো কম নয়! কিন্তু বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি, সেই হয়েছে সর্ব্বনাশ। মহর্ষিকে না ঠকিয়ে উপায় নেই।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "আর আমারও মহর্ষির কথা না রেখে উপায় নেই। কিন্তু, সুকণ্ঠ, আমিও যে বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি।"

"কথা দিয়েছ রঙিলা, কথা দিয়েছ বজ্রনাথকে, মুখের কথা এখন সর্ব্বনাশের নিশান হয়েছে তোমার। মহর্ষিকে ঠকাতে হবে-তোমার, মহর্ষির অভিশাপ কুড়োতে হবে।"

"আমি তা পারিনা সুকণ্ঠ, আমি, আমি কতটুকু! মহর্ষি, তিনি কতবড়—তাঁকে ঠকাতে গেলে"—

—"তাকে না ঠকিয়ে উপায় নেই। রঙিলা, বজ্রনাথ ভালোবেসেছিলেন আমায়। কবিতা লেখায় তাঁর কাছে হাতেখড়ি আমার। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, সুকণ্ঠ, গুরুকে মূল্য দিতে হবে মনে আছে তো? আমি বলেছিলাম, মনে আছে। সেদিন আমি মনে মনে বলেছিলাম, আর কিছুতে না হয়, প্রাণ মূল্য দেব। আজও তাই, যদি না পারি কথা রাখতে, বজ্রনাথের কাজে প্রাণ উপহার দিয়ে যাবো।"

হঠাৎ সুকণ্ঠের হাতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি চমকে উঠল। সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা, মৃত্যু

...ক দিয়েছে আমায়। তোমাকে রাজী করাতে পারলুম না। বেঁচে থাকার উপায় নেই। ...মি সাক্ষী রইলে, বজ্রনাথকে বলতে পারবে তাঁর কাজে প্রাণ দিয়ে গেছি আমি।"

সুকণ্ঠের হাত আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল! আমি মনে মনে কেঁদে খুন হয়ে বললাম, "হায় মহর্ষি! এ কী পরীক্ষায় ফেলেছ আমায়।" আমাকে কে যেন ...নে ঠেলে দিলে। আমি 'সুকণ্ঠ' বলে অস্ফুটস্বরে তাকে নাম ধরে ডাকলাম, তার হাতখানা ...প ধরলাম, "তুমি মরতে পাবে না সুকণ্ঠ"—

সুকণ্ঠ উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে, "না, মরতে হবে। বেঁচে থেকে বড় লজ্জা রঙিলা।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "তোমাকে লজ্জা পেতে দেবনা আমি সুকণ্ঠ! বজ্রনাথের কথা রাখবো আমি।"

"তারপর, তারপর তুমি বজ্রনাথের কথা রাখলে!" কালীভূষণ ভীষণ গম্ভীর স্বরে বললে। রঙিলার কাহিনী একটানা চলেছিল, জাহাজ-কোঠায় বোম্বেটেরা গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, জেগে জেগে তারা এই রঙিলা মেয়েটিকে যেন স্বপ্নে দেখছিল, স্বপ্নে ...ছিল। একটা, দুটো, তিনটে ঘণ্টা ইতিমধ্যে কেটেছে, কারো হুঁশ নেই। হঠাৎ কালীভূষণের কঠোর গম্ভীর স্বর নেশার সুরটা যেন কেটে দিলে। বোম্বেটেরা ধড়মড়িয়ে উঠল।

"সুকণ্ঠকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে তুমি রঙিলা!"—

"হ্যাঁ, বাঁচলাম তাকে," রঙিলা বললে, "শেষরাতে চাঁদের রূপোলী আলো যখন ভোরের ফিকে আলোয় মিশে মিশে যাচ্ছে, তখন আমি একখানা তলোয়ার হাতে জাহাজে চাপলাম।"

"জাহাজে চেপে, তারপর,—তারপর মহর্ষির চোখে ধূলো দিলে তুমি!" অধীরস্বরে কালীভূষণ বললে।

"হ্যাঁ, ধূলো দিতে হল মহর্ষির চোখে। কালীভূষণ, তোমার সামনে যাদুকর সুশঙের রোমাল তুলে ধরলাম, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে। তারপর তোমার হাতপা বেঁধে নৌকোয় তুলে দিলেম, সেই নৌকোয় তুলে দিলেম অমরলতার পুঁথির বাক্স। তারপর মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম তোমাকে"—

"আমাকে নয়, আমাকে নয়, তুমি ভাসিয়ে দিয়েছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোম্বেটে কালীভূষণকে" বলে' থরথর কাঁপতে কাঁপতে কালীভূষণ উঠে দাঁড়ালো।

কালীভূষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত এ কী কথা বলে—তার এলোমেলো কথা শুনে জাহাজ কোঠার সবাই ভাবলে। ক্ষিতিভূষণ ভারী গলায় বললে, "দাদা, স্থির হও, বোসো। নির্ব্বোধ রঙিলা তোমায় মহাসমুদ্রে ভাসিয়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্র তোমাকে ফিরে দিয়েছে।"

"কালীভূষণ নেই, কালীভূষণকে আর ফিরে পাবেনা ছোটকর্ত্তা" বলে' পরচুলো খসিয়ে পুলন্দ বসে পড়ল।

ক্ষিতিভূষণ পাষাণের মত স্থির হয়ে গেল। একটা অতিকায় অজগরের নিঃশ্বাসের মত জাহাজকোঠার বোম্বেটেদের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আর রঙিলা—জাহাজ কোঠার মেঝেয় সে লুটিয়ে পড়ল।

রঙিলার কাছ থেকে সকল রহস্য জেনে নেওয়ার জন্য নকল কালীভূষণ সেজেছিল পুলন্দ। পুলন্দের ফাঁদে রঙিলা ধরা দিলে, অমরলতার রহস্য জানলে বোম্বেটেরা। কিন্তু হতাশায় বোম্বেটেদের বুক ভেঙে গেল। তাদের একটা বড় আশা ছিল, রঙিলা মেয়েটির হয়তো মাথা খারাপ। অতটুকু মেয়ে, সত্যিই কি প্রাণে ধরে' সে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে হাত পা বেঁধে মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারে? নাঃ তা সম্ভব নয়। কিন্তু রঙিলা পুলন্দকে কালীভূষণ ভেবে অকপটে যখন তার কাহিনী খুলে বললে, বোম্বেটেদের ভুল ভাঙল। তারা শিউরে উঠল। কালীভূষণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোম্বেটে কালীভূষণ—সে এখন কোথায়! বোম্বেটেদের মনে হল, হায় মহাসমুদ্র কী নিষ্ঠুর! মহাসমুদ্রের যে গান শুনে তাদের রক্ত নেচে ওঠে, সেই গান যেন কত করুণ!

জাহাজকোঠার বৈঠক শেষ হল। রঙিলাকে তার কোঠায় আটক করা হল। একটা দিনের চারটা প্রহর আকাশের আগুনে গলে' গলে' সেই মহাসমুদ্রের জলে মিশে গেল!

সারাটা দিন ক্ষিতিভূষণ জাহাজের পাটাতনে পায়চারী করল। তার মনে শান্তি নেই। শুধু যে কালীভূষণের কথা সে ভাবছে, তা নয়। এই রঙিলা মেয়েটির কথা ভেবে ও তার মনে শান্তি নেই।—বোম্বেটেদের বিচার বড়ই নিষ্ঠুর। রাত দুপুরে তাকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। ক্ষিতিভূষণ একবার ভেবেছিল, ছেড়ে দেয় রঙিলাকে। কিন্তু না, তা কি সে পারে! কালীভূষণের আত্মা তাহলে অনন্ত পিপাসায় মরবে। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ একটা চাই তো। তাছাড়া পুলন্দ তার দুটি হাত ধরে বলেছে, "ছোটকর্ত্তা, আমাদের সর্দ্দার তুমি। ঐ মেয়েটার চাঁদপানা মুখ দেখে ওকে যদি ছেড়ে দাও তুমি, তাহলে আমরা জানবো আমাদের আর সর্দ্দার নেই।

কিন্তু, ক্ষিতিভূষণ ভাবছে রঙিলা পাষাণী তো নয়। কালীভূষণকে যখন সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, তখন কি আর তার মাথার ঠিক ছিল? তাছাড়া ওর অত সুন্দর মুখ কী ম্লান করুণ দেখাচ্ছে। ক্ষিতিভূষণ দেখেছিল, কালীভূষণ ফিরে এসেছে এই খবর পেয়ে, নকল কালীভূষণকে দেখে রঙিলার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সে কি আর তার নিজের ভুল ধরতে পারেনি!

দুপুররাতে হাওয়া পড়ে গেল, মাঝসমুদ্র হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সমুদ্রের ঘুমন্ত চোখের স্বপ্নের মত একখানা চাঁদ আকাশে ফুটে রইল। সাদা মেঘের ওড়না গায়ে অতবড় আকাশ একেবারে স্থির হয়ে থাকল; আজ সে আর আলোর দোলায় দুলছেনা, তার তারার আঁচল কেঁপে কেঁপে আর চিকমিক করছে না।

রঙিলা তার জাহাজকোঠায় জেগে জেগে রাতের প্রহর গুনছে। মৃত্যু কেমন, মৃত্যু কি মধুর, মৃত্যু কি শুধুই দেশ থেকে বিদেশে যাওয়া—সে ভাবছে। হঠাৎ কবাটে খুট করে একটা শব্দ হল। ক্ষিতিভূষণ এসে কোঠায় ঢুকল।

রঙিলা তার খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "রঙিলা, আমাকে আসতে হল।"

রঙিলা অদ্ভুত হেসে বললে, "তা বেশ! ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিজ হাতে নিতে চাইলে, তোমায় ঠেকায় কে!"

ক্ষিতিভূষণ ম্লান হাসল।

রঙিলা বললে, "ভয় নেই, আমাকে মারতে হাঙ্গামা নেই। আমি সাঁতার জানি না; সমুদ্রে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবো।"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বললে, "যত বড় আনাড়ীই হোক, সমুদ্রে পড়ে একবার ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠে।"

রঙিলা বললে, "ওঃ।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "তখন তার চোখে পড়ে নীল আকাশ, অনেক দূরের আকাশের আলো, আর সব কিছু নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী।"

রঙিলা কথা বললে না।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "তখন তার বড় সাধ হয়, হায় যদি কোন রকমে বাঁচতে পেতাম।"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে রঙিলা পিছন হটে গেল, জাহাজকোঠার দেয়ালের গায়ে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু একবার কেঁপে উঠল।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "কী ভাবছো রঙিলা? সময় হয়ে এলো। কিছু বলার থাকে, আমায় বলতে পারো।"

রঙিলা বললে, "ক্ষিতিভূষণ তোমার জাহাজ তো দেশে দেশে যায়। যদি কোথাও সুকণ্ঠের দেখা পাও তো বোলো রঙিলা বজ্রনাথের কথা রাখতে মারা গেছে।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আচ্ছা।"

ক্ষিতিভূষণের পিছু পিছু রঙিলা জাহাজের পাটাতনের ধারে এলো। সচরাচর বোম্বেটেরা ঘটা করে বন্দীদের শাস্তি দেয়। নাচ গান জমে, জাহাজের পাটাতনে বোম্বেটেদের

বেশ খানিকটা ভিড় হয়। কিন্তু ক্ষিতিভূষণ কথা আদায় করেছে, কোন ভিড় হতে দেওয়া নেই। একা সে শাস্তি দেবে। ভিড় পাকিয়ে একটা কচি মেয়েকে সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে দেখা পুরুষের কাজ নয়।

মহাসমুদ্র ধূসর আলোয় দেখা যাচ্ছে ধূ ধূ। দিগন্তে রহস্যের যবনিকা দুলছে। তার ওপারে—

"রঙিলা, ঐ দেখা যাচ্ছে দিগন্ত। তার ওধারে কী আছে জানো?"

"জানি না" রঙিলা বলে। মনে মনে ভাবে, মৃত্যু। মৃত্যু দিগন্তের এধারে, ওধারেও।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "দিগন্তের ওধারে আশা। আমাদের সামনে মহাসমুদ্রে কোনো আশা নেই। কালীভূষণের নৌকা দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের ওধারে হয়তো চলেছে কালীভূষণের নৌকা। এসো রঙিলা, সময় হয়ে এলো।"

রঙিলার মুখে মৃত্যুর ভয় ফুটে উঠেছে। তার দুটি চোখে একটা আশ্চর্য্য বেপরোয়া ভাব জেগে উঠেছে। সেখানে যেন জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত্তের ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে।

ক্ষিতিভূষণের পাশে রঙিলা এসে দাঁড়ালো। ক্ষিতিভূষণ বললে, "এবার আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব।"

তারপর—তারপর, ক্ষিতিভূষণ রঙিলাকে ঠেলে ফেলে দিলে।

কিন্তু রঙিলা মহাসমুদ্রে না পড়ে জাহাজে বাঁধা একটা নৌকার উপর এসে পড়ল। ক্ষিতিভূষণ এক লাফে নৌকায় নেমে এসে দড়িটা কেটে দিলে। নৌকা টলমল করে মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ থেকে তফাতে সরে এলো।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই রঙিলা। তোমাকে প্রাণে মেরে লাভ কী? তার চেয়ে তোমাকে সঙ্গে করে কালীভূষণের খোঁজে বেরিয়ে পড়া কি ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ নয়!" একটু থেমে ক্ষিতিভূষণ বলে, "হয়তো দিগন্তের ওধারে কালীভূষণের নৌকা চলছে। হয়তো তাকে আমরা ফিরে পাবো।"

ক্ষিতিভূষণ রঙিলার একটা হাত তার হাতে আস্তে আস্তে টেনে নিলে।

অনেক দূরে তাঁর গুপ্ত কোঠায় বসে মহর্ষি তখন লিখছেন, "অমরলতার তপস্যা ব্যর্থ হতে পারে না। অভিযানের নায়ক যে—একদিন সবুজ দ্বীপে সে পৌঁছবে। মহাসমুদ্র, অরণ্য, পাহাড় তাকে পথ ছেড়ে দেবে। মৃত্যু তার সামনে মাথা নুইয়ে পথ করে দেবে।"

প্রথম খণ্ড শেষ

শীতের ভোরে

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

শীতের ভোরে

বেজায় শীত। তবু রাত তেম্‌নি বড় হওয়াতে, ভোরেই উঠে পড়েছি। সব পাখী তখনো ডাকেনি ভালো করে। কুয়াসার তুলোর জাল দিয়ে পৃথিবীকে ঢাকছে যেন কে; কিন্তু শীতের কাঁপুনি সে জাল ছিঁড়ছে দশ আঙুলে।

যেন কোন জটী বুড়ী তার জট আঁচড়াচ্ছে সারা রাত আর কাঁপছে।

ঘুম কাতুরে বলে আমার একটু যে খ্যাতি না ছিল, তা নয়। ও অখ্যাতি ঝেড়ে ফেলেছি। জ্যোতি-দার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, বাড়ীর সবার আগে উঠব দেখো। এ শীতেও আমার পণ পণ্ড হয় নি, আজও!

শুধু উঠেই, শীতকে নিস্তার দিয়েছি ভাবো তো ভুল হবে। রথীশকেও ডেকে তুলেছি। দুটো লেপের ভিতর থেকে বাইরে এনেছি তাকে, যেমন করে বাক্সের আঙুরকে বার করতে হয়।

দু' মাইল করে হাঁটতে হবে ভোরে আমাদের, জ্যোতি-দার কাছে এ আমাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ।

আমার মনে পড়ে না হেরেছি। কিন্তু রথীশ নিজেই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে ধনুক ভাঙার বদলে। মানে, পণ সে প্রায়ই রাখতে পারে নি।

জ্যোতি-দার কাছে লজ্জা পাবে? তাই শীত জমাট বাঁধতেই, আমি ওর সহায় হয়েছি।

পথে এসে মুস্কিল। এক এক জনকে যেতে হবে এক এক দিকে। তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে নিয়ে এসে জ্যোতি-দা এবার আমাদের সঙ্গে এই মজা সুরু করেছেন।

আমরাও দেখব, ভাবছি।

বললেম "পথে হারিয়ে যাস্ তো রথীশ, হুইসিলটাতে হেঁকে সুর দিস্!"

চোক কচলে' রাঙা করে রথীশ রেগে বললে, "যাঃ!"

মফ্‌লার ভালো করে এঁটে, আল্‌ষ্টারের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে ও কুয়াসা ভেদ করে চলে গেল জোরে একটা নতুন রণতরীর মত! আলোয়ান জড়িয়ে আমি মাঠের যে দিকটাতে এলেম, একেবারে কুয়াসার বেতাল সাগরের মধ্যে এসে পড়লেম যে!

—তাই তো, আমার মনের সাহসের কম্পাস অচল হল কি এই গেঁয়ো মাঠটাতে, আজ, শেষে ?

লজ্জা করল। দাঁড়ালেম। কোথায় জানি নে। তবু হুইসিলের দিকে হাত গেল না। ও অপমানের পথে না গিয়ে, চলব সোজা।

উপায় যখন হাতে নেই, চলেলেম সাব্‌মেরিণের মত।

পাখীর গান শুনছি এদিকে সেদিকে! শাদা শ্বেতভূত হয়ে গেছি। শুনেছি যে আলোয়ান আসে কাশ্মীর থেকে নয় তো ইয়োরোপ থেকে, এখন সেটা বেশ বুঝতে পারছি ছটো হাতের উপর দিয়ে আর সেই শোনা কানে। হিমে আলোয়ানটা বোধ হয় কুল্‌পী হয়ে গেছে। সোয়েটারের ভিতরে ছিলেম তাই রক্ষে। পাখীর বাসায় থাকা ডিমের মত ভাবছি মনে মনে অসীম কথা আর চলছিও মহা নিরুদ্দেশে!

ছ' একবার ভাবলেম রথীশের বোধ হয় হুইসিল্ শুনতে পাব। কিছু না। পৃথিবীতে কুয়াসা ছাড়া আর কিছু আছে যেন এ-ও আশা করা ছরাশা হয়ে উঠল।

হঠাৎ খট্ করে কী ঠেকল পায়ে! একটা গর্ত্তে পড়তে পড়তে, শিউরেও সাম্‌লে' গেলাম খুব। শরীরটাতে বেজায় একটা নাড়া পড়ল। ভোর বেলাতেও কোনো ভুতুড়ে কিছু কি থাকে গাঁ-দেশে?

একটা ভাঙা ঢিবিতে ধাক্কা খেয়ে আর উঠতে পারি নি, বসে পড়েছি! শিশিরে ধোয়া হয়ে যেন ঘেমে হাসছে কী কোমল সুন্দর মুখ কালো পাথরের পুতুল! যেন গর্ত্তটাকে আলোতে ভরে রেখেছে কালো পুতুলেই। একটুকু তবু দেখলেম নুয়ে পড়ে'। কিন্তু পারলেম না থাকতে। টুক্ করে তুলে নিলেম বুকে ওকে আলোয়ানে জড়িয়ে।

চারদিকে নানা পাখীর গানে কুয়াসা যেন ঘাব্‌ড়ে গেছে। ঢিবিটের উপর দিয়ে, লাফিয়ে উঠেছি একটা ভিটেতে। আঃ!—কি দেখলেম? পিছনে থম্‌কে আছে কুয়াসা, আর সাম্‌নে? উঁচু জমির উপর দিয়ে ঢেলে গড়িয়ে পড়ছে সূর্য্যের সোনা, গাছের হাজার হাজার ফাঁক ভরে দিয়ে, খালের জল এক চুমুকে সোনার তবকে গড়ে' তুলে, পথ চলা মানুষ গরু কুকুর মোষ—ঘর কুড়ে, পুকুর, দোকান, খেয়া নৌকো, ছোট্ট ডাকঘর সব যেন কোন্ যাহুতে হাসিয়ে দিয়ে, ঝিক্‌মিকে পাখা মেলছে আকাশে।

হালের গরু পালে পালে চলে গেল। লাঙল কাঁধে হুকো হাতে চাষী নীচু মাঠের ভাঙা ভাঙা ভীতু কুয়াসা যেন টেনে ফেলে দিয়ে পথ করে চলল তাদের নিয়ে।

সত্যি আর এক গাঁয়ে এসে পড়েছি। পড়েছি তো, এগিয়ে চললেম। জ্যোতি-দার গাঁয়ে আগের ছ'দিন বেড়িয়েছিলেম বেশ গাছের সারির ভিতর দিয়ে; এখানে পূবদিকে শুধু খোলা মাঠ। কী খোলা! রোদে কুয়াসায় মাখামাখি হয়ে যেন এক অজানা দেশ করে রেখেছে সাম্‌নের সব ধূ ধূ দূরটা! পাথরের পুতুল কি নিয়ে এল আমায় ভুলিয়ে এই মধুর আব্‌ছা-রহস্য ঢাকা দেশে? ওকে আবার দেখলেম। সুন্দর রহস্যের হাসিতে ঘেরা ওরও মুখ। কাঁচা রোদ পড়ে কালো সৌন্দর্য্য ওর চিক্‌চিকিয়ে উঠল দারুণ সুন্দর হয়ে।

"কোথা যাবেন আপনি?"

চমকে' উঠলেম। বিষম লম্বা, দাঁত উঁচু একটি র‍্যাপারে জড়ানো মানুষ। চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত।

"কোথা যাবে তুমি, বাবা?"

চমকে' ডানদিকে ফিরলেম। প্রকাণ্ড পাকা দাড়ি, তুলোর টুপিতে বালাপোষে সেলাইয়ে আঁটা গা মাথা সোজা দাঁড়িয়ে, হাতে মোটা বাঁকা লাঠি, চোক ছটি শিশিরে ভিজানো স্নেহে ভরা।

মাথা নেমে এল। পুতুলটা রুমালে বাঁধতে বাঁধতে জানালেম নমস্কার করে, রায়পুর জ্যোতিবাবুদের বাড়ী এসেছি, যাব কোন্ পথে?

"ও!"

ছ'জনেই উঠলেন বলে'।

"তাই বুঝি মূর্ত্তি কুড়ুচ্ছিলে? জ্যোতি তো ক'বার নিয়েছে। বেশ, কলকেতায় ওসব থাকবে ভালো। নাও। ওই পাকা পথ ধরে, এসো সোজা উত্তরে যাবে রায়েদের বাড়ী।"

যেন বালাপোষ ফুঁড়ে হাত একখানি ছুটে এসে আমায় টেনে নিলে বুকের আড়ালে, বোধ হয়, যেমন করে পাখীর উড়ন্ত ডানা সাথে করে নেয় ছানাকে উড়তে শেখাবার বেলায়।

পাকা পথ অবধি চললেম, মনে হচ্ছে ঠিক ঠাকুর্দ্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছি। পাথরের পুতুলের সবুজ মায়াপুরীতে।

লাল পাকা পথ। চারদিকে বিপুল সবুজের নাচ। পথে উঠে চমক ভাঙ্‌ল। শব্দ হল মাথার উপর দিয়ে "এগিয়ে গিয়ে দিয়ে আসব কি, বাবু?"

"হো! হো!" করে একরাশ হাসি হিমেল হাওয়া তাতিয়ে দিলে হুধশাদা দাড়ির কাশবন উলটপালট করে দিয়ে এসে।

"বলছিস্ যদু ! ও বয়েসে যে আমরা সাত গাঁ সহর ঘুরে এসেছি শুধু পায়ে রে !"

প্রায় সিকিখানা খাটো হয়ে গেল লম্বা মানুষটি। আমি তার হাতে ধরে বললেম, "মাপ করো আমায়, দেখবে ভাই, আমি ঠিক পৌঁচেছি,—এই তো সোজা উত্তর পথ !"

শাদা দাড়ি উড়িয়ে আর দুলিয়ে দিয়ে হাসি এল "জেনো, দুপুর গড়াতেই খবরটা নেবো আমি।"

খোলা হাসির নিবিড় আদর আর চাপা হাসির একটি মিষ্টি চাউনি গায়ে মেখে বাস্-এর মত চললেম আমি লাল পথের নতুন কাঁকর গুঁড়িয়ে, অফুরন্ত সবুজের যেন সিনেমার ভিতর ভিতর দিয়ে।

উঠে পড়ল রোদ। দশ লক্ষ বকের পাখা বোধ হয় সবুজ সমুদ্দুরের উপর দিয়ে চলেছে। রথীশ এখন কী করছে ? ও কি পথ হারিয়ে এরকম রোদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, না আল্‌ষ্টারে হাত পূরে' গট্‌গট্ করে গিয়ে, কুয়াসায় চাপা পড়তে পড়তে ফিরে চা খাচ্ছে জ্যোতি-দার খুকুর টেবিলে ?

মনে হল যেন আমার পুতুলটা হেসে উঠল। কখন্ ওকে একটু ভারি লাগছিল, এখন আর নয়। কী মধুর ছায়া ! শীতের মধ্যেও একটা গরমে চাপা সবুজ রাজ্য—সব শব্দ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে—এক অরণ্যে পড়েছি ঢুকে ! দেশে মহাবন আর দেখিনি, বোধ হল কোনো মহাবনে পৌঁচেছি। পাতায় পাতায় গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে লতায় ঝোপে, বিশাল এক এক গাছে গাছে মেশামেশি। কোথাও শিশির টপ্ টপ্ করে ঝরছে প্রায় বৃষ্টির মত, কোথাও শিশির পাতার মধ্যে জমে জল হয়ে খল্‌খল্ করে হাসছে পাখীর গানে কান পেতে রেখে। পথের লালের উপর মাঝে মাঝে রোদ পড়েছে হঠাৎ আঁকা আল্‌পনার মত—যেখানে এলেই চেয়ে থেকে, ঠিক তাকে অম্‌নি রেখে চলতে ইচ্ছে করে, পথটুকুতে বেঁকে। টেনে নিলে এক ঝাঁক নীল-বেগুনী ফুলে মনটাকে। পথের বাঁ ধারে। থমকে' প্রায় জব্দ হয়ে গেলেম, তুলতে গিয়ে। সরু ডালে একেবারে নীলপরীখুকুর ডানার মত নুয়ে পড়ল পাতাগুলো সবুজ হয়ে ভয়ে যেন চোখের জল ছেড়ে দিয়ে—কাঁপতে কাঁপতে। ছোট্ট কাঁটায় খামচে' দিলে যেন হাতে ডালটাকে উঁচু করতে ! বাঃ রে ! পাথুরে' পুতুলের দেশে ফুলগাছ কি এ না আর কিছু সত্যি ? একটা ফুল হাতে এসেছিল, তারপর আর আমি নিলেম না। হাতে পুতুল বাঁধা রুমালটার দিকে চেয়ে নিয়ে, সাম্‌নে চললেম ঝুঁকে পথটাতে—ঠিক সেইখানেই একটু সে বাঁক ফিরেছে।

এত বড় পাতা দেখিনি আগে চারাগাছের কখনো। দাঁড়ালেম বাঁক ঘুরতে। থালার চেয়েও বেশ বড়ই হবে। তিনটে পাতার আমি পারলেম না লোভ সামলাতে। বসেই আছে পাশে বড় গাছের গায়ে অদ্ভুত একটা কি পোকা, পাখাওয়ালা, উড়ল না পাতাটা গায়ে লেগেও ! মাথা থেকে পিঠটে যেন দিব্যি কে ছুরি দিয়ে কেটে রেখেছে তার !

কৌতূহলে ধরলেম একটা পাতা কুড়িয়ে ওকে চেপে। কিন্তু হাসতে হল। শুকনো পোকা ! ! তবু ধরেছি যা হোক। বেশ দেখতে ; চক্‌চকে, যেন কাঁচের মত। রথীশকে পেলে বলতেম, ছাখ্ আরেকটা নতুন হুইসিল্ জুটে গেল। পুরোণোটার সাথী করে দিলেম ওকে পকেটে।

একটা গরুর গাড়ী ছইয়ের ভিতরে বৌ আর ছোট ছেলে নিয়ে ক্যাঁ কোঁ করে যেন ভেঁপু শুনিয়ে সবকে চুপ করতে বলে একা এসে চলে গেল আমাকে চেয়ে দেখে, ছাড়িয়ে আসা বনের পথে।

একি ! পুলের উপর উঠে যে আরেক পৃথিবীতে ! ডানে আর বাঁয়ে রোদে জ্বল্‌জ্বল্ হলুদ রংএ ছেয়ে গেছে মাঠ—তারি অচেনা দেশের মাঝে মাঝে নীলে শাদায় দোল্ খেয়ে লুকোচুরি খেলছে দুধারটা সব !

একটা মাঠ ? একটা দেশ ? রোদের তুলিতে লেখা একটা ছবি ?

ইচ্ছে করল এইখেনে রথীশকে এক্ষুণি জোড়া হুইসিলে ডাকি। আর জ্যোতি-দার গলা জড়িয়ে ধরে বলি তাঁকে, আমি হারলেম, পথ হারিয়ে নয় জ্যোতি-দা, কোথাকার যেন নতুন করে দেখানো পথ পেয়ে।

পুলের উপর থেকে নামলেম যখন, ঝাঁকি লাগছে হাতের পুতুলে আর পাতায়। যেন কোন্ আনন্দে মাতাল হয়ে তারা চলেছে আমার সাথে, দুধারের গন্ধের, মৌমাছির ডাকের আর রঙের থৈ থৈ ঢেউ কেটে কেটে।

যখন পৌঁচে গেছি রায়বাড়ীতে, তখন আমার দু হাত ভারি দেখে, জ্যোতি-দা এগিয়ে নিয়েছেন আমায় আগ্‌লে'। দো-ভাঁজ করে গলায় মফ্‌লার জড়িয়ে রথীশ রয়েছে কোঁচকানো ভুরুতে হাসিমেখে আমার দিকে চেয়েই, আর খুকুর...যেন হারাণো কাউকে পাওয়া—বিষম চেঁচিয়ে !

বাড়ীর ভিতরটা দোর জুড়ে' এসে বোঠকখানাতে গেছে জমে।

কিন্তু আর একটা চিৎকার খুকুর। লাল মাছের কাঁচের হাঁড়িটা ঘেঁসে ঠোঁটে ঠোঁটে কট্ কট্ শব্দ করছে যে পাখীর ছানাটা, তাকে দেখে।

এসেছে ও আধমরা একটা আমগাছের নীচের ছোট ঝোপের পাশ থেকে আমার
আলোয়ানের ঝুলির পালকিতে চেপে। 'ক'-'খ'-র বইয়েতে ওকে কবে চিনেছি কখন, চোকে
তো দেখিনি, দেখা পেয়ে অত চেনা বন্ধুর, চায়ের নেমন্তন না করে কে-ই বা পারে? সকাল
বেলাতে তা আমিও পারিনি।

রথীশ বললে হাত মুঠো করে টেবিলে চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে, "তুই পারিস্ সব, জানিনে তোর
অসাধ্য কি আছে।"

খুকু বললে জ্যোতি-দার চেয়ারে কোলে বসে তাঁকে জড়িয়ে, বড় বড় চোক ছুটো
পাখীর দিকে ফিরিয়ে রেখে, "কিসের ছানা, বাবা?"

জ্যোতি-দা বললেন হেসে ফেলে, "সন্ধ্যেবেলাই ওর কথা জানতে পারব। অমিয় আর
যা ব্যাপার করে তুলেছে, এ বেলাটাতে সবাই আগে তাই শোনো।"

পাখীর ছানা তো চেনা আমাদের অনেকের, আর ব্যাপারটা কি হল ভেবে ওঠা ঠিক
সহজ হল না।

"ছাখ, শেগুণ গাছ দেশে এদিকে নেই। রায়পুরে বড় জঙ্গলে যে শেগুণ গাছ জন্মেছে
তা চেনে আর জানে খুব কম লোকেই। এই বড় পাতাগুলো হচ্ছে ওই গাছের। এ
নিয়ে একটা কাগজে আমি লিখেছিলেম। আবার হবে স্থরু। তার ফল খুব বড়ও কিছু
হতে পারে।"

কিন্তু খুকু খুসী হচ্ছিল না। ছানাটা তখন বইয়ের গাদা ঘেঁসে চোক বুজে রয়েছে।
খুকুর জাগা চোক, চুপ করা মুখ, সে দিকেই।

"স্যার জগদীশ যাকে জগতে বিখ্যাত করেছেন সে লজ্জাবতী লতার এই ফিঁকে বেগুণে'
ফুল। গাছ যে মানুষের মতই প্রাণের সাড়া দেয়, এই লতাই বিজ্ঞানের পাতায় লিখে
তা দিয়েছে। হাল্‌কা নীলে শাদায় ছোট্ট ফুলগুলো আর লাল্‌চে হলদে ফুল, তিল আর
শণের। শীতের মাঠ এরা গন্ধে, মধুতে, রঙে ভরে রাখে। এই হলদে ফুল আর কাঁটা-
ওয়ালা ডালটা বাব্‌লার। এইটে জলপাইএর একটা ডাল। এদের কেউই কম নয়।
জগতের কাজে এদের খুব বড় ইতিহাস আছে। হুইসিলের সঙ্গে রাখা এই পোকার
খোলসটি হচ্ছে ঝিঁঝিঁর খোলস। যা ডাক ঝিঁঝিঁর! ওরা পোকাদের হুইসিল বটে!
কেউ বলেন, ওদের সন্তানেরাই খায় ওদের পিঠ খুঁড়ে'। কেউ বলেন ডেকে ডেকেই ওদের
পিঠ ফেটে যায়। অনেক খবর আর অনেক চিন্তা আজ এই টেবিলে জড় হয়েছে।"

বড়দি বললেন "ওদিকে যে জড়সড়র ধূম লেগে গেল ও কোণে!" সবাই উঠলেন
হেসে। খুকুও। বেলা বাড়ছে আর ছানাটা চোক বুজে বলের আকার ধরছে।

"কিন্তু আমরা এখন পাখা মেলছি। অনেক দূরের খবরের এবার আনাগোনা।
এই পুতুল, একটু ও বড় বলেই খুকুর ওতে লোভ পড়েনি, অনেক খোঁজার পর আজ হঠাৎ
এসে পড়েছে। ইনিই আমাদের বৌদ্ধ দিনের সরস্বতী। তাঁকে বলে 'প্রজ্ঞা পারমিতা'।
ওঁর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর একটি আছে শুধু কাবুল দেশে, এঁ-কে নিয়ে বিদ্বান্ সমাজে
এবারে আনন্দের ঝর্ণা খুলে যাবে।"

রইলেম অবাক। ওগো মায়াপুতুল! আজ যে দেশ দিয়ে এনেছ তা কি ভুলব? পার
তো পরীক্ষের দিনটেতে দিও ধারাজল একটুকু ছড়িয়ে।

"ও তো সরস্বতী লক্ষ্মী তুইই পেয়েছে!" হেসে উঠল রথীশ। সঙ্গে সব। আমিও।

খুকু তাকাচ্ছে।

জ্যোতি-দা বললেন "চোক বুজে থাকা কি লক্ষ্মীমন্তের লক্ষণ বল কেউ?"

"ও যে প্যাঁচার ছানা, লক্ষ্মী এলে ও-ও চোক খুলবে" বললেন হেসে মেজদি।

"প্যাঁচা?——বাবা?"

"হ্যাঁ খুকু, আমিও প্রথম দেখলেম" বললে রথীশ আমার দিকে প্রশংসার
দৃষ্টিধারা ঢেলে।

যেন ছুজনেই জুড়ুলেম।

খুকু আঁকড়ে ধরে জ্যোতি-দাকে হি-হি করে হেসে উঠল ছানাটাকে যেন নতুন করে
বিঁধে বিঁধে দেখতে থেকে!

"তা হলে বল যে সরস্বতী আর লক্ষ্মী--দিন আর রাত—এ ছুজায়গাতেই আমরা
চোখ খুলব, কেমন?" জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতি-দা।

"কিন্তু কুয়াসা না কেটে গেলে নয় জ্যোতি-দা, এ ক'টা দিন পর।"

রথীশের কথায় বৈঠকখানায় হাসির শিশিরবৃষ্টি হতে লাগল।

চা'র পেয়ালাগুলো বিদেয় পেয়েছে অনেকক্ষণ। এবার দীঘীর ঠাণ্ডা জল আমাদের
টানছে।

কিন্তু স্নানের কথা মনে হতেই ভুরুর ক্যাপস্যুল কুঁচিয়ে গলায় লেবেল আঁটা
আল্‌ষ্টারের খাপে ঢাকনা খোলা অষুদের শিশির মত দাঁড়িয়ে পড়ল রথীশ চেয়ারের
হাতল ধরে।

চা তো হলই ক'বার, ক্বাথও তার তু'গুণ চলেছে।

বললেম, "বরং এক ফোঁটা ব্রাইওনিয়া খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্ এসে আমার
সঙ্গে, তুই শুদ্ধ লাখ ডাইল্যুশন হয়ে সেরে যাবি সাঁৎরাবার ঠিক মাঝখানে।"

হাসলে রথীশ—“বলেছিস! দাঁড়া ভাই, গরমের দিনে আসব, সাঁতার
শেখাস্।”
রেখে তেলের বাটি, খুকু এসে টানছে দুহাতে, “বা রে! বুঝি বেলা
হয় নি?”
কাজেই সব সাঁতারের কসরৎ আজ তাকেই হল দেখাতে।
লোক বিকেলেই। কখন্ পৌঁচেছি এসে জানতে, আর বাড়ীর ছেলেদের কাল ডাক।
মানে, জ্যোতি-দার আর আমাদের নেমন্তন।
যেন শাদা মেঘের মত মনে পড়ল, যাঁর কোলে উড়ে এসেছি আজ, ছোট্ট
ঘুড়িটি।
আবার বুঝি কাটবে কিছুক্ষণ গন্ধরঙিন্ আমাদের সেই ‘প্রজ্ঞাপারমিতার’ মায়া-আলোর
আনন্দপুরে?
সন্ধ্যের দীপ জ্বলল শীতকে ধাধিঁয়ে। বের করতেই আমাদের ধাঁধিঁয়ে উড়ে গেল
প্যাঁচার ছানা খুকুর জোর হাততালির বিদেয়-মালা নিয়ে।

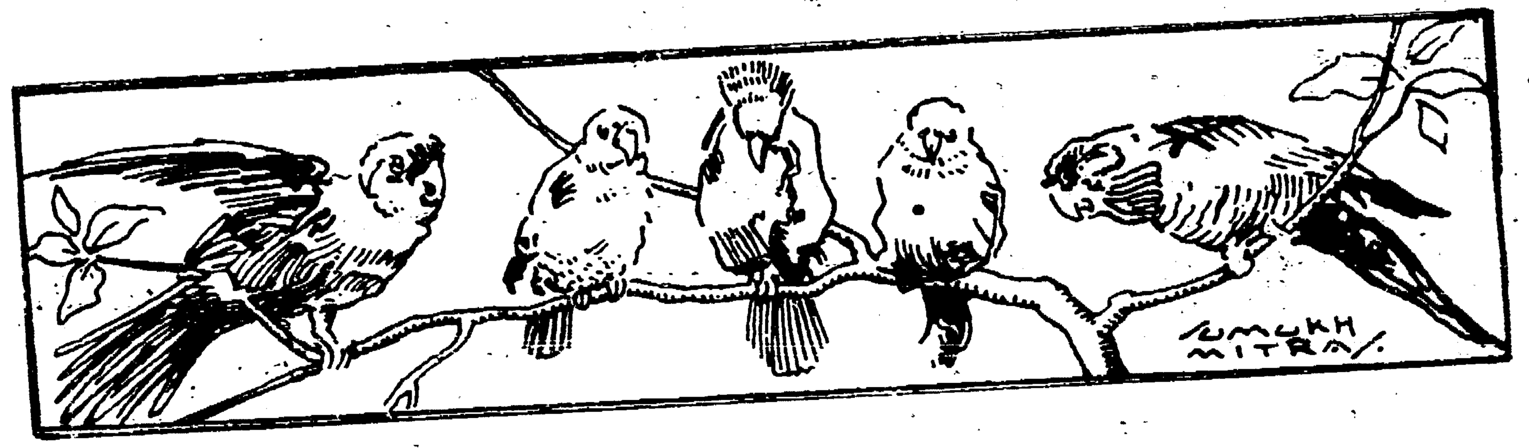

ভাল্লুকদের মংলু

ভাল্লুকদের মংলু মানুষেরই ছানা কারণ ভাল্লুকদের ঘরেত আর মানুষের ছানা জন্মাতে পারে না। তা হলেও ভাল্লুক মা তার বাচ্ছাদের বলে যে—দেখিস বাছারা মংলুকে যেন তোরা আঁচড়ে দিসনি। ওর নরম খালি গায়ে তোদের নখের আঁচড় লাগলে রক্ত বেরোবে। মংলু মানুষের ছানা হলেও তোদেরই ভাই। একই মায়ের দুধ খেয়ে মংলু মানুষ হচ্ছে। দেখছিস না ও যেদিন প্রথম এল নরম নরম কচি হাতে আমার লোমগুলো আঁকড়ে ধরে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোল একটুও ভয় পেল না? খবরদার ওকে যেন আঁচড়ে দিসনি। ওর গায়ে লোম নেই বটে, থাবাতেও নখ নেই কিন্তু দেখিস মংলু একদিন এই বনের রাজা হবে। ওর চোখদুটো দেখিস না? যখন একদৃষ্টে ও আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে তখন আমার শুদ্ধ বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। আমি চোখ সরিয়ে নিই। ওর চোখে কি যেন আছে বোধহয় মানুষরা যাকে আগুন বলে সেই। আগুনকে স্বাধীন জানোয়াররাও ভয় পায় কারণ ওই লাল ক্ষ্যাপাটে ঢেউগুলো যে কি করে হয় সে মানুষ ছাড়া কেউ জানে না।

ভাল্লুক মায়ের তিনটে ছানা অবাক হয়ে মা'র কথা শোনে। গুহার বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে। বনানীর পাতা বেয়ে জলের টুপ টাপ শব্দ। দূরে ধোঁয়াটে গারো পাহাড়ের মাথায়, আগ্নেয় গিরির পাহাড়ের মুখে সীসে-কালো ধোঁয়ার মত একটা বিরাট কালো মেঘের চাপ। ভাল্লুকদের বাচ্ছা তিনটে মায়ের গায়ের উষ্ণতাটুকু ভাল করে অনুভব করবার জন্যে আরো ঘেঁসে আসে।

বড় ভাই কালা বলে ওঠে—ওমা মংলু আমায় ঠেলে দিল।

ভাল্লুক মায়ের বুকের কাছে মংলু—এতটুকু মানুষের ছানা, তার কচি হাত দিয়ে কালার পিঠে থাবড়াতে খাবড়াতে কচি গলায় বলে—তা-তা-তা—

—ওমা মংলু আমায় মারছে।

ভাল্লুক মা বলে—থাক থাক কিছু বলিস নি যেন। ছেলে মানুষ ওকি জানে? এই জলে ঝড়ে ওর শীত করছে গায়েত আর আমাদের মত লোম নেই!

মেঘে আর চাঁদে লুকোচুরি খেলা চলছে

ভাল্লুক মা তার থাবা দিয়ে মংলুকে আরো বুকের কাছে টেনে আনে। তার বিশাল দেহের বুকের লোমগুলো মংলুকে আড়াল করে তার ছোট্ট শরীরটা গরম করে তোলে। মংলু চুক চুক করে ভাল্লুক মার বুকের দুধ খায়। বাইরে বনের মাথায় ঝমঝম করে বর্ষা নেচে চলে। বৃষ্টিধূসর রূপালি পর্দার আড়ালে গারো পাহাড়ের অস্পষ্ট চেহারা মুছে যায়। নীরব শান্তিতে ভাল্লুক মা আর তার বাচ্ছারা বাইরের সেই বর্ষার খেলা দেখে। তাদের চোখে অন্তহীন যুগযুগান্তরের আদিম জীবনের আদিমতা।

ভাল্লুকের দলে মংলুর আসাটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। যার জীবনের কোন আশাই ছিল না, এমনকি পাজী শেয়ালের মুখের গ্রাস থেকে নেহাৎই ভাগ্যের জোরে যে বেঁচে গেছে; তার জীবনযাত্রার সুরুটা কিছু অদ্ভুতও বটেই।

সেদিন শেষরাতে ভাল্লুকের গুহার মুখে মেঘে আর চাঁদে লুকোচুরী খেলা চলছে। সাদা-সাদা তুলোট মেঘের দল আধখানা চাঁদের ওপর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে আর সেই মেঘের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চাঁদ নেচে নেচে চাঁদা হাসি হেসে বলছে ছুয়ো ছুয়ো। মেঘেদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। গারো পাহাড়ের নীচে ঘুমন্ত বন দুরন্ত গ্রীষ্মে থেকে থেকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুচ্ছে যেন।

ভাল্লুক মা তার গুহায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে প্রথমে নখদিয়ে গায়ের লোমগুলো চুলকে নিল তারপরে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে হাই তুলল। চাঁদের আলোয় তার বড় বড় আইভরি দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। জানোয়ারদের চমৎকার দাঁতগুলো একটা দেখবার জিনিস। তারপরে আড়ামোড়া ভেঙ্গে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে ঘুমের কণাগুলো তাড়িয়ে ভাল্লুকমা বলে উঠল···অরর্‌র্‌

তারপরে তার ঘুমন্ত তিনটে বাচ্ছাকে ঠেলা মেরে বলল—ওঠ ওঠ শিকারে যাবার সময় হোল।

বাইরে শুকনো পাতায় একটা সামান্য খসখস শব্দ। গুহার মুখে কার যেন ছায়া পড়ল।

—কে যায়? ছানাদের আগলে ভারী গলায় ভাল্লুকমা জিগেস করল।

—ভাল্লুকদের জয় হোক! শিকার টিকার ভাল জুটুক, বলতে বলতে শেয়াল ঢুকল গুহার মুখে।

—ও শেয়ালভায়া দেখছি, কি খবর? কড়া গলায় জবাব দিল ভাল্লুকমা।

কারণ শেয়ালকে জানোয়াররা কেউ পছন্দ করেনা। শেয়ালগুলোর নিজেদের শিকার করার ক্ষমতা নেই। পরের শিকারের হাড় কুটো খেয়ে দিন চালায় নয়ত অসহায় খোঁয়াড়ে বন্ধ ছাগলছানা মেরে চুরী করে আনে। যে সব জন্তু জানোয়ার যুদ্ধ করতে পারেনা শেয়ালের লোভ তাদের ওপর। জঙ্গলের শক্তিমান প্রাণীদের তা নিয়ম নয়। তারা যুদ্ধ করে শিকার জেতে। শেয়ালগুলো জঙ্গলের কলঙ্ক।

শেয়াল বলল—চলেছি শিকারে

—শিকারে? তুমি আবার শিকার করবে কি?

—হ্যাগো ভাল্লুকমা। বনের ধারে মানুষের গাঁয়ে কিসের মড়ক লেগেছে। সেখানে মড়াও পাওয়া যায় আর খোঁয়াড়ে ছাগলছানাও আছে। মড়কের সময় কেই বা তাদের দেখে?

ভাল্লুকমা বলল—ছি-ছি!

—আর আখের ক্ষেতে খরগোস টরগোসও একটা মিলতে পারে।

—আখ? আখ হয়েছে নাকি? ভাল্লুকমা জিগেস করল।

—অনেক। আচ্ছা আমি আসি ভাল্লুকমা রাত বয়ে যায়। আঁধারে আঁধারে আবার ফিরে আসতে হবে। ধূর্ত্ত শেয়াল নিঃশব্দে আলো আঁধারি বনে গা ঢাকা দিল।

ভাল্লুকমা উঠল—চলরে বাছারা আজ আখ খেয়ে আসি, আখের মিষ্টি রসে শরীর চাঙ্গা হবে।

তিনটে বাচ্ছাকে সামনে নিয়ে ভাল্লুকমা দুলকি চালে বনের পথে পা বাড়াল। চাঁদ তখনও মেঘের সমুদ্রে হাবুডুবু।

ভাল্লুকরা খেয়াল খোলা ফূর্ত্তিবাজ লোক। খায়দায় মজাকরে ঘুমোয়। শিকারের সময় ছাড়া বনের পথে তাদের গলা শোনা যায়। সেই গলা শুনে ছোটখাট প্রাণীরা তাদের গর্ত্তে ঢুকে পড়ে। ভাল্লুকরা যদিও নেহাৎ খাবারের অভাব না হলে তাদের শিকার করে না, তাহলেও ভীতু প্রাণীদের ভয় যায় না। তাদের সবেতেই ভয়। ভাল্লুকরা গান গাইতে গাইতে চলে গেলে, খরগোস তার গর্ত্ত থেকে মুখ বার করে সেই পথে জুল জুল করে চেয়ে থাকে। গাছের পুরোণ বল্কলে বসে কাঠবেড়ালী কুটুরকুটুর করে বাদাম খায়। ময়ূর

গাঁছের শাখায় পাখা মেলে। ভাল্লুকমা তার বাচ্ছাদের জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে শিকারের সঙ্গে পথের গান ও শেখায়। ভাল্লুকরা বনের মহাজ্ঞানী। দেবদারু শাল তমাল হিজল গাছের বনে জড়াজড়ি। তারি ছায়ায় খেতে যেতে ভাল্লুকমা বলে উঠল—কইরে বাছারা চুপচাপ কেন? আমরাত শিকারে যাচ্ছিনা মিছিমিছি ছোট জানোয়ারদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি? গলা ছাড় দেখি কেমন শিখেছিস?

ভাল্লুকের বাচ্ছারা গলা ছাড়ল ঃ

ফুর্ত্তিসে চল, ফুর্ত্তিসে চল
বন ঝরণায় নামল ঢল,
বাদুড় পাখায় রাত নিভেছে
চাঁদ ঢেকেছে মেঘের দল।
গড়াগড়ি দে, গড়াগড়ি দে
আখের মধুরা ডাকছে যে
চিতার ডাকে বন যে কাঁপে
নখের ধারটা শানিয়ে নে।
বন সম্বর জলায় নাচে
বাঘভায়া তার পেছনে আছে
গাছের আড়ালে ধূর্ত্ত শেয়াল
সামাল দে ভাই সামাল দে।

গানের তালে তালে ভাল্লুকি পায়ে পথ কাবার। সামনে চাষাদের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতের ওপর মাচায় সেদিন পাহারাদার নেই। তবু ভাল্লুকমা বাতাসে নাকটা তুলে শুঁকে শুঁকে দেখল কাছাকাছি মানুষ আছে কিনা। মানুষের গন্ধ নেই কিন্তু কি যেন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ ভেসে আছে বাতাসে। শেয়াল বলেছিল গাঁয়ে মড়ক লেগেছে তাই কি? ভাল্লুকমা আর কিছু না বলে আখ চিবুতে সুরু করল, শুধু একবার সে বাচ্ছাদের সাবধান করে দিয়েছিল—দেখিস বাছারা যেন বেশী শব্দ করিস নি।

আকের ক্ষেতের ধারে চাষাদের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। কয়েকঘর সামান্য সরল চাষা সামান্যভাবে চাষবাস করে এই বনের ধারে দিন গুজরাণ করত। তাদের আশাও সামান্য অভাবও সামান্য—দিন কেটে যাচ্ছিল একরকম। হঠাৎ কে জানে কোন দানোর অভিশাপে (উচ্চ আসামের অশিক্ষিত চাষাদের ধারণা যা কিছু অমঙ্গল সব কিছু কোন অশরীরী দানোর অভিশাপ) গাঁয়ে মড়ক নামল। সহর হলে, বা এ গ্রাম যদি সহরের কাছাকাছিও হোত তা হলেও কলেরা বন্ধ করা এত শক্ত হোত না। কিন্তু সরল অশিক্ষিত চাষীরা রোগ থামাবার কোন রকম ব্যবস্থা না করে সুরু করল দানোদের রাজার পূজো। মড়ক এদিকে বেড়েই চলল, দানোদের রাজা ঠাণ্ডা হবার নয়। শেষে এমন হোল যে প্রায় গ্রামকে গ্রাম উজাড়। গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে বনের কিনারে যে পাহাড় ছিল সেখানেত মড়া সরাবার পর্য্যন্ত কেউ রইল না। শেয়াল আর ন্যাড়া শকুনের দল যা পারে মড়াগুলোর সদ্গতি করতে লাগল। শকুনের দলের মহা আনন্দ কারণ তারা মরা খেতেই পছন্দ করে কিন্তু শেয়ালকে

খেতে হয় বাধ্য হয়ে। শেয়াল জাতটাই কাপুরুষ। অসহায় প্রাণী ছাড়া তার শিকার করবার শক্তি নেই কিন্তু অসহায় প্রাণীদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা না থাকুক অন্ততঃ পালিয়ে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা আছে। সব সময় তাও জোটে না তাই মরা জানোয়ারের পচা মাংস খেয়েই শেয়ালকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সে দিন এপাড়া সেপাড়া ঘুরে শেয়াল এই দক্ষিণ কিনারেই এসে হাজির হোল। পাড়ায় পাড়ায় মরা মানুষ পড়ে আছে কেই বা ফেলে কে কি করে? সমস্ত জগৎ থমে থমে স্তব্ধ। ঘুমন্ত মানুষেরও একটা শব্দ আছে। জীবন্ত প্রাণীরা অনুভূতির বলে তা টের পায়। কিন্তু একে বনানী পাণ্ডুর মৃতপ্রায় চাঁদের আলো মাখা রহস্যময় স্তব্ধ, তার ওপর শ্মশান গ্রামের সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত স্তব্ধতা! কিন্তু হঠাৎ সেই গোলমেলে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কে যেন কেঁদে উঠল—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া! শেয়াল চমকে উঠল—মানুষের ছানার গলা না? এমন কি আখের ক্ষেতে আখ চিবুতে চিবুতে ভাল্লুক মা শুদ্ধ চমকে উঠল—এই ভয়ানক মৃত স্তব্ধতার মধ্যে কাঁদে কে?

এদিকে প্রথম চমকটা কেটে গেলে শেয়াল ভাবল—অ্যাঁ মানুষের ছানা? এদিকটায়ত কোন জ্যান্ত মানুষ সে দেখেনি, তাহলে কি দৈবক্রমে কোন মানুষের ছানা এখনও বেঁচে আছে? ধূর্ত্ত ক্রূর শেয়াল পা টিপে টিপে কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে এগোল।

পূবে প্রথম পৃথিবীর ধূসর উদাস আলোর ছোঁয়াচ তখন। হু-উ-স করে প্রথম জাগা একটা শকুন নামল মড়া মানুষের গাঁয়ে। গাছের পাতা বেয়ে প্রথম শিশির টুপ করে ঝরে পড়ল। কি-ই-চ করে রাত প্যাঁচা চোখ জ্বালিয়ে উড়ে চলে গেল। তার ঘুমোবার সময় এসেছে।

—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

শেয়াল পা টিপে টিপে কান্না লক্ষ্য করে একটা চাষীর কুঁড়েয় উঁকি দিল। তার চোখে যে দৃশ্য পড়ল তখন, সে দৃশ্য দেখে আমরা চোখের জল সামলাতে পারতাম না। একটা ঘরে একটা ছোট্ট ছেলে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঁদছে—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া!

আমরা জানি ওই তার ভাষাহীন ভাষায় ডাক—ওমা ওমা ওমা! জাগোনা আমার খিদে পেয়েছে জাগোনা ওমা ওমা ওমা!

কিন্তু মা তার আর জাগবে না। মা তার পাশেই পড়ে আছে। শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত মা ছেলেকে ছেড়ে যায় নি। ক্রূর নিয়তি জোর কোরে ছেলের পাশ থেকে মার প্রাণ হরে নিয়ে গেছে। মা তার সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা।

এ দৃশ্য দেখে কার না চোখে জল আসে? কিন্তু শেয়ালের চোখে জলত এলই না বরং তার ক্রূর মন আনন্দে নেচে উঠল। ওইত অসহায় ছেলেটা পড়ে আছে, একেবারে জ্যান্ত। কতদিন সে জ্যান্ত কচি মাংস চিবোয় নি আজ হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেছে। শেয়াল এদিক ওদিক একবার চোরের মত চেয়ে টান হয়ে দাঁড়াল লাফাবার আগে। তারপর একটা মুহূর্ত্ত। সেই মুহূর্ত্তটুকু পার হলেই আর আমাদের এ আখ্যায়িকা লেখবার দরকার হোত না। এক মুহূর্ত্তে মংলুর জীবনের শেষ হয়ে যেত, কারণ ওই ছেলেটাই যে মংলু এ তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

শেয়ালের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আলগা হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে মংলুর গলার আওয়াজ চিরদিনের জন্যে নিভে যাবে। শেয়ালের লাফান কিন্তু হোল না। তার কাপুরুষ মন হঠাৎ পেছনের একটা ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে চমকে উঠল। পেছনে ভাল্লুক মায়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ গর্জ্জন—গর্-র্-র্!

শেয়াল এক লাফে পাশে সরে গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভাল্লুক মায়ের প্রচণ্ড থাবাটা নামল শেয়ালের পরিত্যক্ত জায়গায়। ভাল্লুক মা গর্জ্জে উঠল—ঘ্ ঘ্ র্ র্!

আরও একটা মুহূর্ত্ত।

শেয়াল তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—হুয়া হুঃ হুয়া! আমার শিকার! একি ভাল্লুক মা? এত বনের নিয়ম নয়!

ভাল্লুক মা তার বড় বড় সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল—অ র্ র্ শিকার? এতটুকু মা হারা ছানা—তাকে শিকার?

—কিন্তু ওত মানুষের ছানা, আমাদের চিরদিনের শত্রু—বলল শেয়াল

ভাল্লুক মা তার কাঁধের পেশীগুলো ফুলিয়ে বলল—শত্রু হয় তার সঙ্গে সমানে লড়াই করব। যে এখনও টিকটিকির বাচ্ছার মত এতটুকু সে আবার শত্রু কি?

মংলুর কান্না এদিকে জীবন্ত গলার শব্দ শুনে থেমেছিল। কতক্ষণ সে কেঁদে কেঁদেও কোন জীবন্ত গলা শোনেনি তাই প্রথমটা সে চুপ করে ছিল। তারপর ভাল্লুকমার গলা শুনে—জীবন্ত আওয়াজ শুনে, তার অভিমান বোধ হয় উথলে উঠল। সে উপুড় হয়ে ভাল্লুকমার দিকে তার কচি কচি হাত বাড়িয়ে আবার কেঁদে উঠল— ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ভাল্লুকমা হাজার হোক মা; সে বলে উঠল—আহা বাছারে!

শেয়াল বলল—তা হলে মানুষের ওই ছানাটা তুমি আমায় দেবে না? আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে? ভাল্লুকমা মংলুর দিকে এগিয়ে গেল। মংলু একটুও ভয় পেল না। দুহাতে ভাল্লুকমার লোমগুলো আঁকড়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে খাবার জন্যে হাঁই ফাঁই করতে লাগল।

শেয়াল আবার বলল—বনের নিয়ম অনুসারে মানুষের ছানাটা আমার শিকার। ওকে দিয়ে যাও ভাল্লুকমা। আমি মুখে করে চলে যাই।

মংলু তখন চুক চুক করে ভাল্লুকমার বুকের দুধ খাচ্ছে। এমন কি তাই দেখে ভাল্লুকমার বাচ্ছা তিনটের পর্য্যন্ত হিংসে হচ্ছিল।

—তা হলে দেবে না? শেয়াল দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এল। ভাল্লুকমা তার বিশাল থাবাটা উঁচু করে গর্জ্জে উঠল—আর এক পা এগিয়েছ কি শেষ!

রাগে অপমানে শেয়াল ফুলে উঠল। দাঁত বার করে সে বলল—আচ্ছা একদিন আমি দেখে নেব!

ভাল্লুকমা ডাকল—কালা!

ভাল্লুকের বড় ছেলে বলল—মা!

—ধরত পাজীটাকে।

কালা দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁকল—অর্ র্…

কাপুরুষ শেয়াল ভাল্লুকের ছানারই সেই যুদ্ধমান মূর্ত্তি দেখে লেজ পিছনে তুলে মারল চোঁ চাঁ দৌড়। যাবার সময় বলে গেল—আচ্ছা দেখা যাবে!

মংলু তখনও দুধ খাচ্ছে। ভাল্লুকমা তার থাবার নখগুলো ঢেকে তার নরম ন্যাংটো শরীরে থাবড়াতে থাবড়াতে বলল—আহা টিকটিকির বাচ্ছা খা, খা, আজ থেকে আমি তোর মা।

ভাল্লুকের বাচ্ছা তিনটে বলল—তুমিত আমাদের মা।

—আর ওরও মা। নারে বাছারা ওকে হিংসে করিস নি। ও মংলু, টিকটিকি, ওর মা মরে গেছে ওকে দুধ খাওয়াবার আর কেউ নেই। আমি যদি আজ মরে যাই তোদের কি হবে বলত?

বাচ্ছারা একসঙ্গে বলে উঠল—না তুমি মরবে না।

—না রে না ভয় নেই কিন্তু ওকে তোরা কিছু বলিস নি! ভাল্লুকমা মুখে করে মংলুকে তুলে নিল। একটা দাঁতও কিন্তু মংলুর সেই নরম চামড়ায় বসল না।

—চলরে বাছারা ঘরে যাই, পূবে ফর্সা হোল, সম্বররা জলায় জল খেতে আসবে তার পেছনে কালো বাঘ আছে। আকাশে চীল উঠছে। পাহাড়ে আবার হাতী এসেছে। চল চল।

ভাল্লুকের দল ফিরল লম্বা সারে। আগে কালা তারপরে তার দুই ভাই, সবশেষে মংলুকে মুখে করে ভাল্লুকমা। ফিরতি পথে কালা গেয়ে উঠল

সারি বাধোঁ ভাই
চল ঘরে যাই
সাহসী শিকারী পথ ছাড়ো।

মায়ের বুকে
ঘুমার সুখে
ও ভাই এবার গান ধরো।

আকাশ রেঙেছে
সকাল ভেঙেছে
বাদুড় ঝুলেছে শাল গাছে,
মহুয়া শাখায়
পেখমে পাখায়
ময়ূর ময়ূরী ওই নাচে।
হাতীর শুঁড়ে
গাছেরা পড়ে
ঘরে চলো ভাই ঘরে চলো,

সাপের ফণায়
চীলের ডানায়
বেলা হোল ভাই বেলা হোল।

ভাল্লুকের দল সদ্যজাগা বনের আলস্যমাখা পথে সার বেঁধে ফিরে চলল। তাদের পেছনে তখন আকাশে সূর্য্যি উকি দিয়েছে। কাঠঠোকরা সেই খবর গাছের গায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকে জানিয়ে দিচ্ছে—ঠক্ ঠক্ ঠক্!

মাছরাঙা তার মরকত মণি আঁকা পোষাক পরে জলের ওপর গিয়ে বসেছে। পাখীদের মিস্ত্রী বাবুই তালগাছে তার বাসা গড়ছে। বাসায় কটা দরজা হবে এই নিয়ে তার গিন্নীর সঙ্গে বচসা, ধার্ম্মিক বক জলার ধারে স্থির। এসব পেছনে ফেলে বাচ্ছাদের সামনে রেখে মংলুকে মুখে নিয়ে ভাল্লুকমা বাসায় ফিরল। এমনি করে মানুষের ছানা মংলু ভাল্লুকদের দলে চলে এল। ছোট্ট তার প্রাণের শিখা নিভু নিভু হয়েও নিভল না। তারপরে দেখা যাক তার প্রশস্ত জীবনে কি পড়ে আছে।

খুকু তুমি একটু থামো

‘স’

খুকু তুমি একটু থামো, তোমার সাথে আড়ি,
আমি বুড়ো ঠাকুরদাদা, আমি কি আর পারি!
ছোট্ট ছুটি হাল্কা পায়ে
ভেসে চলো পবন-নায়ে,
হায়রে আমি পেতাম যদি হাওয়ার জুড়িগাড়ী
দেখে নিতাম তোমার সাথে পারি কি না পারি।

তুমি চলো যেন ভোরের ছোট্ট প্রজাপতি
আমি চলি ঠাকুরদাদা অতি মন্দগতি,
তুমি চলো সামনে পানে
টানো আমায় আল্‌গা টানে,
আমি বলি “দাঁড়াও দাঁড়াও”, তুমি ব্যস্তমতি
একটু হেসে দাঁড়িয়ে বলো “তুমি অলস অতি।”

পক্ষীরাজের পাখা বাঁধা আছে তোমার পায়ে!
মন-পবনের পরশ লাগে তোমার চলার নায়ে!
সে মন আমি খুঁজে কি পাই!
সামনে পানে মিছেই তাকাই,
অনেকদূরে দেখতে বা পাই আকাশ শেষের গাঁয়ে,
কাদের ডিঙি ভিড়লো, ভেসে কোন্ লগনের বায়ে।

যারা তোমার আপন বয়েস সবাই ছুটে চলে
তাদের পথে ভোরের আলো মাণিক হয়ে জ্বলে।
তাদের পথের পাশে পাশে
ফুল ফুটে রয় গাছে গাছে,

খুকু তুমি একটু থামো

ফুলের ডালে পাখীর বাঁশী ঝর্ণা হয়ে গলে,
নাম না জানা রাখাল হাসে অচিন গাছের তলে।

যারা রঙীন হায়রে তাদের বুড়ো কেমন সাথী !
ঠাকুরদাদার আছে কি ভোর ! আছে শুধুই রাতি।
পথ চলিতে তাই তো এমন
দুটি পায়ে জড়ায় স্বপন
ভোরের সোনায় হায় জ্বলেনা একটি তারার বাতি,
খুঁজি আকাশ আছে কোথায় আমার তারা সাথী।

যখন তোমার ভোরের বেলা, আমার অন্ধকার,
যখন তোমার খেলার লগন, আমার ঘুমের বার।
ঘুমিয়ে পথে তবু হাঁটি,
পায়ের তলে এ কোন মাটি !
ঠাকুরদাদার হাতের লাঠি হবে বা চূরমার,
শুধু তুমি বলো, "দাদু ভয় কি, চলো আর।"

যারা সবাই খুকুর দাদু, চমকে তারা বলে,
"হায়রে খুকু, দাদু হয়ে পথ-চলা কি চলে !"
তবু তারা ভাবে নাকি
হয়তো তুমি অচিন-সাথী'
মায়া পাখায় উড়িয়ে নেবে দূর আকাশের তলে,
যেখানেতে সাধের স্বপন মাণিক হয়ে' জ্বলে।

ছায়ামূর্ত্তি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামে পৌঁছুতে মাইল দুয়েক দেরী তখনও এমন সময় তুমুল বৃষ্টি নাম্‌ল। প্রথমে ভেবেছিলুম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই যাবো, কারণ বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু এই অপরিচিত জনমানবহীন পথে জলে আর কাদায় মাখামাখি অবস্থায় পথ হারিয়ে মাঠে মাঠে ঘুর্‌তে হলে বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ যে সম্পূর্ণ উবে যাবে তা মনে আস্‌তেই মতটা বদলে গেল, মাথা গোঁজ্‌বার মত একটা আশ্রয়ের জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠলুম। এ দিকে প্রায়ই নীলকুঠির অনেক বড় বড় বাড়ীর জীর্ণ কঙ্কালগুলো দেখা যায়; সন্ধ্যার মৃদু আলোয় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দূরের ঝাপ্‌সা বাড়ীটা দেখে সে রকমই কোন একটা বাড়ী বলে' মনে হল।

সত্যিই তাই। অতীত দিনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বাড়ীটার গা থেকে খসে পড়েছে; বড় জমীদার বংশের সুশ্রী ছেলেকে ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া জামা পর্‌লে যে রকম করুণ দেখায় ঐ বাড়ীর বাইরেটাও সে রকম। কিন্তু আমার অবস্থা তখন বাড়ীটার চেয়েও করুণ, আকাশের কাছ থেকেও শীঘ্রই যে করুণা মিল্‌বে এ রকম কোন ভরসাও পেলুম না। উপস্থিত এই বাড়ীটাতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখ্‌লুম না।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। লোকালয়ের বাইরে মাঠের ভেতর অন্ধকারময় ঐ রকম বৃষ্টির দিনে নিঃসঙ্গতা ও নির্জ্জনতা যে কি রকম অদ্ভুত এর আগে তার কোনও স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। সমস্ত মন অকারণেই ছম্‌ছম্ করে; আর ছাই, জীবনে যত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প শুনেছি, যতই ভাবি না কেন সেগুলো মনে কর্‌ব না, ততই একটার পর একটা করে মনে পড়ে' যায়।

ক্রমশঃ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, বারান্দার এক ধারে অসহায় দাঁড়িয়ে রইলুম। বাতাসে চাম্‌চিকের একটা স্যাঁৎসেঁত্যে গন্ধ। পেছনেই বড় বড় অন্ধকার ঘরগুলো পড়ে' রয়েছে; সেগুলো খোলা কি বন্ধ, পুরোণো কাঠের দরজা ঠেলে দেখবার উৎসাহ, সত্যি বল্‌তে কি, একেবারেই আমার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা খস্‌খসে শব্দে চম্‌কে পেছনে চাইলুম; পুরোণো কাঠের বিবর্ণ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গ্যাছে আর ভূষো-মাখা একটা লণ্ঠন ওপরে তুলে একটি বুড়ো নিঃশব্দে আমাকে দেখছে। প্রথমে চম্‌কে উঠলেও ঐ

ভূষোমাখা আলো ও কঙ্কালসার বুড়োর দেখা পেয়েই মনে মনে খুসী হ'য়ে উঠলুম। কোনও একটা কথা বলার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম, "যা' বৃষ্টি"—

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে নির্ব্বাক্‌ভাবে সেই বুড়ো আমার কাছে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে বোধকরি ভালো করে আমায় খানিক পরীক্ষা কর্‌লো, তারপর নিতান্ত আচম্‌কা হাস্‌তে লাগলো, "আশ্রয়...হাঃ-হাঃ...তারপর তেম্‌নি আচম্‌কা গম্ভীর হয়ে মুখটা ভারী করে বল্‌লে, "তা, ভেতরে এসো। কিন্তু জায়গাটা হয়তো তোমার সহ্য হবে না!" বুড়ো দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, তার দেহের প্রতিটি নড়াচড়া ঠিক যেন কলের মানুষের মত!

অনেকক্ষণ পরে আলো ও মানুষের দেখা পেয়ে সত্যিই আমি বেশ খানিকটা উৎসাহ পাচ্ছিলুম। তাই সে সব দিকে নজর না দিয়ে বুড়োর পেছন পেছন চললুম। বিরাট বড় বড় সব ঘর, অনেক ভাঙা জিনিষের আবর্জ্জনায় ভরা; সেই ভূষো-মাখা লণ্ঠনের মৃদু লাল আলোয় পলেস্তরা-খসা দেওয়ালের গায়ে যেন অদ্ভুত ধরণের ছায়ারা সব ঘোরাঘুরি করছে! আব্‌ছা আলোয় গোটা তিনেক বেশ বড় বড় ঘর পেরিয়ে অবশেষে বাড়ীর পেছনের অংশে এসে' পৌঁছুলুম। বুড়ো সামনের ঘরের দরজাটা খুলে যন্ত্রের মানুষের মত সেই রকম আড়ষ্টভাবে আগে ভেতরে গেল। বহু পুরোণো বিবর্ণ একটা টেবিলের ওপর বুড়ো লণ্ঠনটা রাখল। ঘরে একটিমাত্র নড়বড়ে তক্তা, ময়লা বিছানা তার ওপর আর আস্‌বাব পত্রের মধ্যে সেই টেবিলটা ছাড়া হাতল ভাঙা মাত্র আর একটি চেয়ার। সেই চেয়ারটায় আমাকে বস্‌তে বলে' বুড়ো কি রকম অস্থিরভাবে খানিক পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ সামনের জানলার শার্শিটা খুলে অন্ধকার বৃষ্টি-ভেজা আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

কোন রকমে আলাপ জমাবার জন্যে বল্‌লুম, "আপনি তো এতোক্ষণ এ ঘরেই ছিলেন? একা থাকতে..."

আমার স্বর শুনে সে কেমন যেন চমকে উঠলো। কথার মাঝখানেই আমাকে থামতে হল। ধীরে ধীরে সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু আমার যেন কি রকম মনে হল—ঘাড় ফেরাতে পারে না বলেই সমস্ত শরীরটা যেন কলের মত তার ঘোরাতে হ'চ্ছে। "বল্‌ছো কি? না আমি তো এতোক্ষণ বাগানেই পায়চারি করছিলুম। তোমাকে আসতে দেখেই না গিয়ে আলো জ্বেলে আন্‌লুম।"

"এই বৃষ্টিতে আপনি বাগানে ছিলেন?" একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লুম।

ততোধিক আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্‌লে, "বৃষ্টি? বলো কি? কখন থেকে নামলো?"

আচ্ছা পাগল লোক তো! বল্‌লুম, "সে তো অনেকক্ষণ! ঘরে এসে কাপড়-জামা বদলান নি?"

অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে সে বল্‌ল, "না-না! কাপড় জামা যদি ভিজেই থাকে আপনিই শুকিয়ে যাবে!" বুড়ো তক্তাটার এককোণে কি রকম যেন আলগোছে বসল। খানিক চুপচাপ্। "আমি কিন্তু মনে কচ্ছিলুম আজ তারা নিশ্চয়ই আস্‌বে। চুপ্, কিছু শুন্‌তে পেলে কি? কতকগুলো লোকের অস্পষ্ট পায়ের শব্দ? সেই তারা, যারা আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল?" কান পেতে কিছু শোন্‌বার চেষ্টা করতে লাগলুম; তুমুল বৃষ্টির শব্দ, ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্; কিন্তু কেমন যেন মনে হল বাইরে কারা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে আস্‌ছে! কে তারা? এবারে সত্যিই সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের মত এঁকে বেঁকে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত বয়ে গ্যাল!

"আচ্ছা, এ ঘরেও কি বৃষ্টি পড়্‌ছে?"

তার মুখের দিকে চাইতে চেষ্টা করলুম; আবছা আলোয় কিছুই বোঝা গেল না। সত্যিই সে ঠাট্টা কর্‌ছে না তো? কিন্তু উত্তর দিতেই হল। ছাতের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "না। কেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন না?" বুড়ো আবার সেই রকম আচমকা জোরে হেসে' উঠ্‌ল, "হাঃ-হাঃ, বয়েস হ'লেই যে সব জিনিস ঠিক ঠিক বোঝা যায় ঐ রকম কুসংস্কার মনে রেখো না! এখন যা' স্পষ্ট দেখছ, শুনছ আমার মত হলে অতটা স্পষ্ট আর দেখবে না, শুনবে না।"

আবার খানিক চুপ্‌চাপ্। "আহা তোমাকে তো কিছু খেতে দিতে পারলাম না। রান্নাঘরে কিন্তু সব জিনিসই আছে; কষ্ট করে যদি জল ফুটিয়ে নিতে পারো তা হলেই এক কাপ্ চা অন্ততঃ খেতে পাবে। আমি যখন," একটু থেমে' সে চুপিচুপি বলতে লাগ্‌ল, "আমি যখন তোমার মত ছিলুম নিজেই চা-টা করতে পার্‌তুম। কিন্তু এখন অনেক দূরে চলে' এসেছি, ভারি অসহায়! তাই... চুপ্‌চুপ্ কিছু শুন্‌তে পেলে কি?"

একটা নতুন সন্দেহ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো! তবে কি, তবে কি...? চেয়ারেতে সমস্ত দেহটা আমার আট্‌কে গিয়েছে যেন, নড়বার শক্তি নেই।

"রাত কটা বাজে, ঘড়ি আছে?" আমাকে সে জিগ্‌গেস্ কর্‌ল।

গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, তবু কোন রকমে জোর করে বল্‌লুম, "সোয়া নটা।"

"তা' হলে এই সবে সন্ধ্যে হল, বল? কখন সূর্য্য ডুবেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় জিগ্‌গেস্ কর্‌ব, আজকাল আর সূর্য্য ওঠে কি? নাকি শুধু ঠাণ্ডা কালো রাতের সময় এসেছে?"

কি উত্তর দেবো? আমার হাত-পা ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে আস্‌ছে! কিন্তু আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে' বুড়ো বিরাট একটা বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়ে দেশলাই জ্বাললো। ভাবলুম মুখটা এবার ভালো করে' দেখা যাবে। কিন্তু এত চট্‌পট্ সে মুখটা নীচু করে' চুরুট্‌টা ধরিয়ে নিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল যে তাতে ভালো করে কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না, তার মুখের জায়গায় শুধু লাল খানিকটা চুরুটের আগুন।

"হ্যাঁ, ততক্ষণ তোমাকে একটা গল্প বলি। গল্প..." আবার বিকট জোরে সে হাস্‌তে লাগ্‌ল, "গল্প ছাড়া আর কি? কারণ তোমরা, কেউই যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না। সাত মাস এখানে আছি; কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবে? এ পথের যে কোনও লোককে জিগ্‌গেস্ করো না কেন, সেই বল্‌বে আমি নাকি বছর তিনেক এখানে আছি। আচ্ছা," সাম্‌নের দিকে খানিক্‌টা ঝুঁকে পড়ে তার নিষ্প্রভ নির্ম্মম চোখ দুটো দিয়ে গভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "আচ্ছা, অন্যায় স্বীকার করলে কি পাপের শাস্তি কিছু কমে?"

"কমে বলেই তো শুনেছি।"

তক্তাটার ওপর খানিক নড়েচড়ে বসে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "জানো, আমি একজন খুনী?"

ভয় পেয়ে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম; আবার সেই কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত সমস্ত দেহের ভেতর বয়ে গ্যাল। আমার দিকে না চেয়েই সে বললে, "ঐ বাড়ীতে আমার আগে যে থাক্‌তো লোকটা ভালোই ছিল। কিন্তু, সত্যি বলতে কি লোকটা ঠিক সুখী ছিল কিনা বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেন?" কি খানিক ভেবে সে বললে, "সুখীই বা ছিল না কেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ আনন্দেই ছিল সে। আগে সে থাক্‌তো সহরে। কিন্তু সে শান্তি চাইতো, নির্জ্জনতা চাইতো, তাই হঠাৎ ঐ বাড়ীটা কিনে ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে এখানে চলে এলো। ছেলেটা বেশ সুন্দর ছিল হে, আমি দেখেছি তাকে। কিন্তু এক রাত্রে, এই রকমই অন্ধকার আর নির্জ্জন ছিল সে রাতটা, কারা এসে তাকে নিয়ে গেল! চুপ্‌চুপ্, কারুর পায়ের শব্দ পাচ্ছো কি?" ভিজে মাঠে শুধু ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে, বাতাসে চাম্‌চিকের গন্ধটা আরও স্যাঁতসেঁতে আর ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে আলোটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আচ্ছা সামনের জানলার শার্শিতে তুমি নিজের কটা ছায়া দেখতে পাচ্ছো?" জান্‌লার পাঁচটা কাঁচে আমার পাঁচটা আব্‌ছা ছায়া দেখা যাচ্ছে। ধরা গলায় বললুম, "পাঁচটা।" নিঃশব্দে হাসতে হাসতে কি রকম যেন বেসুরো গলায় বুড়ো বললে, "ঠিক। সে ভদ্রলোকও তার পাঁচটা ছায়াই দেখতে পেতো!"

চুরুটটায় আরও গোটা দুই টান দিয়ে বুড়ো বল্‌লে, "হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম ;
জানো সব বাড়ী ভালো হয় না। যখনই নতুন কোন বাড়ীতে উঠে যাবে আগে নিশ্চিত জেনে
নিও সেটা ভালো বাড়ী কিনা। কারণ কতকগুলো বাড়া আছে......"
এতক্ষণে বাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলুম, "ঠিক ঠিক ;
মেঝে হয়তো খারাপ থাকে, দেওয়ালে মারাত্মক অসুখের বীজাণু থাকতে পারে, ড্রেনে..."
বাধা দিয়ে বুড়ো বল্‌লে, "না না, সে কথা নয়। কতকগুলো বাড়ী আছে যা' সবাইকার
সহ্য হয় না। বাড়ীতে যে অপদেবতা থাকে আমি তার কথা বলছি। তুমি কি একটা ভয়ঙ্কর
অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছো না এখানে ?"
ভয় পেলেই যে ভয় চেপে ধরে তা আমি জানি। তাই বললুম, "কৈ, তেমন আর
কি ?"
"আশ্চর্য্য, সত্যিই আশ্চর্য্য," উত্তেজিত হয়ে বুড়ো বললে, "আমার আগে যে থাকতো
এ বাড়ী সম্বন্ধে প্রথম প্রথম তোমার মত ধারণাই তার ছিল। এই ঘরটাও—কারণ এ
ঘরটাই এ বাড়ীর সবচেয়ে অমঙ্গলের ঘর—প্রথমে তার কাছে অদ্ভুত বা ভয়ের বলে' মনে হয়
নি। হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলুম ; তুমি যেখানটায় বসে আছো সে ভদ্রলোক এখানটায় বসেই
অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়াশুনো করত।" বুড়ো তক্তাটা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো,
তারপর যন্ত্রের মানুষের মত আড়ষ্টভাবে নড়তে নড়তে আমার পেছনে দাঁড়ালো। চম্‌কে
উঠে মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে চাইলুম। বুড়ো যেই হোক, আমার পেছনে সে যে দাঁড়ায়
কিছুতেই এটা পছন্দ করতে পারলুম না। আমার গায়ে হাত দিতে এসে কি জানি কেন
চম্‌কে খানিকটা সে সরে গ্যালো। একটু সময় নিয়ে বললে, "না না, ভয়ের কিছুই নেই ;
সামনে চেয়ে দেখো ; কি দেখতে পাচ্ছো ?" আলোটা কিছু উজ্জ্বল হওয়ায় আমার পাঁচটা
ছায়াই ভাল করে দেখা যাচ্ছে। বললুম, "সেই পাঁচটা ছায়া।" কিন্তু ক্রমশঃ আমার
পক্ষে এ সব সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে। চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে বাইরে চলে যাবার একটা প্রবল
ইচ্ছে অনুভব করলুম ; এই স্যাঁৎসেঁতে চাম্‌চিকের গন্ধ, ভূষোমাখা লণ্ঠনের আব্‌ছা আলো
আর যন্ত্রের মানুষের মত অদ্ভুত এই বুড়োর চেয়ে অন্ধকার মাঠে একা ভেজা ঢের ভালো।
কিন্তু বৃষ্টিটা আরও জোরে নেমেছে, আর সেই মুহূর্ত্তেই কাছেই কোথায় একটা বাজ পড়ল ;
থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল সমস্ত বাড়ীটা।
আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো কিন্তু বলে' চল্‌ল, "ঠিক তাই। সে ভদ্রলোকও এই
রকম পাঁচটা ছায়াই দেখতো ; বইয়ের পাতা ওল্টাবার সময় সে দেখতো জান্‌লার ওপাশে
সেই পাঁচটা ছায়াও একসঙ্গে পাতা ওল্টাচ্ছে ; হুঁকো খাবার সময়—দেখ্‌তো পাঁচটা ছায়া-

মূর্ত্তিও একসঙ্গে হুঁকো টান্‌ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা কিন্তু মনে রেখো, তার নাম ছিল
হরেন মুন্সী—মনে থাক্‌বে তো ? কেউ যদি তোমায় জিগ্‌গেস্ করে ঐ বাড়ীতে কে থাকে,

পাঁচটা ছায়ামূর্ত্তি একসঙ্গে হুকো টান্‌ছে

বোলো হরেন মুন্সী ! কারণ কারণ, অদ্ভুত ফিস্‌ফিসে গলায় সে বলল, "কারণ কেউ জানে
না যে...যে...যে...চুপ্ ! কারুর পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলে কি ?"
ধীরে ধীরে আরও খানিক পায়চারি করে, চুরুটে গোটা ক'য়েক সুদীর্ঘ টান দিয়ে বুড়ো
বললে, "প্রথমে লোকটা ভালোই ছিল এখানে। কিন্তু তার ছেলেটা চুরি যাবার পর এ
বাড়ীতে অপদেবতা আছে সে যেন বেশ বুঝতে লাগল ! কারা যেন ঘুরে বেড়ায় এ ঘর থেকে
ও ঘরে, বারান্দায়, ছাতে, বাগানে, যেন হাসে...যেন কথা বলে' ফিস্‌ফিস্ করে...! আর
একটা জিনিস এবার থেকে সে লক্ষ্য করল, ওই ছায়াগুলো যেন ক্রমশঃ তার অবাধ্য হয়ে
উঠছে ; বইয়ের পাতা ওল্টালে সবাই হয়তো আর পাতাই ওল্টায় না ; কেমন যেন একটা
বেয়ারা ভাব তাদের মধ্যে ! তারপর, তারপর" গভীর ঘন গলায় সে বললে "তারপর
সেই ভয়ঙ্কর রাতে হরেন মুন্সী হুঁকোটায় কয়েক টান দিয়েই ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে চম্‌কে
উঠল—সবচেয়ে ডান দিকের ছায়ামূর্ত্তি হুঁকোর বদলে একটা চুরুট ধরিয়ে টান্‌ছে। পর পর

পাঁচ রাত ঐ ধরণের ঘটনা ঘট্‌ল, ছ' রাতের বার আশ্চর্য্য হয়ে সে দেখ্‌ল সবচেয়ে ডানদিকের ছায়ামূর্ত্তিটা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে ! লোকটা আশ্চর্য্য হয়ে অন্য চারটে ছায়ার দিকে চেয়ে

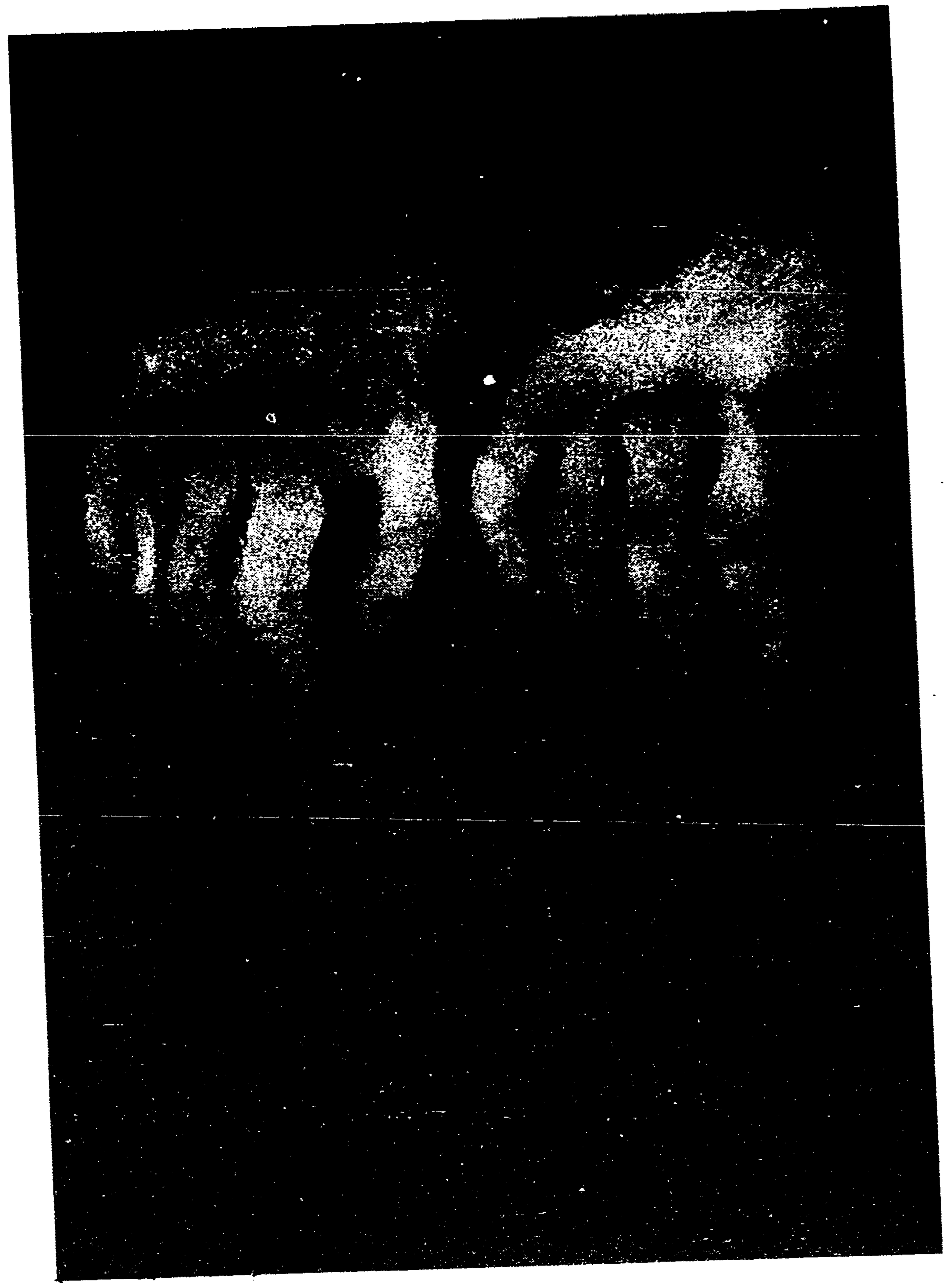

এই সেই হাত দুটো

রইল, আর অন্য চারটে ছায়াও চেয়ে রইল তার মুখে—ঠিক মুখে নয়, তার পেছন দিকে। তার পেছনে তখন বিপদ ঘনিয়ে আস্‌ছিল ! তারপর হঠাৎ কে যেন তার গলা টিপে ধরল, নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে এলো, তারা তবু ছাড়ল না। শেষ নিঃশ্বেস ফেলার আগে লোকটার বেশ মনে আছে অন্য চারটে অবাধ্য ছায়া যেন হাস্‌ছিল !" চুরুট্‌টায় গোটা দুই টান দিয়ে

বুড়ো কানের কাছে মুখ এনে খুব ধীরে ধীরে বল্‌ল, "'সে হাত কার জানো, সেই পঞ্চম ছায়া মূর্ত্তিটার !" তারপর আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো রক্তহীন ফ্যাকাশে হাত টেবিলের দিকে বাড়িয়ে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, "এই সেই হাত দুটো, যে দুটো হত্যা করেছে ; আমারই এই দুটো হাত।" উত্তেজনায় আর ভয়ে বুড়ো ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। "আর সেই দেহটা নিয়ে কি কর্‌লুম জানো ?" আমার পেছন থেকে ধীরে ধীরে সাম্‌নের জান্‌লাটার কাছে এগিয়ে এসে নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্‌ল, "এই সেই দেহটা। এ দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটা ছায়া মূর্ত্তি !"

চেয়ার ছেড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালুম। মুখের ওপর একটা আঙুল দিয়ে বুড়ো বল্‌ল, "চুপ্‌ চুপ্‌—বাইরে কার পায়ের শব্দ ! তারা এলো বুঝি !"

কিন্তু অনেকটা পাগলের মতই, তার কোন কথায় কান না দিয়ে, ছুটে সেই বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম।*

* কোন বিদেশী গল্পের ছায়ায়

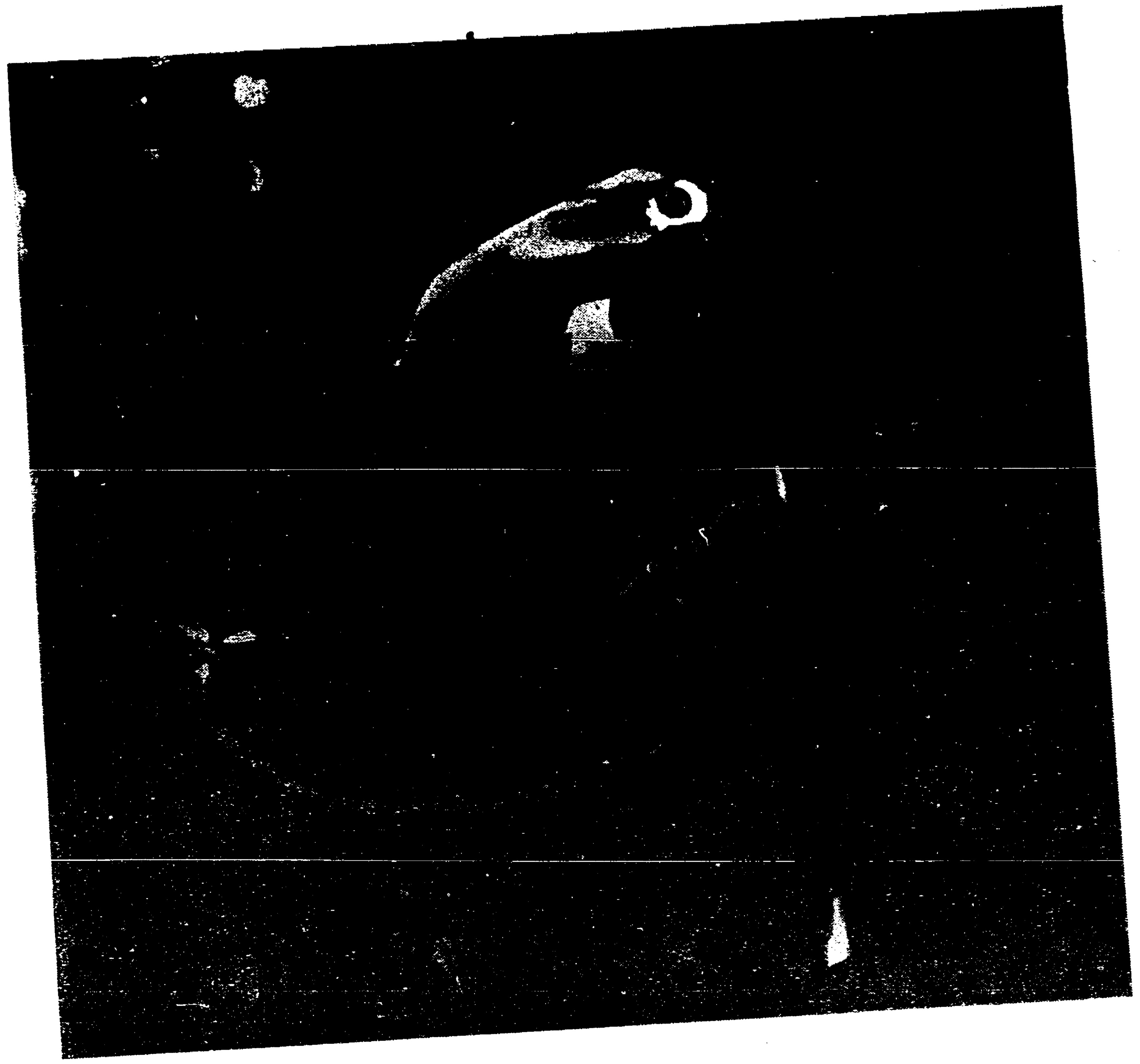

আজব পাখী

আজবদেশের তুমি নাকি পাখী ?
দ্যাখো তো আমায় তুমি চেন না কি ?
নাম কি তোমার ? দিগ্‌গজ্ পাখী
পক্ষীপঞ্চানন !

থোলো থোলো ফল ঝুলছে শাখায়,
সে দিকেতে পাখী ভুলেও তাকায় ?
ভাবছে হয়তো কোন্ ফল খায়
পণ্ডিত সজ্জন !

দুটি চোখ দেখে আঁৎ করে ছাঁৎ
চোখে যেন লেখা আছে ধারাপাত
চশমা এঁটে কি তুমি করে' রাত
পড়ো মোটা মোটা বই !

ঠোঁটটি তোমার বাঁকা তলোয়ার
বুদ্ধিটা বুঝি তাতে দাও ধার
গালটি ফুলিয়ে ভাবো পাখী আর
কে আছে বা তোমা বই !

শের আমি

মহাযুদ্ধের ঘটনা

‘কান্ত লাল’

“কি জানি বাপু, ব্যাপার আমি তো সুবিধের বুঝছি না,” লড়াই পায়রা ‘শের আমি’ দুটি ছোট্ট ডানা ঝটপটিয়ে কবুতরখোপে বসতে বসতে বললে। ‘শের আমি’ কেউ-কেটা পায়রা নয়, তার কথা দলের সবকটি পায়রা কাণ পেতে শোনে। তাছাড়া, তাকে ভালবাসে না, দলে এমন পায়রা নেই। ‘শের আমি’ নামের অর্থটা তো তুচ্ছ নয়, ‘শের আমি’ কথার মানে হচ্ছে ‘প্রিয় বন্ধু।’

দলের ডানপিটে একটি তরুণ পায়রা গ্রীবা উঁচিয়ে বললে, “অসুবিধের কী দেখলে তুমি শের আমি ! দিব্যি আছি। আগেও খেতাম, আকাশে উড়তাম, এখনও তাই।”

একটি আধবয়সী পায়রা গ্রীবা নেড়ে বললে, “নাহে না। শের আমির কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্যিই, দেশে কী যেন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।”

আর একটি পায়রা বললে, “আমারও মনটা কেন জানি কদিন ধরে বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের ব্যারাকের তলায় যে পল্টন থাকে, তাদের কুচকাওয়াজের আর কামাই নেই। মনে হচ্ছে একটা যুদ্ধটুদ্ধ হবে।”

দলের ডানপিটে পায়রা দুটি-চোখ পাকিয়ে বললে, “যুদ্ধ ! বলো কি খুড়ো ! যুদ্ধুতে ভয়ের কী আছে ? দেখো দিব্যি লড়াই ফতে করে বাড়ী ফিরবো।”

শের আমি হেসে বললে, “আচ্ছা আচ্ছা। দেখা যাবে। কথাটা ভুলবনা।” তারপর শের আমি মাথাটা হেলিয়ে কী যেন ভাবতে থাকল। সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত এসেছে, পায়রাদের চোখের পাতায় ঘুমের সুড়সুড়ি লাগছে। চারিদিক চুপচাপ সুনসান। বক্‌বকম্, বক্‌বকম্ আওয়াজে আর রাতের কালো পর্দা কাঁপছে না।

পায়রাদের সন্দেহ মিছে নয়। সত্যিই দেশে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ১৯১৪ সালে ইয়োরোপে লড়াইয়ের যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার একটি শিখা ১৯১৭ সালে এসে অ্যামেরিকাকে ছুঁয়ে দিলে। অ্যামেরিকা এতক্ষণ আটলান্টিকের ওপারের যুদ্ধটা দেখছিল আর ভাবছিল, ‘কি করি, কি করি।’ ১৯১৭ সালে অ্যামেরিকা ঠিক করলে “নাঃ, আর চুপ করে’ বসে থাকা চলে না। জার্ম্মেনী তো পৃথিবী চষে ফেললে। এবার হাতিয়ার বেঁধে নেমে যাওয়া ভালো।”

অ্যামেরিকা লড়াইয়ের খাতায় নাম লেখালে। শিকাগো সহরের এক পল্টনের উপর হুকুম এলো, “তাড়াতাড়ি জাহাজে চেপে আটলান্টিক পাড়ি দাও। জার্ম্মানীর সঙ্গে খাস ইয়োরোপের জমিতে গিয়ে লড়তে হবে।”

শিকাগো সহরের পল্টন ব্যারাকে যখন 'সাজ সাজ' সাড়া পড়ে গেছে, তখন পল্টন ব্যারাকের ছাদে কবুতরখোপে বসে 'শের আমি' দুঃস্বপ্ন দেখছে—নীল আকাশে যেন কালো কুটে মেঘ কড় কড় বজ্রের ধমক দিচ্ছে, পৃথিবী যেন জ্বলে' পুড়ে' ধোঁয়ায় কালো হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দলের ডানপিটে পায়রা পা ছটফটিয়ে বললে, "পায়ে চিঠি বেঁধে দেবে সেই চিঠি নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে—এতটুকু কাজে কিন্তু ফুর্ত্তি নেই, যাই বলো। কেন, মানুষে মানুষে কেমন যুদ্ধ চলছে, তেমনি পাখীদের একটা যুদ্ধ কি ছাই বাধে না। জার্ম্মাণ পায়রাদের সঙ্গে তাহলে অ্যামেরিকান পায়রাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত।"

আধবয়সী পায়রা বললে, "আঃ চুপ করনা বাপু। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে চিঠি পৌঁছে দেওয়া কাজটা কি আর তুচ্ছ হল! যে কাজের লোক তাকে যাই করতে দাও না কেন, সে সত্যিকারের কাজ করে যেতে পাবে। খামাখা চ্যাঁচানো তার স্বভাব নয়। "কি বলো শের আমি?"

শের আমি কথার কোন জবাব দিলে না। সে তখন মহাযুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে। শত্রুর কালো আগুন আর লাল ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে—তার ভিতর ডাকহরকরা পায়রাদের সাদা ধবধবে ডানা চমক দিচ্ছে, এ ছবি শের আমি যেন চোখের সামনে দেখছে।

তারপর, কতদিন, কতরাত। জাহাজের দুলুনি, আটলান্টিক মহাসাগরের গর্জ্জন, ছোট্ট খাঁচাব দমআটকানো অন্ধকার। মাঝরাতে পল্টনদের লড়াইফতের গান, গেলাসের ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্, শেষরাতে হঠাৎ জেগে ওঠা হাওয়ার আর্ত্তনাদ। তারপর একদিন জাহাজের দুলুনি থেমে যায়, ইয়োরোপের মাটিতে এসে জাহাজ আটকে যায়। খাঁচার অন্ধকার থেকে পায়রার দল বেরিয়ে আসে। তারা আবার দেখে নীল আকাশ, আকাশে সাদা মেঘের টুকরো, উড়োপাখীর দল। আকাশে দল বেঁধে পায়রারা শের আমির পিছু পিছু উড়ে যায়, তারপর তারা এসে নামে রোদেভরা একটা ছাতের উপর। ছাতের উপর বাসা বাঁধে তারা। রোজ সকালে পল্টনরা একবার এসে তাদের দেখে যায়।

একদিন নতুন একটি পায়রা এসে বসল ছাতের উপর। সে দিন রোদে কমলা রং ধরেছে। সেই নরম মিঠে রোদে নতুন পায়রাটিকে দেখে শের আমির মনটা যেন স্বপ্নে ছেয়ে গেল। স্বপ্নে সে দেখলে সে যেন আর একা নয়, একটী অপরূপ সুন্দর পায়রার সঙ্গে সে যেন উড়ে চলেছে অসীম নীল আকাশে। পথে পড়ল নীল পাহাড় আর ঝর্ণা, সবুজ জলের কেশর ফুলে ওঠা নদী, মেঘের ছায়া আঁকা টলটলে জল-ভরা দীঘি। সেই নীল পাহাড়ের চুড়োয় সুন্দর পায়রাটীর সঙ্গে সে যেন পাশাপাশি বসল, যেন চিরকাল পাশাপাশি বসে থাকার কী একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলে। সেই সুন্দর পায়রার সঙ্গে সে যেন ঝর্ণা নদী আর দীঘির জল খেয়ে একখানা ছায়াভরা মেঘের তলা দিয়ে অনেকদূরে আকাশের শেষে উড়ে' চলে' গেল……তারপর, তারপর……শের আমির স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে দেখলে তার নিজের অজান্তে সেই নতুন পায়রাটির একেবারে গা ঘেঁষে পাশে এসে বসেছে সে। শের আমির পানে তাকিয়ে নতুন পায়রাটি যেন কেঁপে উঠল, তার দুটি চোখ বুজে এলো। শের আমি মিষ্টি গলায় তাকে বললে, "এসো আমার সঙ্গে।"

তারপর, একদিন ছাতের উপর শের আমির ছোট্ট খোপটায় কচি বাচ্ছাদের কান্না শোনা যায়। শের আমির দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই বাচ্ছারা যে তারই সন্তান। এদের মা—কিছুদিন আগের সেই নতুন পায়রা।

একদিন পল্টন দলে যেন সাড়া পড়ে' যায়। তারা রাইফেলের নল পরিষ্কার করতে লেগে যায়। খাবারের রসদ বোঝাই হতে থাকে সব বড় বড় লরী। রাক্ষুসে কামানগুলোর বিশাল চোঙার ভিতরটা সাফ করতে লেগে যায় গোলন্দাজরা। হুকুম এসেছে, এবার সীমান্তে গিয়ে লড়াই করতে হবে। জার্ম্মাণরা এগিয়ে আসছে তাদের আর এগোতে দেওয়া নয়।

ডানপিটে পায়রার আর উৎসাহের অন্ত নেই। ডানা ঝটপটিয়ে সেদিন খানিকটা সে ছাতে পায়তাড়া কষে বেড়াল। একটি প্রাইভেট খোলামাঠে বসে সামনে একখানা আয়না রেখে দাড়ী কামাচ্ছে। ডানপিটে পায়রা তার কাঁধে বসে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলে। হ্যাঁ, চেহারার মত চেহারা বটে। তারপর খোসমেজাজে বাতাসে গা ভাসিয়ে সে উড়ে একেবারে শের আমির কাছে গিয়ে বলল, "শের আমি, জানো, এবার পল্টনদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে। কী মজা বলো তো!"

সেদিনও ছাতে কমলাফুলি রোদ। শের আমি তার সংসারটি নিয়ে বসে ছিল ছাতে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী একটা কথা বলতে গিয়ে তার কথা আটকে গেল। ডানপিটের মুখের পানে তাকিয়ে সে একবার সামনে তাকাল। তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকদূরে শোনা যাচ্ছে গুমগুম্ আওয়াজ, যেন অনেকদূরে পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে—আর দিগন্তে কালো মেঘের মত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। হঠাৎ সেই ধোঁয়ায় আগুন জ্বলে উঠল, মেঘে যেন বিদ্যুৎ।

জার্ম্মাণরা এসে পড়েছে!

তারপর হুকুমের পর হুকুম। তাঁবু উঠিয়ে, কামান আর রসদগাড়ী সঙ্গে পল্টন সীমান্তে এগিয়ে চলল।

শিকাগো পলটনের ৪৮০ জন সৈন্য মার্চ্চ করে চলেছে। তাদের চলার আর শেষ নেই। জার্ম্মাণরা এগিয়ে আসছে, জার্ম্মাণ কামানের আগুন আকাশে জিভ লকলকিয়ে ছুটে আসছে। আর উপায় নেই, একেবারে জার্ম্মানদের সামনে গিয়ে তাদের পথ আটকে খাঁদ খুড়তে হবে।

দুপুররাতে শিকাগো পল্টন একটা উৎরাই, একটা ছোট নদী পেরিয়ে খাড়াই একটা পাহাড়ের একটা ধারে পৌঁছে গেল। তক্ষুণি সদরে খবর চলে গেল, "আমরা পৌঁছে গেছি—জার্ম্মাণরা এগোয় তো আমাদের পায়ে না পিষে এগোতে পারবে না।"

শিকাগো পল্টনের ৪৮০ জনের একজনের হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে। রাত ফুরিয়ে চারিদিক প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে। কিন্তু দূরে বাজখাই গলায় কে যেন চেঁচিয়ে একটা হুকুম দিলে। শিকাগো পল্টনের সেই একজন সৈন্য শিউরে উঠল। এ যে জার্ম্মান গলা! তবে কি, তবে কি তাদের অজান্তে শত্রু এসে পড়েছে?

শিকাগো পল্টনে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ভয়ে দুঃখে পল্টন প্রায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে কী নির্ব্বুদ্ধিতাই না তারা করেছে! নিঃসাড়ে জার্ম্মাণ সৈন্যদল খাড়াই পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে

ওপাশ থেকে এসে পল্‌টনকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। জাঁতিকলে ইঁদুরের মত সারাটা দিন শিকাগো পল্‌টন ছটফট্ করল। সারাটা রাত দুঃস্বপ্ন দেখে পরদিন তারা মরিয়া হয়ে জার্ম্মাণদের আক্রমণ করলে। একবার, দুবার, তিনবার—দশবার তারা ক্ষ্যাপা মোষের মত জার্ম্মাণ ব্যূহের পাষাণ দেয়ালে ধাক্কা দিলে কিন্তু সেই জার্ম্মাণ ব্যূহ একটু টলল না, সেই ব্যূহ ফুটো করে' শিকাগো পল্‌টনের একটি সৈন্যও ওপাশে গিয়ে পৌছতে পারলে না।

শিকাগো পল্‌টন মন বেঁধে ফেললে। যতদিন না সদর থেকে নতুন পল্‌টন এসে পৌছয়, জার্ম্মাণদের কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তাদের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো। চারিদিকে জার্ম্মাণ পল্‌টন ঘেরাও হয়ে শিকাগো পল্‌টন প্রাণ হাতে করে বেঁচে রইল। জার্ম্মাণ কামাণের আগুন শিকাগো পল্‌টনের মাথার উপর খাড়াই পাহাড়ের একটা ধারে জ্বলে জ্বলে উঠল, গভীর রাতে শিকাগো পল্‌টনের মাথার উপর হঠাৎ বোমা ফেটে পড়ল, তাদের দিন আর রাত দুঃস্বপ্নে ভরে গেল।

গুলি, গোলা, বারুদ রসদ ফুরিয়ে এলো। শিকাগো পল্‌টনের আর আশা নেই। সদরে খবর পৌছে দেবে কে? না হলে' সদর থেকে নতুন পল্‌টন এসে জার্ম্মাণদের হটিয়ে দিতে পারতো। বন্দী পল্‌টনকে মুক্তি দিতে পারতো। চারদিনের দিন খাবার ফুরিয়ে গেল। শিকাগো পল্‌টন ফুলফলের পাতা গাছের ছাল খেতে সুরু করলে।

মস্তবড় কতকগুলো খাঁচায় করে' পায়রাদের আনা হয়েছিল। একদিন খাঁচা থেকে চারটে পায়রা বার করে' আনা হল। তাদের পায়ে চিঠি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এরা সদরে পৌছতে পারে।

চারটি পায়রার ভিতর একটি সেই ডানপিটে পায়রা। অহঙ্কারে তার গ্রীবা ফুলে উঠেছে। শের আমির খাঁচার সামনে দিয়ে তাকে যখন আনা হল, সে চেঁচিয়ে বললে, "শের আমি, কী মজার খেলাই না জানে মানুষ। পায়ে চিঠি বেঁধে এখন আকাশে উড়তে হবে। আগুন আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ওড়া কী মজার বলো তো! যাক, ফিরে এসে সব বলবখন।"

ডানপিটের পানে তাকিয়ে শের আমির দুটি চোখ জলে ভরে উঠল।

ডানপিটে পায়রা আর তিনটি পায়রার সঙ্গে চর্কি দিতে দিতে আকাশে উঠল। তারপর আগুন আর ধোঁয়ায় তারা মিলিয়ে গেল।

কিন্তু সদর থেকে কোনো সাড়া মিললো না। পায়রার দল তাহলে হয়তো অর্দ্ধেক পথেই যাত্রা শেষ করেছে। সদরে তারা পৌছয়নি।

একদিন শের আমি ভাবলে,…'ডানপিটে পায়রা, সে এখন কোথায়?'

সীমান্ত থেকে কিছু তফাতে সদর ঘাঁটিতে চিন্তার অন্ত নেই। শিকাগো পল্টন গিয়ে সেই যে পৌছ সংবাদ দিয়েছে, তারপর একেবারে চুপ। কয়েকটা দিন ফুরিয়ে গেল, শিকাগো পল্টন কোনো সাড়াই দিচ্ছে না।

সদর থেকে উড়ো জাহাজ শিকাগো পল্টনের খোঁজে বার হল। শেষে শিকাগো পল্টন একদিন উড়ো জাহাজের চোখে পড়ল। জার্ম্মানের গোলায় দুটো উড়ো জাহাজ জ্বলে' বিকল হয়ে পড়ে' গেল। কিন্তু উড়োজাহাজদল নাছোড়বান্দা। জার্ম্মাণ গুলি গোলার মাঝেই ভাসতে ভাসতে তারা শিকাগো পল্টনের আস্তানা নিশানা করে' খাবার রসদ ফেলতে থাকল। শিকাগো পল্টনের চারিপাশে পাহাড়ী জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল জার্ম্মাণরা। খাবার পল্টনদের কাছে না পড়ে সেই জঙ্গলে জার্ম্মাণদের আস্তানায় ঝুপ ঝুপ পড়তে থাকল।

শেষে, হতাশায় শিকাগো পল্টনের মন ভেঙে পড়ল। একদিন সাহসে বুক বেঁধে পল্টনের একজন খাবারের খোঁজে পাশের জঙ্গলে চুপি চুপি ঢুকতে গেল। জার্ম্মাণ সান্ত্রীকে সে ফাঁকি দিতে পারলে না। তারই হাতে জার্ম্মাণরা দলের কাপ্তেনের নামে পরোয়ানা পাঠালে—'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করো।'

কাপ্তেনের দুটি চোখ জ্বলে উঠলো। বটে! সার্জেন্ট মেজর বল্ডউইনকে ডেকে কাপ্তেন হুকুম দিলেন, "আস্পর্দ্ধা ছাখো কুকুরগুলোর। তুমি এক্ষুনি উড়ো জাহাজের নিশানগুলোও নামিয়ে নাও। নিশানগুলোর সাদা রং দেখে আহাম্মকগুলো ভেবে না বসে আমরা সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি।"

শিকাগো পল্টন তখন ক্ষুধায় পিপাসায় হাঁপাচ্ছে। অনেকেরই তখন আর কথা কবার শক্তি নেই। তখন আর এক বিপদ সুরু হল। শিকাগো পল্টন খাড়াই পাহাড়ের দেয়ালে আড়াল হয়ে ছিল। ফরাসীরা তাদের দেখতে পাচ্ছিল না। তারা ভাবছে ওখানেও জার্ম্মাণরাই আস্তানা গেড়েছে। ফরাসী কাপ্তেন হুকুম দিলেন, 'চালাও কামান।' আর দেখতে দেখতে ফরাসী কামানের আগুন এসে শিকাগো পল্টনকে সাপের মত ছোবল দিয়ে যেতে থাকল।

একদিন, শেষরাত। শিকাগো পল্টন একটা মুমূর্ষু অতিকায় দানবের মত অন্ধকারে ধুঁকছে! তখন দলের কাপ্তেন পায়চারী করছেন। দুটি চোখ তার কোটরে বসেছে, কপালে কালো রেখা ফুটে উঠেছে। পায়চারী করতে করতে, কাপ্তেন পায়রাদের খাঁচার সামনে হাঁটছেন। সব খাঁচা নিঝুম, চুপ। হঠাৎ একটা খাঁচায় খুব খানিকটা ডানার ঝটপটানি শোনা গেল। একটা পায়রা অস্থির হয়ে খাঁচায় পাখা ঝাপটাচ্ছে। কাপ্তেনের মুখে রহস্যের মত হাসি ফুটে উঠল। কাপ্তেন ভাবলেন, আর কেন, সব তো শেষ। পাখীটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক।

খাঁচাটা খুলতেই পায়রাটা উড়ে এসে কাপ্তেনের হাতে বসল। কাপ্তেন তাকে নিয়ে আকাশে ছেড়ে দিলেন। পায়রাটা আকাশে না উঠে আবার তাঁর হাতে এসে বসল। কাপ্তেন পায়রাটাকে চোখের সামনে তুলে' দেখলেন। এই পায়রাটাই শের আমি, দলের সেরা পায়রা। একে কেন চিঠি দিয়ে আকাশে ছাড়া হয়নি—কাপ্তেন বুঝলেন, শের আমিকে লড়াই খেলার শেষ চাল হিসেবে রাখা হয়েছে।

ঠিক সেই সময় রাত পুইয়ে ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠল। কাপ্তেনের মনেও যেন কী একটা দুরাশা খানিকটা রঙের ছোপ ধরিয়ে দিলে। কাপ্তেন শের আমির পায়ে এ্যালুমিনাম মোড়া একটা চিঠি বেঁধে দিয়ে আকাশে ছেড়ে দিলেন। শের আমি চক্কর দিয়ে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আকাশে উঠতে থাকল।

জার্ম্মাণদের রাক্ষুসে কামানটা থরথর কেঁপে গর্জ্জে উঠল গুরুম্, গুম্ গুম্। শের আমির চারিদিকে যেন আগুনের ঢেউ খেলে' গেল। পাখায় যেন কে উষ্ণ বিষ ঢেলে দিলে। আর একটা আগুনের ছোবল

কাপ্তেন শের আমিকে আকাশে ছেড়ে দিলেন

এসে লাগল, শের আমি কাতর চীৎকার করে' চোখ বুজে ফেললে। আকাশে শিষ দিয়ে আর একটা গোলা ছুটে এল, কে যেন শের আমিকে আগুনমুষ্টিতে লুফে নিলে। শের আমি অন্ধের মত ত্নচোখ বুজে উড়ে চলল। কী একটা ব্যথা তার শরীরে পাক দিলে. একবার তার মনে হল কমলাফুলি রোদেভরা ছাত, হঠাৎ পাওয়া নতুন পায়রা সাথী, তার ছোট ছোট বাচ্ছারা। নীচেয় তাকিয়ে সে দেখলে, ছোট নদী। শের আমির বড় ইচ্ছা হল একটিবার নেমে গলাটা ভিজিয়ে নেয়, আগুন ঝলসানো ডানা ত্নটি জুড়িয়ে নেয়। কিন্তু, না, তা হলে সময় বয়ে যাবে। শিকাগো পল্টনের হয়তো সর্ব্বনাশ হবে।

মুমুর্ষু একটা সদর ঘাঁটির কাপ্তেন দেখলেন একডেলা রক্ত আর মাংস আকাশ থেকে পড়ল। পায়রা! কাপ্তেন পায়ে বাঁধা এ্যালুমিনাম মোড়া চিঠিখানা শশব্যস্তে খুলে নিয়ে পড়লেন: দোহাই আপনার, ফরাসীদের কামান থামান। ফরাসীদের কামানের মুখে শিকাগো পল্টন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ফরাসীদের কামান থামল। আর সেই রাত্রে ৩০৭ নম্বর পল্টন জার্ম্মান ব্যূহ ভেদ করে শিকাগো পল্টনের কাছে রসদ নিয়ে পৌছল। শিকাগো পল্টনের ৪৮০ জনের ১৯৪ জন তখনও নিঃশ্বাস নিতে পারছে। ৩০৭ নম্বর পল্টনের সঙ্গে শিকাগো পল্টন সদরে ফিরে এল।

শের আমি সেরে উঠল। কিন্তু পা তার ভেঙেছে। পাখাও আর হাওয়ায় সাড়া দেয় না। জীবনে সে আর আকাশে উড়তে পারবে না।

কিন্তু তার খাঁচার উপর সোনার তকমা এঁটে দেওয়া হল, বীরদের খাতায় তার নাম উঠলো।

তারপর একদিন, সেদিন কমলাফুলি রোদে আকাশ ছেয়ে গেছে। শের আমির সাথী বাচ্ছাদেয় নিয়ে এলো। একটা বাচ্ছা তার বাপকে শুধোলে, "তোমার খাঁচার উপর রোদে জলজ্বল করছে, কী ওটা বাবা?"

শের আমি তার সাথীর পানে তাকালে। সাথী-পায়রা বাচ্ছাকে বললে, "ওটা তোদের বাপের বীরত্বের পুরস্কার।"

ডানপিটে একটি বাচ্ছা তাই শুনে বললে, "এ আবার কী বীরত্ব! শুধু একটা চিঠি বয়ে নিতে গিয়ে ডানা পুড়ে মরা, এতে আর ফুর্ত্তি কতটুকু! এর চেয়ে বাবা যদি লড়াই করতে পেতে তো কী মজার হোতো বলোতো!"

ডানপিটে বাচ্ছার পানে তাকিয়ে শের আমির ত্নচোখ কেন যেন জলে ভ'রে এলো। আর একটি ডানপিটে পায়রার কথা তার মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে, ডানপিটে পায়রার কথার জবাবে আধবয়সী একটি পায়রা যে কথা বলেছিল তাও তার মনে পড়ে গেল।

শের আমি স্পষ্ট শুনতে পেলে সেই কমলাফুলি রোদে হাওয়ায় মিলিয়ে কে যেন তার কাণে কাণে বললে, 'যে কাজের লোক, তাকে যে কাজই করতে দেওনা কেন, সে সত্যিকারের কাজ করে' যেতে পারে।'

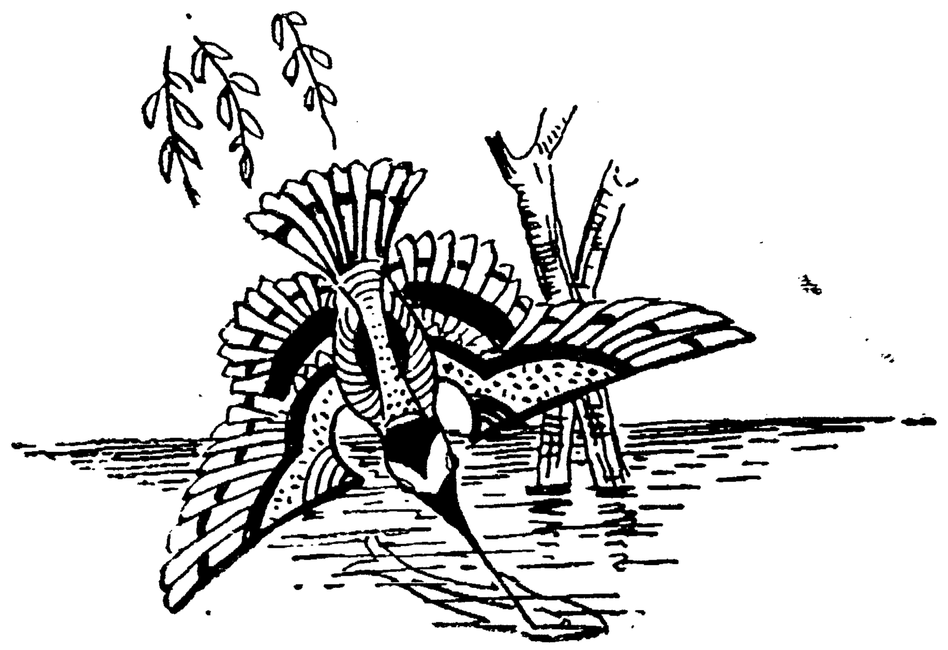

বাদশাহি গল্প

তিন

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"দাদামশায়, ডালমুটের গল্প বল !"

—"ও কাগজের ঠোঙায় কি ?"

—"এক পয়সার মুড়ি !"

—"দাও দুটো মুখে পুরি'

শোন এইবার গল্প জুড়ি !—

ডালহারা পটির ডালমুটে—আম ডালের মত মোটা মোটা কালো শক্ত তার হাত পা ! সে সোনা-মুগের ডাল মোটা মোটা গুণচটের থলিতে ভরে, অলিতে গলিতে, এপাড়ায় সে পাড়ায় বিলি করতে করতে যখন একটা থলি বাকী থাকে, আমাদের ফটকের গোড়ায় এসে জিরোতে বসে—দুপুর বেলায় ঘামতে ঘামতে। সোনা-মুগের ডালে ঠাসা চটের থলিটাকে সে একটা লাঠির ঠেকো দিয়ে বসিয়ে, নিজে মাটিতে বসে ঝিমোয়—দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে, যেন তেল চিক্‌চিক্ কন্ধকাটা দৈত্য কালো আবলুষ কাঠে কুঁদে কাটা। ভয়ে কাছে যেতে পারিনে ; একটুখানি খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে তাকে দেখি।

ইস্কুলের তখন ছুটি, গরমের দিনের দমকা হাওয়া রাস্তার ধূলোয় কখনো শুকনো বাদামপাতা, কখনো ছেঁড়াখাতার টুকরো কাগজের ঘুর্ণি ঘুরিয়ে খেলে—ডালমুটে মুখ তুলে চায়না। আমি দেখি !

ছিরে মেথরের পোষা ডালকুত্তো মাটি সুঁকে সুঁকে পায়ে পায়ে এসে ডালমুটেকে ডাক দেয়—"এউ !"

ডালমুটে জেগে উঠে বলে—"হুজুর !" তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে সেকেলে তামার টিব্‌লে পয়সা বার করে ডাল কুত্তোর সামনে ফেলে দেয়। কুত্তো সেটা মুখে নিয়ে খানিক এ দাঁতে ও দাঁতে সুপুরীর মত চিবিয়ে মাটিতে ফেলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একদিকে চলে গেল। ডালমুটে টিব্‌লেটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে উঠে দাঁড়ালো গা ঝাড়া দিয়ে, লাঠির ঠেকো সরিয়ে ডালের থলিটাকে মোটা-সোটা একটা ছেলের মত পিঠে নিয়ে হন্ হন্ বেরিয়ে যায় !

—"কোথায় যায় ?"

—"তা কি জানি। রোজই দেখি এই ব্যাপার ! ঠিক দুপুর বেলায় ডালমুটেতে ডালকুত্তোতে দেখা হয় ; এ ডাকে 'এউ' একটিবার ; সে ফেলে দেয় একটি পয়সা !

মাটিতে বসে ঝিমোয়

একদিন ডালমুটের হাতে সাহস করে একটি পয়সা দিয়ে বল্লেম—"ডালমুটে আমায় একপয়সার ডাল দাওনা !"

সে বল্লে—"পেট দুখবে। অমিত্ত দাসী বোকবে বাবু !"

—"অমিত্ত দাসীকে তুমি চেনো ?"

—"হাঁ। রান্নাঘরে জাঁতা ঘুরায় ঘর্ঘর, ডাল ভাঙে, আটা পিষে !"

—"আচ্ছা ডালমুটে ডালকুত্তাকে তুমি রোজ রোজ পয়সা দাও কেন?"

—"ধরমরাজ খাপ্পা হোবে তোবে কি হোবে!" বলে সে চলতে চায় দেখে আমি বল্লেম—"ডাল দিলে না তো পয়সা ফিরে দাও!"

সে আমার হাতে পয়সাটি দিয়ে ফিরে চলে গেল। আমারও ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গেল।

জানলার ধারে বসে দেখছি, তারপরদিন ডালমুটে তখনও আসেনি। ভাবছি পয়সা ফিরে নিতে ডালমুটে রেগেছে—বুঝিবা আর এলোনা! নিমগাছে একটা কাক কাঠিকুটি কুড়িয়ে বাসা বাঁধছে—একটা কাঠি সে কিছুতে ঠিকমত গছাতে পারছেনা বাসায়। আমি বসে বসে সেই কাণ্ডই দেখছি, এমন সময় কুত্তো ডাকলো—'এউ'। চেয়ে দেখি ডালমুটে গাঁটের গেরো খুলছে। যেমন টিব্‌লে ফেলা—'লেও ধরমরাজ' বলে অমনি—"

ডালকুত্তা মাটিতে পড়েই দৌড়

—"অমনি কি হলো দাদামশায়? চুপ করলে কেন? বলে ফেলো!"

—"রোসো মনে করি। দাও তো আর দুটো মুড়ি গালে ফেলি!"

—"আর নেই, দেখ খালি ঠোঙা। অমনি কি হলো বলনা!"

—"যেমন পয়সাটি ফেলা ডালমুটে, অমনি কোথা ছিল কাক্ টপ্ করে পয়সাটি তুলে

নিল। ডাল কুত্তো—'ওউবউ'—ডেকে ছুটো লাফ্ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েই উঠে দৌড়।

ডালমুটে তখন কাকের দিকে চেয়ে বললে—"এ ক্যা কিয়া যমরাজ? ধরমরাজ তো খপ্পু হোগা।"

কাক 'ক্যা' বলে পয়সাটা গাছের তলায় ফেলে দিলে। ডালমুটে খুঁটের থেকে এক চিমটি চাল গাছের তলায় ছড়িয়ে দিয়ে পয়সাটি মাথায় ঠেকিয়ে কোমরে গুঁজে চলে গেল ডালকুত্তো যেদিকে গেছে—"যমরাজ ক্যা কিয়া? ধরমরাজ তো খপ্পু হোগা"—বলতে বলতে।

ডালের থলি যেখানকার সেখানে লাঠি হাতে পাঁচিলে বসে রইলো।

আমার কি মনে হলো থলিটাকে পাঁচিল থেকে উল্টে ফেলে দিই। যেমন মনে হওয়া অমনি কাজ—লাঠি শুদ্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লো চটের থলি. ধুপ্ করে খানিক ধুলো উড়িয়ে, খানিক ডাল ছড়িয়ে মুখ গুঁড়ড়ে। কাকটা বাসা বাঁধছিল, 'ক্যা' 'ক্যা' বলে উড়ে পালালো। সেই সময় পাঁচিলের ওপারে শুনলেম ডালমুটে বলছে—"আরে এ ক্যা?" শুনে আমি চোঁ চোঁ চম্পট খড়-খড়ির ঘরে দোতালায়। খড়খড়ি খোলবার সাহস নেই. কান পেতে শুনছি ডালমুটে বলছে—"এ যমরাজ এ ক্যা কিয়া? ধরমরাজ খাপ্পা হুয়া! বহুৎ মাল লোকসান্—ক্যা জানে আওর ক্যা হোনেকো হায়—" বলে সে চলে গেল কি পুলিশ ডাকতে গেল জানিনে।

যমরাজের ঘাড়ে দোষ পড়েছে শুনে আমি ভয় থেকে রেয়াং পেয়ে সেই যে সরলুম. ডালমুটের দিকে আর মাড়াইনে, খড়খড়িও খুলিনে--পুলিসের ভয়ে!"

—"ডালের থলিটা ফেলতে গেলে কেন দাদামশায়?"

—"আরে কি জানি ভাই, থলিটা বসে আছে উঁচুতে, তাকে যে বয়ে বেড়ায় সে বসে আছে নীচুতে—দেখে সেটাকে ফেলে দিতে কেমন আমার হাত নিস্‌পিস্ করতো!"

—"তুমি তখন কত বড় ছিলে?"

—"এই তোমারই মত বয়েস!"

—"তবে পাঁচিলে হাত পেলে কি করে? এইবার তোমার বাজে কথা ধরা পড়েছে!"

—"বাজে কথা কেন হবে! তুমি পাঁচিলে উঠে বিয়ে বাড়ীর বাজনা বাদ্যি দেখ কেমন করে?"

—"তুমি গাছে চড়তে পারো?"

—"না. কিন্তু গাছে চড়ে পট্‌কান্ খেয়েছিলে সেদিন আমি দেখেছি!"

—"কখনো না. পট্‌কান্‌ খেতে আমি ভালোই বাসিনে। আমি ঘুড়ি পাড়তে উঠে-ছিলেম গাছে। আজ আর গল্প থাক দাদামশায়!"

—"আর একটুখানি আছে!"

—"না আমার ঘুম পাচ্ছে. থাক্‌ আজ।"

—"আরে না না বাকীটুকু না শুনলে খাপ্পা হবে ধরমরাজ। শোন বলি—"

—"না আমি শুনবো না, যমরাজ ধরমরাজ আমার ভালো লাগেনা। আমি কানে আঙ্গুল দিলুম।"

—"বেশ আমিও আর গল্প বলছিনে—নাক মল্লুম।"

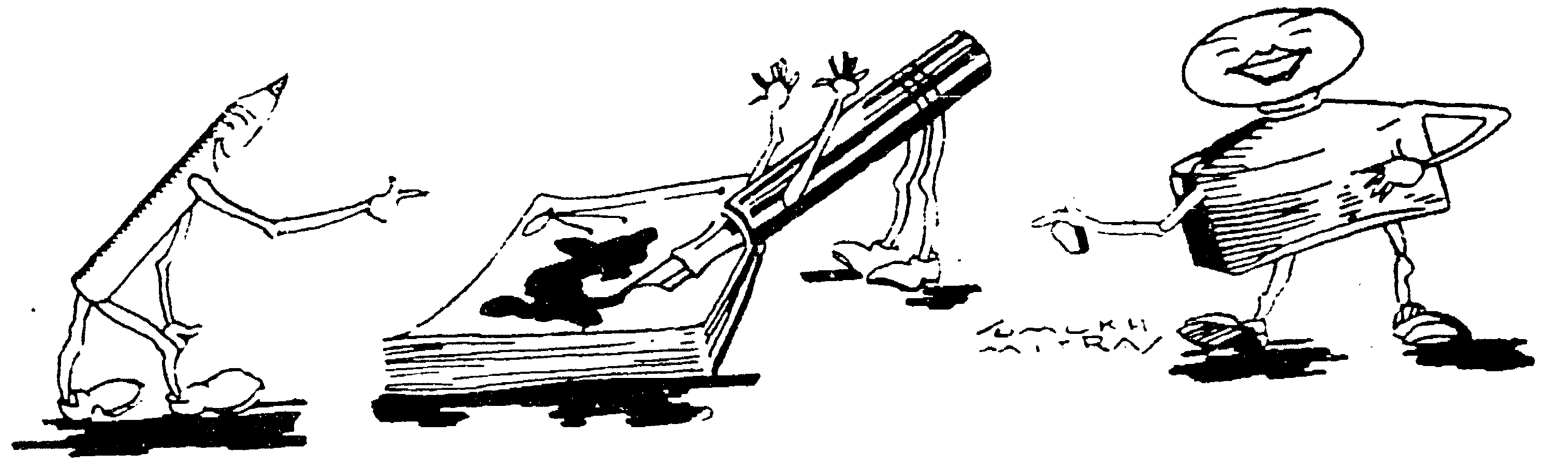

দূরের আলো

সোনার ডাক

খবরী মানুষ

সীতাদেবী একদিন সোনার হরিণ দেখে ভুলেছিলেন। কথা উঠতে পারে, যে-সোনার হরিণ চোখ তুলে তাকায়, সবুজ বনের আড়ালে আড়ালে মিলিয়ে যায়, যে-সোনার হরিণ নিরেট পুতুল নয়, সীতা তাকে দেখে ভুলেছিলেন। এক তাল সোনার একটা পুতুল হরিণ কি আর তাঁর মন টানতে পারত? এখানে লোভের কথা এসে পড়ে, সীতাদেবীর সঙ্গে সাধারণ তোমার আমার তুলনা ওঠে।

সে যা হোক, সোনা মানুষকে চিরকাল টানছে। মানুষের সোনার লোভের আর অন্ত নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ সোনার পিছু পিছু ফিরছে।

মানুষের টাকশালে সোনার পাহাড় জমেছে, কিন্তু তবু তার পিপাসা মেটেনি। ক্ষ্যাপা পরশপাথর খুঁজে ফিরেছে, পাথর ছুঁইয়ে এতবড় পৃথিবীকে খুশীমত সে সোনা করে নেবে; অবধূত মন্ত্র বেঁধে আগুন জ্বেলেছে, সেই আগুনে তাল তাল লোহা সোনা হয়ে যাবে; পাহাড় জঙ্গল ঘেঁটে মানুষ ফিরেছে, মাটির বুক থেকে সোনার চাক কেটে তুলবে সে।

সোনার সামনে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে নি—কোথায় কোন্‌ পাহাড়ে কোন্‌ এক তিথিতে চাঁদের আলোর আশ্চর্য্য গুণ, এক একটা পাথর চক্ষের লহমায় সোনা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান মানুষ, সেও এই অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করে একদিন ঘর সংসার ছেড়ে সেই একখানা সোনার পাথর কুড়োতে বেরিয়ে পড়েছে।

সোনার হাতছানিতে যত মানুষ ঘর ছেড়েছে, তাদের ভিতর খুব কম মানুষই বুঝি বা আবার ফিরেছে।

নিশির ডাকের মত সোনা মানুষকে ডেকে বলেছে 'আয়, আয়': মানুষও কখনো 'যাই' বলতে ভোলেনি।

কালিফোর্ণিয়ায় একদিন সোনা মানুষকে ডেকেছিল, একথা কাহিনী নয় ইতিহাস। কিন্তু কাহিনীর চেয়েও বুঝি তা বিচিত্র।

কালিফোর্ণিয়ায় সোনা! স্পেইনের বুক ভেঙে গেল। কলম্বাসের আবিষ্কারের সময় থেকে, স্পেইন আমেরিকায় সোনা খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু সোনা ধরা ছোঁয়া দেয় নি। মেক্সিকোয় স্পেইনের বংশধররা রাজ্য গড়ে তুলল। তখন ইয়োরোপের পাঁচমিশেলী দল এসে নতুন মহাদেশে আমেরিকা রাজ্য আর আমেরিকান জাতের পত্তন করছে। স্পেইনের বংশধররা যুদ্ধে হেরে একদিন কালিফোর্ণিয়ার দখল ছেড়ে দিলে নতুন এই পাঁচমিশেলী জাতকে। এই ঘটনার অপেক্ষায় যেন ছিল সব—কয়েকটা দিনের ভিতর খবর রটল, কালিফোর্ণিয়ায় সোনা পাওয়া গেছে। পৃথিবীর চারিদিকে এই রটনার সঙ্গে মেক্সিকোতেও খবর পৌঁছল।

কালিফোর্ণিয়ায় সোনা পাওয়া গেছে! স্পেইনের বংশধররা ওষ্ঠ কামড়ে মাথা ধরে বসে পড়ল। কী বিশ্বাসঘাতক এই সোনা! খবরটা কিছু আগে পেলে তারা কি আর কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে দেয়? আরো বেশ কিছুদিন, তারা স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ চালাতে পারত।

কালিফোর্ণিয়ার সোনার ইতিহাসের সুরুটা কিন্তু মোটেই জমকাল নয়।

কালিফোর্ণিয়ায় স্যাক্রামেন্টো অঞ্চলে কেল্লা বানিয়ে ক্যাপ্‌টেইন স্যাটার সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। ক্যাপটেইন একদিন কেল্লায় বসে চুরুট খাচ্ছে। তখন জেম্‌স্ মার্শাল নামে একটি লোক ক্যাপটেইনের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এলো।

মার্শাল নিউজার্শির বাসিন্দা, এসেছে মহাদেশের একেবারে ওপার থেকে। আধ ঘন্টার ভিতর মার্শাল আর স্যাটারের ভিতর ব্যবসার কথাবার্ত্তা তুমুল জমে উঠল।

মার্শাল একটা চুরুট চেয়ে নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে "স্যান্ ফ্রান্‌সিস্‌কোয় সহর গড়ে উঠেছে, আশে পাশে ও মানুষের বসতি বেড়েই চলেছে। কী আন্দাজ বাড়ী না তৈরী হবে! কাঠ আর তক্তার বেজায় চাহিদা, ক্যাপটেইন! কাঠের ব্যবসা ফলাও হতে এখন আর কতক্ষণ? অঢেল মুনফা মিলবে।"

স্যাটার চুরুট রেখে পাইপ ধরিয়ে নিলে।

মার্শাল বুঝলে অষুধে ধরেছে। হাত পা ছড়িয়ে কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে খানিকটা শুনতে স্যাটারের আপত্তি নেই।

মার্শাল বললে, "মাইল পঞ্চাশ ষাট সামনে এগিয়ে যেতে পারো তো বলো।"

স্যাটারের মাথার পাশে কেল্লার একটা জান্‌লা দিয়ে সামনে দেখা যাচ্ছে জঙ্গল, কাছের সবুজ জঙ্গল দূরে নীল জঙ্গলে মিশে গেছে। আর সেই নীল জঙ্গল দিগন্তে যেন অমাবস্যা রাত ঢেলে দিয়েছে।

স্যাটার বললে, "সামনে তো জঙ্গল দেখছি।"

মার্শাল বললে, "ঐ জঙ্গলে ঢুকে পড়তে অন্ততঃ তোমার তো ভয় পাওয়া উচিত নয়, ক্যাপটেইন।"

স্যাটার ভারী গলায় বললে, "মনে ভয় থাকলেও হাতে বন্দুক থাকবে আমার। জঙ্গলে ঢুকতে বাধা নেই। কিন্তু তোমার মতলবটা কি তাই শুনি।"

মার্শাল বললে, "কাঠের ব্যবসায় কথা বলছিলান, ক্যাপটেইন। ওই জঙ্গলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে আমাদের আর চিন্তা থাকে না। ওখানে দেদার কাঠ, কেটে উঠতে পারলে হয়।"

স্যাটার বললে, "কেন, কয়েকখানা করাত সঙ্গে নিয়ে যাবো, তাতে মুস্কিলের কী আছে?"

মার্শাল হো হো করে হেসে দিয়ে বললে, "তা হলেই আমাদের কাঠের ব্যবসা জমবে ক্যাপটেইন—হাত দিয়ে করাত চালিয়ে কখানা কাঠ তুমি পাবে? তাতে কটা পয়সাই বা আসবে পকেটে? শোনো, আমি একটা ফন্দি এঁটেছি। ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ী নদী কেটে চলেছে। স্রোতের কি তোড়! ঐ নদীর স্রোত দিয়ে আমরা করাতের কল চালাবো। করাত শন্‌শন্ চলবে। একদিনে বছরের কাঠ কাটা হবে। চাই কি, সারাটা জঙ্গল ফেঁড়ে ফেলে স্যানফ্রানসিস্‌কোয় চালান দেওয়া যেতে পারে।"

স্যাটার বললে, "ধরে নিলেম করাত কল দিয়ে সারাটা জঙ্গলই তুমি তক্তা বানিয়ে ফেললে। কিন্তু অত কাঠ চালান দেবে কী করে—গাধা ঘোড়া তো আর অত মোট বইবেনা।"

মার্শাল বললে, "ক্যাপটেইন, তুমি কি আমায় আহম্মক ঠাউরলে? বুদ্ধি ঠিক আছে আমার। শোনো, যে নদী করাত-কল চালিয়ে কাঠ ফেঁড়ে দেবে, সেই নদীই কাঠের চালান পৌঁছে দেবে।"

স্যাটার বললে, "কী রকম!"

মার্শাল বললে, "নদীর স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেবে। দুর্দ্দান্ত নদী, স্রোত অনেক মাইল সমান চলেছে। যতদূর খুসী, কাঠের চালান অনায়াসে ভেসে যেতে পারবে। নদীর পারে পারে আমাদের ঘাঁটি থাকবে। কাঠের চালানের গায়ে নম্বর মারা থাকবে। কোন্ ঘাঁটি কোন্ নম্বর চালান পৌঁছে দেবে, ঠিক হয়ে থাকবে। নম্বর দেখে মাল তুলে ঘাঁটির লোকরা ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।"

স্যাটার একগাল হেসে বললে, "চমৎকার! আমাদের লাভ মারে কে?"

মার্শাল বললে, "পাগল! লাভ আবার মারবে কে? ক্যাপটেইন, তুমি ফাঁকা পাইপ টানছ।"

মার্শাল বুদ্ধি জোগালে, স্যাটার জোগালে মূলধন আর লোক লস্কর। মার্শাল একদিন সকালে দলবল নিয়ে রওনা হল। পাহাড়ী নদী ইস্পাতের ফলার মত পাথর মাটী কেটে চলেছে, সেই খরস্রোত নদীর ধারে ধারে মার্শাল সদলে এগিয়ে চলল। পঞ্চাশ মাইল পথের শেষে একদিন মার্শাল দেখলে, দুরন্ত নদীর স্রোত একখানা বাঁকা তলোয়ারের মত খেলছে। নদীর ধারে মার্শাল সেখানে একটা নিশান পুঁতলো। করাত কল সেখানেই বসবে।

নদীর বুকে গাছ উপড়ে, পাথর ফেলে, নদীর স্রোত বেঁধে ফেলা হল। বাধা পেয়ে স্রোত ক্ষেপে গেল, হু হু করে গিয়ে ঢুঁ মারলে করাত কলের চাকায়। চাকা ঘুরতে বিশাল করাত একটা কালো বিদ্যুতের মত খেলল শন্ শন্।

কাজ চলছে। একদিন দুপুরে মার্শাল গাছের ছায়ায় নদীর ধারে পায়চারী করছেন। নদীর স্রোত বাঁধবার সময় প্রথম যেখান দিয়ে জল ছুটে এসেছিল, সেখানটা শুকনো পড়ে আছে। স্রোত এখন ভিন্ন পথে চলেছে। সেই শুকনো নদীর বুক ভরে দুপুর রোদে কী যেন চিক্‌চিক করছে।

মার্শাল চারি পাশে তাকিয়ে দেখে নিলে, ধারে কাছে কেউ আছে না কি। তারপর চুপি চুপি সে নেমে গেল। সোণালী রেণু, যত সম্ভব, মুঠো মুঠো পকেটে পূরে নিলেন। পাছে দলের মজুরদের চোখ পড়ে, মার্শাল সেই খানটাতে খানিক নদীর স্রোত ফিরে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যাপটেইন স্যটার সেদিনও কেল্লায় বসে চুরুট খাচ্ছে। তারই পাশে টেবিলে আসর জমেছে। তখন মার্শাল এসে উপস্থিত। ক্যাপটেইন স্যটার ভাবলে, মার্শাল দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রথমটা, এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্যটার মোলায়েম গলায় বললে, "এসো এসো ইঞ্জিনিয়ার। বোসো। খবর কী! একহাত তাসে আপত্তি নেই তো !"

মার্শালের মুখের 'অস্থির' ভাবটা কিন্তু স্যটারের চোখ এড়াল না। মার্শাল সকলের অলক্ষ্যে চোখ টিপলে। স্যটার সঙ্গীদের বললে, "তোমরা ততক্ষণ আসর জমাও। ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমি ব্যবসার কথা সেরে আসি।"

ক্যাপটেইন অফিসঘরে এসে কবাটে তালা এঁটে দিলে। মার্শাল চেয়ারে বসেছে। ক্যাপটেইন টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললে. "ব্যাপার কী মার্শাল! নদীর স্রোত বুঝি করাত-কল চালাতে নারাজ।"

মার্শাল গম্ভীর হেসে বললে, "নদী এখন করাত-কলে হুকুম খাটছে। কিন্তু করাত-কল চালানোয় আমাদের উৎসাহ শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকবে কি না ভাবছি। ক্যাপটেইন্‌. একটা ঘটনা ঘটেছে।"

স্যটার ভাবলে, ঘটনা—কী ঘটনা !

মার্শাল বললে, "ক্যাপটেইন, তোমাকে আজ আমি বিশ্বাস করতে যাচ্ছি। এতটা বিশ্বাস বন্ধুও বন্ধুকে করে না। ক্যাপটেইন, আমি সোনার সন্ধান পেয়েছি।"

স্যটার খানিক গম্ভীর হবার পর হো হো করে হেসে দিলে। মার্শাল বললে, "এই দ্যাখো ক্যাপটেইন। রঙে ওজনে হুবহু মিলে যায় সোনার সঙ্গে—বলতে চাও তুমি এগুলো হলদে পাথর কুচি !"

স্যটার সেই হলদে রেণুর প্যাকেটটা হাতের তেলোয় নাচিয়ে একটা আন্দাজ নিলে ওজনের। সত্যিই তো, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। মার্শাল তবে কি সোনাই কুড়িয়ে নিয়ে এলো !

স্যটার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। খানিক বাদে সে বললে, "মার্শাল, তুমি সোনা চেনো ?"

মার্শাল বললে, "সহজ বুদ্ধিতে যাকে চেনা বলে, ততটুকু চিনি। জানোইতো আমার সোনার ব্যবসা নেই। জোর করে বলতে পারি না যে নির্ঘাৎ চিনি।"

স্যটার জিগ্‌গেস করলে. "ধারে কাছে কেউ আছে সোনা চেনে ?"

মার্শাল হেসে বললে, "কেল্লার মালিক তুমি, খোঁজটা তুমিই ভালো রাখো আমার চেয়ে।"

স্যটার জবাব দিলে. "ঠিক, ঠিক।"

কাঠের ব্যবসার অংশীদার দুটি হলুদরেণুর প্যাকেটটা সামনে করে' অসহায়ের মত বসে রইল।

সহসা স্যটার বললে, "ভালো কথা! তাক থেকে ঐ মোটা পুরনো বইখানা পেড়ে আনতো ইঞ্জিনিয়ার ? ঐ বইয়ে সোনা চেনার কয়েকটা সঙ্কেত আছে।"

বইয়ের একরাশ পাতা উল্‌টে স্যটার আসল জায়গায় পৌঁছে গেল। লেখা আছে :—Aquafortis য়্যাসিড যত ঢালোনা কেন, সোনা যেমন তেমনই থাকবে।

স্যটার লাফিয়ে উঠল। Aquafortis য়্যাসিড তো তার আলমারিতে এক শিশি আছে ! য়্যাসিড এনে স্যটার সেই হলুদ রেণুগুলোর গায়ে ঢেলে দিলে, সেগুলো যেমন তেমন রইল।

স্যটার ধীরে ধীরে মুখ তুলে মার্শালের পানে তাকাল। মার্শাল একদৃষ্টে স্যটারের পানে তাকিয়ে আছে।

স্যটার বললে "সোনা !"

মার্শাল বললে, "সোনা !"

কাঠের ব্যবসার দুই অংশীদার দুজনের হাত শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর দুজনে টেবিলের দুপাশে চেয়ারে বসে পড়ল।

যাদের বুদ্ধি বেশী, প্রতি বিষয়ের খুঁটিনাটি যারা তলিয়ে দেখে, তাদের উৎসাহ সাধারণ মানুষের মত উদ্দাম উৎসাহ নয়। স্যটার, মার্শাল দুজনেই ভাবলে, হলুদরেণুর প্যাকেটটা নিয়ে তারা এত অস্থির হয়ে পড়ছে কেন। নদীর জলে যে এমন অজস্র সোনা আছে, তার কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। হয়তো

পাহাড়ী নদীর জল থেকে সোনা কুড়োচ্ছে

কোনো পাহাড়ের গা থেকে কিছু সোনা নদীর স্রোতে ভেসে এসেছে। কিন্তু কোন্‌ পাহাড়ে কোথায় সোনার স্তূপ, সে নিশানা তাদের দেয় কে ? কাঠের ব্যবসা উঠিয়ে সোনার খোঁজে বার হয়ে পড়লে

হয়তো তাদের সর্ব্বনাশ হবে। হয়তো সারাজীবন মরীচিকার পিছনে ঘুরে হয়রাণ হতে হবে। তার. চেয়ে, এ বিষয়টা আপাততঃ একেবারে চেপে যাওয়া ভালো। কাঠের ব্যবসাই প্রাণপণ তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

সেদিনই ঘোড়া ছুটিয়ে মার্শাল জঙ্গলে ফিরে এলো। মার্শাল মন বেঁধে ফেলেছে, আপাততঃ সে সোনার চিন্তা মনে আনবে না। শুতে যাওয়ার সময় রাতে ঈশ্বরকে ডেকে সে বললে, "হে ঈশ্বর, কাঠের ব্যবসা ফলাও হোক আমার। সোনার লোভ থেকে বাঁচাও আমায়।"

কিন্তু সে রাতে মার্শাল স্বপ্ন দেখলে, কোথায় করাত-কল! সেই দুরন্ত পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে হাজার হাজার তাঁবু পড়েছে মানুষের। পৃথিবীর চারিদিক থেকে সন্ধানীরা এসেছে সোনার নিশানা পেয়ে। পাহাড়ী নদীর জল থেকে তারা সোনা কুড়োচ্ছে।

আগামীবার শেষ হবে

চুষি-কাঠি

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

গ্রামের পরে ছোট্ট কুটির ঘর,
বাছার আমার কদিন বড় জ্বর ;
কোথায় গেল গাল ভরা সে হাসি,
সোনা যেন ছড়ায় রাশি রাশি।
কতই খেলা ছোট্ট দুহাত দিয়ে,
পোড়া অসুখ ছিনিয়ে গেল নিয়ে।
কাজের ফাঁকে করতে আদর কিছু,
মুখের পরে হতাম যখন নীচু,
আলত করে ছুঁইয়ে দিতে চুমো,
আর বলিতে, 'দুষ্টু, পাজী ঘুমো,'
বন্দী হোত ছোট্ট হাতে তার
চুলের গোছা কিংবা সাড়ীর ধার।
ছাড়িয়ে নেয়া হোত বিষম দায়,
চুলোর পরে তেল বা পুড়ে যায় ;
নরম ব্যথায় 'উঃ' করে যেই উঠি,
সোনা আমার হেসেই লুটোপুটি।
চোখের পরে টলটলে নেই হাসি,
মলিনতা ঘর বেঁধেছে আসি ;
ঘুম পাড়াতে পাগল হতাম যাকে,
চোখের পাতা বুজেই শুধু থাকে।
এই যে বাবা, ওষুধটুকু খাও ;
হরি ঠাকুর, সারিয়ে ওকে দাও ;
এই যে মাণিক চাইছে দু'চোখ মেলে ;
কোথায় সোনার উঠছে ব্যথা ঠেলে !

গ্রামের পরে সাঁঝের বাতাস বয়,
সন্ধ্যা আসে, আর ত দেরী নয় ;
রুণ্‌তী নদীর জল হোল ঐ কাল,
ওপার ত আর যায় না দেখা ভাল ।
তেলের প্রদীপ জ্বলছে কোলে ধীরে,
কোলের ওপর খোকা ঘুমায় ফিরে ;
কোন্ বিকেলে চোখ মেলে সেই দেখা,
ঠোঁটের কোলে মিলায় হাসির রেখা ;
সেই হতে সে চক্ষু বুজেই থাকে,
মাঝে মাঝেও দেয়না সাড়া ডাকে ।
ঘুমোয় খোকা ! আচ্ছা একটু ঘুমোক,
রোগের জ্বালা একটু করে জুড়োক ;
গা'টা এবার ঠেকছে ভাল যেন,
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক এবার যেন ।

অনেক রাতে তন্দ্রা বোধ হয় ধীরে
এসেছিল চক্ষু দুটী ঘিরে ;
কোলের ওপর কিসের নাড়াচাড়া ?
ওমা ! খোকন করছে কেমন ধারা ;
শুনছ, ওগো, কি ছাই ঘুমোও শুধু ?
খোকন সোনা, খাবে আমার দুধু ?
এই যে আমি, চায় না অমন করে,
একটা চুমু দেব ঠোঁটের পরে ?
চোখ থেকে তার মলিনতার ছায়া—
কাটিয়ে সেথা ফুটল হাসির মায়া,
ঠোঁটের কোণে তারি আভাস কত ;
শীতের রাতে আব্ছা চাঁদের মত :
উঠল বুঝি হাত দু'টী তার নড়ে,
একটা কথার আভাস ঠোঁটের পরে :—

কী ব্যগ্রতা ! কিছুই বুঝি না,
বেরিয়ে এলো একটা কথা, 'মা' ।

একটু দূরে রুণ্‌তী নদীর পারে,
হরি ধ্বনি উঠছে বারে বারে ।
ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি ধীরে,
স্বপন দেখি, খোকন এলো ফিরে
রুণ্‌তী নদীর রূপোর ফালি বেয়ে,
চাঁদের আলোয় সব গিয়েছে ছেয়ে ।
বল্লে খোকন, 'গেলাম চাঁদের দেশ,
সবার চেয়ে মাগো তুমিই বেশ ;
সেথায় আছে নুপুর রুমুঝুমু,
কিন্তু কোথায় পাব তোমার চুমু ।'

ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখি খাটের পরে
খোকার 'চুষি কাঠি'ই আছে পড়ে ।

শ্রীঅনুবীক্ষণ

ঘরের দেওয়াল বেয়ে একদল পিঁপড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে চলেছে এ আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে। যেমন দ্রুত তাদের গতি তেমনি আবার সুশৃঙ্খল। প্রকৃত পক্ষে প্রাণী জগতে পিঁপড়ের মত এমন সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রাণী খুবই কম দেখা যায়। পিঁপড়েদের যেন কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই, তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য এবং সকলে মিলে জাতের সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য বেঁচে থাকে। কেমন করে যে পিঁপড়েদের সমাজে এমন সুসংযত নিয়মাবলীর সৃষ্টি হোল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

বেঁচে থাকাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় তাগিদ। সারা বিশ্ব প্রকৃতিতে নানা মরণের খেলা চলছে। গতির যে স্ফুলিঙ্গকে আমরা জীবন বলি নানাদিক থেকে কত ভাবে যে তার পরিবর্ত্তন চলছে বলা যায় না। জীবন একভাবে একরকম প্রাণীর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এল কিন্তু হয়ত প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে না—ব্যস তাকে সরে যেতে হবে। এক রকম প্রাণী নিজের বাঁচবার তাগিদে অন্যরকম প্রাণীকে উচ্ছেদ করে ফেলতে পেছপাও হবে না। সমস্ত সজীব জগৎময় এই খেলাই চল্‌ছে। এর মধ্যে যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেই গেল বেঁচে। এই বাঁচার তাগিদেই বোধ হয় অনুভূতি বলে ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়েদের মধ্যে, এই সমষ্টিগত শৃঙ্খলা। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে এত ছোট প্রাণী বাঁচতে পারে না কিন্তু জাতীয় সমষ্টিতে তারা প্রবল।

যাই হোক, কি কথায় কি এসে পড়ল, বলছিলাম দেওয়ালে একদল পিঁপড়ে আসছে আর একদল যাচ্ছে—বেশ তারা আসুক আর যাক এর মধ্যে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ওরা আসা যাওয়ার মধ্যে কি কি করে। প্রথমেই নজরে পড়ে আমরা যেমন পুরোণ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খোস গল্প, আলাপ করে যাই, সাহেবরা যেমন হ্যাণ্ডশেক করে, কোন দেশের লোকেরা যেমন প্রথম সাক্ষাতে পরস্পর নাক ঘসাঘসি করে নেয়, তেমনি পিঁপড়েরা দেখি হঠাৎ দাঁড়িয়ে শুঁড় শেক করছে। ব্যাপারখানা কি? ওরা কি কথা বলে নাকি? সেটা বুঝতে হলে প্রথমতঃ আমাদের পিঁপড়েদের দৈহিক গঠন প্রণালী বুঝতে হবে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পিঁপড়ের শরীরে তিনটে অংশ আছে। প্রথমে মাথা, তাতে দুটো ছোট্ট ছোট্ট অপরিষ্কার চোখ, আর সর্ব্বদা কম্পমান দুটো শুঁড়। তারপরে বুক। বুক থেকে বেরিয়েছে তিন জোড়া লম্বা লম্বা পা, সবশেষে শরীরের সব চেয়ে বড় অংশ পেট। পিঁপড়ের গলা এবং কোমর আশ্চর্য্য রকমের সরু। শরীরের তুলনায় পিঁপড়ের পা গুলো বেশ লম্বা এবং এই পায়ের সাহায্যে তারা ভীষণ দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। দেখা গিয়েছে পিঁপড়েরা সাধারণ ভাবেও খুব দ্রুত চলে।

একদিন আমেরিকার এক পিঁপড়ে মশাই বেরিয়েছেন, খাবারের সন্ধানেই হোক বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই হোক বলতে পারি না। এদিক সেদিক খেয়ালখোলাভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়ে উঠলেন সামনের টেবিলের ওপর। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল একটা একফুট স্কেল। পিঁপড়ে মশায়ের কি জানি কেন স্কেলটা এত ভাল লাগল, সুড় সুড় করে তিনি একবার এদিকে যান আবার ওদিকে যান। মোটের ওপর ঘড়ি ধরে দেখা গেল তিনি এক সেকেণ্ডে ষোল গজ হিসেবে ঘুরলেন। ভেবে দেখ ব্যাপার খানা, এ ছাড়া দৌড় আছে, আবার এঁরা নাকি ভয় পেলে লাফও দিয়ে থাকেন।

পিঁপড়েদের মুখ দেখে মনে হয় না যে এরা বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। তার কারণ অন্যান্য পোকা মাকড়ের তুলনায় তাদের চোখ বেজায় ছোট এবং জ্যোতিহীন। হবে নাই বা কেন? পিঁপড়েদের চোখের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তাদের ঘর, জীবনযাত্রা হোল অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে। শুঁড় দুটোই তাদের অবস্থার পরিপার্শ্ব তাদের জানিয়ে দেয়। ওই শুঁড় দুটোই পিঁপড়েদের জীবনযাত্রার প্রধান সম্বল।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিঁপড়েদের এই শুঁড় দুটো সব সময়ে নড়ছে যেন এর দ্বারাই ওরা সব জিনিষ অনুভব করে' নিতে চায়। প্রকৃত পক্ষে শুঁড় দুটোর একটা প্রধান কাজই হোল সব জিনিষ অনুভব করে নেওয়া। পিঁপড়েদের স্পর্শেন্দ্রিয় ওই শুঁড় দুটোর মধ্যে গভীর ভাবে জাগ্রত। অন্ধ যেমন তার আঙুল দিয়ে সব কিছু স্পর্শ করে বোঝে, পিঁপড়েরাও স্পর্শ করে বুঝে নেয় তার পরিপার্শ্ব। তাছাড়া আমাদের নাকের যেমন ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতা আছে তেমনি পিঁপড়েদের শুঁড়েরও ওইরকম একটা ক্ষমতা আছে। অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে বা মাটির নীচে, যেখানে নানা রকম প্রাণীরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, চোখের কাজ যেখানে অচল, সেখানে ওই শুঁড়ের ঘ্রাণের সাহায্যে পিঁপড়েরা নিজেদের বাসা চিনে নেয়। ওই ঘ্রাণের সাহায্যে পিঁপড়েরা স্বজাতীয়দের ঠিক করে, এমন কি নিজেদের পায়ের গন্ধও তারা টের পায় এবং বুঝতে পারে যে কোন পথে তারা এসেছে বা গেছে।

তাই যখন আমরা দেখি দুটো পিঁপড়ে শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে আলাপ করতে ব্যস্ত তখন বুঝতে
হবে প্রথমে তারা ঠিক করছে যে তারা এক জাতের পিঁপড়ে কিনা। অবশ্য এটাও বোধ হয় ঠিক যে ওই
শুঁড়ের সাহায্যে কোন উপায়ে তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলে।

এ হেন একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গের নিশ্চয় বিশেষ যত্নের দরকার। এই শুঁড় দুটো বাদ দিলে
পিঁপড়ের কোন সামাজিক অস্তিত্বই থাকে না, তখন তার বনবাসে চলে যাওয়াই ভাল।

বোধ হয় সকলেই দেখে থাকবে যে গুঁফো লোক যেমন সযত্নে তার গোঁফে তা দেয় তেমনি
পিঁপড়েরা মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের শুঁড়গুলো চুমরে নিচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা শুঁড়ের গর্ব্বে যে
পিঁপড়ে তার শুঁড়ে তা দিচ্ছে তা নয়, সে তার ওই দরকারী অঙ্গটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে মাত্র। ওই
শুঁড় পরিষ্কার করবার জন্যে পিঁপড়েদের পায়ে একরকম বুরুষ থাকে। সেই বুরুষ দিয়ে শুঁড় আঁচড়ে নিয়ে, নতুন
উদ্যমে পিঁপড়েরা আবার ছোটে কাজে। পিঁপড়েদের সমাজে অলসতার প্রশ্রয় নেই, সকলেরই কোন না
কোন কাজ আছে। এমন কি পিঁপড়েদের রাণী যাঁর ঘর গড়া, খাবার যোগাড় করা প্রভৃতি সাধারণ কোন
কাজ নেই তাঁরও কাজ হোল ডিম পাড়া। দিনের পর দিন জাতি বৃদ্ধির আশায় ডিম পেড়ে যাওয়া। যাক
সে কথা পরে।

মাথার তুলনায় পিঁপড়ের চোয়াল দুটো বিশাল, তাতে সার সার করাতের মত তিনকোণা দাঁত। চোয়াল
দুটো পাশাপাশি নড়ে। এই চোয়ালই পিঁপড়ের আত্মরক্ষা এবং কাজের প্রধান সহায়। এর সাহায্যে
সে খাবার সংগ্রহ করে ঘরে আনে, শক্ত খাবার পিষে ফেলে, মাটী কেটে গর্ত্ত করে. তার ছানাদের আলগা
ভাবে বয়ে নিয়ে যায়।

পিঁপড়েরা বেশ উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সহর গড়া বেশ দেখবার জিনিষ। ভেতরে বড় বড়
রাস্তা, ড্রেন, ঘরবাড়ি বেশ সুশৃঙ্খল। এমন কি তাদের ময়লা ফেলার জায়গাও আলাদা।

কিন্তু পিঁপড়েদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হোল তাদের বাচ্ছা প্রতিপালন করবার ক্ষমতা।
পিঁপড়ে সমাজে সব কর্ম্মী পিঁপড়েরাই স্ত্রীলোক। কিন্তু মাতৃত্বের অনুভূতি থেকে তারা বঞ্চিত কারণ

সব পিঁপড়েরাই মা হয় না। আগেই বলেছি পিঁপড়েদের রাণীরই কাজ হোল বংশ রক্ষা করা। ইনি সাধারণ
পিঁপড়ে থেকে আকারে অনেক বড়। সারাদিন ইনি ঝিমোন আর দিনে দুটো করে ডিম সমাজে দান করেন।

ডিম পাড়া মাত্র পিঁপড়ে কর্ম্মীরা তার ভার নেয় এবং যদিও মাতৃত্বের অনুভূতি তাদের নয় তবু
এমন যত্ন এবং অধ্যবসায়ে তারা ডিমগুলি লালন পালন করে যে দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়।

দিনে দুটো করে পর পর ডিম পাড়া হলেও একসঙ্গে অনেক ডিম ফোটে। পিঁপড়ের ডিম
সাধারণতঃ আঠাল। ডিম পাড়া মাত্র তাদের এক সঙ্গে গায়ে গায়ে রেখে দেওয়া হয়। ডিমের আঠাল
স্বভাবের জন্যে তারা এক সঙ্গে জুড়ে থাকে, তাতে সরাবার দরকার হলে একসঙ্গে অনেক ডিম পিঁপড়েরা
সরাতে পারে। ডিম ফোটার পর পিঁপড়ে বাচ্ছাদের মানুষ হবার অর্থাৎ পিঁপড়ে হবার আগে দুটো
অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অবস্থাকে বলা হয় লার্ভে (larva) এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে
পিউপে (pupa)।

লার্ভে অবস্থায় পিঁপড়ে বাচ্ছা ভারী অদ্ভুত দেখতে। ছোট্ট একটি মাথা তারপরে শরীর। এই
অবস্থায় বাচ্ছাদের গলাগুলো ভীষণ ইলাষ্টিক, টেনে খুব লম্বা করা যায়। পিঁপড়েদের বাসায় বাচ্ছাদের বয়স
হিসেবে আলাদা আলাদা রাখা হয় যাতে করে দলে দলে যেন সমান ভাবে বাড়তে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে
লার্ভের গায়ে সাদা একটা আবরণ পড়ে। এই অবস্থায় তাদের দেখতে সাদা এক একটা ছোট্ট পুঁটলির
মত। মুখের কাছটা কালো কালো, যেন সাদা পুঁটলির গায়ে কালো ফিতে বাঁধা। এইটাই পিউপে
অবস্থা।

পিউপে অবস্থার থেকে সাদা চামড়া কেটে পিঁপড়ে বাচ্ছা যখন বার হয় তখন তার পিঁপড়ে নার্সদের
মহা উৎসাহ। কেউবা তার গোটান পা গুলো টেনে টেনে সোজা করে দেয়, কেউবা দাঁড়াতে সাহায্য করে
কেউবা দেয় খাইয়ে। এই সময় বাচ্ছা পিঁপড়েদের রঙ ফিকে কটা, তুলনায় চোখগুলো ভীষণ কালো। এই
সময় বাচ্ছা সম্পূর্ণ অসহায় আর বোকা। কোথাও যেতে হলে পিঁপড়েরা এই সম্পূর্ণ বাচ্ছাদের শরীরের একটা
অংশ কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

তারপর দিনের গতির সঙ্গে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, জাগতিক নিয়ম অনুসারে বুদ্ধি বাড়ে। পিঁপড়ে সমাজে নতুন একজন কর্ম্মীর অভ্যুদয় হয় যারা সমাজের জন্য, জাতির জন্য মন প্রাণ ঢেলে দেবে। বাঁচার তাগিদেই পিঁপড়েরা এমনি করে দিনের পর দিন বেঁচে চলে।

আজ এই পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবে পিঁপড়েদের জীবনযাত্রা দেখা গেল, পরে যদি সময় হয় তখন আরও ভাল করে এদের জীবনযাত্রার প্রণালী দেখা যাবে। মানুষের মত পিঁপড়েদের শ্রেণী বিভাগ আছে। তারা একদল আর একদলের ওপর আক্রমণ করে লুঠপাট করে, বন্দী করে নিয়ে এসে দাস করে রাখে। আবার শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, দল বেঁধে অন্যান্য বড় প্রাণীর ওপর চড়াও হতে পিঁপড়েরা পেছপাও নয়। সে সব ভারী আশ্চর্য্য কাহিনী। কিন্তু থাক সে সব পরে।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল!

এতকালের বন্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ-কী অভাবিত ব্যাপার?

জয়ন্ত চুপি-চুপি বললে, "মাণিক, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়, বন্দুক তৈরী রাখো!" সুড়ঙ্গ-পথের ভিতরে তার চুপি-চুপি কথাই শোনালো চীৎকারের মত!

সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরী রাখবে বটে! এই পাতালপুরে কোন্ কুম্ভকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধ'রে ঘুমিয়েছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে দিলুম আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে! বন্দুক ছুঁড়ে করবে কি? বন্দুকের গুলিও তো হজ্‌মী গুলির মত কপ্ কপ্ ক'রে গিলে ফেলবে!"

জয়ন্ত ও মাণিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল!

বস্তাটানার মত শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুম্-দুম্ করে খুব ভারি ভারি জিনিষ আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে!

জয়ন্ত এ সব শব্দের কোন হদিস্ খুঁজে পেলে না! এ যেন কার আস্ফালনের শব্দ!

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হ'ত ব'লে প্রবাদ শুনেছি! তা কি তবে সত্য? যে আসছে সে কি যক?"

জয়ন্ত বললে, "পদ্মরাগ-বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোন বৌদ্ধ পুরোহিত সে-মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্য কি না জানি না,—সত্য না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্য হ'লেও এখানে যক কেউ রাখে নি।"

—"তবে ও কে আসছে?"

—"ভগবান জানেন!"

এইবার ভীষণ একটা গর্জ্জন শোনা গেল ! বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনালো যে, সেটা কিসের গর্জ্জন কিছুই বোঝা গেল না ।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "হুম্ ক্রমাগত চম্‌কে চম্‌কে আজ মারা পড়ব নাকি ? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চললুম আমি উপরে । এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে ব'সে ভয় পাওয়া ভালো. বনের ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো !" তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন ।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎ-খণ্ডের মত ছুটো জ্বলন্ত চক্ষু ! সে বিচিত্র চোখ ছুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিব্‌ছে না !

জয়ন্ত বললে, "আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয় ! মাণিক আজ আমাদের ফিরতেই হবে—এখনও সময় আছে ! সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে ! চল, আমরা বাইরে যাই !"

—"কিন্তু ও-সব কিসের শব্দ. ও কার গর্জ্জন ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না ।"

—"বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয় ! শীগ্‌গির উপরে চল !"

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙ্গা বেদীর গায়ে হেলান্ দিয়ে মড়ার মত হল্‌দে মুখে সুন্দরবাবু চুপ করে ব'সে আছেন ।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু আজ আপনারই জয়জয়কার ! পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক ।"

সুন্দরবাবুর তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না ।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয় । সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপ্‌দপে চোখ দিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে ! চল, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই । আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে !"

অমলবাবু বললেন, "তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত্ত আবার বন্ধ ক'রে দিলে কি হয় না ?"

—"না । পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয় ! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ ! ঐ আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়্‌মুড়্ ক'রে ঠিক্‌রে পড়বে !"

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, "জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত । পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে !"

জয়ন্ত বললেন, "ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্য হয় ! ও-পাপ বিদেয় হ'লে তো সব ল্যাঠা চুকে যায় !"

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ ক'রে আবার একটা বুকের-রক্ত-ঠাণ্ডা-করা গভীর গর্জ্জন বাইরে ছুটে এল !

সে গর্জ্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব ! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জ্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায় !

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, "সে আসছে, সে আসছে ! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোট বনের দিকে !

রাত তখন বেশী নয়, কিন্তু এরি মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিছুটী-মন্ত্রে চতুর্দ্দিকের নির্জ্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত । বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর-বনের আর্ত্তধ্বনি ।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোট মাঠ । তারপর আবার অরণ্য ।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে. "মাণিক, ভাগ্যিস্ বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে বিষাক্ত-বাষ্পের বোমা এনেছিলুম !"

"কেন বল দেখি ?"

—"কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুঁড়ে দেখব কোন ফল হয় কিনা ?"

—"যদি ফল না হয় ? যদি ওটা কোন জীব না হয় ?"

—"মানে ?"

—"ওটা কোন ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব ?"

—"মাণিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও ?"

—"ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোন জীব বাঁচতে পারে ?"

—"না পারাই স্বাভাবিক । কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোন স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা । ভূতের কথা মনেও এননা মাণিক ! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে । কিন্তু ভূত নেই ।"

বোধ হয় তখন শেষ-রাত । আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র । গাছের উপর সকলে ব'সেছিল অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় । কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না । এমন কি মাণিকের মত হচ্ছে, তাঁর

নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে গাছের সব পাখী ও বানর তো দূরের কথা, এমন কি ভূত-পেত্নীরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে !

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দুবার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে !

সুন্দরবাবু বেজায় চম্‌কে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ্ ক'রে ডাল থেকে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁসিয়ার ব্যক্তি ব'লে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ্ ক'রে আর-একটা ডাল ধ'রে ফেলে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম্ম ভেদ ক'রে নানা কণ্ঠের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল ! কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চীৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

—"জয় ! জয় !"

—"কী মাণিক ?"

—"শুনেছ ?"

—"হুঁ !"

—"আমাদের এখন কি করা উচিত ?"

—"চুপ ক'রে এইখানে ব'সে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।"

—"কিন্তু ও কিসের গোলমাল ?"

—"কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কোয়ো না। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।"

নীচের ডাল থেকে করুণস্বরে শোনা গেল, "হুম্ ! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে ! গাছের ডাল ধ'রে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশীক্ষণ ঝুলতেও পারব না !"

অমলবাবুর সঙ্গে মাণিক কোনরকমে ডাল ব'য়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হ'ল ! মাণিক বললে, "বৈজ্ঞানিকের মতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা গাছের ডাল ধ'রে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেন নি সুন্দরবাবু !"

ডাল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, তোমার ঠাট্টা শুন্‌লে অঙ্গ জ্বলে যায় ! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে ?"

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, "ফের কথা কয় !"

দূরের কোন গোলমাল আর শোনা যায় না। শব্দগুলো যেন স্তব্ধতা-সাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইষ্টকের মত প'ড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল ! এখন সুধু কালো রাত করছে

থম্-থম্, মুখর ঝিল্লী করছে ঝিম্-ঝিম্, বনের গাছ করছে মর্-মর্ ! এবং ম্লান খণ্ড চাঁদ নিবু-নিবু চোখে করছে ঊষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা !

গাছে গাছে পাখীর দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে—জাগো লতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলিপ্রজাপতি ! পূর্ব্বের শোভাযাত্রায় দিবারাণীর সোণার মুকুট দেখা দিয়েছে ! জাগো সবাই !

সকালের প্রথম আলো কি শান্তিময় ! সকালের নূতন বাতাস কি মিষ্টি ! এই পৃথিবীতে কখনো যে কালো-কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না !

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "আগে ষ্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেট্‌লি ! কি জানি বাবা, যে-জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না। ওহে, 'এয়ার-টাইট্' টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না ? হুম্, ক্ষমা-ঘৃণা ক'রে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুঁড়ে মেরো।"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো 'ব্রেক্-ফাষ্ট্' মানুষের সাহস আর শক্তিকে দুগুণ ক'রে তোলে। মাণিক, নিয়ে এস রসগোল্লা-সন্দেশের টিন।"

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত-ভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশী ভাব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত মনের মানুষ দুর্লভ।"

প্রাতরাশ শেষ ক'রে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'ল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' বলে চেঁচিয়ে নিলেন।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কাণদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চেঁচালেও তিনি শুনতে পাবেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই। ঠাট্টা সুরু হ'ল তো ? আচ্ছা মাণিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বল দেখি ?"

মাণিক মুচ্‌কে হেসে বললে, "আপনাকে বেশী ভালোবাসি কিনা।"

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশীটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরো সুন্দর ক'রে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব-আগে এগিয়ে চলেছে।

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হল্‌দে। আশেপাশে ঘুরে-ফিরে

ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব-ছোটজাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলোবে গঙ্গাফড়িং 'হাই-জাম্পে'র নানান কায়দা দেখাচ্ছে।

মাঠ পার হয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল। বাঁশীতে বাজছিল তখন কোন গানের অন্তরা, কিন্তু হঠাৎ তার স্বর বোবা হয়ে গেল একেবারে।

মানিক দূর থেকেই লক্ষ্য করলে, জয়ন্ত বাঁশীটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে, পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে। দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল।

সুন্দরবাবু বুঝলেন, আবার কোন অঘটন ঘটেছে। একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরাও ছুটে এস।"—ব'লেই তিনি দৌড়তে লাগলেন।

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, "হে ভগবান, আবার কি হ'ল? আর যে পারি না।"

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিকমত বর্ণনা করা অসম্ভব।

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প'ড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ। এতবড় অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব-রকম মোটা।

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে। অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃতদেহ।...... তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের ওপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে প'ড়ে একটা ভাঙা বন্দুক।

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত। কোথাও প'ড়ে আছে চাপ্ চাপ্ রক্ত, কোথাও কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা। রক্তের ফিন্‌কি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে। এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনো দেখেন নি,—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মত তিনি ধপাস্ ক'রে বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "তাহ'লে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্ত্তনাদ শুনেছিলুম?"

মানিক বললে, "তাছাড়া আর কি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু কে এরা?"

জয়ন্ত বললে, "বুঝতে পারছেন না? এরা যে আমাদেরই বন্ধু! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটে নি, পদ্মরাগ-বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কি করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে ঢুকেছিল!"

অমলবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "আমি চ্যান্ আর ইন্‌কে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন্, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিচিয়ে রয়েছে চ্যান্। অন্য লোকটাকে চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে!..........সাপ কখনো গর্ত্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্ত্তে সে আশ্রয় নেয়। কোন জন্তু উপর থেকে গর্ত্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখেই সুড়ঙ্গে বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোন কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায় নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে! চ্যান্ আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ ক'রে দুবার বন্দুক ছুঁড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল।...... অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর-শত্রুকে বধ ক'রে আমাদের পথ সাফ ক'রে দিয়েছে! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যাণ্ড্ ইন্ কোম্পানীকেও ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ দি পদ্মরাগ-বুদ্ধদেবকে! তিনি সত্যই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হ'লে তিনি বোধ করি খুসি হবেন!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা ক'রে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হুম্! বেটা অজগর! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে!" ব'লেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

—এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃত-দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল।

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেন নি, তিনি ভয়ানক ভড়্‌কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সাঁমলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়াম-বীরের মত আশ্চর্য্য এক ডিগ্‌বাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে বাবারে, অজগরটা এখনো জ্যান্তো আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি-অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে স'রে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে!

অজগরের দেহটা তখন ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধ'রে তাকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন ব'লে উঠলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হ'তে চাই না!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!"

—"শান্ত হব? জ্যান্তো অজগরের সামনে শান্ত হব? হুম্ হুম্ হুম্!"

—"ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নড়েচড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনো ঐ কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোন জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!"

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বটে, বটে, বটে? তা'হলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগ্‌বাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ!"

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা-বেদীর সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, "এখন দূরে যাক্ সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ-বুদ্ধের প্রতিমা। হাতী সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই রাতও নেই, আছে সুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার।"

হাতী সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বাল্‌লে, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ।

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কাণে-কাণে মাণিক বললে, "আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহ'লে আপনি কি করবেন?"

সুন্দরবাবু চম্‌কে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে আর নতুন ভয় দেখিও না মাণিক।"

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হ'ল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোন শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল।

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হ'ল।"

সুন্দরবাবু বললেন, "শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম। হুম্, পদ্মরাগ-বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব-বুদ্ধ। ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা।"

মাণিক বললে, "তাহ'লে অকারণে এত কষ্ট ক'রে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?"

অমলবাবু বললেন, "এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক। ওঙ্কারধামের ভাস্কর্য্যে সর্ব্বত্রই তাই নাগমূর্ত্তির ছড়াছড়ি! ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমীর পোষা হয়, বাংলাদেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু আপনার যুক্তি মনে লাগছে না। যে-অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ ক'রে তাকে কখনো কবর দিয়ে জ্যান্তো মারবার ব্যবস্থা করত না।... আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। হাতী সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বল। ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল। দেখা যাক্ দেওয়ালের ওপাশে কি আছে?" ব'লেই সে রূপোর শামুকের নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাণিক জানত, জয়ন্ত খুসি হ'লে নস্য না নিয়ে পারে না। কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, "জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখন হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়্-হুড়্ ক'রে জল ঢুকতে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?"

জয়ন্ত বললে, "সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।......ভাঙো দেওয়াল।"

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগলো কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা। শক্ত দেওয়াল। সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হ'ল।

কিন্তু জল-টল্ কিছুই ভিতরে ঢুকল না। জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কি অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে ব'লে উঠল, চালাও কুড়ুল। সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। এ সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয় নি।"

মাণিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মত কি হাতে ঠেকছে। বোধহয় দরজা।"

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, "অ্যাঁঃ? বল কি। দরজা? আলিবাবা'র চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক।"

ঠকাং। ঠকাং। ঠকাং। চলল সমান কুড়ুলের পর কুড়ুল। খ'সে প'ড়েছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর। এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে ওঠে সকলের প্রাণ।

দরজাই বটে! খুব বড় দরজা নয়, ছোট দরজা! তিন ফুটের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুৎ! আগাগোড়া লোহার শিকল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরাণো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, "কুলুপের ভিতরে বেশ ক'রে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও-কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তেল ত ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?"

মাণিক বললে, "আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা ঐ কুলুপে লাগবে?"

জয়ন্ত রূপোর শামুকের নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিয়ে বললে, "কুলুপটা ভাল ক'রে তেলে ভিজুক্! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরী করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে একগাল হেসে বললেন, "রাগ। আমার এ ভুঁড়ি পর্ব্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে। এ ভুঁড়ি কখনো পরিপূর্ণ হয় না। বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ্ ক'রে দেখতে পারো—হুম।"

মাণিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, "এইবারে পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে।"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, পদ্মরাগ-মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কি, এইবারেই তা জানতে পারব। অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে-ভালো পদ্মরাগ-মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথায় জন্মায় না। পৃথিবীতে সব-চেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান-ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ-মণি বেশী মূল্যবান।"

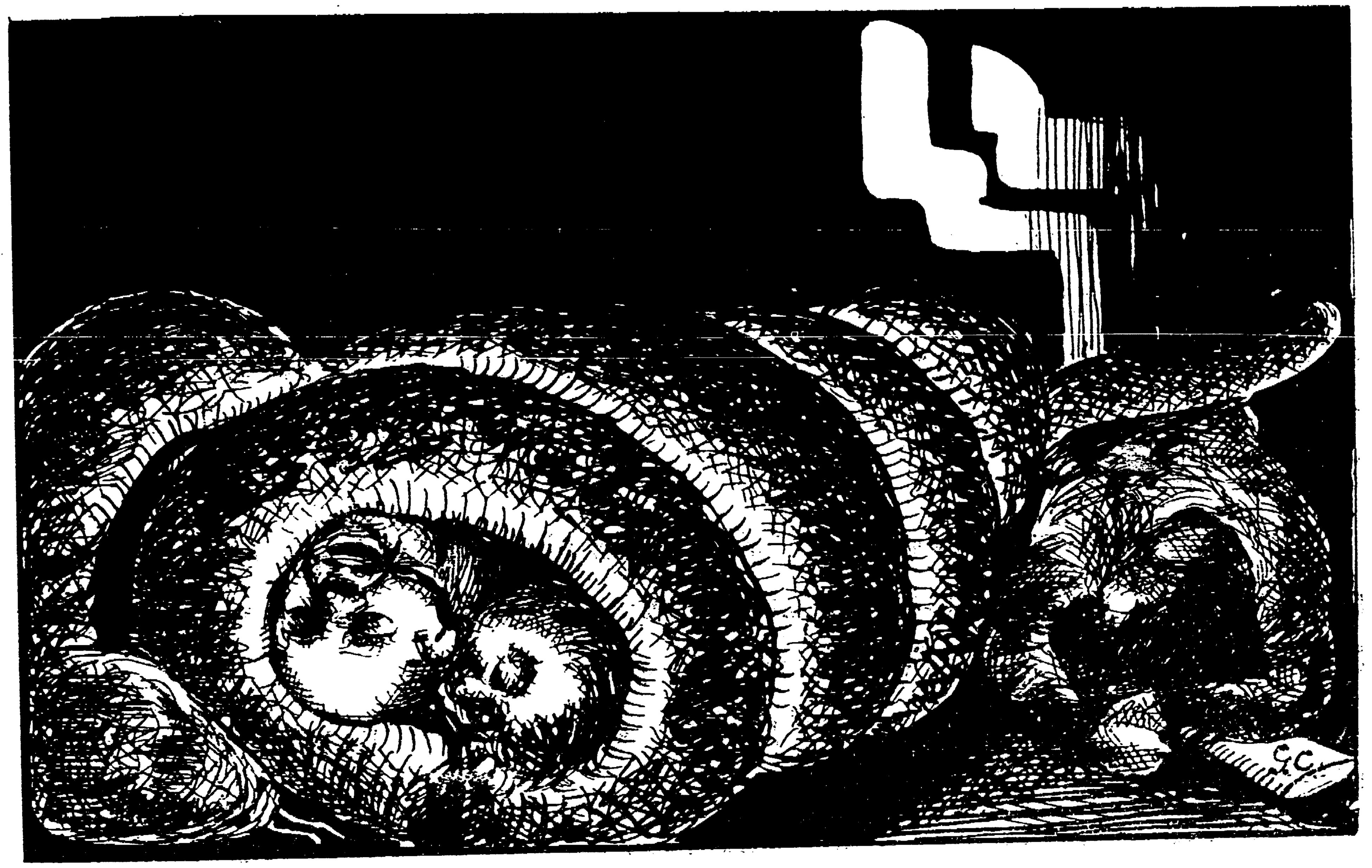

অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে

চায়ের পেয়ালা যখন খালি হ'ল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুলো, তখন মাণিক সগর্ব্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে।

সমস্ত গুহা চীৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ ক'রে জয়ন্ত বললে, "জয়, পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোট একটি ঘর। তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হ'ল, তার হিসাব কেউ জানেনা। ঘরে আর কোন আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোন্ ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক।

জয়ন্ত ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললে, "মাণিক, দেখ। পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেঁতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?"

—"পারছি, জয়। এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।"

—"এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদীর তলায় সিঁড়ির সার আছে, নক্সা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত। সাধারণ লোকে নক্সা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ। কারণ অসাধারণ লোক নক্সার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ত, কিন্তু আমরা ফিরে যাই নি। অতএব অনায়াসেই গর্ব্ব করতে পারি। এখন তোল ঐ সিন্দুকের ডালা।"

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।...সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা। তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জ্বল-জ্বলে পাথরে তৈরী একটি অতি-আশ্চর্য্য অতুলনীয় বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানে কারুকার্য্যের বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে। মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতেরও কম হবে না।

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, "মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল-আলো ঠিক্‌রে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা। এ মণিময় মূর্ত্তি না হয়ে যায় না। না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা। মাণিক মাণিক। এ কি সত্য, না অসম্ভব স্বপ্ন?"

মাণিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্ত্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুইচক্ষু ছানাবড়ার মতন ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। পদ্মরাগ মণি কেটে এত-বড় মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে? পদ্মরাগ-মণি এত বড় হয়!"

মাণিক বললে, "না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ-মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্ত্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায় নেই।"

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্ত্তিটিকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপরে বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মত ঘোররক্তবর্ণ সেই মহামানবমূর্ত্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল।

সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সামনে দুইহাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

শেষ

ছুটির ঘণ্টা

বি, সি

ডুরাণ্ড টুর্ণামেণ্ট

নর্দার্ণ ইণ্ডিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল টুর্ণামেণ্ট হল ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা। আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পর নামজাদা মিলিটারী দল শুধু এই টুর্ণামেণ্টেই যোগদান করে থাকেন। আগে সিভিল টীম খুব অল্পই এই টুর্ণামেণ্টে খেলত। কিন্তু যে বছর হতে মোহনবাগান—গোষ্ঠ পাল, সামাদ, রবি গাঙ্গুলি, মনা দত্ত, কুমার, বলাই চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় নিয়েও সেমি ফাইন্যালে বিখ্যাত মিলিটারী দল সেরউড ফরেষ্টারের কাছে হার স্বীকার করে তখন হতেই বাঙ্গলার বহু সিভিল টীম এই টুর্ণামেণ্টে খেলে আসছে কিন্তু কেউ এই প্রতিযোগিতায় গোরাদলকে হারিয়ে শীল্ড নিতে পারে নি। এবার বাংলার কোন নামজাদা দলই সিমলায় খেলতে আসেনি। ফাইন্যালে উঠেছিল সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারস্ আর নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে দল। ডিফেন্সের জোরে ভাল খেলে গোরাদল বিপক্ষ দলকে ১-০ গোলে হারায়। চ্যাপম্যান হেড করে গোলটি দেয়। খেলার শেষে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর পারিতোষিক বিতরণ করেন।

মানাভাদার দল—

হকিতে ভারতীয় দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য সত্যিকার শ্লাঘার বিষয়। কিছুদিন আগে মানাভাদার টীম নিউজিলাণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। সেবার ভারতীয় দলের উন্নত খেলা সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। এবার মানাভাদার মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে গিয়ে আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়েছেন। সবশুদ্ধ ৩১টি খেলা হয়। মানাভাদার অকলাণ্ডে পিচ্ছিল মাঠে একটি গেমে হার স্বীকার করেন। সব টেষ্ট ম্যাচে অতি সহজেই মানাভাদার জয়ী হয়েছেন। ৩১টি খেলায় মানাভাদার গোল স্কোর করেছেন কম করে ২৩২। বিপক্ষ দলেরা মাত্র ১৯টি গোল দিতে সক্ষম হয়।

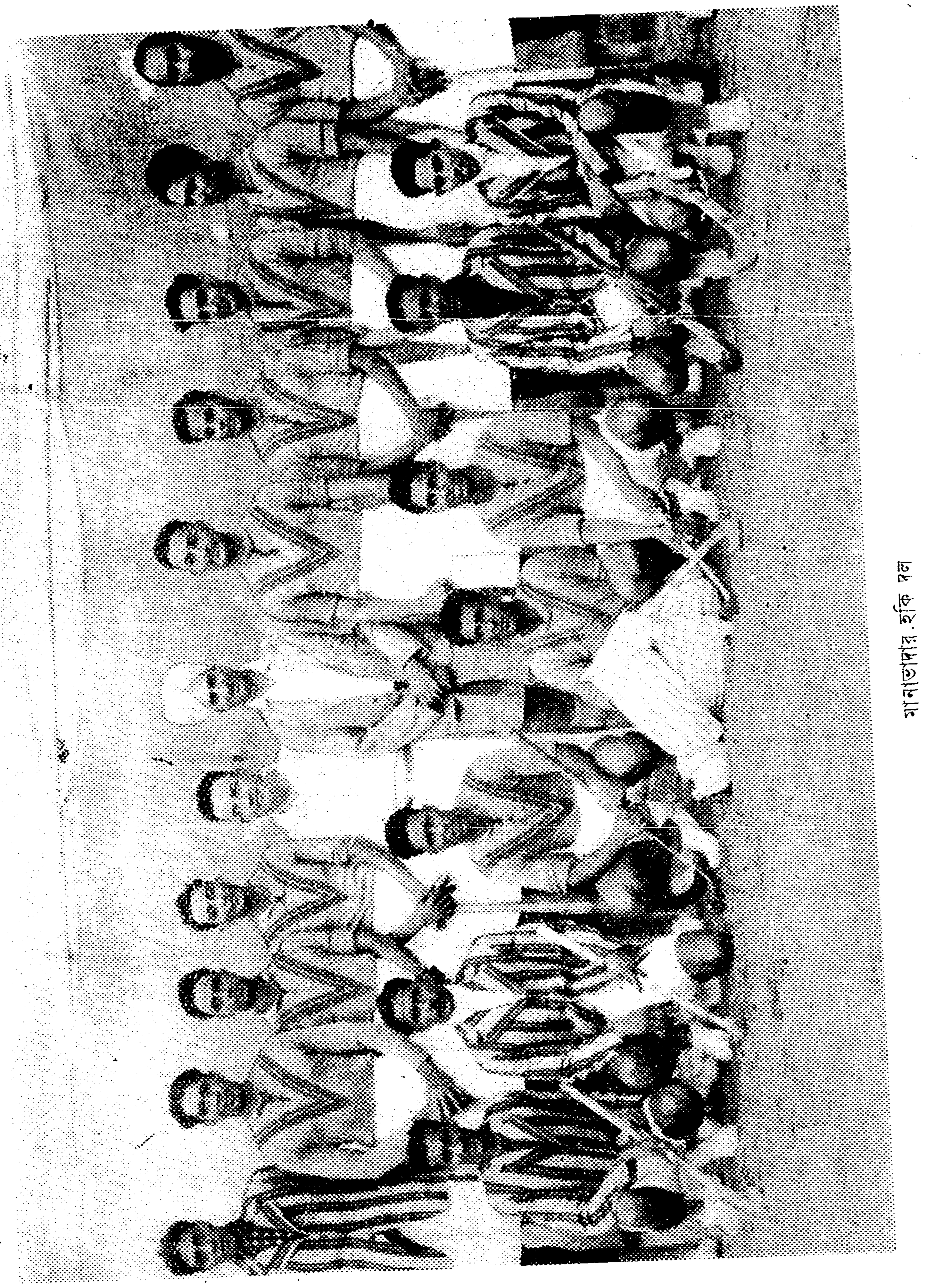

মানাভাদার হকি দল

ডোন্যাল্ড বাজ

আমেরিকার লন টেনিস টুর্ণামেণ্টে জয়ী হয়ে ডোন্যাল্ড বাজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমেচার খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য হলেন। কিন্তু অন্য একটি টুর্ণামেণ্টে বাজ অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় হফ্‌ম্যানের কাছে ৬-২, ৫-৭, ৬-৮ গেমে হেরে গেছেন। বাজ বোধ হয় এই টুর্ণামেণ্টের এমেচার খেলোয়াড় হিসেবে শেষ খেলা খেললেন। শোনা যাচ্ছে, বাজ শীঘ্রই প্রফেসনাল খেলোয়াড় হবেন। টিলডেন, কোসে, ভাইনস, পেরী প্রভৃতি প্রফেসনাল খেলোয়াড়ের পর বোধ হয় বাজের মত সমকক্ষ আর কোন এমেচার খেলোয়াড় রইল না।

অষ্ট্রেলিয়াতে আই. এফ, এ. দল

অষ্ট্রেলিয়াতে আই, এফ, এ, দল

আমরা রংমশালের আশ্বিন সংখ্যায় অষ্ট্রেলিয়াতে আই, এফ, এ দলের খেলার একটি বিবরণ দিয়েছিলাম। তৃতীয় টেষ্ট খেলার ফলাফল তাতে আমরা প্রকাশ করেছিলাম। তৃতীয় টেষ্টে আই, এফ, এ ৪—১ গোলে জিতেছিল কিন্তু চতুর্থ টেষ্টে আবার সিডনী মাঠে আই, এফ, এ ৪--৫ গোলে হেরে যায়। শেষ টেষ্ট ম্যাচেও অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলকে ৩--১ গোলে হারিয়ে 'রাবার'জয়ী হন।

পরিচালিকা——**দিদিভাই**

আমার পরম স্নেহের ভাই বোনেরা !

আশ্বিনের আয়ু ফুরোল...কার্ত্তিক এলো।

রৌদ্র ঝল্‌সান বাতাসে শীতের আমেজ এসেছে—বেশ অম্লমধুর লাগে রোদটুকু ! পূজোর ছুটী ফুরিয়ে এলো নাকি ? পড়ার বইগুলোতে ধুলো জমে গেছে তো ? আবার ধুলো ঝাড়া সুরু হোক—দেরী করা চলে না—

কার্ত্তিক এসেছে !

তোমাদের ৺পূজার ছুটী কেমন আনন্দে কেটেছে ? ৺বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ ও অকৃত্রিম ভালবাসা জানাচ্ছি আর এই সঙ্গে ভাইদের জানাচ্ছি—ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

এবার এসো মিষ্টিমুখ করি।

রেখা (পাটনা) গ্রাঃ ৩৭২

তোমার পুরো নাম নেই কেন ? তোমায় সাদরে ডেকে নিচ্ছি ভাই। গ্রাহক নম্বরটা ত'-ভাইবোনের নামে করিয়ে নিও। কার সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছা করে লিখো।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) গ্রাঃ ৬৭০

তোমার শুভকামনা যেন রংমশালের আশীর্ব্বাদ হয়ে ওঠে। যার ঠিকানা চেয়েছ পরে পাঠাচ্ছি।

হামিদা বেগম (বারাকপুর)

তোমার মিষ্টি চিঠি খুব ভাল লেগেছে। গ্রাহক নম্বর দুজনের নামেই করিয়ে নিও তাহলে হবে। গ্রাহিকা না হলে রংমশাল দলে প্রবেশ করা যায় না। তোমাদের এ বৈঠকে বয়সের তারতম্য নেই— ভাল-লাগা নিয়ে কথা—তাছাড়া তুমি তো অনেক ছোট—মনটি আরও ভাল।

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর)

আন্নু ! গ্রাঃ নম্বরটা প্রতি চিঠিতে দিও, না হলে বড় অসুবিধা হয়—সব সময় তো মনে থাকেনা। লীলার খবর পাইনি—পেলেই জানাবো—আর সেও ভাল হলে নিশ্চয় চিঠি লিখবে। পূজার ছুটীর আমোদ কি আর আমাদের মত বুড়োর জন্য ? তোমরা কি করলে তাই বলো।

সমরেন্দ্রকুমার চৌধুরী (গৌরারং) গ্রাঃ ৪৩৮

তোমার রচনা এসেছে যথাসময়ে খবর পাবে। ধাঁধা আলাদা কাগজে লিখো বুঝেছ ?

সুজাতা রক্ষিত (নাইনীতাল)

তোমার চিঠি ও টি, বি, সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। পরিচালক মশাই বলেছেন—একটু ছোট করে ওটা প্রকাশ করবেন। তুমি সুস্থ হয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী ফিরে আসছ—এ তো আনন্দের কথা। কলকাতায় আসবে তো ? শ্রীভগবান তোমায় সুস্থ রাখুন ও মনে শান্তি দিন। মানুষের জীবনে কত কাজ—সে তো ব্যর্থ হবার নয়।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার রচনা পাঠিয়েছ তো ? যথাসময়ে খবর পাবে। তুমি 'ইন্টার স্কুল' গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছ জেনে আমরা খুব খুসী হয়েছি ভাই।

লেখা বসু (কালিঘাট) গ্রাঃ ১১৪১

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়েছি। রংমশাল তোমার ভাল লাগে এ খুব আনন্দের কথা ভাই। তোমার ডাক নামটী মিন্টু, ভারী মিষ্টি। তুমিও বুঝি দিদিভাই ?

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮২৩

তুমি রংমশালের ব্যাজ পেয়েছ তো ? যার যার নাম পাঠিয়েছ তাদের ঠিকানা পরে পাঠাচ্ছি।

বেলা দাশগুপ্তা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫১

বিবি ! চিঠি পেয়ে তবে তো উত্তর দিয়েছি—না হলে কি করে দেবো বলো ? লেখনী বন্ধুর নাম জানালেই পাবে।

শৈলেন্দ্র কুমার নাথ (সিমলা হিল)

তুমি সিমলা সম্বন্ধে কি লিখবে ছোট করে লিখে পাঠিও। হাতের লেখা খারাপ নয়—তবুও হাতের লেখা ভাল করবার চেষ্টা করো।

জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় (সালকিয়া)

গ্রাহিকা নম্বর কই ? তুমি যে আমায় অনেকদিন চেনো—তার প্রমাণ তো পাইনি ভাই—এত দেরী কেন ? আগে বুঝি লিখতে নেই—আমি খুব রাগ করেছি। তোমার ডাকটী কিন্তু ভারী মিষ্টি। বন্যা সম্বন্ধে যা বলেছ তাতো আমি আগেই জানিয়েছি।

রমা দত্ত, বীণা দত্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ৩৮৫

তোমরা চন্দননগর, দানাপুর, নীরাট এখানকার লেখনী বন্ধু চাও—আচ্ছা পরে জানাবো। যাদুমন্ত্র জানি না—তোমরা ভালবাস বলে ভাল লাগে।

জ্যোৎস্নাকুমার সেনগুপ্ত (দিনাজপুর) ১১৬৯

নিয়মাবলী যা জানতে চেয়েছ সে তো রংমশালের পাতাতেই পাবে। তোমার রচনা পাঠিও ভাই। যে যে বিষয় বলেছ পরিচালক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে পরে জানাবো।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) ১১৪৫

কই আমি তো তোমার উপর রাগ করিনি—কেন করবো বল ? তোমরা আমার স্নেহের জিনিষ। প্রীতি সম্মিলনী তোমাদের জন্যই হচ্ছে—এসো সবাই কেমন ? তুমি দ্বিতীয় চিঠিতে যা লিখেছ—সে কথার উত্তর পরে জানবে—পরিচালক মহাশয়কে বলা হয়েছে।

রণীশচন্দ্র ঘোষ (রাজসাহী) গ্রাঃ ৩৩৬

তোমরা—'রংমশাল ও অন্যান্য শিশু পত্রিকার পার্থক্য' এই সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করছ ? আচ্ছা ফলাফল জানিও। ওটী প্রকাশ সম্বন্ধে পরিচালক মশাইকে জানিয়ে বলবো।

এস্ কুণ্ডু (বিদ্যাসাগর কলেজ)

অনেকদিন তুমি রংমশাল নিয়ে আসছ—তাহলে গ্রাহক হয়ে পড়ো না ? গ্রাহক না হলে চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নয়। লেখনী বন্ধু তো গ্রাহক না হলে দেওয়া হয় না ভাই।

প্রভাত রঞ্জন দে (মজিদপুর) ১১০৫

তোমার আগের চিঠি পাইনি তাই উত্তর দিতে পারিনি। পত্রিকা তোমরা যাতে তাড়াতাড়ি পাও তার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে ভাই।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি

শুভাথিনী—

দিদিভাই

চলন্তিকা

গত মাসে রংমশালে আমরা ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধের কথা বলেছিলাম। যুদ্ধ আসন্নই হয়ে আছে আজও, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধের দামামা থেমে আছে মাত্র। জার্ম্মানী এবার শুধু কূট বুদ্ধিতে ও হুম্‌কি দিয়েই জেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে থেকে স্যুডেটানল্যাণ্ড কেড়ে নিলে। মুহূর্ত্তের মিথ্যা শান্তির জন্য স্যুডেটানলণ্ড বিনামূল্যে জার্ম্মানীর হাতে বিক্রয় হয়ে গেল। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সও এই অসং ব্যবসায়ে শান্তির দোহাই পেড়ে বেশ দোকানদারী করে নিলে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর এই হুম্‌কিতে নিজেদের যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়েছে তা তাদের ইতিহাসে একটা চিরদিনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হল, অপবাদ ঘটল, এর গ্লানি শুধু তাদেরই একদিন হবে না, সমস্ত পৃথিবীর এতে ক্ষতি হবে, আজ হয়েছেও। আজ বুঝি এই প্রথম ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হল। এখন নিত্যনূতন ইউরোপের ম্যাপ তৈরী হবে, দেশের সীমান্তগুলি ভেঙ্গে চুরে নূতন সীমান্ত তৈরী হবে। অসহায় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলিকে কিন্তু আজ কে বাঁচাবে ? জার্ম্মানী এতেও সন্তুষ্ট নয়, তেমনি অশান্ত। এখন সে আফ্রিকায় নূতন উপনিবেশ দাবী করেছে। ডাঃ গোবেল্‌স্ বলেছেন—"We get what is ours or we draw sword."

* * * * * *

দেশ কেড়ে নিলে কিন্তু কি সত্যি তাকে জয় করা যায় ? জাপান আজ চীনদেশে যে যুদ্ধের আগুন লাগিয়েছে, সহরগ্রাম লোকসংখ্যা যে নিত্য ধ্বংস করছে তাতে করে কি জাপান চীনকে কখনও আপনার করে নিতে পারবে ? চীনদেশ আজকের নয় সে বহুকালের, বহু প্রাচীন তার সভ্যতা। চীন শুধু দেশ নয় সে বিরাট এক মহাদেশ, অসংখ্য তার লোকসংখ্যা: জাপান কি এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতায় সে বিরাট মহাদেশের সমগ্র জয় করতে পারবে ? তাহলে তো অনন্তকাল যুদ্ধ চালাতে হবে ! যাই হোক, ইউরোপেই হোক আর এসিয়াতেই হোক সমস্ত পৃথিবীতে আজ পশুবলের রাজত্ব। গায়ের জোরে ও চোখ রাঙিয়ে রাজ্য ও মৈত্রী বিস্তার চলছে ! পৃথিবীতে সত্যিকারের আন্তরিক মৈত্রী ও শান্তি বোধহয় সুদূর

পরাহত। বোধহয় একমাত্র প্রাকৃতিক বিলয় এই পশুবলকে পরাহত করতে পারে। একমাত্র মহাজ্ঞানী ও মহর্ষিরাই এর শেষ কবে কোথায় বলতে পারেন।

* * * * * *

বর্ত্তমান নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আজ মানুষের যেমন সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও তথাকথিত সভ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি সে সমস্ত আবিষ্কার ঘটিত দুর্ঘটনার ও অন্ত নেই। ১৯৩৪ সালে কেমিষ্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন Mr. Urey। তিনি এ বিষয়ে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন তার কথা বলেছেন। বড় বড় উড়ো জাহাজ, নানা কলকব্জা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু কোথাও যেন মানুষের সৃষ্টিশক্তির সমাপ্তি ঘটছে। আশা আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে আকাশ ঢেকে মস্ত উড়ো জাহাজ চলল, আর আরাম কেদারায় বসে মানুষ অনেক নীচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যখন জয়ের উল্লাসে হাসছে কেজানে ঠিক তখনই হয়তো তারা ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই সেদিন কুয়াসায় পথ হারিয়ে এক পাহাড় চুড়ায় ধাক্কা লেগে একটি উড়ো জাহাজ তার গর্ব্বিত যাত্রীদের নিয়ে নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। জমির ওপর দিয়েও চলা আজ নিরাপদ নয়। রেল দুর্ঘটনা তো ভারতবর্ষে রোজই ঘটছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে তো এই গত কয়েক সপ্তাহেই তিন চারিটি অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। কিন্তু এগুলি কি বাস্তবিক দুর্ঘটনা? না মানুষেরই ভ্রান্তি ও দুষ্কৃতির ফল? হিংসা দ্বেষ শয়তানী আর মানুষের নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টির অসম্পূর্ণতাই কি এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী নয়?

* * * * * *

কামাল আতাতুর্ক আজ মৃত্যুশয্যায়। তুর্কী দেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশ যে কোন মুহূর্ত্তে এই বিরাট পুরুষের মৃত্যু ঘটতে পারে! বর্ত্তমান ইতিহাসের পাতায় পাতায় কামালের নাম লেখা আছে। আজ তাঁর মৃত্যু হলে তুর্কীর শাসন ভার কে গ্রহণ করবে? কামাল কিছুই প্রকাশ করেন নি, হয়ত কারুর নাম প্রস্তাব করবার আগেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন কিনা কে জানে? অনেকে বলছে তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী ইসমেৎ পাশাই নাকি হবেন পরবর্ত্তী ডিকটেটর। ইসমেৎ পাশা তুর্কীর সৈনিকদলের খুব প্রিয়। একসময় ইসমেৎ পাশাই নাকি কামালকে হটাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু একদিন ইসমেৎ নিজেই হঠাৎ কোথায় হটে গেলেন! কেউ কেউ ফেবেল পাশার নাম করছে। ফেবেল পাশা বর্ত্তমান তুর্কীর সৈনিকবিভাগের বড় কর্ত্তা। কিন্তু যেই তুর্কীর অধিনায়ক হোন না কেন, কামাল আতাতুর্কের সমকক্ষ কেউ নন। কামালের মৃত্যুতে তুর্কীর ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মানী আসন্ন পরিবর্ত্তনের কোন দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়বে না। শকুনি দৃষ্টি নিয়ে অলক্ষ্যে বসে সে সব দেখছে।

রংমশালের পাঠকপাঠিকা ভাইবোন—

পূজোর পর তোমরা সবাই আবার যে যার পড়াশুনো কাজ নিয়ে পড়েছ। সামনেই পরীক্ষা। ছুটির ছাড়া-পাওয়া মনকে আবার লাগাম চড়িয়ে কাজে জুড়ে দিতে 'একটু সময় বোধ হয় অনেকেরই লাগে। মনটা তাজা হয়ে আসে বটে, অভ্যাসের একঘেয়েমির বাইরে গিয়ে, হাঁফ ছেড়ে, কিন্তু তেমনি কখন কখন একটু ঢিলেও হয়ে যায় অনেক দিন কোন শাসন না মেনে। লাগাম লাগাতেই প্রাণটা তাই উস্‌খুস্ করে একটু, একটু বেয়াড়াপণাও করতে ছাড়ে না। ছুটির রঙ যে এখনো তার আকাশে লেগে আছে, ছুটির হাওয়ার মর্ম্মর এখনো থামেনি তার মধ্যে।

ছুটির মর্ম্মর মনের মধ্যে থাক্—তাইত চাই! কিন্তু মনের এই ঢিলে হয়ে যাওয়াটাকে ভালো বলা যায় না কোন মতে। যে ছুটি কাজের টান না বাড়াতে পারে, কাজকে যা মধুর করে না তুলতে পারে তার ভেতর কোথায় কিছু গলদ নিশ্চয় আছে। ছুটি হল আমাদের মনের জানলা। ঘরের যেমন জানলা থাকার অত্যন্ত দরকার, বাইরের আলো হাওয়া ভেতরে আসবার জন্যে, ভেতরের দৃষ্টি সুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে যাবার জন্যে,—জানলা না থাকলে ঘরের যেমন কোন মানে বা মূল্য থাকে না, তেমনি মনেরও চাই ছুটির ফাঁক; সাধারণ দরকারের, অতি-কাছের জগৎটাই যাতে প্রধান হয়ে উঠে, আর সব না আড়াল করে দিতে পারে। কিন্তু ঘরের সঙ্গে জানলার সামঞ্জস্যও থাকা চাই। যদি তাদের সম্পর্কটা হয় ঝগড়ার তাহলে ফাঁকটাই বড় হয়ে সব জিনিষটা ফাঁকি হয়ে যাবে।

ছুটি মানে যে মনের আলসেমি নয়, ছাপান বই-এর পাতার 'মারজিনে'র মত তা যে কাজের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধে জড়ানো, সেটা বুঝলে আর ছুটির পর মনকে লাগাম লাগাবার কথাই তোলার দরকার হবে না।

—তোমাদের সম্পাদক মশাই

আমরা সকলের জন্য

রংমশাল দল

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়. নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলি হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি. একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার. তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করেছি—**রংমশাল দল।**

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্য যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের! দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে. সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো**। রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ে দরকার হয় সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হবে '**মশাল**'। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

সকলে আমাদের জন্য

নিয়মাবলী

রংমশাল দলের "ব্যাজ"

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে আলাদা কোন চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্তি হওয়া যাবে।

(৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার! সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, 'দিদিভাই' c/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোনও ব্যাপার—'দিদিভাই' এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

চন্দ্রকান্ত ৩০।১০।৩৮

রংমশাল দল
কুপন

নাম...গ্রাঃ নং.......................

জন্ম তারিখ....................স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী...

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর)...

ঠিকানা...

....

লেখনী বন্ধু চাই কিনা..

হবি (Hobby)..

নূতন ধাঁধা

লুকোন নাম

নীচের ত্বটি লাইনে ভারতবর্ষের পাচজন বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার নাম ও ত্বজন গ্রাহক গ্রাহিকা যাঁরা রংমশাল প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন (যাঁদের নাম রংমশালে প্রকাশিতও হয়েছে) তাঁদের নাম লুকোন আছে। তোমরা এই সাতজনের নাম বার করতে চেষ্টা কর দেখি :—

নবীনইন্দ্রকারআকুবরদন্দঘোলজঠাষরহরবরবিপ্রসাশি

নেড়ুলখাজিনীগফঅতুলারুহেরথনারোসনাপ্রসেসরশি

পত্রিকা পাবার ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে

শ্রাবণ মাসের বাড়ী-করা প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম। কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী—শিমলা শৈল।
২য়। শ্রীমান রথীন্দ্র সেন—দিনাজপুর।
বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ! পিন্টু, মিন্টু, ও স্থরথ বস্থ—হুগলী।

ভাদ্র মাসের জীবন কাহিনী প্রতিযোগিতায়

কোন রচনা পুরস্কার-যোগ্য হয় নাই।

স্থানাভাবে এবার গতমাসের শব্দ-চোকির ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভবপর হল না।

নূতন প্রতিযোগিতা

অঞ্জুলী স্মৃতি পুরস্কার

রংমশালের গ্রাহিকা ৺শ্রীঅঞ্জুলী সেনগুপ্তার স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা ত্বটি পুরস্কার ঘোষণা করছি। এই পুরস্কারের বিষয়—ছোট একটি কবিতা রচনা। কোন একটি ফুল নিয়ে এই কবিতাটি রচনা করতে হবে। ঝরঝরে ভাষায় ও ছন্দে কবিতাটি একটি ছোট্ট মালার মত করে গাঁথতে হবে।

কবিতাটি পাঠাবার শেষ দিন ১৫ই অগ্রহায়ণ। গ্রাহক গ্রাহিকা ও এজেন্টের মারফৎ যাঁরা রংমশাল নিয়ে থাকেন এই প্রতিযোগিতাটি কেবল তাঁদের জন্য। গ্রাঃ নং বা এজেন্টের নাম, বয়স ও পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর দিতে হবে।

রংমশাল দলের বন্ধু ভাইবোনেরা—

আগামী ৪ঠা অঘ্রাণ বিকেল ৪টায় ১০, ইন্দ্ররায় রোড (রংমশাল অফিসের পাশের রাস্তা) ভবানীপুরে দলের আসর বসবে। দেখাশোনা আলাপ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আমোদ প্রমোদেরও আয়োজন হবে। দেখো, আসতে যেন ভুল না হয়। সঙ্গে ব্যাজ এনো। তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভাইবন্ধু একজন করে আসতে পারবেন।

—সম্পাদক

কার্ত্তিকের শেষে রংমশাল অফিস থেকে প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

শেষটা এমাসের রংমশালও খানিকটা দেরী করেই বার হল। ছুটিতে সকলে বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তাড়াহুড়ো করেও সময় ঠিক রাখা গেল না। অঘ্রাণের রংমশাল মাসের গোড়াতেই বার হবে। পৌষ থেকে আমরা আগের মাসের শেষ তারিখেই পত্রিকা বার করে দেব।

তাড়াহুড়োয় কাজ ভাল হয় না। তবু এ মাসের রংমশাল পেয়ে তোমরা খুসীই হবে। অঘ্রাণ পৌষে পত্রিকা দেখে তোমরা চিনতে পারবে না, নতুন রকমের লেখা ছবি ইত্যাদি দিয়ে আমরা পত্রিকাখানা চমৎকার করে সাজাবো। এখন থেকে রংমশাল আমরা সত্যিকারের একখানা মূল্যবান পত্রিকা করতে চেষ্টা করব।

এমাসে স্থকুমার বাবুর 'জঙ্গল' উপন্যাস স্থরু হল। এদেশের শিশুসাহিত্যে 'জঙ্গল' উপন্যাস সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিষ। উপন্যাসের নায়কটি শুধু মানুষ, তার আশে পাশে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা কেউ মানুষ নয়—গভীর অরণ্যের প্রাণী। এ মাসে অস্থস্থ শরীর নিয়ে সম্পাদক মহাশয় 'পৃথিবী ছাড়িয়ে'র শেষ কিস্তি লিখে উঠতে পারেন নি। আগামী সংখ্যায় 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা নতুন একটি বিচিত্র উপন্যাস স্থরু হবে।

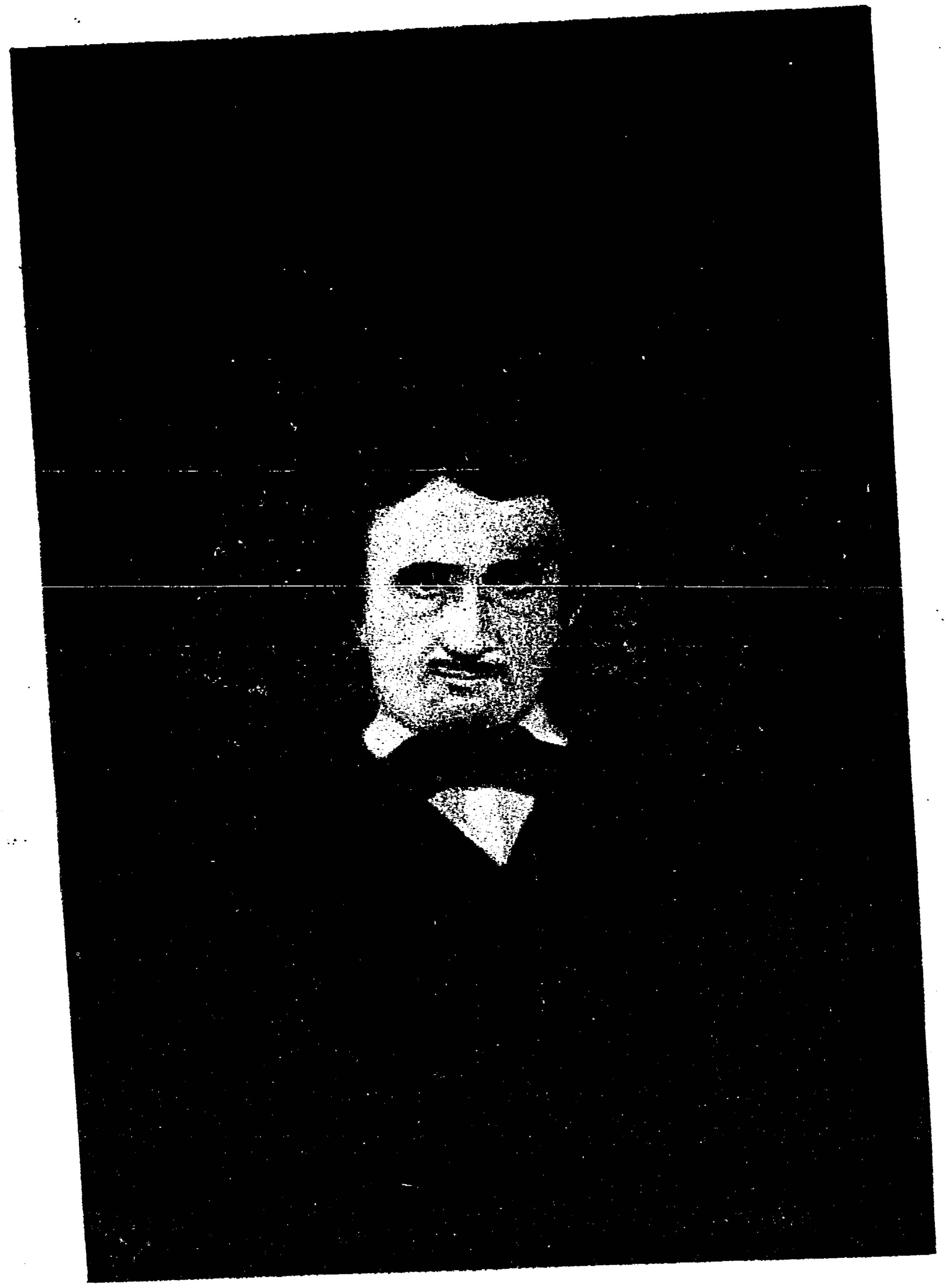

৭

রংমশাল দলের প্রতিযোগিতা

কেবল মাত্র দলের সভ্যদের জন্য

উপরকার ছবিখানা কার ? সেই মানুষটির নাম ধাম পেশা ও তাঁর জীবনকাহিনী রংমশালের এক পাতার মতন করে সোজা ঝরঝরে ভাষায় লিখতে হবে।

দুটি পুরস্কার থাকবে। একটি ছোটদের ও একটি বড়দের।

নাম গ্রাঃ নং বা এজেন্টের নাম, অভিভাবকের স্বাক্ষর ও বয়স দিতে ভুলবে না।

পাঠাবার শেষ দিন আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ।

ঝুঁটির বাহার (ফুলের না চুলের ?)

ছোট্ট বাক্স ক্যামেরায় তোলা ছবি, বড় আকারে "এনলার্জ্জ" (enlarge) করা হয়েছে। কেমন সুন্দর, স্পষ্ট ছবি উঠেছে দেখ।

১৪৪ পৃষ্ঠা

রংমশাল

তৃতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ
১৩৪৫

খুকুর রান্না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খুকুমণি রান্না করে খেলার ঘরে,
যজ্ঞিবাড়ি-ই কাক ওড়ে
আর চিল পড়ে।
—সে কি বিষম যজ্ঞি !

খুকুমণি রান্না করে কি ?
কালিয়া, পোলাও, কাবাব, কোর্ম্মা,
সুক্তো, পায়েস, ঘণ্ট, দোর্ম্মা
একটি পাহাড় বাট্না লাগে
এক সমুদ্দুর ঘি !
চাকা চাকা তিমির দাগা
হাঙর মাছের পেটি,
জেব্রা, জিরাফ, সিন্ধু-ঘোটক
যাহার ভাল যে-টি ;

খুকুমণি রান্না করে কি ?

ডিম এল সেই উট্ পাখীর আর
মুড়ো বোয়াল মাছের,
ভিয়েন হ'ল ভিসুভিয়াস্
তাত কি উনুন আঁচের !
কিস্কিন্ধ্যা ওজাড় করে
এল কলার মোচা,
শাক দ্বীপেতে যত ছিল
এল শাকের গোছা,
কচ্ছ দেশের কচু এল ওলন্দাজী ওল,
আলাস্কার আলু এবং পাটনাই পটোল,
সিমলা থেকে সীম এল আর
নিম্‌কামারীর নিম্ ;
—খুকুমণি হেঁসেলে হিম্‌সিম !

খুকুমণি রান্না করে,
পাত পেতেছে কারা ?
তুমি, আমি, পুসি বেড়াল
ভুলো হতচ্ছাড়া ;
—ওই ভুলো কুকুর !

ভুলো কুকুর

বাদশাহী গল্প

চার

—"পট্‌কান্‌ ফলে কোন্‌ গাছে বাদশা মশায় ?"

—"কেন, লট্‌কান্‌ গাছে। তুমি বলতো দাদামশায় চিৎপটাং ফলে কোন গাছে ?"

—"কেন, তৃপ্‌পতাং গাছে, ফলটি খেয়েছ কি তৃপ্ত হয়ে গেছ, আর খাবার ইচ্ছে হবে না। তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাও আর শুয়ে থাকো বিছানায়।"

—"খাবার ইচ্ছে হবে না ?"

—"না !"

—"চিঁড়ে ভাজা সামনে ধরে দিলেও না ?"

—"না !"

—"চিনে বাদাম ? গোলাপী রেউড়ি ? গরম ফুলুরি ? চকলেট ? বিস্কুট ? লজনঞ্জুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি ?"

—"কিছুনা !"

—"মিশির বোধহয় আজ সেই ফল খেয়েছে দাদামশায়, আমি দেখেছি খাটিয়ায় পড়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে—মটর চলবে না বলে পাঠিয়েছে—আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ!"

—"আরে সে ফল পেলে তো খাবে ! পৃথিবীতে জন্মায় না সে ফল—দেবলোকের গাছে স্বর্গের বাগানে ফলে। মিশির কাল মটর ভাজা খেয়েছে বেশী করে তাই পেট ফুলে ঢোল হয়েছে, উঠতে পারছে না, কাল ঠিক উঠবে।"

—"কাল রবিবার, ইস্কুলের ছুটি, উঠলেও আমি যাচ্ছিনে। সোমবারের আগে সেই গাছ একটা আনাতে পারো না দাদামশায় ?"

—"আমাদের যুধিষ্ঠির যদি বেঁচে থাকতো তো আনতে পারতো।"

—"যুধিষ্ঠির কে ?"

—"জানো না ?"

—"না, হাঁ মনে পড়েছে, ভীমের দাদা স্বর্গে হেঁটে গিয়েছিল !"

—"আরে সে যুধিষ্ঠির কেন হবে ! এ হল পরীক্ষিৎ মালীর ছেলে যুধিষ্ঠির ? ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়।

—"সে কি করতো ?"

—"উড়ে রামায়ণ পড়তো সন্ধ্যে বেলা, দিনের বেলায় সবজী বাগানে মাটি খুঁড়তো। সূর্য্যিকে বলতো সে 'মহাপড়ভু', আমাকে বলতো সে 'ড়বনীবাবু, অবধাড় নমসকাড়'; 'অ' বলতে সে বলতো 'ড়', 'র' বলতেও সে বলতো 'ড়'। অড়হর ডালকে সে বলতো 'ড়ড়র ডাল', রামায়ণকে বলতো 'ড়ামায়ণ', 'অ' গুলো সে যোগ করে দিত কথার শেষে। কানন্‌ বলতে বলতো 'কানন্অ'; শ্রাবণ বলতে বলতো 'সড়াবন্অ'।"

" 'আ' বলতে পারতো ?"

"এক একবার পারতো, এক একবার পারতো না। আম গাছকে কখনো বলতো 'অমগছ্অ' 'কখনো বলতো 'আম্বগাছ্অ'।"

—"তার পড়াশুনো খুব বেশী ছিল না বুঝি ?"

—"খুব ছিল, রামায়ণ মহাভারত গড় গড় করে পড়ে যেতো কিন্তু নিজের নাম যুধিষ্ঠির বলতে তার চক্ষুস্থির হয়ে যেতো।"

—"কি বলতো সে নিজের নাম ?"

—"আরে সেই নিয়েই তো কথা, শোন না বলি—

ছিরে মেথর ছিল ইংরাজি বলতে পাকা। মদ না খেলে সে সাধু বাংলায় কথা কইতো। মদ খেয়েছে কি বেরিয়েছে কুইক ইংলিশ ফর্‌ ফর্‌—ড্যাম্‌ ইউ রাস্কেল, গো টু হেল, ব্লখেড্‌—এক্‌স নম্বর ওয়ান, ব্লডি ফুল।

আমি তখন ভালো ইংরিজি শিখিনি। বিদ্যে ফলাতে গেলাম তার কাছে, শুধোলেম ইংরিজিতে—'ছিরে মেথর, হোয়াট নেম ইউ ?'

সে খাঁটি ইংরিজিতে জবাব দিলে—'মাই নেম্‌ ইজ শ্রীরাম—নট্‌ ছিরে মেথর।'

আমি বল্লেম—"মেথর নয় তো হোয়াট্‌ ইউ !"

সে হেসে বল্লে—"গো এণ্ড রীড—ফাষ্ট বুক, প্যারিচাঁদ সরকার—আপন্‌ গড্‌ আই এম নট্‌ মেথর, হাইকাষ্ট স্কেভেঞ্জার। দীন দরিদ্রকে উপহাস করিয়া লজ্জিত করিবেন না—আমি অতি অজ্ঞ।"

—"তুমি কি করলে দাদামশায় ?"

—"আরে ভাই কি ইংরিজি কি বাংলাতে হার মেনে আমি বোকা বনে গেলাম—কান লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়।"

—"তারপর ?"

—"তারপর বলি শোন। ইস্কুলে আমার পাশে যে বসতো, সে ডবল প্রমোশান পেয়ে ক্লাস উঠে গেল—আমি ইংরেজি বাংলা দুয়ে ফেল হয়ে হেডমাষ্টারের হাতে পায়ে ধরাধরি করে ক্লাসের সেকেণ্ড বেঞ্চিতে বসবার হুকুম আদায় করে পূজোর ছুটিতে বাড়ি এলেম যখন তখন হাফ হলিডের লেজুরটুকু আছে বাকিটা বাদ।"

—"মার খেলে না বাড়ীতে এসে দাদামশায় ?"

—"ক্ষিদে ছিল না ভাই, দুটো কুচো গজা খেলাম, রামলাল বল্লে 'হয়েছে তো প্রমোশন ?' আমি বল্লেম—'হয়েছে, দুধ খাবো না, নিয়ে যাও।' প্রমোশান নিয়ে আর কিছু গোলমাল হল না।"

—"কেন ?"

—"আবার কেন ? দুধের বাটি চাপা পড়ে গেল।"

—"তারপর ?"

—"কত আর দুধের বাটি চাপা দিই। মাষ্টার গেল টের পেয়ে--সেকেণ্ড বেঞ্চির উপরে আর উঠতে প্রমোশান হয় নি। 'দী র‍্যাম' একশোবার তার মানে একশো বার লেখার হুকুম দিয়ে পূজোর ছুটিতে বাড়ী গেল। ইস্কুল ঘোড়া পূজোর ছুটি পেলে, আক্কেল সহিস সেও পেলো—কেবল আমিই পেলেম না ইস্কুলের পড়া থেকে ছুটি। রামলাল চাকর খাতা বেঁধে আনলে রুল টেনে।

—"কি মুস্কিল, দাদামশায় কি করলে ?"

—"কি আর করবো! রুল টানা খাতার পাতা তো নয়, যেন ইঁদুর কলের শিক পরানো দরজা!"

প্রথম পাতায় 'দী র‍্যাম' ভর্ত্তি করতে, আর 'দী র‍্যাম' কটা পড়লো খাঁচাকলে গুনতে বষ্ঠির সকাল কাটলো। দ্বিতীয় পাতা লিখবো, গেছি ভুলে 'দী র‍্যাম্' মানে। দী র‍্যাম মানে আর কিছুতে মনে পড়ে না—'দী র‍্যাম' মানে কি লিখি! মানের পাতা খালি রেখে 'যাই' বলে এক হাঁক দিয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়—বই সেলেট খাতা ফেলে। এমনি রোজই হয়, 'দী র‍্যাম্' পর্য্যন্ত এগিয়ে মানেতে গিয়ে ঠেকি। হাই তুলছো যে বাদশা বাবু, ভালো লাগছেনা গল্প ?"

—"লা-গ-চে বলে যাও।"

—"ঐ খাতা লিখতে লিখতে কোন দিন ঘুম পায়, কোন দিন মানে ভেবে ঘুম হয়না রাতে। পাছে হঠাৎ ছুটি ফুরিয়ে যায় মাষ্টার এসে পড়ে—এই ভাবনায় ছুটোছুটি করতে

পারিনে ভালো করে, ক্ষিদেও হয়না, দুধের বাটি ভর্ত্তিই থাকে পড়ে রাতের বেলায়। এই অবস্থায় একদিন ছিরে মেথরের শরণ নিলুম।

—'দী র‍্যামের' মানে বাংলায় বলতো দেখি, কেমন পারো ?'

—'কেন ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তা।'

—বস্ আর পায় কে! পাতাজোড়া গোটা গোটা 'দী র‍্যাম' আর ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তাতে খাঁচা কল ভর্ত্তি করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ভাই তোমার দাদামশায়।"

—"তারপর ?"

—"দিন দিন মোটাতে থাকলেম, দুধের ক্ষিধে বেড়ে গেল। রামলাল থেকে থেকে ভয় দেখায়—'খাতা লিখছ না বলে দেবো।'

—'দিও বলে, আমি খাতা লিখে শেষ করে দিয়েছি—দেখে নাও।'

'এক পাতায় একশোটা করে লেখা দরকার, এ যে একটাতেই পাতা ভর্ত্তি করে রেখেছ। এ খাতা চলবেনা আমি আবার খাতা আনবো।'

—'বারে আমি দুবার করে খাতা লিখবো নাকি ?'

—'চল খাতাঞ্চিখানায়, যোগেশ দাদা এর বিচার করবেন।'

—'চল, চলনা তুমি আগে চল, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

—"গেলে না সরলে মাঝপথ থেকে দাদামশায় ?"

—"আরে ভাই সে রামলাল তাতে কদিন দুধ না পেয়ে চটেছে—গ্রেপ্তার করে হাজির করলে খাতাঞ্চিখানায় বিচারকের সামনে। কদম ছাঁটা পাকা চুল বুড়ো বাঘের মত পাকা গোঁফ গলায় শাদা সাপের মত পৈতে, বড়ো বড়ো চোখ সামনে খাতা বাক্সো পাশে রূপো বাঁধা হুঁকো—ফরাসে বসে উঁচু বৈঠকের পরে।

—'কি রামলাল, ছোট বাবাকে ধরেছ কোন অপরাধে ?'

—'আজ্ঞে খাতা লেখায় ফাঁকি দিচ্ছেন।'

—'খাতা দাও, এক কল্কি তামাক সাজো দেখি। বোসো ছোটবাবা তক্তায় উঠে বসো।'

আমি উঠে বসতে বল্লেন—'গোবর্দ্ধন দাও তো তোমার চশমাটা, ভালো করে বিচার করে দেখি খাতা।'

আমি বল্লেম—'চশমা যে তোমার নাকেই রয়েছে যোগেশ দা।'

—'ছোট বাবা হাসালে। সুক্ষ্ম বিচার করতে হলে ডবল চশমার দরকার।'

—আমি বল্লেম—'আমার দোষ নেই, দুধের বাটি দিইনি বলে রামলাল রেগেছে।'

—'আচ্ছা সে বিচার পরে, দেখি খাতা, কি লিখতে দিয়েছিল মাষ্টার ?'

—'দী র‍্যাম আর তার বাংলা মানে।'

—'বেশ, দী র‍্যাম—এতো দিব্বি হয়েছে, পাতা জোড়া খাতা দেখিতো মানেটা —'ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তা' বলেই বাক্সতে এক চাপড়। রামলাল হুঁকো হাতে হাজির ঠিক সময়ে। যোগেশদা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—হুঁকো হাতে পেয়ে ঠাণ্ডা।'

—'রামলাল ছোট বাবার দুধ কতটা বরাদ্দ ?'

—'আজ্ঞে দেড় সের দুবেলা।'

—'গোবর্দ্ধন দেখতো খাতা।'

গোবর্দ্ধন খাতা ধরে দিলে কিছু না বলে।

—'যাও ছোটবাবা তুমি খালাস—লেখা খুব ভালো হয়েছে। আমি দৌড়।"

—"তারপর দাদামশায় রামলালের কি হল ?"

—"তা দেখবার ইচ্ছেও হলনা সময় ও হলনা। বৈকেলে দেখি দুধের বাটিতে পুরু সর—'ও রামলাল আমি সর খাইনে যে।'

—'হুকুম হয়েছে ঘন দুধ খাওয়াতে যোগেশ মজুমদারের।'

—'সর তুলে নাও।'

—'এক দিক ভেঙ্গে চুমুক দাওনা—দুধ আছে তলায়।'

চুমুক দিই' দুধের গন্ধ পাই দুধ পাইনে।

—'একি হল ? দুধ কোথা গেল ?'

—'দুধ ঘন করতে করতে মরে গেছে—সরটা খেয়ে ফেল।'

—'না কাল থেকে বল্‌কা দুধই দিও।'

—'তাই হবে কিন্তু মজুন্দার মশায় আর না টের পায়, আমার তা হলে তোমার চাকরী করা চলবেনা।'

—'কোথায় যাবে রামলাল ?'

—'জবাব হলে আর কোথায় যাবো ?—বর্দ্ধমানে দেশে চলে যাবো।'

—'তা হলে সীতে ভোগ এনে দেবে কে ?'

—'তবে আর নালিশ করোনা দুধের।'

—'করি তো আমার নাম নয়—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক

গত ৯ই নভেম্বর ইস্তাম্বুল সহরে সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই তুরস্কের প্রভাতসূর্য্য অস্তমিত হ'ল। ঐ দিন প্রভাতে ৭—৫ মিনিটে বর্ত্তমান তুরস্কের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিনায়ক, গাজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক দেহত্যাগ করেন।

কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত তোমরা আগেই রংমশালের পাতায় পড়েছ। তাঁর নামের মধ্যে দুটি শব্দ লক্ষ্য করবার বিষয়—গাজী ও কামাল। 'কামাল' নাম তাঁর অঙ্কের মাষ্টার-মশায়ের দেওয়া, অর্থ, সাবাস্! 'গাজী' অর্থে বিজেতা। ১৯২১ সালে ২২ দিন ক্রমান্বয় যুদ্ধের পর কামাল যখন গ্রীক সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করেন এবং তুরস্কের জাতীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জাতীয় মহাসভা তাঁকে 'গাজী' উপাধিতে বিভূষিত করেন।

যে তরুণ ছাত্র তার গণিত-শিক্ষকের কাছ থেকে 'কামাল' আখ্যা পান, উত্তর জীবনে মুগ্ধ পৃথিবী তাকেই আবার বলেছিল, কামাল—সাবাস্। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় গৌরবের বস্তু বোধ হয় আর নেই। বাল্যকালে কামাল তাঁর পিতাকে হারান, কিন্তু মায়ের স্নেহ এবং শাসন থেকে বঞ্চিত হন নি। যুবক এবং প্রবীণ কামাল হতাশ হয়ে অনেকবার ছুটে এসেছেন মায়ের কাছে সান্ত্বনা পেতে। তাঁর পিতা ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী এবং কামাল নিজেও জীবন আরম্ভ করেন অখ্যাতনামা সৈনিকরূপে। কিন্তু জীবনের শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয় ভাগ্যের পরীক্ষা। যেদিন তাঁর সেনাবিভাগে নিয়োগের বার্ত্তা প্রকাশিত হয় সেদিনই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তিনি গ্রেফ্‌তার হন এবং ড্যামাস্কাসে নির্ব্বাসিত হন।

ড্যামাস্কাসে নির্ব্বাসন কামালের জীবনে বৃথা হয় নি। এখানেই কামাল প্রথম দেখেন, বিরাট অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধোগতির চিহ্ন। তরুণ সৈনিক কামালের রাজনীতির প্রতি চিরকালই টান ছিল, কিন্তু ড্যামাস্কাসে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হ'ল। আরম্ভ হ'ল গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা, তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধারের জন্য। আরম্ভ হ'ল কামালের বহুমুখী প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতিভা একমুখী হয়। অর্থাৎ তাঁদের প্রতিভা যুদ্ধক্ষেত্রে বা সামরিক কার্য্যকলাপেই আবদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক ব্যাপারে বা রাষ্ট্রশাসনে খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবার অভিলাষ বা ক্ষমতা তাঁদের প্রায়ই থাকে না।

সামাজিক সংস্কার কার্য্যে তো নয়ই। তুরস্কের সৌভাগ্যের বিষয় যে কামাল আতাতুর্ক'এর প্রতিভা একমুখী ছিল না। কামালের প্রতিভা যদি সামরিক ব্যাপারেই আবদ্ধ থাকত, একথা নিঃসন্দেহ যে তুরস্কের স্বাধীনতা এতটা স্বষ্টিকরী হত না। কামালের যুদ্ধকৌশলে দেশ হয় তো বিজাতীয় পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্তি পেত, কিন্তু দেশের ভিতরকার শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেত না।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করবে, ভিতরকার শত্রু কে? এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যায় না। ভিতরের শত্রু আমরা নিজেরা। আমাদের চরিত্রের অবনতি, সামাজিক কুসংস্কার, জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব, গতানুগতিকতা —দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় এর চেয়ে বেশী কি আছে? কামালের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে তুরস্কের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সভ্য-জগতের কাছে সেদিন সে অবহেলার—হয় তো অবজ্ঞার পাত্র; বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে সে ছিল অপাংক্তেয়। রাজনীতি ছিল ঘরোয়া কলহ-বিবাদ-হিংসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। জাতীয় স্বার্থ ও রাজ-স্বার্থ ছিল বিপরীত ভাবাপন্ন। কামালের জীবনে বহুবার এইরূপ প্রভুর কর্ম্মে ও বীরের ধর্ম্মে সংঘাত লেগেছিল। কিন্তু প্রতিবারই কামাল বীরের ধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলে বরণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই একনিষ্ঠতা, একান্ত আত্মনির্ভরতা লক্ষ্য করবার বিষয়। যখন সমগ্র তুরস্ক তাঁকে সন্দেহের চক্ষে, ভয়ের চক্ষে দেখছে, অবিশ্বাস করছে, হয়তো তিনি নিরাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, তবুও তিনি তাঁর পথ হারান নি। সেই পথ তুরস্কের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পথ। কামাল শুধু বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। সাধারণতঃ রাজনীতিক বললে যা আমরা বুঝি—অর্থাৎ "বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কাণে, কি যেন করা উচিত ছিল কি করি তা কে জানে" এই ধরণের রাজনীতি যাঁরা প্রচার করেন ও বক্তৃতা দেন, কামালকে এই ধরণের রাজনীতিক বললে তাঁর স্মৃতির অবমাননা করা হবে। কামাল ছিলেন তুরস্কের জাতীয়তা গঠনকারী। দশ বৎসরে তিনি শতাব্দীর চেষ্টা সফল করেছেন, একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। অপাংক্তেয় তুরস্ককে তিনি জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন না হোক, অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে অধিকার দিয়ে গেছেন।

এই চেষ্টার প্রতীকরূপে কামালকে আমরা পাই দুইটি বিভিন্নরূপে। প্রথমতঃ বীর কামাল, দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিক এবং সমাজগঠনকারী কামাল। দার্দ্দেনালিশ যুদ্ধে যখন কামাল শক্তিশালী ব্রিটিশবাহিনীর প্রতিরোধ করেন—শুধু প্রতিরোধ নয়, বিধ্বস্ত করেন তখন বিস্মিত য়ুরোপ তাঁকে বলেছিল—কামাল—সাবাস্! *আবার ১৯২১ সালে য়ুরোপীয়

* Chonuk Bair (Dardenelles) এর যুদ্ধে তুরস্কের ৮ম এবং ১৯শ বিভাগীয় সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যদল 6th North Lancashires এবং 5th Wiltshires সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

সম্মিলিত শক্তির প্ররোচনায় উদ্বদ্ধ গ্রীকবাহিনীকে যখন তিনি সাকারিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে' স্মার্ণায় গ্রীক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন, তখন তাঁর দেশবাসী তাঁকে বলেছিল, গাজী কামাল, সাবাস বিজেতা! বীর কামালের নাম তুরস্কের ইতিহাসে এই দুটি স্মরণীয় ঘটনায় অমর হয়ে থাকবে।

ছোট ছোট ঘটনা থেকে মানুষকে চেনা যায়। দার্দ্দেনালিশ যুদ্ধের কথাই বলি। সত্য কথা, গল্প নয়। তাঁর সৈন্যদলকে সাহস দেবার জন্যে কামাল অনেক সময় অযথা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, প্রতিবারই যেন কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে। একবার যুদ্ধকালে কামাল একটা নূতন ট্রেঞ্চের নিকট বসেছিলেন এমন সময় শত্রুপক্ষ সেই ট্রেঞ্চ অভিমুখে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। গোলার উপর গোলা পড়তে থাকে চারিধারে, আর কামাল সেখানে বসে নিশ্চিন্তমনে ধূমপান করছেন! তাঁর সহ-সেনানায়করা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন সেখান থেকে তফাতে আশ্রয় নেবার জন্য। কামাল হাসিমুখে তাঁদের বল্লেন, "আমি যদি এখন ভীরুর মত আশ্রয় খুঁজি, আমার সৈন্যদল কি মনে করবে? তারা কি প্রাণ দিচ্ছে না?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কামালের চারিধারে গোলাবর্ষণ-সত্ত্বেও কামালের কেশাগ্র পর্য্যন্ত আহত হয় নি।

আরেকবার কামাল গ্যালিপলি থেকে মোটরে আসছিলেন, এমন সময় একটা ব্রিটিশ হাইড্রোপ্লেন (এরোপ্লেন যা' জলেও ভেসে যেতে পারে) তাঁর গাড়ীর উপর বোমা ফেলে। ফলে রাস্তায় সম্মুখ এবং পশ্চাদ্ভাগ বিধ্বস্ত হয়, গাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী কাচ ভেঙ্গে যায়, ড্রাইভার নিহত হয়, কিন্তু কামালের কোন ক্ষতি হয় না। ব্যাপারটা আশ্চর্য্য নয় কি? আরেকবার রাত্রি ৩ টায় চোনুক বেয়ারের বিখ্যাত যুদ্ধে কামাল তাঁর ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে আসছেন এমন সময়ে ইংরাজ কামান নিঃসৃত একটি গোলা ঠিক তাঁর অনতিদূরেই পড়ে। গোলার একটা টুকরা লাগে কামালের হাতঘড়ির উপর। হাতঘড়িটি অবশ্য চুর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কামালের একটি কেশাগ্রও জখম হয় নি। তুরস্কের ভাগ্যবিধাতা হয় তো নিজে কামালের জীবনরক্ষার ভার নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ জয় করে কামাল স্থির থাকতে পারেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীকে নূতন করে গড়ে তোলা। সুলতানী রাজত্বে তুরস্ক হয়ে উঠেছিল বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক, কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ হয়ে উঠেছিল বিদেশী শক্তির প্রতিভূদের লীলাভূমি। দেশের সর্ব্বত্রই গুপ্তচরের হুমকিতে লোকে সন্ত্রস্ত থাকতো, তিনটি লোক জমা হলেই সেখানে আসতো একটি চতুর্থ লোক, গুপ্তচর। সুলতান নিজে প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষে বিদেশী শক্তির বশ্যতা স্বীকার করায় তুরস্ক জাতির বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তারা খুঁজছিল এমন কাউকে

যার মন্ত্র হবে দেশের স্বাধীনতা এবং চাইবে তুরস্কের ভীরু, কাপুরুষ স্বার্থান্ধ সুলতানকে সরিয়ে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা। কামাল দেশবাসীর কাছে সেই মন্ত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু এই মন্ত্রের সাধন যুদ্ধ জয় অপেক্ষাও কঠিন। বাহিরের শত্রুকে চেনা যায়, কিন্তু ঘরের শত্রুকে চেনা যায় না। কিন্তু কামাল ছিলেন দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক, তাঁর লক্ষ্য হতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত হন নি। কামালের চরিত্রের একটা গুণ ছিল যে, যে কার্য্যে যত বিপদ বেশী, যে কার্য্য যত বেশী কঠিন, সেই কার্য্যেই তার উৎসাহ তত বেশী। অনেক বাধা বিপত্তির পর, ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩—ঠিক পনর বৎসর পূর্ব্বে, কামাল তুরস্কে গণতন্ত্রের ঘোষণা করলেন। সুলতান-খলিফার রাজত্ব তুরস্কের ইতিহাসে নির্ব্বাপিত হন।

দেশে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা হলেও কামালের কাজ শেষ হল না। বরং তাঁর সত্যকারের কাজ—জাতীয় জীবন পুনর্গঠন—আরম্ভ হল। কামাল আতাতুর্ক নূতন গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হলেন। নব-উদ্বুদ্ধ প্রজাশক্তির প্রথম অধিনায়করূপে তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিকের উন্মেষ হল। তুরস্ক কামালকে পেলে সমাজসংস্কারক রূপে। মুসলমানের মত সংরক্ষণশীল জাতির মধ্যে সমাজসংস্কার যে কী কঠিন কাজ তা বর্ণনা করা যায় না। কামাল সেই কার্যে অগ্রণী হলেন। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির! আরম্ভ হ'ল সমাজসংস্কার। আরম্ভ হ'ল দশ বৎসরের মধ্যে একশ' বৎসরের ইতিহাস লেখা। কামালের আদর্শ হ'ল য়ুরোপীয় সভ্যতা। মধ্যযুগ প্রয়াসী অ-সভ্যতার কবল থেকে মুক্ত ক'রে তুরস্ককে য়ুরোপের অঙ্গীভূত করা হ'ল কামালের সংকল্প। রাষ্ট্রশাসনের খুঁটিনাটি কামাল হাতে নিলেন। আলস্যপ্রবণ সুলতানী রাজত্বের পরিবর্ত্তে এলো একটা বিরাট শক্তির প্রেরণা। য়ুরোপীয় আচার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে' তুরস্কের নবজীবন আরম্ভ হল। জাতীয়তাকে মৌলানা মৌলভীদের অন্ধ কারাগার হতেঁ উদ্ধার করে আনা হল য়ুরোপীয় সভ্যতার আলো হাওয়ার মাঝখানে। প্রতিবাদ হল, বাধা হল, কামালের উপর অতর্কিত আক্রমণও হ'ল। কিন্তু যে ব্যক্তি দার্দ্দেনালিসের উপান্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে ভয় পায় নি, সে কি ভয় পায় এই প্রতিবাদ এবং বাধায়?

দ্রুত চললো কামালের সংস্কারকার্য্য। নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি হলো। বিস্তৃত ভূমিকা বা আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কারণ কামালের হুকুমই হ'ল আইন! হুকুম হল, কেউ ফেজ পরতে পারবে না। হ্যাট পরতে হবে। প্রতিবাদ হল, হ্যাট কাফেরে পরে। কেউ ফেজ ছাড়লো, কেউ ছাড়লো না। হুকুম হলো যারা ফেজ ছাড়বে না তারা হাজতে যাবে এবং পুলিশের হাতে মার খাবে। গেলো সব ফেজ! এদিকে আবার হ্যাট পাওয়া

যায় না। শেষকালে লোকে মেয়েলি হ্যাটও পরতে লাগলো। দোকানীদের খুব মজা! চড়াদরে হ্যাট বিক্রী হতে লাগলো।

হুকুম হলো, মেয়েদের বুরখা ছাড়তে হবে, জুজুবুড়ী সেজে বেড়ালে চলবে না। নারী পুরুষের সমান অধিকার হবে। আজ তুরস্কের নারী য়ুরোপের যে কোনো দেশের নারীর সমকক্ষ। মেয়েরা ব্যায়াম শিখছে, টেনিস খেলছে বক্তৃতা শুনছে, ঘরের বাইরে যে জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে যোগ রাখছে। গ্রামে গ্রামে বসেছে Peoples' House—সেখানে পুরুষ মেয়ে শিল্পসাহিত্যকলা আলোচনা করছে, তুরস্কের নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। দেড় হাজার বৎসরের পুঞ্জীকৃত সামাজিক আবর্জ্জনা বৃহত্তর পৃথিবীর সভ্যতার হাওয়ায় তুরস্কের অতীত ইতিহাসে বিলীন হয়ে গেছে। আজ প্রায় কুড়ি লক্ষ নারী ভোটের অধিকার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, নব-নির্ব্বাচিত আইন সভায় ১৫ জন নারী সভ্যা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দশজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, চারজন টাউন কাউন্সিলের সদস্য, একজন ডাক্তার এবং দুজন কৃষিজীবিনী।

তুরস্কের ভাষা থেকে আরবী এবং ফার্সী শব্দ উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং সেই সমস্ত শব্দের তুর্কী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। আরবী হরপ উঠিয়ে তার বদলে রোমান হরপ (অর্থাৎ যেমন ইংরাজী হরপ) বসান হয়েছে। কামাল নিজে ব্ল্যাকবোর্ড এবং খড়ি হাতে ঘুরেছেন রোমান হরপের উপকারিতা দেখাবার জন্য।

কামাল যখন প্রথম এই সংস্কারকার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তুরস্কের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসী ছিল অশিক্ষিত। আজ ঘরে ঘরে শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আজ তুরস্কের সহর যে কোন য়ুরোপীয় সহরের সমকক্ষ। অথচ তুরস্কের প্রধান সহর এঙ্গোরা আগে ছিল কাদায় ভরা, পর্ণকুটির ছিল সাধারণের আস্তানা। সে এঙ্গোরাকে আজ আর চেনা যায় না। শিল্পে, বাণিজ্যে, চারুকলায় আজ তুরস্ক প্রাচ্য প্রগতিবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে।

৬০ বৎসর বয়সে কামাল আজ ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। রেখে গেছেন তার বিরাট কর্ম্মশক্তির উদাহরণ। যে য়ুরোপীয় শক্তিসমুদয় তুরস্ককে অবজ্ঞা করত, আজ তারা তুরস্ককে তাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছে। বিদেশী আচার ব্যবহার গ্রহণ করেও তুরস্ক তার সত্ত্বা হারায় নি। আজ তুরস্কের দিকে চেয়ে এবং তার অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করে' বলতে ইচ্ছা হয় না কি—কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই!

ব্যাঙের পাতা

ঘ্যাঙর ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্

অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাঙলা থেকে চলতি বাংলায় তর্জমা করলে এর মানে হয়—এ পাতাটা আমার।

শুনেই বুঝি চোখ কপালে উঠলো, মুখটা হয়ে উঠল, হাঁড়ির মত!

কেন বলত বাপু? আমাদের কি একটা পাতা থাকতে নেই?

তোমাদের ত কত কাগজ আছে—কাগজের কত ভাগ বিভাগ—গোটা রংমশালটাই তোমাদের। আর আমাদের ত খালি একটি পাতা বই ত নয়। তাতেই এত হিংসে!

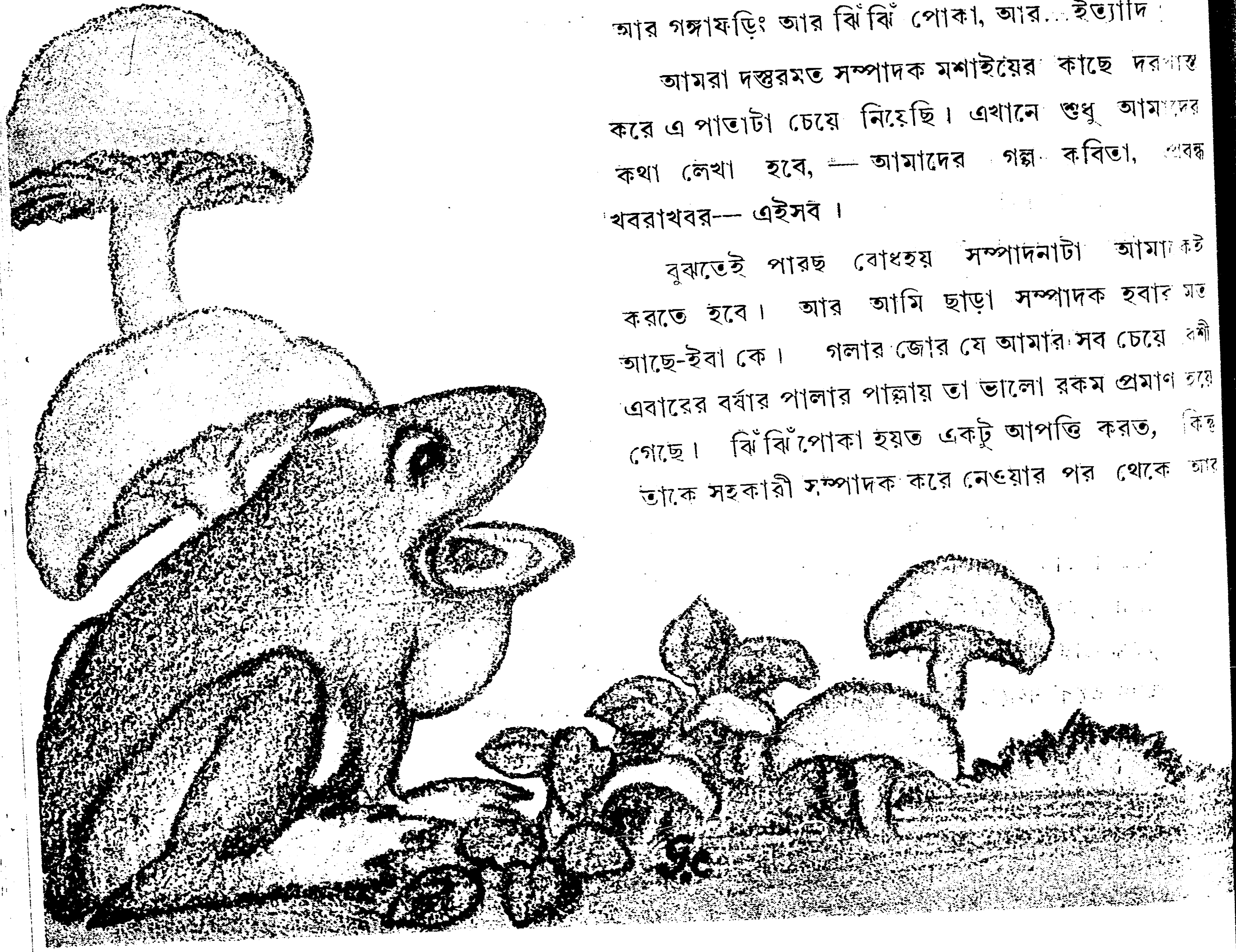

আমরা কি এতই ফেলনা?—আমরা মানে, আমি, আর গঙ্গাফড়িং আর ঝিঁঝিঁ পোকা, আর...ইত্যাদি।

আমরা দস্তুরমত সম্পাদক মশাইয়ের কাছে দরখাস্ত করে এ পাতাটা চেয়ে নিয়েছি। এখানে শুধু আমাদের কথা লেখা হবে,—আমাদের গল্প কবিতা, প্রবন্ধ খবরাখবর—এইসব।

বুঝতেই পারছ বোধহয় সম্পাদনাটা আমাকেই করতে হবে। আর আমি ছাড়া সম্পাদক হবার মত আছে-ইবা কে। গলার জোর যে আমার সব চেয়ে বেশী এবারের বর্ষার পালার পাল্লায় তা ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁপোকা হয়ত একটু আপত্তি করত, কিন্তু তাকে সহকারী সম্পাদক করে নেওয়ার পর থেকে আর সে গোলমাল করেনি। ঝিঁঝিঁ পোকার ওপর আমার অবশ্য বিশেষ ভরসা নেই। তার স্টাইলটা আমার, একদম পছন্দসই নয়—কিন্তু একজন কাউকে নেওয়া 'ত দরকার। ঝক্কি অবশ্য সব আমাকেই পোয়াতে হবে।

তোমাদের কিরকম লাগবে অবশ্য জানি না! তোমরা আমাদের মানতেই চাও না। ছাপাখানায় ত আর একটু হলেই ব্যাঙের পাতাকে ব্যাঙের ছাতা করে বসেছিল! ভাগ্যিস শেষ প্রুফটা দেখেছিলুম।

ব্যাঙের পাতাকে ছাতা ভাবা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়! আর এ অন্যায় ভুলটা দেখি তোমরা সবাই কর। ব্যাঙ হলেই যেন ছাতা থাকতে হবে। কেন হে বাপু? আর কিছু যেন থাকতে নেই।

আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, ও ছাতার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আসলে আমাদের কোন ছাতা-ই নেই। ছাতা ব্যবহার করা আমাদের শাস্ত্রে বারণ। জল কাদায় কেউ ছাতা নিলে আর ব্যাঙ সমাজে মুখ দেখাতে হবে না তাকে। তখখুনি একঘরে!

সুতরাং ব্যাঙের ছাতা বল্লে যে আমাদের গালাগাল দেওয়া হয় একথাটা মনে রেখো।

আমাদের সম্বন্ধে তোমাদের আরো অনেকগুলো অত্যন্ত ভুল ধারণা আছে। না জেনে শুনে তোমরা যা খুসি বলে বসো—যেমন কথায় কথায় আমাদের অপমান করে বল—ব্যাঙের আধুলি!

পরের বারে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আজ এই পর্য্যন্ত!

পুঃ—স্থানাভাবে এবার ঝিঁঝিঁ পোকার কবিতাটা ছাপা হ'ল না বলে সে অত্যন্ত দুঃখিত।

আমি কিন্তু নয়।

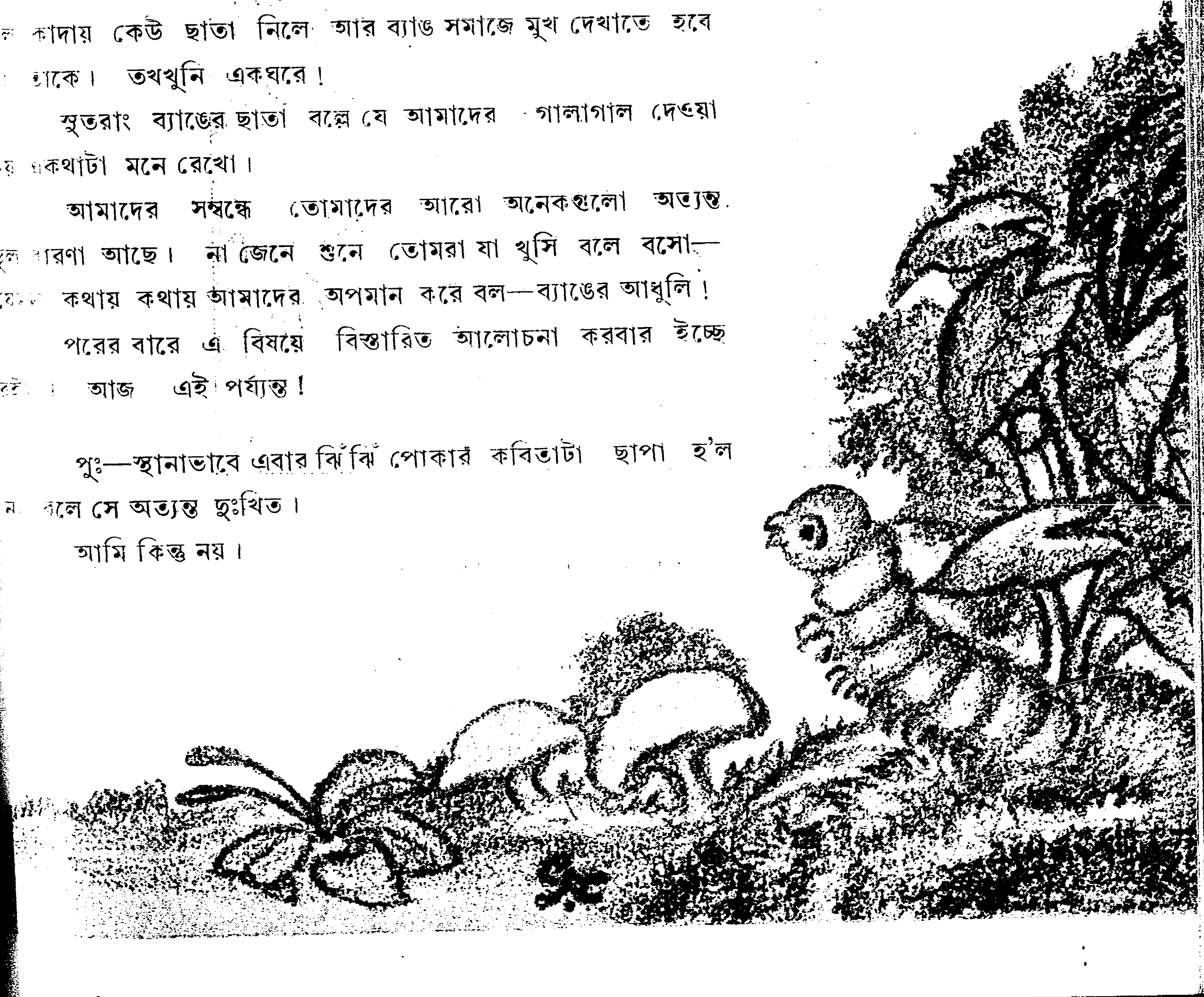

সোডার বোতল

বোতল হুঁ হুঁ বোতল নয়
ফোঁস ফোঁসিয়ে কোন্ কথা কয়
থামরে বাপু থাম
ছেঁই ছেঁই ছেঁই শোন্‌না মানা
বে-আক্কেলে ভূতের ছানা
ছুটল কালো ঘাম।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এরপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। দেখতে দেখতে বনে বর্ষা এসে গেল। গারো পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে পাগলা হাতীর মত দলে দলে এল কালো মেঘ, শালের দলের হাত ছানিতে বাঁশঝাড়ের ইসারায়। সেই সঙ্গে এল টিয়া পাখীর দল আর বন কবুতর। তারপরে কোথা থেকে কোন বনান্তর থেকে, কত পাহাড় পার হয়ে এল নালুখ।

ভাল্লুকদের যখন বাচ্ছা হয় তখন ভাল্লুক আর ভাল্লুক গিন্নীর একবছরের ছাড়াছাড়ি। সেই একটা বছর ভাল্লুক গিন্নী তার ছানাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ছানাদের চোখ ফোটান, মানুষ করা তার তখন কত কাজ। ভাল্লুক মশাই তখন বিস্তৃত পৃথিবীটা একটু দেখবার জন্যে, বনান্তরের স্বাদ পেতে দূরে সরে যান। আবার একবছর পরে পুরোণ বাসায় ফেরা। তখন থেকে বাচ্ছাদের ভার বাপের উপর। তখন থেকে কর্ত্তা ভাল্লুকের হাতে ছানারা বনের পথ একা একা চিনতে শেখে, বড় জানোয়ার শিকার করতে শেখে, বনের নিয়ম কানুন মুখস্থ করে। পৃথিবীকে একা মুখোমুখী চেনবার একটা শিক্ষা দরকার। মায়ের কাছে সেটা হয় না—মায়েদের মন বড় নরম, বড় স্নেহশীল, কঠোরতা শেখাবার শক্তি তাদের নেই। তখন দরকার হয় বিজয়ী বীর পুরুষের।

গুহার সামনে এসে তাই নালুখ বর্ষার বিদ্যুৎভরা মেঘের মত একটা গম্ভীর গর্জ্জন ছাড়ল প্রথমে তারপরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁক দিল—কই গো গিন্নী বাচ্ছারা কতবড় হোল ? আলাপ টালাপ করিয়ে দাও।

ভাল্লুকমা গুহার মুখ থেকে মুখ বার করে বলল—অর্র্ ভাল্লুক জবাব দিল—হ্র্র্।

ভাল্লুক গিন্নী বেরিয়ে এল। তার পরে কর্ত্তাগিন্নী কাছাকাছি এসে নাক শুঁকে পরস্পরের পুরোণ আলাপ ঝালিয়ে নিল। তখন ভাল্লুকমা ডাকল—কইরে বাছারা বেরিয়ে আয় ! গুহার মুখ থেকে প্রথমে বেরোল কালা তার পেছনে দুই ভাই।

এই দেখ তোদের বাপ।

নালুখ আপাদমস্তক তার ছানাদের একবার দেখে নিল তারপরে এগিয়ে গিয়ে কালাকে তার প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে মারল এক ঠেলা। কালা গড়িয়ে গিয়ে একপাশে পড়ল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ ও করল না। নালুখ বলল—সাবাস বেটা জোয়ান হবে।

ভাল্লুক মায়ের বুক গর্ব্বে ভরে উঠল।

ঠিক সেই সময় গুহার মুখে হামা দিতে দিতে বেরিয়ে এল মংলু। গুহার মুখে মুখ বার করে ভাল্লুক মায়ের দিকে চেয়ে সে বলল—তা-তা-তা।

নালুখ তার দুই থাবা দিয়ে কালাকে কুস্তির আর একটা প্যাঁচ মারতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।—ও কে ?

ভাল্লুকগিন্নী জবাব দিল—ও মংলু টিকটিকি, আমার ছেলে।

—সে কি ? আমার বাচ্ছা ?

নালুখ অবাক হয়ে ভালুক গিন্নীর মুখের দিকে তাকাল।—না গো-না ও মানুষের ছানা। ওর মা মরে গেছে, মানুষের গ্রাম থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছি। আমার বুকের দুধ খেয়ে ও বড় হচ্ছে। ওকে কিছু বোল না।

নালুখ বলল—তাই ত !

—জান ? শেয়াল ওকে খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে ওকে আমি কেড়ে এনেছি তাই শেয়াল শাসিয়ে গেছে।

—বটে ?

নালুখ ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়াল।

—পাজী বদজাত শেয়াল ! দেখিরে টিকটিকি তোর সাহস !

নালুখ মংলুর কাছে এগিয়ে গেল। মংলু ভালুকমা ছাড়া এত বড় জানোয়ার আর দেখেনি। নালুখ এগিয়ে আসতে সে অবাক হয়ে তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল

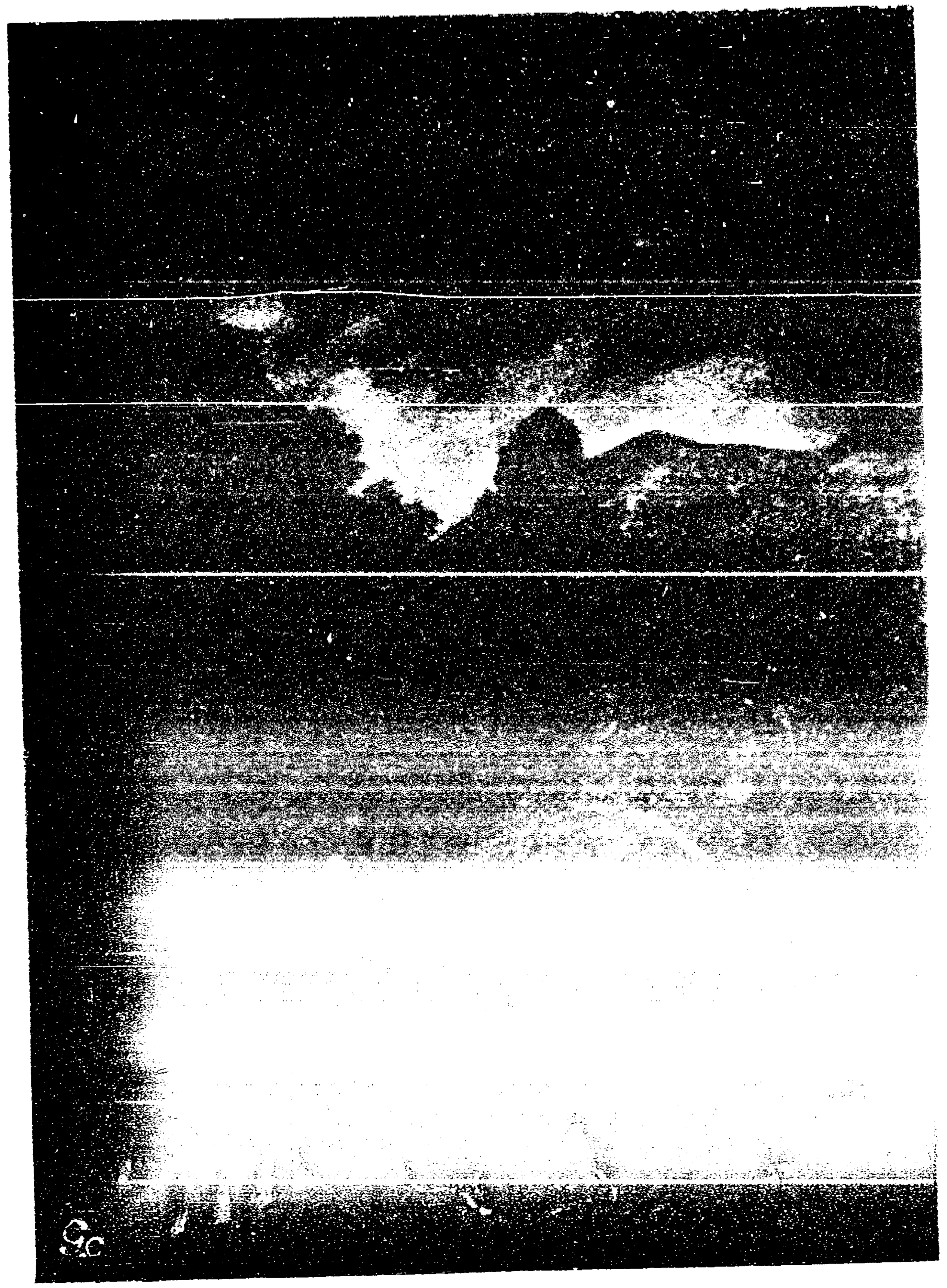

কত পাহাড় পার হয়ে এলে নালুখ ১১৫ পৃষ্ঠা

শিকার কোথায়? ১১৮ পৃষ্ঠা

মানুষের সেই অগাধ রহস্যময় চোখের দৃষ্টি নালুখ সইতে পারল না, চোখ সরিয়ে নিল। মংলু মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করতে করতে নালুখের বুকের কাছে হামা দিয়ে এগিয়ে এল। নালুখ তার থাবা দিয়ে মংলুর পিঠে এক চাপ দিল। মংলু সেই চাপে মাটিতে চেপ্টে গিয়ে খল খল করে হেসে উঠল। তারপরে তার কচি হাত দিয়ে নালুখের গোঁফ ধরে মারল এক টান। নালুখ একলাফে পেছিয়ে এল।—ওরে বাপ্ টিকটিকির সাহস আছে।

নালুখ থাবা দিয়ে মংলুকে এক ঠেলা মারল। মংলু গড়িয়ে গেল একপাশে।

ভাল্লুকমা হাঁ হাঁ করে উঠল।

নালুখ বলল—শক্ত হবে, বাচ্ছা শক্ত হবে। ভাল্লুকের দুধ যখন খেয়েছে, ভাল্লুকের সঙ্গে যখন ছুটতে হবে তখন শক্ত হওয়া দরকার। চিরকাল ত টিকটিকি থাকলে চলবে না। আয়রে বাচ্ছা আয়।

মংলু আবার হামায় ভর দিয়ে উঠে জুল জুল করে তাকাতে লাগল।

ভাল্লুকমা বলল—চিনে রাখ মংলু টিকটিকিকে চিনে রাখ কক্ষণ যেন ভুল কোর না—। আমাদের ঘরে যখন ও এসেছে—

নালুখ বলল—তখন আজ থেকে ও ভাল্লুকদের মংলু।

—আজ থেকে ওর যে শত্রু...

—সে আমাদেরও শত্রু!

নালুখ বন কাঁপিয়ে একটা হুঙ্কার দিল—শুনে রাখ, বনের সব জানোয়ার। আমি নালুখ ভাল্লুকদের কর্ত্তা বলছি। আমার তিন বাচ্ছা ভাল্লুক আজ থেকে বনে চরবে আর মংলু টিকটিকি আজ থেকে ভাল্লুকদের মংলু হোল। এই বনে ভাল্লুকদের সমান অধিকার ওর।

ভাল্লুকের সেই ডাক আকাশের চীল শুনে তারস্বরে চেঁচিয়ে আকাশে আকাশে ঘোষণা করে দিল। বনের ওপারে লঙ্গুর বাঁদররা হুপ হুপ করে লাফাতে লাফাতে সে ডাক শুনে চমকে উঠল। গাছের আড়ালে শেয়াল সে ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠল কারণ পাজী শেয়াল তখনও মংলুর আশা ছাড়েনি। অনেকবার নিঃশব্দে ফাঁকে ফাঁকে এসে সে গুহার মুখে ঘুরে গেছে। একবার মংলুকে একা পেলে হয়। কিন্তু প্রতিবারই সে দেখে গেছে ভাল্লুকমা বুক দিয়ে মংলুকে আগলে আছে। তখন একা ছিল ভাল্লুকমা এখন আবার নালুখ ফিরে এসেছে। তার একার দ্বারা আর মংলুকে পাওয়া সম্ভব নয়। শেয়াল মন ঠিক করে ফেলল। দেখা যাক ভাল্লুকদের কতদূর আস্পর্দ্ধা। মানুষের ওই ছানার কচি হাড় সে চিবুবে তবে তার নাম শেয়াল। শেয়াল লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে দূর বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উচ্চ আসামের কালো বাঘ বড় ভয়ঙ্কর জানোয়ার। যেমন ক্রুর তেমনি ক্ষিপ্র আর তেমনি বলবান। বিশেষতঃ কালকেতু যেন সাক্ষাৎ যম। সে যখন চলে তার পায়ের শব্দ হয় না, তার নমণীয় ইস্পাতের মত পেশীগুলোতে ঢেউ খেলতে থাকে। তার এক থাবার ঘায়ে প্রকাণ্ড বুনো সম্বরও লুটিয়ে পড়ে। এই কালো বাঘগুলো গাছে চড়তেও ওস্তাদ।

হিজল গাছের শাখায় শাখায় বন যেখানে দুর্ভেদ্য সেইখানে একটা ডালে বসে কালকেতু তার থাবা চাটছিল। বর্ষার সময় হরিণগুলো আর বিশেষ দল ছিটকে পড়ে না তাই শিকার একটু দুষ্প্রাপ্য। এমন সময় গাছের তলায় শেয়াল এসে বলল—কালো বাঘদের ভালো হোক শিকার টিকার বেশী করে জুটুক!

কালকেতু রাজার মত ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে শেয়ালকে দেখে নিয়ে বলল—শিকার কোথায়?

কালকেতু রাজার মত মড়াটা ঈষৎ হেলিয়ে শেয়ালকে চামে নিয়ে হল—শিকার কোথার? সম্বরটম্বর একটা দেখেছ?

শেয়াল বলল—কাল জলার পাড়ে একদল নেমেছিল কিন্তু তারা ওপরে উঠে গেছে।

—তবে শিকার?

শেয়াল বলল—আছে

—কি রকম?

—আছে একটা মানুষের ছানা—

—মানুষের ছানা? তবে তুমি শিকার করনি কেন?

—ভাল্লুকদের কাছে আছে তাই ভয় পাই—

কালকেতু ঘাড় বেঁকিয়ে বল—কালো বাঘ ভাল্লুকদের ভয় পায় না। কোথায় আছে?

নালুখের গুহায়? তাহলে একটু ভয়ের কথা বটে নালুখের আবার অসীম ক্ষমতা কিন্তু তবু কালকেতু ভয় করে না।

শেয়াল বলল—তাইত এসেছি তোমার কাছে। হাজার হোক জ্ঞাতি ত?

কালকেতু বল—হুঁ, চল দেখি, একটু সাবধানে যেতে হবে।

একলাফে গাছের ডাল থেকে নেমে এল কালকেতু।

শেয়াল বলল—আমার পেছনে এ-সো।

ক্রমশঃ

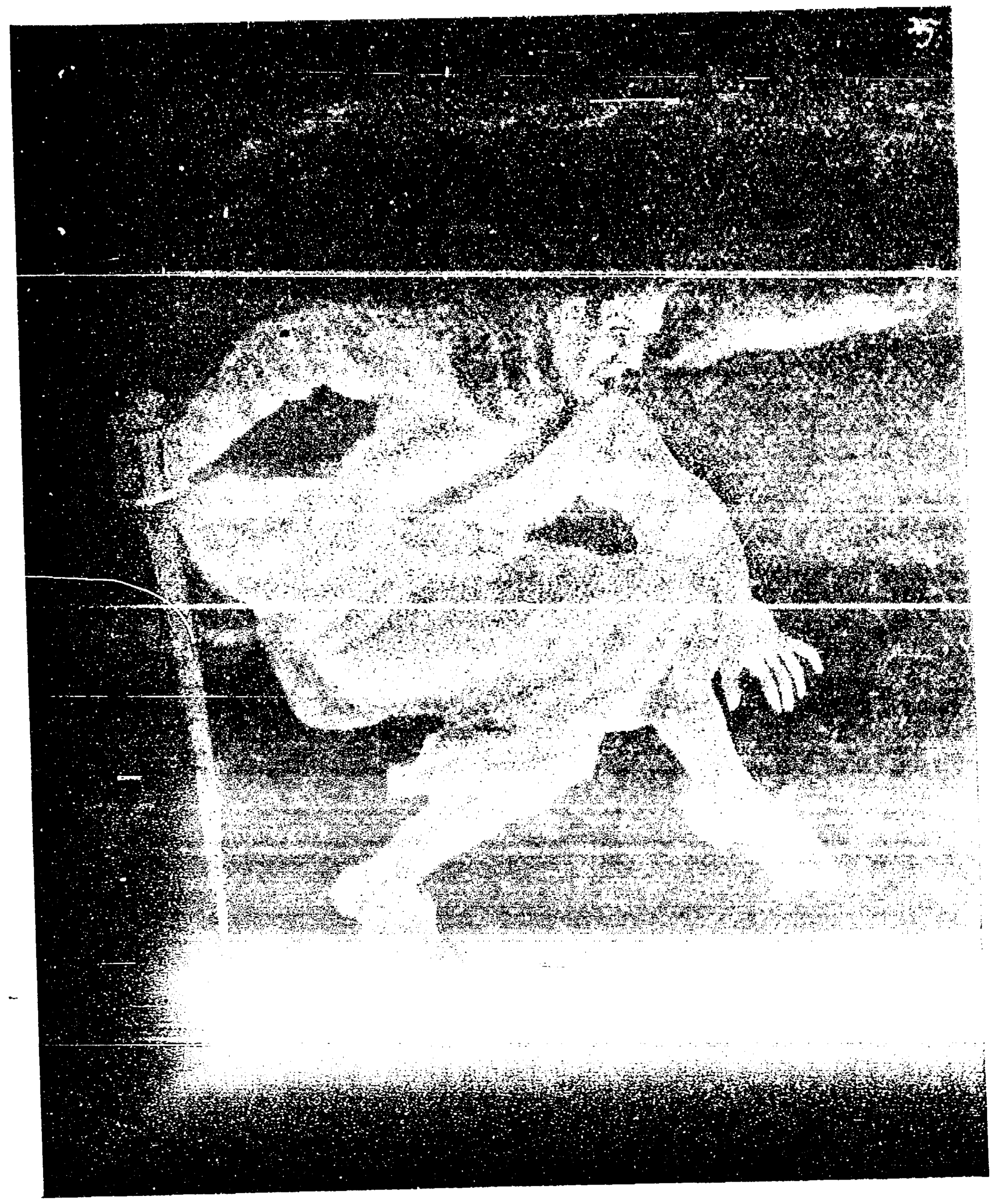

কী ভীষণ যুদ্ধ

সারথিস্থুর বন্দর

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

পাহাড়ের কোলে ছোট সুন্দর সারথিস্থুর দেশ। সোণার মত দেশ—সারথিস্থুর।

কিন্তু পাথরের ফাটলে শস্য হয় না। গরীব দেশ সারথিস্থুর।

সারথিস্থুরের পশ্চিমে সমুদ্র। পুরো একদিনের পথ। এত কাছে সমুদ্র—তবু সে দেশের লোক কখনও সমুদ্রের পথ মাড়ায় নি। এ পথে গেলে নাকি আর ফিরে আসা যায় না। তাই পশ্চিমে, যেখানে পাহাড়ের হু'টো চুড়ো উচুঁ হ'য়ে উঠেছে, তারই মধ্য দিয়ে যে সঙ্কীর্ণ পথ—সে পথে কখনও মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি।

আর উত্তর দিকে যে পথ নেমেছে, সেই হ'ল নীচে নামবার আর একটা পথ। সেই পথ ঘুরে ঘুরে গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের শেষে, বহুদূরে সমতল ভূমির আর একটি দেশে—সে দেশের নাম ছিল অনিন্দস্থুর।

পাশাপাশি দুটি দেশ—যাওয়া আসা নেই। পাহাড়চূড়োয় সারথিস্থুর আর পাহাড়ের নীচেয় অনিন্দস্থুর। পাহাড়ের ব্যবধানে দুটি দেশে ছাড়াছাড়ি। ওপর থেকে নীচে নামা সহজ, কিন্তু নীচের থেকে ওপরে ওঠা সহজ নয়। সারথিস্থুরের লোকেদের পক্ষে যেটুকু সহজ ছিল অনিন্দস্থুরে যাওয়া, অনিন্দস্থুরের লোকেদের পক্ষে সারথিস্থুরে আসা ঠিক ততটা সহজ ছিল না। সহজও ছিল না, দরকারও ছিল না। কেন না অনিন্দস্থুরের টাকা ছিল, কাজ ছিল। কাজ করে সেখানে টাকা পাওয়া যেত। কাজ আর টাকা—এ দুটি জিনিষের যে দেশে অভাব নেই, তার আবার দুঃখ কী! খাওয়াপরার সুখ অনিন্দস্থুরের বাসিন্দাদের ছিল— দেশান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন কখনো তাদের হয়নি।

কিন্তু ধনীর দেশে গরীবদেশের লোক দেখতে পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। অনিন্দস্থুরে আসত সারথিস্থুর থেকে লোক, কাজ করে দু'পয়সা রোজগার করতে। এই দলে ছিল উপল, সে সারথিস্থুরের ছেলে। কাজ করত অনিন্দস্থুর দেশে। বিদ্যুৎপর্ণা নদীর স্রোত বেঁধে বিরাট কল চালানো হয়। সেখানে জলচক্র কলে মজুর খাটে সে।

কিন্তু সমস্ত মন তার সারথিস্থুরে পড়ে থাকত। সারথিস্থুর—সারথিস্থুর দেশের জন্য কি সুরই না তার হৃদয়কে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভরিয়ে তুলত। সারথিস্থুরের প্রত্যেক লোকের সরল মুখ, সে দেশের প্রত্যেকটি গেঁয়ো পথ, সে দেশের প্রত্যেক পাখীটিও যেন তার পরিচিত। সকল কল্পনা তার পাখীর মত সারা গ্রামের পথ আর বনের উপরের আকাশে

উড়ে বেড়াত। সব চেয়ে সে কাতর হ'ত দেশের দুর্দশার কথা ভেবে। অবসর সময়ে সে এ বই সে বই নিয়ে ঘাঁটত—দেখত কি ক'রে এক একটা দেশ বড় হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সে ছুটি নিয়ে সারথিস্থুরে যেত বটে। কিন্তু তবু, তার যেন আর ভালো লাগে না। একদিন সন্ধ্যায় কারখানার মালিককে সে জানালে যে আর সে কাজ করবে না।

মালিক গম্ভীর হয়ে বললেন,—"বলো কি! হঠাৎ কাজটা ছেড়ে দেবে?"

"ভাল লাগে না"—উপল বললে—"অনেকদিন দেশে যাইনি"।

"ওঃ—এই"—সস্নেহে মনিব হেসে বললেন,—"বেশ ত,' তুমি এক মাসের ছুটি নাও। এক মাস পরে আবার ফিরে এসো।"

চঞ্চল ঝরণার মত হাল্কা পায়ে পাহাড় ভেঙে ভেঙে পথ চলেছে উপল। মনে তার কি স্ফূর্তি—কি আনন্দ। গান সে গাইচে কি না—কি গান—তা সে বলতে পারে না। সে যে কঠিন বন্ধুর পথ পেরিয়ে, পাথরের অগণ্য সিঁড়ি ডিঙিয়ে চলছিল তা তার খেয়াল ছিল না। তিনদিন পথ হাঁটার পর, সে সারথিস্থুরে পৌঁছল।

ওগো সারথিস্থুর! বনে তোমার কি ফুল ফোটে, ঝরণায় তোমার কোন্ জলের ধারা—যা'কে ভুলতে পারলে না ছোট একটি কিশোর প্রাণ! সে এল—এই ঝরণা জল ধারার সঙ্গে সমস্ত দিন তার কত হল কথা! ফুলের বনে তার হ'ল গান! কিন্তু সব আনন্দের মাঝে একটা কথা কাঁটার মত তার মনে বারবার বিঁধলো। তার মনে হল, হায়! তার দেশ গরীব! তার দেশের মানুষদের কত দুঃখ!

পশ্চিম দিকটা তার প্রায়ই মনে পড়ত। উচুঁ পাহাড়ের দু'টো চুড়োর মধ্য দিয়ে সরু একটা রাস্তা। কত নীচে নেমে গিয়েছে—কত নীচে। তারপর আর দেখা যায় না, উপল পড়েছিল কত দেশের কাহিনী, সমুদ্রের বুকে বাণিজ্যের বহর ভাসিয়ে যারা উধাও হয়। তারপর একদিন ফিরে আসে বহর, অর্থ আর শস্যে বোঝাই হয়ে। অর্থ আর শস্য মানুষকে দেয় সাহস, সুখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা। সেই সঙ্গে দেশে আসে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য। উপল স্বপ্ন দেখে, নীল জল—অথৈ নাচে কুলে কুলে—হেসে ওঠে পাহাড়ের ধারে ধারে আঘাত খেয়ে খেয়ে—সাদা সাদা ফেণা তার গলায় সাদা ফুলের মালার মত দোলে বুঝি।

সকলে বলে: "বলো কি উপল? পশ্চিম পথে সেই যে আদিত্যদেব গিয়েছিলেন তিনি তো আর ফিরে আসেন নি'। ওপথ বড় ভয়ঙ্কর—তুমি যেও না।"

অনেকে মাথা নেড়ে বললেন, "সুড়ঙ্গের পথ ধরে চার ক্রোশ হেঁটে পাথরের বড় বাঁধে পৌঁছবে। কিন্তু তারপর ?"

বুড়োরা আতঙ্কে উঠে বললেন, "কী সর্ব্বনাশ। ওই পাথুরে বাঁধের পথে তুমি যেওনা বাপু।"

সকলেই উপলকে ভালবাসতো।

কিন্তু উপল মনে মনে বললে —"না, আমি যাব। ঐ পথে আনব লক্ষ্মীকে।

দুই

পরদিন ভোরবেলা।

সারথিস্তুর উপত্যকার পশ্চিমদিকের পথটা এসে উতরাইয়ে নেমেছে। পথ হয়েছে সঙ্কীর্ণতর। পথের দু'পাশে পাহাড়ের মাথাগুলো আদিযুগ থেকে জটলা করেছে। অত্যন্ত ঢালু পথ—এত ঢালু যে পা ফস্কালে গড়াতে গড়াতে সামনে পাহাড়ের মাথায় এসে ধাক্কা খেতে হবে। ঠিক দুপুরে সেখানে বুঝি সূর্য্যের আলো এসে পড়ে।

অন্ধকার সেই সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে, কোমরে দু'টো বোতল আর পিঠে পোটলা ঝুলিয়ে, একটি লোক সন্তর্পণে পথ চলছিল। সামনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে সে চলছিল। পেছন থেকে মনে হয় আদ্যিকালের বুড়ো। কার সাধ্য চিনবে সে বালক উপল।

উপল চলছিল। চোখে মুখে তার উৎসাহ। উপল পথ চলছিল—ঢালু পথ।

রূপকথার রাজপুত্রের মত উপল আজ সোণার কাঠি নিয়ে চলে বুঝি পাতাল পুরীতে। নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম পথে চলতে চলতে সে হঠাৎ থেমে যায়—আর কত দূর সে ঘুমন্ত পুরী যেখানে সোনার পিদিম জ্বলে, মনিমাণিক্য দেওয়ালের গায়ে ঝিক্‌মিক্ করে, সোণার পালঙ্কে কুচবরণ রাজকন্যা ঘুম যায়।

প্রথম মোড় ঘুরতেই, অনেকদূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় রোদ্দুর ঝলমল করছে। ঐ বুঝি সেই পাথরের বাঁধ !

কাঁধটা তার ব্যথা হয়ে গেছে। কাঁধ বদলিয়ে একটা যেন মুক্তির হাওয়া লাগল তার মনে। একটু দ্রুত সে নামতে লাগল। ঐখানে পৌঁছাতে পারলে সে হয়ত একটা নতুন পথের সন্ধান পাবে।

কিন্তু হঠাৎ পথ যে আরও ঢালু হয়ে চললো! মানুষের পক্ষে এই পথে হাঁটা

একবার নিচের দিকে চাইল ১২২ পৃষ্ঠা

দুঃসাধ্য। উপল সেখানে একটা পাথরের গা ধরে অতি কষ্টে দাড়িয়ে পুঁটলিটি মাথা গলিয়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেললে। গড়াতে গড়াতে পুঁটলিটি কোথায় চলে গেল।

অনেকক্ষণ—প্রায় এক প্রহর সেই পথ চ'লে পিছন ফিরে সে দেখলে অর্দ্ধেক এগিয়ে এসেছে সে, তখন আর একবার মরিয়া হয়ে নামতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ—এবার সে পাহাড়ের সেই উন্মুক্ত চুড়োটায় নেমে এসেছে। উঃ—দর দর ঘাম ঝরছে। উপল কপালটা মুছে নিলে। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে দেখলে বেলা একপ্রহর কেটেছে।

অসম্ভব ক্ষিধে পেয়েছে। ঢালুপথে নামবার জন্য পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পুঁটলিটা এখন থাকলে ভালো হত। কিন্তু. হ্যাঁ তাইতো, ঐ না পুঁটলি। উপল সামনে ছুটে এলো।

একটু বিশ্রামের পর উপল আবার নামবার জন্যে তৈরী হল।

জায়গাটা সেখানে বেশ সমতল। কিন্তু এই সমতল জমি ঘিরে তিনধারে বাঁধের মত ছোট পাহাড়। পুঁটলীটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে একটা পাথরের কয়েকটা ধাপ বেয়ে সে বাঁধটার ওপর উঠল।

ওপরে উঠে সামনে সে দেখতে পেলে খানিকদূরে ক্রোশ পাঁচেক তফাতে ধূধূ সমুদ্র দিগন্তে মিশে গেছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের ঠিক নীচেই আছড়ে পড়ছে। কিন্তু বাঁধটা একটা দেয়ালের মত খাড়া দাড়িয়ে রয়েছে—কোথাও এতটুকু বাঁক খায় নি, ঢালু হয় নি।

এখান থেকে নামতে পারলেই সমুদ্র—যে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে দেশান্তরে যায় জাহাজ, দেশে আসেন লক্ষ্মী। কিন্তু সে নামবে কি ক'রে? জায়গাটি বিশ হাত উঁচু তো হবেই।

সে তার পুঁটলীর ছোট কাপড়টা খুলে নিজে পরল; পরণের কাপড়টা খুলে নিয়ে এক প্রান্ত একটা ছোট পাথরের সঙ্গে বেঁধে বাঁধের গায়ে একটা পাথরের ফাটলে আটকে রাখলে। খাবারগুলো পাগড়ীতে জড়িয়ে সে সেই কাপড় ধরে তার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নেমে এসে একবার নীচের দিকে চাইল। বেশ দূর—এখনও নীচের জমি দশ হাত তফাৎ। ঠিক মত লাফ দিতে না পারলে পাথরে গুড়ো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। উপল আদিত্যদেবের নাম স্মরণ করে হাত ছেড়ে দিলে! এক মুহূর্ত্ত। তারপর শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকুনি। শরীরে ব্যথা, পা শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে। তবু উপল এগিয়ে চললো। ধীর গতি। ছোট ছোট পাথরের উঁচু নীচু পথ—কাঁকর আর নুড়ি ছড়ানো জমি। তারপর—সন্ধ্যায় সূর্য্য যখন আকাশ রাঙিয়ে অস্ত গেলেন উপল তখন সমুদ্রের বিস্তীর্ণ কিনারায়।

কিনারাটি আঁটা মাটির—ভিজে। জলের কাছে লম্বা লম্বা ঘাস—মধ্যে তার নীল নীল ফুল ফুটে। শুক্তিতে এই বুঝি মুক্তো—মুঠো ভরে সে ঝিনুক কুড়োল।

কিন্তু উপল আর ফেরে নি'।

সেই দিনই রাত্রের ঘন অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে সে যখন তার ব্যথাবিবর্ণ শরীর নিয়ে সেই খাড়াইয়ের কাছে এলো, ভয়ে সে করুণ হ'য়ে উঠল। তাই ত, ওখানে উঠবার পথ কৈ, শক্তি কৈ—আলো কৈ? একটা পাথর নিয়ে একটা পাথর ঘ'ষে, সে তা'তে লিখলে—নামবার আগে উঠবার ব্যবস্থা কোরো।

তারপর পাথরটা সে ওপরের চূড়োর দিকে ছুড়ে দিলে।

তিন

জলচক্রের মালিক বাস্তবিকই উপলকে ভালবাসতেন।

এক মাস হ'য়ে গেল, অথচ উপল এলো না। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মনিব বিচিত্রবান্ সারথিস্থুর রওনা হলেন।

দিন যায় রাত আসে। রাত যায় আবার আসে দিন। এমনি, তিন রাত পোহালো। তারপর একদিন দলবল নিয়ে বিচিত্রবান্ সারথিস্থুরে পৌছলেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন উপলের কথা। কোথায় থাকে, তার খবর কি?

বাড়ীর নিশানা দিয়ে সারথিস্থুরের একটি লোক বললে, "কিন্তু সে ত' পশ্চিমদিকের পথে রওনা হয়ে গেছে। আদিত্যদেব যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথে—আদিত্যদেব ফেরেন নি, সে কি আর ফিরে আসবে?"

"বটে"—চিন্তিতভাবে বিচিত্রবান্ বললেন, "আচ্ছা তার বাড়ীতে গিয়ে পরামর্শ করে' দেখি।"

উপলের বুড়ো বাপ আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বললেন। আদিত্যদেবের পথে গেছে সে, আদিত্যদেব তাকে আর ছেড়ে দেবেন না।

বিচিত্রবান্ বললেন "আমরাও কাল ঐ পথে যাত্রা করব। উপলের মুখে শুনেছিলাম ওখানে না কি বেশ ভাল বন্দর হ'তে পারে। আমরা যাব। উপল বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে দেখা হবে।"

"আপনারাও যাবেন"—উপলের বুড়ো বাপ গম্ভীর হয়ে গেলেন। "আদিত্যদেব ঐ পথ ধরে একদিন গিয়েছিলেন। ওপথে গেলে মানুষ আর ফেরে না।"

"ঐ পথেই দেশের লক্ষ্মী আসবেন" বিচিত্রবান্ বললেন। "আপনার ছেলে পথ দেখিয়েছে। ঐ পথে আমরা সমুদ্রে পৌছে যাবো।"

লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি, দড়ি মই নিয়ে পরদিন ভোরে আর একদল যাত্রীকে সেই পশ্চিমদিকের পথে যেতে দেখা গেল। দড়ির মই ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে, পাথরের ধাপ বানিয়ে বানিয়ে—তাঁরা প্রথমে সেই বাঁধের ধারে নামলেন। বাঁধের ওপর উঠে হঠাৎ একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে পেয়ে বিচিত্রবান্ চেঁচিয়ে উঠলেন—"শিগ্ গির এই পথে দড়ির মই ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে পড়।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মইটা হাতে করে কিনারার কাছে এসে অবাক হয়ে গেলেন। একখণ্ড কাপড় ঝুলছে—তাহ'লে এই পথে সে নেমেছে। কিন্তু উঠতে পারে নি। অবোধ কিশোর!

তিনি নীচে নামলেন। "উপল—উপল"—কোথাও যদি মুমূর্ষু উপলের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় উপল! তার কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে। শুধু এক জায়গায় কতকগুলি ঝিনুক আর মুক্তো সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক্ করছে।

বিচিত্রবানের চোখ জলে ভরে এলো। "মুক্তো হারিয়ে গেছে"—বলে মাথার পাকাচুল মুঠো করে ধ'রে তিনি বসে পড়লেন। আরও তিনটে মই ঝুলিয়ে দলের লোকেরা নামছিল, কাছে এসে তারা বললে,—"কি বললেন?"

"কৈ, কিছু না—কিন্তু দেখ সমুদ্রের কিনারাটি বড় সুন্দর। উপল আমাদের এই জায়গাটি দান ক'রে গেছে।" একটু নিঃশব্দ থেকে তিনি বললেন,—"কিন্তু উপল আর নেই।"

দলের লোকেরা মাথা হেঁট করে রইল। বিচিত্রবানকে কী তারা বলবে? কী কথা ভেবে তারা সান্ত্বনা পাবে?

বিচিত্রবান্ বললেন,—"ওখানে ওই সমুদ্রের কিনারায় একটা বন্দর তৈরী করার বড় ইচ্ছা ছিল উপলের। তার বিশ্বাস ছিল এতে করে তার দেশের উপকার হবে। আমি তার ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করব। চল—আজ আমরা ফিরে যাই।"

তারপর পশ্চিমের সঙ্কীর্ণপথ বেয়ে একদিন একদল লোক সারথিস্থুর গ্রামে ফিরে এলো।

তারপর—সারথিস্থুর দেশে লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছেন। দেশদেশান্তর হতে জাহাজ আসে সারথিস্থুরের বন্দরে, দেশদেশান্তরে জাহাজ যায় বন্দর হতে।

লক্ষ্মীর পূজা ঘরে ঘরে। সমুদ্রের পথে প্রথম গিয়েছিলেন আদিত্যদেব, তাঁর পরেই উপল। আদিত্যদেবের সঙ্গে উপলের পূজো হয়।

চাঁদের দেশে যায়রে ভেসে

চাঁদের দেশে যায়রে ভেসে

‘স’

যায়রে যায় যায়
চাঁদের দেশে যায়রে ভেসে জাহাজ ভেসে যায়
রাজপুত্তুর সাতপুত্তুর চাঁদের দেশে যায়।
সাতপুত্তুর রাজপুত্তুর—
কার পুত্তুর সাতপুত্তুর ?
চম্পাদেশের পারুলদিদির সাতটি কি ভাইরে ?
চাঁদের দেশে খুঁজতে এলো পারুল কি তাইরে ?

নাইরে নাই নাই
চাঁদের বুড়ি হেসেই বলে পারুল কোথায় পাই ?
সাতপুত্তুর হঠাৎ হাসে, কে বলে যাই যাই।
তারার দেশে টিপ পরিতে
এলেম হাওয়ার পাল্‌কিটিতে—
বলেই আসেন পারুলদিদি ফুরফুরে হাওয়ায়,
পারল দিদি সাতটি চাঁপা জাহাজ চেপে যায়।

জাহাজ কোথায় যায় ?
জাহাজ ফিরে যায়।
ঘুম্ ঘুমাঘুম্   সাতটি চাঁপা
পারুলদি গান গায়।

মানুষেই যোগ বিয়োগ করতে ভুল করে। কিন্তু কখনও শুনেছ যে কুকুর যোগ বিয়োগ করতে পারে আর কখনও ভুল করে না। অন্ততঃ একটি কুকুর পণ্ডিতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই কুকুরটার নাম ভাইকাউন্ট এবং তার মনিবের নাম মারকাস। যখন হয়ত তাকে জিগেস করা হয় ৪ আর ৩ যোগ করত—তখন সে ৭ বার চেঁচিয়ে তার জবাব দেয়। যখন আবার তাকে হয়ত প্রশ্ন করা হল ১০ থেকে ৭ বিয়োগ করলে কত থাকে—সে তিনবার ডাক দিয়ে তার নির্ভুল উত্তর দিয়ে সবাইকে অবাক করে। বাড়ীতে এই রকম একটা কুকুর পণ্ডিত থাকলে মন্দ হয় না।

ঘটোৎকচ গুহার নাম শুনেছ কখনও ? অজন্তা গুহার নাম শুনেছ ত—ঘটোৎকচ গুহা তার থেকে বেশী দূর নয়। কিন্তু ঘটোৎকচ গুহা কেন এর নাম হল সেটাই আশ্চর্য্য—কারণ অজন্তায় তো বুদ্ধ মূর্ত্তিই পূজার দেশ। শোনা যায় বৎসরে একবার যখন সেখানে মেলা হয় তখন লোকেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ঘটোৎকচ বলে পূজা করে। বুদ্ধদেব ও ঘটোৎকচ—একজন দেবতাতুল্য আর একজন রাক্ষস—সেখানকার লোকের চোখে কেমন করে এক হল ! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম !

ছোট্ট মানুষ বামন টম্ থাম্ব এর গল্প তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। কিন্তু ইতিহাসে সত্যিকারের এক টম থাম্ব ছিল সেই টম ছিল এমেরিকান তার নাম ছিল জেনারেল টম্ থাম্ব। অবশ্য এই টম্ থাম্ব এর আসল নাম ছিল চার্লস ষ্ট্রাটন। ষ্ট্রাটনেরা চার ভাই ছিল কিন্তু একমাত্র চার্লসই হয়ে রইল ছোট এতটকু ২৫ ইঞ্চি। ৬ মাসের পর আর সে বাড়ল না। যাই হোক এই ২৫ ইঞ্চি চার্লস সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিল ও রানী ভিক্টোরিয়ার খুব প্রিয় ছিল। এই বামনটি বিয়ে করেছিল তার তিনগুণ লম্বা একটি মেয়েকে। ১৮৮৩ সালে চার্লস এর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী আর একটি বামনকে বিয়ে করে।

সিসিলী ও দক্ষিণ ইটালীর মধ্যে মেসিনা জলপ্রণালীতে একরকম অদ্ভুত মরীচিকা দেখতেও পাওয়া যায়। জলের মধ্যে নানা প্রাসাদতুল্য বড় বড় ঘরবাড়ি দুর্গ এসব দেখা যায়। এই মরীচিকার নাম ফাতা মর্গানা। সেখানকার লোকেদের বিশ্বাস মর্গান লি যে বলে এক পরী ছিল—রাজা আর্থারের এক বোন সেই নাকি জলের মধ্যে যাদুবলে এক ঐন্দ্রজালিক দুর্গ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বলে লি ফে যে দুর্গে বাস করত তারই প্রতিচ্ছায়া এগুলো। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই মরীচিকা দেখে বলেছেন যে আলোক তরঙ্গ বাতাসের নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে এই জলে গিয়ে পড়ে ঐ মরীচিকার সৃষ্টি করে। সিসিলীর লোকেরা কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এ ধারণা মোটেই বিশ্বাস করে না।

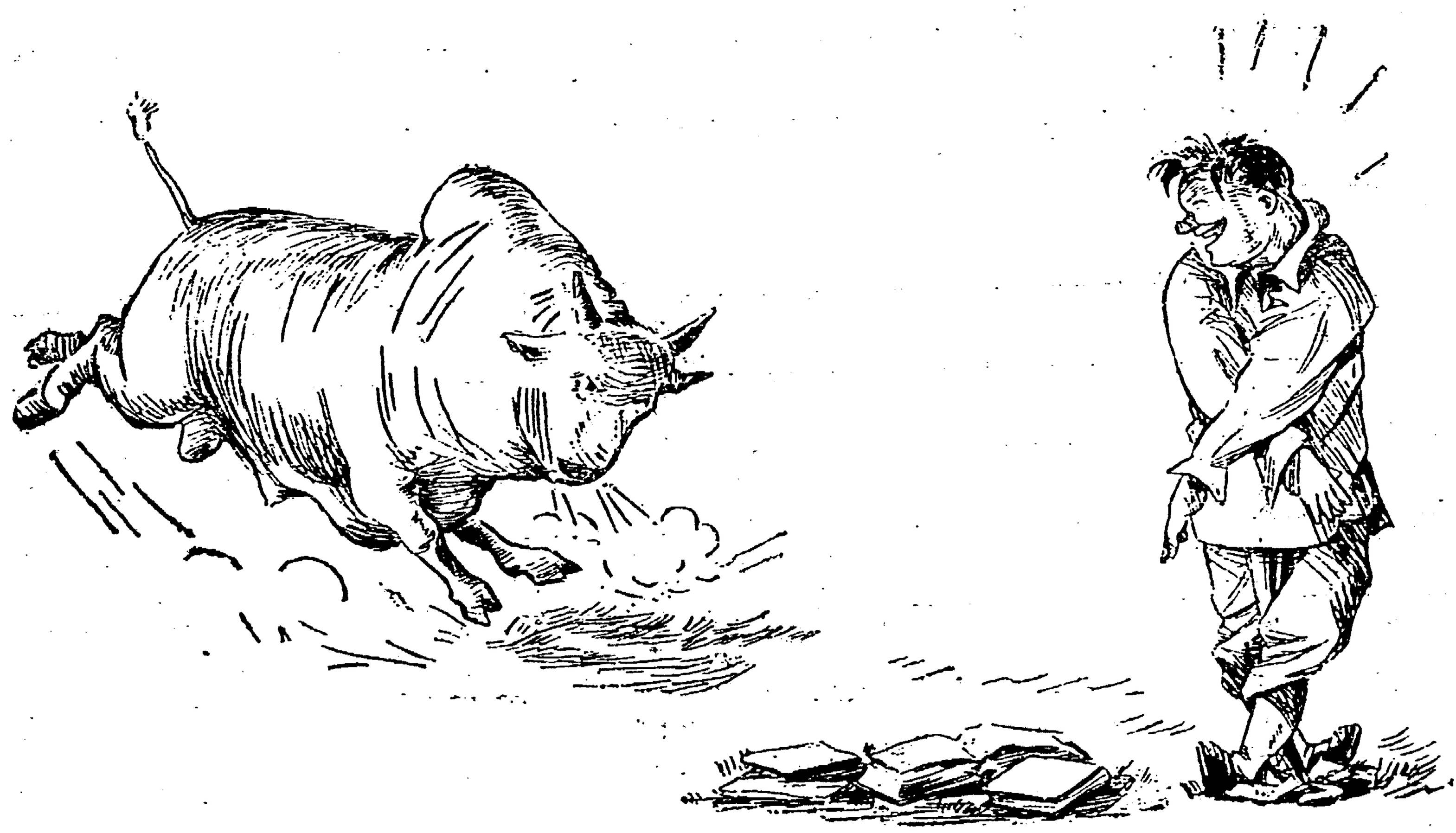

এ্যাসিরিয়ার রাজা ইসারহাডন

এ্যাসিরিয়ার রাজা ইসারহাডন লয়লী রাজাকে লড়াইয়ে হটিয়ে দিলেন। ইসারহাডনের হুকুমে এ্যাসিরিয়ার সৈন্যরা লয়লীর রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে, রাজধানীর বাসিন্দাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে দলে দলে গাড়ী বোঝাই করে এ্যাসিরিয়ায় চালান দিলে। পাত্রমিত্র মন্ত্রী সেনাপতিরা কেউ শূলে চড়লেন, কেউ জীবন্ত পুড়ে মরলেন। লয়লীর রাজ্য ছারখার হয়ে গেল। স্বয়ং লয়লী খাঁচায় বন্দী হলেন।

একদিন দুপুর রাত। ইসারহাডন একা শুয়ে ভাবছেন, লয়লীকে কোন্ নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করেন। হঠাৎ বিছানার পাশে খস্খস্ একটা আওয়াজে চোখ মেলে ইসারহাডন দেখেন এক বুড়ো সেখানে দাঁড়িয়ে; লম্বা শাদা দাড়ী তার, চোখ দুটির ভাব বড়ই কোমল।

বুড়ো জিগেস করলে, 'তুমি লয়লীকে মেরেফেলতে চাও, না?'

রাজা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কী ভাবে যে লয়লীকে মারি কিছুই স্থির করতে পারছিনা।'

বুড়ো বললে, 'কিন্তু তুমিই তো লয়লী।'

রাজা বললেন, 'সে কী কথা! লয়লীই হচ্ছে লয়লী, আর আমি তো আমিই।'

বুড়ো মুচকি হেসে বললে, 'তুমি আর লয়লী একই মানুষ। তুমি লয়লী নও, সে-ও তুমি নয়, এ তোমার মিছে কথা।'

রাজা হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'তোমার কথার কী অর্থ? এই তো, আমি শুয়ে আছি নরম বিছানায়: আমার চারপাশে দাসী বান্দারা ভিড় করে আছে; আজ ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে যেমনটি ধুমে ধামে ভোজে বসেছিলাম, আগামী কালও তার কোনই ব্যতিক্রম হবেনা। আর লয়লী—লয়লী যে এখন পাখীর মত খাঁচাবন্দী হয়ে ঝটপট করছে। আসচে কাল তাকে শূলে চড়ানো হবে, তার জিভ বেরিয়ে আসবে, যতক্ষণ প্রাণ না বেরুবে সে নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করবে; তারপর—তারপর তার শবটা ডালকুত্তোর দল খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।'

বুড়ো দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'কিন্তু তুমি তো জীবন লোপ করতে পারো না।'

ইসারহাডন চটে মটে বললেন, 'বটে! গণে গেঁথে লয়লীর চোদ্দ হাজার সৈন্য আমি হত্যা করিনি! বলতে চাও, তারা এখনো বেঁচে আছে? আমি বেঁচে আছি, তারা কেউ বেঁচে নেই—এতেই কি প্রমাণ হয় না আমি জীবন লোপ করতে পারি?'

'কী করে জানলে তুমি তারা বেঁচে নেই?'

'কী করে—কেন, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিনা, এতেই তো বোঝা যাচ্ছে তারা আজ বেঁচে নেই। তারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কষ্ট পেয়ে মরেছে, আর আমি—আমি তো মোটেই কষ্ট পাইনি।'

'কষ্ট পাওনি —মিছে কথা। আসল কথা, তাদের কষ্ট দিতে গিয়ে তুমি নিজেকেই কষ্ট দিয়েছ।'

রাজা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝছিনা।'

বুড়ো হেসে বললে, 'বুঝতে চাও তুমি?'

'না বুঝে লাভ কী!'

একট বিরাট চৌবাচ্ছা দেখিয়ে বুড়ো রাজাকে বললে, 'এসো।' রাজা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন।

বুড়ো বললে, 'এখন পোষাক ছেড়ে চৌবাচ্চায় নেমে পড়ো।'

রাজা কথামত চৌবাচ্চায় নেমে গেলেন।

'আমি তোমার মাথায় জল ঢালবো; সঙ্গে সঙ্গে তুমি চৌবাচ্চার জলে ডুব দেবে।'

রাজার মাথার উপর ঝাঁকুনি দিয়ে বুড়ো এক কলস জল ঢেলে দিলে। যতক্ষণ না জলে মাথা তলিয়ে যায় ইসারহাডন মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

ইসারহাডনের মাথা ছাপিয়ে জল উঠলো। তখন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। ইসারহাডনের মনে হল, তিনি যেন ইসারহাডন নন, তিনি যেন আর কেউ। মনের এই বেয়াড়া আশ্চর্য্য ভাবটা কিছুতেই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ইসারহাডন বুঝলেন তিনি ইসারহাডন নন।

ইসারহাডনের নাকে এলো একটা নরম মিষ্টিগন্ধ, কাণে এলো তারের বাজনার টুংটাং। ইসারহাডন দেখলেন, তিনি কিংখাবের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর শিয়রে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বসে। এই মেয়েটিকে তিনি আর কখনও দেখেননি, তবু—তবু ইসারহাডন বুঝলেন, এই মেয়েটি তাঁরই স্ত্রী।

ইসারহাডন চোখ মেলতে মেয়েটি উঠে বসে বললে, 'লয়লী, স্বামী আমার! কালরাতে কি খাটুনি-ই না গেছে তোমার! যাতে তোমার ঘুম না ভাঙে, রাতজেগে আমি পাহারা দিয়েছি। এখন ঘুম ভেঙেছে তোমার। ভাল আছো তো তুমি? রাজ্যের নায়করা সভাঘরে এসে জুটেছেন। নাও, পোষাকটা পরে নাও।'

ইসারহাডন বুঝলেন তিনি লয়লী। কিন্তু ইসারহাডন কিছুমাত্র বিস্মিত হলেন না, বরং এতকাল একথা তিনি যে জানেননি ভেবে তিনি চমৎকৃত হলেন। ইসারহাডন বিছানা ছেড়ে উঠে বেশভূষা করে নিলেন। তারপর তিনি সভাঘরে গেলেন।

'মহারাজ লয়লীর জয় হোক' বলে নায়করা ইসারহাডনের সম্বর্দ্ধনা করলেন। সবার চেয়ে যিনি বয়সে বড়, হাতজোড় করে তিনি ইসারহাডনকে জানালেন, 'মহারাজ। ইসারহাডন ক্ষান্ত হবার পাত্রটি নন। এক আধটা লড়াইটড়াই ছাড়া তাঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে না।'

ইসারহাডন কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। হুকুম দিলেন, ইসারহাডনকে বিষয়টা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য দূত পাঠানো হোক।

সেদিনকার মত *লয়লী মন্ত্রণাসভা থেকে নায়কদের ছুটি দিলেন। কয়েকটি বুদ্ধিমান নাগরিককে ডেকে বললেন, 'যাও তোমরা ইসারহাডনের সভায়, তাঁকে বুঝিয়ে বলো খামাখা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে লাভ কী?'

তখন ও কিন্তু ইসারহাডন ভাবছেন, 'তিনি লয়লী।'

ঘোড়ায় চড়ে লয়লী বুনো গাধা শিকার করতে গেলেন। নিজহাতে তুটো বুনো গাধা শিকার করলেন। প্রাসাদে ফিরে এসে লয়লী বন্ধুদের নিয়ে ভোজে বসলেন। তখন ওড়না উড়িয়ে বাঁদীর দল নাচতে এলো, লয়লীর মনে হল, খাসা নাচ।

রাত ভোর হল। লয়লী সভায় গেলেন। আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে একদল লোক মহারাজের অপেক্ষায় ছিল। বিচারের জন্য আসামীরাও হাজির আছে। লয়লী রোজকার মত উপস্থিত বিষয়গুলির মীমাংসা করলেন। সভার শেষে তিনি আবার তাঁর সখের শিকারে বার হলেন। নিজহাতে তুটো সিংহ মেরে তিনি প্রাসাদে ফিরে এসে খুব খানিকটা ঘটা করে ভোজ দিলেন। নাচে গানে আমোদে ভোজ শেষ হল। তারপর— সেইরাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন, বেছে বেছে মধুর কথা বলে তাকে খুশি করলেন, তিনি তাকে ভালোবাসলেন, কী আশ্চর্য্য সে ভালোবাসা! জেগে জেগে তার সঙ্গে লয়লীর তুইপ্রহর রাত কেটে গেল।

রাজকাজ আর মৃগয়া, এই তুই কাজে আধা আধি ভাগ হয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এককালের ইসারহাডন, আজকালের লয়লী, তাঁর নিজেরই রাজ্যে পাঠানো রাজদূতদের পথ চেয়ে কাল কাটাতে থাকেন। একমাস বাদে

* ইসারহাডন এখন থেকে লয়লী নামেই চলবেন

রাজদূতেরা ফিরে এলেন। ইসারহাডন রাজদূতদের নাক কাণ কেটে রেখেছেন—এর চেয়ে স্পষ্ট উত্তর আর কী হতে পারে!

রাজা ইসারহাডন বলে পাঠিয়েছিলেন, রাজদূতদের অদৃষ্টে যা ঘটেছে মহারাজ লয়লীর কপালে ও তার বেশী কিছু ভালো জুটবেনা। ভালো চান তো মহারাজ লয়লী ভাট ভেট সমেত মহারাজ ইসারহাডনের সভায় হুজুরে হাজির হোন।

লয়লী মন্ত্রণাসভা জুটিয়ে বসলেন। রাজ্যের নায়কেরা একগলায় বললেন, যুদ্ধ ছাড়া মান বাঁচে না। অগত্যা লয়লী রাজী হলেন। মহারাজ লয়লী নিজে সেনাবাহিনী চালিয়ে নিয়ে এ্যাসিরিয়ার দিকে ঝড়ের মত চললেন।

সাতদিন লয়লীর সেনাবাহিনী আকাশে ধূলোর ঝড় তুলে ছুটে চলল। সাতদিনের দিন পাহাড়ী জমিতে নদীর ধারে ইসারহাডনের বিশাল বাহিনী দেখা গেল।

লয়লীর সৈন্যরা প্রাণপণ যুঝল। স্বয়ং লয়লী জীবন তুচ্ছ করে লড়লেন। একসময় লয়লী দেখলেন, পাহাড়ের গা বেয়ে অগণিত শত্রুসৈন্য পিঁপড়ের মত পিলপিল করে নেমে আসছে। মহাসমুদ্রের মত বিশাল চঞ্চল শত্রুবাহিনীর সামনে পড়ে লয়লীর সৈন্যদল একবার টলমল করে হটে এলো। লয়লী ক্ষেপে গেলেন, রথ চালিয়ে যুদ্ধের কেন্দ্রভাগে তিনি ছুটে গেলেন, তাঁর উন্মত্ত তলোয়ারের কোপে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এক সময় লয়লী বুঝলেন, তিনি মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন, তাঁর হাত আর চলছে না। লয়লীর সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তিনি যুদ্ধে হারলেন। ইসারহাডনের সৈন্যঘেরাও হয়ে পায়ে হেঁটে সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে ভিক্ষুকের মত বন্দী হয়ে লয়লী চললেন। দশদিনের দিন তিনি নিনেভায় পৌছলেন। সেখানে তাঁকে খাঁচায় আটক করা হল। ক্ষুধায়, শরীরের যন্ত্রণায় তাঁর ততটা কষ্ট হল না, যতটা লজ্জায় আর নিস্ফল আক্রোশে। তিনি বুঝলেন, তিনি আর কেউ নন, শত্রুর লাঞ্ছনার জবাব দিতে তিনি অক্ষম।

শত্রুরা তাঁকে কষ্ট পেতে দেখে আমোদ পাবে, ভেবেই না মহারাজ লয়লী দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে মুখ বুজে রইলেন। এমনি করে নিশ্চয় মৃত্যু সামনে করে বিশদিন তিনি পশুর মত খাঁচাবন্দী হয়ে রইলেন। তাঁর চক্ষের সামনে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের মশানে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁদের মৃত্যুচীৎকার দূর থেকে খাঁচায় বসে তিনি শুনতে পেলেন। তাঁদের কারো হাত পা কেটে দেওয়া হল, জীবন্তে কারো গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া হল, কিন্তু লয়লী একটুও অধীর হলেন না, ভয় অনুকম্পার একটা রেখা তাঁর মুখে ফুটলনা। তাঁর স্ত্রী, যাকে ভালোবেসে তিনি নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন,

তাঁর খাঁচার সামনে দিয়ে দুটো নপুংসক তাকে বেঁধে নিয়ে গেল। লয়লী বুঝলেন, ইসার-হাডনের হারেমে তাকে বাঁদী করে রাখবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এও তিনি একটি কথাও না বলে সহ্য করলেন। কিন্তু লয়লীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল। খাঁচার সামনে একদল সিপাই মোতায়েন ছিল। তাদের একজন বললে, 'মহারাজ লয়লী, দয়া হয় তোমাকে দেখে। একদিন তুমি রাজা ছিলে, আজ তোমার একী হাল হয়েছে!' এ কথা শুনে লয়লী বুঝলেন, তিনি কী হারিয়েছেন। খাঁচার গরাদ বজ্রমুষ্টিতে তিনি আঁকড়ে ধরলেন, গরাদে পাগলের মত মাথা ঠুকে তিনি খুন হতে চাইলেন। কিন্তু নিজেকে মেরে ফেলার মত শক্তিও

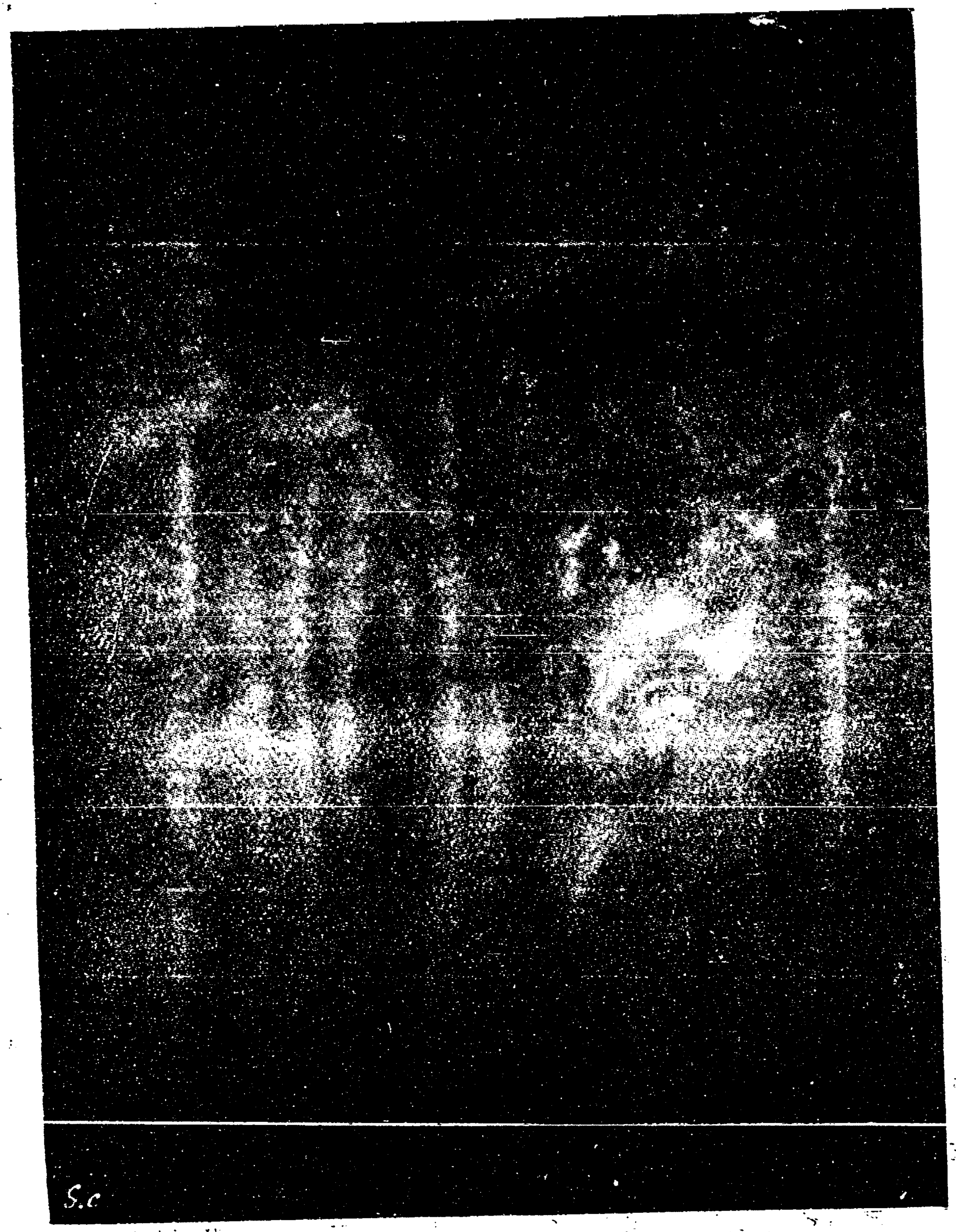

গরাদ আঁকড়ে ধরলেন

তাঁর নেই। থরথর করে তিনি কাঁপতে থাকলেন। নিস্ফল আক্রোশে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে তিনি খাঁচায় আছাড় খেয়ে পড়লেন।

তারপর একদিন—দুজন জহ্লাদ এসে খাঁচার কবাট খুললে। পিছনমোড়া করে তাঁর হাত বেঁধে তারা তাঁকে মশানে নিয়ে গেল। লয়লী দেখলেন তীক্ষ্ণ একটা লোহার ফলা থেকে টস্ টস্ করে রক্ত ঝরছে। তাঁরই এক বন্ধুকে এই মাত্র লোহার ফলা দিয়ে বেঁধা হয়েছে। লয়লী বুঝলেন, বন্ধুর রক্তে তাঁরও রক্ত মিশবে। লয়লীর শরীর থেকে তাঁর শেষ পোষাক খুলে নেওয়া হল। লয়লীর সুডৌল নধর শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেছে —নিজেকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। সেই জহ্লাদ দুজন তখন তাঁকে জাপটে ধরে তুলে ধরলে। তারা তাঁকে শূলে চড়াতে যাচ্ছে দেখে লয়লী আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, 'মৃত্যু, তারপর—তারপর সবশেষ।' মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সাহসে ভর করে তিনি নীরব থাকবেন, মহারাজ লয়লী এ সংকল্প ভুললেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই জহ্লাদ দুজনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু হুকুমের চাকর তারা—পাষাণগম্ভীর তারা সেই রক্তাক্ত শূলের দিকে এগিয়ে চলল।

'না, না, এ হতে পারেনা, এ একেবারেই অসম্ভব' লয়লী ভাবলেন। 'নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্নে সব ঘটছে।'

একি সত্যিই ঘুম? তাহলে তো জেগে পড়লেই হয়! ভয়ঙ্কর সেই ঘুম হতে লয়লী উঠতে গেলেন। লয়লী জেগে পড়লেন, কিন্তু জেগে দেখলেন তিনি ইসারহাডন নন, লয়লীও নন—তিনি যেন একরকমের জন্তু। তিনি তবে জন্তু? লয়লী বিস্মিত হলেন। আরও বিস্মিত হলেন তিনি, এ বিষয় আগে জানেন নি বলে।

পাহাড়ের ঢালু জমিতে তিনি চড়ে বেড়াচ্ছেন। দাঁতে নরম ঘাস কাটছেন আর লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। একটা লিকলিকে লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা গাধার বাচ্চা, গভীর ধূসর রঙ, পিছনে চক্কর বেচক্কর আঁকা। বাচ্চাটা ঠ্যাঙ ছুড়তে ছুড়তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো ইসারহাডনের কাছে। নরম মুখ দিয়ে বাচ্চাটা তার পেটের তলায় ঠোক্কর দিয়ে দুধের বাঁট খুঁজতে লাগল। দুধ চুষতে চুষতে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা হল। ইসারহাডন বুঝলেন তিনিই এই বাচ্চার মা। ইসারহাডন বিস্মিত হলেন না, দুঃখিতও হলেন না, বরং তাঁর একটা আশ্চর্য্য রকমের আনন্দ হল। তাঁরই সন্তান এই বাচ্চা গাধা, তাঁদের দুজনের ভিতর একই জীবন বয়ে চলেছে—এ অনুভূতি তাঁর বড়ই মধুর ঠেকল।

হঠাৎ শন্ শন্ শব্দে উড়ে এসে একটা তীর তাঁর শরীরের একধারে বিঁধলো, তীরের তীক্ষ্ণ ফলাটা তাঁর চামড়া ফুড়ে মাংসে ঢুকে গেল। দল ছাড়া হয়ে তাঁরা অনেকটা দূরে

চলে এসেছেন, নিষ্ঠুর শিকারীর হাতে পড়েছেন। বাচ্ছাকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চললেন ইসারহাডন।

গাধার দলও ছুটে চলেছে। ইসারহাডন বাচ্ছা নিয়ে দলের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। তখন আর একটা তীর ছুটে এসে বাচ্ছার গলায় বিঁধলো। চামড়া ফুড়ে মাংস বিঁধে দিয়ে তীরটা কাঁপতে থাকল। বাচ্ছাটা কাতরস্বরে ডাকতে ডাকতে মাটিতে বসে পড়ল। নিষ্ঠুর শিকারী ছুটে আসছে, না পালালে রক্ষা নেই। তবু ইসারহাডন বাচ্ছাকে ছেড়ে যেতে পারলেন না, তার শরীরটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাচ্ছাটা একবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর লম্বা সরু ঠ্যাঙগুলো তার কাঁপতে থাকল থরথর, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আবার বাচ্ছাটা।

'এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না, আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি' ভাবতে ভাবতে ইসারহাডন ঘুম ভাঙবার চেষ্টা করলেন। 'আমি লয়লী নই, গাধাও নই—আমি ইসারহাডন' —ইসারহাডন চেঁচিয়ে উঠলেন। চৌবাচ্ছার জলের তলা থেকে তখন তিনি মাথা তুলেছেন। ইসারহাডন দেখলেন সেই বুড়ো চৌবাচ্ছার পাশে দাঁড়িয়ে, তার হাতের কলস থেকে তখনও বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে।

'কী দুর্ভোগ! এ রকম কতক্ষণ?' ইসারহাডন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কতক্ষণ আর!' বুড়ো জবাব দিলে। 'জলে মাথা ডুবিয়েই তো তুমি তুলে নিয়েছ। দ্যাখো কলস থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। যাক, যা বুঝতে চেয়েছিলে বুঝেছো তো এখন?'

বুড়োর এ কথার কোনো জবাব ইসারহাডন দিতে পারলেন না। তার পানে তাকিয়ে তার মন কী একটা গভীর ভয় আর অনুভূতিতে ভরে এলো।

বুড়ো বললে, 'বুঝেছো ইসারহাডন, তুমিই লয়লী, লয়লীর যে-সৈন্যদের কাটামুণ্ড মশানে পাহাড় হয়ে আছে, তারাও তুমি-ই। শুধু কি তারাই? শিকারে বার হয়ে যে পশুদের তুমি হত্যা করেছ, যাদের মাংস মহানন্দে ভোজে বসে খেয়েছ, তাদের থেকেও তুমি আলাদা নও। তুমি ভেবেছিলে তুমি একা বেঁচে আছ। একা বেঁচে থাকতে পারো— কী ভয়ঙ্কর ভুল তোমার! আমি তোমার মোহ-যবনিকা তুলে ধরেছি, তোমাকে দেখিয়েছি, সকলের সঙ্গে তুমি বেঁচে আছো, যাকে মারছ তার সঙ্গে তুমিও মরছ। একই জীবন সকলের ভিতর বয়ে চলেছে। কারো প্রাণ নিতে যাওয়া মানে সেই জীবনকে আঘাত করা, অর্থাৎ নিজের টুটি টিপে ধরা। পরকে ঠকিয়ে, দুঃখ দিয়ে সুখী হওয়া যায় না—কারণ যে-পর সে তোমার কত আপন। সে যে তুমি-ই। তাছাড়া, তুমি মারছো কাকে?

কার গায়ে হাত তুলছ? বিরাট জীবন, যার শতকোটি অংশের এক অংশও তুমি নও, সেই জীবন কি মারবার না মরবার? যাকে মারছ, চোখে দেখছ বটে সে নেই, কিন্তু সে তখন বেঁচে উঠছে অন্য মূর্ত্তিতে, ভিন্নরূপে। মানুষ মাটী হচ্ছে, আর মাটী হচ্ছে মানুষ। রূপের অদলবদল চলছে, কিন্তু জীবন যা তাই আছে, একতিল ক্ষয় হয় নি। এক কণা জীবন চুরি করে নেওয়া, জীবনের গায়ে একটা আঁচড়কাটা মানুষের সাধ্য নয়। জীবন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে—তার সুরু নেই, শেষ নেই। জীবন হচ্ছে একমাত্র সত্য।'

ইসারহাডন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সামনে ফিটফাট পরিস্কার— কোথায় সেই বুড়ো?

রাত পোহাতে রাজা ইসারহাডন লয়লী আর তাঁর অনুচরদের মুক্তি দিলেন। লয়লী তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। তারপর, তিন দিনের দিন ইসারহাডন তাঁর পুত্র য়্যাস্থুরব্যানিপালকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে রাজ্য সঁপে দিয়ে তিনি রাজধানী ছেড়ে চললেন মরুভূমিতে। সেই বুড়োর কাছে যে সত্য তিনি শিখেছিলেন, অসীম মরুভূমির একটি নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে তিনি তার ধ্যানে বসলেন। একদিন, তারপর, তিনি সহরে পল্লীতে তাঁর সেই একরাত্রে শেখা সত্য প্রচার করে ফিরতে থাকলেন।

টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ

শ্রীসতীকান্ত গুহ

পাথুরে চীনে মানুষ

শ্রীপ্রত্নতাত্ত্বিক

চীন দেশে আজ যেখানে তার রাজধানী পেইপিঙ মহানগরী. তারই কোল দিয়ে যে হলদে নদী—চীনের হুঃখ হোয়াং হো বয়ে গিয়েছে তার উপত্যকার ধারে ধারে, তার পাহাড়ের গুহায় গুহায়, একদিন পাথুরে চীনে মানুষদের একছত্র রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস তখনও আরম্ভ হয়নি, তখনও চীনের বিরাট প্রাচীর, তখনও মিশরের পিরামিড এর জন্ম হয়নি, তারও অনেক আগে এই পাথুরে চীনে মানুষ এর দল হলদে নদীর ধারে ধারে তার পাহাড়ের গুহায় গুহায় তাদের আস্তানা বেঁধেছিল। তাদের রাজ্য ছিল উন্মুক্ত, চোখ রাঙিয়ে কেউ তাদের শাসন করত না। যতদূর হলদে নদী দেখা যায়—হলদে নদী পেরিয়ে আরো দূরে, যেখানে আরো অনেক ছোট বড় নদী. যেখানে পাহাড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে. ততদূর বিস্তৃত ছিল তাদের সাম্রাজ্য।

সেই সহস্র বছর আগেকার এক পাথুরে চীনে মানুষএর দল একটা বিশেষ আস্তান গেড়েছিল হলদে নদীর কাছে আজ সেখানে চোকুতঙ গ্রাম, সেখানে গা ঘেঁষে যে পাহাড় স্তূপ তারই গুহায় গুহায়। আজ চোকুতঙ গ্রামে রেলপথ হয়েছে, রাস্তা ঘাট হয়েছে। তখন এসব কোথায় কী? রেল তো দূরের কথা কোন পথও তখন ছিল না। তখন বন জঙ্গল ছিল গভীর—হলদে নদী বয়ে যেতো আরো অনেক জোরে। জলবাতাস আবহাওয়া ছিল তখন ভিজেভিজে। তখন বনে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে নদীর ধারে নানা রকম অদ্ভু জন্তু জানোয়ার চরে বেড়াত। হাতী গণ্ডার হায়না অনেক জন্তুজীব ছিল—আরে বড় রকমের। বাঘের দাঁত ছিল বেঁকান-ছোরার মত। এই ছোরা-দাঁতওয়ালা ভয়ঙ্ক বাঘ ছিল সেই পশুরাজ্যের রাজা। আর এই অসংখ্য জন্তু জানোয়ার সবার উপরে রাজ করত. চোকুতঙ-এর সেই সহস্র বছর আগেকার এক পাথুরে চীনে মানুষের দল। তাদের গায়ে অসাধারণ শক্তি, তাদের হাতে থাকত অমোঘ পাথুরে অস্ত্র। তাহার রাজ্য ছিল হলদে নদী ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত। হাজার পাথুরে অস্ত্র তারা তৈরী করত। এই পাথুরে অস্ত্র তৈরি করার কৌশল ও উদ্যম ছিল তাহাদের অসাধারণ। নানা রকম পাথর নানা আদব কায়দা তৈরী পাথুরে অস্ত্র নিয়ে তাদের আর ভাববার কিছু ছিল না। তারা ছিল শিকারী জাত আর তারা ছিল পাকা মজুর। পাথরের ভারী ভারী ছোট বড় অস্ত্র তৈরী করতে পাকা ওস্তাদ মজুর ছাড়া আর কে পারবে? বাড়ীঘরদোর করার দিকে তাদের এতটুকু

চোক তঙ্—পাথুরে চীনে মানুষের আস্তানা

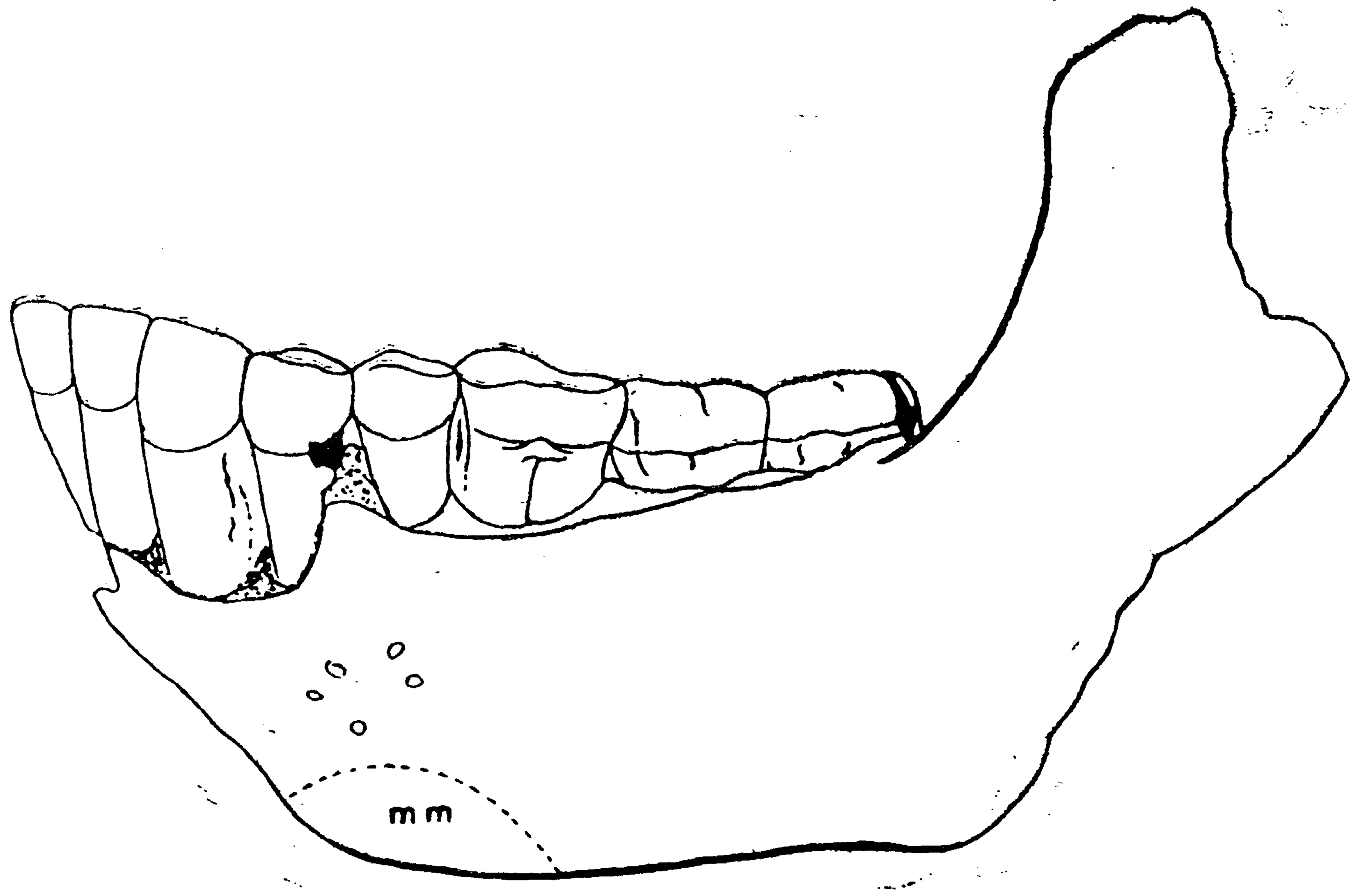

সিনানথ্রোপাসের চোয়াল

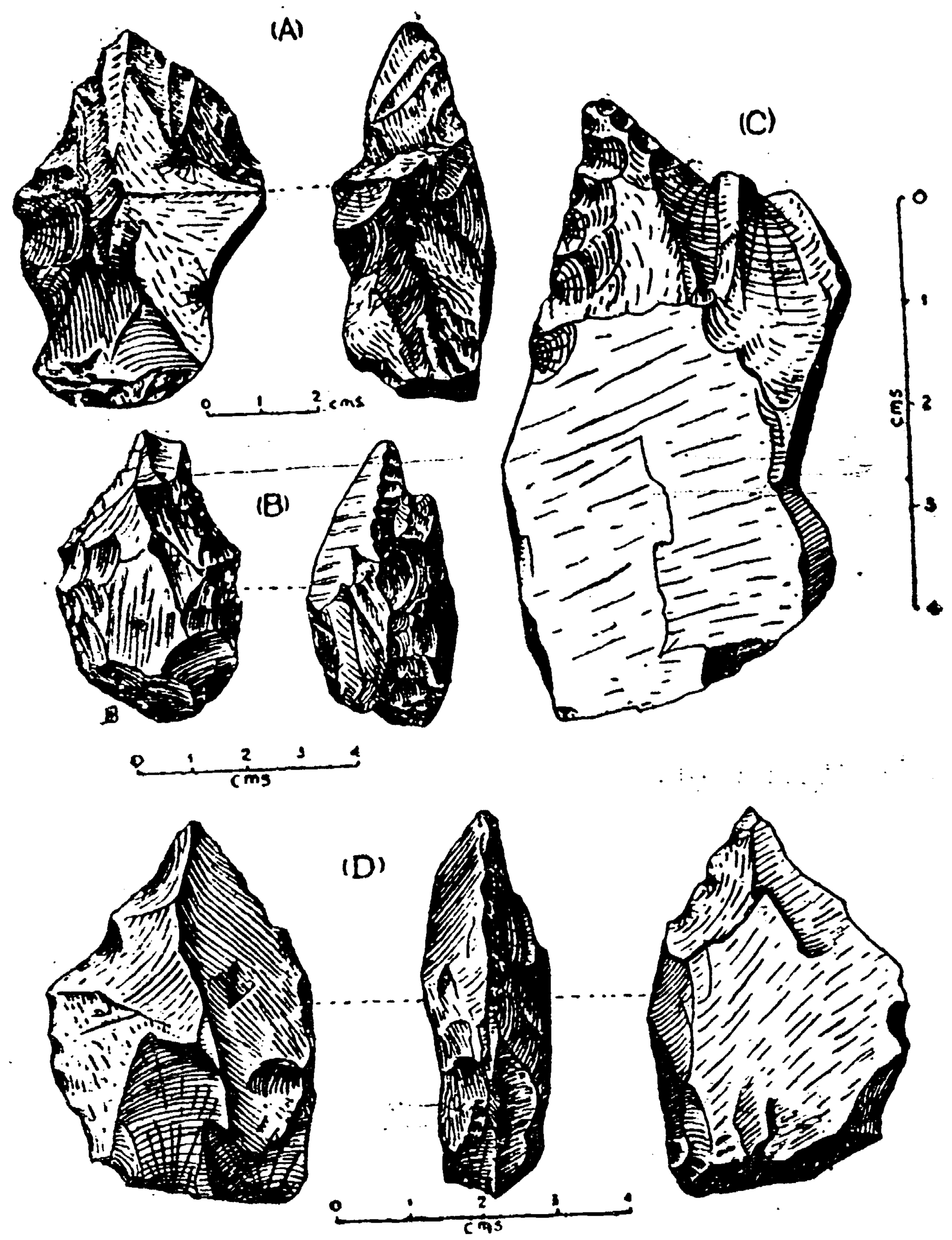

পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র

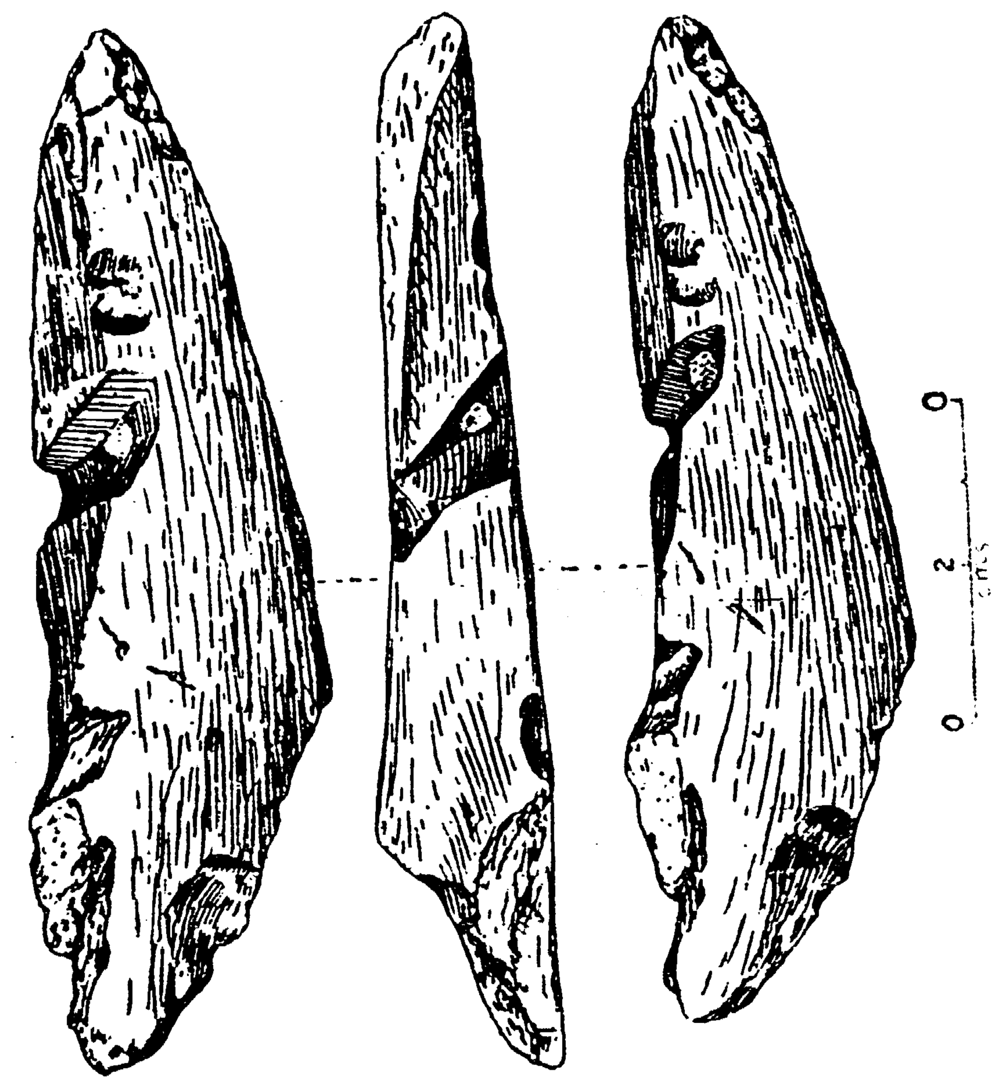

হাড়ের জিনিষ

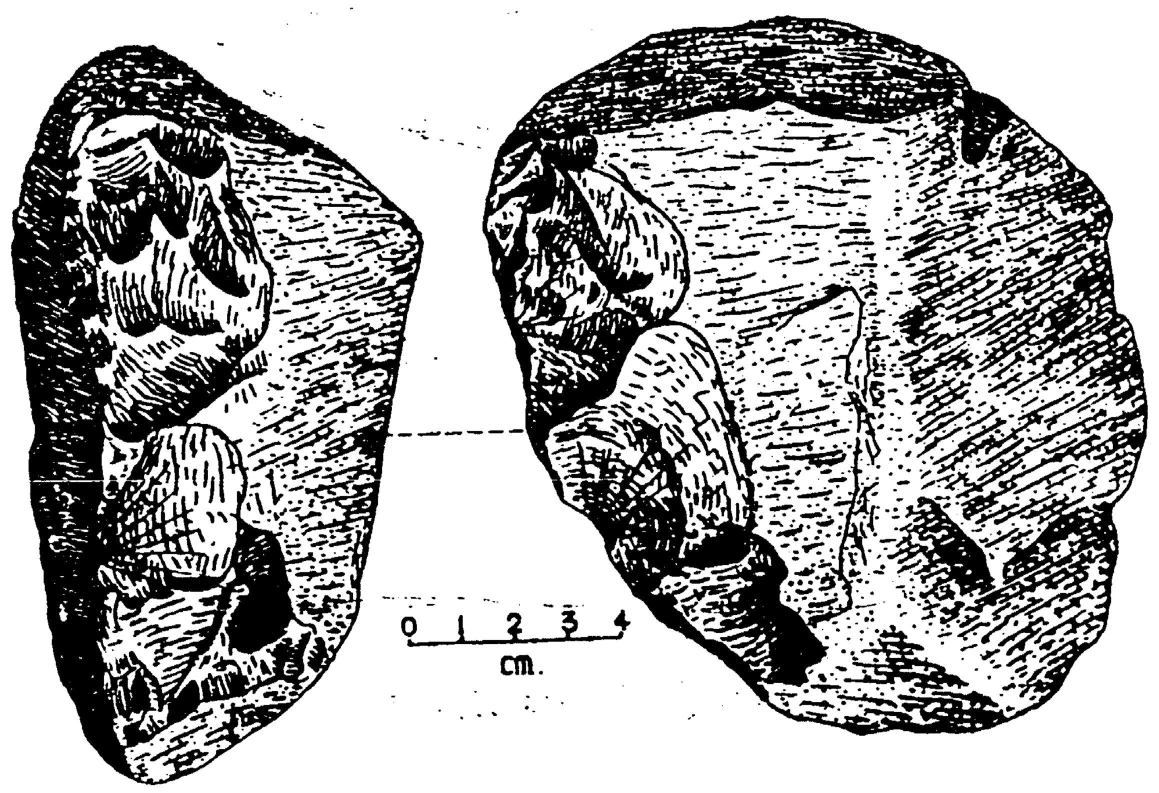

বড় পাথুরে অস্ত্র

মন ছিল না, ওসব তাদের মাথায়ও আসত না। কি দরকার ছিল তাদের ? প্রকৃতির দেওয়া পাহাড়ের কোলে তাদের গুহা ছিল, কোথাও কোথাও নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে তারা তাদের আস্তনা গাড়ত। রোজ তারা যা শিকার করত তাই নিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে তারা সুখে দিন কাটাত। কোনও চাষবাসও তারা করত না, করতে তারা জানতও না। কাজের মধ্যে তাদের ছিল বন্যপশু শিকার আর পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা। লোহা তামার তখন রেওয়াজ ছিল না, কোন গন্ধই ছিল না। কাজে লাগান দূরের কথা তার খোঁজও কেউ জানত না। সে খোঁজ নেবার কেউ তোয়াক্কাও রাখত না। কেন রাখবে ? তাদের সব কাজ তারা পাথর দিয়ে, নিজের পাকা হাতের গড়া পাথরের অস্ত্র দিয়েই বেশ ভাল ভাবেই সারতে জানত। কি দরকার তাদের লোহা ইস্পাতের যন্ত্রের—অতটা আধুনিক বর্ব্বর তারা ছিল না। পাথরই ছিল তাদের সোনা, পাথরই ছিল তাদের তামা, লোহা, সব কিছু।

আর একটা ভারী আশ্চর্য্য জিনিষ এই পাথুরে চীনে মানুষ এর দল জানত। আর যে জিনিষ তখনকার অন্য কোন দেশের পাথুরে মানুষের দল জানত না। এরা চকমকি ঘষে আগুন জ্বালাতে জানত। পাথরে পাথরে ঘষে মস্ত আগুন জ্বালিয়ে শীতের সময় তার চারধারে তারা দল বেঁধে বসত। সবই তাদের পাথর—যার যত পাথর সে তত বড়লোক। কিন্তু বড়লোক গরীব লোক তখন ছিল না কারণ সবাই ছিল মজুর। সবাইকেই পাথর ভাঙ্গতে হত গাদা গাদা—পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে হত হাজার হাজার। চীনের এই আদিম অধিবাসী পাথুরে মজুর ছিল আজকের পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মজুর চীনে মজুরের অগ্রদূত।

সারা দিনের কাজ থেকে ফিরে এসে রাতে আপনার গুহায় আগুন জ্বেলে, ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই এক সঙ্গে বসত। রাত গভীর হলে একজন সেই আগুনের পাশেই পাহারায় বসত আর সবাই যে যার সেখানে শুয়ে পড়ত। পালা করে এক একজন সমস্ত রাত পাহারায় থেকে নিজের দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করত। তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে তারা জেগে উঠত আর যে যার কাজে লেগে যেত—পাথর যোগাড় করা, পাথর ভাঙ্গা, পাথুরে অস্ত্র তৈরী করা আর বনের পশু শিকার করা।

পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, এই পাথুরে মানুষের দল আসলে একেবারেই আমাদের মত মানুষ ছিল না। ভয় পাবার কিছু নেই—তারা মানুষের মতন ছিল বটে কিন্তু আকৃতিতে গড়নে তারা খানিক মানুষ খানিক অ-মানুষ বা উপমানুষ ছিল।

ভয় পাবার কিছু নেই কারণ তারা তো রাক্ষস নয়, গুহাবাসী বিভীষণও তারা ছিল না। তারা কোন জাতের গরিলা ওরাঙওটাংও ছিল না। কেবল তাদের বন্য দেহের গড়নে

একটু আধটু মর্কটএর ভাব ছিল বটে কিন্তু তাদের মাথা, মাথার খুলি ছিল অনেকটা মানুষের মতই। মানুষের মতই সোজা হয়ে তারা চলতে জানত। তাঁদের দাঁতের চেহারা খানিক মর্কটের মত হলেও—তোমরা যদি ভাল করে লক্ষ্য কর তাহলে দেখবে, বানরের ও মানুষের দাঁতের বড় বেশী তফাৎ নেই—তবে আর প্রভেদ বড় বেশী কি হ'ল ? আমাদের চোখে হয়ত তাদের অত্যন্ত অসভ্য বন্য বলেই মনে হবে। তাদের হাত পাএর মাংসপেশী হাড় সুদৃঢ় ও ভারী, তারা দেখতে ছিল বলবান। কিন্তু তারা হিংস্র ছিল না। একসঙ্গে মিলেমিশে তারা থাকতে জানত। আর তাদের মুখে চোখে সেই উদার দৃষ্টি ছিল যা একমাত্র মানুষ জাতেরই হতে পারে। প্রভেদ থাকলেও তাদের শরীর চোখমুখের মানুষিক গড়ন দেখে তারা যে একরকম নতুন মানুষএর জাত এ কথা বৈজ্ঞানিকরা বললেন।

কিন্তু সামান্য হলেও আজকালকার মানুষের চেহারার সঙ্গে যে অমিল দেখা গেল তাও উড়িয়ে দিলে চলে না। নানা পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা এই নতুন জীবকে মানব-জাতির ভিতর খানিকটা টেনে আনলেন বটে কিন্তু তাকে ঠিক মানুষের জায়গাটা তাঁরা দিতে পারলেন না। তাঁরা এর একটা আলাদা নাম দিলেন—'সিনান্থ্রোপাস্'। পাহাড়ের গুহায়,ফাটলে, মাটির তলায়—শুধু এক আধটা নয়—ছেলে বুড়ো জোয়ান ছোটবড় অনেক রকম—সিনান্থ্রোপাসের পাথুরে মাথার খুলি, পাথুরে কঙ্কালের টুকরো—আর সিনান্থ্রোপাসের হাতের তৈরী হাজার হাজার নানা ধরণের নানা রকমের চমৎকার চমৎকার অস্ত্রশস্ত্র—এ সব দেখেই তো বোঝা গেল এদের রাজ্য ছিল একছত্র। আজকে চীনের যে মস্ত সাম্রাজ্য মস্ত সভ্যতা এর সুরু হয়েছেই সেই আদিম পাথুরে চীনে মানুষদের রাজত্ব থেকে।

যা হোক একদিন যে এই পাথুরে চীনে মানুষদের একছত্র রাজত্ব ছিল ঠিক বর্ত্তমান চীনে রাজধানী পেইপিঙএর কাছেই, হলদে নদীর ধারে, তার খবর কেউ জানতে পেত না যদি না কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক, চোকুতঙ্এর পাহাড় পর্ব্বত গভীর বনজঙ্গল ঘুরে, একদিন পাহাড়ের গুহায় তাদের লুকোন আস্তানা প্রথম খুঁজে না পেতেন। সেই পাথুরে যুগের চীনে মানুষেরা তো আজ পাথুরেই হয়ে গিয়েছে। সহস্র বছর পাথরের চাপে তাদের আর পাথর না হয়ে উপায় কী ? কিন্তু চতুর বৈজ্ঞানিক দেখবামাত্র তাদের চিনে ফেলেছিলেন। আর চাপা মাটি পাথরএর ফাঁকের ফাটল থেকে প্রকৃতিও তাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করলে। বৈজ্ঞানিকদল চাপা মাটি পাথর আরো খোদাই করে তাদের নিভৃত অন্ধকার পৃথিবীর আলোতে নিয়ে এলেন।

প্রস্তরযুগের গুহাবাসী পাথুরে উপমানুষের রহস্যরাজ্যের আবরণ এমনি করে অনাবৃত হল।

চোকুতঙ্এর এই গুহাবাসী পাথুরে চীনে মানুষই চীন সাম্রাজ্যের যে কেন সব চেয়ে আদিম অধিবাসী ছিল তার উত্তর দিয়েছেন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করেছেন যে ঐ সব হাজার হাজার পাথুরে অস্ত্র যে ঐ পাথুরে সিনান্থ্রোপাস্এর দলই তৈরী করেছে—তার মানে কী ? তার প্রমাণ কী ? এমনও তো হতে পারে যে, কোন আধুনিক কিম্বা অন্ততঃ সিনান্থ্রোপাস্ এর চেয়ে সভ্য, বা নতুন অন্য কোন জাতের মানুষ ঐ সব পাথুরে অস্ত্র তৈরী করেছে—গুহাতে তাদের ব্যবহার করা আগুনের চিহ্ন রেখে গিয়েছে ? কে দেখেছে, এমনও তো হতে পারে, সেই নতুন জাতের মানুষ সিনান্থ্রোপাসকে হত্যা করে গিয়েছে ঐ গুহাগুলির ভেতর—যেমন হয়ত সে অন্যান্য জীবজন্তু সেখানে মেরে গিয়েছে। এঁদের সন্দেহের কারণ মানুষ ছাড়া কেউ আগুন জ্বালতে পারে না—আর এই পাথরের মত সুন্দর অস্ত্রগুলি অত আদিম কোন জাতির তৈরী হতে পারে না। এর উত্তরে যে বৈজ্ঞানিক দল সিনান্থ্রোপাস্কে খুঁজে বার করেছেন, যাঁরা সেখানে বছরের পর বছর অভিযান করে সমস্ত পাহাড় জঙ্গলে মানুষ থাকবার উপযোগী আস্তানাগুলি পরীক্ষা করেছেন—তাঁরা সকলেই বলেছেন যে সিনান্থ্রোপাস্এর সেই কাল্পনিক হত্যাকারীর কোনও খোঁজ তাঁরা আজ পর্য্যন্ত পান নি। বরঞ্চ সিনান্থ্রোপাসএর মাথার পাথুরে খুলিগুলি, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও আগুন জ্বালার চিহ্ন তাঁরা এমন অবস্থায় এক সঙ্গে পেয়েছেন যে তাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে সিনান্থ্রোপাস্ই ঐ সব পাথুরে অস্ত্র তৈরী করত—সিনান্থ্রোপাসই আগুন জ্বালিয়ে বাস করত সেই গুহায়। আর সিনান্থোপাস্ তো মানুষই—মানবজাতির বিরাট গোষ্ঠীর একজনই তো তাকে বলতে হয় ! সে সময়ে দ্বিতীয় অন্য জাতের মানুষএর সেখানে আবির্ভাব যেমন আজ অপ্রমাণিত তেমনি সম্ভাবনার বাইরে।

এই আদিম পাথুরে চীনে মানুষই গোড়ায় সুরু করেছিল যে একছত্র রাজ্য আজ তা বর্ত্তমান বিরাট চীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আজকের মহাচীন দেশের মজুর সেই হলদে নদীর ধারের পাথুরে মজুর চীনে মানুষেরই যে বংশধর সে কথা অনেকে বলছেন। এতদিন যে পেইপিঙ এ পর্ব্বত গুহার মাটি পাথরের তলায় তার পাথুরে অস্ত্র সম্পদ নিয়ে চাপা পড়েছিল আজ তার শাপ মোচন হল। আজ তার সমস্ত লজ্জা আড়ষ্টতা ভেঙ্গে দিয়ে পাথুরে চীনে মানুষকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বর্ত্তমান জগতের আলোয় নিয়ে এসে তাকে সসম্মানে পেইপিঙ ও প্যারি যাদুঘরে রাখা হয়েছে। আজকের চীনে মানুষ তাদের দেখে কি ভাবে সেই জানে।

পাথুরে চীনে মানুষের রহস্য রাজ্যের এই হল গোড়ার কথা।

ছবি তোলা

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলার সখ অনেকেরই আছে। কারো দামী ক্যামেরা আছে, কারো হয়তো কম দামের বাক্স-ক্যামেরা (Box-form camera) আছে: কারো হয়তো ক্যামেরাই নাই ;—অন্যের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে।

সখ থাক্‌লেই ভাল ছবি তোলা যায় না বটে ; কিন্তু, সখ থাক্‌লে, খারাপ ছবি তু'লে দ'মে গিয়ে ছবি তোলা বন্ধ না ক'রে, আরো ভাল ছবি তুলতে চেষ্টা করার, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনা থাকে। ভাল ক্যামেরা থাক্‌লেই ভাল ছবি তোলা যাবে তার কোনও মানে নাই ; কিন্তু, ভাল ক্যামেরার সাহায্যে ভাল ছবি তোলা যে অনেক বেশী সহজ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (১) সখ, (২) ভাল ক্যামেরা আর (৩) ছবি তোলার কায়দা জানা—এই তিনটি জিনিষ একত্র হ'লে তো কথাই নাই।

যা'র কাছে কম দামের বাক্স-ক্যামেরা আছে, তা'রও দম্‌বার কোনও কারণ নাই। ছবি তুল্‌বার নিয়ম এবং কায়দা জানা থাক্‌লে তা' দিয়েও সুন্দর ছবি তোলা যায়। আমার একটি বন্ধু সেদিন ঐ রকম ক্যামেরায় তোলা কয়েকটি ছবি এনেছিলেন, তা'র প্রত্যেকটি সুন্দর আর স্পষ্ট।

ছবি তুল্‌বার সময় তিনটি কথা ভাব্‌তে হবে :

(১) ছবির বিষয়

(২) ছবির জিনিষগুলির ঠিকমত সমাবেশ

(৩) ছবি তোলার কায়দা (এবং নিয়ম)।

এই তিনটি যা'র ভাল রকম জানা আছে, সে অতি সহজেই সুন্দর ছবি তুল্‌তে পারবে। এখন, এই তিনটি বিষয়কে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

(১) **ছবির বিষয়** : তোলার কায়দা নিখুঁত হলেও, ছবির মধ্যে কোনও দেখ্‌বার মত বিষয় না থাক্‌লে সে ছবির কোনও মূল্য নাই। শুধু একটি ধূ-ধূ-করা মাঠের ছবি তুলে কি লাভ ? সেই মাঠের মধ্যে লাঙ্গল-কাঁধে কৃষক একটি থাক্‌লে হয়তো ছবি হিসাবে সেটা অনেক সুন্দর হবে। বড় নদীর জলের ছবি তুলে কোনই সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যাবে না ; কিন্তু নদীর পিছনে বাড়ী, গাছপালা ইত্যাদি, এবং জলে তু'চারটা নৌকা, পান্‌শি ইত্যাদি থাক্‌লে হয়তো সুন্দর ছবি হবে। দিনের বেলা তোলা নদীর জলের ছবি হয়তো

একেবারে সৌন্দর্য্যহীন মনে হবে ; কিন্তু সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তে তোলা সেই নদীর উপর আলো-ছায়ার খেলা ছবিতে নদীকে অপরূপ সৌন্দর্য্য দেবে। অন্যমনস্ক খুকী বা খোকাবাবুর ছবির তত মূল্য নাই, যতটা তা'র হাসি, কৌতুহল প্রভৃতি ভাবের ছবির মূল্য আছে। জীবজন্তুর ছবির সম্বন্ধেও তাই। তাদেরও খেলাধূলা, কৌতুহলী ভাব প্রভৃতির ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাশের পূঞ্জীভূত মেঘ যে কি সুন্দর, ছবিতে তা' অনেক সময় বেশ বোঝা যায় ;—সেটা, তুল্‌তে জানার উপর অনেকটা নির্ভর করে। মোট কথা, ছবিতে দ্রষ্টব্য জিনিষ চাই, কৌতুহল জাগাবার মত কিছু চাই।

(২) **ছবির জিনিষগুলির (বা অংশগুলির) ঠিকমত সমাবেশ** : ছবি তুল্‌বার সময় এ বিষয়ে খেয়াল থাকা খুবই দরকার। হয়তো খোকাবাবুর হাসির একটা সুন্দর ছবি তুল্‌লে, কিন্তু মুখখানাই একপেশে হয়ে গেল আর ছবির মাঝখানে একটা মোটা বাঁশের ছবি উঠে একদম ছবির চেহারা মাটি করে দিল। একটা পাহাড়ে জায়গার ছবি হয়তো তুল্‌লে কিন্তু পাহাড় গিয়ে উঠ্‌ল আকাশে ; আকাশ গেল ছবি থেকে প্রায় বাদই প'ড়ে। কিম্বা, ছবির বেশীর ভাগই উঠ্‌ল আকাশ ; পাহাড় একেবারে নীচে দেখা গেল ; সামনের জমি বাদই প'ড়ে গেল। তা' ছাড়া ছবির চারিপাশের জায়গার তারতম্য হওয়ায়ও অনেক সময় ছবির চেহারা মাটি হয়। মুখের ছবির চারিদিকে জায়গা না থাকায়, অথবা অতিরিক্ত জায়গা থাকায়, অথবা বেখাপ্পাভাবে চারিদিকে জায়গা রাখায় ছবি অনেক সময় খারাপ হয়। অনেকের ছবি একত্রে তুল্‌বার সময় (Group photo) সাজাবার অভাবে অনেক সময়ই ছবি খারাপ দেখায়। মেঘের ছবি তুল্‌তে গিয়ে হয়তো মেঘ গেল একেবারে উপরে—সম্মুখে বাড়ী বা গাছে ভরা। দাদুর হাত ধরে নাতি বা নাত্‌নি চলেছে, এই ছবি তুল্‌তে গিয়ে হয়তো নাতি বা নাত্‌নি একটু পিছনে পড়ায় মনে হলো দাদু একটি পুতুল নিয়ে চলেছেন ; কিম্বা, দাদুর আড়ালে নাতি বা নাত্‌নি লুকিয়ে। এ রকমের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। সামান্য দু চারিটি যা' দিলাম তা' থেকেই বুঝ্‌বে, ছবির মধ্যে যে জিনিষগুলি উঠবে তাদের ঠিক মত সমাবেশ হওয়া নিতান্ত দরকার।

(৩) **ছবি তোলার কায়দা (এবং নিয়ম)** : এটি জানা না থাক্‌লে সবই মাটি। ক্যামেরা কি ভাবে ধরতে, খাটাতে এবং ব্যবহার করতে হবে ; আলো কি ভাবে এলে ছবি ভাল উঠবে, এক্সপোজার কতখানি দিতে হবে, কত বড় 'ষ্টপ' ব্যবহার করা হবে, যে জিনিষের ছবি তোলা হবে তার দূরত্ব আন্দাজ কেমন ক'রে করা হবে, ইত্যাদি বিষয় জানা না থাক্‌লে ভাল ছবি কেমন করে তুল্‌বে ? অধিকাংশ কম দামী ক্যামেরায় 'ভিউ ফাইণ্ডার' [view finder] দেওয়া থাকে ; তার মধ্যে যে ছোট ছবি দেখা যায় সেটি দেখেই ছবির

সম্বন্ধে সব ঠিক করতে হবে। জিনিষের দূরত্ব কম বেশী হলে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সে সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে না ;—সেটি তোমার নিজের আন্দাজ দিয়ে ঠিক করতে হবে। এক্সপোজার সম্বন্ধেও তোমার নিজের আন্দাজ থাকা চাই। ক্যামেরা বাঁকা করে ধরায় অনেক সময় ছবিতে সবই যেন কাৎ হয়ে আছে দেখায়। প্রথম প্রথম ছবি তুলতে গিয়ে অনেক সময় ক্যামেরা নড়ে যায়। তাতে হয় ছবি ঝাপসা ওঠে নয় তো ছবি একপেশে হয়ে যায়। কত সময় মুণ্ডুকাটা ছবি ওঠে, কত সময় শুধু মুণ্ডুই ওঠে,—বাকিটুকু সব আকাশ। ক্যামেরার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলার নানা অসুবিধা ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে বটে, কিন্তু, তবুও, নিয়ম-কানুন সবই জানা থাকা দরকার। আলো কোন্ দিক দিয়ে এলে ছবি ভাল উঠবে, সেটা জানা না থাকায়ও অনেক সময় বিভ্রাট ঘটে। পিছনে উজ্জ্বল আলো থাকলে প্রায়ই মানুষের চেহারা কালো ভূত উঠবে, মুখের চেহারা ঠিক রাখতে গেলে পিছন দিকটা একেবারে জ্বল জ্বলে শাদা হয়ে ছবি মাটি করে দেবে। ভাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুল্‌লেও আলো ঠিক না হলে ছবি ঠিক উঠবে না। এই রকমের নানা খুঁটিনাটি বিষয় জানা থাক্‌লে তবে ওস্তাদ ফটোগ্রাফার হওয়া চলে।

এবার বিষয়টির মোটামুটি আলোচনা কর্‌লাম, পরে এক একটি বিষয় নিয়ে দু'চারটি কথা বল্‌বার ইচ্ছা রইল। ক্যামেরা সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা ভবিষ্যতে বল্‌বার ইচ্ছা রইল —যদি তোমাদের শুন্‌বার ইচ্ছা এবং উৎসাহ আছে বলে জান্‌তে পারি।

চলন্তিকা

বর্ত্তমান তুর্কীর প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশা আর ইহ জগতে নেই। গত ৯ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কামাল ছিলেন বিদ্রোহী পুরুষ—সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন তুর্কীকে ভেঙ্গে চুরে তাকে নতুন করে কামাল গড়েছিলেন। আজ তাঁর অকাল মৃত্যুতে হয়ত এই অশান্তি-পূর্ণ জগতে আরও অশান্তি আসবে। কে জানে আজকের এই দুর্ব্বল তুর্কীদেশ ইউরোপের অগ্নি দৃষ্টি থেকে কেমন করে নিজেকে বাঁচিয়ে অশান্তি ও বিগ্রহ থেকে রক্ষা পাবে! তুর্কীতে অবশ্য কামালের নিজের হাতে গড়া নির্ভীক সেনাপতির অভাব নেই কিন্তু নাৎসী জার্ম্মাণীর গায়ের জোর ও চোখ রাঙানি অমান্য করতে আর এক কামাল পাশার প্রয়োজন। গত মাসের রংমশালে আমরা লিখেছিলাম তুর্কীর পূর্ব্ব মন্ত্রী ইসমেৎ পাশা কামালের গদীতে বসবেন। ইসমেৎ পাশাই আজ শোকসন্তপ্ত তুর্কীর নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন কামাল পাশার রাজনীতিই তিনি মান্য করে চলবেন।

ভারত বিখ্যাত সেতারিয়ে প্রঃ এনায়েৎ খাঁ গত ১১ই নভেম্বর শুক্রবার কলিকাতায় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এনায়েৎ খাঁ ছিলেন সুরের যাদুকর—তাঁর ঐন্দ্রজালিক সুরবাহার ও সেতার বাজনা যে একবার শুনেছে সে কখনও ভুলবে না। তাঁর মধুর হাতে সেতার মূর্ত্ত হয়ে উঠত। ভারতের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতারিয়ে ছিলেন। এবার এলাহাবাদে মিউজিক কনফারেন্সে তিনি সেতার বাজাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এনায়েৎ খাঁ এর পিতা ৺ইমদাদ খাঁ ছিলেন খুবই বড় ওস্তাদ, তিনি ইন্দোর রাজসভার ওস্তাদ ছিলেন। এনায়েৎ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার অধিকাংশ গুণের অধিকারী হয়ে তিনিও ইন্দোরের সভা-সেতারিয়ে নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর আগে তিনি কলিকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। মৃত্যুকালে এনায়েৎ খাঁ গৌরীপুর দরবারের রাজওস্তাদ ছিলেন। তাঁর পুত্র বেলায়েৎ খাঁও একজন গুণী সেতারিয়ে। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ এর মৃত্যুতে ভারতের সঙ্গীত মহল যে ক্ষতিগ্রস্ত হল তা বলা বাহুল্য।

চীন দেশের মর্ম্মান্তিক নিগ্রহে ও জাপানের অত্যাচারে ও বর্ব্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপানী কবি নোগুচিকে তাঁর পত্রের উত্তরে বলেছেন যে, তাঁরা কি মনে করেন যে শবের বিরাট পাহাড় সাজিয়ে, সহর গ্রাম লুট করে আগুনে পুড়িয়ে কখনও এই দুই বিরাট দেশের মিলন ঘটাতে পারবেন? নোগুচি লিখেছেন, চীনেরা জাপানীদের জব্দ করবার জন্য তাদের নিজেদের সমস্ত প্রাসাদে কলাভবনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। নোগুচির এ কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নেপোলিয়নের মনের অবস্থাটা এরকমই হয়েছিল—যখন রাশিয়ার মস্কো সহর আক্রমণ করে তিনি দেখলেন সেখানকার ঘরবাড়ী সব দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। শত্রুহাতে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে নিজেদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিজেদের হাতে ধ্বংস করা ঢের ভাল। পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—আমি আজ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলছি, তোমার দেশবাসীদের আমি ভালবাসলেও তোমাদের কোন শুভকামনা আমি করতে আজ অক্ষম। তোমাদের শীঘ্র অনুতাপ ঘটে এই প্রার্থনা করি।

প্যালেষ্টাইন আরবদের দেশ। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে আজ অশান্তির শেষ নেই। সেখানে আজকের এই ইহুদী-আরব দাঙ্গাহাঙ্গামার সুবিধে নিয়ে ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হটিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ইংলণ্ডের আপন ইচ্ছে নয় যে এই দুই অত্যাচারিত জাতির কোন মিলন ঘটে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ড তার নিজের স্বার্থের জন্য এই দুই জাতিকেই নানা লোভ দেখিয়ে বাকচাতুরী ও ছলনায় তাদের ধ্বংসের পথে টেনে এনেছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইন আজ একেবারে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। হুমকি কামানের গোলা তাদের আরও অশান্ত করে তুলছে। ইউরোপে এক সভায় পণ্ডিত জহরলাল বলেছেন যে আজকের প্যালেষ্টাইনে যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহুদী-আরব সংঘর্ষ প্রভৃতি বেধেছে, তার জন্য সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডই দায়ী। প্যালেষ্টাইনের পুরোপুরি অধিকার স্বায়ত্তশাসন আরবদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আরবদেরও উচিত ইহুদিদের ন্যায্য ক্ষমতা দিয়ে তাদের থাকবার জায়গা দিয়ে মিলেমিশে বসবাস করা। ইংলণ্ড আর কোন ছলনা করে কিছুতেই পূর্ণ অধিকার থেকে আরবদের বঞ্চিত রাখতে পারবে না। স্বাধীনচেতা দুর্দ্ধর্ষ আরব হীনতা ঘৃণা করে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সে আজ অস্ত্রধারণ করেছে। তার আসল যুদ্ধ ইহুদীদের বিরুদ্ধে নয়।

এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন একজন আমেরিকান মহিলা সাহিত্যিক। তাঁর নাম মিসেস পার্ল বাক। তাঁর যে বইটি পৃথিবীতে নাম কিনেছে সে বইটির নাম—

The Good Earth। বইটি চীনদেশের কৃষক জীবন নিয়ে লেখা। The Good Earth কেবল একটি বিরাট উপন্যাস নয়—লেখিকা নিজে চীনদেশে ছিলেন, সেখানকার ভাষা তিনি জানেন, সেখানে নিজের চোখে যা দেখেছেন, নিজের দরদী অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছেন বইটি তারই একটি প্রতিলিপি। উর্ব্বরা সহনশীলা ধরিত্রীমাতার সঙ্গে মহাচীনের তুলনা করে তিনি তাকে মহিয়সী করেছেন তাঁর লেখায়। মিসেস বাককে নোবেল প্রাইজ দিয়ে শুধু তাঁকেই সম্মান দেখান হয়নি সেই অতি প্রাচীন একদা সমৃদ্ধিশালিনী মহাচীন দেশের প্রতিও সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে। মিসেস বাক যখন মাত্র চার বৎসরের শিশু তখন তিনি চীন দেশে যান। এমন কি ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করার আগে তিনি চীন ভাষা শিখেছিলেন। পরে দেশে ফিরে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করে তিনি চীন দেশে ফিরে ইংরাজি অধ্যাপনার কাজ করেন। মিসেস বাক এর পূর্ব্বে আরও তিন জন মহিলা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম সেলমা লাগেরলফ, গ্রংসিয়া দেলেদ্দা ও সিগ্রীড উণ্ডসেট। মিসেস বাক আরও কয়েকটি ইংরাজি ও চীনে বই লিখেছেন।

উল্টো মানুষের নাম শুনেছ কখনও? হাঁ, তা তাকে উল্টো মানুষই বলতে হয় বটে। তা ছাড়া কী? আমরা যেমন সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে দেখি তেমন করে দেখলে তার কাছে পৃথিবীটাই সত্যিই উল্টো। দুপায়ের মধ্যখানে মাথা নীচু করে নামিয়ে পেছন দিয়ে ফিরে তবে সে সোজা দেখতে পায়। নইলে চোখের সামনে তার যে মানুষগুলো চলাফেরা করছে সব উল্টো। পৃথিবী তার ওপরে, আকাশ নীচে। এই উল্টো মানুষটির নাম জ্যাক পেরো। লোকে তাকে বলে পাগল, তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। কিন্তু হাসি তামাসা নয়, এ তার চোখের অসুখ। যদিও সে অসুখ তার অদ্ভুত ও অসাধারণ বলতেই হয়। জ্যাক পেরোর বাড়ীতে একবার একটা বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ দুর্ঘটনা হয়, তার ফলে আগুনের ভেতর থেকে অজ্ঞান অবস্থায় টেনে বের করে তাকে বাঁচান হয়। তারপর থেকেই তার চোখের অসুখ। তার চোখের সামনে সে সব উল্টো দেখে। সোজা ভাবে দেখতে হলেই তাকে তার মাথা নীচু করে এনে দুপায়ের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। পেরোর সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হবার সব ঠিক ছিল। কিন্তু এই উল্টো মানুষকে নিয়ে সে ঘরসংসার কি করবে? তাই দুঃখে বেদনায় ও লোকের তামাসায় ক্ষুব্ধ হয়ে বেচারা পেরো জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

জনপ্রিয় বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীননীগোপাল মজুমদার সিন্দ প্রদেশে জহুতে এক ডাকাতের দলের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মরুভূমিতে

ঘুরতে হয়। জহুতে লোকালয়ের অনেক বাইরে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে কর্ম্মচারীদের নিয়ে তিনি ছিলেন। যেদিন সকালে ডাকাতরা ননীবাবুকে হত্যা করে, তার আগের দিন রাত্রে তারা কাথিয়ায় এক জমীদার বাড়ী লুট করেছিল। ভোর রাত্রে এই ডাকাতের দল জহুর ধার দিয়ে ফিরছিল—হঠাৎ তারা ননীবাবুর তাঁবুগুলি দেখতে পায়। তখন এই ডাকাতের দল কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে বন্দুকের। আওয়াজ শুনে ননীবাবু ও তাঁর কর্ম্মচারীরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন। ননীবাবু বেরিয়ে আসা মাত্রই ডাকাতের দলের একজন তখনই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলে—অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ও খুন করে। তারপর তাঁবু লুটপাট করে তারা উধাও হয়। দিনে ডাকাতি ও এই সব খুন জখম করাচী প্রদেশের লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ননীবাবু কেবল তাঁবুর বাইরে এসে দাড়িয়ে ছিলেন মাত্র, তখনই ডাকাতের গুলীতে তিনি মারা পড়েন। শোনা যাচ্ছে পুলিশে ঐ জায়গা এরোপ্লেন ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক মজুমদার মশাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কাজ ইউরোপেও খুব প্রশংসা পেয়েছিল। ডাকাতের হাতে তাঁর এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়েছি। আমরা তাঁর সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

সেণ্ট নেভিল ও ড্রাগন

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দিন খুব একটা বড় রকমের বীরত্ব প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেনি—বয়স বেড়ে চলেছে, যৌবনের উৎসাহ কিন্তু এখনও কমেনি, সেণ্টনেভিল চলেছিলেন পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে আকাশ পথে। দেশ দেশান্তরের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে চলেছে—কোথায় কোন্ যোদ্ধা বর্ম্ম এঁটে তলোয়ার হাতে যুদ্ধের আশায় অপেক্ষা করে আছে, কোথায় কোন্ সুন্দরী রাজকন্যাকে দস্যুরা বন্দী করে রেখেছে তারি সন্ধানে।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে তিনি দেখেন—এক গাছের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে আছে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে, তার পাশেই দাড়িয়ে রয়েছে এক ভীষণ আকৃতির ড্রাগন। তার রক্ত চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে, লকলকে জিভ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, নিশ্বাসে চারিপাশের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটি সেণ্টনেভিলকে দেখে করুণ সুরে কেঁদে উঠলো—"রক্ষা করুন আমায়। এই দুষ্ট রাক্ষসটা আমার হাত পা খেয়ে ফেলতে চাইছে।"

সেণ্টনেভিল একটিবার হাওয়ায় তলোয়ার ঘুরিয়ে নিলেন বন্‌বন্। তারপর গোঁফ নেড়ে বললেন, "নির্ভয় হও। আমি মুস্কিল আসান করে দিচ্ছি।"

ড্রাগনের দিকে ফিরে সেণ্টনেভিল ভ্রূকুঁচকে বললেন "ত্যাখো বাপু এই মেয়েটিকে প্রাণে মারা তোমার উচিত হয় না। আমি কথা দিয়েছি একে, যদি নিরস্ত না হও তোমার সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকে লড়াই করতেই হবে।"

ড্রাগনের চোখমুখ দিয়ে খানিকটা আগুনের হল্কা বার হয়ে এলো—হুম্ হুম্ করে সে বলে উঠল—"বটে! আমি এই মেয়েটার হাত পা খাবোই খাবো।"

সেণ্ট তলোয়ারের খাপে একবার হাত দিলেন, তখন ড্রাগনের ভীষণ মূর্ত্তিটা তার চোখে পড়ল। সেণ্ট নেভিল একটু যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন, খানিকটা মাথা চুলকলেন। একটা বুদ্ধি তার মাথায় এলো, একটু হেসে তিনি বললেন "আহা, এত চটো কেন? খাওনা তুমি মেয়েটির হাত পা। কিন্তু দেখো বাপু, মেয়েটি যেন প্রাণে না মরে।"

ড্রাগন আমতা আমতা করে বললে, "সে কী রকম?"

সেণ্ট নেভিল মুরব্বি চালে হেসে বললেন, "কী রকম আবার! রকমটা নিতান্ত সোজা।

তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি মেয়েটির হাত পা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। আমি নয় মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে ধরে রাখব, তুমি আস্তে আস্তে বেশী ব্যথা না দিয়ে হাত পা খাবে, বুঝেছ।"

মেয়েটির চোখ কপালে উঠল। কপাল চাপড়ে কেঁদে সে বললে, "আমার হাত পা খেলে আমি কি আর বেঁচে থাকবো! সেণ্ট নেভিল. এতবড় বীরপুরুষ হয়ে আপনি এ কী বলছেন?"

সেণ্ট নেভিল গলা খাখারি দিয়ে বললেন, "চুপ। আর একটি কথা নয়। এসব ব্যাপার আমি বেশ ভালোই বুঝি। নাও, এসো, লক্ষ্মীটির মত চুপ হয়ে শুয়ে পড়ো।"

মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে ধরে সেণ্ট নেভিল মেলোয়েম স্বরে বললেন, "ড্রাগন মশাই আপনি এখন তাহলে"—

ড্রাগন হাহা করে হেসে বললে, "তা বেশ, তা বেশ,—"

মেয়েটির হাত পা খাওয়া শেষ হল।

সেণ্ট নেভিল তখন একগাল হেসে বললেন, "আচ্ছা ড্রাগন মশাই, এখনকার মত বিদায় হই। আপনার সঙ্গে দেখা হল, পরম সুখের বিষয়।"

ড্রাগন ভদ্রতা করে ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললে "আমার স্পষ্টই ধারণা হচ্চে আপনার মত এত বড় বীর পুরুষ আর ত্রিভুবনে নেই।"

হেঁহেঁ করে হেসে খাপে ভোঁতা তলোয়ারটা পুরে নিয়ে সেণ্ট নেভিল একদিকে চলে গেলেন। ড্রাগনটা গর্জ্জন করতে করতে একদিকে চলল।

মেয়েটির তখন হয়ে এসেছে। সে কাতর স্বরে বলে উঠল—"সেণ্ট নেভিল মশাই, একটু দাঁড়ান, একটু শুনুন।"

কিন্তু কে শোনে! সেণ্ট নেভিলের পক্ষীরাজ তখন পশ্চিমের দিকে দ্রুত প্রস্থান করছে।

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

চাঁদ এসেছে চাঁদ হেসেছে

শ্রীসতীকান্ত গুহ

ঘুম্ ঘুমা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্তা ঘুমা ঘুম্
আয় নেমে আয় ঘুম
ঘুম নেমে আয় রাতের ছায়ায়
হাওয়ার পাখায় ঘুম
আয়রে নেমে একটু থেমে
শিরশিরিয়ে ঘুম
থির থির থির খোকনমণির
চোখের পাতায় ঘুম

ঘুমতা ঘুমা ঘুমা
চাঁদের চোখে কে দিয়েছে ঘুম-আদুরে চুমা
কে দিয়েছে হায় রে খোকন
চাঁদের চোখে চুমুর আঁকন
কে দিয়েছে কে দিয়েছে কে দিয়েছে রে
চাঁদ এসেছে চাঁদ হেসেছে
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্
আয় নেমে আয় ঘুম
আয়রে নেমে খানিক রেঙে
আয় স্বপনের ঘুম
চাঁদের চোখে তারার চোখে
তোমার চোখে আমার চোখে

মায়ের চোখে খোকার চোখে
ঢুল-কাজলের ঘুম
লাল পাহাড়ে নীল পাহাড়ে
হিম পাহাড়ে সব পাহাড়ে
বরফ চূড়োর মেঘের সারে
এলিয়ে পড়া ঘুম
পাখীর চোখে পাতার চোখে
ছোট্ট ঝিঁঝির ঝিমোন চোখে
'ঘুমিয়ে পড়া রাতের চোখে
ঘুমিয়ে পড়া ঘুম
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম

ঘুম নেমে আয় রে
নিশুতরাতে আকাশটাতে ঘুমিয়ে কে যায় রে
ঘুমের বুড়ো হায়রে খোকন
ঘুমিয়ে বুঝি দেখছে স্বপন
কে ঘুমোল কে ঘুমোল কে ঘুমোল রে
চাঁদ ঘুমোল রাত জুড়োল
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

রাত জুড়োল পাড়া জুড়োল
চাঁদ ঘুমোল রে
নড়নকাটি চড়নকাটি
এলিয়ে রল রে,
নড়নকাটি নড়বে না,
চড়নকাটি চড়বে না,
চোখের পাতা পড়বে না
থির থির থির ঘুম

পাখীর ঠোঁটে ফুটবে না
গানের কলি ফুটবে না
'আয় খোকা' গান ফুটবে না
ধীর ধীর ধীর ঘুম
মৌমাছিরা জুটবে না
ফুলের বনে জুটবে না
ফুলের মধু লুটবেনা
শির শির শির ঘুম
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্

ঘুমিয়ে ঘুমোয় রাতের আকাশ
ঘুমিয়ে ঘুমোয় চাঁদ
চাঁদ পেতেছে ঘুম ধরিবার
আল্‌গা বাঁধন ফাঁদ
কে পেতেছে ফাঁদ পেতেছে
কে পেতেছে রে
চাঁদ পেতেছে চাঁদ হেসেছে
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

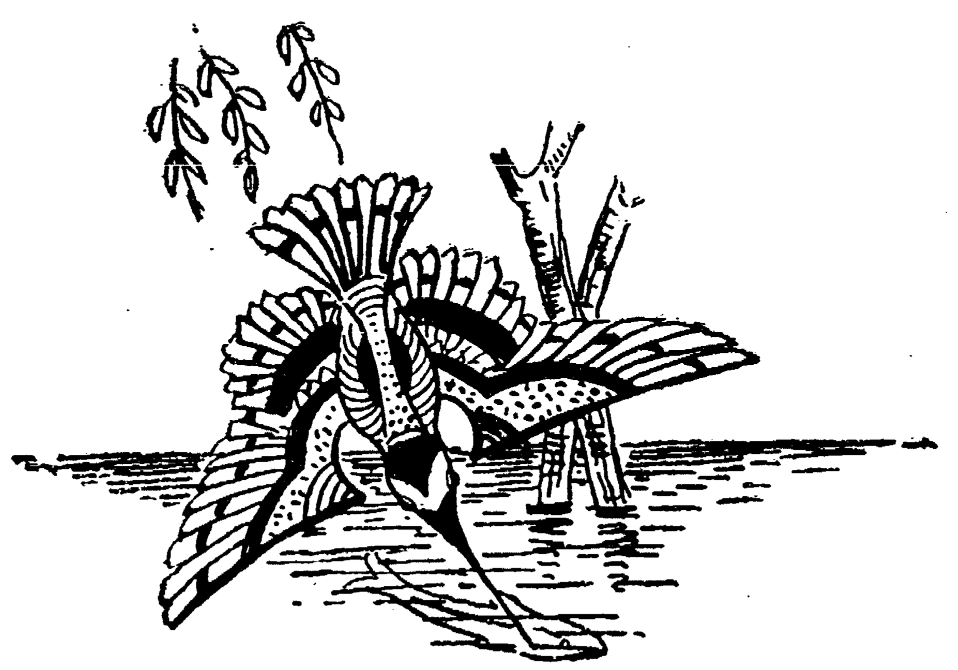

ছুটির ঘণ্টা

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্ট—

এবারেও ফাইনালের খেলা হল সেই হিন্দু আর মুস্‌লিম দলের ভিতরেই। সে দিক দিয়ে নূতনত্ব কিছু না থাক্‌লেও খেলাটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খুবই প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। টসে জিতে মুস্‌লিম দল ব্যাট্ করতে নামলেন—কিন্তু রাণ করলেন মোটে ১৩[illegible]। তার ভিতর দাউদ খাঁ ৫৪, গোলাম মহম্মদ ৩৪—আর কারও কথা না বলাই ভাল। হিন্দু দলও যে খুব বেশী রাণ করলেন তা নয়—তাদের রাণ হল ২১[illegible]। তরুণ সত্‌রাম দাস খেললেন চমৎকার! তাঁর রাণ হল ৯৫—এবং তাঁকে আউট করতে গিয়ে সকলেই হার মানলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও মুসলীম দল ওবাজী ও গোপালদাসের হাতে বেশীক্ষণ টিকলেন না। মাত্র ১৭৫ রাণ হল। হিন্দু দলের জয় তখন অনেকটা সুনিশ্চিত। ৬ উইকেটে ৭২ রাণ করে সহজেই তারা মুসলিম দলকে পরাস্ত করলেন।

রঞ্জি টুর্ণামেণ্ট—

রঞ্জি টুর্ণামেণ্টের কথা তোমরা জান নিশ্চয়ই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাদের সেরা খেলোয়াড় নিয়ে এতে যোগ দেন। গত বছরের বিজয়ী নবনগর অমরসিং, কোলা, এস্, ব্যানার্জ্জি, মানকাদ প্রভৃতি নামজাদা টেষ্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে গুজরাটকে হারিয়ে দিয়েছেন। এদের ভিতর মানকাদ যেমন প্রথম ইনিংসে রাণ করেছেন ৮০, তেমনি ২১ রাণে ৫ উইকেটও নিয়েছেন। ব্যাটিং এবং বোলিং—তুটোতেই এতখানি কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেন নি।

ওদিকে বোম্বে এবার অনেকখানি আশা নিয়ে খেলার মাঠে নেমেছিলেন। জয় হল তাদের ক্যাপ্টেন এবং মার্চ্চেণ্ট, হিণ্ডেলকার, হাভেওয়ালা, কাদ্রি—কেউ ত কম যান না! বরোদার সঙ্গে খেলায় তারা মাত্র করলেন ৪৪১; তার ভিতর মার্চ্চেণ্ট একাই করলেন ১৪৩। বরোদার নিম্বলকর খুব ভাল খেললেন, ১১৯টী রাণ ও করলেন বটে কিন্তু তার দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। বরোদার মোট রাণ সংখ্যা হল মাত্র ৩২৬। তারপর বোম্বে খেল্‌তে নামলেন সিন্ধুর বিরুদ্ধে। মার্চ্চেণ্টের হাতে আবার একটী সেঞ্চুরী হ'ল। বোম্বের রাণ হল ৩৬৬ এবং সিন্ধুর ইনিংস যে ভাবে সুরু হ'ল তাতে তাদের পরাজয় সম্বন্ধে কারও একটুকু সন্দেহ রইল না। হঠাৎ হাওয়া বদলে গেল, নওমলের হাতে ব্যাট ছুট্‌ল চাবুকের মত, রাণের সংখ্যা বেড়ে চল্‌ল। উইকেট তুলে নেবার যখন মাত্র ৫ মিনিট বাকী তখনও বোম্বের জয়ের আশা যায় নি। কিন্তু তার তিন মিনিটের ভিতরই সিন্ধুর রাণের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৩৭০। বোম্বের মাথা হেঁট হল। নওমল ১৪৯ রাণ করে সিন্ধুকে জয়ী করলেন।

নিখিল বঙ্গ সন্তরণ প্রতিযোগিতা—

খুব সমারোহ করে সেদিন বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। হাটখোলার তরুণ সাঁতারু শ্রীমান শচীন্দ্র নাগ এই প্রতিযোগিতায় খুব বাহাদুরী দেখিয়েছেন। ১০০ মিটার 'ফ্রি ষ্টাইল' সাঁতারে তিনি প্রথম হন; এতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ১ মিঃ ৪ ৪/৫ সেঃ। ৪০০ মিটার সাঁতারেও কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারেনি। এতেও তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ৫ মিঃ ৩১.৬ সেকেণ্ড।

আর একটী বিখ্যাত প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের টুর্ণামেণ্ট। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে পি মল্লিক মাত্র ৩ মিঃ ৬.৪ সেকেণ্ডে জয়ী হয়ে এক নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। মহিলারাও কিছু কম যান না। মাত্র ১ মিঃ ২৮.৮ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে শ্রীমতী লীলা চ্যাটার্জ্জিও আর একটী ভারতীয় রেকর্ড করলেন—অবশ্য মহিলাদের মধ্যে। এর আগে সাঁতারে অন্য কোন মহিলা এতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। মনে হয় নিজের রেকর্ড ভাঙ্গ্‌তে শ্রীমতী চ্যাটার্জ্জির বিশেষ দেরী হবে না।

রিঙ্ক ও ডিস্ক্ হকি প্রতিযোগিতা—

তোমরা অনেকে হয়ত 'রিঙ্ক' ও 'ডিস্ক' হকির নামও শোননি। বিদেশে—বিশেষ করে যে সব দেশ প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকে সেখানে Skate পায়ে দিয়ে একরকম হকি খেলা হয়, তাকেই বলে 'রিঙ্ক' হকি খেলা। সেণ্ট জেভিয়ার্স, রেঞ্জার্স, ইষ্ট পার্ক প্রভৃতি কয়েকটী টিম এই লীগে যোগ দিয়েছেন—কিন্তু কোন ভারতীয় টিমের সাক্ষাৎ এখনও পাওয়া যায় নি।

তারপর ডিস্ক হকি; কল্‌কাতাতেই প্রথম এই খেলা সুরু হল। এক এক দলে ছ'জন করে খেলোয়াড় থাকে; খেলার নিয়মকানুনও অনেকটা হকিরই মত। এ খেলা শুধু কল্‌কাতায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই খেল্‌ছে।

টেনিস দল—

গত বছর শীতে তোমরা টিলডেন, কোসে, ব্যামিলো, বার্কের খেলা দেখেছ। এবারেও একটী এ্যামেরিকান দল খেল্‌তে আসছেন। এবারের বিশেষত্ব হচ্ছে এই, যে দলের সকলেরই বয়স খুব কম—ধর ২০।২১ বছর। তাই বলে খেলার কৃতিত্ব যে এদের কম আছে তা মনে কর না! রিগ্‌স্, এণ্ডারসন, রবার্টসন, ম্যাকনীল এদের সকলের কাছেই বিদেশের অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়কে হার মান্‌তে হয়েছে। রিগ্‌সের স্থান নাকি এমেরিকায় বাজের পরেই, আর পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের ভিতর পঞ্চম। ডিসেম্বর মাসে এঁরা অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান্‌সিপে যোগ দেবেন। ভারতবর্ষের সব বাছাই খেলোয়াড়রাও তৈরী হচ্ছেন—আমাদের গাউস মহম্মদ, সোহানী, বব, রণবীর সকলেই!

শ্রেষ্ঠ এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্—

অনেকদিন আগে শুনেছিলাম এক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মানুষের দেহ পরীক্ষা করে তাদের দৌড় ঝাঁপের ক্ষমতার নাকি একটা সীমা নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন। সেই বৈজ্ঞানিকের মতে এই ক্ষমতা কতটুকু

তা ঠিক মনে পড়ছে না—তবে মতটাই বিশ্বাস করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। যারা খবরের কাগজ পড়—তারা জান রোজ কত রেকর্ড ভাঙ্গার ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এইত সেদিন কোপেনহেগেনে মিস্ রেগেন হিল্ড ৩ মিঃ ২৫/৬ সেকেণ্ডে ২২০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে এক রেকর্ড করলেন। মিস্ ইভাভ্যান নেগিলান ২০০ মিটার বুক সাঁতারে আর একটী রেকর্ড করলেন। তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ২ মিঃ ৪০.৬ সেকেণ্ড। ছেলেরা ত আছেই। ৩ মিঃ ২ সেকেণ্ডে ১০০০ মিটার দৌড়ে টিষ্টোমেডি এক রেকর্ড করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত এ্যাথেলেটিক উডার্সন ১ মিঃ ৪৮.৮ সেকেণ্ডে ৮০০ মিটার দৌড়ে পৃথিবীর সব রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। এ ত গেল দৌড়ের কথা। ফিনল্যাণ্ডের আর একটী বীর—নিজামেন ২৫৫ ফিট ৫৪/৫ ইঞ্চি বর্ষা ছুড়ে এক রেকর্ড করেছেন। জে, ম্যাকলেন্যান বলে এক ভদ্রলোকও কম নন। একটী ১৬ পাউণ্ড হাতুড়ি ১২৯ ফিট ৬৫ ইঞ্চি দূরে তিনি অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলেছেন। এও এক রেকর্ড!

তারপর এরোপ্লেনে, মোটরে, মোটরবোটে, সি প্লেনে নিত্য নূতন রেকর্ড হচ্ছে। মানুষের যেন কিছুতেই আর আশ মেটে না। এই ত সেদিন স্যার ম্যালকম্ লুসানএর হলউইল হ্রদে তাঁর 'ব্লুবার্ড' গড়ে ঘণ্টায় ১৩৯.১ মাইল অতিক্রম করেছেন! আজ আমরা অবাক হচ্ছি—কিন্তু কদিন বাদে যখন আবার আর একটী নূতন মানুষ নূতন রেকর্ড করবেন—আমরা ভাবব—ঘণ্টায় ১৩৯.১ মাইল—! সে আর এমন কি!

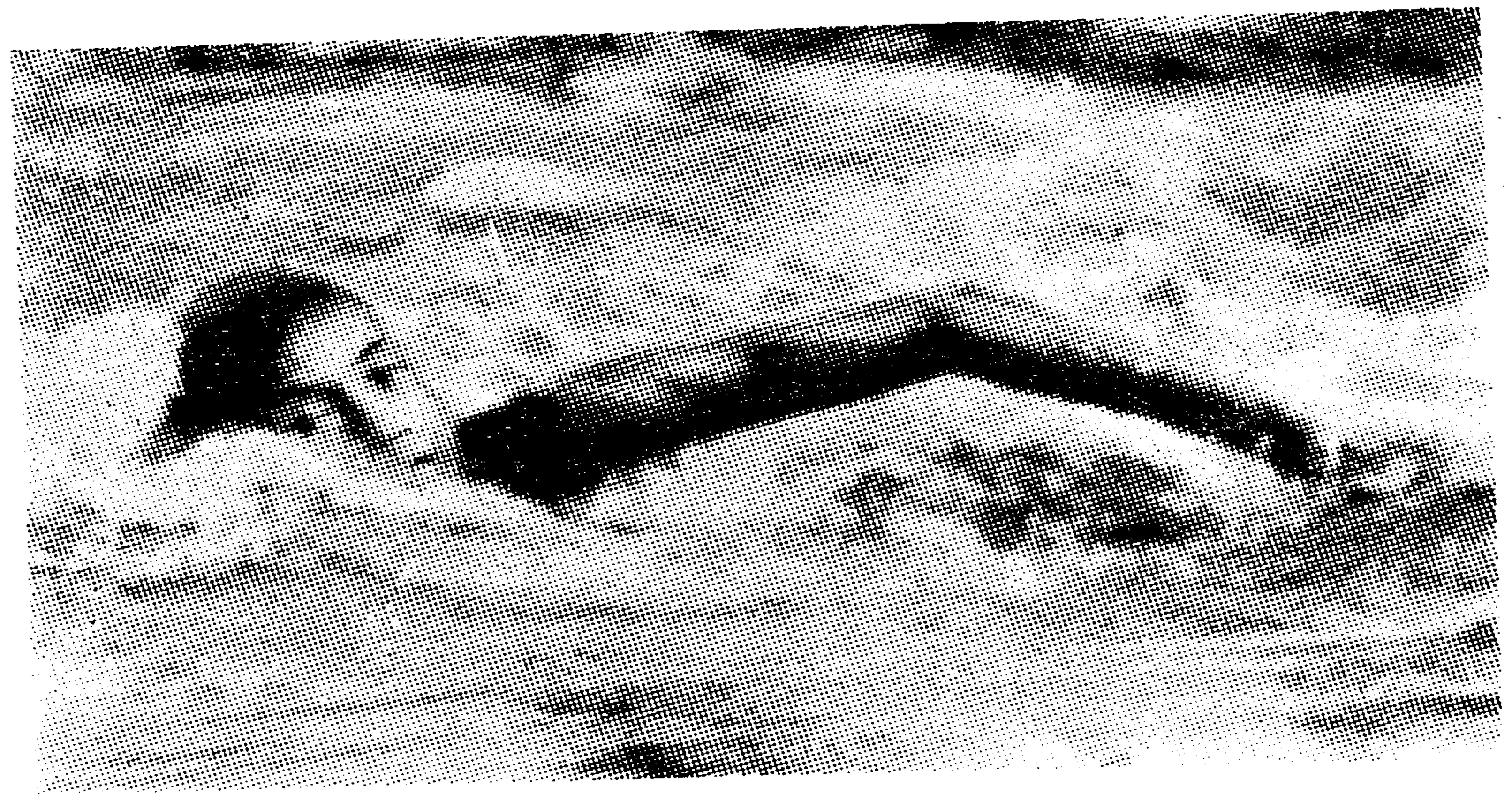

কুমারী লীলা চাটাজ্জি ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণে এক নূতন রেকর্ড করছেন

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কি যা তা বলছ?—হের ভোগেল ও অজয় ব্যস্ত হয়ে টেলিভিশন পর্দ্দার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেদিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

ডাঃ ক্রুল সত্যিই সেখানে নেই।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব!—হের ভোগেলই প্রথম কথা বল্লেন,—আমি নিজে সে ঘর বন্ধ করে এসেছি।

যেমন করেই হোক সম্ভব যখন হয়েছে, তখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন কোন লাভ নেই। তার চেয়ে এয়ার প্ল্যাণ্টের ব্যবস্থা করা আগে দরকার।—বলে অজয় টেলিভিসন যন্ত্রের আর একটা বোতাম টিপে দিলে।

কিন্তু কলের আয়নায় এবার কোন ছবি ফুটে উঠল না।

সমর তিক্ত স্বরে বল্লে,—উন্মাদ হলে কি হয়, শয়তানী বুদ্ধিটা দেখেছেন ত। সেবারকার মত এয়ার প্ল্যাণ্টের কামরায় টেলিভিসনের ব্যবস্থাটি আগে বিগড়ে দিয়েছে।

এরপর আর কাউকে কিছু বলতে হ'ল না। তিনজনে শশব্যস্ত হয়ে হাউই-জাহাজের ভেতরকার সুড়ঙ্গ-পথের দিকে ছুটলেন। এখনো যদি সময়মত গিয়ে সর্ব্বনাশ ঠেকান যায়—তিনজনেরই এই এক চিন্তা।

সুড়ঙ্গ-পথের বৈদ্যুতিক যানে এয়ার প্ল্যান্টের দিকে যেতে যেতেই হাওয়ায় অক্সিজেনের অভাবটা ক্রমশঃ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অজয়ই বোধ হয় সকলের মনের কথাটা প্রথম প্রকাশ করে বল্লে—এত বিপদ কাটিয়ে পৃথিবীর এত কাছে এসে শেষে এমনি দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে! যা দেখে এলাম পৃথিবীকে তার কিছু জানাতেও পারব না!

সমর অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে বল্লে,—অপাত্রে দয়া করার এই ফল! হাউই-বোট উদ্ধার না করলে ত আর এ সর্ব্বনাশ হয় না। কি লাভ হল ওই সাক্ষাৎ শয়তানকে প্রাণে বাঁচিয়ে। সে এখন নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে!

হের ভোগেল মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিলেন। কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে নীরবে তিনি সবার আগে নেমে গেলেন।

সুড়ঙ্গ পথ থেকে বেরিয়ে এয়ার প্ল্যান্টের কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার পর ডাঃ ক্রুলের শয়তানী বুদ্ধিটা ভাল করে বোঝা গেল। এয়ার প্ল্যান্ট চলবার কোন আওয়াজ বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাঃ ক্রুল ভেতরে ঢুকে সেটি শুধু বন্ধ করে ক্ষান্ত হন নি, দরজার বৈদ্যুতিক কলও এমন ভাবে বিগড়ে দিয়েছেন যে বাইরে থেকে তা খোলবার কোন উপায় নেই।

খানিকক্ষণ নিষ্ফল চেষ্টা করবার পর হতাশ ভাবে হের ভোগেল বল্লেন—না, আর কোন উপায় নেই দরজা খোলবার! ভেঙ্গে ফেলা যায় না এ দরজা!—অজয় উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

হের ভোগেল একটু ম্লান ভাবে হাসলেন—যায়—ডিনামাইট দিয়ে। সেই ভাবেই জাহাজের সব দরজা তৈরী।

কিছুই তাহলে করবার উপায় নেই?—সমর হতাশ ভাবে বল্লে,—আমরা হাওয়ার অভাবে মারা যাব, আর শেষ পর্য্যন্ত ওই শয়তানই এয়ার প্ল্যান্টের ঘরে নিজেকে বন্ধ করে বেঁচে যাবে! এর চেয়ে ডিনামাইট দিয়ে সমস্ত জাহাজ উড়িয়ে দেওয়াও ভাল!

হের ভোগেল খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্লেন,—না তাতে কোন লাভ নেই। তবে শেষ এক চেষ্টা আমরা করতে পারি!

অজয় ও সমর একসঙ্গে উদ্‌গ্রীবভাবে বলে উঠল—কি?

হের ভোগেল বল্লেন,—পৃথিবী থেকে খুব দূরে এখন আমরা নেই। হাউই জাহাজের হাওয়া একেবারে নিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠবার আগেই সেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা আমাদের একমাত্র বাঁচবার উপায়। তাতে অবশ্য হাউই জাহাজকে একেবারে 'ফুল স্পীডে' চালাতে হবে।

তাতে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। একে ত জাহাজের কণ্ট্রোল-ব্রেক খারাপ। —অজয়ের স্বরে উৎসাহের বিশেষ অভাব দেখা গেল।

তবু শেষ আশায় ভর করে আমাদের তাই করতে হবে। আর কোন উপায় আমাদের নেই—বলে হের ভোগেল আবার সুড়ঙ্গ-পথের দিকে এগুলেন।

'ফুল স্পীডে' জাহাজ চালাবার সঙ্কল্প নিয়ে হের ভোগেল কণ্টোলরুমে এসে ঢোকবার পর সময় যে কি ভাবে কেটে যেতে লাগল সে বিষয়ে কারো আর কোন হুঁস রইল না।

হাউই জাহাজের গতি যেন শেষ সীমা পর্য্যন্ত হের ভোগেল বাড়িয়ে* দিয়েছেন। হাউই বারুদে ভরা বিশাল নলগুলি নিজেদের প্রচণ্ড বিস্ফোরক মশলার তেজে আগুন আর ধোঁয়া উদ্গার করতে করতে বুঝি ফেটেই যায়। সমস্ত জাহাজ থর থর করে' কাঁপছে, গতিমান যন্ত্রের কাঁটা সরে সরে একেবারে চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। পৃথিবীর চেহারা ছোট একটা অস্পষ্ট বল থেকে ক্রমশঃ চাঁদের মত বড় হয়ে উঠল—তারপর আরো বড়। কিন্তু এখনো যে অনেক দূর। এদিকে নিশ্বাস যেন আর টানা যায় না। সমর এ যন্ত্রণার স্বাদ একবার পেয়েছে। সেবার অমন আশ্চর্য্য ভাবে মুক্তি পাবার পর আবার কি সেই যন্ত্রণা পেয়েই তাকে মরতে হবে?

পৃথিবী নয় যেন স্বর্গের চেহারাই দেখা যাচ্ছে এমনি আগ্রহ নিয়ে তারা জাহাজের দূরবীণে চেয়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তারা কি সেখানে আগে পৌঁছোতে পারবে না! না তার আগেই নিশ্বাস নেবার হাওয়া যাবে ফুরিয়ে!

পৃথিবী অবশ্য তাদের চোখের ওপরই ক্রমশঃ বড় ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওই ত তার মেঘের আবরণ, এমন কি মেঘের আবরণের ফাঁকে তার আসল রূপ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, আর কতক্ষণ!

হঠাৎ অজয় ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে উঠল—একি, জাহাজ যে ভুল পথে চলছে। পৃথিবী যে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আবার।

হের ভোগেল তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। তারপর ব্যাপারটা বুঝে সমরের সাহায্যে ধরাধরি করে অজয়কে সেখানে শুইয়ে দিলেন।

হাওয়ার অভাবে অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে অজয়ের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

তাঁরা নিজেরাই শেষ পর্য্যন্ত খাড়া থাকতে পারবেন কি? তাহলেই বোধহয় উদ্ধার পাওয়া যায়!

হের ভোগেল একটু একটু করে জাহাজের গতিবেগ কমাতে সুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। পৃথিবীর ওপর আছড়ে গিয়ে যাতে না পড়তে হয়।

আর বেশীদূর নয়, পৃথিবীর মানচিত্র পর্য্যন্ত এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেন বিশাল একটা নকল গ্লোবের অংশ বলে মনে হচ্চে! জল স্থলের ছবি যেন রঙ দিয়ে আঁকা—

এ ত প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই তাদের হাউই জাহাজ গিয়ে পড়ছে। মেঘের অস্পষ্ট আবরণের তলায় এসিয়ার বিশাল উপকূল রেখা দেখা যাচ্ছে; নীল সাগরের মাঝে অসংখ্য দ্বীপের জটলা।

কিন্তু হাউই জাহাজ কি নিরাপদে গিয়ে নামতে পারবে? তার বেগ ত এখনই আরো অনেক কমে যাওয়া উচিত। বেগ কমছে নাই বা কেন! কি করছেন হের ভোগেল?

চোখ তুলে চেয়েই—সমর স্তম্ভিত হয়ে গেল। হের ভোগেল কণ্টোল-বোর্ডের পাশেই মাথা ঘুরে পড়েছেন। হাউই জাহাজ সামলাবার কেউ নেই। সমরের মাথার ভেতর তখন ঝিম ঝিম করছে, তারও চোখ আসছে ঝাপসা হয়ে। বুকের কষ্ট অসহ্য। তবু একবার এ যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলেই সে প্রাণপণে নিজেকে সামলে কন্ট্রোল বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রেকের লিভারটা তাকে টেনে নামিয়ে দিতে হবে যেমন করে হোক।

কিন্তু হাতে যেন তার কোন শক্তি নেই। কলের আয়নায় নীচের ছবি ক্রমশঃ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রই যেন ছুটে আসছে উন্মত্তভাবে তার দিকে। তবু সে 'লিভার'টা টেনে নামিয়ে রাখতে পারছে না। আর বুঝি পারা যাবে না।

শেষ পর্য্যন্ত শেষ শক্তি প্রয়োগ করে সে লিভারটা এবার নামিয়ে আনল। তার ফল কি হল না হল তা' কিন্তু সে জানতে পারলে না। সে তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

* * * *

জ্ঞান হ'তে সমর প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলে না। সে কোথায় আছে!

তার মুখের ওপরে হের ভোগেল ও অজয় উদ্বিগ্নভাবে ঝুঁকে আছে। তাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। কাণে জলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সে মাথা তুললে। একি! কোথায় গেল হাউই জাহাজ! চারিধারে অকূল সমুদ্রের জল থই থই করছে। ছোট একটা ভেলার ওপর তারা তিন জনে ভাসছে।

হের ভোগেল ও অজয়ের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে তাকে চোখ খুলে তাকিয়ে মাথা তুলতে দেখে।

কি ভয়টাই পেয়েছিলাম!—অজয় বললে—তোমার আর জ্ঞান হবে এ আশাই ছিল না।

কিন্তু ব্যাপার কি? আমরা এ ভেলায় কি করে এলাম? হাউই জাহাজের কি হ'ল?—সমর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

হের ভোগেল বল্লেন—দাঁড়ান সবই শুনবেন. এখন আপনি আর একটু সুস্থ হ'ন।

সব না জানলেও যে সুস্থ হ'তে পারছি না!

অজয় একটু হেসে বল্লে,—জানবার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের হাউই-জাহাজ একেবারে সমুদ্রের ওপর এসে পড়ে। শেষ মুহূর্ত্তে তুমিই নিশ্চয় ব্রেক টেনে দিয়েছিলে। তা না হলে আমাদের বোধ হয় চিহ্ন থাকত না এতক্ষণ। কিন্তু ব্রেক টানা সত্ত্বেও হাউই জাহাজ রক্ষা পায় নি। তার বেগ তখনও এত বেশী যে জলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সামনের দিকটা ভেঙ্গে চুর হয়ে যায়। সেই অবস্থায় প্রথমে নিজের বেগে অনেক দূর পর্য্যন্ত হাউই জাহাজ সমুদ্রে তলিয়ে যায়। তারপর আবার ভেসে ওঠা সত্ত্বেও ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে জল ঢোকার দরুণ ক্রমশঃ ফের ডুবতে থাকে। সেই সময় হের ভোগেলের প্রথম জ্ঞান হয়।

অজয় একটু থামতে সমর জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু জাহাজে ত হাওয়া ছিল না। পৃথিবীতে পৌছোবার পর জাহাজের কোন জানলা খোলবার মত অবস্থাও কারুর ছিল না। জ্ঞান হ'ল কি করে?

হের ভোগেলই এবার উত্তর দিয়ে বল্লেন—জাহাজ ভেঙ্গে যাওয়া আমাদের সে হিসেবে শাপে বর হয়েছে। নীচের দিকটা ভেঙ্গে যেমন জল উঠেছে, ওপরের দিকেও তেমনি নানা জায়গায় জোড় খুলে গিয়ে হাওয়া ঢোকবার পথ হয়েছে। সেই জন্যেই আমরা আপাততঃ রক্ষা পেয়েছি। জ্ঞান হবার পর প্রথমেই অবস্থাটা আমি বুঝতে পারিনি। আপনারা তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কোন রকমে

অজয়কে যদি বা সজ্ঞান করা গেল, আপনার অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। সেই সময় সমস্ত ব্যাপারটাও বোঝা যায়। জাহাজ তখন বেশ তাড়াতাড়ি ডুবছে। দুজনে মিলে, হাতের কাছে যা সুবিধেমত জিনিষ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে এই ভেলা তৈরী করে আপনাকে তার ওপর তুলে কোনরকমে তারপর ভেসে পড়ি। জাহাজ খানিক বাদেই ডুবে যায়।

সমর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে শুধু জিজ্ঞেস করলে—ডাঃ ক্রল!

হের ভোগেল ধীরে ধীরে বল্লেন—জাহাজের সামনের দিকটাই জখম হয়েছিল। তিনি সেই দিকেই ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করবার উপায় ছিলনা।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—তাঁর কীর্ত্তির সঙ্গেই তাঁর সমাধি হয়ে গেল।

অকূল সমুদ্রের মাঝে ছোট একটি ভেলায় তারপর কি দুঃখে তাদের দুদিন দুরাত কাটে তার বর্ণনা আর করার প্রয়োজন নেই। আহার ও জলের অভাবে যখন তারা মৃতপ্রায় তখন ভাগ্যক্রমে একটি সদাগরী মাল-বওয়া জাহাজ তাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। আর একটা দিন দেরী হলে তাদের কোন পাত্তা বোধ হয় পাওয়া যেত না।

উদ্ধার পেয়ে প্রাণে বাঁচলেও তাদের সমস্ত কীর্ত্তি এক হিসাবে মানুষের অগোচরই রয়ে গেল। তারা নিজেরা সে কথা জানাবার চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু বাধ্য হয়েই শেষ পর্য্যন্ত তাদের নীরব হতে হয়েছে। হাউই জাহাজের সঙ্গে যাদের অভিযানের সমস্ত প্রমাণ সমুদ্রে পড়ে তলিয়ে গেছে তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে।

উদ্ধার পাবার পর জাহাজেই প্রথম অবিশ্বাস ও উপহাসের আঘাত তাঁদের পেতে হয়। ভেলা থেকে জাহাজের ওপর আশ্রয় পাবার পর আহার ও বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে নিলে জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য কর্মচারী তাদের খোঁজ নিতে আসেন এবং প্রথমেই কেমন করে তারা ওরকম বিপদে পড়েছিল তা জিজ্ঞাসা করেন।

হের ভোগেল সামান্য একটু বিবরণ সুরু করতেই তাঁরা সবাই হেসে ওঠেন।

কি বল্লেন?—বুধগ্রহ থেকে আপনারা আসছেন?—কাপ্তেনের হাসি আর থামতে চায় না।—ওই ভেলায় করে নাকি?

হের ভোগেলকে তখনকার মত চুপ হয়ে যেতে হয়। তারপরেও আরও অনেককে বোঝাবার চেষ্টার ফলও একরকমই দাঁড়ায়। সমুদ্রে কদিন অসহায়ভাবে মৃত্যুভয়ে কাটিয়ে তাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে এই দেখা যায় সকলের ধারণা।

দেশে ফিরে হের ভোগেল আরো কয়েকবার চেষ্টা করেন নিজেদের অভিযানের কাহিনী সাধারণকে বিশ্বাস করাতে। কিন্তু সব জায়গাতে উপহাস অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার আঘাত পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দেন। অজয় ও সমরকে ও এবিষয়ে মৌনব্রতই নিতে হয়েছে উপহাসাস্পদ হবার ভয়ে।

মানুষের প্রথম নক্ষত্র লোকে অভিযানের কীর্ত্তি এমনি করে বাজে গল্পকথাই হয়ে রইল।

শেষ

তিন-বাঁকা

শ্রীসুকুমার দে সরকার

এখান থেকে নাকের সোজা তিনটে বাঁক নিলেই দেখতে পাবে তিন-বাঁকা কুঠি। তিন-বাঁকা-কুঠিতে থাকে তিন বাঁকাদের সর্দ্দার তিনবাঁকা বুড়ো।

এমন একদিন ছিল যখন ওই কুঠিতে তিনবাঁকা বুড়ো ছাড়া আর কেউ থাকত না। ওই বুড়োই তখন পৃথিবীর আদিম বুড়ো কিনা—তিনকাল জেনে জেনে তিন বাঁকে বেঁকে গিয়েছিল। একদিন তেপায়া টুলে বসে, তিন বছরের ভাজা মুড়ি চিবুচ্ছে তিনবাঁকা বুড়ো, হঠাৎ পায়ের কাছে শব্দ—খুট! বুড়ো আঁৎকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ঠ্যাঙ তুলে ধপাস।

ব্যাপার কি? না একটা তিনবাঁকা ইঁদুর!

তারপর থেকে সেই তিনবাঁকা কুঠিতে, যখন তখন শব্দ খুট্ খাট্…খুট খাট্…বুড়ো অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শেষে আর না পেরে তিনকালের তিনবাঁকা লাঠিটা নিয়ে তিনবাঁকা পথে বেরিয়ে পড়ল তিনবাঁকা বুড়ো। এর একটা বিহিত করতেই হবে। কত মাঠ, ঘাট, বাট পার হয়ে বুড়ো পৌছাল এক সহরে। সহরের দোরে দোরে সে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—"হ্যাঁগো তোমাদের বাড়ী বেড়াল আছে?" কেউ দেখাল হুলো বেড়াল, কেউ দেখাল পুসী, কেউ বা মোটা, কেউ বা রোগা। বুড়ো কেবল মাথা নেড়ে বলে—"উঁহু হোলনা হোলনা"। শেষে এক বাড়ীতে বলল—"হ্যাঁ আছে বটে একটা তবে সেটা বুড়ো হয়েছে।"

বুড়ো লাফিয়ে উঠল—"বেঁকে গিয়েছে?"

"হ্যা তিনবাঁকে বেঁকেছে। কোমর বাঁকা, এক চোখ আর এক ঠ্যাঙ নেই।"

বুড়ো বলল—"ব্যস হয়ে গেছে!"

সেই তিনবাঁকা বেড়াল নিয়ে বুড়ো ফিরল তিনবাঁকা কুঠিতে। তিনবাঁকা বেড়াল দেখে, তিন বাঁকা ইঁদুর থমকে দাঁড়াল। কে প্রথমে পালাবে ঠিক হয় না। শেষে ইঁদুর বলল—"থাক দাদা আর মারামারিতে কাজ নেই। এই ঢুকছি আমি গর্ত্তে। তুমিও থাক আমিও থাকি।"

ব্যস সেই থেকে আজও তিনবাঁকারা আছে, নাকের সোজা তিনটে বাঁক নিয়ে তিনবাঁকা কুঠিতে! আশা আছে একদিন আমিও গিয়ে উঠব সেখানে।

নান্দীমুখ

রংমশালের পাঠক-পাঠিকা ভাই বোন,

বইএর সঙ্গে বইএর মলাট তোমাদের ভালো লাগে কি! আমার ত লাগে। মনে হয়, তেমন ভালো হলে বই পড়বার আগে মলাট দেখেই মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায়। মলাট আমার কাছে যাকে বলে বইএর বাজে খোসা নয়, বইএরই অত্যন্ত দামী একটা অংশ।

শুধু বই কেন, অনেক কিছুরই মলাট অত্যন্ত দামী—এমন কি মলাটটাই প্রধান বলা যেতে পারে। অতি গভীর যে মানের লাগাল মন সহজে পায় না, মলাটেই থাকে তার পরিচয়; যেমন ধর এই পৃথিবীর কথা। পৃথিবী বা সৃষ্টির মধ্যে কত রহস্য, কত তত্ত্ব, কত গভীর সমস্যাই ত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতরা খুঁজে পান। সে সব বুঝি আর না বুঝি আমরা তার মলাট দেখেই খুশী—বিচিত্র রঙে রঙীন, নদী পাহাড় অরণ্য সাগর দিয়ে তৈরী মলাট। সে মলাট নিত্য আমাদের চোখের ওপর বদলে যাচ্ছে—নিত্য তাতে নতুন রঙ ফলাচ্ছেন পৃথিবীর প্রচ্ছদপট আঁকবার পটুয়া।

পৃথিবীর মলাট ইতিমধ্যে আবারই বদলেছে। দিগন্ত-ছোঁয়া ধানের সবুজ ক্ষেতে একটু করে হলদে ছোপ লাগিয়ে সকাল সন্ধ্যে তার ওপর একটু কুয়াশার পোঁচ বুলিয়ে প্রকৃতির পটুয়া তাঁর নতুন ছবি সুরু করেছেন।

আমাদের রংমশালের মলাটও সেই সঙ্গে বদলেছে লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। কেমন লাগল তোমাদের নতুন মলাট? আশা করি ভালোই লেগেছে, এবং মলাট বদলানতে তোমরা খুশীই হয়েছ। বদলে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম, আর সাধারণতঃ তাতে আমরা খুশীই হই।

তবু এমন বদলে যাওয়া আছে যাতে মন আমাদের আনন্দের সঙ্গে সায় বুঝি দেয় না। যেমন এই ছেলেবেলা। তোমরা এখন বড় হতেই চাও, কিন্তু বড় যারা হয়েছে ছেলেবেলাটা বদলে যায় বলেই বুঝি তাদের আফশোষ।

আসলে, বড় ত নয়, ক্রমশঃ ছোট হই বলেই হয়ত আমাদের ছেলেবেলা যায় হারিয়ে। বয়স বাড়ার একটা শাস্তিই বুঝি এই—মানুষ মাথায় বাড়ে কিন্তু ছোট হয়ে যায় অনেক দিক দিয়ে,—অনেক কিছু তার ছোট হয়ে যায়। তার কল্পনা আর তেপান্তরের মাঠের নাগাল পায় না, নিজের উঠানের সীমানাটুকু পার হতেই সে নারাজ,—কাজের চাপে মনের ছুটি তার এত অল্প যে বইএর ভেতরটা ছেড়ে মলাট নিয়ে মুগ্ধ হবার আর তার সময় থাকে না।

বড় হয়ে ছোট না হওয়ার মন্ত্র যদি সবাই জানত !

—তোমাদের সম্পাদক মশাই

দ্রষ্টব্য

গত মাসে "শীতের ভোরে" প্রবন্ধটি লিখেছেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং শীতের ভোরে ছবিখানা এঁকেছেন শ্রীগোপেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞপ্তি

রংমশালের ষাণ্মাসিক চাঁদা দেড় টাকা ধার্য্য হল। রংমশাল পত্রিকার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় সে অনুপাতে ষাণ্মাসিক চাঁদা দেড় টাকা মোটেই বেশী নয়। বার্ষিক চাঁদা কিন্তু পূর্ব্বের মত দুই টাকা দশ আনা থাকল।

রংমশাল দলের আসর ৪ঠা অঘ্রাণ হবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে ইস্কুলের পরীক্ষা থাকার দরুণ দলের অনেক সভ্যই তারিখ সম্বন্ধে আপত্তি জানান। ফলে তখনকার মত আসর স্থগিত রাখা হয়। আমরা আসরের দিন ৯ই পৌষ ধার্য্য করলাম। পৌষের পাঁচ তারিখ রংমশাল কার্য্যালয় ১৫৪ রসারোড ভবানীপুরে দলের সভ্যদের প্রবেশপত্র দেওয়া হবে। প্রবেশপত্রে স্থান কাল ইত্যাদি দেওয়া থাকবে।

রংমশাল দলের সভ্য হতে গেলে দলের ব্যাজ কিনতে হয়। ব্যাজের মুল্য এক টাকা। ডাকখরচ আলাদা।

আমাদের লাইব্রেরী

ডালি : সম্পাদক সমর সরকার

একখানা আশ্চর্য্য বার্ষিকী আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকাখানা আগাগোড়া হাতে লেখা। সম্পাদক স্বয়ং ছবির মত করে পত্রিকাখানাকে অক্ষরের অপরূপ অলঙ্কার পরিয়েছেন। শিল্পী রবীন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার গায়ে কী মনোহর চিত্রবিচিত্রই না করেছেন !

এত চমৎকার পত্রিকা—এত সুন্দর লেখা (বিখ্যাত অনেক সাহিত্যরথীর লেখা এতে আছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন)—এত সুন্দর ছবি !

"ছেপে ফেললেই তো বেশ হত"—বলতে যাচ্ছিলাম সম্পাদককে। ভেবেছিলাম সম্পাদক নিশ্চয়ই টাকা পয়সার কথা পাড়বেন। তাঁর জবাবটা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মুগ্ধ হলাম।

সম্পাদক বললেন, "দেখুন বড় লেখকদের লেখার সঙ্গে নতুনদের লেখা আমরা মিশিয়ে দিয়েছি। এই নতুনদের লিখতে উৎসাহ দেওয়া ভালো, তার জন্যেই হাতে লিখে পত্রিকা প্রকাশ। কিন্তু এঁদের লেখা ছেপে বার করা সম্ভবতঃ উচিত হত না।"

"হয়তো এই নতুনদের দু-একজন বেশ ভালোই লেখেন।"

"তা হলে শিগ্‌গিরই তাঁরা ছাপানো পত্রিকায় জাতে উঠবেন।"

সম্পাদকের কথা কয়টি আমার মনে ধরল। হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে' এরকম লেখক ধরার ফাঁদ নানাস্থানেই পাতা চলে (যদি সমরবাবুর মতন গোটা পত্রিকা হাতে লিখে ফেলার মত সহিষ্ণু সম্পাদকের অভাব না হয়)। অনেকেই, যাদের লেখায় দখল নেই, ভিড় করে' আসবেন হাতে লেখা পত্রিকার জাত মারতে। কিন্তু দুটি-একটি হঠাৎ দেখা মিলবে সত্যিকারের লিখিয়ে লোক যাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতিদের লেখা পড়লাম। বেশ লেখা, তবে এ রকম ভালো লেখা পড়ে অভ্যেস আছে। কিন্তু যখনই ভাবতে গেলাম এই সব লেখা এত সুন্দর হাতের লেখায় কখনো ছাপা হয়েছে কি না, তখনই বিস্ময় মানতে হল !

মিঃ জি পরবের প্রেমের অলক, অজয় লাহিড়ীর জাভা নৃত্য, নবীন ভট্টাচার্য্যের দিনের কাজে ও মাখমলাল দত্তগুপ্তের বৃষ্টির পরে ছবি সুন্দর হয়েছে।

মোটকথা এই পত্রিকাখানা দেখে স্পষ্টই ধারণা হল সাহিত্য ও শিল্পে সত্যিকারের সাধনা যাঁরা করছেন, প্রায়ই প্রেসে বা বাজারের বুকষ্টলে তাঁদের দেখা মেলে না।

পূজোর ছুটি প্রতিযোগিতার ফলাফল

পূজোর ছুটি প্রতিযোগিতায় সত্যিকারের ভালো লেখা আমাদের হাতে আসে নি। কুমারী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়ের 'পূজোর একরাতের বন্ধু' লেখাটি নেহাৎ মন্দ হয় নি। কুমারী অরুন্ধতীকেই এবার পুরস্কার দেওয়া হল। রংমশাল পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হবে!

আশ্বিনের শব্দচৌকির ফলাফল

১ কু	২ ঠা	৩ র	●	●	●	৪ বি	বা	৫ দ
৬ সু	কু	মা	৭ র	●	৮ বী	চি	●	স্তি
৯ মা	মা	●	সু	●	১০ ত	ত্র	প	●
য়ূ	●	১১ ম	ল	ম	●	বী	●	১২ ম
১৩ ধ	১৪ ব	●	●	●	১৫ শৌ	র্য্য	●	তি
●	১৬ লা	১৭ জ	●	১৮ অ	রি	●	১৯ অ	চ্ছ
২০ ল	হ	না	●	বি	●	২১ বি	প	ন্ন
২২ ব	ক	●	২৩ ম	ন	●	২৪ লা	মা	●
ন	●	২৫ আ	ল	য়	●	২৬ স	ন	ব্য

স্থানাভাবে উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হল না।

নূতন প্রতিযোগিতা

রংমশালের পাতায় 'এক পাতার' গল্পের পত্তন হয়েছে, তোমরা দেখবে এক পাতার গল্প হয়তো এক নিঃশ্বাসেই পড়ে ফেলা চলে। কিন্তু পড়া যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়। এক পাতার গল্প লিখতে গিয়ে অনেক পাকা লেখকও হটে আসেন। আমরা এবার তোমাদের একপাতার গল্প লিখতে নিমন্ত্রণ করছি। একপাতা মানে রংমশালের ছাপানো একপাতা—পিঁপড়ের মত কুটিকুটি অক্ষরে ভরাট একপাতা নয়! হ[illegible]র গল্প, রূপক[illegible] যা খুশি এক পাতায় লিখে দিতে হবে। বড় গল্প তাড়াহুড়ো করে' একপাতার মত করে বললেও চল[illegible] গল্পটি ঠিক যেন এক পাতার যোগ্যই হয়—যে পাতায় সুরু সেই পাতায়ই শেষ। যার গল্প বিচারে প্রথম হবে, তাকে দশটাকার একটা পুরস্কার দেওয়া যাবে।

কার্ত্তিক মাসের লুকোন-নাম ধাঁধার ফলাফল

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) সরোজিনী নাইডু
(৩) জহরলাল নেহেরু
(৪) অরবিন্দ ঘোষ
(৫) আবদুল গফর খান
(৬) শিপ্রা সরকার
(৭) শিবপ্রসাদ সেন

ভুলক্রমে ১টি 'প্রা'—'প্র' হয়ে ছাপা হয়েছিল

স্থানাভাবে উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হল না

নূতন ধাঁধা

ছদ্মবেশ ধরা

পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে কুড়িটি লোকের চেহারা দেখা যাচ্চে। আসলে কিন্তু দশটা লোক প্রত্যেকে একটা করে ছদ্মবেশ ধরে আছেন। কে আসল কে নকল তা হয়ত ধরা শক্ত হবে। প্রত্যেক লোকের ছদ্মবেশ তোমাদের ধরতে হবে। পুরুষ মেয়ে সেজে আছে, হিন্দু সেজেছে মুসলমান, সাহেব ফকির সেজে আছে—এমনি নানা বেশে ও মূর্ত্তিতে আসল লোকেরা নকল হয়ে লুকিয়ে আছে। যেমন—একজনকে আমরা ধরিয়ে দিচ্ছি—A নম্বরের টাকপড়া লোকটি আর ১১নম্বরের চশমাপরা মেয়েটি একই লোক। তোমরা এই রকম দুটো নম্বর মিলিয়ে এই ধাঁধার উত্তর দেবে—যেমন A = 11.

উত্তর পাঠাবার শেষ দিন—২৮শে অগ্রহায়ণ।

E
12
7
8
H
15
10
11
K
L
16
C
N
O
A
3
2
M
D
6

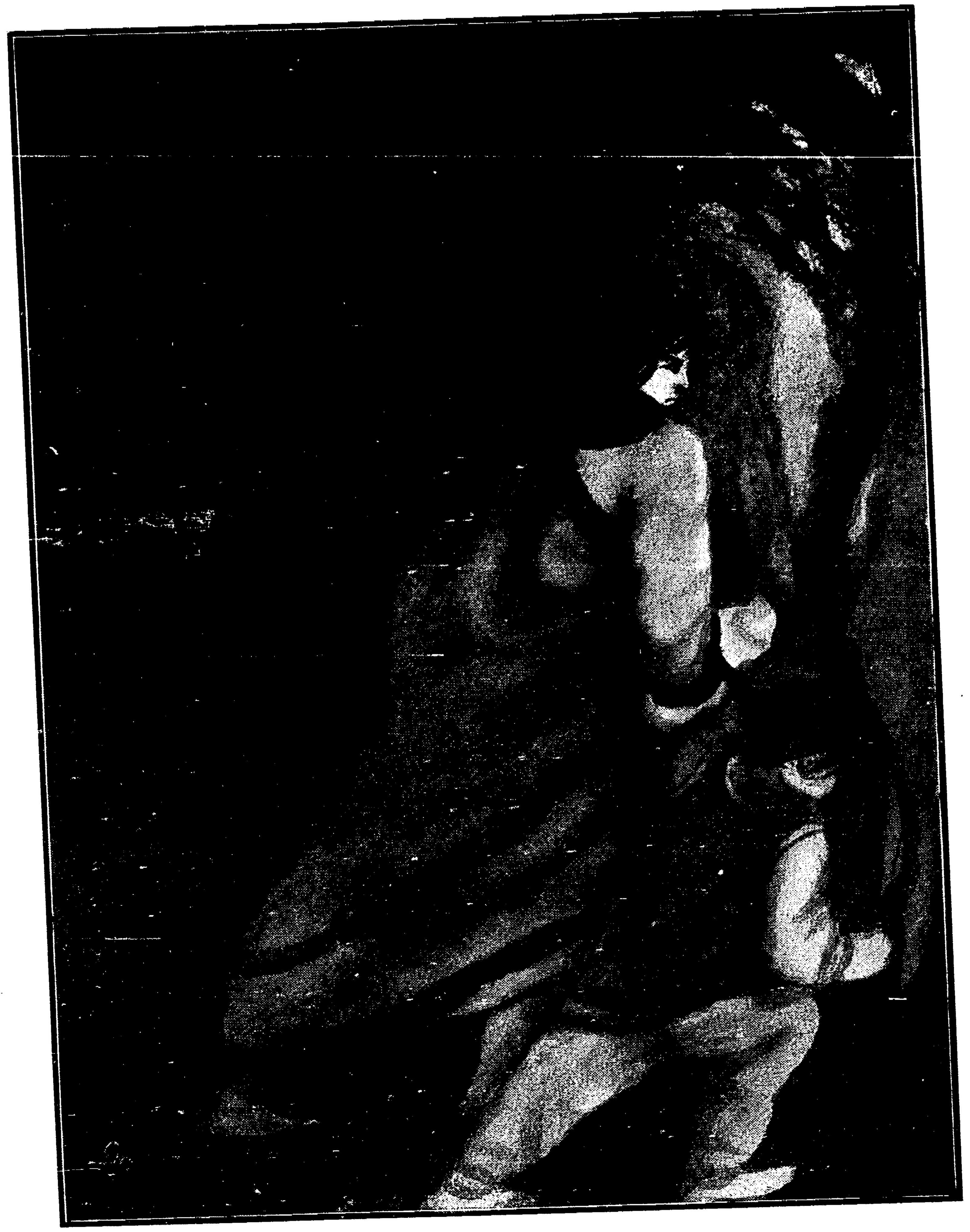

দিদি

[শিল্পী—শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

রংমশাল

তৃতীয় বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ,
১৩৪৫

সহজ ব্যাখ্যা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাঠ, বন, পাহাড়ের পাখা নাই,
দিন রাত বাঁধা থাকে এক ঠাঁই ;
ছল্‌ছল্ চোখে শুধু চায় !
মেঘ আর পাখী উড়ে যায়,
দেখে আর ভাবে,
তারা কবে ওই মত যাবে !

তাদের দুঃখ বুঝি জানিয়ে,
রেল-গাড়ী নিলে তারা বানিয়ে !
গাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে,
তাই দেখি চলে তারা ধেয়ে
তুফানে সওয়ার,
মাঠ, বন, গ্রাম ও পাহাড় !

——

প্যারাডাইস লষ্ট

[Paradise Lost]

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

"প্যারাডাইস লষ্ট" ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। শুধু ইংরেজী ভাষার নয়, জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ
মহাকাব্য। জগতের কত লোক কত কবি, এই মহাকাব্য থেকে আনন্দ পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে, প্রেরণা
পেয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মহাকাব্য থেকে প্রেরণা পেয়ে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা ভাষায়
মেঘনাদ বধ কাব্য লিখেছিলেন।

এই মহাকাব্য যিনি লিখেছিলেন, তাঁর নাম জন মিল্‌টন। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন।
তিনি জন্মেছিলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এবং দেহত্যাগ করেন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে।

তখন ইংলণ্ডে ভীষণ দলাদলি। একদলের নাম ছিল "পিউরিট্যান"—তার বিরুদ্ধ দল ছিল
"রয়ালিষ্ট"। এই "পিউরিটান্" দলের লোকেরা স্বাধীনচেতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে
রাজার দলের ব্যবহারে এবং আদর্শে অনেক গলদ আছে। যে-গলদ দূর না করলে ইংলণ্ডের নাম কলঙ্কিত
হয়ে থাকবে। তাই তাঁরা রয়ালিষ্ট দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মিল্‌টন ছিলেন এই "পিউরিট্যান্" দলের কবি। আর অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন দলের নেতা।
বিদ্রোহে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্‌কে ফাঁসী দিলেন এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য
চালাতে লাগলেন। এই সময় মিল্‌টন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে নতুন আদর্শের প্রচার
করতে লাগলেন। এই সময় তাঁকে এত চোখের কাজ করতে হতো যে, ক্রমশঃ তাঁর দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা
হয়ে আসতে লাগলো। শেষকালে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু দেশ-সেবার যে পুন্য দায়িত্ব
তিনি নিয়েছিলেন, অন্ধ হয়েও তিনি অন্য লোকের সাহায্যে সে কাজ চালাতে লাগলেন।

প্রথম যৌবনে তাঁকে ডাকে কাব্য কিন্তু যখন দেশের ডাক এলো, তখন তিনি সরিয়ে রাখলেন
কাব্যকে; তারপর গেল দৃষ্টি-শক্তি। অবশেষে তাঁর এলো চরম সর্ব্বনাশ।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লস্ পিউরিট্যান্‌দের তাড়িয়ে আবার ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন।
মিল্‌টন রাজ-কাজ থেকে বিতাড়িত হলেন। তাঁকে হত্যা করবার জন্যে চারদিকে রয়ালিষ্টরা ঘুরতে লাগলো।
বৃদ্ধ বয়সে, অন্ধ অবস্থায় সহায় সম্বলহীন ভাবে মিলটন আত্মগোপন করে রইলেন।

বাইরের সব আলো যখন একে একে নিভে গেল, তখন ভিতরের আলো জ্বলে উঠলো সহস্র শিখায়।
যৌবনে যে কবিকে তিনি ফেলে রেখে এসেছিলেন, সে আবার ফিরে এলো তাঁর মনে। বাইরের দৃষ্টিতে
কতটুকু দেখা যায়? তিনি মনের চোখ দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল প্রত্যক্ষ দেখতে লাগলেন। তাঁর মন বলে
উঠলো তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নিয়ে, জগতের প্রথম যে মানব আর যে প্রথম মানবী, তারা কেমন করে,

তাদের আদি-জন্মভূমি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলো, তাদের কাহিনী গাইবেন। তিনি বলে যেতেন, আর তাঁর মেয়েরা লিখতেন—এইভাবে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "প্যারাডাইস লষ্ট" লেখা হয়।

সেদিন এই মহাকাব্যের কোন প্রকাশক জোটেনি। অতি কষ্টে একজন জুটলো, সে মাত্র পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে এই বইখানি কিনে নেয়। সর্ত্ত হয়, বই-এর সংস্করণ হলে আরো পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।

আজ মিল্‌টনের হাতের এক টুক্‌রো লেখার দামই পাঁচশো পাউণ্ড!

বন্দনাতে এই মহাকাব্যের আরম্ভ

"প্রথম মানুষের সেই প্রথম অনাচার,······
যার ফলে পৃথিবীতে এলো মৃত্যু······
আর এলো মানুষের যত দুঃখদৈন্ত······
···আজও কেউ গায় নি তার গান······
হে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাব্যের
আমি গাইবো সে-ই গান,
তুমি থেকো সহায়······
আর তুমি, হে অনাদি শক্তি,
তুমি একমাত্র জান,
সকল মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মন্দির হলো মন,
যে-মন সুন্দর, পবিত্র, চির-উন্নত,······
তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো······
আমার মধ্যে যা কিছু আঁধার, যা কিছু কালো,
তোমার আলোতে তাকে করো আলোময়······
আমার মধ্যে যা কিছু তুচ্ছ,
তুমি তাকে করো মহীয়ান্············

স্বর্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দরুণ তিনি, স্যাটান্ এবং তার অনুচর অন্য সব দেবদূতদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিশাপে জ্বলন্ত আগুণের নরকে তারা গিয়ে পড়লো। ন'দিন ন'রাত সেই আগুনের নদীর মধ্যে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে স্যাটান্ দশ দিনের দিন আবার উঠে দাঁড়ালো। পাশ ফিরে দেখে, তার পাশে তারই মত অবস্থায় রয়েছে বিল্‌জিবাব্, তার সব চেয়ে প্রিয় অনুচর। তার সঙ্গে পরামর্শ করে, সে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে, আগুণের মত গরম সব পাথরের ওপর পা

দিয়ে দিয়ে, সে একটা মাঠে এসে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। মাঠ বটে তবে মাটী নেই.... আগুণ জমে আছে......তারি মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সাগরের তীরে এসে পৌছল— পারাপারহীন জ্বলন্ত আগুণের সাগর...তারি তীরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে সে তার সঙ্গীদের ডাকলো......

"উঠ, জাগো—নইলে পড়ে থাক, অনন্ত কাল ধরে"......

তার সেই আহ্বানে, তারা আবার সব উঠে দাঁড়ালো—বিন্দু মাত্র ভীত বা বিচলিত না হয়ে, যেমন স্বর্গে সে তাদের আদেশ করতো, তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে আদেশ করলো ...তার সেই কণ্ঠে সেই আগুণের সমুদ্রে ঢেউ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—সেই চির-আঁধার রাত্রি যেন ভয়ে কেঁপে উঠলো—প্রিয় অনুচরদের ডেকে সে বল্লে—হোক্ সে ঈশ্বর! তবু বশ্যতা মানবো না আমরা—আজ থেকে তার সঙ্গে হবে আমাদের যুদ্ধ—কখনও প্রকাশ্য, কখনও গোপন—তবুও স্বীকার করবো না পরাজয়।

তারপর সেই জ্বলন্ত নরকের দিকে চেয়ে সে গর্ব্ব-ভরে বল্লে,

"তোমার দেশে এসেছে তোমার নতুন রাজা......
তাকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হও,
সে এসেছে সঙ্গে করে এমন এক মন,
স্থান বা কালে যার পরিবর্ত্তন হয় না—
সে এনেছে এমন এক মন, যে-মন তার নিজের
সিংহাসনে নিজে রাজা হয়ে বসে আছে,
যে-পারে স্বর্গকে নরক করে আর নরককে স্বর্গ করে তুলতে!"

সেই মন দিয়ে স্যাটান্, ম্যামুন * বলে তার এক অনুচরকে, তার জন্যে এক নতুন প্রাসাদ তৈরী করতে আদেশ দিলো। ম্যামুন্ তার আদেশে এক প্রাসাদ তৈরী করলো। তার নাম হলো,—"প্যাণ্ডিমোনিয়াম্"। †

এই প্রাসাদে স্যাটান্ তার অনুচরদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। কি ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো যায়।

প্রথমে মোলক্ (*) উঠে প্রস্তাব করল যে, যেমন করেই হোক, যুদ্ধ চালাতেই হবে!

কিন্তু বেলিয়াল্ * প্রতিবাদ করে বললে—স্বর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, আমার

*স্যাটানের অনুচরদের যে সব নাম মিলটন দিয়েছেন, সে নামগুলি হলো প্রাচীন পৌত্তলিক জাতিদের দেবতাদের নাম। যেমন ম্যামুন হলেন—অর্থের দেবতা; মোলক্ হলেন—এক ফিনিসিয়ান্ দেবতা, যাঁর কাছে নরবলি দেওয়া হত; বেলিয়াল—শয়তানের এক নাম বা পতিত দেবদূত।

†এই কথাটির মানে অভিধানে দেখে নিও।

মনে হয়, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—কারণ স্বর্গে ঢোকবার্ সব পথ সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে সদা-সর্ব্বদা ঘেরা—তা ছাড়া হেরে গেলে হয়ত এবারে একেবারে লোপ পেতে হবে! যত কষ্ট হোক, একেবারে লোপ পেয়ে যেতে কে চায়? হয়ত একদিন সেই মহাশত্রু আমাদের ক্ষমা করতেও পারে...

ম্যামনও সেই কথাতে সায় দিয়ে জানালো যে, এই নরক নিয়েই আমাদের একরকম থাকতে হবে......

কিন্তু ব্যাল্‌জিবাব্ সকলকে প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, তা নয়! অস্ত্র দিয়ে না পারি, ঈশ্বরকে জব্দ করবার, আমাদের যেমন কষ্ট সে দিয়েছে, তাকেও তেমনি কষ্ট দেবার অন্য পথ আছে। আমাদের রাজা স্যাটান আগে যে প্রস্তাব করেছিলেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করি। আমরা শুনেছি, ঈশ্বর আর এক নতুন স্বর্গ তৈরী করেছেন, এবং সেখানে তাঁর প্রতিনিধিরূপে আর এক নতুন দেবদূত সৃজন করেছেন। তার নাম নাকি মানব! ঈশ্বরের সে বড় প্রিয়। আমরা এই মানবকে দিয়ে তার এই নতুন স্বর্গ-রচনাকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবো, তার কাণে মন্ত্রণা দিয়ে তাকে তার সৃজন কর্ত্তার বিরোধী করে তুলবো...স্বর্গ থেকে ঈশ্বর যখন দেখবে যে তার সাধের নতুন স্বর্গ পাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যখন সে দেখবে যে তারই সৃজিত মানব যখন তার কথা না শুনে, আমাদের কথা শুনে চলেছে, তখন তার মনে যে জ্বালা হবে তাতেই হবে আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ! ঈশ্বরের সেই হবে যোগ্য শাস্তি!

ব্যালজিবাবের মুখে স্যাটানের সেই প্রস্তাব শুনে অভিশপ্ত দেবদূতের দল আনন্দে নেচে উঠলো! কিন্তু কোথায় সেই নতুন স্বর্গ-খণ্ড? তারা তো কেউ তা জানে না! আর কে-ই বা যাবে সেই নতুন দেশের সন্ধানে?

তখন স্যাটান্ বল্লে, তোমরা বিচলিত হয়ো না, আমি-ই যাব! অন্ধকার মরণ-সাগরের তীরে তীরে ঘুরে আমি খুঁজে বার করবো সেই নতুন দেশ!

সকলেই সেই প্রস্তাবে রাজী হলো! তখন স্যাটান্ অনুচরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নরকের দ্বারে এলো। নরকের দ্বারে বসে ছিল দুই দ্বারী, পাপ আর তার ছেলে মৃত্যু! রাজাকে দেখে দ্বারী দরজা খুলে দিল। সে দরজা আর বন্ধ করতে পারলো না।

নরকের দরজা পেরিয়ে স্যাটান্ দেখে, সামনে সীমাহীন মহাসাগর...তার তীর নেই...পারাপার নেই।

সেই মহাসাগরের ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়তে উড়তে সে দূরে দেখতে পেলে স্বর্গ দেখা যাচ্ছে...তার জন্মভূমি...তাকে ঘিরে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, মঙ্গল!

মাথায় এক বুদ্ধি খাটিয়ে সে সূর্য্যে গিয়ে উঠলো। একটী ছোট্ট দেব-শিশুর মূর্ত্তি ধরে সে উরিয়েলের সঙ্গে দেখা করলো। কারণ সে জানতো, উরিয়েল বড় সাদা-সিধে দেবদূত। তাকে সে জিজ্ঞাসা করলো,

হে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল দেবদূত, বলতে পারো ঐ সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে কোথায় মানব আছে?

কোন সন্দেহ না করে উরিয়েল পৃথিবীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন,

"ঐ হলো সেই নতুন স্বর্গ-খণ্ড! পৃথিবী ওর নাম ··ঐখানে থাকে মানব।"

স্যাটান্ চেয়ে দেখলো, এক সোনার দড়িতে পৃথিবী স্বর্গ থেকে ঝুলছে।

আর কাল বিলম্ব না করে স্যাটান্ পৃথিবীতে গিয়ে উঠলো। পৃথিবীতে ঢুকতেই এক অপূর্ব্ব গন্ধ তার নাকে এলো। সেই নতুন জগতের নতুন গাছ-পালা, ফল-ফুল দেখে তার মন মুগ্ধ হয়ে গেল। এ কোথায় সে কি করতে চলেছে? একবার তার মনে অনুশোচনাও এলো। কিন্তু যখনি তার মনে পড়লো, দাসত্বের কথা, তখনি সব অনুশোচনা তার দূর হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে দেখলে এক অপরূপ সুন্দর উদ্যানে * দুটী মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে...দীর্ঘ, উন্নত, সুন্দর, একেবারে ঠিক ঈশ্বরের ছায়া। তাদের দুজনের রূপে পৃথিবীর আর সব জিনিষের রূপ ম্লান হয়ে গিয়েছে। স্যাটান বুঝলো, এই সেই ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি!

নানারকম পশু-পাখীর রূপ ধরে স্যাটান তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো। এক জনের নাম আদম, অপরের নাম ঈভ্—জগতের প্রথম মানব, আর প্রথম মানবী।

একদিন এক গাছের তলায় শুয়ে তারা দুজনে কথা বলছিল, আর গাছের ওপর থেকে স্যাটান শুনছিল,

আদম ঈভ্‌কে বলছিল, তিনি আমাদের এই সমস্ত পৃথিবী দিয়েছেন—শুধু এই যে গাছ দেখছো এর নাম হলো জ্ঞান-বৃক্ষ, এই গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন...,

ঈভ্ বিস্ময়ে আদমের কথা সব শুনছিল।

আদম বলছিল, আমি ছিলাম একা, একা এই বিরাট পৃথিবীতে! তাই দেখে ঈশ্বর তোমাকে তৈরী করলেন, আমারই এই বুকের পাঁজর থেকে!

* Garden of Eden—আদম ও ঈভের বাসস্থান; eden অর্থে আনন্দ।

ঈভ্ বলে, আমি চোখ চেয়ে দেখি, জলে আমার ছায়া! নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো। এধারে উরিয়েলের কাছ থেকে স্যাটান চলে আসবার পর, তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়েছে। তিনি গ্যাব্রিয়েলকে খবর পাঠালেন যে তাঁর সন্দেহ হয়েছে যেন একটা দুষ্ট দেবদূত পৃথিবীতে গিয়ে ঢুকেছে!

আদম আর ঈভ্ যে উদ্যানে থাকতো, তার রক্ষী ছিল দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। উরিয়েলের কাছ থেকে খবর পেয়ে গ্যাব্রিয়েল তক্ষুনি খোঁজ করবার জন্য দুজন দেবদূতকে বাগানের ভেতর পাঠালেন।

তখন স্যাটান একটা ব্যাঙের মূর্ত্তি ধরে ঈভের কানে কানে স্বপ্নে পরামর্শ দিচ্ছিল, সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাবার জন্য। পাছে তারা ঈশ্বরের সমান হয়ে যায়, সেই জন্যে ঈশ্বর তাদের সেই গাছের ফল খেতে বারণ করেছে। সেই ফল খেলেই ঈভ একেবারে দেবী হয়ে যাবে!

দেবদূত দুজন খুঁজতে খুঁজতে সেই ব্যাঙ-রূপী স্যাটানকে ধরে ফেলেছেন। তাঁদের হাতে ছিল তাঁদের স্বর্গীয় দণ্ড। সে দণ্ড যার ওপরে পড়বে, তার আসল মূর্ত্তি তখনি ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ সেই ব্যাঙের গায়ে সেই দণ্ড গিয়ে পড়তেই স্যাটানের আসল মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠলো। তখন স্যাটানের কাজ হয়ে গিয়েছে—সে ঈভের কানে তখন কুমন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছে।

উপায়ান্তর না দেখে স্যাটান সেখান থেকে চম্পট দিল।

এধারে সকাল হতেই ঈভ রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা আদমকে বল্লো। সেই স্বপ্নের কথা শুনে আদম ঈভকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লো, কোন ভয় নেই! এস আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্তব করি! তাঁর স্তবে রাত্রির দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে!

"...এই সকলি তোমার অপরূপ কীর্ত্তি, হে মঙ্গলময়,
হে অনাদি শক্তি, এই ভুবন-ভরা রূপ—
কত যে সুন্দর তা কথায় প্রকাশ করা যায় না,
তুমি এ সবার স্রষ্টা,
তোমার রূপের তুলনা কোথায়?......
জয় হে প্রভু, তোমারি জয়!

তোমার যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল,
তাই শুধু দাও আমাদের !
যদি রাত্রির অন্ধকারে, কোথাও জমা হয়ে থাকে
যা অমঙ্গল, যা অসুন্দর,
দূর করে দাও তা তোমার মঙ্গল স্পর্শে,
যেমন প্রভাত আলো দিয়ে দূর করে দিলে রাত্রির অন্ধকার।”

এধারে স্বর্গে থেকে ঈশ্বর স্যাটানের গতিবিধি সব লক্ষ্য করছিলেন। র‍্যাফেলকে পাঠিয়ে দিলেন, আদমকে সাবধান করে দেবার জন্যে। স্যাটান সম্বন্ধে সমস্ত কথা আদম আর ঈভ্‌কে জানিয়ে র‍্যাফেল ফিরে গেলেন।

এধারে স্যাটানের মনে শান্তি ছিল না। সে সারা পৃথিবী অস্থির চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষকালে সে ঠিক করলে যে, সাপের মূর্ত্তি ধরে আবার সে গার্ডেন অফ্ ইডেনে যাবে। যদি কোন রকমে ঈভকে ভুলিয়ে সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াতে পারে।

একদিন সকাল বেলা আদম আর ঈভ কাজে বেরিয়েছে। সেদিন ঈভ বল্লে, তারা আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করবে—চব্বিশ ঘণ্টা এক জায়গায় থাকলে, গল্পে আর হাসিতে কাজের ব্যাঘাত হয় !

আদম কিন্তু ঈভকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না, যদি এইটুকু ছাড়াছাড়ির মধ্যে কোন বিপদ হয় ?

ঈভ হেসে বল্লে, সে কি কখনও সম্ভব ? এইটুকু ছাড়াছাড়ির মধ্যে, এই গার্ডেন অফ্ ইডেনে যদি বিপদ হয়, তাহলে আজীবন তারা এখানে থাকবে কি করে ?

অগত্যা সেদিন আদম ঈভকে ছেড়ে দূরে কাজ করতে গেল। তাই না দেখে, সাপ-রূপী স্যাটানের কি উল্লাস ! সে সর্ব্বদাই খুঁজছিল কি করে ঈভকে আলাদা পাওয়া যায়—সে সুযোগ সেদিন আপনা থেকেই জুটে গেল।

আজকাল সাপেরা যেমন বুকে হেঁটে মাটী দিয়ে চলে, সেদিন কিন্তু তেমন ছিল না। তাদের দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

স্যাটান সাপরূপে ঈভের কাছে এসে তাকে ডাকলো,

এই সুন্দরী ধরণীর হে সম্রাজ্ঞী—

ক্রমশঃ

বাদশাহী
গল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— পাঁচ —

—“অবাক জলপান খেয়েছ কখনো দাদামশায় ?”

—“না খাইনি, গল্প শুনতে বসলেই তোমার খাবারের কথা মনে পড়ে কেন বলতো বাদশাবাবু ?”

—“মনে পড়লেই বা দোষ কি ?”

—“ওতে করে গল্প শোনার ক্ষিদে মরে যায়।”

—“গল্প বলবার ক্ষিদে ?”

—“আরো বেড়ে যায় ; কই দেখি একটু অবাক-জলপান দাওতো চাখি।”

—“সে এখানে পাওয়া যায়না !”

—“তবে ?”

—“তোমাকে লোভ দেখালুম !”

—“আরে কি মুস্কিল, কোথায় পাওয়া যায় বলনা, আনাই কাউকে দিয়ে !”

—“সে কেউ আনতে পারবেনা, এদিকে আসেনা সে !”

—“তবে কোন দিকে ?”

—"সে অনেক দূরে—মামারবাড়ীর দিকে !"

—"যাওয়া যায়না সেখানে ?"

—"যাবেনা কেন ? মটোরে গেলে ছটাকার তেল পুড়বে, ট্রামে গেলে ছ'আনা, বাসে গেলেও তাই—অথচ জিনিষটার দাম এক পয়সাও নয় !"

—"কেমন করে জানলে ?"

—"আমিতো অমনি খেয়ে এলেম মামার বাড়ীতে, পকেটেও নিয়ে এলেম একথাবা—দাম তো চাইলে না কেউ !"

—"দেখি তো পকেট !"

—"অ্যাঁ, না কি কর দাদামশায়, পকেট ছিঁড়ে যাবে ছেড়ে দাও !"

—"আরে পকেট নিচ্চিনে !"

—"তবে দেখ যাঃ ফোক্কা—উড়ে গেছে—কেমন ঠকেছ ?"

—"ভারি তো তোমার অবাক-জলপান আমি ওর চেয়ে ভালো জিনিষ বিনি পয়সায় খেয়েছি।

—"কি বলনা !"

—"শুনে কেবল ছুঃখু বাড়বে, খেতে তো পাবে না।"

—"নিশ্চয় তোমার পকেটে আছে, দেখি !"

—"দেখ, এ পকেটে রুমাল, ও পকেটে চশমার খাপ্, বুকের পকেটে কলম, খড়ি কাঠি, অ্যাঁ ওটা নিও না—ও আমার নোট !"

—"খুলে দেখি ?"

—"দেখ আপত্তি নেই !"

—"এ কি লেখা আছে ?

—"পড়ে দেখ না !"

—"চেপ্টা মাথা চট্ জলদী !!"

—"কি বাদশাবাবু কথা নেই যে ? অবাক-জলপানের চেয়ে খাসা জিনিষ কিনা বল ! —ও কি কাগজটা খেয়ে ফেল্লে যে !"

—"থ্যাক্ থুঃ তেতো !"

—"লেখা কাগজে তেতো হবেনা, জীভে কালী লেগেছে। যাও মুখ ধুয়ে এসো—চেপ্টা-মাথা চট্-জল্দীর গল্প হবে।"

—"কামিজে মুছে ফেলেছি আর তেতো নেই।"

—"আচ্ছা তা'হলে মুখটি বুজে কানটি খুলে রাখ, গল্পের মাঝে মুখ খুলেছ কি চট্-জলদী পালিয়েছে। শোন বলি—

যুধিষ্ঠির মালী—ঘাড় নাড়ো যে বাদশা ? শোন না বলি—হাত নাড়ো যে ? যুধিষ্ঠির মালী—এ কি উঠে যাও যে ? আচ্ছা বুঝেছি, যুধিষ্ঠিরের গল্প চলবে না। বসো, বলি শোন—

যখন যে তরকারিটি মাছটি নতুন উঠবে বাজারে, সেটি এনে উপস্থিত করা চাই আমাদের বাড়ীতে সহরের আর কেউ খাবার আগে—দামের জন্যে ভাবনা নেই। মানুষটি কে ? তুমি দেখনি, দেখতেও পাবে না, নামধাম পরিচয় দিলেও বুঝবেনা।—আঙ্গুল নড়ে যে ? ছবি এঁকে দেখাতে বলছ ? আচ্ছা কথায় ছবি আঁকা যাক্—

ভাবো এক বুড়ো টাক মাথা,
ঘাড়ের কাছে পাকচুল বাবড়ি-কাটা,
বাম পাটা-ফোলা যেন হালি সহরের বৈতাল কুমড়ো,
বাকী দেহটা-কালিদাসের 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' কবিতা
পাঞ্জাবি কেতাব-পাকা দাড়ি গোঁফ্
গায়ের রং—খয়েরে সিঁছরে মিলেছে সুরকীর গুঁড়ো
সর্ব্বদা হাতে মুর্শিদাবাদের গেঁটে বাঁশের মোটা দাণ্ডা,
লালছিটের রুমাল গলেতে বাঁন্ধা,
কামিজের চুনোট্ হাতা,
কাঁধে চাদরখানি—
ধুতি পরার কেতা হিন্দুস্থানি,
ছুপায়ে ছুই মাপের জুতা,—বাম পায়েরটা চেপ্টা গুড়মুড়ো।
ভোরে উঠে ডন ফেলে, লর্ডস্ প্রেয়ার পড়ে
দাঁতন করেন,
বেড়াল দেখেছে কি উঠিয়েছে হুড়ো।

বেড়ালের উপর জাতক্রোধ এমন আর দেখিনি। কেন তা জানিনে। রাতে চারখানা কাঠের চৌকির হাতায় মশারি বেঁধে বৈঠকখানার মাঝের ঘরে মাছুরের উপর তোষক পেতে দিত ফরাশ, তার মধ্যে তিনি নিদ্রা দিতেন—বেড়াল সেখানে এগোতে সাহস করে কি ?

আমি একদিন শুধিয়েছিলেম—'বেড়াল দেখলেই তেড়ে ওঠ কেন ?'

কে জানে ভাই, ব্যাটাদের দেখলেই কেমন রাগ হয়ে যায় ; শোন তবে বলি—

আজ প্রায় ৬০।৬৫ বছর হল. এই লাঠি যখন প্রথম কিনি, তখন যার নামে ঐ পাঁচি-ধোপানীর গলিটা হয়েছে সেটা বেঁচে আছে। ইয়া ল্যাজ মোটা তার এক পোষা বেড়াল। ভোরে নতুন লাঠিটা হাতে তোমাদের এখান থেকে যাচ্ছি, দেখি বেড়ালটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে দাওয়ায় পড়ে। নতুন কিনেছি লাঠিটা—মজবুদী তো পরখ্ করা চাই! দিলেম বসিয়ে বেড়ালটার ঘাড়ে। টু শব্দটি করতে হল না। আমিও চট্ সরলেম নতুন বাজারের দিকে—তখনো ঘোর ঘোর আছে।

বাসায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, বাজার থেকে নতুন এক তরকারী—যা কেউ খায়নি—কিনে রুমালে বেঁধে আসছি, গলির মোড় থেকে শুনি পাঁচি বাড়ীওয়ালীর গলা—'কে কল্লে এমন? তার সর্ব্বনাশ হোক—গোল্লায় যাক্'—যত গালাগাল তত কান্না।

আমি বুঝলেম ভাই ব্যাপারটা যা হয়েছে! অতি ভাল মানুষটি হয়ে বল্লেম—'বলি ও গিন্নি, হল কি? কান্নাকাটি কেন?'

—'দেখনা বাবু কোন্—' বলেই যা একটানা লম্বা গালাগাল, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

আমি কি আর বলি, বেড়ালটাকে একটা লাঠির খোঁচা দিতে সেটা দাঁত খিঁচিয়ে, পেট উঁচিয়ে কাৎ হয়ে পড়লো খানায়।

আর কোথা আছে—বাড়ীওয়ালীর কান্না! মাথা কুটে মরতে যায়! আমি সাধু হয়ে তার কাটা ঘায়ে তত নুনের ছিটে দিই—'তাই তো, এই বাজারে যেতে দেখে গেলেম, বেড়ালটি মোটা ল্যাজ ফাঁপিয়ে দেয়ালে গা ঘসছে—আহা কে এমন নিষ্ঠুর এর মধ্যে মধ্যে এর দফা রফা করলে? বড় ভালো ছিল বেড়ালটি! সকালে ওর মুখখানি দেখলে দিনটি ভালো যেতো! কোলে পিঠে করে মানুষ করলে—ওর প্রমাই ফুরিয়েছিল; তবু ভাল বলতে হবে যে তোমার ষষ্ঠির দাস ঠিক ষষ্ঠির দিনেই গেছে—' এই বলেই আমি চট্ চম্পট।

তারপর থেকে বেড়াল দেখেছি কি, সেদিনের গালাগাল মনে পড়ে যায় তার রাগ সামলাতে পারি না—ব্যাটা বেড়াল অপঘাতে মরেছিল তাই উদ্ধার হয়নি এখনো ঘুরছে।

আমি বল্লেম—'কখনো সে বেড়াল আর দেখা দিয়েছিল?'

—'দিয়েছিল, সেদিন সন্ধেবেলা এতকাল পরে ঠিক ষষ্ঠি পুজোর সময় নিজের চৌকিতে বসে আছি—বিশ্বেশ্বর তামাক দিয়ে গেল, টানছি তো টানছি, টিকে আর ধরতে চায়

না, বৈঠকে হুঁকো রেখে ভাবছি সেই কত বছর আগেকার তোমাদের বাড়ীর ষষ্ঠি পুজোর ধুমধাম, এমন সময় পিছন দিকে ডাক! লাঠি ঠুকবো—দেখি লাঠি সরে গেছে।

—'বেদ্ড়া কোথাকার' বলে উঠিতে যাই পারিনে। 'বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর' হাঁক দিতে কে যেন চেপ্টা-মাথা চট্ জলদী পালিয়ে গেল।"

—"তারপর?"

—"এঃ বাদশা বাবু মুখ খুলেছ—আর গল্প চলবে না।"

—"তুমি যে বল্লে চট্ জলদি খাবার জিনিষ?"

—"নিশ্চয় আমি কি মিছে কথা বলেছি!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ষার মেঘছেঁড়া রোদে ছায়ামাখা বন স্তব্ধ শান্ত। নালুখ তার বাচ্ছাদের নিয়ে কাছেই বনের ভেতর কোন শেকড় খাওয়া যায়, কোন শেকড় ওষুধ আর কোন শেকড় বিষ তাই চেনাচ্ছে। ভাল্লুকমা একটা শাল গাছের তলায় শ্যাওলার ওপর মংলুকে শুইয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। তার অন্য বাচ্ছাগুলো এখন বড় হয়েছে কিন্তু মংলু টিকটিকি এখনও ছেলে মানুষ। মানুষের ছানাগুলোর বড় হতে বড় সময় লাগে। তবু ভাল্লুকমা এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত, নালুখ এসে পড়ায় তার ভয় অনেক কমে গিয়েছে। শত্রুর হাত থেকে বাচ্ছাদের বাঁচাবার ভার এখন নালুখের তাই ভাল্লুকমা অনেকটা নিশ্চিন্ত। মালুর পায়ে থাবা দিয়ে থাবড়াতে থাবড়াতে ভাল্লুকমা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। বর্ষার রোদে তৃপ্ত বন ঝিম ঝিম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার লুকোচুরী খেলা। শাল গাছের মাথা থেকে চীল হাঁক দিল—কর্‌র্‌ চি-ই...ভাল্লুকদের ভালো হোক। শিকার টিকার ভাল জুটুক! কি গো ভাল্লুক গিন্নী শিকারে যাওনি আজ?

ভাল্লুকমা বলল—মংলু টিকটিকি যে ঘুমোচ্ছে

ওদিকে মহুয়া গাছের ডালে সে মস্ত এক মৌচাক হয়েছে

—সত্যি?

ভাল্লুকরা মধু খেতে বেজায় ভালবাসে।

ভাল্লুক গিন্নী চীলকে বলল...মংলুর ওপর একটু নজর রেখো না ভাই, আমি ঘুরে আসব। দেখো যেন শকুনগুলো না নামে। পৃথিবীতে লোভই যত কিছু অনিষ্টের মূল। ওই মধু খেতে লোভ যদি ভাল্লুকমার তখন না হোত তা হলে মংলুর এতবড় একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারত না। কারণ ভাল্লুকমা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে পা ফেলে শেয়ালের পেছনে কালকেতু এসে হাজির হোল। শালের মাথায় চীল ঝিমুচ্ছিল, শেয়াল আর কালোবাঘ এমন নিঃশব্দে এল যে চীলের সামান্য শব্দে অভ্যস্ত কাণও তাদের পায়ের আওয়াজ ধরতে পারল না।

শেয়াল বলল—এই যে এসে গেছি! আরে ওইত মানুষের ছানাটা গাছতলায় ঘুমুচ্ছে, ভাল্লুকরা কেউ নেই! কি ভাগ্যি! কালকেতু নিঃশব্দে মংলুর কাছে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শেয়াল বলল—কি দাঁড়ালে কেন? মারোনা থাবা! ইস! কালকেতু গম্ভীর গলায় বলল—ওযে ঘুমুচ্ছে, ঘুমন্ত জানোয়ারকে শিকার করা জঙ্গলের নিয়ম নয়।

শেয়াল অধীর হয়ে বলল—তবে কি হবে?

অধীর হলেই জানোয়াররা অসাবধান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার পায়ের শব্দে চীল চটকা ভেঙ্গে জেগে উঠল। জেগে উঠে নীচের পানে তাকিয়েই আকাশ কাঁপিয়ে চীৎকার। সেই চীৎকার বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনিত হতে হতে নালুখ যেখানে শেকড় খুঁড়ছিল সেখানে পৌঁছল। ভাল্লুকমা যেখানে মৌমাছিদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মধু খাচ্ছিল সেখানে পৌঁছাল। ভাল্লুকমা খাওয়া ভুলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল! নালুখ ফিরল বাসার পানে।

এদিকে শেয়াল বলল—শিগ্‌গির মানুষের ছানাটাকে মুখে তুলে নাও, এখুনি ভাল্লুকরা এসে পড়বে!

কালকেতু একলাফে এসে সাবধানে মংলুকে মুখে করে তুলে নিল। চীল তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। কালকেতুর একটা দাঁতও মংলুর গায়ে বসল না কারণ বনের নিয়ম অনুসারে কালকেতু এখন তাকে মারবে না। মংলু জাগল না। ভাল্লুকমার মুখে মুখে এমন সে অনেক ঘুরেছে কিন্তু ক্রূর ধুর্ত্ত কালো বাঘ আর শেয়ালের সঙ্গে সে মৃত্যুর দক্ষিণ দ্বারে যে এগিয়ে চলল, ঘুমন্ত অসহায় মংলু তা জানতেও পারল না। বাঘেদের অনুসরণ করে চীল চেঁচাতে আকাশে উড়ে চলল।

এদিকে ভাল্লুকমা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে দেখে মংলু নেই। ভাল্লুক মা মাথায় হাত দিয়ে বসে করুণ চীৎকার করে উঠল ঠিক সেই সময়ে বাচ্ছাদের তাড়িয়ে নিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে নালুখ এসে হাজির।

—কি কি হয়েছে গিন্নী?

ভাল্লুক গিন্নী বলল—মংলু টিকটিকিকে শেয়ালে নিয়ে গেছে।

নালুখের লোমগুলো রাগে খাড়া হয়ে উঠল। সে গর্‌গর্‌ করে গজ্জন করে উঠল।

ভাল্লুকমা মাথা চাপড়ে বলল—হায় হায় কেন আমি মধু খেতে গেলাম? মংলু টিকটিকিকে পাজী শেয়াল নিয়ে গেল? হায় হায়!

নালুখ তখন মাটির ওপর থাবার দাগ একমনে পরীক্ষা করছিল, সে বলে উঠল—শেয়াল নয় এখানে বাঘের থাবাও দেখা যাচ্ছে।

ভাল্লুকমা চমকে উঠল—অ্যাঁ? কালো বাঘ?

—হুঁ!

—হায় হায়, তাই চীল অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। নালুখ জিগেস করল—চীল?

—হাঁ ওই গাছের ওপর ছিল।

—কোথায় চীল?

ভাল্লুকমা আকাশে তাকিয়ে দেখল চীল কোথাও নেই!

নালুখ বলল—চল আর দেরী নয়, এর প্রতিশোধ নিতে হবে। দেখি সে কেমন বাঘ।

নালুখ দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ছাড়ল তার যুদ্ধ গর্জ্জন। সে গর্জ্জন মেঘের ডাকের মত বন থেকে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। জানোয়াররা সে গর্জ্জন শুনে চমকে উঠল। দূর পাহাড়ে সম্বর সে ডাক শুনে ভয়ে লাফিয়ে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

বাঘের থাবার দাগ অনুসরণ করে নালুখ ছুটল মরিয়া হয়ে, পেছনে তার ভাল্লুক মা আর বাচ্ছারা। বনের যেখানে ফাঁকা জায়গায় ধূলো জমে আছে সেখানে বাঘের থাবার দাগ সুপষ্ট। কিন্তু বন যতই গভীর হতে লাগল ততই শুকনো পাতা ঝরে মাটি ছাওয়া। সেখানে আর থাবার দাগ দেখা যায় না।

ভাল্লুকরা থমকে দাঁড়াল। পথ হারিয়েছে। বাঘ কোথায় গেছে কোন দিকে?

কোথায় যেন দূর আকাশ থেকে ক্ষীণ একটা ডানায় শব্দ। ভাল্লুক মা চমকে ওপরে তাকাল। নীল আকাশের বুকে ছোট্ট কালো একটা দাগ। তারপরে দাগটা বড় হতে লাগল। বিদ্যুৎ বেগে কে যেন ছুটে আসছে। তারপরে ভাল্লুকরা চীলের গলা শুনল—ওগো ভাল্লুকরা শোন। তোমাদের শিকারের ভাগ আমি অনেক সময় পেয়েছি। আমি তাই তোমাদের বন্ধু। মংলু টিকটিকিকে কালো বাঘ ধরে নিয়ে গেছে।

—কোথায়? নালুখ হাঁক দিল

—হিজল বনে

আর শোনবার দরকার হোল না। ভাল্লুকরা ছুটল আবার।

এদিকে বাঘের ডেরায় মংলুর ঘুম ভাঙ্গল। প্রথমে সে আড়ামোড়া দিয়ে শরীর থেকে ঘুম তাড়িয়ে নিল, তারপরে উঠে বসল সে।

শেয়াল বলল—এইবার!

কালকেতু দুপা পেছিয়ে এসে—গর্‌র্‌ করে উঠল। মংলু চমকে ফিরল বাঘের দিকে। সে বাঘ কখনও দেখেনি কিন্তু কোন অনুভূতি যেন তাকে বলে দিলে যে এই প্রাণীটা তার শত্রু। কিন্তু সে ভয় পেল না, হামা দিয়ে উঠে বাঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকাল। কালকেতু এদিকে টান হয়ে দাঁড়িয়েছে লাফিয়ে পড়বে বলে। এক থাবার ঘায়ে মংলুর ছোট্ট প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সময় কেটে যেতে লাগল বাঘ আর লাফায় না। শিকার ভয় না পেলে শিকারী কখনও শিকার করতে পারে না।

—কি দেরী করছ কেন?—শেয়াল জিগেস করল। কালকেতু গর্জ্জন করে উঠল—কি তখন থেকে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ? দেখছ না মানুষের ছানাটা একটুও ভয় পায়নি? তাছাড়া ওর চোখে কি যেন আছে। ওর চোখের দিকে তাকালে আমার বুকের ভেতর কি রকম করছে!

সত্যি সত্যিই মংলুর চোখের সেই অদ্ভুত রহস্য মাখা গভীর দৃষ্টির সামনে বাঘ ছটফট করছিল।

কোন জানোয়ার মানুষের পূর্ণদৃষ্টি সহ্য করতে পারে না।

কালকেতু বলল—ও যতক্ষণ ভয় না পেয়ে আমার দিকে ওই রকম স্থির চেয়ে থাকবে ততক্ষণ আমি লাফাতে পারবনা।

শেয়াল বলল—আচ্ছা আমি ওর দৃষ্টি ফেরাচ্ছি। শেয়াল গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। মংলু চমকে শেয়ালর দিকে ফিরল। সে জানত না যে সেই মুহূর্ত্তে তার জীবনের অলক্ষ্য দঁড়ি টানা হয়ে গিয়েছিল।

কালকেতুর পেশীগুলো লাফাবার আগের মুহূর্ত্তে কঠিন হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ে নালুখের যুদ্ধ গর্জ্জনে হিজল বন কেঁপে উঠল। কালকেতু লাফিয়ে উঠেছিল কিন্তু সেই গর্জ্জনে তার তাক ফসকে গেল। নালুখ তখন দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটে আসছে। ভাল্লুকমা এক লাফে এসে মংলুকে আগলে দাঁড়াল। আর কালকেতু শিকার ফসকে মরিয়া হয়ে ঘুরেই নালুখের ওপরই এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নালুখ ত তৈরীই ছিল। সামনের দুটো বলিষ্ঠ হাতে সে সাঁড়াসীর মত বাঘকে তার বিশাল বুকে চেপে ধরল।

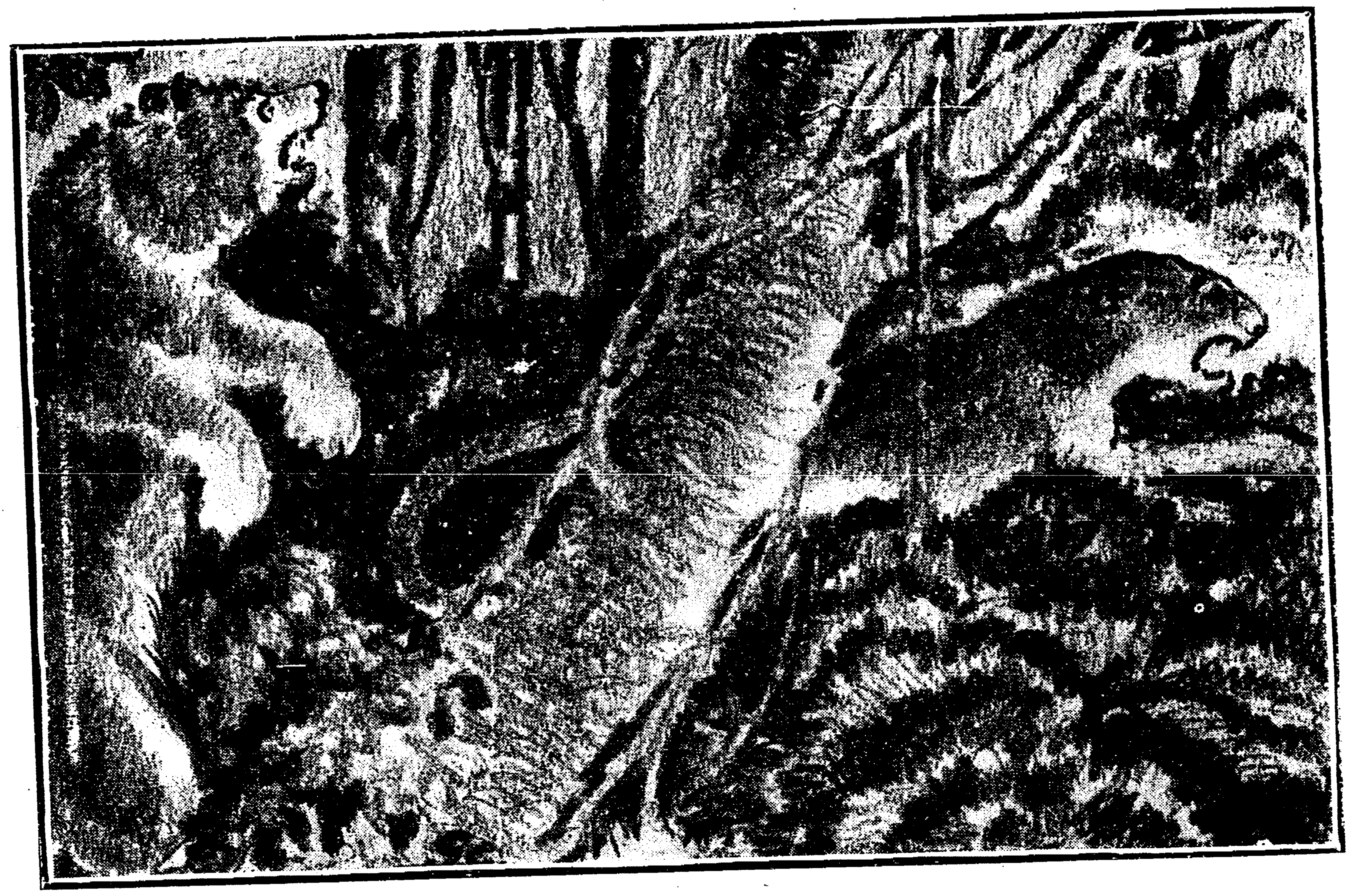

হিজল বন কেঁপে উঠল

পাজী শেয়াল এ সব ব্যাপার দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে হাওয়া।

কালকেতু গায়ের বলে কম যায় না কিন্তু ভাল্লুকদের আক্রমণ তার ওপর অতর্কিত।

ওদিকে নালুখ মরিয়া হয়ে লড়বার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে। তার হাঁ করা মুখে দাঁতগুলো ঝক ঝক করছে। চোখগুলো আগুণের পিণ্ডের মত রাগে ঘুরছে। কালকেতু শিকার ফসকে নেহাতই রাগের মাথায় নালুখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আক্রমনটা ঠিক মত হোল কি না ভাববারও সময় পায় নি। যখন ব্যাপারটা ভাল সে বুঝল তখন সে

বুঝতে পারল যে সে একেবারে বোকার মত মরণের খপ্পরে পড়েছে কারণ ভাল্লুক কোন জানোয়ারকে একবার বুকের মধ্যে পেলে তার আর আশা থাকে না। সে একেবারে পিষে ছাতু হয়ে যায়।

কালকেতু তখন বুঝছে যে এ যাত্রা তার আর রক্ষে নেই, ভাল্লুকের বিশাল সেই দুই বাহুর চাপে তার জিভ বেরিয়ে আসছে! সে আবার নখ দিয়ে ভাল্লুকের কাঁধটা ফালা ফালা করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নালুখের কাঁধে অজস্র লোম। কালকেতুর নখ জড়িয়ে যেতে লাগল। কালকেতু বুঝল এখন জেতবার আশা বৃথা, আত্মরক্ষা করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ওদিকে মুহুর্মুহু নালুখের বাহুর চাপ কঠিন হচ্ছে। কালকেতুর জিভ আধখানা বেরিয়ে এল, সে গোঁ গোঁ করে উঠল। মরণ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। কালকেতু মরিয়া হয়ে প্রাণপণে সাপের মত একবার পেশীগুলো কিলবিল করে দিয়ে পিছলে নালুখের দুই বাহুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। যুদ্ধের প্রথম ঝোঁকে প্রতিপক্ষ কাবু না হলে জানোয়াররা দাঁড়ায় না। নালুখ গর্জ্জন করে উঠল। কালকেতু বেরিয়ে এসেই সজোরে একটা দম নিয়ে বনের ভেতর দিকে মারল ছুট।

নালুখ আকাশে মুখ তুলে ছাড়ল তার বিজয় গর্জ্জন। চীল সে ডাক আকাশে তুলে নিয়ে বনে বনে ছড়িয়ে দিল তারস্বরে।

এমনি করে মংলু তার জীবনের প্রধান একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেল। সে তখন আপন মনে ভাল্লুকমায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে।

ফিরতি পথে নালুখ গান ধরল—

নালুখ। শিকার কোথায় ?
বাচ্ছারা। পালিয়েছে, পালিয়েছে,
নালুখ। বনের মাথায় চীল ডাকে,
ভাল্লুকমা। নালুখ ভালুক ওই হাঁকে।
নালুখ। কঠিন খাবার অনেক বল,
বাচ্ছারা। ওভাই এবার ছুটেই চল।
সকলে। ছুটেই চল, ছুটেই চল।
ভাল্লুকমা। কৌ গাছেতে ঝরছে মৌ
নালুখ। বাসায় কাঁদে শেয়াল বৌ

বাচ্ছারা। বন হরিণী কোথায় গো ?
ভাল্লুকমা। শেয়াল ডাকে হুক্কা হো
মংলু আমার সামলে শো
সকলে। সামলে শো, সামলে শো।
নালুখ। আলো ছায়ায় পথ কাবার
ভাল্লুকমা। সূয্যি ডোবে জলার পার
বাচ্ছারা। ওভাই এবার ঘরেই চল
নালুখ। বনঝরণায় নামল ঢল
সকলে। নামল ঢল, নামল ঢল।
ঘরেই চল, ঘরেই চল।

ক্রমশঃ

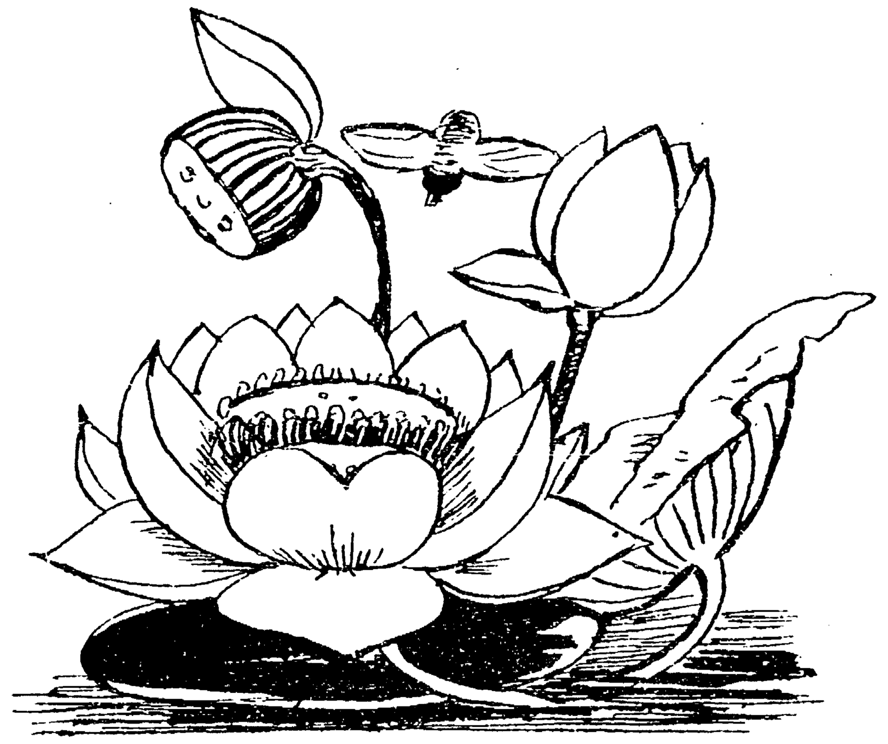

ভদ্রতা কাকে বলে

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অনাদিবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমি মুগ্ধ। এমন প্রিয়ভাষী অমায়িক ভদ্রলোক আজকালকার দিনে হয় না। সেদিন সকালবেলা এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা আর এক খণ্ড অদৃশ্য মাখন মাখানো চামড়ার মতো শক্ত পাঁউরুটি খেয়ে হোটেলের খুপরিতে চিং হ'য়ে প'ড়ে আছি, হঠাৎ বাইরে একজনের হাঁক শুনলাম—বিজন আচ্ছা নাকি হে ?

এই হাজারিবাগের জঙ্গলে আমার আবার খোঁজ করে কে ? তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলুম। দরজা খুলে দেখি মোটা সোটা সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে বললেন, তোমারই নাম বিজন ঘোষ ?

ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশের উপর হবে ; মাথার চুল কাঁচাপাকা মেশানো। আমি যথাচিত বিনয়ের সঙ্গে বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি...

ভদ্রলোক মধুরভাবে হেসে বললেন—আর আমাকে তুমি চিনবে কোথেকে ? তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। তোমার বাবার নাম রামদয়াল ঘোষ তো ?

কথাটা নিছক সত্য, কোনোরকমেই অস্বীকার করা যায় না।

—তাহ'লেই হয়েছে ! আরে তোমার বাবা হচ্ছেন আমার মাসতুতো ভাই। আমি তোমার কাকা হই। ব'লে ভদ্রলোক হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি সসম্ভ্রমে বললুম, আসুন, ঘরে এসে বসুন।

ঘরের মধ্যে একটি তক্তপোষ, একটি ছোটো টেবিল, তারপর আর পা ফেলবার জায়গা নেই। ঐ তক্তপোষে আমি আর সুমন্ত্র রাত্রে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুই ; আর দিনের বেলায় যেটুকু সময় ঘরে থাকি, কোনোরকমে সময় কাটাই। সেই তক্তপোষেরই এককোণে সসঙ্কোচে ভদ্রলোককে বসতে দিলুম।

—এই ঘরে আছো বুঝি ? ইনি কে ?

সুমন্ত্র ওর কতগুলো ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ আলোয় তুলে ধ'রে পরীক্ষা করছিলো, আগন্তুককে দেখেও বিশেষ বিচলিত হ'লো না। ফটোগ্রাফি ওর এক ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে, ওকে নিয়ে আর পারা যায় না।

ওর অভদ্রতায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে আমি বললুম—ও আমার বন্ধু, সুমন্ত্র সোম। আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছি।

—বাঃ, দু' বন্ধুতে বেড়াতে এসেছো হাজারিবাগ। বেশ। কবে এসেছো?

—এই তো তিনচারদিন হ'লো।

—ভাখো তো! তুমি আমাদের আপন লোক, আর তুমি কিনা এখানে এসে হোটেলে আছ! আরে তোমার সঙ্গে কি দেখাই হত নাকি! ভাগ্যিস আজ এই হোটেলে এসেছিলাম এক বন্ধুর জন্যে ঘর ঠিক করতে! তোমাদের এই ছোটো ঘরটা হ'লে তাঁর চ'লে যেতো। ম্যানেজার বললেন, ও-ঘর এনগেজ্ড্ হ'য়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আছেন? ওঁরা তখন ওঁদের খাতা নিয়ে এলেন, তাতে তোমার নাম দেখলুম। তাতেও আমার কিছু মনে হয়নি—কী ক'রেই বা হবে?—কিন্তু যেই তোমার বাবার নাম চোখে পড়া অমনি আমার মনটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। এ তো তবে আমাদেরই সেই বিজন! তক্ষুনি এসে ডাকলুম তোমাকে।

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলুম, কিন্তু কী ক'রে সেটা প্রকাশ করবো ভেবে পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম—আপনি এখানেই থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আমি ফরেষ্ট-আপিসে কাজ করি কিনা। চাকরি জীবনে নানা জায়গায় ঘুরেছি, শেষটায় এই হাজারিবাগে এসে ভারি ভাল লাগলো। রিটায়ার ক'রে এখানেই কাটাবো ভাবছি। সে যা-ই হোক্, তোমার খবর কী বলো? কী করছো?

—বি-এ পড়ছি স্কটিশে। সুমন্ত্র আমার সঙ্গেই পড়ে।

—বাঃ এইটুকু বয়েসে বি-এ পড়ছো! চমৎকার! ভদ্রলোক আমার হাত ধ'রে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি ছিলেন। —আরে তোমাকে কতটুকু দেখেছি! তোমার বাবা যখন নেত্রকোনায় ছিলেন, মনে আছে তোমার?

আমি বললুম—মনে নেই।

—তা কী করেই বা থাকবে, তখন তুমি কতটুকু! তখন আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম, তারপরে আর তোমার বাবার সঙ্গেও দেখা হয়নি। এই তো ভাখো এখান থেকে ওখানে ঘুরছি—কোথায় শিলং কোথায় নাগপুর কোথায় নৈনিতাল—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার কি আর উপায় আছে! এতদিন পরে তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে! ছেলেবেলায় তোমার বাবার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। তাঁকে আমরা বড়-দা বলতুম। তাঁর মা আর আমার মা সাক্ষাৎ মামাতো-পিসতুতো বোন। কাজেই দেখতে পাচ্ছো, সম্পর্কটা নেহাৎ ফ্যাল্‌না নয়।

সম্পর্কের জটিলতার ব্যূহভেদ করবার চেষ্টা না ক'রে তৎক্ষণাৎ সায় দিলুম—তা তো নয়ই।

তারপর ভদ্রলোক অনেক পারিবারিক তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিছু আমি জবাব দিতে পারলুম, কিছু পারলুম না। পরিশেষে বললেন—যাক্, ভা-রি ভালো লাগলো এখানে তোমাকে পেয়ে। আরে আগে জানলে আর হোটেলের দরকার কী ছিল, আমার ওখানেইত থাকতে পারতে।

আমি অপরাধীর মতো বললুম—আপনার কথা আমি তো জানতুম না।

—তা তো ঠিকই তা' তো ঠিকই। হোটেলের ব্যবস্থা কেমন?

সুমন্ত্র এক্ষণে একটা কথা বললে—যাচ্ছে-তাই।

—ভালো না বুঝি? আর দিশি হোটেল সবই এ-রকম, আমি তো এদের এতদিন ধ'রে দেখে আসছি। তা তোমরা এককাজ তো করতে পারো, আমার ওখানে এখনো তো চ'লে আসতে পারো—হ্যাঁ, বেশ তো, তোমরা দু'জনেই চ'লে এসো না—বেশ আনন্দে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে। আমি বলি কী, অসুবিধে হ'লেও আমার আপন লোকের কাছেই থাকবো, সে-রকম আনন্দ কিছু নেই। কী বলো তোমরা?

আমি বললুম তা তো ঠিকই, তবে—

ভদ্রলোক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি হোটেলে কথা দিয়ে থাকো যে অতদিন থাকবে সে-কথা আলাদা। তাছাড়া, এক জায়গায় এসে উঠেছ, জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করাও হাঙ্গামা। আমি জোর করবো না—তোমরা ভেবে দ্যাখো, যা তোমাদের সুবিধে হয় তা-ই করবে।

হোটেলে আমরা কোনো কথা দিই-নি; আর জিনিষপত্রের মধ্যে তো বাক্স আর বিছানা; কিন্তু ভদ্রলোকের ভদ্রতায় এতদূর অভিভূত হয়ে পড়লুম যে সে-কথাটা জানানো হ'লো না। একটু বাদেই তিনি উঠলেন।

—আচ্ছা আমি চলি আজ, কাজ আছে। এসো তুমি একদিন আমার বাড়িতে, তোমার বন্ধুকে নিয়েই আসবে। একদিন কী বলছি, রোজই আসবে, যখন খুসি। আমি বাড়ী না থাকি, তোমার কাকীমা তো আছেন। তিনি তোমাকে দেখে কত সুখী হবেন। আজই এসো না বিকেলে—

—আজ বিকেলে তো আমরা......

—ও, বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি? আচ্ছা কাল এসো, রোজ এসো! ভদ্রতা করে একদিন এসেই যে পালাবে তা নয়। সত্যি সত্যি আপনাদের মতো আসা যাওয়া করবে, কেমন?

এই কথা রইলো কিন্তু। আমার বাড়িটা তোমাদের ব'লে দিই—কলেজ ছাড়িয়ে বাঁ দিকে যে-রাস্তা গেছে, তার মুখেই। থ্রী ট্রীজ। তিনটে গাছ আছে কম্পাউণ্ডে। চেনা খুব সোজা। দরজায় নেম-প্লেটও আছে, এ, এন, দাস। অনাদিনাথ দাস আমার নাম। ঠিক আসবে তো?

আমি মাথা নেড়ে বললুম—আসবো।

—হ্যাঁ, ক'দিন আছো এখানে?

—আছি আর দিন সাতেক।

—কেন, থাকোনা কিছুদিন। এখানকার স্বাস্থ্য এ-সময়টায় খুব ভালো। কলেজ খুলতেও তো দেরী আছে বুঝি। আর ছাখে তো, খামকা তোমরা হোটেলে এসে উঠলে। আগে জানলে কি আর...আমার এখানেই তো বেশ থাকতে পারতে! করবে এক কাজ? চ'লে আসবে আমার ওখানে? হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহভরে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

আমি খুব মৃতুস্বরে আরম্ভ করলুম, তা...

অনাদিবাবু তৎক্ষণাৎ আবার বললেন, অবশ্যি তোমাদের অসুবিধে হ'তে পারে, সে তোমরা বুঝবে। তবে আমি বলি কী, যেখানে আপন লোক পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে একটু অসুবিধে ক'রেই না-হয় থাকলাম। ব'লে তিনি অত্যন্ত মন-খোলাভাবে হেসে উঠলেন। —আচ্ছা, আমি বলি এখন, তোমরা কাল আসছো তো? শুধু কাল নয়, রোজই আসা চাই।

পরের দিন সকাহে আমি বললুম—সুমন্ত্র, চল্ আজ অনাদিবাবুর বাড়ী।

সুমন্ত্র কোটের উপর ক্যামেরা ঝুলিয়ে বললে—তুই যা তোর কাকাবাবুর ওখানে। আমি একটা জঙ্গলের ধারে চমৎকার ভিউ দেখে এসেছি, চললুম সেখানে।

চল্, চল্, চমৎকার খাওয়াবে দেখিস। হোটেলে খেয়ে-খেয়ে তো আধ-মরা হ'য়ে গেলুম।

—তোর তো দিন-রাত কেবল খাওয়ার চিন্তা। এখানে এসে খিদে ছাড়া আর কোন কথা তোর মুখে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। গ্লাটন!

একটু চুপ ক'রে থেকে আমি বললুম—ছাখ্ সুমন্ত্র, তোর সঙ্গে এসে আমি যে-রকম ভুগছি অন্য কেউ হলে পাগল হ'য়ে যেতো। ক্যামেরা কেনবার পর থেকে তুই আর মানুষ আছিস নাকি, আস্ত জানোয়ার ব'নে গেছিস। কাল ঐ ভদ্রলোক এলেন, এতক্ষণ বসলেন. এত সব চমৎকার আলাপ করলেন, তুই একটা কথা বললি না। কী ভাবলেন অনাদিবাবু!

সুমন্ত্র আমার কথা শুনতেই পায়নি এইভাবে বললে—রেড ফিল্টার দিয়ে ঐ দূরের পাহাড়গুলির ছবি যা একখানা নিয়েছি, দেখবি কলকাতায় গিয়ে!

না সত্যি সুমন্ত্রকে নিয়ে আর পারা যায় না! এক দণ্ড ওর সঙ্গে তিষ্ঠোয় কার সাধ্যি! বেড়াতে বেরিয়ে একটা কথা বলে না, আর কোনদিকে মন নেই, কেবল ইতিউতি যায়, ডালে ডালে পাখির বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো, ক্যামেরাটা একবার এদিক, একবার ওদিক, আধঘণ্টা কসরতের পর মাথা নেড়ে হয়তো বললে—নাঃ। তারপর হয়তো টেনে নিয়ে গেলো একটা জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে একটা গাছ দেখে এসেছে, তার নাকি ছবি তুলতেই হবে। খিদে তেষ্টা ক্লান্তি এ-সবই ওর লুপ্ত হয়েছে, ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমার একেবারে হয়রাণির একশেষ। কথা যখন বলবে তখন ঐ ছাইভস্ম ক্যামেরারই তথ্য বোঝাবে—নাঃ, সত্যি আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সেদিন ওর সঙ্গে ছোটখাটো একটু ঝগড়াই হ'য়ে গেলো। আমি চ'টে গিয়ে বললুম —বেশ, তুমি যাও যেখানে খুসি, আমি চললুম অনাদিবাবুর ওখানে।

সুমন্ত্র হেসে বললে, আরে রাগ করো কেন? চলো চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

অনাদিবাবুর বাড়ী সহজেই খুঁজে পাওয়া গেলো। সহরের বাইরে নির্জন জায়গায় সুন্দর বাড়িটি। অনাদিবাবু বাড়িই ছিলেন, আমাদের দেখে মহাখুসি। খুব আদর ক'রে ঘরের ভিতর নিয়ে বসালেন। তারপর অনাদিবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ আমার কাকিমার সঙ্গেও পরিচয় হ'লো। তাঁরও কথাবার্ত্তা ভারি ভদ্র ও পরিপাটি।

কথায় কথায় জানা গেলো বাড়িটি ভদ্রলোকের নিজের; শিলঙে ও মধুপুরেও তাঁর বাড়ি আছে। কলকাতায় একটি 'ছোটখাটো আস্তানা' করবার ইচ্ছে আছে সামনের বছর। —কোনরকমে আমাদের বেঁচে থাকা আর কি, এ-সব কথার পর কাকিমা বললেন, ছোট্ট এই বাড়িটুকুতে যা হোক ক'রে থাকা। তা বাড়ি আমার ছোটো হ'তে পারে, কিন্তু অনেকেই তো বাড়িটিকে সুন্দর বলেন।

—হ্যাঁ, ভারি সুন্দর আপনার বাড়ি।

—তোমরা—তোমরা তো হোটেল থেকে পেট ভ'রে খেয়ে-দেয়েই বেরিয়েছো? কিছু খাবার...

সুমন্ত্রের কথা জানিনে, কিন্তু আমি তো এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে অবধি হোটেলের কৃপায় সর্ব্বদাই জঠরের জ্বালায় জ্বলছিলাম। সকালে একটু যা রুটি খেয়েছি টেরও পাইনি,

তার উপর এই মাইল ছু'য়েক হেঁটে প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গেছল। তবু এতখানি ভদ্রতার বদলে ভদ্রতাই করতে হ'লো। শুষ্কস্বরে বললুম, না, না, ও-সব কিছু...

—অন্তত একটু চা? কাকিমার ভাবখানা যেন এই যে, আমাদের শত আপত্তি সত্ত্বেও চা একটু আমাদের খাওয়াবেনই।

—আচ্ছা, চা একটু খেতে পারি।

খানিক পরে ছুটি ছোট পেয়ালায় ঈষদুষ্ণ যে তরল পদার্থটি এলো, তাকে চা ব'লে চিনতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। ভদ্রতা ক'রে তাইতেই ছু' এক চুমুক দিয়ে রেখে দিলুম।

কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন—ও কী, খেলে না? ভাল হয়নি বুঝি?

বলতে হ'লো—আমরা একটু কড়া চা খাই।

—ঐ তো, আজকালকার ছেলেদের ঐ তো দোষ! বাব্বা কড়া চা খাও অসুখ করে না?

কই, করে না তো।

আগে জানলে আমিও না-হয় একটু বেশী চা ভিজোতাম। ছ্যাখো চাগুলো ফেলা গেলো!

অনাদিবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—তা আর কী হয়েছে। আবার একটু ভালো করে এনে দাও না।

আমরা বললুম—না, না থাক্—

হ্যাঁ, এত বেশি চা খাওয়া ভালোও না, বললেন কাকিমা। আর একদিন এসো, ভালো ক'রে চা খাওয়াবো।

তারপর ছুটো চারটে কথা ব'লে আমরা বিদায় নিলাম। অনাদিবাবু বার-বার বলতে লাগলেন—আবার আসা চাই কিন্তু। যে-ক'দিন আছো, রোজ আসবে। আমি ভেবেছিলাম সবাই একসঙ্গে আনন্দ ক'রে থাকবো, তা তো আর হ'লো না—যেটুকু তোমাদের পাই, সেটুকুই ভালো।

বাইরে এসেই সুমন্ত্র বললে—তোর কাকার বাড়ীতে এত খেয়েছি যে সারাদিনে আর কিছু না-খেলেও চলবে।

আমি ঝাঁ ক'রে চ'টে উঠে বললুম—ওঁদের সায়েবি চাল-চলন, ওঁরা অসময়ে অমন যা-তা কতগুলো খেতে দেন না। আর চা তো সকলে একরকম খায় না—তাতে কী হয়েছে? যেদিন নেমতন্ন ক'রে খাওয়াবে সেদিন দেখবি।

একদিন যায়, ছু'দিন যায়, আমার নব-আবিষ্কৃত কাকার আর দেখা নেই! সুমন্ত্রর ঠাট্টার খোঁচায় আমি যখন প্রায় আধ-মরা, তখন একদিন অনাদিবাবুকে আমাদের হোটেলের

দিকে আসতে দেখা গেলো। আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠলুম, দেখিস, আজ নিশ্চয়ই আমাদের খেতে বলবে। সেইজন্যেই আসছে।

অনাদিবাবু আমাদের দেখেই হা-হা ক'রে হেসে বললেন—বেশ লোক তোমরা, আর দেখাই নেই। আমাদের ওখানে থাকলে না, এলে না, খেলে না—কী অন্যায় তোমাদের বলো তো! আরে পর তো আর নই, না হয় দেখাশোনাই হয় না। একদিন তোমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ছি না, কবে খাবে বলো।

সেটা আমাদের বলার চাইতে ওঁর বলাই ভালো ভেবে চুপ করে রইলুম।

সুমন্ত্র বললে—পরশু আমরা চ'লে যাচ্ছি।

—অ্যাঁ! পরশু চ'লে যাচ্ছ! ফিরে যাচ্ছো কলকাতায়! আহা, আমরা যে ভাবছিলুম পরশুই তোমাদের খেতে বলবো। কী মুস্কিল ছ্যাখো তো। একসঙ্গে ব'সে একদিন একটু আনন্দ ক'রে খাওয়াও কি হবে না? থাকো না আর ছু'চারটে দিন অন্ততঃ। পরশু না গিয়ে তার পরের দিন যাও না! ভদ্রলোক রীতিমতো মিনতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম—নাঃ, আর থাকা হয় না, পরশুই যাবো।

—কেন, ভালো লাগছে না আর হাজারিবাগ?

—ভালো লাগছে বেশ, তবে....

আসল কথা, তল্পি ফুরিয়েছে, হোটেলের মাশুল পরশুর পরে আর একদিনও চালাবার উপায় নেই, কিন্তু সে কথা বললে তো ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

—তাও তো বটে, অনাদিবাবু খুব বিচক্ষণভাবে বললেন, সব ঠিক ক'রে ফেলেছ, এখন আবার ওলোট পালোট করাও তো মুস্কিল। কী কাণ্ড বলো তো! কোথায় আমাদের ওখানে গিয়ে থাকবে—তা দূরের কথা, একদিন খেলে না পর্য্যন্ত। আমরা আরো ভাবছিলাম পরশু তোমাদের সঙ্গে ব'সে কত আনন্দ ক'রে খাবো—নাঃ, তোমরা সব মাটি ক'রে দিলে! যা-ই হোক্, এবারে চেনাশোনা হ'য়ে থাকলো তো—এর পরে যদি আসো খবর দিয়ো—আঃ, খবর দেবে কী, একেবারে আমাদের ওখানেই উঠবে—কেমন তো? আচ্ছা, আমি এখন আসি। কাল একবার বেড়াতে বেড়াতে যেয়ো না! আঃ, আর একটা দিন যদি থেকে যেতে...

আর একটা দিন থাকলুম না ব'লে আক্ষেপ করতে করতে অনাদিবাবু উঠলেন। তিনি যাওয়ার পর আমার কি সুমন্ত্রর কারো মুখে কথা নেই। ভদ্রতা কাকে বলে এতদিনে শিখলুম।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে

গভীর বনে এক ঋষি ধ্যানে বসে আছেন। সহসা আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক আলোক ছটা পৃথিবীতে নামছে তিনি দেখতে পেলেন। ধ্যানে ঋষি জানতে পারলেন, তেত্রিশ দেবতার স্বর্গ থেকে পৃথিবীর বুকে এই আলোক ছটা নেমে আসছে।

ঋষির তপোবনের নিকটে একটি নীল হ্রদ ; সে হ্রদে অজস্র পদ্মকুঁড়ি। ঋষি দেখলেন, তেত্রিশ দেবতার স্বর্গের সে অপরূপ আলোক ছটা নীল হ্রদের একটি পদ্মকুঁড়িতে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হল। আশ্চর্য্য হয়ে ঋষি ভাবতে লাগলেন, এর অর্থ কী!

দিন যায়। পদ্মকুঁড়িগুলি ফোটে, শুকিয়ে ঝরে যায়। কেবল একটি পদ্মকুঁড়ি শুকোয় না, ঝরেও না। তাজা কোমল হয়ে দিনের পর দিন হ্রদের বুক সে আলো করে থাকে। একদিন ঋষি দেখলেন, সেই পদ্মকুঁড়িটি ফুটে উঠল আর তার থেকে বেরিয়ে এল, ছোট্ট একটি পরীর মত মেয়ে। ঋষি ভারী খুসী হয়ে তাকে নিজের কুঠীরে নিয়ে এলেন। নিজের মেয়ের মত তাকে তিনি লালন পালন করতে থাকলেন।

পদ্মকুঁড়ির মেয়ে দিনে দিনে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠল। ঋষির তখন একটু ভাবনা হল। মন্ত্র পড়ে তিনি শূন্যে একটি স্ফটিক নির্ম্মিত রমনীয় দুর্গ রচনা করলেন তার জন্য। দুর্গটির নাম রাখলেন—স্ফটিক প্রাসাদ। শূন্যে স্ফটিক প্রাসাদ ভাসতে থাকল।

ঋষির তপোবনে কাঠুরেরা আসত কাঠ কাটতে। স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা তাদের মুখে মুখে চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বারাণসীর এক তরুণ রাজপুত্রও সেকথা শুনতে পেলেন। মনে মনে রাজপুত্র পণ করলেন, যেমন করে হোক স্ফটিক প্রাসাদের মেয়েকে তিনি জয় করে নিয়ে আসবেন ও তাকে বিয়ে করবেন।

লোক লস্কর মন্ত্রী নিয়ে রাজপুত্র তাঁর অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। ঋষির কুঠীরে এসে ঋষিকে অভিবাদন করে রাজপুত্র তাঁর মনের ইচ্ছে নিবেদন করলেন। রাজপুত্রকে দেখে ঋষি খুসী হয়ে বললেন, রাজপুত্র, একটি সর্ত্ত আছে। তুমি যদি তার কি নাম বার করতে পার— তা হলেই তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে।

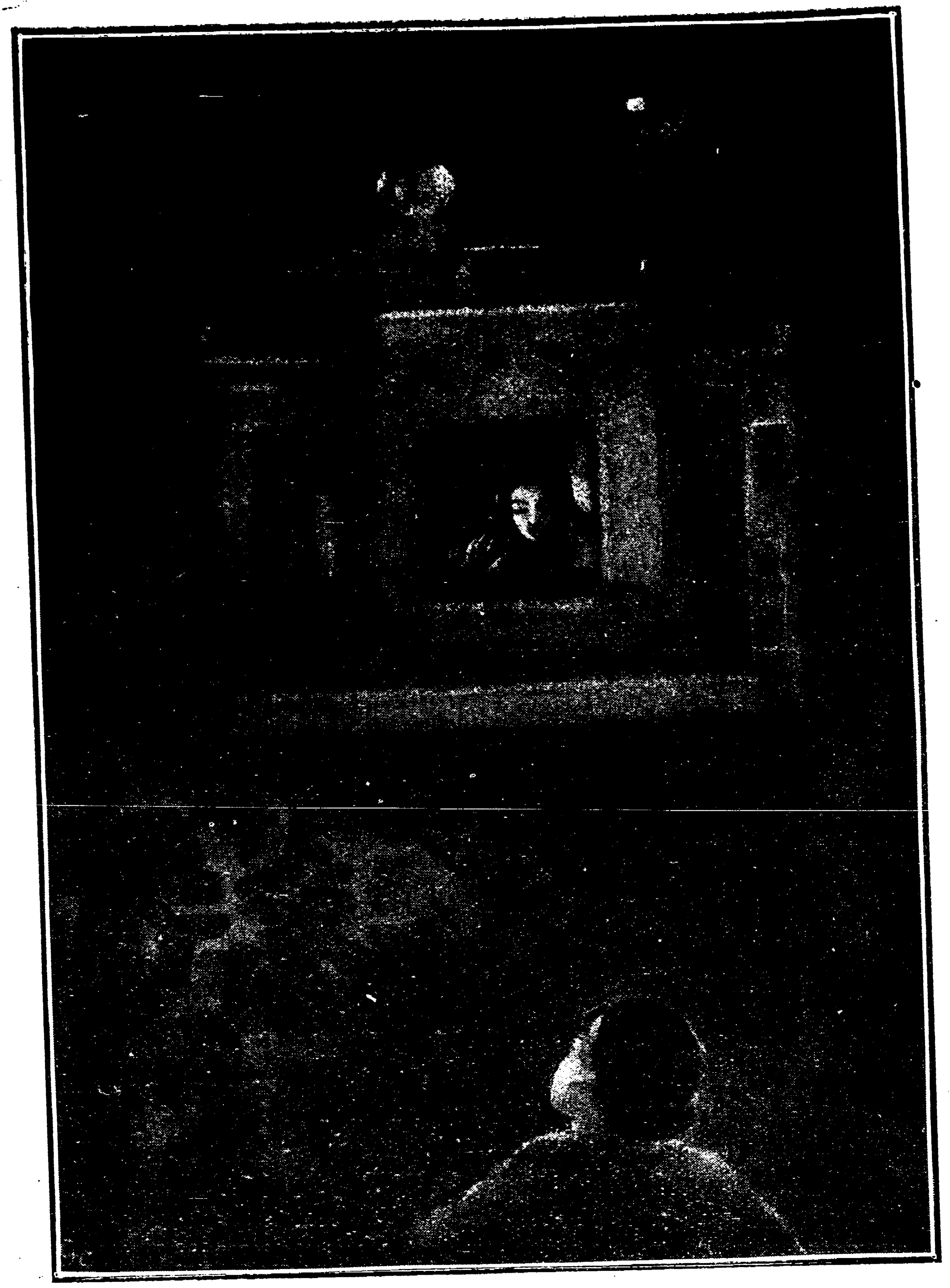

রাজপুত্র, নিরাশ হোয়ো না।

রাজপুত্র, রাজপুত্রের মন্ত্রী লোক লস্কর সকলে হাজার হাজার নাম বলতে থাকেন কিন্তু কোন নামই মেলে না! রাজপুত্র ভাবলেন, এত লোক লস্কর নিয়ে এ কাজে সিদ্ধ হওয়া যায় না, তিনি একা এ কাজ করবেন। তখন রাজপুত্র তাঁর লোক লস্কর মন্ত্রীকে তাঁর রাজধানীতে ফিরে যেতে বললেন। মন্ত্রী অনুরোধ করলেন যে রাজপুত্রও তাঁদের সঙ্গে ফিরে চলুন, কত বোঝালেন। কিন্তু রাজপুত্র কোন কথায় কান দিলেন না। তখন মন্ত্রী লোক লস্কর সকলেই চলে গেল। একা রইলেন রাজপুত্র তাঁর তাঁবুতে। বসে বসে রাজপুত্র ভাবেন, রোজ নতুন নতুন নাম বলেন, কিন্তু হায়, ঋষি রোজই মাথা নাড়েন।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল, রাজপুত্র নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? আরো তো হাজার হাজার মেয়ে আছে। একটা পুরো বছর আমার বৃথা নষ্ট হল। এবার আমি দেশে ফিরব।

স্ফটিক প্রাসাদের নীচে দিয়ে রাজপুত্রের ফেরবার পথ। যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন, স্ফটিক প্রাসাদের জানালায় স্ফটিক প্রাসাদের সেই মেয়ে। রাজপুত্র তাকে বললেন, তোমার নাম বার করতে পারলাম না, তাই আমি ফিরে যাচ্ছি।

তখন স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে বললে, রাজপুত্র, নিরাশ হোয়ো না। আর একবার চেষ্টা কর। তেত্রিশ দেবতার রাজ্যে চিত্রলতা উদ্যানে একটি লতা আছে, সে লতার নাম—আশাবতী বা আশার লতা। এই আশাবতী লতার ফল থেকে এক ভারী চমৎকার রস তৈরী হয়। সে রস যে পান করে, সে এমন মুগ্ধ হয়, যে চারমাস সুখ-শয্যায় পরম সুখভোরে সে নিদ্রা যায়, স্বর্গের সব সুখ সে উপভোগ করে! কিন্তু হাজার বছরে কেবল মাত্র একবার আশাবতী লতা ফল ধরে। রাজপুত্র, আশাবতী লতার ফলের রস পান করতে দেবতার ছেলেরা হাজার বছর অপেক্ষা করতে থাকে।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র আবার তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসেন। আবার এক বছর ভোর রোজই তিনি হাজার হাজার নাম বলেন, কিন্তু হায়, ঋষি কেবলই মাথা নাড়েন।

নিরাশ হয়ে রাজপুত্র ফেরবার আবার সঙ্কল্প করেন। স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে আবার তাঁকে দেখতে পেয়ে বললে, রাজপুত্র, নিরাশ হোয়ো না। আর একবার চেষ্টা কর। এক পাহাড়ে এক সারস পাখী থাকত। সে পাহাড়ে না ছিল জল, না ছিল মাছ। ছিল কেবল শুকনো শুকনো ঘাস। সারস ভাবত, আহা, যদি এখানে একটি পুকুর পাই তাহলে আর কোথাও না যাই। সারস প্রার্থনা করতে থাকল, যাতে তার ইচ্ছা পূরণ হয়। দেবতাদের দয়া হল, তাঁরা সে পাহাড়ের গায়ে একটি ঝরণা করে দিলেন। তখন সারস শুধু যে জলই পেল তা নয়,

ফূর্ত্তিতে মাছও খেতে পেলে প্রচুর। রাজপুত্র, আশার মত পৃথিবীতে আর কোন বস্তু নেই।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র আবার ফেরেন। কিন্তু মেয়েটির যে কি নাম, সে তিনি কিছুতেই বার করতে পারেন না। এমনি করে আবার বছর ভোর গেল। তখন হতাশায়, রাগে ও দুঃখে রাজপুত্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বললেন, না, আর নয়; এ নিয়ে আর যদি মাথা ঘামাই তাহলে ঠিক আমি পাগল হয়ে যাব। এই বোকা মেয়ের কথা শুনে কোন লাভ নেই। ফিরে যাই বারানসী।

ফিরে চলেছেন রাজপুত্র, এমন সময়ে স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে তাঁকে আবার ডাকল। রাজপুত্র রেগে বললেন, মিছামিছি আমাকে ডাকাডাকি করে আর লাভ কি তোমার—? কথায় তুমি আমার মন ভোলাও, আমাকে কেবল বৃথা আশা দাও। আমার জীবনের এতগুলি বছর আমি নষ্ট করলাম তোমার জন্য; আর তোমার নাম, আমার আশঙ্কা....................

নাম বলেছ তুমি, রাজপুত্র! নাম বলেছ তুমি!—বলে স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রাজপুত্র ছুটলেন ঋষির কুঠীরে। ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, তাঁর মেয়ের নাম আশঙ্কা।

রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে ঋষি বললেন, ঠিক বলেছ, রাজপুত্র। এতদিনে তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে। আমার মেয়েকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও। জানো রাজপুত্র, নীল হ্রদের পদ্মকুঁড়ি থেকে যখন একদিন আমি তাকে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, ভারী আশ্চর্য্য হয়েছিলাম আমি। কিন্তু মনে আমার সংশয় হয়েছিল—কে এই স্বর্গের মেয়ে!—তাই আমি নাম দিয়েছিলাম তার—আশঙ্কা।

প্রাচীন ভারতীয় উপকথা
বি, আর, ভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে

ধরণী সেন

আজব কথা শুনি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজব দেশ এই যে কোল্‌কাতা
কেউ বল্‌লে, নেইকো ব্যাঙের ছাতা !
শোনো বলি সেদিন যখন ফোড়েপুকুর দিয়ে
আস্‌ছি হেঁটে বইপত্তর নিয়ে
হঠাৎ শুনি ঃ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্‌—
আস্‌ছে কালো আস্‌ছে কোলা আস্‌ছে সোনা ব্যাঙ্‌ !
হাজার হাজার শেষ কি আছে তাদের,
ডাকের চোটে কাঁদ্‌ল ছেলে কাদের !
কোলার ছেলে ভোলার সেদিন বিয়ে
সক্কলে তাই চলেছে পথ দিয়ে
পষ্ট দেখি তাঁদের মাথায় ছাতি !
এ-সব তো আর গল্প কথা নয়
নিজের দেখা, ভুল কখনো হয় ?

তিন-ঘন্টা আট্‌কা পড়ে গেলুম
আট্‌টা-কুড়ি যখন বাড়ী এলুম !
আজো মনে পড়্‌ছে তাদের ডাক ঃ
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্‌
মস্ত সে এক গ্যাঙ্‌
চল্‌ছে কালো চল্‌ছে কোলা চল্‌ছে সোনা ব্যাঙ্‌ !

আজব দেশ এই যে কোল্‌কাতা
শুনব তবু, হয় না ব্যাঙের ছাতা !

বাঁচি যদি শুনতে কত হবে
কেবলি ভয় বল্‌বে কে যে কবে ঃ
ঘোড়ায় নাকি পাড়ে নাকো ডিম—
দুর্ভাবনায় হাত-পা হিম্‌সিম্‌।
ছোটমামা বল্‌বে কবে ঃ
"এই সন্তু ! রোশ্‌—
চাঁদের ভেতর নেইকো খরগোস্‌ !
ওখানেতে চাঁদের বুড়ি চর্‌কা কাটে না..."
বল্‌ব, "বেশ
তক্ক আমি কর্‌তে চাই না।"

সন্ধানী

অশনি, কুলিশ ও মেঘগর্জ্জন

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শীঘ্রই ঝড় বৃষ্টি হ'বার সম্ভাবনা। বাব্লা, টুকু, খুকু কল্কাতা বনাম মোহনবাগান খেলা দেখার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে তাদের বুড়ো দাদু একটু ভীত।

"খেলা দেখ্তে যাওয়া মানে বিষ্টিতে ভেজা"—এই ব'লে দাদু তামাকে ফুঁ দিতে লাগ্লে, ছেলেরা তাঁকে ঘিরে বস্ল।

বাব্লা—আচ্ছা দাদু, তুমি তো বেশ বলে দিলে খেলা দেখ্তে যাওয়া মানে বিষ্টিতে ভেজা—তুমি কেমন করে জান্লে যে বৃষ্টি হবে?

দাদু—ঐ ত্যাখ আকাশের পশ্চিমদিকে কালো কালো মেঘ আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশ ঘিরে ফেলেচে বাতাসেরও তেমন বেগ নেই। এই সব দেখেই তো বলি বৃষ্টি হবে।

টুকু—(স্বরে —মেঘের ওপর মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।)

বাব্লা—(ধমক দিয়ে) থাম্ তোর ঐ ষাঁড়ের গলা নিয়ে আর গাইতে হবে না।

টুকু—বাঃ রে ম্যাচ দেখ্তে যেতে পেলাম না বলে কি গানও গাইবো না।

বাব্লা—না গান গাইতে পাবে না।

টুকু—আচ্ছা দাদু ম্যাচ্ দেখ্তে যেতে পেলাম না—গান গাইতে বারণ, তাহ'লে এই মেঘলা দিনে কি করি।

দাদু—কেন, বসে বসে তোরা গল্প কর না।?

বাব্লা—(দাদু বেশ উপদেশ দিলে। কিন্তু গল্প বলবে কে?) তুমিই না হয় এই বাদ্লা দিনে একটা গল্প বলো।

দাদু—বেশ, কিসের গল্প বোল্বো বল্?

বাব্লা—ভূতের গল্প!

খুকু—না দাদু ভূতের গল্প না—আমার বড্ড ভয় করে। তুমি রাজারাণীর গল্প বলো।

টুকু—হ্যাঁ দাদু তুমি বলো,—

এম্নিতর মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে;
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেল কার কাছে?

দাদু—না, আজ তোদের এই বাদ্লা দিনেরই একটা গল্প বোলবো তবে তাতে রাজপুত্তুরও নেই আর স্বয়োরাণী দুয়োরাণীও নেই। তবে ঐ রাজার জাতেরই এক বৈজ্ঞানিকের কথা বোলবো। ১৭৪৯ সালে এমনি বাদ্লা দিনে বেন্জামিন ফ্রাঙ্কলিন শিল্কের রুমালের ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে এনেছিলেন।

বাব্লা—দাদু বেন্জামিন কে ছিল, সে কি করতো সে সব তো কিছুই বল্লে না।

দাদু—বল্চি রে ভাই বলচি। ১৭০৬ খৃঃ আমেরিকায় বেন্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম। ছোট বয়স থেকেই তাঁর সব জিনিষ কেন হয়, কি করে হয়, এইসব জান্বার প্রবল ইচ্ছে হয়। প্রথম বয়সে তিনি ইংলণ্ডে এক মুদ্রাকরের সহকারী হয়ে কাজ করেন। একদিন বস্টন সহরে বৈজ্ঞানিক ডক্টর স্পেনসকে (Spence) বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করতে দেখে তাঁর কৌতূহল হোলো। এর পরই ১৭৪৮ সালে তিনি তাঁর মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির কাজ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন।

খুকু—দাদু বিদ্যুৎ কি?

হঠাৎ আকাশে বারবার বিদ্যুৎ চম্কে উঠলে বুড়ো দাদু মেঘের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ছেলেদের দেখিয়ে বল্লে,—ঐ ত্যাখ্ মেঘের গায়ে সাদা আঁকা বাঁকা (বিজুলী)—ওরই নাম বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ যে শুধু মেঘের গায়েই থাকে তা নয়, আমরাও ঐ রকম বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারি। বহুদিন আগে গ্রীস দেশে থেল্স্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্ফটিক (amber) ও পশম একসঙ্গে ঘসে দেখ্তে পান যে স্ফটিক ছোট ছোট হাল্কা জিনিষকে (এই যেমন কাগজের টুক্রোকে) নিজের কাছে টেনে আনে। স্ফটিকের এই গুণ কি করে হয় তা তিনি বুঝ্তে পারেননি। তারপর কতদিন কেটে গেল কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন চর্চ্চা হোল না। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ যখন রাণী ছিলেন তখন তাঁর চিকিৎসক গিলবার্ট প্রমাণ করেন যে ঘষা পেলে গন্ধক, গালা, কাচ, মোম.

রবার পশম প্রভৃতি অনেক জিনিষই ঐ পশম দিয়ে ঘষা স্ফটিকের মতো হাল্কা কাগজের টুক্‌রোগুলো টান্‌তে পারে। এই শক্তিকে গিলবার্ট সাহেবই প্রথম নাম দেন বৈদ্যুতিক শক্তি। আমরা যখন এবনাইটের চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াই তখন চুলে একরকম শব্দ শুন্‌তে পাই। এই সময় যদি ঐ চিরুণিকে ছোট ছোট পাতলা কাগজের টুক্‌রোর কাছে আনা যায় তা হোলে দেখ্‌বে যে কাগজের টুকরোগুলো চিরুণির দিকে লাফিয়ে ওঠে। চিরুণি শুক্‌নো চুলে ঘষা পেয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে।

বাব্‌লা—শুক্‌নো চুলে ঘষা পেলে এব্‌নাইটের চিরুণি যেমন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে, ভিজে চুলে তেমন করে না কেন আর শীতকালেই বা কেন মাথা আঁচড়াবার সময় চুলের মধ্যে শব্দ হয়?

দাদু—পৃথিবীতে দু রকম জিনিষ আছে। কাচ, গন্ধক, এবনাইট, পোরসেলিন, গালা, রেশম, পশম প্রভৃতি একশ্রেণীর, আর জল, তামা লোহা, রূপো, মাটি, মানুষের দেহ প্রভৃতি আর এক শ্রেণীর ষ্টিফেন গ্রে নামে এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রমাণ করেন যে ঘষা পেলে ঐ প্রথম শ্রেণীর জিনিষগুলো যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে তা ঐ জিনিষের ভিতর দিয়ে চলা ফেরা করতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিষগুলিতে উৎপন্ন হোলেই তা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রে সাহেব প্রথম শ্রেণীর কাচ, গন্ধক, রেশম প্রভৃতি জিনিষগুলির নাম দেন অপরিচালক থাকে ইংরাজিতে Non-conductor বা Insulator বলা হয়। টেলিগ্রাফ খুঁটিতে চীনে মাটির ছোট ছোট টুপি লাগানো আছে দেখেচ বোধ হয়। ঐ টুপিগুলি insulator তার দিয়ে যখন বিদ্যুৎ চলাফেরা করে তখন সেটা মাটিতে পালাতে পারে না। গ্রে সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিষকে অর্থাৎ তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতুর জিনিষ জল, মানুষের দেহ, মাটি ইত্যাদিকে বিদ্যুৎ পরিচালক (conductor) নাম দেন। গ্রে সাহেব 'চেষ্টার হাউসে" একটি ছেলেকে রেশমের দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তার পায়ের কাছে কাচের নল ঘষেন। কাচ ঘষা পেয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আর ঐ বিদ্যুৎ যে ছেলেটির দেহে চলা ফেরা করে তা গ্রে সাহেব ছেলেটির মুখের কাছে পিত্তলের পাত ধরে দেখিয়ে দেন। তিনি দেখান যে পিত্তলের পাত ছেলেটির মুখের কাছে ধর্‌লেই সেগুলি লাফিয়ে ওঠে। জল ও জলীয় বাষ্প বিদ্যুৎকে পরিচালনা করে এইজন্যে ভিজে চুলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হলেও সেটা আমাদের দেহ দিয়ে পৃথিবীতে পালিয়ে যায় কিন্তু শীতকালে যখন বাতাসের জলীয় অংশ খুব কম তখন শুক্‌নো চুলে চিরুণি দিয়ে মাথা আঁচড়াবার সময় যে বিদ্যুত সৃষ্টি হয় তা পালিয়ে যেতে পারে না তাই তখন বিদ্যুতের ছোট স্ফুলিঙ্গ চুলের মধ্যে হতে থাকে আর আমরা তখনই শব্দ শুন্‌তে পাই। আকাশেও যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সেগুলিও বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ (Electric spark)।

টুকু—হ্যাঁ দাদু ঐ আকাশের বিদ্যুৎ আর এই ঘষে যে বিদ্যুৎ হয় এ-দুটোই কি এক?

দাদু—হ্যাঁ রে ভাই ওদুটোই এক। আর এই কথাই বেনজামিন প্রমাণ করেন। তখনকার মানুষ ভাব্‌তো যে আকাশে মেঘে আগুন লাগ্‌লেই বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের সেদিনকার পণ্ডিতেরা আর গ্রীক্‌রা ভাবতো যে আকাশে দেবতাদের সঙ্গে অসুরের লড়াই হোলেই আকাশের

ঘন কালো ঢেউ খেলানো মেঘের গায়ে আগুন লেগে যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের নাম কে না জানে। এক সময় বৃত্র নামে এক অসুর সকল দেবতাদের হারিয়ে দিয়ে স্বর্গ দখল করে। বৃত্রের পত্নী ঐন্দ্রিলা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীকে দাসী করবার জন্যে ধরে নিয়ে আসেন। তারপরই দেবতা ও দানবে খুব লড়াই বাধে। এই যুদ্ধে বৃত্রকে বধ করবার জন্যে বিশ্বকর্ম্মা দধীচি মুনির হাড়ের এক অস্ত্র তৈরী করেন। তার নাম বজ্র। ঐ বজ্রাঘাতেই বৃত্রের পতন হয়। এই হচ্ছে আমাদের পুরাণের কথা। বড় হোয়ে কবি হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার বই যখন পড়বি তখন বুঝতে পারবি সে কি ভীষণ যুদ্ধ। গ্রীক্‌রাও এই রকম একটা কাল্পনিক উপাখ্যান বিশ্বাস করতো। বেনজামিনের ইচ্ছা হোলো আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনবার। বেনজামিন স্থির করলেন যে উঁচু একটা বাড়ির ওপর ধাতুর শিক লাগিয়ে মেঘের বিদ্যুৎকে মাটিতে আন্‌বেন। কিন্তু ফিলাডেলফিয়া সহরের কোন বাড়িই তখন বেশী উচু ছিলো না। তিনি যখন এই কল্পনা করছিলেন সেই সময়ে প্যারী সহরের উপকূলে এক গ্রামে দালিবার্ড (Dalibard) নামে একজন—শুধু ৪০ ফিট উচু থেকে মেঘের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনেন। এই খবর পৃথিবীময় রাষ্ট্র হোয়ে পড়ে—বেনজামিনও সংবাদ পান তবে তিনি সেটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌লেন না। তারপর তিনি রেশমি রুমালের একটা ঘুড়ি তৈরী করে ঘুড়ির গায়ে পাত্‌লা লোহার শিক লাগিয়ে দিলেন। আর তার সঙ্গে ঘুড়িব সূতোও জোড়া হোলো। এই রকম ঘুড়ি নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন কবে মেঘ দেখা দেবে। অনেকে ভাব্‌লে লোকটার বুঝি মাথা খারাপ। কিন্তু বেনজামিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আর ভাবেন কখন আকাশে মেঘ উঠ্‌বে। দিনের পর দিন কেটে যায়, মেঘ আর দেখা দেয় না। শেষে একদিন নীলাকাশ কালো করে মেঘ দেখা দিলো।

টুকু—হাঁ দাদু—

সেদিনো কি এম্‌নিতরো মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজুলী দিচ্ছিলো কি হানা?

দাদু—হ্যাঁ ভাই সেদিনও গাঢ় কালো মেঘ আকাশে দেখা দিলো। বেনজামিন সময় বুজে ঘুড়ি উড়িয়ে দিলেন। বাতাসে ঘুড়ি উড়তে লাগলো। তখন তিনি লাটায়ের সূতোর শেষে এক টুক্‌রো লোহা বেঁধে দিলেন। কালো কালো মেঘ আকাশ জুড়ে এ'লো কিন্তু কোন ফলই ফল্‌ল না। শেষে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে ঘুড়ির সূতো গেল ভিজে এমন সময় সূতোয় লাগানো লোহা থেকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ পুট্‌ পুট্‌ শব্দ করে তাঁর আঙ্গুলে আঘাত করতে লাগলো। ফ্রেঙ্কলিনের নাম জগতময় ছড়িয়ে পড়লো। আর ছুঁচ্‌লো লোহার শিক খাড়া করে' আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে আন্‌তে পৃথিবীর লোকে উঠে পড়ে লাগলো। (এই ছুঁচলো শিক্‌কে ইংরাজিতে Lightning Conductor বলা হয়। আমরা বোল্‌বো বজ্র-বারক।) বড় বড় বাড়ীর ছাতের ওপর ছুঁচলো শিক্ লাগানো থাকে, এইসবগুলো বজ্রবারক।

বাব্‌লা—বজ্রবারক বাড়ির ওপর কেনো লাগান হয় ?

দাতু—আকাশে মেঘে যখন বিদ্যুতে পরিপূর্ণ হয় তখন আমাদের পৃথিবী ও মেঘে বেশ একটা টানাটানি চলে, যার ফলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ভেজা বাতাসের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে মাটিতে এসে পড়ে। এই স্ফুলিঙ্গকেই আমরা বাজ বলি। যখন ভিজে বাতাসে বিদ্যুতের যাতায়াতে পথ পরিষ্কার আর খুব সোজা হোয়ে পড়ে তখন মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অল্প রাস্তা যেটা সেইটেই বিদ্যুৎ ধরে চলে। এই জন্যে উঁচু মন্দিরে কিম্বা উঁচু গাছেই প্রায় বাজ পড়ে। বাড়ির মধ্যে সব থেকে উঁচু জায়গার ওপর বজ্রবারক লাগানো থাকে সুতরাং মেঘের বিদ্যুৎ সহজেই ঐ পরিচালক ধাতুর ছুঁচোল মুখের দিকে ছুটে আসে আর একটু একটু করে তার শক্তি নষ্ট হয়। কাজেই ঐ রকম বাড়ির কাছে বাজ পড়ে না।

বাব্‌লা—বজ্রবারক বাড়িতে লাগাতে হোলে, কি কি জিনিষের দরকার ?

দাতু—একটা ছুঁচ্‌লো লোহার শিক্, তামার তার আর তামার পাত (৩ বর্গ ফুটের কম নয়), এই তিন্‌টে জিনিষ দরকার। বাড়ির ছাতে সকলের উঁচু জায়গায় লোহার শিক্‌টা লাগাতে হয়। তামার তার ঐ শিকের গোড়ায় জুড়ে দিয়ে বাড়ির জলের জল দিয়ে কিম্বা দেয়ালের কোন্ দিয়ে বাড়ির তলায় নিয়ে আসা হয়। তারপর ঐ তারের শেষভাগে তামার পাত জুড়ে তলাকার ভেজা মাটির মধ্যে (কূয়ার মধ্যে সাধারণতঃ পোঁতা দরকার) পোঁতা হয়। এই বজ্রবারকের (ছবি দেখ) ওপরকার দিক্‌টা যত বেশী বিভক্ত কোরে বাড়ির ছাদে লাগানো যায় ততই ভাল, কারণ তাহ'লে কালো মেঘের বিদ্যুৎ ঘনীভূত হোতে পারে না আর বাড়ীতে বাজ পড়বার আশঙ্কাও কম হোয়ে পড়ে।

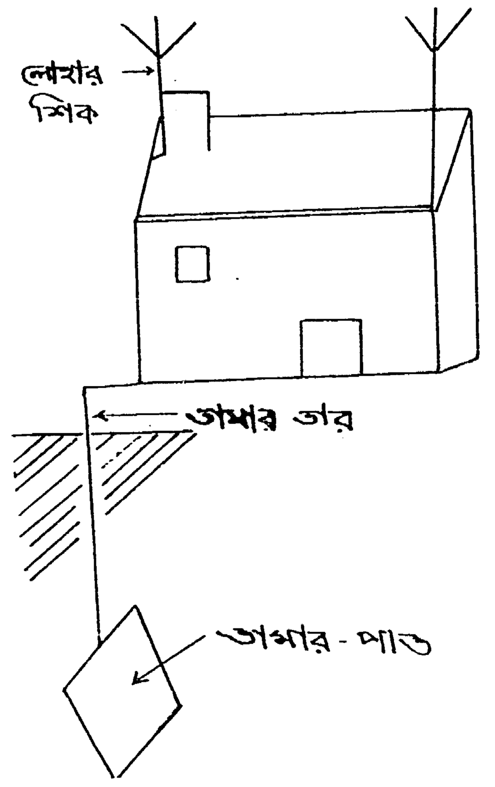

বজ্রবারক

বাব্‌লা—হ্যাঁ দাতু মেঘ ডাকে কেন ?

দাতু—ছুটো মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুতের চলাচল হয় তখনই ঐ বিদ্যুতের পথটা গরম হোয়ে জলে ওঠে আর বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ এধার ওধার ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করে তখনি আমরা বলি বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন বিদ্যুতের পথের বাতাস গরমে হাল্কা হয়ে ওপরে ওঠে যায়। এই সময় চারিদিককার ঠাণ্ডা বাতাস ঐ গরম বাতাসের স্থান অধিকার করবার জন্যে ছুটে আসে। এই ছুটোছুটিতে যে শব্দ হয় তাকেই আমরা বলি মেঘডাকা।

খুকু—দাতু কখন কখন আমরা কেবল একবার মেঘডাকা শুনি, আবার কখন কখন গুড় গুড় মেঘের আওয়াজ শুন্‌তে পাই। এরকম হয় কেন ?

দাতু—বিদ্যুৎ যখন সোজা পথে চলে তখনি আমরা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুন্‌তে পাই কিন্তু বিদ্যুৎ যখন এঁকে বেঁকে চম্‌কে ওঠে তখন গুড়গুড় শব্দ শুন্‌তে পাই। বিদ্যুৎ যখন চম্‌কায় তখন বাতাসের

আলোড়নে যে শব্দ হয়, সেটা মেঘে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। এই জন্যে তখন গুড়গুড় শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুন্‌তে পাওয়া যায়।

টুকু—দাতু মেঘ ডাক্‌লে আমার বড্ড ভয় করে, তার ওপর বাজ পড়লে তো কথাই নেই। আচ্ছা দাতু, ঝড়ের সময় যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চম্‌কাতে থাকে আর মেঘ ডাকতে থাকে তখন আমাদের কি করা উচিত ?

দাতু—ঝড়ের সময় বুঝে কাজ করতে হবে। রাতে বিছানায় ঘুমোচ্ছ এমন সময় যদি খুব মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চম্‌কাতে থাকে তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠো না। বিছানাতেই শুয়ে থাক্‌বে। দিনের বেলা ঐ রকম ঝড় আরম্ভ হলে, ঘরের জানালা বন্ধ করে দেবে কিন্তু দরোজা বন্ধ কোরো না অথবা উনন ও দরজার মধ্যে বসে থেকো না। এ-গুলো হলো ঘরের কথা কিন্তু বেড়াতে বার হয়েছো এমন সময় আকাশ কালো করে যদি ঝড় আসে আর মাঠের মাঝখানে তুমি আছো তাহলে মাটিতে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ঐ রকম সময় কখনও ছাতা ব্যবহার করবে না—উঁচু গাছ তলায় বা তার নিকটে দাঁড়াবে না—তারের বেড়ার কাছেও দাঁড়ান বিপজ্জনক।

টুকু—দাতু, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্ আর একদিন বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বোলো—বড্ড খিদে পাচ্ছে আর রাতও হয়ে এসেছে দেখ।

দাতু—নিশ্চয়, এবার তোদের ছুটি।

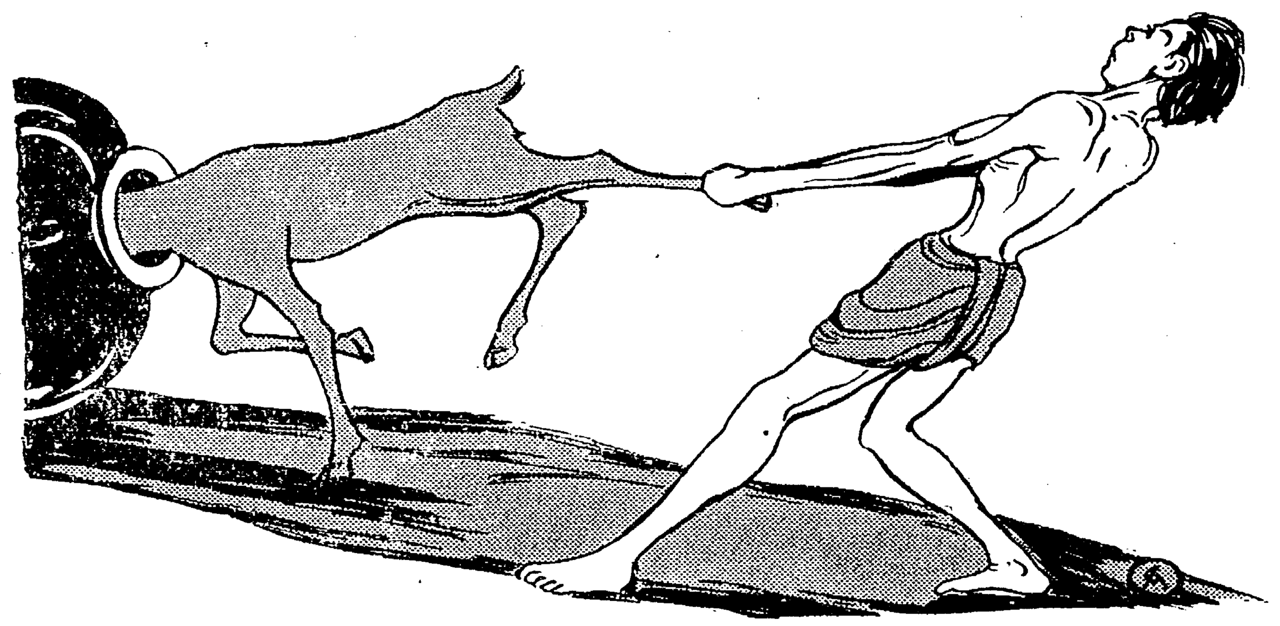

এনাটোলিয়াতে শিকারীরা এক মেয়ে টার্জ্জনএর দেখা পেয়েছে। গভীর জঙ্গলে একা একা সে হিংস্র বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে নির্ব্বিবাদে নাকি বাস করে। তার গায়ের রং ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুরে কালো হয়ে গিয়েছে। কোন কথা কোনো ভাষা সে বলতে পারে না। শোনা যায়, অনেকদিন আগে ছুটি মেয়ে তাদের গ্রাম থেকে হারিয়ে যায়। শিকারীরা বলে, তাদের একজন আজকের এই টার্জ্জন। একটি মা-ভাল্লুক নাকি এই মানুষের মেয়েটিকে লালন পালন করেছে।

*   *   *   *

প্রস্তরযুগের ম্যামথ-হাতি পৃথিবী থেকে সহস্র বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সাই-বেরিয়ার বরফের তলা থেকেই প্রথম ম্যামথ-হাতির দেহ পাওয়া যায়। বরফের তলায় চাপা পড়ার দরুণ পুরো দেহটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সাইবেরিয়ার কোন কোন লোকের ধারণা, এই ম্যামথ-হাতি আজও বেঁচে আছে! মাটির নীচে এই ম্যামথ যখন চলাফেরা করে তখন ভূমিকম্প হয়। তারা নাকি মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটে। সাইবেরিয়ার লোকেরা বলে, ম্যামথরা কখনও ওপরে আসে না, কারণ সূর্য্যের মুখ দেখলেই তাদের নাকি মৃত্যু অনিবার্য্য।

*   *   *   *

একরকম অদ্ভূত মাকড়সা আছে যারা ঠিক পিঁপড়ের মত থাকে, খায়, চলাফেরা করে। পিঁপড়ের সব কিছু তারা আশ্চর্য্যভাবে অনুকরণ করে। তারা দেখতেও অনেকটা পিঁপড়ের মত! এ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর—কর্ম্মনারায়ণ বাহল।

*   *   *   *

ইউরোপের পঁচাত্তর জনের বেশী গণক জ্যোতিষী, ঋষি, ফকির প্রভৃতি একবার ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। যেদিন ১০০০ খৃষ্টাব্দ পড়ল, সেদিন ইউরোপের লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল আর নানা জায়গায় উৎসব হয়েছিল।

*   *   *   *

চীনদেশেই নাকি সবপ্রথম ফুটবল খেলার প্রচলন হয়। কিন্তু সে ফুটবল আর খেলার নিয়ম একেবারেই অন্য রকম ছিল। চামড়ার মধ্যে খড়কুটো ভর্ত্তি ক'রে তাকে গোলগাল ক'রে ফুটবল তৈরী হত। প্রায় ৫০ গজ ব্যবধানে ছুটি গোলপোষ্ট মাঠের শেষে লাগান হত—আর মধ্যিখানে দড়ি বা লম্বা কাপড় বাঁধা থাকত। গোল দিতে গেলে তার ওপর দিয়ে বল চালান করতে হত। খেলার শেষে জয়ী দলকে নানা রকম সুখাদ্য খাওয়ান হত আর বিজয়ী দলের কাপ্তেনের মাথায় ঘন ঘন চাঁটি পড়ত।

*   *   *   *

এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সহস্র বছর পরে যে মানুষজাতির আবির্ভাব হবে তাদের মাথার ঠিক ওপরে এক রকম ছুর্ব্বিণ-চোখ থাকবে, যাতে করে সে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সব পর্য্যবেক্ষণ করতে পারবে। তাদের মাথার পেছন দিকেও একজোড়া চোখ থাকবে, সামনে চলবার সময় তাদের পেছনে কি ঘটছে, তারা "স্বচক্ষে" দেখতে পাবে।

একপাতার গল্প

ভাড়াটে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পায়রা-বৌএর সঙ্গে চড়ুই গিন্নির সেদিন ভারী ঝগড়া হয়ে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, চড়ুই গিন্নির তেমন দোষ নেই। অনেক দিন ধরে সয়ে সয়ে না সে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে! আর মিছেও ত কিছু বলেনি। গেরস্থালী করে যেখানে বাস করতে হবে সেখানে অমন নোংরা করলে চলে! বেদে বাউণ্ডুলেরাও যে এর চেয়ে পরিস্কার। তাছাড়া সরাইখানা ত নয় যে আজ আছি কাল নেই! যা কে বলে চোদ্দপুরুষের আস্তানা।

তা চোদ্দপুরুষ সত্যিই হল বই কি চড়ুইদের। পায়রা-বৌ ত সে দিনের. সে আর জানবে কোথা থেকে যে এই পোড়ো দালান একদিন গমগম করত মানুষ জনে, ঝলমল করত আলোয়।

চড়ুইদেরও সে সুখের দিন আর নেই। তখন কি বনে বাদাড়ে ফড়িংটা কেঁচোটা খুঁজে বেড়াতে হত! অত বড় সংসারের এঁটো কাঁটা খেয়ে কত কাক কুকুরেরই ত জন্ম কেটে গেছে, চড়ুইদের ত কথাই নেই, থালা থালা বড়ি, ছালা ছালা চাল ডাল খেয়ে ফুরোনই যায় না।

চড়ুইগিন্নী তাই বড় দুঃখে ভাবছে—আহা তারা যদি আবার আসে! আবার যদি ভাঙা ভিটেয় সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

চড়ুইগিন্নির মুখের কথা অমন করে ফলবে কে জানত।

তারা সত্যিই এল তার পরদিন থেকে। শাবল কোদাল নিয়ে গোড়ায় এল মজুর। পোড়ো দালান ভেঙে চুরে তারা মাটিতে মিশিয়ে দিলে। তারপর এল রাজমিস্ত্রি আর হ্যাট কোট পরা ইঞ্জিনিয়ার, এল লোহালক্কর সিমেণ্ট সুরকী চুন। নতুন করে বাড়ি তৈরী হ'ল।

কিন্তু কই, সে বাড়ীতে চড়ুইএর বাসার ফোকর কোথায়! শুধু পাথরের মত শক্ত পাকা দেওয়াল, আর ছাদ।

সেখানে বারান্দায় সারি সারি খাঁচায় ঝোলে রং বেরংএর বিদেশী পাখী আর বিনি শেকড় বাহারী গাছ। পায়রারা সেখানে পাত্তা পায় না বটে কিন্তু চড়ুইএরও সেখানে জায়গা নেই।

প্রতিহিংসা

শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়

বেনিফেসিয়োর এক প্রান্তে ছোট্ট কুটিরে পায়োলো শ্যাভেবিনির বিধবা পত্নী তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করতো। সমস্ত সহরটা সমুদ্রের জলে ঝুঁকে-পড়া একটা অংশের ওপর অবস্থিত —যেখান থেকে অদূরবর্ত্তী সারডিনিয়ার পর্ব্বতসঙ্কুল তটভূমি দেখা যেত। যে দিকে চোখ যায় কেবল জলের ওপরে ভেসে থাকা কালো কালো পাহাড়ের চূড়া, আর তাদের গায়ের-লাগা সাদা সাদা ফেনা-গুলো যখন হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে যেতো, মনে হোতো এক টুকরা সাদা কাপড় যেন হাওয়ায় উড়ছে।

বিধবার বাড়ীটা সমুদ্রের ঠিক ধারেই। জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালেই চোখে পড়তো ঢেউয়ের তাণ্ডব আর কানে আসত জলের গর্জ্জন। সেখানে তার ছেলে অ্যান্তয়েন্ ছাড়া আর একজন অধিবাসী ছিল। সে হচ্ছে তার প্রিয় কুকুর শেমিল্যান্তে, শিপ-ডগ্ জাতীয় এক বিরাট বলশালী জন্তু।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নিকোলাস্ র‍্যাভোলাতি বলে একজন লোক অকারণে অন্যায়ভাবে অ্যান্তয়েন্‌কে ছোরা মারল। তারপর সে সেই রাত্রেই পালিয়ে গেল সারডিনিয়ায়।

পাড়ার লোকেরা অ্যান্তয়েনের মৃতদেহ তুলে এনে তার মার কাছে পৌছে দিয়ে গেল। বৃদ্ধা পুত্রের মৃতদেহ দেখে একবারও কেঁদে উঠলো না, শুধু চুপ করে ছেলের রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ছেলের মৃতদেহ স্পর্শ করে বৃদ্ধা প্রতিজ্ঞা করলে তার পুত্রহন্তার ওপর প্রতিশোধ নেবার। সে সবাইকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলে নিজের প্রিয় কুকুরটিকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। কুকুরটা সবই বুঝতে পেরেছিল। সে তার প্রভুর দিকে একবার চেয়ে কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। অসহায় বৃদ্ধা চুপ করে চেয়ে রইলো ছেলের দিকে—এতক্ষণে তার চোখ দিয়ে অবিরলধারে জল পড়তে লাগলো।

তারপরে বৃদ্ধা ছেলেকে বলছিলো—ভয় নেই, আমি প্রতিশোধ নেবো, নিশ্চয়ই এর শোধ নেবো। তুমি ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আমি তোমার রক্তপাতের প্রতিশোধ নেবো রক্ত দিয়ে। তোমাকে আমার কথা দিচ্ছি, আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না।

আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে সে তার ছেলের হিমশীতল ঠোঁটে চুমু খেলে।

কুকুরটা আবার কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

পরদিন সকালে অ্যান্তয়েনের অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে লোক তার নামও ভুলে গেল। অ্যান্তয়েনের নিজের কোন ভাই কোনো আত্মীয় ছিল না। তার বৃদ্ধা মা কেবল রইল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য।

সকাল সন্ধ্যা সে সমুদ্রের ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে থাকতো। ঐ ত ওপারে লঙ্গোসারদো—ছোট্ট গ্রাম। বৃদ্ধা খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলো নিকোলাস র‍্যাভোলাতি ঐখানেই আছে।

সমস্তদিন সে সমুদ্রপারের সেই গ্রামটার দিকে চেয়ে থাকতো। মনে তার শান্তি ছিল না। শেমিল্যান্তেও যেন সব বুঝতো, কিন্তু পশু সে, তার করবারই বা কি আছে?

একদিন রাত্রে হঠাৎ বৃদ্ধার মাথায় একটা মতলব এলো—পৈশাচিক আনন্দে তার মনটা ভরে উঠলো। বাকী রাতটা সে বসে বসে ভালো করে ভাবতে লাগলো। সকালে সে প্রথমেই গির্জ্জায় গেলো। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে তার কাতর আবেদন জানালে—'আমার হৃদয়ে, আমার মনে বল দাও, হে গরীবের ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর, হে দয়াময়, আমাকে আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সাহায্য কর।'

তারপর সে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ী এসে কুকুরটাকে ঘরের ঠিক সামনেই একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে, জানলা দিয়ে সার্‌ডিনিয়ার তটভূমির দিকে চেয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

কুকুরটা সমস্তদিন সমস্তরাত্রি চীৎকার করলে। পরদিন সকালে বৃদ্ধা তাকে শুধু জল খেতে দিলে। আরেকদিন গেলো, কুকুরটা কোন খাদ্য পেলে না, শুধু পেলে জল। চীৎকার করে করে আর ক্ষিদের জ্বালায় ক্লান্ত হ'য়ে চুপ করে সে শুয়ে পড়লো। তারপর দিন কুকুরটা আবার মরিয়া হয়ে চেঁচাতে লাগলো—কিন্তু সেদিনও সে জল ছাড়া আর কিছুই খেতে পেলে না। ক্ষিদের জ্বালায় কুকুরটা প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো। আরেকটা রাত্রি সেই রকম ভাবেই কেটে গেলো।

তারপরদিন সকালবেলায় বৃদ্ধা তার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে দুআঁটি খড় চেয়ে নিয়ে এলো। তারপর তার স্বামীর কতকগুলো পুরোণো জামাকাপড় নিয়ে তার মধ্যে খড় পুরে একটা মানুষের মত মূর্ত্তি তৈরী করলে। তারপর কুকুরটা যেখানে বাঁধা ছিল তার ঠিক সামনেই সেটাকে একটা বাঁশে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে।

কুকুরটা আশ্চর্য্য হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

তারপর বৃদ্ধা খানিকটা মাংস কিনে এনে পুডিং তৈরী করলে—মাংসর গন্ধ পেয়ে কুকুরটা উঠল পাগল হয়ে, বৃদ্ধা পুডিংটা সেই খড়ের মানুষটার গলার মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে বেঁধে দিলে। তারপর সে কুকুরটার গলা থেকে খুলে দিলে শেকল।

কুকুরটা একলাফে গিয়ে খড়ের মানুষটার টুঁটি কামড়ে ধরলে—তার গলার কাছের খানিকটা জায়গা কামড়ে নিয়ে সে নেবে পড়লো। তারপর আবার লাফিয়ে গিয়ে গলা কামড়ে ধরলে। আবার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে নেবে পড়লো। আবার দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করলে। এই রকমভাবে সেই খড়ের মানুষটার গলাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বৃদ্ধা পাশ থেকে নিঃশব্দে দেখছিল—তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগলো।

বৃদ্ধা তাকে আবার চেন দিয়ে বেঁধে রেখে দিলে। আবার চললো না-খেতে দেওয়ার পালা। তারপর আবার সেই খড়ের মানুষের ওপর আক্রমণ। এই রকম ভাবে তিনমাস ধরে শিক্ষা চললো।

তারপর আর তাকে চেন বেঁধে রাখতে হোত না—একটু ইসারা করলেই সে গিয়ে খড়ের মানুষটাকে আক্রমণ করতো। এমন কি যখন মানুষটার গলায় খাবার বাঁধা থাকত না, তখনও ইসারা করলেই লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরতো—তারপর তাকে পুরস্কাররূপে পুডিং খেতে দেওয়া হোত।

একদিন রবিবারের সকালে বৃদ্ধা এক ভিখারীর পোষাক পরে একটা নৌকো ভাড়া করে ওপারে সেই গ্রামে যাত্রা করলে। খানিকটা পুডিং সে তার সঙ্গে নিয়ে নিলে।

কুকুরটাকে সঙ্গে করে সে লঙ্গোসারদো গ্রামে প্রবেশ করলে। তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করে নিকোলাসের বাড়ীর দিকে চললো।

নিকোলাসের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে, সে একবার চারদিকে চেয়ে সেই বাড়ীর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—

নিকোলাস! নিকোলাস!!

নিকোলাস ঘরেই ছিলো, ডাক শুনে সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই বৃদ্ধা কুকুরকে ইসারা করলে। কুকুরটাও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—লাফিয়ে উঠে সে তার গলাটা কামড়ে ধরলে।

খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ও পশুর যুদ্ধে, পশুরই জয় হোলো। নিকোলাসের বিরাট দেহ ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

গলাটা কামড়ে ধরলে

সেইদিন লঙ্গোসারদো গ্রামের অধিবাসীরা দেখতে পেলে, যে তাদের গ্রামের মাঝখান দিয়ে একজন অপরিচিতা বৃদ্ধার সঙ্গে একটা বিরাট কুকুর মহানন্দে কি যেন খেতে খেতে চলেছে।

ভাটিয়ালী

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

ধান আমারে ভুলায় মাগো ধান আমারে ভুলায়
আঘন মাসের হাউয়াতে মোর মনডা যে তাই ঘুলায়।
ক্ষ্যাত ভরা মোর ধানের শীষে শীষে
সোনার বরণ ধইরাছে মা তোমারি আশিসে।
দূরে যে তাই চইলা য্যাতে য্যাতে
তাকাই যত সোনার ধানের ক্ষ্যাতে
ওই ক্ষ্যাত ভরা ধান ছুইলা আমার পরাণডাকেও ছুলায়।

যতই হাউয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুলচে সোনার ধান
ততোই আনন্দেতে মাগো কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ।
ওই সোনার বুকে প্রাণ মাতানো-ঢেউ খেলানোর গুণে
কী আমোদে মেতে আমি নেচেছি যৌবুনে,
ওই তোমার ছোঁয়া ধানই আমার ধ্যান,
ওই তোমার ছোঁয়া ধানই আমার জ্ঞান,
ওই ধানের কাছে কি আছে মা আলু বাইগুন মূলায়!

ভায়ের যে ঘর ছাইতে হবে ভুইলা যাই তা পাছে,
বউ আমারে বইলা দিয়া মনে কইরা ছ্যাছে।
ভায়ের চালা ভাইঙা গেল—গেল সনের ঝড়ে
সে ঘর আমি ছাইয়া দিব এবার নূতন খড়ে
গাঁইথ্যা দিব গোয়াল ঘরের ছ্যাল্
গরুর ঘরে ঘুস্‌বে না আর শ্যাল্
নূতন কাপড় কিইনা দিব বউ ও ছাওয়াল গুলায়!

আর একটুখানিক ছ্যাখ মা আমি যাবো এবার ঘর,
তোর পাহারায় রইল আমার জ্যান্ত সোনার চর।
এই কডা দিন দেখিস্ মাগো, দেখবি তাহার পরে,
কী আনন্দ ভইরা দিলি আমার মাটির ঘরে।
বউছাওয়ালরা দেখবা যতই ত্বরা
উঠান বোঝাই মায়ের আশিস ঝরা
অঙ্গ আমার ধন্য হবে তোমার ধানের ধূলায়!
ধান ভুলায়, ধান ভুলায়, ধান ভুলায়, মাগো—
ধান আমারে ভুলায়।

যবদ্বীপের নর-বানর

শ্রীপ্রত্নতাত্ত্বিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, এক নর-বানরের কঙ্কাল ও অস্থি পাওয়া গিয়েছে—এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারে সারা পৃথিবী হুলস্থূল ! ব্যাপার কি জানবার জন্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক ব্যস্ত।

যবদ্বীপে গাউই সহরের কাছে ট্রিনিল নামে একটি গ্রাম আছে। এই ট্রিনিল গ্রামে লায়ু-কোকোসান্ আগ্নেয়গিরির পাদদেশে সোলো নদী প্রবাহিত—এই সোলো নদীর তীরেই এক নর-বানরের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৮৯১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একদিন

যবদ্বীপের সোলো নদীর তীরে নর-বানরের আস্তানা

(সাদা ক্রশ দেওয়া জায়গাটায় ঐ নরবানরের অস্থি পাওয়া যায়)

এক মিলিটারী ডাক্তার ইউজেন্ ডুবয় এই নর-বানরের আবিষ্কার করেন। প্রথম তিনি একটি দাঁত পেলেন, তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে একমাস পরে পাওয়া গেল তার মাথার খুলি। তখন পুরো দেহটা পাবার জন্য আবার খোঁজাখুঁজি চলল কিন্তু একবছর বাদে পাওয়া গেল কেবল বাঁ পাএর একটি হাড়। ডাঃ ডুবয় প্রথম যখন দাঁত ও মাথার খুলি পান তখন কিন্তু তাঁর মনে হয় নি যে এটা নর-বানর জাতীয় কোন জীব, তিনি ভেবেছিলেন যে এটা

একটা বড় বানর জাতীয় জীবই হবে, কিন্তু তার পায়ের হাড়ের গড়ন ও আকৃতি দেখে তিনি ভয়ানক আশ্চর্য্য হলেন। এ ত কোন বানরের পা নয়—এ ত মানুষের পা !—এই তাঁর মনে হল। তাহলে কি এই প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, সোজা হয়ে চলতেও পারত ? অথচ এর দাঁতগুলি ও মাথার খুলি ত বানরের মত ! তাহলে এ কে ? নানা পরীক্ষা ও গবেষণা করে ডুবয় স্থির করলেন, এ একজাতীয় নর-বানরই আর এই নর-বানর মানুষের আদিম পূর্ব্বপুরুষের একজন ! সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে যখন ডুবয় ১৮৯৪ সালে তাঁর বই লিখলেন, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেল ! ডুবয় লিখলেন, যে এই নর-বানর—মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি অর্থাৎ বানরের পর ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে এই মানুষ-বানরের আবির্ভাব। তারপর এই নর-বানরের বর্ণনা করলেন। এর মাথার খুলি একটু লম্বাগোছের ও একটু চ্যাপ্টা এবং দেখতে গিবন বা শিম্পাঞ্জীর মত, ও এর কপাল ঢালু। কিন্তু এর মস্তিষ্কের চেহারা বানরের চেয়ে উঁচু দরের—খানিকটে মানুষের মতই। বলতে পারা যায় তার মস্তিষ্ক মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি। এর দাঁতের আকৃতি কিন্তু পুরোপুরি বানরের মত। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য ! এর বাঁ পা দেখলে মনে হয়—এই অদ্ভুত প্রাণীটি শুধু সোজা হয়ে দাঁড়াতে ত পারতই, এমন কি, সোজা হয়ে চলতেও পারত। ডুবয় আরো বললেন যে এই নর-বানর অস্পষ্ট একরকম কথা বলতেও পারত !

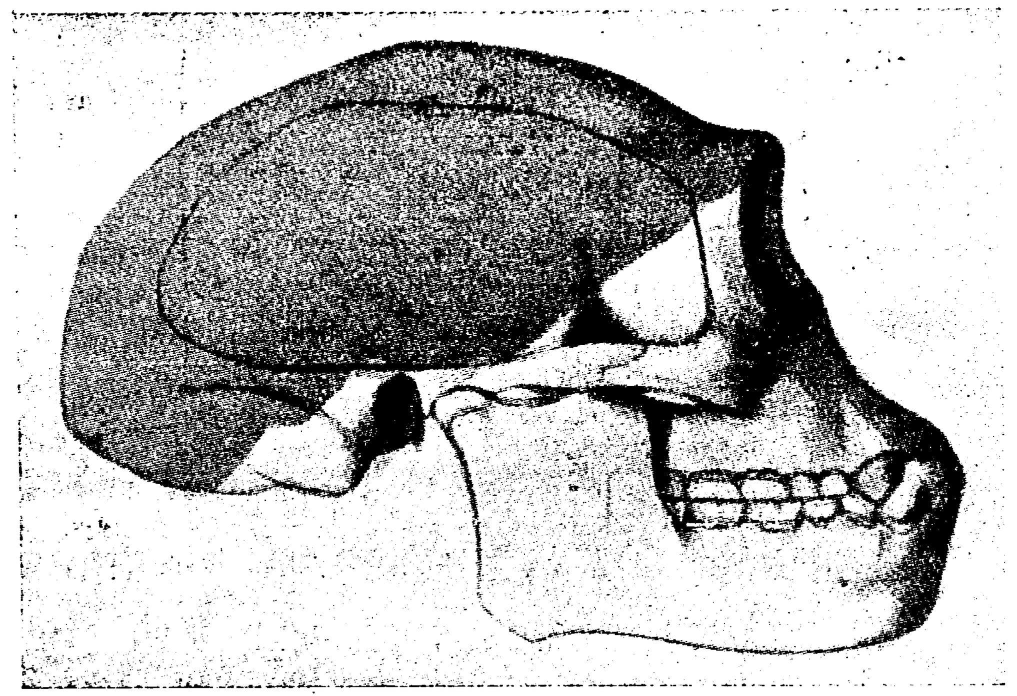

পিথিক্যানথ্রোপাসের মাথা

এই নর-বানরের নামকরণ হল—পিথিক্যানথ্রোপাস্ (pithecanthropus—pithecos অর্থাৎ বানর ; anthropos অর্থাৎ মানুষ) বা নর-বানর। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে ডুবয় এই নর-বানরের এক সম্পুর্ণ রং করা জীবন্ত মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন। পৃথিবীর চারিদিক থেকে লোক এসে ভীড় করে এই নর-বানরের মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হল। ভাবল—এই অদ্ভুত জীবটি তাদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি ?

তারপর নানা তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগল বৈজ্ঞানিক মহলে। কেউ বললেন, না, শুধু পায়ের চেহারা দেখে মোটেই একে মানুষ-গোষ্ঠীতে ফেলা চলবে না। কেউ বললেন, কেন

চলবে না ? আর একদল বললেন, একে মানুষের ঠিক পূর্ব্বপুরুষের লাইনে না এনে—পাশের এক লাইনে জায়গা দাও। ডুবয় বললেন, এই জীবটিকে আমাদের আপন ঠাকুরদা নাই বললাম, কিন্তু খুড়তুত ঠাকুরদা (grand uncle) বলতে আপত্তি কি ? প্যারিসের এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাথা নেড়ে বললেন, এই জীবটি অনেকটা—বড় একটা গিবনের মত—যে মানুষের মত চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকরা বললেন, যে মানুষ-গুঁড়ীর একটা পার্শ্ববর্ত্তী শাখাভুক্ত জীব একে বলা যেতে পারে।

এই পর্য্যন্ত—এই অবস্থা অনেকদিন থাকল। অর্থাৎ—পিথিক্যানথ্রোপাস্ না বানর না মানুষ হয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার রহস্য হয়ে যাদুঘরে রইল। তারপর আবার নানারকম আবিষ্কার হল। কয়েকটি পাএর হাড় পাওয়া গেল ঐ নর-বানরের। ১৯৩২ সালে সে সমস্ত পরীক্ষা করে ডুবয় তাঁর আগের মত বদলালেন। তিনি বললেন—যে আগের মত এদের পায়ে বিশেষত্ব একটা আছে বটে কিন্তু এরা যে গাছেও চড়তে পারত তার প্রমাণ তিনি পায়ের আকৃতিতে দেখতে পেছেন এবং সে আকৃতি অনেকটা কোন বড় জাতীয় গিবনের মত। অর্থাৎ পূর্ব্বে, প্যারিসের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকটি যে মত দিয়েছিলেন, তিনি সেই মতের আরো সমর্থন করলেন ! তারপর আবার গবেষণা তর্ক সুরু হল। জনসাধারণ যারা কিছু বোঝে না তারা একটু দমে গেল।

তাহলে বড় গিবন জাতীয় কোন জীবই কি আমাদের মানুষের নিকট আত্মীয় ?

এর উত্তর আর ভাল করে আমরা পেলাম না। নর-বানরটা একটু রহস্যময় হয়ে রইল। তারপরে শুধু যবদ্বীপ নয়, সম্প্রতি চীনদেশে এমন কি আফ্রিকাতেও এই নর-বানর পিথিক্যানথ্রোপাসের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া গেল। তাহলে কি যবদ্বীপ, চীন ও আফ্রিকাতে কোন সংযোগ-সূত্র ছিল ? হয়ত বা ছিল। কিন্তু নর-বানরের রহস্যের আর কী সমাধান হল ? সেটা আমাদের শোনা চাই।

পরিশেষে বিজ্ঞান-পণ্ডিতরা একটা উত্তর দিলেন। তাঁরা সভা করে এই কথা বললেন যে নর-বানর পিথিক্যানথ্রোপাস বড় গিবন জাতীয় জীবের মত দেখতে হলেও, তার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে—আর এই পরিবর্ত্তনগুলি মানবীয় গড়নের দিকে বিবর্ত্তিত হয়েছে। এই নর-বানরের পাএর গড়ন ও আকৃতি এই পরিবর্ত্তনের একটা উদাহরণ।

নর-বানর জাতীয় এই জীবটির সমস্ত রহস্য কিন্তু এতে করে উদ্‌ঘাটন হল না।

ভগবানের এই অদ্ভুত সৃষ্টি নিয়ে পণ্ডিতেরা আজও তর্ক করেন : এ মানুষ না বানর ?

খুকু ঘুমোয় ঘুমোয় না

পুর্ণেন্দু নারায়ণ সেন

খুকুমণি করছ তুমি কি ?—
পড়ছ নাকি কিসের পড়া
ভুলোর কাছে কোন্ সে ছড়া
রাত্তিরেতে দুইজনাতে
জ্বালিয়ে বাতিটি ?
রাত্তির হোল গভীরতর, চাঁদ যে ডুবে যায়
খুকুশোন : টুপ সরসর ঝুপ্ !
কুড়ের কোনায় জোনাই ওড়ে,
নেড়া বটের কোন্ কোটরে
দুচোখ দেখা যায় ;
আসছে তারা যাচ্ছে তারা
ধোঁয়ায় মিশে আসছে কারা
খুকু তুমি মুখটি বুজে একেবারে চুপ্ ;
দেখতে থাকো ঐ কিনারায়
কাদের ইসারায়
মেঘের কোলে চাঁদের যে ঘুম পায়
তার দু'চোখ জুড়ে যায়।

মিথ্যে কথা চাঁদ কি ঘুমোয়
জানলা দিয়ে তোমায় চুমোয়
আদর করে কে ?
আদর করেও নীল পরীরা
টুকরো নাচের এলোমেলো
আলপনা এঁকে।

অচিন পরী নীল পরীদের ওড়না মাথায় রাণী
তোমায় দেখে করবে কানাকানি ;
ওপার থেকেও আসছে তারা
আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে
সপ্ততারার ফাঁকে ফাঁকে
আলোর দোলনায়,
খুকুমণি অবাক হয়ে অবাক চোখে চায়।

খুকুমণি কে ঘুমুবে তোমায় রেখে একা ;—
যারা ঘুমোয় ঘুমুক তারা
তোমায় ফেলে ঘুমোয় কারা
যারা ঘুমোয় দাও ঘুমোতে
তুমি তো নও একা !
তোমায় ঘিরে ছড়িয়ে আছে
ভাসান্ পরীরা,
পেরৃজাপতির রঙীন পাখে
যে সব পরী লুকিয়ে থাকে
লুকিয়ে থেকে চাইছে কাকে
—চোখ যেন হীরা,
ঘুম ফেলে সব আগলে আছে
সেই সে পরীরা।

ওমা খুকু পড়ছ নাকো
—সামনে খোলা বই !
তাই কি পিদীম হাসছে খালি
দেখে তোমার এই গাফিলি ;
খোলা বই এর সামনে খোলা
এক জোড়া চোখ কই ?

চোখের ওপর চশমা বাবার,
কায়দা করে কলম আবার
ঠোঁটের মাঝখানেই ;
সবই আছে তুমিও আছ
মনটা শুধুই নেই।

মনটা তোমার কোথায় খুকু
কোথায় ফেরে মন ?
সাতদরিয়ার পারে যেথায় কলমীলতার বন
তেরো নদীর পারে ছোটে
মন কি অনুক্ষণ !
সেই সে বনের সবুজ পারে মানস সরোবর
রাজ হংসের জড়িয়ে গলা
ভাসছে রাজার মেয়ে
পারের দিকে তোমার পানে চেয়ে।
সেথায় যেতে করেছে কি পণ—
তোমার উধাও মন ?

শেলেট ও বই তাইতো খুকুর যাচ্ছে গড়াগড়ি,
গড়িয়ে কোথায় গেছে হাতের খড়ি।
বই যেখানে যায় না নিয়ে,
খড়ির রেখাও শেষ
দিগন্ত যার পায় না নাগাল
সেই সে চাঁদের দেশ !—
সেই দেশেতে ফিকে আলোয় এগোয় তাড়াতাড়ি,
ঝড়ের আগে চলল খুকু
স্বপ্ন দোলায় পাড়ি।

নাকি যেথায় দত্যি ভীষণ উদগরাসে খায়
গাঁয়ের মানুষ বনের কিনারায়।
সবার শেষে রাজকুমারীর পালা এল ক্রমে,
সেথায় এসে খুকুর মনের
রথ গিয়েছে থেমে।
ভাবছ তুমি সামনে বসে বজ্রমুঠি হাত,
এগিয়ে যাবে দত্যিটাকে
লড়বে তুমি মারবে তাকে
করবে কূপোকাত ?
একমাত্র রাজার মেয়ের জীবন যে আজ যায়
ভাবছ কেন ?
দত্যি এসে ধরল বুঝি প্রায়!

* * * *

খুকুমণি ভোর যে হোল
সময় যে আর নাই
—আমরা এবার যাই।
আসছে আলো আকাশ জুড়ে,
আমরা এবার গেলাম দূরে
আর কি থাকা যায়!
বুনতে থাকো স্বপ্নেরই জাল;
আমরা আবার আসব যে কাল,
স্বপ্ন দিয়ে এসেছিলাম
স্বপ্ন দিয়েই যাই ;
—পার নাকি চিনতে মোদের ভাই!

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শাল

১৮৬৪ সালের আশ্বিনমাস ; বাংলাদেশে ঝড়ে চারিদিক তোলাপাড়া করছে। তারই মধ্যে আমাদের এই কলকাতা সহরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হল। তাই শিশুর মা শিশুটির নাম রাখলেন 'ঝোড়ো'। মায়ের কোলে শুয়ে শুয়েই শিশু আকাশের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। মা অবাক হয়ে ভাবতেন—এ দার্শনিক শিশুটি কে ? কি সে আকাশের দিকে চেয়ে একমনে ভাবে! ক্রমে শিশু বড় হয়, পৃথিবীও এই আকাশ-চাওয়া শিশুটিকে তখন তার মাটির দিকে টানে। বনের ধারে পুকুরের পাড়ে গাছপালা পশুপাখীদের মাঝে এই ঝোড়ো শিশু শান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকল। কৌতুহলী বিজ্ঞান মন তখন তার জাগল। তারপর—রামলীলায় রামায়ণের গল্পের মুখোসপরা অভিনয়, রাম রাবনের সে জাব্বাজোব্বা সাজপোষাকের ঘটা দেখতে দেখতে এই শিশু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমন কাটিয়ে দিত। তারপর একদিন চড়ক পূজোর মেলাতে এই শিশুটিকে দেখা গেল, শূলে বেঁধা সন্ন্যাসীদের সে কাণ্ড দেখতে দেখতে হঠাৎ এক টুকরো পাথর তার চোখে এসে লাগে। ফলে প্রায় অন্ধ হয়ে শিশুকে ৬ মাস মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হয়। তারপরই তার শিশুমন আবার অবাক হয়ে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে। বোধ হয় চোখে তার কোন প্রশ্ন ভাসে।

এই ভাবুক দার্শনিক শিশুটিকে তার উত্তর জীবনে পৃথিবী আচার্য্য শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলে চিনেছিল।

কিসে লোকে বড় হয় ? পৃথিবীর সুখ ও আরাম তুচ্ছ করে যিনি জ্ঞান সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন, মানুষের দৃষ্টির সামনের সব আগাছা তুলে দিয়ে যিনি নূতন আলোর বীজ বপন করেন, সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে সহজ ও সুস্থ জীবন প্রবাহের যিনি উন্মুক্ত উদার পথ দেখান—তিনিই তো বড়।

এমনি শৈশব থেকেই জ্ঞানের তপোবনে ঋষির মত সাধনা সুরু করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। শৈশবে আরব্ধ এই সাধনায় ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করে তিনি মহাজ্ঞানী হন।

ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য হল অগাধ। শিক্ষক ও ছাত্র ভীড় করে পাশাপাশি তাঁর কাছে দিক্ষা নিল। তাদের সম্মুখে দর্শনগুরু আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞান সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে যে সহজ ও সুস্থ জীবন প্রবাহিত তার উদার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। আর শুধু জ্ঞানাতুর ছাত্র শিক্ষকের কাছেই তাঁর মহৎ জীবন উৎসর্গ হয়নি, গরীব দুঃখীরাও তাঁর বিশাল মনে পরম আশ্রয় পেত। তিনি নিজেও সরল অনাড়ম্বর জীবনের ভক্ত ছিলেন। যৌবনে তাঁর সাথী ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বানী—সেবাধর্ম্মে তিনিও তাঁর মত মন্ত্রপূত ছিলেন।

তাঁর ছেলে বেলার গল্প তাঁর নিজের কথায় তোমাদের কিছু বলি ঃ—

> পশুপাখী গাছপালাই আমার কৌতুহলে সবপ্রথম সাড়া দিলে। প্রথম বইর ছবি দেখে তারপরই দমদমে আমাদের সাতপুকুর ও বাগান—সাতপুকুরের জঙ্গল, পশুপাখী আমার মন টানল।
>
> ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প আমার ভারী ভাল লাগত। রামলীলাতে রামায়ণ মহাভারতের দৃশ্যগুলি আমাকে মুগ্ধ করত। রামায়ণের গল্পের মুখোসপরা অভিনয়, জাব্বাজোব্বা সাজপোষাক, সে সব দৃশ্য দেখে আমার মন এত মুগ্ধ হত যে তখন থেকেই রামায়ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে আমার মন চেয়েছিল।
>
> তারপর—চড়কপূজোর সন্ন্যাসীদের সেই খেলা দেখে আমার কি ভয় হয়েছিল! সেখানেই যখন আমি সন্ন্যাসীদের শূলে ঘোরা দেখছিলাম হঠাং আমার চোখে এক পাথরের টুকরো এসে লাগে, ফলে আমি ছয়মাস প্রায় অন্ধ হয়েছিলাম আর কি! তারপরই আমার সমস্ত অনুপ্রেরণা আমার অন্তর্মুখী হল।
>
> যখন আমার বয়স বছর চারেক তগন আমি পাঠশালায় ভর্ত্তি হই। ভজু বলে আমাদের এক পুরণো চাকর আমাকে রোজ কাঁধে করে পাঠাশালায় নিয়ে যেত। গুরুমহাশয় যখন বন্ধ ঘরে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানতেন আর মুখ থেকে রাশিকৃত ধোঁয়া ছাড়তেন তা দেখে ভয়ে আমি পড়া ভুলে যেতাম। দিন দশবারো এই রকম চলল তখন গুরুমশায় বাবার সঙ্গে দেখা করে বললেন—এ-ছেলের কিছু হবে না—এ একেবারে গাধা।

হায়! গুরুমশাই তখন যদি জানতেন, উত্তর জীবনে এই ছেলে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবে! যদি জানতেন, এই ছেলে একুশ বছর বয়সে নাগপুর মরিস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হবে!

১৯০৫-৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ করেন ও বহু সভাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কয়েক বছর পরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি 'স্যর' উপাধি পান। তারপর ক্রমশঃ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতজন্ম বার্ষিকি সভায় তিনি সভাপতি হন। জনসাধারণের সম্মুখে সেই যে তাঁর শেষ আবির্ভাব কে জানত? তার পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পড়ে। প্রথম পক্ষাঘাত পরে হঠাৎ নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে, গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহৎ আত্মা পৃথিবীর মাটির মায়া ত্যাগ করে তাঁর শৈশবের প্রিয় অনন্ত আকাশে লীন হয়।

বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমাঝারের তপোবনে
সত্যদ্রষ্টা, যেথায় যুগযুগান্তরের ধ্যানের গগনে
গূঢ় যত উদ্ঘারিত জ্যোতির্ম্ময় সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে—
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ। যেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি। (রবীন্দ্রনাথ)

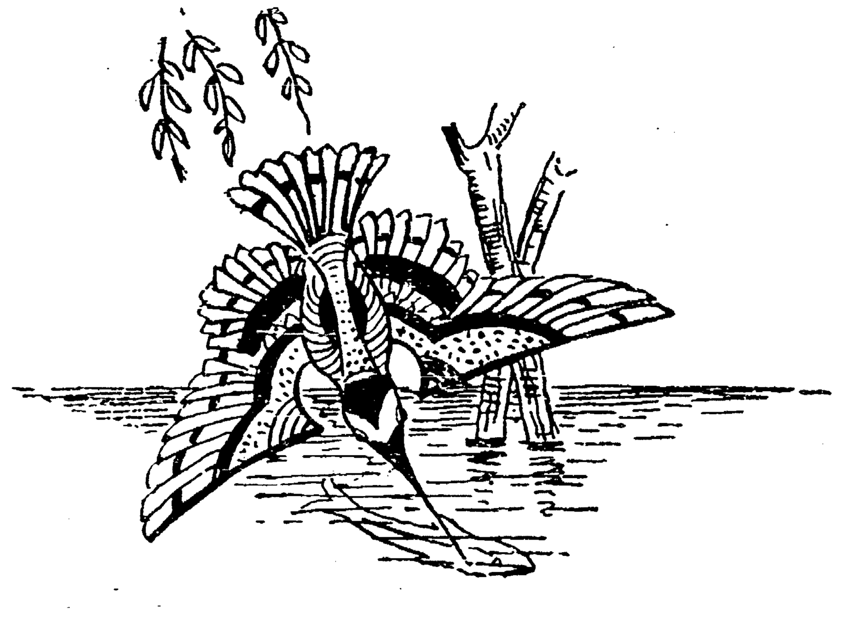

নিনান্টমুখ

রংমশালের পাঠকপাঠিকা ভাইবোন,

এবারকার কাগজ যখন তোমাদের হাতে গিয়ে পড়বে তখন তোমাদের সামনে বড় দিনের উৎসব। খৃষ্টধর্ম্মের এই পরবটির নাম কে যে আমাদের দেশে বড়দিন লিখেছিল তা ঠিক জানিনা। কোথায় 'খৃস্‌মাস্‌' আর কোথায় 'বড়দিন'! ওপর থেকে দেখতে গেলে নামটি দেওয়া ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান পরবের এর চেয়ে উপযুক্ত নাম বুঝি আর হতে পারে না।

বড়দিন সত্যিই বড় দিনের উৎসব। খৃষ্টধর্ম্ম যাঁর জীবনের সাধনা ও বাণী থেকে গড়ে উঠেছে, সেই মহাপুরুষ দু' হাজার বছর আগে মানুষের দিন আরো বড় করবার জন্যেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে অন্ধকার রাত্রি মানুষের মনের জগৎ ছেয়ে আছে,—যে অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত লোভ, হিংসা, নীচতা, স্বার্থপরতা ঘুরে বেড়ায়, যে অন্ধকারে মানুষ নিজের সত্যকার কল্যাণের, আনন্দের পথ চিনতে পারেনা, সেই অন্ধকার দূর করে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের জীবনে স্বর্গের আলো আনতে। অন্ধ অজ্ঞ মানুষ সে দিন তাঁর চেষ্টার মূল্য দেয়নি, ভুল বুঝে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে তারা শাস্তি দিয়েছিল।

তাঁর সে শাস্তি আজো শেষ হয়নি, এইটেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার সবচেয়ে দুঃখের কথা। মানুষের দিন এখনো ছোট হোয়েই আছে, কত মানুষের জীবনে দিন ত দূরের কথা প্রভাত পর্য্যন্ত এখনো হয়নি। এখনো রাত্রির অন্ধকার মানুষের মন ছেয়ে আছে, সে অন্ধকারে নিজেদের পথ চিনতে না পেরে আমরা টানাটানি মারামারি করে মরছি, পৃথিবীর ইতিহাস, লোভে নীচতায় স্বার্থপরতায় পঙ্কিল রক্তে কলঙ্কিত হয়ে উঠছে।

বড়দিনের উৎসব পৃথিবীর খৃষ্টান অনুষ্ঠান বহু দেশে এবার সুরু হবে। প্রতি বৎসরই হয়। সে উৎসবে মাতবার সময় কারুর কি মনে পড়বে যে যাঁর নামে এই উৎসব তিনি আজো হিংসার তীক্ষ্ণ শলাকায় মূঢ় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আছেন? মনে পড়বে কি, মানুষের দিন সত্যি করে বেড়ে না উঠলে তাঁর শাস্তির শেষ নেই?

তোমাদের সম্পাদক মশাই।

চলন্তিকা

এবারে চলন্তিকার পাতায় প্রথমেই আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দুটি শোক সংবাদ জানাচ্ছি। মৌলানা সৌকত আলি এবং আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল আর 'ইহ জগতে নেই। মৌলানা সৌকত আলি গত অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা সৌকত আলির গুণগান করে লোকের মুখে মুখে যে ছড়া চলেছিল তা আজও সকলের মনে আছে। মৌলানা সাহেবের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন নির্ভীক নেতাকে হারাল। আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল ছিলেন ভারতের দর্শন গুরু। অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি পৃথিবীর খ্যাতি পেয়েছিলেন। কত ছাত্র কত শিক্ষক তাঁর কাছে প্রেরণা পেয়েছে। ১৯২০—৩০ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মহীশূর রাজ্যের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। ৩রা ডিসেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজ তাঁকে হারিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ শোক করছে।

*　　*　　*　　*　　*

জীবন এবং মৃত্যু এরা মানুষের কাছে চিরদিনই রহস্য। প্রাণের আশা মানুষ সহজে ত্যাগ করে না। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কতই না চেষ্টা—মৃত্যুর দিন পেছিয়ে দেবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা। রাশিয়ায় এইরকম মানুষের আয়ু দীর্ঘ করবার বহুদিন ধরে নানা গবেষণা চলছে। সম্প্রতি সেখানকার ইউক্রেনিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ, এ বোগোমোলেট্‌জ্‌ বলেছেন, যে কোন লোকের পক্ষে ১২৫ থেকে ১৫০ বছর পর্য্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব।

*　　*　　*　　*　　*

এই সম্পর্কে রাশিয়ার আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমাদের বলছি। সোভিয়েট রাশিয়াতে ডাক্তারী বিদ্যা ও চিকিৎসা যাতে জনসাধারনের সকলের কাছেই পৌঁছতে পারে

তার চেষ্টা হচ্ছে। প্রত্যেক সোভিয়েট অধিবাসীর সোভিয়েট চিকিৎসার ওপর সমান দাবী থাকবে। সে দেশে গরীব ও বড়লোক নেই, সবাই সমান, সকলেরই সব বিষয়ে সমান অধিকার। সোভিয়েট চিকিৎসা কেবল ব্যক্তি বিশেষকে সুস্থ রাখবার মন দেয়নি, যাতে সমস্ত জাতি সুস্থ থাকতে পারে সে বিষয়ে পণ করেছে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট একটা "Medical City" তৈরী করছে। এ একটা আশ্চর্য্য সহর হবে। রাশিয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক পাভ্‌লভ্‌—তাঁর ছাত্র ফিওডোরোভ এই সহরের দেখা শোনার ভার নিয়েছেন। এই Medical Cityতে রাশিয়ার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা পর্য্যবেক্ষণ করা হবে—যেমন কাজকর্ম্মের পর লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাওয়া দাওয়ার পর তাদের শরীর পরীক্ষা, নিদ্রার পর শরীর পরীক্ষা ইত্যাদি। তারপর এই সহরে নানা গৃহ তৈরী করা হবে—এক একটি গৃহে এক একরকম জলহাওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। যেমন, কোন গৃহ করা হবে ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার মত খুব গরম, কোন গৃহ হবে উত্তর মেরুর মত তুষার শীতল; এমনকি কোন কোন গৃহে সমুদ্রের তলায় যেমন হাওয়া তাপ সেরকম বন্দোবস্ত হবে, আবার কোথাও আকাশের বায়ু বা অক্সিজেন স্তরের সীমা ছাড়িয়ে যে স্তর অর্থাৎ Stratosphere সেখানকার তাপমানে গৃহ তৈরী হবে—আর এই সব গৃহে লোকেদের স্বাস্থ্য কেমন করে সুস্থ রাখা যায় তার গবেষণা হবে। এই আশ্চর্য্য সহরে ৫৫০০ ডাক্তার, নার্স, ছাত্র থাকবে আর লোক বা রোগী থাকবে ৬০০। প্রত্যেক রোগীর জন্য আলাদা এক একটি ঘর থাকবে—ও প্রত্যেকের জন্য এক একটি গবেষণাগার থাকবে! এরকম আদর্শ ও এরকম যুগান্তকারী ব্যাপার পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি।

* * * * *

বায়োস্কোপ তোমরা প্রায়ই দেখে থাক। বায়স্কোপে নানারকম বিস্ময়কর জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ছবি জলের নীচে তোলা হয়েছে—শুনেছ কখনও? সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডা অন্তর্গত ওকালা নামে এক জায়গায় ১৮ ফুট জলের নীচে তোলা "সিলভার ফিস" (silver fish) বলে একটা অদ্ভুত ছবি তোলা হয়েছে। মানুষ জলের নীচে একবারে এক মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। তাহলে একটা সম্পূর্ণ ছবি তুলতে বায়স্কোপের লোকেদের কতবার ওঠা নামা করতে হয়েছে একবার ভেবে দেখ!

* * * * *

জার্ম্মাণীতে ইহুদি অত্যাচারের কথা তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে যে ব্যাপার হয়ে গেল তাতে সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। প্যারিসে

১৭ বছরের একটি ইহুদী ছেলে জার্ম্মান দূত হের ফন্‌রাথকে গুলি করে। তার ফলে হাঁসপাতালে ফন্‌রাথের মৃত্যু হয়। ইহুদি ছেলেটি নাকি তাদের জাতির প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই ফন্‌রাথকে গুলি করে। এই রকম হত্যাকাণ্ড যদিও একেবারে সহ্য করা যায় না তবু জার্ম্মাণীর ভয়ঙ্কর বিচারের কথা ভেবে আমরা লজ্জিত না হোয়ে পারি না। প্রথমতঃ ইহুদিদের ঘর, দোকানপাট লুটপাট করে জার্ম্মাণ জনতা তাদের হিংস্র ক্রোধ জানায়। তারপর রাষ্ট্র থেকে হুকুম আসে সমস্ত ইহুদি অধিবাসীদের কোটি মুদ্রা 'ফাইন' দিতে হবে। তাছাড়াও আরও অন্যায়ভাবে ইহুদিদের সমস্ত নাগরিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাদের ওপর অত্যাচারের অন্ত নেই। বহু ইহুদী পরিবার জার্ম্মাণী থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে পালিয়ে বেঁচেছে।

* * * * * *

আমাদের দুটি কিশোর গ্রাহক পাটনার নস্থু সেন ও খস্থু সেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা বড়দের জন্য— তাও যাঁরা পাকা বড় খেলোয়াড়। নস্থু ও খস্থু দুটি বাচ্চা ছেলের খেলা দেখে কিন্তু পাকা খেলোয়াড়রাও চমকে যাচ্ছেন। নস্থু খস্থু হেরে যাবে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা তাদের অপমান নয়। বরঞ্চ এই পাকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে তারা খেলছে এই যথেষ্ট বিস্ময়কর। শুধু খেলেছে না, এখনও তারা হেরে যায়নি। অনেক পাকা খেলোয়াড়দের তারা হারিয়ে দিচ্ছে। এই কয়েক দিন আগে খস্থু সেন আমাদের বড় লাটের এক ছেলেকে—তিনি পাকা খেলোয়াড়ই তাকে হারিয়ে দিয়েছে! ছোটদের মধ্যে আর একটি ছেলে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় খুব ভাল খেলেছে ও নাম করেছে— সে দিলীপ কুমার বসু। এদের খেলা কলিকাতা সাউথ ক্লাবে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অনেকে বলছেন বড় হলে এদের হারান ভারতবর্ষের এমন কি বাইরেরও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের পক্ষে সহজ হবে না।

* * * * * *

রংমশালের পাতায় তোমরা সকলেই শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্তের নাটিকা "ভাইটামিন" পড়েছ। অনেক জায়গা থেকে আমরা খবর পেয়েছি— এই সুন্দর ছোট নাটিকাটি ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করেছে। সম্প্রতি শ্রীবিমল বসুর প্রযোজনায় এই নাটিকাটি ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা রেডিয়োতে অভিনীত হবে। তোমরা এই তারিখটি নিশ্চয় মনে রাখবে ও শুনবে কেমন হয়েছে। এই সম্পর্কে আর একটি কথা শুনে তোমরা সুখী হবে, যে গত ভাদ্র মাসের রংমশালে শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের যে 'ছেলেদের গান' প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি শীঘ্রই গ্রামোফোনে রেকর্ড হবে

শেফালিকা

শ্রীশিবানী সরকার

ওগো শেফালিকা রাতের আঁধারে চুপে
এসেছিলে তুমি কি মনোমোহিনী রূপে,
প্রভাতেবেলায় কখন পড়েছ ঝরে'
কোমল তৃণের শ্যামল শয্যা' পরে।

ওগো শেফালিকা শুভ্র তোমার দেহে
পীত অংশুক পরেছ কত না স্নেহে,
সিক্ত করিছ শ্যামল ধরিত্রীরে
বিদায়ব্যথার শিশির অশ্রুনীরে।

ওগো শেফালিকা রজনী না হতে ভোর,
বিদায় চাহিছ চুরি করে মন মোর ?
শরতের মেঘ ফিরিছে তোমারে ডাকি
তোমারে চাহিয়া ছলছলে তার আঁখি।

ওগো শেফালিকা, শ্যামল দীঘির জলে
ফুটেছে কমল তারো আঁখি ছলছলে।
এমন করিয়া কাঁদাবে এ বনভূমি,
কি পাষাণে আজি বেঁধেছ হৃদয় তুমি ?

ওগো শেফালিকা তোমারে চাহিয়া আজ
শরতের মেঘ পরেছে শুভ্র সাজ
কাশবনে আজি তাই লেগে গেছে দোল
আকাশ বীণায় বাজিতেছে হিন্দোল।

ওগো শেফালিকা তোমার গন্ধ লুটি
দিকে দিকে আজি বাতাস চলেছে ছুটি
শস্যের ক্ষেত ভরে গেছে পাকা ধানে
পৃথিবী আজিকে মেতেছে হাসি ও গানে।

ওগো শেফালিকা কাঁদায়ে এ ধরণীরে
এমন করিয়া যেয়োনা, যেয়োনা ফিরে,
চেয়ে দেখো ঐ তোমারি লাগিয়া আজ
আকাশ পৃথিবী পরে উৎসব সাজ ॥

ঝরাফুল

শ্রীঅসীম কুমার সরকার

শেফালির পাদদেশে কত ঝরাফুল
চারিদিক্ আলো করি রয়েছে পড়িয়া ;
গন্ধে তার মুগ্ধ হয়ে আসে অলিকুল
অজানা প্রদেশ হতে উড়িয়া উড়িয়া !

এ ফুলে হয়নি পূজা কোনও দেবতার
কোনও নর ঘ্রাণে তার হয়নি বিহ্বল ;
দেয় নাই প্রিয়জনে কেহ উপহার
তবু জন্ম তাহাদের হয়েছে সফল !

সে কি শুধু মানবের বিলাসের তরে
বৃক্ষশাখে ফুলরাজি ফুটে থরে থরে ?

ছোটমেয়েদের ঝগড়া

শ্রীগৌরাঙ্গ রায়

দুটি টুকেটুকে সুন্দর ছোট মেয়ে—একটির নাম সুশী আর একটির নাম টুকু। দুজনেরই সোনালী চুল বব্ করে ছাঁটা, গাঢ় নীল চোখ। দুজনেরই বেশ ভাব। রাতে জল হয়ে গেছে; সামনের ডোবায় জল জমে, সেইখানেই তারা দুজনে খেলা কর্চ্ছিল। টুকু বড় লোকের মেয়ে; সে দামী পোষাক পরে এসেছে আর সুশীর গায়ে একটা সাধারণ ফ্রক।

খেল্‌তে খেল্‌তে হঠাৎ সুশী দিয়েছে টুকুকে জলে ঠেলে, আর যায় কোথায়! টুকু অমনি উঠল কেঁদে. টুকুর বাবা সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি এসে টুকুকে জল থেকে উঠিয়ে সুশীকে বেদম প্রহার দিলেন। সুশী যেই তার মামাকে গিয়ে সেই কথা বলেছে, অমনি তিনি তেলে বেগুনে হয়ে ছুটলেন টুকুদের বাড়ী। সেখানে সামান্য কথাকাটা থেকে, হাতাহাতি শেষটা মারামারিতে পরিণত হল। টুকুর বাবা বড় লোক, সঙ্গে সঙ্গে থানায় লোক পাঠালেন। ও তরফ থেকে সুশীর মামা নিজেই থানায় গেলেন। এ দিকে বাড়ীতে সুশীর আর টুকুর যা অবস্থা হল, তা আর কি বলব! সুশীর মা মেরে সুশীর গায়ের চামড়া তুলে ফেল্লেন প্রায়; এদিকে টুকুকে তার মা সুশীর সঙ্গে খেল্‌তে মানা করে দিলেন।

সন্ধেবেলা সুশীর মামা আর টুকুদের বাড়ী থেকে যিনি থানায় গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে আস্‌তেই রায়েদের পুকুরের পাড়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন। দেখলেন, টুকু আর সুশী রায়েদের পুকুরের পাড়ে বসে খোশ মেজাজে গল্প কর্চ্ছে। সুশী বল্‌ছে, "ভাই টুকু, আর আমি কখনও তোকে জলে ফেলে দেব না ভাই, কেমন?" টুকু বল্‌ছে, "অমন রে কত হয়ে থাকে—তার জন্য আর ভাবনা কি? আয় আমরা আগড়ুম বাগড়ুম্ খেলি।"

দিন মজুর

শ্রীশিবানী সিংহ

শীতের ভোর; চারিদিকে জমাট কুয়াশা। ভোরের আবছা আলোয় দূরে কুয়াশায় ঢাকা গাছ ও সারি সারি খোলার বস্তি—ঝাপসা দেখায়। অনতিদূরে চট্‌কলের ভোঁ দিগন্ত কাঁপাইয়া বাজিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অগণিত কুলী বস্তি হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের বেশ—জীর্ণ ও মলিন। উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাবে শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখে অলসতার ঘোর তখনও কাটে নাই; মুখে চোখে দীনতা ও নৈরাশ্যের অপরিসীম কালিমা। কিন্তু কি ক্ষিপ্র তাহাদের গতি! সময়ে না পৌঁছিলে মজুরী মিলিবে না। দেহের রক্ত জল করিয়া হাড় পিষিয়া পয়সা রোজগার; তাই এত ছুটোছুটি।

বস্তি অপরিচ্ছন্ন; বাতাসে বিশ্রী পচা গন্ধ। কোন অপরিসর কক্ষে জীর্ণ খাটিয়ায় শ্যামল শুইয়াছিল। নিকটে বার তের বছরের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—"দাদা, ওরা সব চ'লে গেল, আর তুমি এখনও শুয়ে। আজকাল তোমার কি হয়েছে বলত?"

বিকৃতকণ্ঠে শ্যামল বলিয়া উঠিল—"আমি না যাই তোর কি? আমার গায়ে জ্বর, আমি ওদের মত খাটতে পার্‌বো না। আমি যাব না। তুই বেরো সাম্‌নে থেকে বলচি কাজল।"

কাজল বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে ছোট ছিল না। চার বছর আগে একদিন সব হারাইয়া, অভাবের দুর্দ্দান্ত তাড়নায় সে তাহার নিরক্ষর ভালমানুষ দাদাটির হাত ধরিয়া এই বস্তিতে আসিয়াছিল। এখন শ্যামলের বয়স বাইশ কিন্তু আরও বেশী মনে হয়; পূর্ব্বের সে স্বাস্থ্য নাই; তাহার উপর যখন তখন জ্বর আসে। কাজলের কান্না পাইতেছিল।

হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শ্যামল বলিল—"কাজল, আমি চল্‌লুম।" সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। কাজল বহুবার ডাকিয়াও ফিরাইতে পারিল না।

দিনের আলো নিভিয়া আসিল। কলের ভোঁ একটু আগেই বাজিয়াছে। দিনমজুরের দল ধীর মন্থর গতিতে গৃহপানে ফিরিতেছিল; এবারকার মূর্ত্তি আরও রূক্ষ ও মলিন। দানবযন্ত্রের নিস্পেষণে বুঝিবা ইহাদের সবশক্তি উজার হইয়া গিয়াছে। টলিতে টলিতে শ্যামল ঘরে ঢুকিয়া কোনমতে শুইয়া পড়িল। কাজলকে ডাকিয়া সস্নেহে এবং ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল—"কাজল, দেরী হলে সর্দ্দার খুব মারে, আজ মজুরীও দেয়নি। না দিক্‌গে। উঃ! গায়ে কাঁথাটা চাপিয়ে দেত, বোন্।"

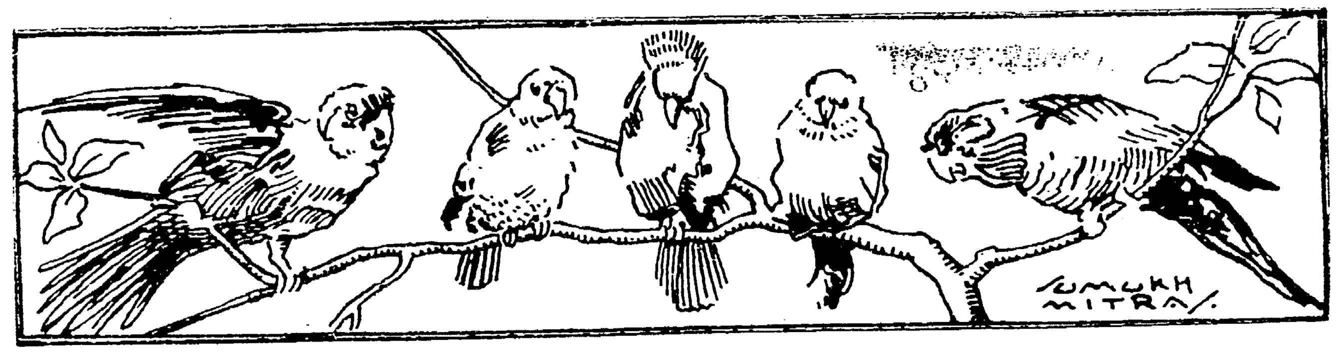

পরিচালিকা—**দিদিভাই।**

আমার সোণার ভাই বোনরা !

তোমাদের আশ্চর্য্য ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই একথা জানি—আমার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের জন্য। কিন্তু আমি হারিয়ে যাইনি—তোমাদের মত সোণার বন্ধু যার সে কখনও হারিয়ে যেতে পারে ?

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে মানুষের সমারোহ—দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের জন্য অসংখ্য পাতা পড়েছে—বড় ছাদের চারিদিকে। তোমরা যদি লক্ষ্য করো তো দেখতে পাবে এই ভীড়ের ভেতর একখানা পাতা বাদ পড়ে গেছে—আমরাও সেই অবস্থা ঘটেছিল। যাহোক অগ্রহায়ণ গিয়ে পৌষ এসে পড়লো, শীতটা বেশ জমে এসেছে আর রোদও বেশ মিষ্টি লাগছে। সময় মত 'দিদিভাই'এর দেখা না পেয়ে তোমাদের পর্ব্বত প্রমাণ রাগ ও অভিমান জমা হয়ে আছে। মেঘ ঢাকা চাঁদের মত তোমাদের মিষ্টিমুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে আর তোমাদের কথা ভাবতে দপ্তর খুলছি।

চমকে চেয়ে দেখি অজস্র চাঁদ হাসছে পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা ও স্নিগ্ধতা নিয়ে।

শিবানী সিংহ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪৮৪

আশা করি তুমি এমাসের রংমশাল পেয়েছ। দিদিভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হয়না তা বুঝি জানো না বোনটী ? তোমার লেখা কি আছে পাঠিয়ে দিও—দেখে বলবো।

নিলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী)

তুমি কাকে লেখনী বন্ধু চাও জানিও আর তুমি কি ব্যাজএর জন্য টাকা পাঠিয়েছিলে ? টাকা পাঠিয়ে যদি ব্যাজ না পেয়ে থাকো পরিচালক মশাশয়কে একখানা চিঠি লিখো—তাহলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হবে ভাই।

আলপনা দাস (ধুবড়ী)

আলো ! তোমার লজ্জা ও ভয়ের জন্য আমি সত্যি দুঃখিত বোন। গ্রাহিকা হওয়া সম্বন্ধে যে কথা লিখেছ ভাই আমি তাতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছি—এ বিষয় আমি পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমায় জানাবো। আমায় যেমন তোমার ভালোলাগে তোমাকেও ঠিক তেমনি ভালো আমার লাগে। নিশ্চয়ই তোমার দিদির অভাব পুর্ণ করবার চেষ্টা করবো ভাই। চিঠি যখন লিখবে—ঠিকানাটী সমস্ত ভাল করে লিখো কেমন ? বৌদিকে আমার কথা বলো আর প্রীতি দিও।

গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) গ্রাঃ ১১৮৩

তোমার লেখার খবর যথাসময়ে পাবে ভাই। গৌরাঙ্গ চৌধুরীর ঠিকানা আমি শীঘ্র তোমায় পাঠাচ্ছি। আবার আমার ছবির কথা ! কোন্ কাগজে কি আছে ভাই তা যদি করা হয় তাহলে রংমশালের স্বাতন্ত্র থাকে কি ? আমায় একটা যাহোক কল্পনা করে নিও না—সেই তো বেশ।

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৬৬

তোমার অনুযোগ শুনে দুঃখিত—আমি সত্যি তোমার চিঠি পেলে ঠিক উত্তর দিতাম ভাই—যে কোন কারণেই হোক আমার কাছে এসে পৌছয়নি তাই লিখতে পারিনি। কিছু মনে করোনা—এই তো উত্তর দিচ্ছি ভাই—অভিমান যেন না থাকে কেমন ? লেখনী বন্ধু কাকে চাই তোমার ?

শিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী) ৫৮৯

তোমার চিঠিটা পড়ে খুব ভাল লাগলো। তুমি লিখেছ—পূজায় খুব আনন্দ করেছি। এখানে খুব বড় পূজা হয়···বোধহয় এতগুলি বাঙ্গালী একসঙ্গে পূজা কোথাও করেনা। এবার সবচেয়ে ভাল লাগলো রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বল্লেন।···দুর্গাপূজা সম্বন্ধে ছোট করে একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বল্লেন দুর্গাপূজা শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের শক্তি দেয়। আমরা যেন ভুলে না যাই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীতে বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ ফুরায় না বরং সেখানেই আরম্ভ। দুর্গার বোধন করতে হবে অন্তরে অন্তরে, বাহ্যিক আড়ম্বরে নয় তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

শিবপ্রসাদ তুমি যে বলেছ ভাই আমায় চিনতে পেরেছ তা জেনে খুব খুশী হলাম—কিন্তু কে তোমায় বলেছে আমি লেখিকা ? এটি একেবারে ভুল। তোমার দিল্লী যাবার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করছি ভাই।

রহিমা খাতুন (ষোলঘর) ৭৭৭

রমু ! তোমার নতুন চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু তোমার কথা ভুল—আমার কাছে যে সব ভাই বোন সমান ভাই—পক্ষপাতিত্ব নেই, তোমরা সকলেই আমার স্নেহের ও আদরের। ভাষা সুন্দর নয় কে বলেছে ! আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে। তোমার ভালবাসা ও মা ঠাকুমার স্নেহ আমি সাদরে গ্রহণ করেছি।

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

তোমাদের একত্রিত করবার দিন একটু বদলান হয়েছিল ভাই সকলের সুবিধার জন্য। অঞ্জলি বোনটীর মৃত্যুর জন্য আমরা সবাই আন্তরিক দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। শ্রীভগবান যেন তার পরিবারবর্গের মনে শান্তি দেন—আর তার আত্মার কল্যাণ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

বিনয় চন্দ্র (কটক) ১০৩৮

তোমার মতামত গুলি পড়েছি ও ভাল লেগেছে—এবিষয় যদি পরিচালক মশাইকে জানাও তাহলে ফল বেশী হয়—তোমরা সেই চেষ্টাই করো ভাই।

দ্বিজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুণ)

নামটা ভাই তোমার বড্ড বড়, ছোট নাম নিশ্চয় একটা আছে সেটাই জানিও আমায়। তোমার ধাঁধার ব্যাপার শুনে খুব আনন্দ পেলাম। গত পূর্ব্ব মাসে বিশেষ কারণে রংমশাল বেরতে দেরী হয়েছিল সেজন্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারনি। এবার থেকে যাতে তোমাদের অসুবিধা না হয় তার চেষ্টা আমরা করবো।

কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপূর) ৬৭৮

তোমাদের সুবিধার জন্যই বড়দিনের সময় তোমাদের একত্র করবার দিন স্থির হয়েছে লেখা পাঠিও।

দুর্গা বসু (শালকিয়া) ৬৬১৬

তুমি যে সব অনুযোগ করেছ ভাই—এসব আমায় না লিখে তোমরা যদি পরিচালক মশাই কে জানালে বড় ভাল হয় আর তোমাদেরও সুবিধা হয়।

প্রেমাংশু ঘোষ (কলিকাতা)

আমাদের দলের নিয়ম তুমি তো ভাই জানো—সুতরাং পত্রোত্তর বা লেখনী বন্ধু সম্বন্ধে আমি নতুন করে কি বলবো? রংমশাল যে তোমাদের আনন্দ দেয় এজন্য আমরা সবাই সুখী।

শেখর সেন (ভবানীপুর) ৯৫১

তোমাদের কথামত সম্মিলিত করবার দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নামের বিষয় একটা চিঠি পরিচালক মশাইকে দিয়ে দিও ভাই—কেমন?

আরতি সেন (ভবানীপুর) ৯৫১

আমার ছোট্ট বোন! তোমার চিঠিটা পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। লেখনী বন্ধু তুমি কাকে নেবে তার নাম লিখো।

শৈলেন্দ্র নাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তুমি কবিতা লিখতে পারোনা—একথা সবাইকে বলতে বারণ করেছ—আচ্ছা আমি বলবো না। রংমশালের বার্ষিক সুচীপত্র সম্বন্ধে যা লিখেছ তার বিষয় পরিচালক মশাইকে লিখো ভাই।

কুমুদ সেন (কলিকাতা) ১১৭৮

আমি মোটেই ভাবি নি যে তুমি এলে জ্বালাতে আমায়। তোমার ধারণা ভুল, রাগ কি আমি করতে পারি ভাই? কোন্ শৈলেনের সঙ্গে আলাপ করবে পুরো নাম লিখো—ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো। আমার ছবির কথা পূর্ব্বেই তো বলেছি ভাই

শিবরাম বন্দোপাধ্যায় গ্রাঃ ৮৭

তোমাদের দেশ বন্যায় ডুবে গেছে শুনে খুব দুঃখিত হলাম ভাই। তোমাদের একত্র করার দিন অগ্রহায়ণের রংমশালে জানান হয়েছিল।

তরুণ তপন ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৭৬৭

তোমার খুব বড় চিঠি একটি আমি পেয়েছি। চিঠিখানি আমি সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছি যা উত্তর পাবো তোমায় জানাবো। বারে বারে কেন নাম জিজ্ঞাসা করছ ভাই? দিদিভাই এর নাম দিদি ভাই ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্র নাথ মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

তোমার লেখা যথাযোগ্য স্থানে দেওয়া হয়েছে। তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর আমি একটু ভেবে দেবো।

অলকা ঘোষ (কত্রাসগড়)

তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেলাম। গ্রাহক নম্বর লিখতে ভুলেছ। তোমরা বেড়িয়ে এলে আর রংমশালের 'কাজীর বিচার' আর 'প্রেমের ঠাকুর' অভিনয় করেছিলে শুনে খুব সুখী হলাম। তুমি যার নাম লিখেছ সে ঠিকই বলেছে—তার কথা বিশ্বাস করতে পারো। যে অভিযোগ জানিয়েছ সে সম্বন্ধে প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো।

মহম্মদ গুলজার আলী (শালিখা) ১১৮৫

তোমার চিঠি পেয়েছি। ...র দেওয়া সত্বেও তুমি এসে ফিরে গেছ শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ভূত প্রেতদের ফটো-তোলা যায় না লিখেছ, আমি ও বোধ হয় ঐ দলেরই হবো।

শিবাণী সরকার (কলিকাতা) ৪০৮

অনেকদিন পরে দিদিভাইকে মনে পড়লো কেমন? আমি তোমাদের কাউকে ভুলিনি ভাই। তোমাকে রংমশাল দলে ভর্ত্তী করা হয়েছে, তোমার ব্যাজ শীঘ্র পাবে। প্রীতির খবর কি? তাকে আমার কথা বোলো।

সুরথ বসু (চুঁচুড়া) ১১১৮

রথীশের ঠিকানা পাঠাবো। এরপর থেকে প্রত্যেক চিঠিতে ভাই পুরো ঠিকানা নাম ইত্যাদি লিখো, তাতে সুবিধা হয়।

মিণ্টুরাণী ও পিণ্টুরাণী বসু (চুঁচুড়া) ১১১৮

তোমাদের উভয়ের চিঠি আমি পেয়ে খুব সুখী হলাম। লেখনী বন্ধু কাকে চাই তোমাদের ?

মাষ্টার পণ্টু (কলিকাতা)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ? নতুন চিঠি হলেও ভাল লাগলো। দেখা হবে না, কে বলেছে ?

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ১০০৯

তোমার কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি ভাই। তুমি অল ইণ্ডিয়া ইণ্টার স্কুল গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে একটা কাপ পেয়েছ শুনে ভারী সুখী হলাম। এবার তবে আমাদের মিষ্টান্ন মিতরে জনা হয়ে যাক !

প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

আবার ভুলে গেছ গ্রাহক নম্বর, স্থানের নামও নেই কেন ? শান্তিনিকেতনের গ্রাহিকা আছে, গ্রাহক নেই। গল্প যথাস্থানে দিয়েছি—যথা সময়ে জানতে পারবে ফলাফল।

তোমরা আর যারা চিঠি দিয়েছ, তাদের উত্তর দিবার মত কিছু পাইনি ভাই ! তোমরা সকলে আমার প্রীতি ভালবাসা নিও। হ্যাঁ, একটা কথা—আমার কাছে অভিযোগ আসছে, রংমশাল দলের যা নিয়ম কানুন ও বিধি নিষেধ আছে, তোমাদের ভিতর কেউ কেউ তা রাখছো না। এজন্য দুঃখের চেয়ে লজ্জা আমার বেশী হয়, দুঃখিতও হয়েছি খুব এই সব অভিযোগ শুনে। আশা করি, এরপর তোমরা আর আমায় লজ্জা দেবেনা। ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি রেখে তোমরা কাজ করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

ইতি—

তোমাদের

দিদিভাই

নূতন ধাঁধা

আমাদের কলমটা মাঝে মাঝে পাগলামি সুরু করে, এটা লিখে পড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল,—কোন্ দেশের ভাষারে বাবা ! কলমটা যা বলেছে তার কম বা বেশী একটি অক্ষরও সে নড়ায়নি, অথচ পাগলামি আছে ষোল আনা। দেখ কি লিখেছে, তোমরা যদি কেউ এর অর্থ করতে পারো !

(১) বালাই বুবু কথস্ত মুরছিল,
মানুষ ফাড়ানো অনে ব্যকারনে কয় ওরা।

(২) দাবি রদা, আড়ি বাছো
দাড় ব নেড়ি বাই।
গেথায় কোল ?
নানি জা।

(৩) রে কিচ্ছে হ ?
খুনুন ওড়ছি।
হ কিবে ?
বাঁত ভাধবো।

(৪) মকন খোনি মকন খোনি
ক তুচ্ছ কিমি ?
দেই এখনা কেমি আমন
এঁবি ছকেছি !

নতুন প্রতিযোগিতা

ব্যাঙ-এর পাতা গল্প প্রতিযোগিতা

তোমরা গত মাসের রংমশালে ব্যাঙএর পাতার গল্পের কথা জান ও সকলেই পড়েছ। এই ব্যাঙএর পাতা রংমশালে আমরা প্রায়ই বার করব। এবার কিন্তু তোমাদের ভার—এই ব্যাঙএর পাতা গল্পে সাজিয়ে লিখে তোমাদের পাঠাতে হবে এ মাসের প্রতিযোগিতায়। মনে রেখো কিন্তু পাতাটা ব্যাঙএর, তোমাদের নয়। পাঠাবার শেষদিন ১৫ই মাঘ।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

কার্ত্তিক মাসের অঞ্জুলী-স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা

বড়দের মধ্যে প্রথম—শ্রীশিবানী সরকার, কলিকাতা, গ্রাঃ নং ৪০৮। কবিতার নাম—শেফালিকা।

ছোটদের মধ্যে প্রথম—শ্রীমান অসীম কুমার সরকার, পুরুলিয়া, গ্রাঃ নং ৩২১
কবিতার নাম—ঝরাফুল।

অগ্রহায়ণ মাসের ছোট-গল্প প্রতিযোগিতা

বড়দের মধ্যে প্রথম—শ্রী শিবানী সিংহ, গ্রাঃ নং ৪৮৪, গল্পের নাম—দিনমজুর।

ছোটদের মধ্যে প্রথম—শ্রীগৌরাঙ্গ রায়, গ্রাঃ নং ১১৮৩, গল্পের নাম—ছোটমেয়েদের ঝগড়া।

কবিতা দুটি ও গল্প দুটি এবার রংমশাল বৈঠকে প্রকাশিত হল।

গতমাসের ছদ্ম-বেশ ধাঁধার উত্তর

A=11	E=10	L=12
C=8	H=15	M=2
D=7	K=3	N=6
	O=16	

নির্ভুল উত্তরদাতাদে নাম

সাধনা অর্চ্চনা গোপাল রাখাল (গৌহাটি), শ্রীদিলীপকুমার সেন (চাঁইবাসা), শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুন), কামাক্ষাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ), ইন্দিরা ঘোষ (ঢাকা), মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর), শিবানী সিংহ, অসীমকুমার সরকার (পুরুলিয়া), বেলা দাসগুপ্তা (কলিকাতা), প্রতিভা, রেণু, নীলা (জামসেদপুর). অর্চ্চনা সেন (কলিকাতা), অরুণ, তরুণ, সুভাষ, ঊষা, মীরা, মুক্তি, কিরণ, সুকুমার (কুচবিহার), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (খুলনা)।

তুটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ গুলজার আলি, সামশের আলি আহমদ; শ্রীলেখা বসু; লীলা, ইলা, মন্মথ, অশোক, লীলা, শান্তা, হাঁদু, ঊষা, সুহাসিনী; বিনয়কুমার ঘোষ (ধানবাদ); ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ; নক্ষত্র রায় (কলিকাতা); বিজয়লক্ষ্মী পোদ্দার (কলিকাতা); সুবোধকুমার গুপ্ত, মণি, কালুদা, মা, বাবা, নিখিলদা, ঠাকুমা, চঞ্চল, (আসানসোল); প্রদীপ, বুনু (কলিকাতা); রেবা মুখার্জ্জী (কালিঘাট); বিমলরঞ্জন রায় (পাটনা); সুরেখা বসু (কলিকাতা); সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবপুর); রেখা, বাদল ও বিশু (এলাহাবাদ); শিবানী সরকার; মন্মথনাথ পাল (কিশোরগঞ্জ); মা, বাবা, জ্যোতির্ম্ময় ও জগদীশ (তেলেনীপাড়া); ছবি বিশ্বাস (কলিকাতা); অমিয়া ও আরতি দত্ত; শচীন দাস, পঞ্চানন, সমর, প্রভাত, কৃষ্ণ, প্রফুল্ল, বলাই (গোপালনগর); জগদীশ, প্রশান্ত, অনন্ত, গোবিন্দ সিংহ (কলিকাতা); তরুণ ঘোষ (কলিকাতা); প্রণব ও বিজন গোস্বামী; ব্যোমকেশ ঘোষ (হাওড়া), কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর); গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ); শান্তিময়ী গোস্বামী (কালিঘাট); সুলতা ও সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈদ্যবাটী); পারুল সেনগুপ্ত (লাহোর); যশোধন ভট্টাচার্য্য (বিষ্ণুপুর); মিনু, পানু, বানু (দ্বারভাঙ্গা); শান্তি মজুমদার (গয়া); যতীন্দ্রনাথ দাস, কানাইলাল চৌধুরী (কলিকাতা); প্রভাসচন্দ্র দাস (কলিকাতা); শান্তিময় গুহ (ঢাকা); রূপবাণী রায় (ভবানীপুর); ধীরেন ঘোষ (ডিব্রুগড়); তুষারকান্তি দত্ত (ভবানীপুর); শিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী); রহিমা খাতুন (ঢাকা); বিমল ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (খিদিরপুর); নীরেন্দ্র চন্দন, রবীন্দ্র (আঠারবাড়ী); নিলিমা, নমিতা, নির্ম্মল, অমল (নিউদিল্লী); সন্দীপ রাও (কটক); কেয়ারাণী চৌধুরী (মধুপুর); বুল সেন (ভবানীপুর); অরুণ ব্যানার্জ্জী (কলিকাতা); নীলিমা নাগ (টালা); নীলাদ্রি সেন (কলিকাতা); বেলাবাণী ব্যানার্জ্জী; শীলা মিত্র (গৌহাটি); অমিতাভ, মনোজিৎ, লীলা, নমি, বানু, খুকু, বুড়ো (পুরুলিয়া); মণীন্দ্র, কানু, খুকু, কৃষ্ণা, বেণু, ফড়িং (কলিকাতা); নাসীম আরা বেগম (কলিকাতা)।

ভীলের মেয়ে

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে] [শিল্পাচার্য্য শ্রীনন্দলাল বসু

রংমশাল

চতুর্থ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ
১৩৪৫

আকাশ পারে

সতীকান্ত গুহ

আকাশ পারে সূয্যি তারা চাঁদের আনাগোনা
মেঘ কালো হায় সাধ তবু তাঁর রঙের বাঁশী শোনা।
চাঁদ ভাবে, ছিঃ, তাও কি বা হয়!
তারারা কয়, কক্ষণো নয়!
সূয্যি তবু মেঘের মুখে ছড়িয়ে দিলেন সোনা।

তাই না দেখে ঘোমটা খুলে নিশীথ রাতে চাঁদ
জোছ্‌না আলোর রঙটি ঢালে মেঘ ভোলানোর ফাঁদ।

তালপাতার সেপাই।

সুকুমার দে সরকার

(তিন অঙ্ক নাটিকা)

পাত্র পাত্রীগণ।

তালপাতার সেপাই।	কঙ্কণ-না রাজকন্যা
লালকমল—গরীবের ঘরের ছেলে	লালকমলের মা
কঙ্কণ-না দেশের রাজা	তিন ডাইনি বুড়ি।
হুহুঁঙ্কার—দৈত্যরাজ	কঙ্কণ-না সভাসদগণ, নকীব,
কঙ্কণ-না রাণী	রাজদূত, প্রহরী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৈত্রের শেষ। ছোট্ট গরীবের কুঁড়ে ঘর। ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ নিরাভরণ। একদিকে একটা তেলের প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, চারটি বাসন সাজান, একটা ভাঙ্গা প্যাঁড়ার ওপর কয়েকটা আধময়লা কাপড় কোঁচান। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার আকাশে রাশিরাশি তারার ঝকমকি। একদিকে একটা ভাঙ্গা তক্তপোষ, তারওপর ময়লা বিছানায় লালকমল শুয়ে আছে। তারপাশে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মা। লালকমলের বয়স বছর ছয়, মিষ্টি ফুটন্ত ফুলের মত মুখ, রোগে মলিন হয়ে গেছে। লালকমলের মা, গ্রাম্য মেয়ে অপরূপ সুন্দরী। হাতে তাঁর একটা পাখা। লালকমল চোখবুজে ছিল, হঠাৎ নড়ে উঠে চোখ খুলে মায়ের মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাল।

মা। কি হয়েছ লাল? কি হয়েছে অমন করে দেখছিস কেন?

লাল। মা মা!

মা। কি রে, কি হয়েছে বাবা? এইত আমি রয়েছি, এখনও ঘুমোস নি তুই?

লাল। না ঘুম আসছে না, মা। চোখ বুজলেই যেন মনে হচ্ছে কারা সব আমায় ডাকছে, সেই কোথায় কতদূরে এক প্রকাণ্ড মাঠের ভেতর তারা আমায় খেলতে ডাকছে। তাদের হাতে সব কত খেলনা। কারো হাতে বা কাঠের ঘোড়া, কারো হাতে তরোয়াল, কারো হাতে বা তীর ধনুক, আবার একজন,

জান মা, তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছে। সে ভেঁপুটা প্রকাণ্ড লম্বা ঠিক যেন সেই যে রাজপুরীর গল্প বলেছিলে তুমি সেখানকার কতোয়ালের শিঙ্গে।

মা। কি বলছিস তুই লাল? একটু ঘুমো দেখি বাবা।

লাল। ঘুম যে আসছে না। আচ্ছা মা সব ছেলেদের কত সব খেলনা আছে, আমার জন্যে বাবা কিছু আনে না কেন?

মা। (চোখ মুছে) হা কপাল! আনবে বাবা আনবে, তুমি ভাল হও।

লাল। ওমা তোমার চোখে জল কেন?

মা। (সামলে নিয়ে) দূর বোকা চোখে জল কোথায়? চোখে একটা কুটি পড়ল কিনা তাই চোখ মুছলাম।

লাল। না আমি জানি আমরা গরীব কিনা তাই তুমি কাঁদ।

মা। (কপালে চুমো খেয়ে) কে বলেছে বাবা আমরা গরীব? এমন লাল যার আছে সে কি কখনও গরীব হতে পারে?

লাল। জানো মা আমি বড় হলে খুব বড় মানুষ হব। আমি চলে যাব সেই সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে প্রকাণ্ড এক দেশে, সেখানে কোন গরীব নেই, সেখানে কথা বললেই খেলনা পাওয়া যায়। সেই দেশে আমি বড় হয়েই চলে যাব।

মা। আর আমি বুঝি এখানে পড়ে থাকব রে?

লাল। না না তোমাকেও নিয়ে যাব আর বাবাকেও। হ্যাঁ মা, বাবা কবে আসবে?

মা। শনিবারে বাবা। জানিস লাল, এবারে তোর বাবাকে চড়কের মেলা থেকে তোর জন্যে একটা তালপাতার সেপাই আনতে বলে দিয়েছি।

লাল। (উঠে বসে) সত্যি মা সত্যি?

মা। হ্যাঁ রে।

লাল। বাঃ বেশ হবে, বেশ হবে। আমার অসুখ করে অবধি কারো সঙ্গে আমি খেলতে পাইনা, এবার এই বিছানায় বসে বসেই খেলব। হ্যাঁ মা তালপাতার সেপাই কি রকম?

মা। তালপাতার সেপাই লিকলিকে গড়ন, হাতে এক মস্ত তলোয়ার, মাথায় টুপি আর কথায় কথায় সে তলোয়ার উঁচিয়ে লাফ মারে তিড়িং তিড়িং।

লাল। বাঃ কি মজা! তালপাতার সেপাই লড়াই করে?

মা। করে বৈকি

লাল। আমিও লড়াই করব তাহলে—

মা। সে কিরে? তোর সেপাইয়ের সঙ্গে তুই লড়াই করবি?

লাল। না না তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে নয়, আমি লড়াই করব দত্যিদের সঙ্গে, সেই যে তুমি বলেছিলে দত্যিপুরীর রাজা রাজকন্যাকে চুরী করে নিয়ে গেছে, আমি সেই দত্যিপুরীর রাজার সঙ্গে লড়াই করে রাজকন্যেকে কেড়ে নিয়ে আসব।

মা। আচ্ছা বাবা, এবার ঘুমিয়ে পড়, না হলে অসুখ আবার বেড়ে যাবে।

লাল। মা একটা গল্প বল না?

মা। শোন একটা ছড়া বলি—

কঙ্কণ-নার দেশে চাঁদের আলো হাসে
তেপান্তরের মাঠের শিরে মেঘের ভেলা ভাসে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দত্যি পুরীর দেশ
সোনার বরণ রাজকন্যে চোখের জলে শেষ
সেথায় যাবে কে?
আমার সোনার লালকমল আজ সেপাই সেজেছে

লাল। (ঘুমজড়ান স্বরে) সেপাই সেপাই তালপাতার সেপাই।

মা। তেপান্তরের মাঠে সেথায় বেজায় অন্ধকার
কঙ্কণ-নার দেশ লুটেছে দত্যি হুহুঙ্কার
অন্ধকারের মাঠ ভেঙ্গেছে তালপাতা সেপাই
সঙ্গে যদি যাবি রে ভাই আয় ছুটে সবাই।

ঘুমিয়ে পড়েছে লাল আমার, ঘুমিয়ে পড়েছে। পাগলা ছেলে, খেলনা খেলনা করে পাগল কিন্তু এমন কপাল নিয়ে এসেছিলুম বাছার হাতে একটা কিছুও তুলে দিতে পারলুম না। হে ঠাকুর, একবার মুখ তুলে চাও, আমাদের জন্যে কিছু চাইনা কিন্তু বাছার মনে যেন কিছু দুঃখ না থাকে।

(লালকমলের মা উঠলেন, প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন।)

যাই ঘরের কাজগুলো সেরে রাখিগে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালকমল ঘুমোচ্ছে, বিছানার ওপর ছেঁড়া মশারী ফেলা। ঘরে প্রদীপ নেই। জানলা দিয়ে চাঁদের মৃদু স্তিমিত আলোয় ঘর মিটমিট করছে। জানলা দিয়ে একটা ধানের মরাই দেখা যায়, তারপরে মাঠ

দিগন্তে ছড়ান, চাঁদের আলোয় ধূ ধূ। জানলার গরাদ তিনটে ভেঙ্গে গেছে একপাশে শুধু একটা উইধরা গরাদ জানলার জানলাত্বের সম্মান এখনও বজায় রেখেছে। জানলার ঠিক ধারেই একটা বকুল গাছ থেকে ফুল ঝরছে টুপটুপ। বকুল গন্ধে ঘর ভরপুর।

সেই ভাঙ্গা জানলার মধ্যে দিয়ে প্রথমে একটা পা ঢুকছে দেখা গেল। পায়ে দরোয়ানদের মত লাল ফেট্টি জড়ান, শুঁড় তোলা দেশী জুতো। তারপরে সমস্ত শরীরটা এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে খাকী হাঁটু অবধি লম্বা পিরাণ। কোমরে লাল শালুর ফেট্টি। মাথায় তালপাতার সৈন্যটুপী, এক হাতে মস্ত এক তালপাতার তরোয়াল আর এক হাতে লম্বা এক তালপাতার ভেঁপু। লিকলিকে পাংলা চেহারা, মাথায় লালকমলের চেয়ে একটু বড়। মূর্ত্তিটা ঘরে ঢুকে হাত পা ছুঁড়ে একপাক ঘুরে নিল, তারপরে মৃদু মিহিগলায় সুর করে বলে উঠল ঃ—

তালপাতার ঝড়ে
একানড়ে নড়ে
আয়রে আয় কে যাবি ভাই
ভেঁপুর পিঠে চড়ে।

তারপরে লালকমলের বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে ফিরে মূর্ত্তিটা ভেঁপুতে এক ফুঁ দিল। ভেঁপুর গম্ভীর আওয়াজ ঘরে কেঁপে কেঁপে ঘুরতে লাগল। লাল বিছানায় চমকে উঠল।

লাল। কে?

মূর্ত্তি! (চুপি চুপি) লালকমল, লালকমল?

লাল মশারী তুলে বেরিয়ে এল।

লাল। কে? তুমি কে ভাই?

মূর্ত্তি। আমি তালপাতার সেপাই
চোখের পলকে আমি তরোয়াল চমকাই

লাল। (বিস্মিত হয়ে) ও তুমি তালপাতার সেপাই?

সেপাই। হ্যাঁ তুমি যে ডাকছিলে...

লাল। কই?

সেপাই। সেই যে ঘুমোবার আগে...

লাল! একি আমি কি এখন জেগেছি? কিন্তু ঘরের ত কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার সামনে ধূ ধূ মাঠ, ধানের গোলার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাঙা পথ, চাঁদের আলোয় বকুল ফুলের গন্ধ নাচছে। একি হোল আমার ঘর কোথায় গেল? আমি কি ঘুমোচ্ছি না জেগে আছি?

সেপাই। তুমি ঘুমোচ্ছ

লাল। তবে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কি করে ?

সেপাই। ঘুমোলেই ত আমায় দেখা যায়। ঘুমের দেশের ওপার থেকে যে আমি আসি। একটি বার জেগে দেখ আর আমাকে দেখতে পাবে না, তোমার নিশ্বাসের ফুঁয়ে আমি উড়ে যাব।

লাল। না না তুমি যেয়ো না, তুমি আমার সঙ্গে খেলা কর

সেপাই। তুমি কি খেলা জান ? নাচতে জান ?

(সেপাই হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে তিড়িং তিড়িং করে নাচতে সুরু করে দিল।)

আমার নাম রামখেল সিং
তাই নাচি তিড়িং মিড়িং

কই নাচো না।

লাল। আমি জানি না

সেপাই। এঃ তুমি কিছু না। না নাচলে কি মন হাল্কা হয় ? আর মন হাল্কা না হলে কি ওড়া যায় ? আচ্ছা তবে কি জান ? লড়াই লড়াই খেলা জান ?

লাল। কার সঙ্গে ?

সেপাই। কেন দত্যিদের সঙ্গে

লাল। দত্যি ? হ্যাঁ হ্যাঁ দত্যিদের সঙ্গে যে আমার লড়াই করতে হবে। রাজ-কন্যাকে কেড়ে আনতে হবে। কিন্তু আমার যে তরোয়াল নেই।

সেপাই। সেজন্য ভাবনা কি ? ওই যে মাঠের শেষে হলুদ পুকুরের ধারে একানড়ে তালগাছটা দেখা যায়, ওই যে তালের পাতা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ওরি তলায় গিয়ে আমি তোমায় তালপাতার তরোয়াল বানিয়ে দেব, ভাবনা কি ? চল না যাই।

লাল। কিন্তু কোথায় যাব ?

সেপাই। আগে যেতে হবে কঙ্কণ-না রাজার দেশে

লাল। তারপরে ?

সেপাই। তারপরে রাজাকে জিজ্ঞেস করতে হবে—মহারাজ, দত্যিরাজ হুহুঙ্কার আপনার মেয়েকে চুরী করে নিয়ে গেছে, তাকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনি তা হলে কি দেবেন ?

লাল। রাজা বলবেন, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে

সেপাই। রাজকন্যে ? উঁহু রাজকন্যে নিলেই মহা মুস্কিল। তাদের বড় বায়না। এই আল্লাদী পুতুল চাই, এই পুঁতীর মালা চাই, এই বিয়ে করার জন্যে রাজপুত্তুর চাই। সে বড় বিপদ। আর রাজত্ব সে আরও বিপদ।

লাল। কেন ?

সেপাই। রাজা হওয়ার মহা জ্বালা। একটু নাচতে ইচ্ছে হলে নেচেছ কি অমনি বুড়ো মন্ত্রী দাড়ী নেড়ে ছুটে আসবে। আহা আহা, করেন কি মহারাজ ? আপনার সব নটীরা আছে তারা নাচবে দেখুন। কেনরে বাপু ? তারা কি আর আমার মত তিড়িং তিড়িং নাচতে পারে ?

আমার নাম রামখেল সিং
তাই নাচি তিড়িং মিড়িং

(সেপাই নেচে দেখিয়ে দিল)

লাল। তবে ?

সেপাই। আচ্ছা আগে চলত, তারপরে দেখা যাক রাজা কি দিতে চান।

লাল। বেশ চল। আমাকে একটা তরোয়াল করে দিতে হবে কিন্তু।

চলে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ সভা। মাঝে প্রকাণ্ড সিংহাসন রাজার। পাশেই রাণীর সিংহাসন। দুটো সিংহাসনই খালি। একপাশে একটা পাথরের ফোয়ারা। দুপাশ দিয়ে দুজন নকীবের প্রবেশ। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুজনেরই নকীবের বেশ।

ছেলে নকীব। শোন গো শোন

মেয়ে নকীব। মন দিয়ে শোন

ছেলে নকীব। কঙ্কন-না রাজা
কেবল খান খাজা

মেয়ে নকীব। কঙ্কন-না রাণী
মাথায় দোলে বেণী—

ছেলে নকীব। দত্যি হুহুঙ্কার
ঘর করেছে আঁধার

মেয়ে নকীব। কঙ্কন-না রাণী
তাই চোখে ঝরে পাণি

ছেলে নকীব। কঙ্কণ-না রাজা
বেজায় মরা হাজা।

মেয়ে নকীব। আরে চুপ চুপ মহারাজ আসছে

ছেলে নকীব। এইরেঃ সেরেছে এখনি খাজা আনতে ছুটতে হবে।

মহারাজার প্রবেশ। গায়ে জমকালো রাজপোষাক। বয়সে বৃদ্ধ ইয়া লম্বা পাকা পাকা গোঁফ। মহারাজ এসে সিংহাসনে ধা করে বসে পড়লেন।

রাজা। আঃ বসে বাঁচলুম, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর পারা যায় না। ওরে কে আছিস।

নকীবরা। (একসঙ্গে) কি হুকুম মহারাজ?

রাজা। (চমকে) অ্যাঁ তোরা কি করছিলি এখানে?

নকীবরা। মহারাজার গুণ-গান করছিলুম।

রাজা। (ছেলে নকীবকে) যা খাজা নিয়ে আয়, না খেয়ে খেয়ে পেট্‌টা ভরে উঠেছে।

নকীব। যো হুকুম মহারাজ!

আলুথালু বেশে রাণীর প্রবেশ! রাণী অপরূপ সুন্দরী। মাটিতে তাঁর আঁচল লুটছে বেণী দুলছে পিঠে।

রাণী। রাজা রাজা!

রাজা। কি মহারাণী?

রাণী। কিছু কি উপায় করবে না? বাছা কি আমার চিরদিন দত্যিপুরে বন্দী হয়ে থাকবে! আর তুমি খাজা খাবে!

মেয়ে নকীব। স্থির হোন রাণীমা

রাণী। কে কে আমায় মা বলে ডাকল? (নকীবের দিকে ফিরে) ও তুই? না না তোরা আমায় মা বলে ডাকিস নি। মা বলে যে ডাকত সে রইল দত্যিপুরে বন্দী হয়ে, কিসের মা আমি? কিসের রাণী?

রাজা। তাইত একটা কিছু উপায় ত করতে হয়। ওরে আমার খাজা কই? খাজা না খেলে যে বুদ্ধি খুলছে না।

আগামী বারে সমাপ্য

প্যারাডাইস লষ্ট

[Paradise Lost]

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠে সেই নির্জন যায়গায় তাকে এইভাবে কে ডাকছে শুনে, ঈভের মন বিচলিত হয়ে উঠলো!

যত রকম মিষ্টি কথা আছে, তাই দিয়ে, স্যাটান ঈভের মন প্রথমে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলো। মিষ্টি কথায় কার না মন ভোলে?

বিস্মিত হয়ে ঈভ জিজ্ঞাসা করলো, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! তুমি তো মানুষ নও, তবে মানুষের ভাষা কোথা থেকে পেলে?

এই প্রশ্নই শোনবার আশা সে করছিল। গম্ভীরভাবে সে বল্লে, এই বাগানে এমন একটী গাছ আছে, যার ফল খেয়ে আমার এই দিব্য শক্তি হয়েছে! দেখবেন, দেখবেন, সেই গাছ?

এই বলে সে তাড়াতাড়ি ঈভকে জ্ঞান-বৃক্ষের তলায় নিয়ে গেল।

এই গাছ! এই গাছের ফলে আমার অমরত্ব! কোন ভয় নেই! কিসের ভয়, এই তো আমি খেয়েছি!

এইভাবে নানা কথায় স্যাটান্ ঈভের কোমল মনকে বশীভূত করে ফেল্লে। মন্ত্র-চালিতের মত ঈভ তার নিজের হাতে গাছ থেকে একটা ফল পেড়ে খেয়ে ফেল্লে!

সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী যেন হঠাৎ আহত হয়ে দুলে উঠলো—সমস্ত প্রকৃতি যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সর্পরূপী স্যাটানও অদৃশ্য হয়ে গেল! কারণ, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গিয়েছে।

ওধারে আদম কাজ সেরে, ঈভের মাথায় পরিয়ে দেবে বলে, নিজের হাতে একটা মালা গেঁথে ছুটতে ছুটতে ঈভের কাছে এলো।

সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে ঈভের মনে কেমন একটা ভয় এলো। যখন সে দেখলো তার সামনে থেকে সাপও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তখন ভয়ে সে ভেঙ্গে পড়লো। আদমকে দেখে সে সব কথা বল্লে। শুনে আতঙ্কে আদমের হাত থেকে গাঁথা মালা মাটীতে পড়ে গেল!

—কি সর্ব্বনাশ ! একি করেছ তুমি ! এর ফল যে মৃত্যু !

ঈভ তখন বুঝতে পারলো যে স্যাটান তাকে প্রতারিত করে গিয়েছে। কি হবে ? তবে কি আদমকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ?

আদম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, ভয় করো না তুমি ঈভ্ ! তোমাকে ছাড়া আমার জীবনে কি লাভ ? যদি ঈশ্বরের অভিশাপে তোমার হয় মৃত্যু, তোমার সঙ্গে আমিও সে ভাগ্য বরণ করে নেবো ! তুমি আর আমি অবিচ্ছেদ !

এই বলে আদম নিজে গিয়ে সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে।

তখন হঠাৎ তুজনার মনে কি এক পরিবর্ত্তন এলো। এতোদিন তারা লজ্জা কাকে বলে জানতো না। যেই তারা তুজনে সেই ফল খেলো, অমনি আর তারা আগেকার মতন তুজন তুজনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। ছুটে তারা তুজনে তুদিকে তুই ঝোপে গিয়ে লুকোলো। তারপর পাতার কাপড় তৈরী করে, তারা আবার পরস্পরের সামনে বেরুলো।

এধারে গার্ডেন অফ ইডেনে যে সব দেবদূত রক্ষী ছিল, তারা বুঝতে পারলো যে স্যাটান তাদের ঠকিয়ে সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে। তারা স্বর্গে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরকে সব জানালো।

ঈশ্বর বল্লেন, আমি জানতাম এ হবে ! তবে আজ থেকে আমি অভিশাপ দিলাম, সাপের মূর্ত্তিতে স্যাটান মানবকে ভুলিয়েছে, চিরকাল তাকে নীচ হয়ে মাটীতে বুক দিয়ে হাঁটতে হবে। আর এই অপরাধের জন্যে মানবকে মৃত্যুর তুঃখ ভোগ করিতে হবে....স্বর্গে আর তার কোন স্থান নেই !

দেবদূত এসে আদম আর ঈভকে ঈশ্বরের সেই অভিশাপের কথা জানালো।

সেইদিন তারা গার্ডেন অফ ইডেন থেকে চিরকালের মত বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে ঢুকলো !

ঈভ কেঁদে উঠলো, এই মৃত্যু-ময় পৃথিবীতে সে একলা কেমন করে থাকবে ?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দেবদূত বল্লে, একলা তোমাকে থাকতে হবে না। তোমার পাশে তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার স্বামী ! তোমার স্বামী যেখানে যাবে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে ! যেখানে থাকবে তোমার স্বামী, সে-ই হবে তোমার ঘর, তোমার নতুন জন্মভূমি !

এই বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আদিম মানব আর আদিম মানবী পাশাপাশি মৃত্যুময় পৃথিবীতে প্রবেশ করলো।

—

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এরপর অনেকগুলো বছরকে পার হয়ে যেতে দিতে হবে। এর মধ্যে ছোট খাট বিপদ মংলুর জীবনে অনেক এসেছে গেছে। কিন্তু তারা আমাদের কাহিনীর বাইরেই থাক। এর মধ্যে ভাল্লুকদের সাথে মংলুর অদ্ভুত জীবন বেড়ে উঠেছে। সে আজকাল নিজের পায়ে ভাল্লুকদের সঙ্গে ছুটে বেড়ায়। ভাল্লুকের তুধ খেয়ে এই সাত বছর বয়সেই তার বুকের ছাতি দেখবার মত। তার নধর তুই হাতে বেশ প্রচণ্ড ক্ষমতা। কালার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার কুস্তি লাগে। তখন কে হারে কে জেতে বলা যায় না। কালা আর তার তুই ভাই এখন প্রায় পূর্ণ আকারের ভাল্লুক। তার বন্য জীবনের শিক্ষার ভার নিয়েছে নালুখ।

প্রথম প্রথম মংলু ভাল্লুকদের মত চার হাত পায়ে ছুটে চলত। নালুখই তাকে শেখাল যে তার তুপায়ে চলতে হয়। হাত তুটো অন্য কাজের জন্য।

মংলু বলেছিল—কেন তুমিত চারপায়ে চল ভাল্লুকমা, কালা ভাই সবাইত চার পায়ে চলে। তবে ?

নালুখ বলে—আমরা হলুম ভাল্লুক, আমাদের চারটে পাই চলবার জন্যে। যে জাতের যা। দেখিস না ময়ূর হাঁটে দুই পায়ে, সাপ চলে বুক দিয়ে? তুই হলি মানুষের ছানা তোকে দুপায়ে চলতে হবে।

—মানুষ? সে আবার কি?

নালুখ বলে—জানবি জানবি—একদিন জানবি

সে কি! আজ তার সময় হয়নি।

ভাল্লুক মা বলে—কেন ওকে ওকথা শেখাচ্ছ? ও ভাল্লুকদের মংলুই থাক। ও আমারই ছানা। নালুখ হেসে বলে—কেউটে সাপ কি কখনও তার দাঁতের বিষ ভুলতে পারে? ওকে সব শিখতে হবে শুধু ভাল্লুকদের জ্ঞান নিয়ে বাঁচলে ওর চলবে না। মংলু টিকটিকি টিকটিকিও নয়, সাপও নয় শেয়ালও নয় ভাল্লুকও নয়! ও মানুষই! মংলুর কিন্তু সে সব খেয়াল নেই। সে ভাল্লুকদের সঙ্গে ভাল্লুক হয়ে থেকেই সন্তুষ্ট। অন্ততঃ আপাততঃ। গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, বসন্ত আসে, শীত আসে। তারা ফিরে ফিরে যায়। প্রতিটি বছরে তার বাহুতে শক্তি বাড়ে, বুকের ছাতি শক্ত হয়। ভোর বেলা উঠেই সে কালার বেঁড়ে লেজটা ধরে টান লাগায়—এই কালা ওঠ না! আকাশে আলোর গোলাটা যে দেখা দিল।

কালা আধো জাগা আধো ঘুমে শুয়ে শুয়ে তার বেঁড়ে লেজটা নাড়তে থাকে। মংলু সেই লেজ ধরে আবার টান লাগায়। কালা গর্জ্জন করে ওঠে—হু—উ—ম্!

মংলু আবার টান লাগায়। কালা চটে মটে লাফিয়ে উঠে মংলুর কাঁধে এক থাবড়া লাগায়। সেই ভাল্লুকি থাপ্পড়ে যে কোন মানুষের খোকা চেপ্টে যেতে বাধ্য কিন্তু মংলু ভাল্লুকের দুধ খেয়ে মানুষ। সে এক লাফে গুহার বাইরে এসে প্রশস্ত উরু দুটোয় দু হাতে চাপড় মেরে কালাকে ডাকে—চলে আও! কালার ততক্ষণে ঘুম ছুটে গেছে। সে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ দিয়ে শব্দ করে—অর্‌র্! মংলু বলে—ওতে ভয় পাচ্ছিনা। চলে এসো। কালা ঝাঁপিয়ে পড়ে মংলুর কাঁধে। মংলুও কালার কাঁধ দুটো ধরে লাগায় বিষম টান। দুজনে লেগে যায় কুস্তি। তারপরে একবার মংলু নীচে একবার কালা নীচে। মাঝে মাঝে কালার নখের ঘায়ে মংলুর গা ছড়ে যায়। মংলু তখন কালার কাঁধ ধরে তার পায়ে নীচে হাত চালিয়ে দিয়ে তাকে এক বিষম আছাড় মারে। কালা কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লাফিয়ে উঠে দুই থাবা দিয়ে মংলুকে সজোরে ঠেলা মারে। মংলু গড়াতে গড়াতে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে।

গুহার মুখে বসে নালুখ কখনও বলে—সাবাস কালা!

কখনও বলে—সাবাস সাবাস মংলু।

সাবাস্ কালা! সাবাস্ মংলু!

পৃষ্ঠা ২৫৪

কুস্তির মধ্যেই কখনও হয়ত তারা দেখে একটা রং চঙে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে।

মংলু বলে—ওভাই ওই দেখ একটা প্রজাপতি

কালা বলে ওঠে—কই কই ?

—ওই যে !

তখন কালা আর মংলু আর তুই ভাল্লুক ছানা ধর ধর করে প্রজাপতির পেছনে ছোটে। কিন্তু বাতাসের প্রজাপতিকে তারা ধরতে পারবে কেন ? খানিকটা ছোটাছুটিই সার। তবু তাদের বেশ মজা লাগে। খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে হাঁফাতে হাঁফাতে তারা আবার গুহার মুখে ফিরে আসে। নালুখ বলে—চল যাই নদীর ধারে, খাবার জোগাড় দেখিগে।

নালুখের পেছু পেছু মংলু আর ভাল্লুক ছানারা বেড়িয়ে পড়ে।

ভাল্লুকরা সাধারণতঃ ফলমূল মধু খায়। মাঝে মাঝে মাংসও যে শিকার করে খায় না তা নয়। মংলু কিছু দিন কাঁচা মাংস খেয়ে দেখেছে। কিন্তু মোটের ওপর কাঁচা মাংস তার ভাল লাগে না। তার নানা রকম ফল, মধু বাদাম ইত্যাদি খেতেই ভাল লাগে। বনে এগুলো কোনটারই অভাব নেই।

নালুখ পথে যেতে যেতে তাদের নানা জিনিস শেখায়। হয়ত কোথায় একটা ঘাসের ডগা বাতাসে নড়ে উঠল। নালুখ অমনি থমকে দাঁড়াল ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্যে। কারণ বনে সামান্য একটু স্পন্দন, সামান্য একটু শব্দেরও একটা মানে আছে। প্রথম প্রথম মংলু অতটা খেয়াল করত না। একদিন অমনি তারা বেরিয়েছে। খেলা লোভী মংলু একধারে ছুটকে এগিয়ে গেছে। তার পায়ের কাছে খানিকটা ঘাস নড়ে উঠল। মংলু খেয়াল করে নি। খেয়াল হোল যখন কেউটের মাথাটা ফোঁস করে তার সামনে গর্জ্জে উঠল। একেবারে সামনেই সাক্ষাৎ যম। সাপের মাথাটা হিস্‌স্ করে ছলে পেছিয়ে গেল। তখন আর পালাবারও সময় নেই কারণ সাপের ছোবল তখন পড়ছে। কিন্তু বনে গড়ে ওঠা ভাল্লুকদের মংলু অদ্ভুত ক্ষিপ্র। সাপের ছোবলটা তার বুকে পড়ার আগেই বিদ্যুতের মত তার একটা হাত খপ্ করে সাপের মাথাটা বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরল ! সে মুঠ ছাড়াবার সাপের সাধ্যি নেই যতই কেন সে ছপটির মত লাফিয়ে উঠে মংলুর হাতে পাকাক না কেন। নালুখ ততক্ষণে এসে পড়েছে। সে দেখেই বলে উঠল—খবরদার মংলু ছাড়িস নি। মুঠো চেপে ধরে সাপের মাথাটা ওই পাথরে ঘস্। মংলু নালুখের কথা মত সাপের মুণ্ডুটা পাথরে ঘসতে সুরু করল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কেউটে সাবাড়।

মংলু লাফিয়ে উঠে আকাশে মুখ তুলে হুঙ্কার ছাড়ল। শত্রু জয় করে বনকে জানিয়ে দিতে হয় এটা বনের নিয়ম।

আর সেই থেকে মংলু শব্দ চিনতে শিখল। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি পাতার মর্ম্মর, প্রত্যেক ঘাসের ডগাটির উপর গরম রাতের উষ্ণ শ্বাস, প্যাঁচার ডাকের প্রতিটি স্বরভঙ্গী,—গাছের বাকলে বাদুড়ের ডানার প্রতিটি মৃদুতম আঁচড়ও মংলুর কাছে অর্থময় হয়ে উঠল। নদীর জলে মাছের লাফ, বাঘের পায়ের সামান্য শব্দ, শেয়ালের হাঁচি, সজারুর কাঁটা ঝাড়া কিছুই তার কাছে গোপন রইল না। প্রতিদিন বনের প্রতিটি রহস্য তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যেতে লাগল।

অবশ্য এ সবের সমস্ত কৃতিত্ব নালুখের। সে এমন করে কোন ভাল্লুক ছানাকে শেখায় নি। কারণ ভাল্লুকদের অতশত দরকার হয় না। কিন্তু মংলু মানুষের বাচ্চা, ভাল্লুকদের চেয়ে তার সাধারণ ঔৎসুক্য অনেক বেশী। দিন কেটে যেতে লাগল। কখনও শান্ত শিথিল অলস দিন, কখনও ক্ষিপ্র, অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দিন।

মোটের উপর ভাল্লুকদের মংলু এই বন্য জীবনে বেশ খাপ খেয়ে গেল। সে তখনও জানে না যে মানুষ বলে কোন জানোয়ার কোথাও আছে বা কি তাদের জীবন। সে জঙ্গলের জানোয়ারদের জীবন দেখেছে। ভাল্লুকরা কি করে, চীল কি করে ছোঁ মারে। সাপ কেমন করে ব্যাঙ ধরে, বাঘ কি করে সম্বর শিকার করে। এ সমস্ত জীবনের একটা সঙ্গতি আছে। সরল অনাড়ম্বর ও প্রয়োজনীয়।

সেদিন ভাল্লুকদের সাথে মংলু নদীর ধারে গেছে। ভাল্লুকদের মাছ ধরা বেশ দেখবার জিনিস। পাথরের ছোট ছোট টিলায় টিলায় নাচতে নাচতে পাহাড়ে নদী ছুটে চলেছে। রূপোলি জলে সূর্য্যের আলো ঝিকমিক। মাঝে মাঝে দু' একটা মাছ জলে লাফিয়ে উঠছে। নালুখ দূর থেকে তাই দেখে বলল—মাছের ঝাঁক চলেছে নদী বেয়ে, চল কালা মাছ ধরিগে। ভাল্লুকরা চুপি চুপি নদীর পাড়ে এসে জলের ওপর মুখ বাড়িয়ে বসল। তখন তাদের দেখে মনে হোতে পারত যে এরা যেন কিছুই জানে না, এমন বোকা জানোয়ার বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু মাছের ঝাঁক যেই সেই কিনারাটা দিয়ে যেতে গেছে অমনি অত্যন্ত সহজে নালুখের মুখটা জলে ডুবেছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছ তার মুখে উঠে এসেছে। তাই দেখে মংলুর কি হাততালি।

একবার একটা বড় মাছ নালুখের মুখ থেকেই ঝটপট করতে করতে পালিয়ে গেল। নালুখ ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে মাছটাকে ধরতে গেল। কিন্তু হাজার হোক ডাঙ্গার প্রাণী জলে জলের মাছকে ধরতে পারবে কেন?

মংলু কিন্তু ব্যাপার দেখে অবাক। সে নালুখকে জিগেশ করল—বাঃ জলে পড়ে তুমি ডুবে গেলে না?

নালুখ বলল—না, ডুবব কেন। জলে কি কেউ ডোবে কাছিমে না কামড়ালে?

—আমি কিন্তু ডুবে যাব

নালুখ বলল—কই দেখি

এখন ভয় বলে কোন জিনিস মংলুর ছিল না। নালুখ বলা মাত্র মংলু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাল্লুকদের যদিও সাঁতার শেখাতে হয় না তারা অনুভূতির বলে আপনি শেখে। মংলুর বেলা কিন্তু নালুখ খানিকটা ব্যাপার আন্দাজ করে ছিল। তাই মংলুর সঙ্গে সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মংলু এদিকে জলে পড়েই হাবুডুবু। সে আঁকুপাকু করতে সুরু করল। কয়েক ঢোঁক জল খেল তখনও নালুখ তাকে কোন সাহায্য করল না। তারপরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বশে মংলুর হাত ক্রমে জলকে নীচের দিকে ঠেলতে লাগল, আর দুপায়ে ঝুপঝাপ। মংলু কোনরকমে মাথাটা জলের ওপর ভাসিয়ে তুলে দম নিতে পারল। তখন নালুখ তার একটা থাবা মংলুর পেটের তলায় দিয়ে তাকে তুলে ধরেছে। মংলু জল থেকে মাথা তুলে একমুখ জল ছেড়ে বলল—হুস্! বাব্বাঃ!

নালুখ বলল—প্রথমটা ওরকম বোকামি করলি কেন? হ্যাঁ এইবার ঠিক হচ্ছে। সাবাস সাবাস মংলু।

নালুখ তার পেটের তলা থেকে থাবাটা সরিয়ে নিল। দুজনেই তখন স্রোতে ভেসে চলেছে।

নালুখ বলল—চল ওই দিকের ডাঙ্গায় উঠি। না উল্টো দিকে নয়, স্রোতে পা ভাসিয়ে দে। মংলু ঝুপ ঝুপ করে সাঁতার কাটতে কাটতে, স্রোতে ভেসে কূলের দিকে এগিয়ে চলল।

এমনি করে মংলু প্রথম সাঁতার কাটতে শিখল। তারপরে দিনের গতির সঙ্গে সাঁতারে সে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠল যে ক্রমে নালুখও তার কাছে হার মানতে সুরু করল জলে।

সেদিন দুপুরে সমস্ত বন বিশ্রামে শান্ত অলস। দূরে গারো পাহাড়ের মাথার ওপর রোদে গরম একটা বাষ্প ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে যাচ্ছে। বাবুই তার তৈরী বাসার গরবে থেকে থেকে গলা বাড়িয়ে ডেকে উঠছে—কুক্ কুক! জলার ওপর নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়ে মাছরাঙা চোখ বুজে স্থির। তার সকালের মত মাছধরা শেষ। তাই মাছেরাও অবসর বুঝে থেকে থেকে জলার ওপর ছিটকে লাফিয়ে উঠছে। জলসিক্ত তার রূপোলি দেহে আলোর ঝকমকি।

ভাল্লুকরা গুহার সামনে শাল গাছের তলায় বসে ঝিমুচ্ছে, জানোয়াররা বিশ্রামের মূল্য

জানে। মংলু ভাল্লুক মায়ের বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় দুপুরের সেই নিস্তব্ধ অলসতা কাঁপিয়ে, আকাশে চীলের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

ভাল্লুক মা ওপরে তাকাল।

চীল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে। দুই পাখা সে ভাসিয়ে দিয়েছে বাতাসে।

—ভাল্লুকদের জয় হোক! শিকার টিকার ভাল জুটুক। ভাল্লুক গিন্নী বলল—কি গো চিল, কি খবর?

—খবর শুনে এলাম।

চীল এসে শালের মাথায় বসল।

ভাল্লুক গিন্নী বলল—কি কি?

"—কালকেতু শেয়ালকে বলছে "তোর কথায় মংলু টিকটিকিকে শিকার করতে গিয়ে একদিন প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু সে অপমান আমি ভুলিনি। তখন মংলু ছিল শেয়ালদের খাবার উপযুক্ত। এখন সে বড় হয়েছে। সে এখন বাঘের শিকার।"

তারপরে? ভাল্লুক মা বলল।

'—শেয়াল বলল "সাবাস দাদা! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভুলেই গেছ। ওই মানুষের ছানাটা যে জানোয়ারদের মত নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়ায় এ দেখে আমার গা জ্বালা করে।"

'বাঘ বলল—"হুঁ! দেখা যাক!"

ভাল্লুক গিন্নী নালুখকে ঠেলা দিয়ে বলল—শুনছ গা?

নালুখ ঝিমুতে ঝিমুতে জবাব দিল—হুঁ!

চিল বলল—খুব সাবধান ভাল্লুক গিন্নী, খুব সাবধান!

কালকেতু মোটেই সুবিধের জানোয়ার নয়!

চিল আবার চীৎকার করে আকাশে উঠে ডানায় ডানায় কালো একটা ফোঁটা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

সাত বছর পরে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জীবনকে রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ষ্টেশনথেকে তার যাত্রা আরম্ভ, কোনো বিশেষ ষ্টেশানে তা' শেষ। মাঝে পড়ে আছে কত অরণ্য আর মরুভূমি আর নদী; কত বৈচিত্র, কত রহস্য।

অতীতের লুপ্ত ইতিহাসের ভেতর স্মৃতির ডুবুরিকে পাঠিয়ে দিলে খালি হাতে কখনই সে ফিরে আস্‌বে না। সব সময়ে মণি-মুক্তো না পাওয়া যাক, এমন কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যা কোনো বর্ষা সন্ধ্যায় চা-চপ্ সহযোগে অন্যদের শোনানো যায়।

হঠাৎ এই সব খাপছাড়া কথার অবতারণার কারণটা বলি। আমি বর্ত্তমান এক প্রৌঢ় অজীর্ণরোগী বাঙালী উকিল। কি রকম পসার জমেছে সে কথাটা না হয় নেপথ্যেই রইলো; কিংবা, যদি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হই তা হলে, একটু ঘুরিয়ে বল্‌লেই এক রকম বোঝা যাবে; সব দিন ট্রাম-বাসের 'চিপ-মিডডে-ফেয়ার'ও জোটে না।

এই যে আমি, এই আমার জীবনেও একবার অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক আমার জীবনে অবশ্য ঘটে নি, আমি ছিলুম একজন দর্শক মাত্র—ঠিক দর্শকও নয়, ছিলুম উক্ত ঘটনার একজন সাক্ষী। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, সবটা শুন্‌লেই বুঝতে পারবে।

য়ুনিভারসিটির গণ্ডী পেরিয়ে সবে তখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছি। ছাত্রাবস্থায় ছিলুম একজন নামজাদা খেলোয়াড় তাই কর্ম্মজীবনের সূচনায় সেই নিটোল স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি সংগ্রহ করে উন্নতির স্বর্ণাভ শিখরের জন্যে যাত্রা সুরু করেছিলুম। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত বিপুল উৎসাহে খাটতুম। শুধু সন্ধেগুলো নিজের জন্যে পাওয়া যেতো, খেলোয়াড়ী সবল মন তখন জেগে উঠতো, তাকে শান্ত করার জন্যে নির্জ্জন দম্‌দম রোড ধরে অনেকখানি বেড়িয়ে আস্‌তুম। সমস্ত দিনের কাজের আবর্জ্জনার ভার সেই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে ফুস্‌ফুস্ থেকে নেমে যেতো। এই রকমেই বেড়াবার পথে একদিন অর্জ্জুণের সঙ্গে আমার আলাপ আর তার মাস দুই পরে আমার জীবনে আসে সবচেয়ে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা।

সবে তখন শীত পড়তে সুরু হয়েছে। সন্ধেগুলো শিরশিরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নির্জ্জন পথ দিয়ে হন্‌হন্ করে একা এগিয়ে চলেছি। মহানগরীর অক্টোপাস এদিকটায় ক্রমশঃ

এগিয়ে আস্‌ছে। বেশ বোঝা যায় আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই নির্জ্জনতাপ্রিয় লোকদের কর্ম্মক্লান্ত ফুস্‌ফুসের আবর্জ্জনার ভার নামাবার জন্যে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করতে হবে!

শীতের সূচনায় সেই সন্ধ্যায় কিন্তু বসন্তের হাওয়া বইছিল। পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ, জ্যোৎস্নার নীল আলো আকাশ চুঁইয়ে আশেপাশের গাছের ডালপালা বেয়ে নির্জ্জন পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। আর না এগিয়ে এবারে ফেরার জন্যে ফিরে দাঁড়ালুম।

কি অদ্ভুত পরিষ্কার রাত! গতিকে শ্লথ আর দৃষ্টিকে আল্‌গা করে ধীরে ধীরে আবার চল্‌তে সুরু কর্‌লুম। হঠাৎ একটা বাড়ী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। বস্তুতঃ বাড়ীটার পাশ দিয়ে আগে অনেকবারই আসা-যাওয়া করেছি। কিন্তু দিনের আলোয় যা ভালো করে চোখে পড়ে না, আজ রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারে তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বিরাট বাড়ী। রাস্তা থেকে খানিক পেছিয়ে নিজের বাগানের ভেতরে তা' স্তব্ধ, নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবার দেখলেই বোঝা যায় কোনো বিলাসী ধনীর এটা বাগান-বাড়ী ছিল এককালে। তার বাগান পথ আর দেয়াল ইত্যাদি দেখলে সহজেই বোঝা যায় তাকে যত্ন করার জন্যে কেউই এখন আর নেই। একটা করুণ ছন্নছাড়া ভাব তার সর্ব্বাঙ্গে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলুম হঠাৎ বিশেষ একটা ঘটনায় আমার চিন্তারস্রোত অন্য দিকে মোড় ঘোরালো।

কিছু দূরে একটা মোটারকার ঝড়ঝড় শব্দ করতে করতে এগিয়ে আস্‌ছিল, তার সামনেই দেখতে পেলুম একটা চলন্ত সাইকেলের কম্পিত হল্‌দে আলো। পথে শুধু তারাই ছিল চলমান বস্তু, (অবশ্য নিজেকে বাদ দিয়ে)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও তাদের ধাক্কা লাগল! দোষটা অবশ্যই সাইকেল আরোহীর, মোটরকারটার সাম্‌নে কেনো যে সে হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আস্‌তে গেল, তা বোঝা শক্ত। ব্রেক করে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল, পথের একপাশে সাইকেল আরোহী ছিট্‌কে পড়েছে। এক দৌড়ে ঘটনাস্থলে চলে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ ঘটল একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। মোটর চালক আলোগুলো নিভিয়ে সশব্দে গিয়ার বদলে অকস্মাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। বোধ হয় সে আমাকে স্থানীয় পুলিশ বলে ভুল করেছিল।

গায়ের ধূলো ঝেড়ে লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌ল, তারপর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে আবার বসে পড়ল।

তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলুম, "খুব লেগেছে কি? কোথায়?"

"হ্যাঁ...না-না, তেমন কিছু নয়, এই আমার গোড়ালির কাছটায়, সামান্য"

যন্ত্রনায় ভদ্রলোকের কপালটা কুঁকড়ে উঠল, "কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে বেশ। আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেবেন কি? উঃ..."

আমার হাতটা ধরে কোন রকমে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু একটা পা শূন্যেই রয়েছে। "এটা মাটিতে নামাতে পার্‌ছি না" আমার কাঁধে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। বয়েস খুব বেশী নয় তার রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট আর বড় চোখ দুটোর ভীতু দৃষ্টি দেখলেই তার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ থাকে না।

"কোথায় থাকেন?"

"এইখানে।" সেই স্তব্ধ অন্ধকারময় বিরাট বাড়ীটার দিকে সে আঙুল দেখালো। "বাড়ী পর্য্যন্ত আমায় নিয়ে যাবেন কি?"

"নিশ্চয়।" সাইকেলটাকে বাড়ীর বাগানের একধারে রেখে এসে তাকে নিয়ে চল্‌লুম। কোথাও একটুও আলো নেই। সিঁড়িগুলো পেরিয়ে আমরা বিরাট্ হল-ঘরটায় এলুম। এখানকার নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে চাইলে মনেই হয় না কেউ এখানে কোনকালে ছিল।

"ডানদিকের দরজা দিয়ে যেতে হবে", ভদ্রলোক বল্‌লো। হাৎড়াতে হাৎড়াতে আমরা আর একটা ঘরে এলুম। টেবিলের ওপর কোরোসিনের একটা বাতি ছিল। সেটা জ্বালিয়ে সে বল্‌ল "এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ কর্‌ছি। আপনি যেতে পারেন, বহু ধন্যবাদ।" ভদ্রলোক আরাম কেদারাটায় এলিয়ে পড়ে' একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলো!

আমার অবস্থা তখন যে কি রকম শোচনীয় ধরণের অসহায়, সহজেই তা' অনুমেয়। রক্তহীন ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, মুখের রঙ্‌ও বিভৎস শাদা। প্রথমে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বুঝি বা মারাই গেলো! কারুর কাছে সাহায্য পাবার জন্যে ঘরের বাইরে এসে সেই অন্ধকারেই বার কয়েক চীৎকার কর্‌লুম, "বেয়ারা বেয়ারা" কিন্তু নিরুত্তর নিস্তব্ধতা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল না এই বিরাট বাড়ীটায় আর কেউ থাকে! আমি আরো কয়েকবার ডাকাডাকি কর্‌লুম, অপেক্ষা কর্‌লুম আরো খানিক, কিন্তু সেই নির্ম্মম অন্ধকারে জীবনের কোন মর্ম্মরই জাগল না। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে একলা ফেলে আলোটা নিয়ে আমাকে বেরুতে হল সাহায্যের জন্যে।

ঘরের বাইরে এসে কিন্তু বিস্মিত হলুম। হল ঘরটা খালি, দোতালায় ওঠবার সিঁড়িটায় কারপেট নেই, অনেকটা পুরু হয়ে ধূলো জমেছে তার ওপর। এগিয়ে চল্‌লুম। প্রত্যেকটা ঘরেই সেই এক ধরণের অসহায় রূপ। দেয়ালের কোনে কোনে কত বছর ধরে মাকড়সাদের জালগুলো পুরু হয়ে উঠেছে কে জানে! একটা বিচ্ছিরি স্যাঁৎসাঁতে গন্ধ। কতকাল ধরে এই দীর্ঘ অসহায় নির্জ্জন ঘরগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু এ বাড়ীতে আর

কেউ যে থাকে তার সামান্যতম ইঙ্গিতও পেলুম না! আর একটা বারান্দায় এসে পড়লুম, এটা শেষ হয়েছে বিরাট একটা তামাটে দরজার কাছে। দর্‌জাটা তালা বন্ধ এবং সেই বন্ধ তালার ওপর লাল গালা দিয়ে শিলমোহর করে দেওয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন ধরে এটা ঐ রকমভাবে পড়ে রয়েছে কারণ ধূলো জমেছে প্রচুর আর লাল গালার রঙটা বদ্‌লে গিয়েছে। তখনো আমি কৌতূহলী হয়ে চেয়ে ছিলুম দর্‌জাটার দিকে, এমন সময় আচমকা একটা আর্ত্তনাদ বাতাসে ভেসে এলো। এক দৌড়ে সেই আগেকার ঘরটায় চলে এসে দেখি ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং কোনোখানে আলোর চিহ্ন নেই দেখে সে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছে খুব।

"আলোটা নিয়ে কেনো আপনি বাইরে গিয়েছিলেন?" রুক্ষ গলায় ভদ্রলোক প্রশ্ন কর্‌লো।

"আমি সাহায্য পাবার জন্যে বাইরে গিয়েছিলুম।"

"আপনার বোঝা উচিত ছিল এখানে আমি একাই থাকি।"

"খুবি খারাপ কথা। যদি হঠাৎ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন?"

"তা ঠিক! এ' রকম আচম্‌কা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে। মা'র কাছ থেকে এই ধরণের দুর্ব্বল হার্ট পেয়েছি! সামান্য উত্তেজনা বা যন্ত্রনাতেই এ রকম প্রতিক্রিয়া আমার ওপর হয়। কিছুদিন এখন এ' রকম অসুস্থতায় কাট্‌বে, তাঁর যেমন কেটেছিল—কিন্তু আপনি কি ডাক্তার?"

"না উকিল—শৈলেশ চৌধুরি আমার নাম।"

"আমার নাম অর্জ্জুন রায়। কিন্তু অদ্ভুত, একজন উকিলের সঙ্গে এ'ভাবে আমার আলাপ হওয়া। কারণ আমার বন্ধু নির্ম্মল বল্‌ছিলেন শীগগিরিই একজন উকিলের সাহায্য আমাদের লাগবে।"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমি সাহায্য করব।"

"কিন্তু নির্ম্মলবাবুর ওপরেই সব কিছু নির্ভর কর্‌ছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি কি আলো নিয়ে একতলার সমস্ত ঘরগুলোয় ঘুরেছেন?" উত্তেজনায় তার চোখ দুটো চক্‌চক্ কর্‌তে লাগল।

"হ্যাঁ।"

"সব ঘরেই?" মানসিক উত্তেজনাকে দাঁতের মধ্যে পিষে ফেলে আবার সে জিগগেস্ কর্‌লো।

"আমার তো তাই মনে হয়। আশা করে ছিলুম, কারুর দেখা..."

বাধা দিয়ে অর্জ্জুন বল্‌লো, "সব ঘরের মধ্যে কি আপনি গিয়েছিলেন?" সেই তীক্ষ্ণ চক্‌চকে চাউনি আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ছড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ, যে সমস্ত ঘরে যাওয়া সম্ভব।"

"ওঃ,তা' হলে তো নিশ্চয়ই আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন।" সে অবসাদে ভেঙ্গে পড়লো।

"লক্ষ্য? কি?"

"কেনো, সেই শিল-মোহর করা দরজাটা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি বটে।"

"ভেতরে কি আছে জান্‌তে কৌতূহল হয় নি আপনার?"

"কতকটা; মানে কি রকম অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, এই পর্য্যন্ত।"

"আপনি কি বছরের পর বছর এ' বাড়ীতে একা থাক্‌তে পারেন? অপেক্ষা করে থাক্‌তে পারেন কি সেই দিনের জন্যে যে-দিন ঐ বন্ধ ঘরের রহস্য জান্‌বার জন্যে তালাটা খুল্‌তে পার্‌বেন?"

"আপনি কি বল্‌তে চান ও ঘরে কি আছে জানেন না?" উত্তেজিত হয়ে আমি প্রশ্ন কর্‌লুম।

"না, আপ্‌নার চেয়ে বেশী কিছুই জানি না।"

"কিন্তু কেনো আপনি চেষ্টা করেন নি জান্‌তে?"

"বারণ আছে!" ক্লান্তি ও উত্তেজনা মিলিয়ে অর্জ্জুণবাবুর গলার স্বরটা কি রকম যেন ফিস্‌ফিস্ করে উঠ্‌ল।

এতোক্ষণে মনে হ'ল অন্য লোকের গোপনীয় খবর জান্‌বার কৌতূহল অনেক আগেই আমার চেপে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক্, অর্জ্জুন যখন সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তখন আর অনর্থক দেরী করার মানে হয় না। তাই আমি দাঁড়িয়ে উঠে বিদায় চাইলুম।

"আপনার কি তাড়াতাড়ি আছে?"

"না; এখন আমার কোনো কাজ নেই।"

"আরো কিছুক্ষণ এখানে থাক্‌লে বিশেষ আনন্দিত হব। আমার মত নির্জ্জন নিঃসঙ্গ জীবন আর কেউ কাটায় বলে মনে হয় না।"

বসে পড়ে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লুম। আস্‌বাব পত্র বিশেষ কিছুই নেই। এই বিরাট রিক্ত বাড়ীটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগ্‌ল: মাকড়সার জাল আর পুরু ধূলির প্রলেপ আর সেই বন্ধ দর্‌জাটা!

"শৈলেশবাবু, ক্ষমা করবেন, আমার শরীর অসুস্থ বলে কিছুই অতিথেয়তা করতে পারছি না। ঐখানে সিগারেটের টিনটা আছে, কষ্ট করে যদি নিয়ে আসেন! —হ্যাঁ; আপনি তাহলে উকিল?"

"হ্যাঁ।"

"আর আমি? কিছুই না।—একজন ক্রোড়পতির হতভাগ্য ছেলে! বিলাসিতার মধ্যে আমার শৈশব কেটেছে, কিন্তু এখন দেখতেই পাচ্ছেন: গরীব; না আছে চাকরি না আছে স্বাস্থ্য। ঐ বাড়ীটা যদিও আমার, তবু একে যত্ন করে রাখার মত সামর্থও আমার নেই। এটা একটা ভয়ানক খাপছাড়া ব্যাপার নয় কি?"

"কিন্তু এ'কে বিক্রী করে দেন না কেন?"

"বারণ আছে।" আবার সেই অসহায় স্বর।

"তা হলে ভাড়া দিন।"

"না, তা-ও অসম্ভব।"

আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলুম আর আমার নতুন বন্ধু ফিকে দুর্ব্বল হাসতে লাগলো।

"আপনি যদি বিরক্ত না হ'ন সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বলি।"

"বিরক্ত? নিশ্চয়ই নয়। সব ব্যাপার জানতে আমার তো অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।"

কোনো ভূমিকা না করেই ভদ্রলোক বললো, "আমার বাবার নাম হয়তো শুনে থাকবেন —নীরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যাঙ্কার।"

আমি চমকে উঠলুম! নীরেন্দ্রনাথ রায়? বছর ছ'-সাত আগে হঠাৎ তাঁর গা-ঢাকা দেওয়াটা সমস্ত সমাজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

"আপনার মনে আছে দেখছি," অর্জ্জুন রায় বলে চললো, "হ্যাঁ, বাবাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর ব্যাঙ্কের টাকা তিনি যে স্পেকুলেশানের জন্যে খরচ করেছিলেন তা প্রথমে সফল হয় নি। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই দুর্ঘটনা তাঁর বিচার-শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। আইনত তিনি কোনো অপরাধ করেন নি। কিন্তু লজ্জায় আর অনুশোচনায় কারুর কাছেই তিনি মুখ দেখাতেন না, এমন কি আমাদের সামনে আসতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন।—বিদেশে অপরিচিত লোকদের ভেতর তিনি মারা গেছেন, কিন্তু কখনই তিনি জানান নি, কোথায় আছেন।"

"তিনি মারা গেছেন?" চমকে উঠে আমি জিগগেস করলুম।

"তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু আমরা জানি এ' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না

কারণ, তিনি যে স্পেকুলেশান করেছিলেন তা' আবার সফল হয়েছে। এখন তো তাঁর আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থাকলে নিশ্চই তিনি ফিরে আসতেন। কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে তিনি মারাই গিয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে কেন?"

"কারণ, তাঁর শেষ চিঠি আমরা দু' বছর আগে পেয়েছিলুম।"

"তিনি কোথায় আছেন সে কথা কি জানান নি তা' হলে?"

"চিঠিটা রেঙ্গুণ থেকে এসেছিল। কিন্তু কোনো ঠিকানা ছিল না। আমার মা তখন সবে মারা গিয়েছেন। চিঠিতে কতকগুলি উপদেশ ও ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা ছিল। সেই শেষ চিঠি।"

"এর আগেও কি খবর পেতেন তাঁর?"

"ও, হ্যাঁ, আগেও তাঁর চিঠি পেয়েছি, এবং সে চিঠিতেই ওই বন্ধ ঘর সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত পাই। ওই সুটকেশটা আমার দিকে এগিয়ে দেবেন কি?—ধন্যবাদ। এটাতেই আমার বাবার চিঠিগুলি আছে। নির্ম্মলবাবু ছাড়া আপনিই প্রথম বাইরের লোক যিনি এ' চিঠি পড়ছেন।"

"নির্ম্মলবাবুকে আমি কি জিগগেস্ করতে পারি?"

"তিনি আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন এককালে। তারপর থেকে আমাদের সংসারের পরামর্শদাতা এবং বন্ধুই তিনি এখন। নির্ম্মলবাবু না থাকলে কি যে আমাদের হত, জানি না। তিনি ছাড়া এ' সব চিঠি আর কেউই দেখেন নি।—এইটা প্রথম চিঠি; বাবা যে দিন নিরুদ্দেশ হন. প্রায় সাত বছর আগে, ঐ চিঠিটা এসেছিল ঠিক তার পরের দিন। পড়তে পারেন ওটা।"

চিঠিটা তাঁর স্ত্রীকে লেখা। আমি পড়তে লাগলুম:

"—ডাক্তারের মুখে শুনেছি তোমার স্বাস্থ্য কি রকম খারাপ। সেজন্যে আমার ব্যবসার কথা কোনোদিনই তোমার সঙ্গে আলোচনা করিনি, পাছে অত্যধিক উত্তেজনার জন্যে আরো বেশী অসুস্থ হ'য়ে পড়। কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যা'তে তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ব্যবসার অবস্থা এখন বিশের খারাপ, সে জন্যে কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'বে। ঐ কারণে অনর্থক দুঃখিত বা চিন্তিত হয়ে তোমার স্বাস্থ্য আর খারাপ কোরো না।

"এখন যা' যা' বলি মন দিয়ে শোনো। যে অন্ধকার ঘরে আমি ফটোর কাজ করতুম সেখানে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যা' আমি কাউকে দেখাতে চাই না। কিন্তু নিশ্চিন্ত

থেকো, সে ঘরে এমন কিছু নেই যার জন্যে তোমরা লজ্জিত হ'তে পারো। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি চাই না তুমি কিংবা খোকা সে ঘরে যাও। সে ঘরে তালা লাগানো আছে, এবং আমার একান্ত অনুরোধ এ' চিঠি পাবার পরেই সেই তালার ওপর যেন গালা দিয়ে 'সিল্' করে দেওয়া হয়। ঐ বাড়ী বিক্রী কোরো না, বা ভাড়া দিয়ো না, কারণ তা' হলে সমস্তই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। খোকা যখন একুশ বছরে পড়বে তখন সে ঐ ঘরে আস্তে পারে, তার আগে নয়।

"নির্ম্মলের ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাকে সব কথা বল্তে পারো আর সময়ে-অসময়ে যে কোনো সাহায্য নিতে পারো। এখন বিদায়। ৭।১।১৭

নীরেন্দ্রনাথ রায়।"

অর্জ্জুন রায় চিঠিটা পড়া হয়ে যেতেই বল্লো, "আপ্নার সাহায্য দরকার হবে বলেই নিতান্ত গোপনীয় এই চিঠি দেখালুম।"

"আপনার বিশ্বাসের জন্যে আমি সম্মানিত," আমি বল্লুম, "এবং সমস্ত শুনে অত্যন্ত কৌতূহলীও হয়ে উঠেছি।

"আর দেখুন, বাবা ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাই যখন তিনি লিখেছেন যে আবার দেখা হ'বে এবং ওই বন্ধ ঘরে এমন কিছু নেই যার জন্যে আমরা লজ্জিত হতে পারি,—এ' কথায় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রাখা যেতে পারে।"

"কিন্তু তা' হলে আর কি হ'তে পারে?"

"সেইটাই তো মস্ত এক্টা ধাঁধাঁ— আমি কিংবা মা কেউই অনেক ভেবেও এর কোনো উত্তর পাই নি। তাঁর কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ঘরটায় তখন থেকেই সিল্ করে দেওয়া হয়েছে। মা'র হার্ট খুব দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু তবুও বাবার চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি আরো পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। মা, বাবার কাছ থেকে আরো দু'টো চিঠি পেয়েছিলেন তাঁর অদৃশ্য হ'বার প্রথম ক' মাসের মধ্যেই। সে দুটো চিঠিতেও একই কথা ছিল; শিগগীরই দেখা হবে। সে দু'টো চিঠিতেও রেঙ্গুনের পোষ্ট-অফিসের ছাপ ছিল। তারপর সব চুপ্‌চাপ্, যতদিন পর্য্যন্ত না মা মারা যান। তারপর এলো আমার নামে আর একটি চিঠি। এতো গোপনীয় ধরণের যে তা আপনাকে দেখাতে পারবো না। তবে তার প্রধান বক্তব্য ছিল এই, যে মা যখন মারা গিয়েছেন তখন আর ও ঘর বন্ধ রাখার অত বেশী প্রয়োজন নেই। তবে সে ঘরে এমন কিছু আছে যা প্রকাশিত হলে অনেকেই, বিশেষ করে আমি, অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ব। সে কারণে আমার একুশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ও ঘর না খুলি। ওই ঘরের সমস্ত ভারই আমার ওপর এসে পড়ল। অতএব বুঝ্তে

পারছেন, নিজের সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কেনো আমি এ-বাড়ী ভাড়া দিতে কিংবা বিক্রী কর্তে পার্ছি না। একে একে বাড়ীর আস্বাব-পত্র বিক্রী কর্তে হয়েছে, চাকরদেরও ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। —কিন্তু আর দু' মাস মাত্র আমাকে অপেক্ষা কর্তে হবে। তারপরই আমি বন্ধ-ঘরের রহস্য জান্তে পারবো।"

"কিন্তু হয়তো আপ্নার বাবা বেঁচে আছেন।"

"কখনই তা' হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই তিনি মারা গিয়েছেন। নইলে তো ফিরেই আসতেন।"

"কিন্তু তাঁর চিঠিগুলো আসে কি করে?"

"জানি না।"

"কেন তিনি ঠিকানা লুকিয়ে রাখ্লেন?"

"জানি না।"

"কেনো আপনার মা'র মৃত্যুর সময়েও তিনি এলেন না?"

"জানি না।"

সেই অল্প আলোয় ভরা ঘরে আমরা দু'জনে অনেক্ষণ চুপ্‌চাপ্ বসে রইলুম। তারপর নিজের ঠিকানা তাঁর কাছে রেখে বিদায় নিলুম।

সেদিন সকালে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা কর্তে এলেন, উক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে। ইতিমধ্যে নানা কাজের চাপে অর্জ্জুন রায়ের কথা প্রায় ভুলেই এসেছি।

ভদ্রলোকের নাম নির্ম্মল লাহিড়ী; ছোট্ট বেঁটে লোক, তামাটে রঙ্, শুক্‌নো চাম্‌ড়া, কিন্তু চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল।

"অর্জ্জুনের কাছে বোধ হয় আমার নাম শুনে থাক্‌বেন।" নমস্কার করে ভদ্রলোক আমাকে বল্লেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।"

"সে তার বাবার অদৃশ্য হওয়ার খবর আপনাকে বলেছিল, আর সে বন্ধ ঘরের কথাটাও। আপনি বলেছিলেন সাহায্য কর্‌বেন। ভুলে যান নি বোধ হয়।"

"নিশ্চয়ই না," জোর দিয়ে আমি বলে উঠলুম।

"আজ অর্জ্জুনের জন্মদিন, সে একুশ বছরে পড়্‌ল।"

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, "ঘরটা কি খোলা হয়েছে?"

"এখনো নয়," গম্ভীর গলায় ভদ্রলোক বলে চল্লেন, "আমার মনে হয় একজন সাক্ষীর এক্ষেত্রে দরকার। আপনি একজন উকিল এবং ঘটনার বিবরণও জানেন। আপনি কি দয়া করে এ' বিষয়ে সাহায্য কর্‌বেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"সারাদিন আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। আমারও কাজ আছে। সন্ধ্যের দিকে কি সুবিধে হবে আপ্‌নার?"

"বেশ, সন্ধ্যের সময়েই যাবো।"

"বহু ধন্যবাদ। আমরা আপ্‌নার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বো।" আবার নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

সে দিন সমস্তক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তিকর উত্তেজনার মধ্যে কাট্‌লো। যাই হোক সন্ধ্যের মুখে আবার সেই বিরাট্ স্তব্ধ বাড়ীটায় এসে পৌঁছুলুম। সেই ছোট ঘরটায় নির্ম্মল লাহিড়ী আর অর্জ্জুন রায় আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। অর্জ্জুনের মুখ চোখ উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে আর সেই শুক্‌নো-চামড়া ছোট্ট লোকটিও অস্থির হয়ে সমস্ত ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

"চলুন, যাওয়া যাক্। এই অভিশপ্ত বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।" অর্জ্জুন রায়ের গলায় অস্বাভাবিক অসুস্থ উত্তেজনা।

সেই প্রৌঢ় লোকটি আলোটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লেন। আমরা চল্‌লুম পেছনে। সমস্ত বাড়ীটা আর তার বিরাট অসহায় ঘরগুলো মাকড়সার জাল বুকে নিয়ে যেন বিরাট একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্যে নিশ্বেস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সেই ঘরটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। প্রৌঢ় লোকটির হাত অস্বাভাবিক রকম কাঁপচে, আমাদের ছায়াগুলো দেওয়ালের ওপর দুল্‌ছে সেই অপ্রচুর আলোর কম্পনে।

"শোনো খোকা," ভাঙা গলায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক অর্জ্জুনকে বল্‌তে সুরু কর্‌লেন, "আমাদের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া ভালো।"

"কেনো, ভেতরে কি আর থাকতে পারে?" সাহস দেবার জন্যে আমি বল্‌লুম।

"তা তো আমাদের জানা নেই, তবে....তবে, তবুও আমাদের প্রস্তুত...হ্যাঁ, প্রস্তুত হওয়া উচিত যদি..." প্রত্যেক কথার মধ্যে তাঁকে থাম্‌তে হচ্ছিল, এবং শেষে হঠাৎ যেন আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তিন চুপ্ কর্‌লেন আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল; আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলুম ওই প্রৌঢ় শুক্‌নো-চামড়া ভদ্রলোকটি সমস্তই জানেন এবং ঘরের ভেতর নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য সাত বছর ধরে লুকিয়ে রয়েছে।

"এই নাও চাবি, কিন্তু খোকা প্রস্তুত হ'য়ে নাও।"

এক রকম ছিনিয়েই অর্জ্জুন রায় সেটা নিল। প্রৌঢ়ের হাত থেকে আলোটা নিয়ে আমি তালাটার ওপর ধরলুম। তালাটা ভাঙা হল, চাবিটা ঘুর্‌ল একপাক, খুল্‌ল তালা,

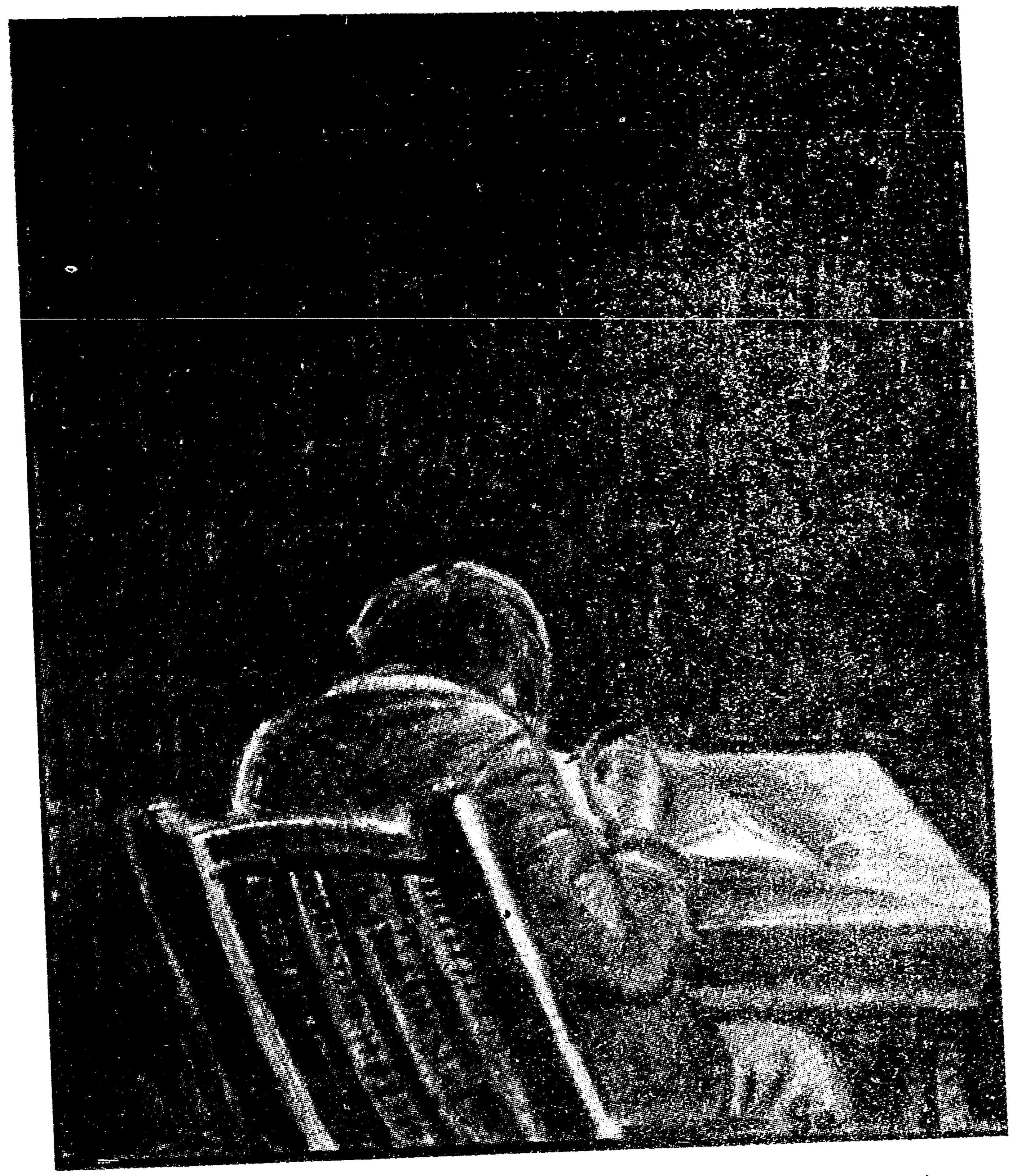

প্রথমে জীবন্ত বলেই মনে হয়েছিল পৃষ্ঠা ২৬৮

হুড়মুড় করে অর্জ্জুন রায় ঢুক্‌লো ঘরে, তারপরেই বিভৎস একটা চীৎকার আর অর্জ্জুন রায়ের জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আমার দেহ অত্যন্ত সবল ও সুস্থ না হলে অন্ততঃ আলোটা নিশ্চয়ই হাত থেকে পড়ে যেতো। ঘরটার কোনো জান্‌লা নেই, কতগুলো ফোটোগ্রাফির যন্ত্রপাতিতে ভরা। শেল্‌ফের ওপর নানা ধরণের ওষুধ পত্র; ঘরে সাত বছরের রুদ্ধ ভাপ্‌সা একটা গন্ধ। ছোট একটা টেবিল, তার সাম্‌নে একটিমাত্র চেয়ার আর সেই চেয়ারে আমার দিকে পেছন করে এক ভদ্রলোক বসে আছেন লেখার ভঙ্গীতে। প্রথমে জীবন্ত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ভালো করে আলোটা পড়তেই সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠ্‌ল: তাঁর গলার জায়গাটা কুঁক্‌ড়ে অস্বাভাবিক সরু আর কালো হয়ে গিয়েছে—পুরু হল্‌দে ধূলো জমে উঠেছে তার ওপর, সাত বছরের পুঞ্জিত ধূলো; ধূলো জমে উঠেছে তাঁর চুলে, তাঁর কাঁধে, তাঁর হাতে। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, কলমটা তখনও বিবর্ণ কাগজের ওপর রয়েছে ধরা।

"নীরেন বাবু নীরেন বাবু......," প্রৌঢ় ভদ্রলোকের গলা থেকে আর্ত্তস্বর বেরিয়ে এসে সেই সাত বছরের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, "নীরেনবাবু, নীরেনবাবু.."

"কি বল্‌লেন?" আমিও উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করল্‌ুম, "ইনিই কি নীরেনবাবু? অর্জ্জুনবাবুর বাবা?"

"সাত বছর ধরে এখানে ইনি বসে রয়েছেন! আমি কত তাঁকে বোঝালুম, কত বল্‌লুম, এমন কি পায়েও ধর্‌লুম, কিন্তু শুনলেন না তিনি কিছুতেই। টেবিলের ওপর এই যে চাবি দেখ্‌ছেন এই চাবি দিয়ে তিনি ভেতরের দরজাটায় তালা লাগিয়ে দেন। তিনি আরো কি লিখেছেন; এ' চিঠিটা আমরা বাইরে নিয়ে যাবো।"

"চিঠিটা শিগ্‌গীর নিয়ে বাইরে চলুন, ঈশ্বরের দোহাই; ঘরের বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে।"

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর আমি অর্জ্জুনকে ধরাধরি করে ছোট ঘরটায় নিয়ে এলুম। ক্রমশঃ তার জ্ঞান ফিরে এলো, "বাবা ঐ চেয়ারে বসে রয়েছেন। কিন্তু নির্ম্মলবাবু আপনি তো সব জান্‌তেন? সাবধান করে দেবার সময় এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আপ্‌নি!"

"হ্যাঁ খোকা, আমি জান্‌তুম। সাত বছর ধরে কি কঠিন অভিনয়ই না কর্‌তে হয়েছে আমাকে। সাত বছর ধরে আমি জানি তোমার বাবা ও ঘরে মরে পড়ে রয়েছেন!"

"এ' কথা জেনেও আপ্‌নি জানান নি কিছু! এ' চিঠিগুলো, এগুলো কি সব জাল?"

"তোমার বাবা নিজেই ওগুলো লিখে খামে বন্ধ করে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করেছি। নিজে প্রত্যেক চিঠি ডাকে দিয়েছি

রেঙ্গুনে গিয়ে।” নির্ম্মলবাবু খানিক চুপ করে ধীরে ধীরে আবার বলে চল্‌লেন, “তোমার বাবার দুঃসময়ের কথা তো সবই জানো। তিনি ভেবেছিলেন শুধু তাঁরই দোষের জন্যে অনেক লোককে অনেক টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। তাঁর মন এতো সরল এতো কোমল ছিল যে এ’ চিন্তা কিছুতেই সহ্য করার মত শক্তি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ’ চিন্তা তাঁকে এতোদূর বিচলিত করল যাতে তিনি আত্মহত্যা করাই ঠিক কর্‌লেন। খোকা, যদি তুমি জান্‌তে আমি কত অনুনয়, কত মিনতি করেছিলাম তা’ হলে কিছুতেই আমাকে দোষ দিতে না। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নড়ানো গেল না। এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর দু’চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। তিনি শুধু আমাকে বল্‌লেন আমি কি চাই না তাঁর মৃত্যু যাতে স্বস্তির হয়? আমার সাহায্য না পেলেও তিনি আত্মহত্যা কর্‌বেন এবং মৃত্যুর সময় একটা ভয়ানক অশান্তি নিয়ে যেতে হবে।—খোকা, আমার অসহায় অবস্থার কথা মনে কর, এক্ষেত্রে তাঁর শেষ ইচ্ছে আমি কি করে অপূর্ণ রাখি?” সেই শুক্‌নো চাম্‌ড়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির পঞ্চাশ বছরের পুরানো চোখে যে জলের ফোঁটাগুলো ফুলে উঠ্‌ল সে রকম বেদনার অশ্রু আর বুঝি তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে আসেনি!

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার তিনি সুরু কর্‌লেন, “তোমার বাবা জান্‌তেন তাঁর স্ত্রীর হার্ট কি রকম দুর্ব্বল। সে কারণে, যাতে তিনি কোনো রকম আঘাত না পান তার জন্যে আমার কাছে কতগুলো চিঠি আগে থেকেই লিখে রেখে গেলেন। চিঠিতে যখন তিনি লিখ্‌লেন শীগ্‌গিরই দেখা হবার কথা, তখন তোমার মা’র মৃত্যুর কথা ভেবেই লিখেছিলেন। কারণ তিনি জান্‌তেন যে তোমার মা ও রকম দুর্ব্বল হার্ট’ নিয়ে আর বেশী দিন বাঁচ্‌বেন না। তোমার মা’র মৃত্যুর পর তুমি যে চিঠিটা পাও সেটাও আমি নিজে পোষ্ট করেছি। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল তুমি যতদিন যথেষ্ট বড় না হও ততদিন তোমাকে যেন কিছু না জানান হয়। আজ তোমাকে তিনি নিজেই সব কথা জানালেন। তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে এই আঘাতের তীব্রতা যে কমে যাবে এ’ কথা তিনি ভালো করেই জান্‌তেন।”

তারপর সেই চিঠিটা পড়া হল, যেটা লিখ্‌তে লিখ্‌তে তিনি মারা গিয়েছেন ঃ

—এইমাত্র বিষটা খেয়েছি। তার ক্রিয়া শিরার ওপর আরম্ভ হয়েছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, খুব কষ্টকর নয় কিন্তু! এ’ চিঠিটা যখন পড়া হবে তার অনেক বছর আগেই আমি মরে গিয়েছি, যদি আমার শেষ ইচ্ছে ঠিকমত পালন করা হয়! খোকা, আমাদের এই পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। কে জানে, আমার জন্যে যাঁদের লোকসান দিতে হয়েছে এতোদিনে তাঁদের সেই অসন্তোষ কিছু কমেছে কিনা।

* একটি বিলিতি গল্প থেকে নেওয়া।

অবসর

কুমারী শিবাণী সরকার

আজ এই সকালবেলা,
নীল আকাশের তলে তলে শাদা মেঘের খেলা,
কেন, লাগলো আমার ভালো?
কেন অকারণ,
ইচ্ছা করে থাকতে চেয়ে কেবল সারাক্ষণ,
ওদের সাথে খেলা করে সকালবেলার আলো।

এদিক থেকে ওদিক কেবল নীল আকাশের তলে,
মেঘ ছুটে যায় দলে দলে।
দেয় না ওরা ধরা,
ওরা যেন মুক্তশিশু হাসিখেলায় ভরা,
সকালবেলার আলোর মাঝে রূপোর মত জ্বলে।

কোথায় সে কোন্ দূর,
কোথা হ’তে এল ওরা কোন্ সে রাজার পুর,
ছুটীর খবর নিয়ে হঠাৎ কখন এল ছুটে,
সকল বাঁধন টুটে,
বাক্য যেথায় স্তব্ধ শুধু সেথায় জাগায় সুর।

উদাস করে মন,
ওদের দেখে আকুল হ’ল কাশকুসুমের বন,
ওদের সুরে সুর মেশালো ভোরের শিউলীঝরা,
ওরা, মাতিয়ে তোলে ধরা।

আজ এই সকালবেলা,
দেখছি বসে নীল আকাশে শাদা মেঘের খেলা,
মুখের ‘পরে পড়ছে এসে সকালবেলার আলো,
লাগছে আমার ভালো॥

টি, বি সম্বন্ধে দু'একটী কথা

শ্রীসুজাতা রক্ষিত

যক্ষ্মা কেন হয় ? এই কথার উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে ডাক্তারেরা বলেন, শরীরে যদি জোর, পুষ্টি ও সহ্য করবার শক্তি বেশী থাকে তাহলে টি, বি বড় একটা হয় না। আবার দেখা যায় যে খুব ভাল স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ অসুখ হয়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে যে টি, বি কাহাকেও ছেড়ে কথা কয় না।

যক্ষ্মা বীজাণু হাওয়ার সঙ্গে, খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির সঙ্গেই মিশে আছে অথচ তার মধ্যে থেকে আমাদের বাঁচতে হবে ও সকলকে বাঁচাতে হবে কিন্তু কি করে ? সেটাই জানা উচিৎ।

অনেকেই হয়ত বলবেন্ ভাল জায়গায় বাস কর। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের যেরূপ অবস্থা তা'তে সবার পক্ষে ভাল জায়গায় বাস করা সুবিধা হ'য়ে ওঠে না। তবুও ওরই মধ্যে আমাদের বাস উপযোগী একটা বাড়ী দেখে নিতে হবে। প্রথমতঃ বাড়ীর দরজা, জানালা, আলো, বাতাস প্রভৃতি দেখে বাড়ী ব্যবস্থা করতে হবে কারণ এঁদো পল্লীতেই বেশীর ভাগ যক্ষ্মা হয়। তর্ক ওঠান যেতে পারে যে এঁদো পল্লীতেই বা কেন হবে আর ভাল হাওয়া বাতাস ও রোদযুক্ত স্থানেই বা কেন হবে না ? আজকালকার দিনে সকলেই বোধহয় জান যে যক্ষ্মা বীজাণুর পক্ষে পাঁচ মিনিটকাল রৌদ্রই যথেষ্ট অর্থাৎ যক্ষ্মা বীজাণুর রৌদ্রই হচ্ছে একমাত্র শত্রু। ধর কোন গলি দিয়ে টি, বি রোগী যাচ্ছে ও কাসতে কাসতে সেইখানেই খানিকটা গয়ের ফেলে দিলে অথচ সেখানে রোদ কখনই আসে না—তার কিছুক্ষণ পরে কোন ছোট ছেলের বল খেলতে খেলতে রাস্তায় সেই জায়গায় গিয়ে পড়ল—ছেলেটী কিছুই জানেনা, সে বল্‌টি তুলে নিয়ে এসে আবার খেলতে আরম্ভ করলো—কখনও মুখে, গায়ে দিচ্ছে আবার কখন বা সেটা খাবার জিনিসে গিয়ে পড়ছে। এই রকম করেই টি, বি বিস্তার লাভ করে।

বাড়ী ঠিক মত হ'ল ত এইবার খাদ্যের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিৎ। টি, বি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাব। আমরা (বিশেষ বাঙ্গালীরা) যা খেয়ে জীবন ধারণ করি তার মধ্যে বিশেষ কোন পুষ্টিকর জিনিস থাকে না।

যেরকম পরিশ্রম করতে হবে সেই অনুপাতে ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন কিন্তু দুঃখের বিষয় যেটুকু দরকার আমরা তার সিকি ভাগও খাইনা। ছোট মেয়েরা সকাল নটার সময় কোনও রকমে খেয়ে স্কুলে যায় আর আসে সেই বেলা পাঁচটার সময়—এই এতটা সময় এরা কিছুই খায় না অথচ পরিশ্রম সমানই হয়, তারপর বাড়ীতে এসে সামান্য কিছু খেয়ে আবার যায় মাঠে খেলা করতে ; খেলা অবশ্য খুব ভাল কিন্তু বেশ ভাল রকম পেটভরা থাকা চাই। যদি না খেয়ে ফের খেলা ধূলা করা যায় তাহলে ফল হয় উল্টা—শরীরের ক্ষয় হয় বেশী ও ফলে চেহারা হয় ফ্যাঁকাশে ও রোগা !

আমাদের দেশে টি, বি বেশীর ভাগ পেঁটে ও বুকেই হয় ; গ্ল্যাণ্ড ও হাড়ে ছোট ছেলেদেরই হয়—অনেক রোগ আছে যে বড়দের হয় যেমন—ক্যান্‌সার ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতি সেইরকম গ্ল্যাণ্ডও হাড়ে ছোটদেরই হয়।

হাড়ে হয় বটে তবে যেখানে সেখানে হয় না। চওড়া হাড় বা প্লেন হাড় সেখানে একেবারেই হয় না। হাড়ের জোড়ে জোড়ে হয় যেমন হাঁটুতে, পায়ের গাঁটে, হাতের ওপর দিকের জোড়ে, শিরদাঁড়া প্রভৃতি এইরকম জায়গায় হয়।

আমরা সাধারণতঃ টি, বি রোগী নামেই ভয়ে আঁতকে উঠি কিন্তু ভয় পাওয়াটা একেবারে অমূলক, ভয় পাবার কোন মানে হয় না। প্রথমেই বলেছি আকাশে, বাতাসে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সব জায়গায় টি, বি সব বীজাণু মিশে রয়েছে ও সময়ে খাদ্যে ও নিশ্বাসে শরীরের মধ্যে আমরা নিচ্ছি। তোমরা মনে মনে বিবেচনা করে দেখ যে যক্ষ্মা রোগীর দেহ থেকে যে ব্যারাম নেবার ভয় (ইনফেকসন্) থাকে যার জন্য আমরা ভয় করি সেত চব্বিশ ঘণ্টাই নিশ্বাসের সঙ্গে নিচ্ছি তবে আর তাকে ভয় কিসের ? ভয় যদি করতে হয় তাহলে আমাদের নিশ্বাস নেওয়াও বন্ধ করতে হয়।

এমন বহুরোগীর সঙ্গে আমরা অজানাতে মিশছি, খাচ্ছি বেড়াচ্ছি তাতে ত কই আমাদের ভর করে না। কিন্তু মজা যে যাঁহাতক জানলাম যে সে রোগী তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করলাম। একটা জানা রোগীর সঙ্গে মেশার থেকে ঢের বেশী ভয়ের কারণ ট্রেনে জাহাজে, ট্রামে বাসে ও হোটেলে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়—জানা রোগীর সঙ্গে যতটা সাবধান হ'য়ে মেশা যায় ততটা অজানাতে হয় না। আমি এমন বহু রোগী দেখেছি যে তাদের চেহারা দেখলে কার সাধ্য বলে যে তাদের টি, বি হ'য়েছে এমন সুন্দর চেহারা অথচ তাদের স্পিউটাম পজিটির অর্থাৎ কি না গয়েরে বীজাণু মজুত রয়েছে !

টি, বি আবার দুরকম হয়—একরকমকে বলে Open case আর একরকমকে বলে closed case. যে সমস্ত রোগীর গয়ারে টি, বি বীজাণু পাওয়া যায় তাদের বলে Open case ও যাদের পাওয়া যায় না তাদের বলে closed case. T. B. জাবাণুযুক্ত গয়ারকে স্পিউটামপজিটি ও যে গুলিতে পাওয়া তাকে বলে নেগেটিব।

যাক যা বলছিলাম—এই সমস্ত অজানা রোগীরাই আমাদের পক্ষে বিপদ্দজনক। তার কারণ আগেই বলেছি যে অজানাতে লোকে সাবধান হতে পারে না। জানতে হোক অজানাতে হোক close caseকে ভয় করবার কিছুই নেই ! কারণ এদের গয়ার ওঠেনা ও এখানে সেখানে অজ্ঞাত ভাবে থুথু ফেললেও তাতে T. B. বীজাণু না থাকার জন্য অসুখ ছাড়তে পারেনা কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই বলে এঁটো খাওয়া, একসঙ্গে শোওয়া রোগীর জিনিসপত্র ব্যবহার করা চলবে তা মোটেই নয়। টিবির লক্ষণ—

অসুখ হবার আগে অথবা হ'লে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘুসঘুসে জ্বর, কাসি, গয়ের, রাত্রির ঘাম, বিকেল দিকে সামান্য জর বা জ্বর ভাব, মাথা ধরা ও সর্ব্বদাই অবসন্ন ভাব, ক্ষিদে কমে যাওয়া, হজম না হওয়া অনিদ্রা প্রভৃতি যত রকম খারাপ হ'তে হয় সব রকম হয়। কারও বা স্পিউটামের সঙ্গে রক্তের ছিট দেখা যায় বা কাসতে কাসতে রক্ত বমি হয়।

টি, বি হ'লে কিছুতেই ভাল লাগে না মনে হয় কেবলই শুয়ে পড়ি। সামান্য জ্বর অথবা বিকালের দিকে শরীর খারাপ হ'লে বড় একটা কেউই যত্ন নেয় না—মনে করে ও কিছু নয় দুদিন পরে সেরে যাবে কিন্তু তা যায় না। হয়ত কারও থুথুর সঙ্গে সামান্য একটু রক্ত বেরুল—কিন্তু মোটেই গ্রাহ্য করলে না।

বাড়ীর লোকে অথবা সে নিজে মনে করে ও দাঁতের রক্ত অথবা গলার রক্ত পরে শেষে অগ্রাহ্যের ফলে একেবারে শরীর শেষ সীমায় পৌছায়। এই কটী লক্ষণ প্রকাশ পেলেই বাজে চিকিৎসা না করিয়ে প্রথমে ray করান দরকার ray করাইলেই একেবারে সমস্ত ধরা পড়ে। এবারে চিকিৎসা সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলি কেমন? টিবির চিকিৎসা হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, অস্ত্র চিকিৎসা।

সম্পূর্ণ বিশ্রাম কাকে বলে? সম্পূর্ণ বিশ্রাম মানে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম শরীর মনকে বিশ্রাম না দিয়ে যত যাই চিকিৎসা করা হোক না কেন কিছুতেই কোন ফল পাওয়া যাবে না বরং মৃত্যুর পথে রোগী এগিয়ে চলবে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম কবতে হ'লে নড়াচড়া যত কম হয় ততই ভাল এমন কি বিছানায় মল মূত্র ত্যাগ ও শুয়ে শুয়ে খাওয়া নিয়ম। একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার তাঁর চিরজীবনের সাধনার ফলে বের করেছিলেন যে টি, বির পূর্ণ বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা। ফুসফুসে টি, বি হ'লে যতরকম চিকিৎসা করা হয় তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য যাতে ফুসফুস সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়।

পুষ্টিকর খাদ্য বলতে (অবশ্য যক্ষ্মা রোগীর উপযোগী) মাংস, ডিম, মাখন, ঘি, দুধ, টাকা শাক জী প্রভৃতি বোঝায়। মাংস আধ পোয়া, ডিম দুটো, মাখন আধপোয়া, দুধ একসের থেকে পোয়া পর্য্যন্ত খেলে তবে যদি রোগীর ওজন বাড়ে—যারা মাংস বা ডিম খায় না তাদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মাছ মাখন, ক্রীম প্রভৃতি খাওয়া উচিত। তোমরা হয়ত বলবে যে এত সব খেতে হ'লে পয়সার দরকার গরীবরা কি করে খাবে? কিন্তু এ রোগটাই যে রাজা রোগ,—টাকার ঘণ্ট না করতে পারলে এ রোগ থেকে সারা বড় মুস্কিল। এই দেখো না সব থেকে কম ভাড়ায় যাঁরা থাকেন তাঁদেরও মাস গেলে ১০০৲ টাকা খরচ করতে হয়। অনেক লোককেই দেখলাম যে তাঁরা বেশ সারতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু শেষে তাঁরা এখানে থাকতে পারেন না, টাকার অভাবে চলে যান এবং পরে আবার রোগ বেড়ে যায়।

যেখানে ধোঁয়া, ধূলা, নোংরা প্রভৃতি নেই সেখানের বাতাসকেই বিশুদ্ধ বায়ু বলে অর্থাৎ উত্তম আবহাওয়া। সাঁওতাল পরগণা, পাহাড় বা সহর ছাড়িয়ে গ্রামের আবহাওয়া খুব ভাল। এ রোগের পক্ষে পাহাড়ে থাকাই প্রশস্ত। কারণ গরমে এ রোগ বাড়ে, পাহাড়ে থাকলে ক্ষিদে বাড়ে, হজম হয় ও মশা মাছি বিরক্ত করতে পারে না. রাত্রিতে ঠাণ্ডার দরুণ খুব ভাল ঘুম হয়। রোগীকে যত রকম শান্তিতে রাখাযায় ততই ভাল।

টি, বি রোগীর পক্ষে স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসাই সব চেয়ে ভাল। বাড়ীতেও চিকিৎসা হয় বটে তবে সকলের পক্ষে বাড়ীতে থেকে সমস্ত নিয়ম পালন করা সম্ভবপর হয় না টি, বি র পক্ষে ঠাণ্ডা দেশই উপযোগী ঠাণ্ডা দেশে থাকলে—হজমের তত গোলমাল হয় না।

এমন ঢের দেখা যায় যে অনেকে স্যানাটোরিয়মে থেকে ভাল হ'য়ে চলে যায় কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তাদের অসুখ ফের হয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। রোগীরা যখন স্যান্যাটোরিয়মে থাকে তখন তাদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত নিয়ম পালন করতে হয়। বাড়ীতে এলে তাদের সুবিধাই হয় নিময় পালন মোটেই করতে হয় না। কাজেই আবার অসুখে বাড়ে। খালি রোগীদের দোষ দিলেই হয় না—বাড়ীর অভিভাবকদেরও অল্প বিস্তর দোষ থাকে। সাধারণতঃ রোগীরা যখন স্যানাটোরিয়ম থেকে ফিরে

আসে তখন দেখতে বেশ মোটা হ'লেও শরীর সম্পূর্ণ ভাবে সারতে আরও কিছুদিন লাগে। সেখানকার আবহাওয়ায় থেকে রোগীরা শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখে কিন্তু যখন অভিভাবকেরা দেখেন, যে চেহারা বেশ ভাল হয়েছে, জ্বর হয় না, বা কোন উপসর্গ নেই, তখন তাঁরা চান যে তাঁদেরই মতন রোগীও কাজ কর্ম্ম করুক—নিয়ম পালন করা তাঁরা বিষ দৃষ্টিতে দেখেন। রোগীরা আপত্তি করলে শোনেন না। মনে করেন শরীর যখন সেরে গেছে তখন বসে বসে বাবুগিরির কোনও দরকার নেই। রোগীরা তখন মরিয়া হয়ে মনে করেন যে যা হয় হোক (এটা মেয়েদের পক্ষেই বেশী করে খাটে)। তারপর আর কি, কিছুদিন পরে যে—কে সেই !

এত বড় ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র ১২।১৩ টি স্যানাটোরিয়ম আছে। এটা বড়ই দুঃখের কথা যে রোগীর তুলনায় জায়গা মোটেই নেই।

বাউল

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

তুই চল্‌বি যদি চল রে ছুটে
জলের মতোই চল,
সময় যে তোর যায় রে ব'য়ে
যেমন নদীর জল!
লোকে কি বল্‌বে না-বল্‌বে
এখন ভাবলে কি চল্‌বে
আর পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার
সময় কোথায় বল?

হয় তো পথে চলতে কত
কাঁদবি পাষান মূলে,
আছাড় খেয়ে পড়বি কেবল
উপল উপকূলে।
তবুও তোকে চল্‌তে হবে
সকল বাধা দল্‌তে হবে
এই চলার পথেই রয়েছে তোর
সব সাধনার ফল॥

—০—

বুদ্ধির অঙ্ক

শ্রীধর

তা বেশ রাত। অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে আছি, শক্ত একটা বুদ্ধির অঙ্ক কিছুতে মিলছে না! কেমন করে মিলবে? ও-বাড়ীর দেয়ালের ঐ অদ্ভুত ভুতুড়ে তিনটে ছায়ার দিকে যে আমার চোখ পড়ে আছে!

দেয়ালে তিনটে ছায়া। তাদের মধ্যে একজন খুব ছোট্ট নাদুস নুদুস আর গোলগাল, আর একজনও তাই, তবে তার মাথাটা যা একটু হেঁড়ে। বাকি তিন নম্বর ছায়া, লম্বা দাড়িওলা সে, বেশ বুড়ো গোছের। ঘন ঘন তার মাথা দুলছে, ঘন ঘন তার ঝুলো ঠোঁট নড়ছে। মাঝে মাঝে তার সরু সরু হাতদুটো কড়িকাঠে উঠছে, কখনও মেঝেতে ঠেকছে। এক একবার সে ভারী চুপ হয়ে যাচ্ছে, লম্বা হাতদুটো তার গুটিয়ে নিচ্ছে। নাদুসনুদুস ছায়াদুটো বসে বসে দুলছে কি ঢুলছে! রকম দেখলে ভয়ের চেয়ে হাসি পায়।

হঠাৎ সব চুপচাপ, কেউ নড়েও না চড়েও না। কি যেন একটা ঘটবে!

যা ভেবেছিলাম। ঘটোৎকচের মত প্রকাণ্ড এক বিটকেল ছায়া কড়িকাঠ থেকে নেমে নিরীহ ছায়া তিনটের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল! তার ভীষণ চাপে তালগোল পাকিয়ে তিন তিনটে ছায়াই ম্যাজিকের মত দেয়ালের নীচের দিকে ধ্বসে গেল। ছোট্ট একটি মেয়ে ডুকরে কোথায় কেঁদে উঠল। বাস্, তারপর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গালে হাত দিয়ে ভাবছি উঠব কি থাকব। এমন সময়, ওরে বাবা! আর একটা কিম্ভুতকিমাকার ছায়া নিঃশব্দে দেয়ালের নীচে থেকে ওপরে উঠল। তার মাথামুণ্ড হাত পা কি যে কোথায় বোঝা যায় না। অন্ধকারে স্কন্ধকাটা কিম্ভুত ছায়াটা হিমসিম খেয়ে চামচিকের মত দেয়ালে নেপটে গেল। তারপরই সেটা মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে কেটে, দেয়াল ঘেঁষে দুদিকে দুটো বিটকেল মূর্ত্তি ধরে ছটকে বেরিয়ে গেল। কি কাণ্ড!

তারপর একি! দেয়ালে আবার যে-সে নিরীহ তিনটে ছায়া! তেমনি বসে আছে সব, যেন কিছুই তাদের হয়নি। বুড়ো ছায়াটার ঝুলো ঠোঁট আবার নড়ছে, সরু সরু হাতদুটো তার উঁচুতে চড়ছে আর নীচে নামছে। নাদুসনুদুস ছায়াদুটো সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দুলছে কি ঢুলছে।

সকাল হয়েছে। ও-বাড়ীর ঘরে দাড়ীওলা থুড়থুড়ে ওদের বুড়োদাদুর কাছে বসে দুই নাদুসনুদুস নাতিনাতনি বাটি বাটি দুধ আর গাদা গাদা খাবার খাচ্চে। অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে আছি—কালকের সে বুদ্ধির অঙ্কটা আজও মিলছে না। এমন সময় জানো-দিদি ঘরে এসে বললেন,—জানো বাবুদাদা, কাল রাতে ও-বাড়ীর রুণুর দাদু রুণুকে আর খোকাকে ভুতের গল্প বলছিলেন। হঠাৎ ওদের পিসিমা না জানো, কি দরকারে, একবার ঘর থেকে ওদের হারিকেন আলোটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন জানো, রুণু ভয়ে কি রকম কেঁদে উঠেছিল—তুমি শুনেছিলে বাবুদাদা?

ওমা কি বোকা! বুদ্ধির অঙ্কটা তো সোজাই—এই ত মিলে গেল!

সত্যি নাকি ?

ঠায় বসে ৬২টি হাসের ডিম ভক্ষণ ও তারপর দুজায়গায় নিমন্ত্রণ ভোজ রক্ষা করা কোন মানুষের মানুষ পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু একটি বাঙ্গালী মানুষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই কীর্ত্তি অনুষ্ঠিত করেছেন। শৈলেন্দ্রনাথ আরো ২০টি ডিম উদরস্থ করতে পারেন বলেন কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিরস্ত করেন। ডিম ভক্ষণে পৃথিবীর রেকর্ড হচ্চে—একজন আমেরিকানের। উক্ত আমেরিকানটি ঠায় বসে ৭২টি ডিম ভক্ষণ করে পৃথিবীর রেকর্ড করেছেন।বাঙ্গালী যুবকটি বোধ হয় আরো ১০টি ডিম অনায়াসে খেতে পারতেন।

জার্ম্মণীতে Brocken নামে একটি উঁচু পাহাড় আছে। সূর্য্যাস্তের সময় তার ওপরে দাঁড়ালে আকাশে রাক্ষসের মত কিম্ভুতকিমাকার ছায়া দেখা যায়। এই ভুতুড়ে ছায়াগুলি দেখে তো স্থানীয় লোকদের চক্ষু চড়কগাছ। এই অদ্ভুত ছায়াগুলি আবার নড়ে—ঠিক যেন যারা তাদের পাহাড়ের ওপর থেকে দেখছে তাদের ভ্যাঙচাচ্ছে। ক্রমশঃ আসল ব্যাপারটা প্রকাশ

হয়ে পড়ল। এক বৈজ্ঞানিক এসে বললেন-তোমরা যারা পাহাড়ের ওপর দাড়িয়ে ঐ ছায়াগুলো দেখছ ওগুলো তোমাদেরই ছায়া। তোমাদের সামনে শূন্যে রয়েছে মেঘ আর তোমাদের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। তোমাদের ছায়া বড় হয়ে ঐ মেঘের পর্দ্দায় গিয়ে পড়েছে। কিন্তু নিরীহ স্থানীয় লোকেরা এ কথা বিশ্বাস করে না।

জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের সময় একটি কাণ্ড হয়। জার্ম্মাণীরা তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জেপলীন বা উড়োজাহাজ তৈরী করে আকাশে চালাচ্ছে আর শত্রুদের ওপর নিঃশব্দে অতর্কিত বোমা ফেলছে। একদিন হঠাৎ একটি জেপলীন চালাতে চালাতে তার জার্ম্মান চালক ও আরোহী দেখতে পেলে কিছুদূরে পাশাপাশি তাদেরই অনুরূপ আর একটি জেপলীন নিঃশব্দে চলেছে। কাদের এ জেপলীন? তার চেহারাটাও খুব পরিষ্কার দেখা যায় না—ছায়া ছায়া মত কেমন যেন ভুতুড়ে ভাব! চালক ঐ নিঃশব্দচারী ভুতুড়ে জেপলীন দেখে রীতিমত ভয়ে পেয়ে গেল। এখন যে আরোহীটি ছিলেন তিনি এক বৈজ্ঞানিক, চট করে সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। তিনি দেখলেন তাঁদের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, তাঁদের সামনে মলিন মেঘপুঞ্জ। এযে ওঁদের জেপলীনেরই ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। চালকটি তবু কিন্তু ভয়ে ভয়ে চালাতে লাগল। কে জানে যদি ঐ ছায়ার সুযোগ নিয়ে কোন শত্রুপক্ষ তার জেপলীন চালিয়ে থাকে বা কোন সত্যিকারের ভৌতিক— !

প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের ছেলেমেয়েরা আজকালকার মত এত সুন্দর সুন্দর কাগজে ছাপা বই পড়তে পেত না। তাদের নাকি বই ছিল কাঠের, পাথরের বা সিঙের বা তামার তৈরী। কাঠের বা পাথরের ফলকে নানারকম ছবি আঁকা থাকত—এই রকম কাঠের বা পাথরের ফলক ছিল তাদের পড়বার বই। পরে তামার ওপর লেখা ও ছবি আঁকা সুরু হল। ভারতবর্ষে এই রকম অনেক পাথরে ও তামার ওপর লেখা পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেও নাকি কাঠের বই দেখতে পাওয়া যেতো—ক্রিকেট ব্যাটের মত দেখতে, তবে একটু চওড়া ও ছোট হ্যাণ্ডেল দেওয়া, তার ওপর রোমান হরফের লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাট বইর ওপরে পাতলা শিঙের একটা স্বচ্ছ আবরণ দেয়া থাকত—তার মধ্যে দিয়েই লেখাগুলি বেশ পড়া যেতো। এই ধরণের অভিনব বই ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে Horn-book! নানা আকারের ছোট বড় এই horn book নাকি পাওয়া গিয়েছে।

নতুন রামায়ণ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ছিল তারা দুই ভাই রাম ও লক্ষণ;
ছোটবেলা থেকে দেখে ভাব ও লক্ষণ—
বলেছিল গণকেতে "হবে এরা দারোগা,
হবে এরা মাথামোটা, কিম্বা কি পা-রোগা।"
বড় হয়ে ভুলবে কি গণকের বুলি সে!
দুই ভাই কাজ নিল শেষটায় পুলিশে।
পুলিশের কাযেতেই ভাই তারা দুইজন
কিছুদিন না যেতেই ইস্তফা দিতে মন!
দারোগা বলেন, "আহা, কেন যাবে চলে হে
কেন যাবে চলে সেটা যাবে নাকি বলে হে?"
দারোগার প্রশ্নেতে বলে তারা দু'ভায়ে,—
"পোষায় না আমাদের সামান্য এ আয়ে,
যত আসামীকে মোরা ধরে আনি গুঁতায়ে,
জরিমানা করে তুমি নাও সব হাতায়ে!
করে দাও নিস্ব-ই, তাও যদি না জোটে
যার নেই কিছু-ই তাকে জোতো হাজতে!
কাজ দিনু ছেড়ে মোরা ওই এক কারণেই
আয় বাড়াবার হায়, বুদ্ধি কি কারো নেই!
"প্ল্যান, সব ঠিক আছে,"—ফের তারা বল্‌ল,
"কাজ সব সুরু হবে আজ বাদ কল্য!
নিজেরাই দু'ভায়ে ব্যবসা-এ ধরবো—
লালরঙ্‌ওলা বাড়ী কাল ভাড়া করবো।

তার মাঝে বসাব-ই আন্‌কোরা থানা যে
শুন্‌ব না তোমাদের কোন কিছু মানা হে !
নতুন সে থানাটার দারোগা-ই এ আমি !
লক্ষণ জমাদার—জমা দেবে আসামী !
দাব্‌ড়িতে ঘাব্‌ড়িয়ে বলব এ সোজা বাৎ—
'ঘুসি খেয়ে ঘুস্ দিয়ে চলে যাও নির্ঘাৎ !'
সব কথা আমাদের শুনলে তো মন দিয়ে—
এখন বলত বাপু মন্দ কি ফন্দি-এ ?"

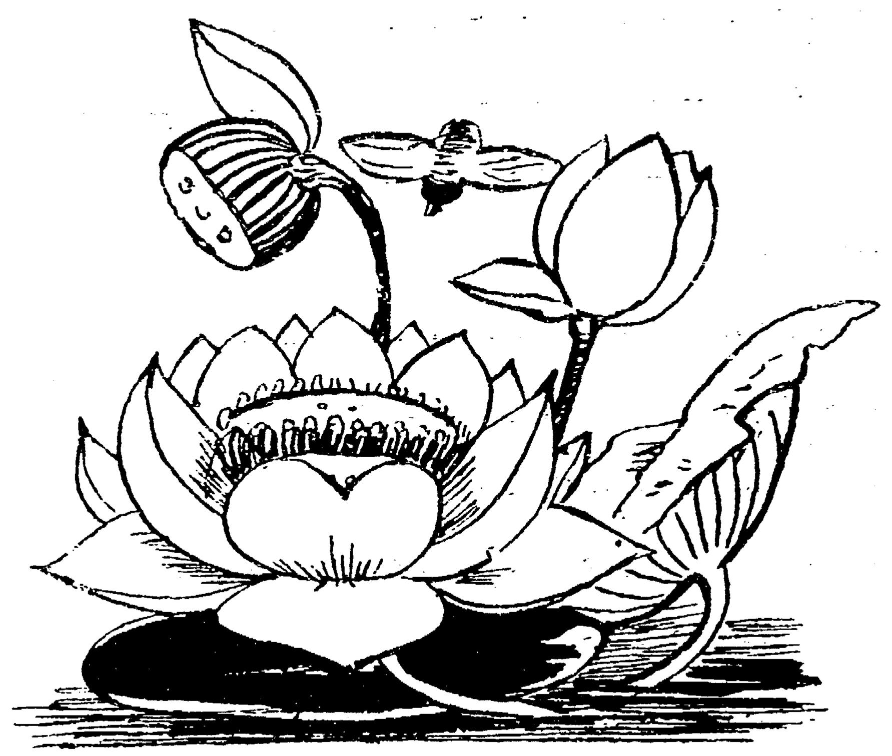

কল্কের ধোঁয়া

পৃষ্ঠা ২৮১

কল্কের ধোঁয়া

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

পাকা বাদামী রঙের লম্বা দাড়ী বা'র ক'রে বুড়ো দোকানদার বললে,—"আরে কাহে চাহেন মশয়, এই তো মিয়াচিনির তামুকের দোকান।"

মামার বাড়ীতে এসেছিলাম। ফেরবার সময় দাদামশাই সেদিন পাকড়াও করলেন, "যাচ্ছিস যখন চীনেবাজার, মিয়াচিনির দোকান থেকে পাঁচপো তামাকও নিয়ে আসিস্।" প্রায় আধঘণ্টা চীনেবাজার ঘুরে দোকানটী পেয়ে খুসী হ'লাম, বললাম, "কলুটোলার শ্যামরতণ বাড়ুয্যে আমার দাদামশায়—তিনিই পাঠিয়েছেন।" দাদামশায়ের নাম শুনে' বুড়ো চৌকী ছেড়ে লাফিয়ে উঠিল, "আরে, আহ আহ তা দাড়াইয়া ক্যান্"—ব'লে পাশের দরজা দেখিয়ে আমাকে ভেতরে এনে, একদম তার আসনের কাছে একটা টুলে বসালে। তার মুখের কাছেই এক প্রকাণ্ড হুঁকোয় বালাখানার তামাক পুড়ছে। নলে একবার মুখ লাগিয়ে সে বলল, "তারপর, তোমার দাদামশায় আছেন ক্যামন্?" "ভালই"—আমি বললাম, "এখন যদি পাঁচপো তামাক দেন।"

"আঃ, তা ব্যস্ত হও ক্যান্। বসো, তামুক খাও,—বলি দাদামশায়ের মত রসিক আছ তো?"

আমাকে নিরুত্তর দেখে বুড়ো ত' হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি কমলে বুড়ো বললে, "আর ও তো তোমার দাদামশাই ও ব'লে আমার দোকানে ঢুকেছিল, কিন্তু আজ তিরিশ বছর গত' আমার দোকানেরই খর্দ্দের!" আমি আশ্চর্য্য হলাম, বললাম,—"তবে কি দাদামশাই তিরিশ বছর আগে তাঁর দাদামশাইয়ের জন্য তামাক কিনতে—"

"না হে না ছোকরা, তবে শোন"—গড়গড়ায় প্রকাণ্ড একটান দিয়ে সে বললে, "তিরিশ বছর আগে আমি সামনের গলির মধ্যে তখন তামুকের দোকান খুলি, খবর পেয়ে এক পাঠশালায় পড়া দোস্ত শ্যামু তো এসে হাজির। কত হোল গল্প, শেষে শ্যামু বললে, 'যাক্, ভালই ত করলে ভায়া কিন্তু এমন মালের দোকান দিলে, আমাদের আর কিছু কেনা হবে না'—আমি তখন এমনি ধারাই তামুক খাচ্ছিলাম"—ব'লে বুড়ো আরও গোটা'দুয়েক টান মেরে বললে, "নলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, একবার খেলে কিন্তু কিনবে। তারপর থেকেই তো'—" বুড়ো আরামে চোখ বুঁজে গড়গড়ায় অনবরত টান দিতে লাগল। ধোঁয়ায় ঘর উঠল ভরে। কেমন যেন ভাল লাগছিল গন্ধটা। বললাম,—'আচ্ছা, দেখি তো একটু—"

বেল ফুল

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মল্লিক

বল্‌ত মা, ওই যে মেঘের ফাঁকে
সন্ধে হ'লে আমায় যারা ডাকে—
ওরা ফুল বুঝি মা ? ফুটলো তারা হয়ে ?
আর সকাল হ'লে পথের ধারে ধারে
আমায় যারা ডাকে বারে বারে
তখন, তারার আলো ফোটে কি ফুল হ'য়ে ?

আমার সকল কথায় তুমি হাস
(যেন) যা বলি সব ভুল
বেশ ! তোমার বুকে হাস্‌লে আমি
ফুটবে নাকো ফুল ?
দেখত মা পথের ধারে হিমের হাওয়া লেগে,
বেলি ফুলের আঁখির তলে উঠেছে জল জেগে।

ওরা শীতের শিশির
পাতায় পাতায় ?
নয়ক' চোখের জল ?
ওদের হাসির তলে
ব্যথার মানিক
অশ্রু হাসির ছল ?
তবে যখন, তোমার বুকে লুকিয়ে ছুটে আসি
চোখের জলে ভিজিয়ে তোল মিষ্টি মুখের হাসি।

কান্না হাসি, বুঝিনা মা,
একই বুঝি সব ?
হাসির গানের সুরে সুরে
অশ্রু তোলে রব ?
বলত মা ছোট্ট কলি
ফোটে কি সুন্দর
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
সাজাল আদর।

ওদের, তুলোনা মা থাক্ না ফুটে
সবুজ আঁখির জল
মনের বনে ফুটেছে যে
ব্যথার শতদল।
একটু পরেই শেষ হবে তার
ফুল জীবনের খেলা,
বইবে নাক বুকের পরে
কালকে সকাল বেলা।
বলনা মা লক্ষ্মী তুমি
কান্না আমার আসে
কেমন করে রইবে না সে
প্রভাতে যে হাসে।

———

ব্যাঙের পাতা

ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর্ ঘ্যাক্

হে পাঠকপাঠিকা তোমাদের ভাল হোক্।

আমার এই পাতাটা তোমরা যে এত সহজে মেনে নিয়েছ—তাতেতোমাদের ওপর না খুসী হ
না। যাগ্ ভবিষ্যতে হিংসে টিংসে আর করবে না আশা করি।
তো যথেষ্ট পাতা রয়েছে—তাতে যত খুসী বকর বকর কর না কেন।

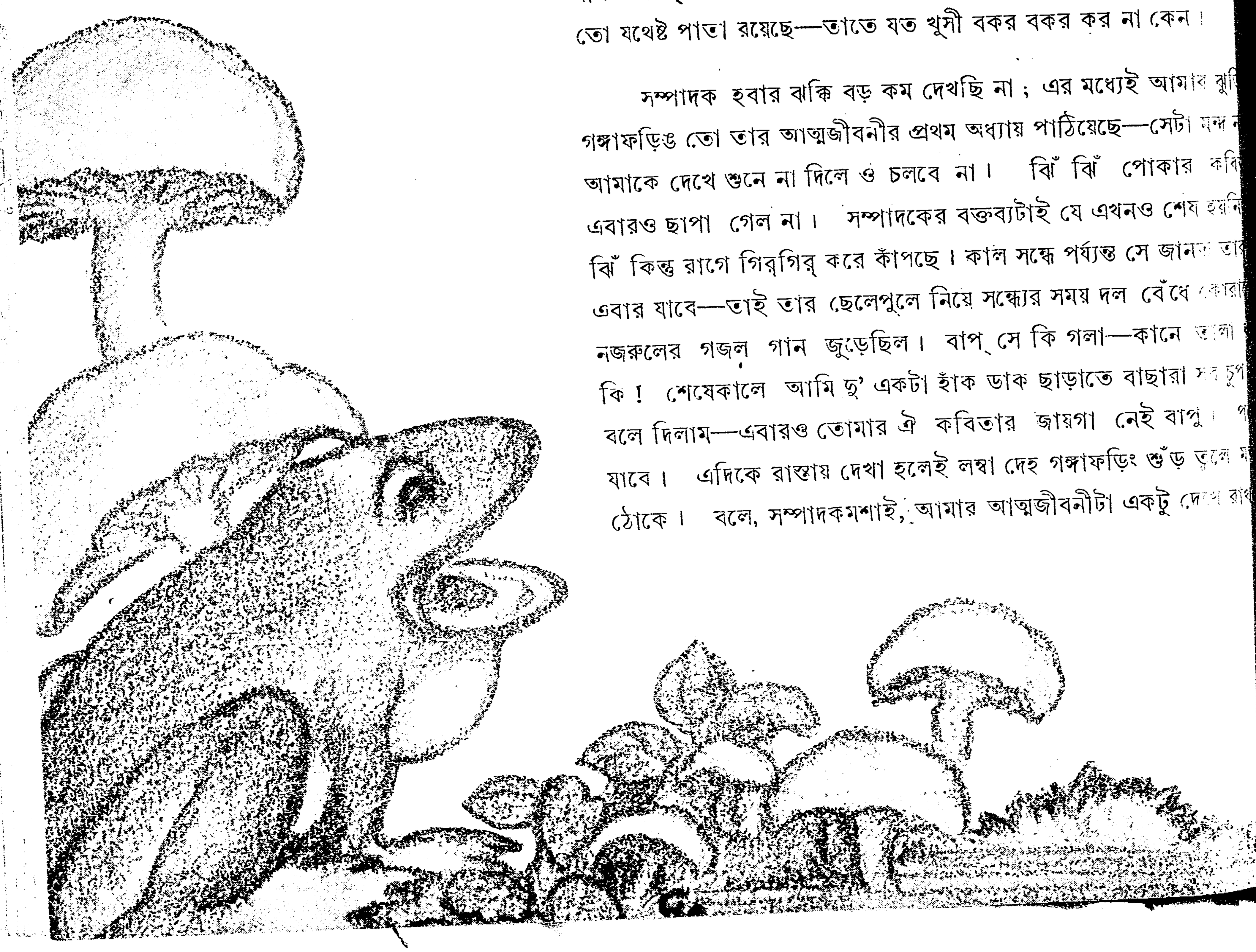

সম্পাদক হবার ঝক্কি বড় কম দেখছি না; এর মধ্যেই আমার ঝুলি
গঙ্গাফড়িঙ তো তার আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায় পাঠিয়েছে—সেটা মন্দ ন
আমাকে দেখে শুনে না দিলে ও চলবে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কবি
এবারও ছাপা গেল না। সম্পাদকের বক্তব্যটাই যে এখনও শেষ হয়নি
ঝিঁ কিন্তু রাগে গিরগির্ করে কাঁপছে। কাল সন্ধে পর্য্যন্ত সে জানত তার
এবার যাবে—তাই তার ছেলেপুলে নিয়ে সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে কোরা
নজরুলের গজল্ গান জুড়েছিল। বাপ্ সে কি গলা—কানে তালা
কি! শেষেকালে আমি দু' একটা হাঁক ডাক ছাড়াতে বাছারা সব চুপ
বলে দিলাম—এবারও তোমার ঐ কবিতার জায়গা নেই বাপু। প
যাবে। এদিকে রাস্তায় দেখা হলেই লম্বা দেহ গঙ্গাফড়িং শুঁড় তুলে ন
ঠোকে। বলে, সম্পাদকমশাই, আমার আত্মজীবনীটা একটু দেখে রাখ

দেখছি সম্পাদকের কাজ সত্যি বড় ভারী। সকলকে আবার খুসী করাও চাই। কিন্তু তা আমি করি না, কারণ জানি সকলকে খুসী
মানে কাউকেই খুসী না করা। কাল ঝিঁ ঝিঁ কে বকুনি দেবার আগে সোনা ব্যাঙকে সম্পাদকের দায়ীত্বের কথা বলছিলাম। সোনা
হুরে ও ছেলে মানুষ; তবে হাজার হোক ব্যাঙ তো, বুদ্ধি আছে। বোঝবার চেষ্টা করলে। ঝিঁ ঝিঁ কে কিন্তু ঐ রকম ভাবে ব
চটে গেল। বল্লে, দাদা, সম্পাদকের মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হয়। সোনাটা বলে বেশ। তবে জানে না তো আজকালকার
কোন সম্পাদকের মাথা ঠাণ্ডা থাকে না।

ের যে ছাতা হয় না সেকথা তোমাদের বলছিলাম। ও ছাতার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ও ছাতা এক নীচু
জাতীয় পদার্থ। ওকে ছুঁয়ে ফেল্লে ব্যাঙদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মুস্কিল হচ্ছে আমরা যেখানে বাসা বাঁধি, তার কাছ
গুলোও কোত্থেকে এসে জোটে। জোলো ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা ওদের পছন্দ। আমরাও অবশ্য জোঁলো জায়গায় থাকতে পছন্দ
আমাদের আসল ঘর হচ্ছে জলের নীচে, যেখানে মানুষের পো গেলে দম আটকে যাবে। হি হি কিন্তু আমরা কেমন মজাসে থাকি
অবশ্য সবাই যে আমরা জলে থাকি তা ভেবে বোসো না। আমাদের কেউ কেউ জমীর ওপরও ঘর বাড়ী করে থাকেন। তোমরা
রে কা হবে আমাদের কোন কোন জাত ভাইয়ের দল জলে বা ডেঙ্গায় তাঁদের ঘরদোর আর পছন্দ না হওয়াতে তাঁরা গাছের ওপর
খলেন। বহু বছর ধরে চেষ্টা চরিত্রি করে এক প্রতিভাশালী ব্যাঙ কুল প্রদীপ গাছের ওপর উঠে বাসা বাঁধতে পেরেছিলেন। চেষ্টায়
হাঁ, আর আমাদের চেষ্টায়! যাহোক্ তাঁদের পায়ের আঙুলে চাকতির মত চামড়ার
ম তৈরী করে তার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁরা গাছে গিয়ে উঠতে থাকেন। এঁরা আমাদেরই
ভাই—গেছো ব্যাঙ বলে জগতে পরিচিত।

আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বংশ মর্য্যাদা রেখেছেন—কোলা ব্যাঙ পরিবার অর্থাৎ যে
নেদী পরিবারে, হে পাঠক পাঠিকা, আমার জন্ম। লঙ্ জাম্পে আমাদের যুবকদের
সবচেয়ে বেশী আর এনাডিউরেন্স বক্তৃতা ও কোরাস গানে তো কথাই নেই।
তারপর আমার এক খুড়তত ভাই বহুকাল ধরে উত্তর আমেরিকাবাসী—তাঁরা ষণ্ড-
বলে সেখানে নাম করেছেন—তাঁদের সকলেই ভয় করে। সকলের কাছেই শুনতে
তাঁদের প্রতিপত্তি সেখানে অনেক।

আরো কৃতিত্ব আছে এই প্রাচীন ব্যাঙ বংশে। আমরা কি আজকের! মানুষের পো
জন্মাবার অনেক অনেক আগে থেকে এ পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। মানুষের
কে তো আমরা জন্মাতে দেখলাম। তোমরা কিন্তু রাগ কোরো না, এ পাতাটা আমার।

ব্যাঙ পরিবারে আরো অনেক গুণকীর্ত্তি আছে কিন্তু আজ আর জায়গা নেই।

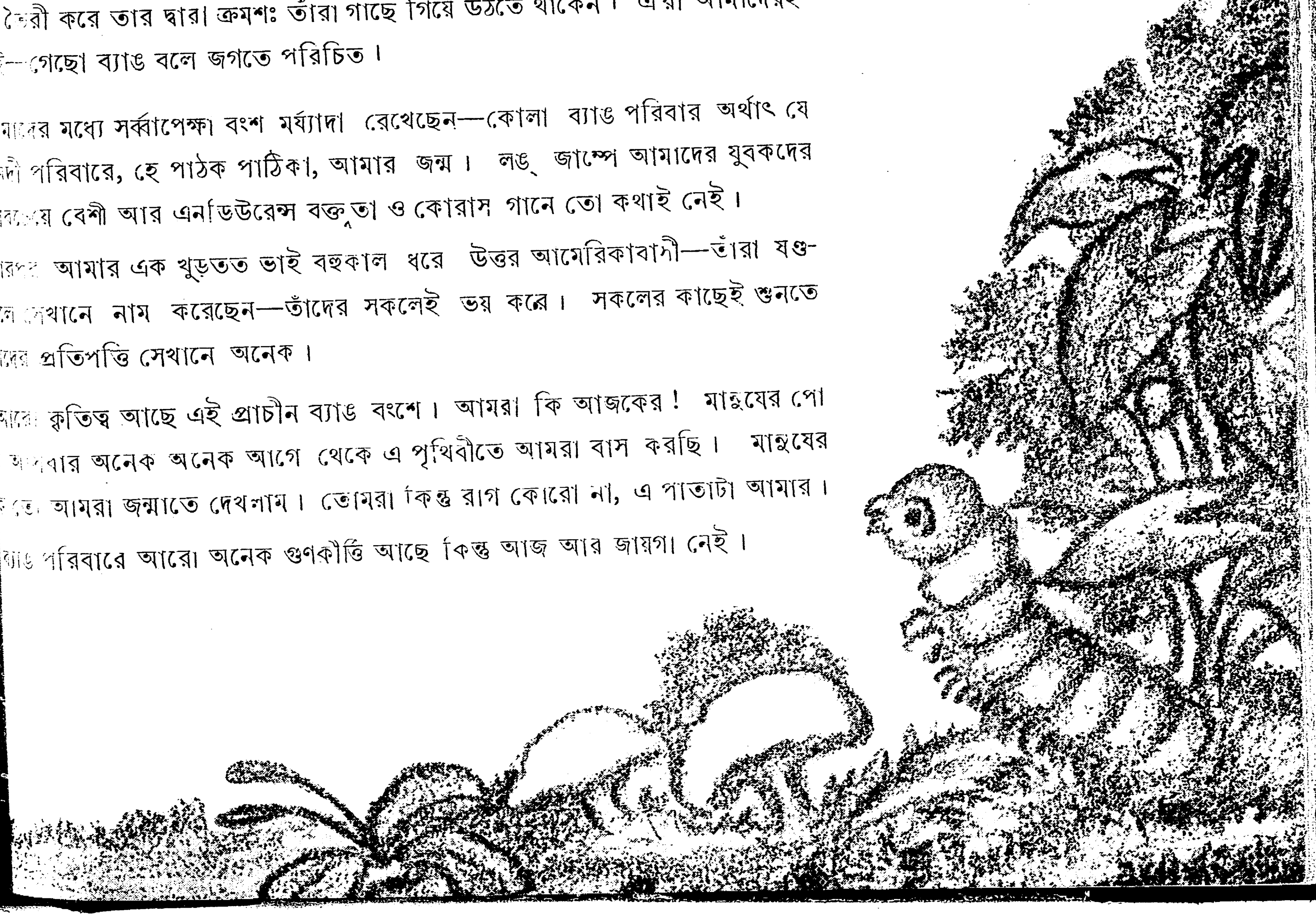

চলন্তিকা

গত ২৫ শে ডিসেম্বর রবিবার ১০ নং ইন্দ্ররায় রোডে রংমশাল দলের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।. সেদিনকার অনুষ্ঠানে কোন আড়ম্বর ছিল না, জাঁকজমক ছিল না; মেলামেশা, সকলের সঙ্গে পরিচয় দেখাশুনাই ছিল সেদিনকার অনুষ্ঠানের আসল জিনিষ। অবশ্য প্রথম পরিচয়ে সকলের মধ্যেই একটা সলাজ ভাব ছিল। একটা বড় ঘরের একদিকে একটা পর্দ্দা টাঙিয়ে একটা ছোট ষ্টেজের মত করা হয়েছিল—অপর দিকে সতরঞ্চির ওপর সকলের বসবার জায়গা হয়েছিল। প্রথমে আমাদের একটি তরুণ ওস্তাদ গ্রাহক (তার বয়স ৭ এর বেশী নয়) শ্রীমান গোপাল দাস গুপ্ত—তিনি বাঙ্গলা ও হিন্দি গান করেন—তাঁর সঙ্গত করেন আর একটি ছোট ছেলে। এর পরে একটি মেয়ে গান করেন। তারপরে জনপ্রিয় ক্যারিকেচারিষ্ট শ্রীধীরেন্দ্র ঘোষ মহাশয় কয়েকটি কমিক করে সকলকে একচোট খুব হাসান। তারপর ছোট ছোট বাক্সবন্দী খাবার—দলের সকলের মধ্যে বিলি করা হয়। এরপর একজন চমৎকার সেতার বাজালেন। সেতারের পর এলেন ভারত বিখ্যাত যাদু সম্রাট পি, সি, সরকার—তিনি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ম্যাজিক দেখালেন। পরে রংমশাল দলের মধ্যে নানা খেলাধূলা সুরু হল। খেলাধুলার মধ্যে ছিল একটি memory test—একটি থালার ওপর ছোট ছোট কয়েকটি জিনিষ পত্র রেখে সেটি সকলকে দেখিয়ে বলা হল—দেড় মিনিট সময় যে যার সব দেখে নাও—পরে মনে করে কি কি থালায় আছে বলতে হবে। সবশুদ্ধ বুঝি ১২টা জিনিষ ছিল—১১টা পর্য্যন্ত একজন গ্রাহিকা বলেছিল। তারপরের খেলায়, পর্দ্দার আড়ালে নানা রকম জিনিষের শব্দ করা হয়—ও জিগেস করা হয়—কিসের শব্দ? যেমন গেলাসে জল ঢালা শব্দ, কাঁচ ভাঙ্গা শব্দ, কাগজ ছেঁড়া শব্দ ইত্যাদি। এ তে খুব মজা হয়েছিল। এরপরও আরো কিছু খেলধুলো হয়—খেলাধুলা সাঙ্গ হলে সব প্রাইজ দেওয়া হয়। প্রায় আটটার কাছাকাছি আসর ভাঙ্গে।

তোমরা সকলেই স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনেচ। শুধু ঘরোয়া নয়, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিশালী জাতিদেরও এতে স্বার্থ আছে। ইতালী স্পেনের এই অন্তর্বিদ্রোহের আগুণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে স্পেনের লোকেদের আজ নির্যাতনের শেষ নেই, দেশে দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। এমন কি খাবার পরবার জিনিষ নেই। স্পেনের চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি আবেদন জানিয়েছে। মেয়েটির নাম মারগারিটা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুব-সঙ্ঘের সে সব চেয়ে ছোট্ট প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, মারগারিটা স্পেনদেশীয় ছাত্রছাত্রী সঙ্ঘের সেক্রেটারী। এই টুকু মেয়ে নিজের দেশের কত বড় কাজ করছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। নীচে আমরা তার চিঠিটির মর্ম্মানুবাদ দিলাম ঃ

আমার প্রিয় ভারতীয় বোনেরা!

তারা বসুকে (একজন ভারতীয় মেয়ে প্রতিনিধি) দেখে আমার মনে হয়েছে তোমাদের সকলের বিশেষ ইচ্ছে স্পেনের লোকদের তোমরা সাহায্য কর—তাই সানন্দে আজ তোমাদের বলছি কেমন করে তোমরা এই সাহায্য দিতে পার।

সব চেয়ে ভাই আমাদের দরকার খাবার দাবার—অর্থাৎ চাল, মাখন, কফি জমা দুধ ইত্যাদি। আর একটা জিনিষ আমাদের খুব দরকার—তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যদি সেলাইর ক্লাব হয় তা হলে তোমরা এই শীতে ক্লিষ্ট সৈনিকদের জন্য গরম জামা, মোজা বুনে দিতে পার। আমাদের দেশে উল হয় না—তাই এটার প্রয়োজন এত বেশী। আরো দুটি জিনিষ আমাদের খুব দরকার—তুলো ও ব্যাণ্ডেজ। আর শিশুদের জন্য চটি ও জুতো।

একটি কথা বলে চিঠি শেষ করব। তোমরা আমাদের চিঠি দিয়ো। আজ স্পেনের যুব সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্চে—সমস্ত পৃথিবীর ছেলেমেয়েকে পৃথিবীর শান্তির জন্য একত্রিত করা! আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত, ভাই বন্ধুগণ! সমস্ত স্পেন দেশের মেয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের আমি অভিবাদন করছি।

মারগারিটা রোবল্‌স্

বার্সেলোনা,

রোসেলন ২৭১, স্পেন

* * * * *

ই. আই. আর. ট্রেণ দুর্ঘটনা যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিটা দুর্ঘটনা ভুলতে না ভুলতে তার চেয়েও ভয়াবহ নিদারুণ এক রেল দুর্ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। এবারেও আশ্চর্য্য সেই বিহার প্রদেশই দুর্ঘটনার লীলাভূমি! গভীর রাতে হাজারিবাগ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন আপ্‌ দেরাদূণ এক্সপ্রেস ছুটে চলেছিল তখন এই করুণ মৃত্যুময় ঘটনা ঘটে। রেললাইনের প্লেট নাকি কে বদ্‌মায়েসী করে সরিয়ে ফেলেছিল। ফলে এঞ্জিন

ও পরের গাড়ীখানা সজোরে বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ তাদের কিছু হয়নি কিন্তু অন্যান্য যাত্রীগাড়ী লাইন থেকে ছিটকে নীচে খাদের মধ্যে পড়ে। ফলে কয়েকটি যাত্রীদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। আজ পর্য্যন্ত খবর পাওয়া গিয়েছে একুশজন যাত্রী নাকি মৃত। আহতের সংখ্যা অনেক। কয়েকজন যাত্রীর নাকি কোন হদিস পাওয়াই যাচ্চে না। মৃত যাত্রীদের পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্চি।

* * * * *

ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যসমূহে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছে। সেখানকার প্রজারা আজ অত্যন্ত অসুখী, নানাভাবে তারা অত্যাচারিত। তাদের অভাব আবেদন শোনবার আজ কেউ নেই। ঢেনকানাল দেশীয় রাজ্যের অনেক প্রজারা সেখানকার অশান্তি থেকে পরিত্রাণ নিতে ঢেনকানাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্চে। এই অবস্থায় আর একটি পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যে এক হত্যাকাণ্ড ঘটল। এই রাজ্যের নাম রণপুর। রণপুরের প্রজারা দলবেঁধে তাদের আবেদন জানাতে বোধহয় রাজপ্রাসাদের দিকে চলেছিল। সে দেশের রাজা তাদের ঐরূপ ভাবে আসতে দেখে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট এক সাহেব মিঃ বেজাল্‌গেটকে ডেকে পাঠান। খবরের কাগজের মারফতে শোনা যায়, এই সাহেবের সঙ্গে প্রজাদের কারুর কারুর বচসা বাঁধে। ব্যাপারটা তারপর আরো সঙ্গীণ হয়। শোনা যায় প্রজাদের মধ্যে কেউ নাকি লাঠি নিয়ে সাহেবকে ভয় দেখায়। প্রজাদের মধ্যে আগে কেউ সাহেবকে মেরেছিল কি না আমরা জানি না, তবে সাহেব বোধহয় আত্মরক্ষায় গুলি চালান। কিন্তু সেই গুলিতে প্রজাদের মধ্যে একজন না দুজন হত হয়। তারপরই প্রজার দলের কেউ কেউ নাকি ক্ষেপে যায়। ফলে সাহেব আহত হন—পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মারামারি হত্যাকাণ্ডে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কেন এমন অশান্তি হল, কেন এই লাঠি গোলাগুলি চলল—এর সমস্ত ব্যাপার রণপুরের রাজার উচিৎ জনসাধারণকে ও সরকারকে জানান। কোথায় আসল অশান্তি সেটা না জানলে এই হত্যাকাণ্ড, ইংরেজ ও ভারতীয়দের এই করুণ মৃত্যু ভারতবর্ষে কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। এই দুঃসাহসী ইংরেজটি ও দুজন অসুখী প্রজা তাদের যে জীবন দান করে গেল, তার কারণ যেন ব্যর্থ না হয়।

* * * * *

ইংলণ্ডের হাইস্কুলের একদল ছেলেরা নাকি ভারতবর্ষে বেড়াতে আসছে। অষ্ট্রেলিয়ারও এক দল স্কুলের ছাত্র ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছে। ইউরোপীয় ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তারা দেশভ্রমণ করছে। দেশভ্রমণ একটা বড় শিক্ষা—স্কুলের বইপড়ার চেয়েও অনেক বড় শিক্ষা। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের ছেলেদের উচিৎ দেশভ্রমণে সদলবলে

বেরিয়ে যাওয়া। স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের উচিৎ অল্প খরচে যাতে তাঁদের ছাত্রেরা দেশভ্রমণের সুযোগ পায় তার সুবিধে করে দেওয়া। ভারতবর্ষে কয়েকটি স্কুল কলেজে দেশভ্রমণের বা হাইকিংএর বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু তা অত্যন্ত কম। কলিকাতার বড় বড় হাই স্কুল ও কলেজে এই দেশভ্রমণের সুযোগ সুবিধা করা উচিৎ। আশা করি অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের এই তরুণ ছাত্রদলের সঙ্গে তোমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটবে। তাদের দেশের স্কুলের শিক্ষাদীক্ষার কথা তাদের নিজেদের মুখে তোমরা শুনতে পাবে।

* * * * *

এবারে জানুয়ারী মাসে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলে একত্র হন ও নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আজ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ও ছাত্র বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নতুন গবেষণায় মন দিয়ে নতুন তথ্য আবিষ্কারে ও পর্য্যবেক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলকে আকর্ষণ করেছেন। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ; পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে পা ফেলে ও মাথা মিলিয়ে আজ ভারতবর্ষ তার নিজের দানে পৃথিবীর মধ্যে তার বিশেষ স্থান বেচে নিতে চলেছে। এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে হল বলে, সেখানে একটি বই ছাপা হয়—অতীত ও বর্ত্তমানে পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে এক সময় এক বিরাট প্রস্তর যুগ ছিল। পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তখনকার লোকেদের উপজীবিকার জিনিষ। পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে এই প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। আর একটি ভারতের প্রাচীন প্রাগ ঐতিহাসিক লীলাভূমি ছিল হারাপ্পাতে—সেখানেও বিরাট এক সভ্যতা—ঘরবাড়ী প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সভ্যতা নাকি প্রায় তিন চার হাজার বছর আগেকার। তারপরের পাঞ্জাবের ইতিহাসের কথা তোমরা অল্পবিস্তর সকলেই জান।

দূরের আলো

মৃত্যুমুখী সূর্য্য

স্যর জেমস্ জীন্স্

(অনুবাদ)

আকাশে কয়েকটি "তারা" আছে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে হয়ত সামান্য বড় ; কিন্তু বেশীর ভাগ তারাগুলি এতই প্রকাণ্ড যে সহস্র-হাজার পৃথিবী তাদের একটির মধ্যেই অনায়াসে জায়গা পেতে পারে। আবার এক একটি তারা আছে পৃথিবীর কোটি কোটি গুণ বড়। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরের বালুকণা যদি গোণা যায় বোধহয় ততগুলি তারাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে।

ভেবে দেখো তাহলে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে আমাদের জায়গা কতটুকু, কত নগণ্য !

শূন্যপথে এই সমস্ত তারা ক্রমাগত চলাফেরা করছে। কয়েকটি দল বেঁধে চলাফেরা করে, বেশীর ভাগ তারাই কিন্তু নিঃসঙ্গ শূন্যচারী। শূন্যপথটা এতই প্রকাণ্ড যে, এক একটি তারার মধ্যপথের যে দূরত্ব তা লক্ষ যোজনেরও অধিক। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডে একটি তারার সঙ্গে আর একটি তারার সাক্ষাৎলাভ অতিমাত্র দুর্লভ।

কিন্তু হাজার দুই কোটি বছর আগে আকাশপথে এরকম একটি দুর্লভ ঘটনা ঘটেছিল ! সূর্য্য একটি বিরাট "তারা" তোমরা জানো। এখন সূর্য্যের কাছাকাছি আর একটি তারাকে দেখা গেল। চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর বুকে যেমন আলোড়ন তোলে তেমনি এই দ্বিতীয় তারাটিও নিশ্চয় সূর্য্যের বুকে সেরকম আলোড়ন তুলেছিল। সে আলোড়ন এতই বিরাট ও প্রবল যে, তার তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে যে তোলপাড় হয় তা অতি নগণ্য। এই দ্বিতীয় তারাটি বোধহয় পর্ব্বত প্রমাণ আলোড়ন সূর্য্যের বুকে উপস্থিত করেছিল। যখন এ দ্বিতীয় তারাটি সূর্য্য থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকল তখন তার আকর্ষণের ফলে এই বিরাট পর্ব্বতপ্রমাণ আলোড়নগুলি সূর্য্যের গা থেকে খসে গেল। কিন্তু সূর্য্যের নিজের আকর্ষণও এত বেশী যে এই ছিন্ন অগ্নিখণ্ডগুলি একেবারে ছিটকে না গিয়ে সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরতে থাকল এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে লাগল।

এই খণ্ডগুলিকে আমরা বলি উপগ্রহ ; আর আমাদের এই পৃথিবী তাদের একটি।

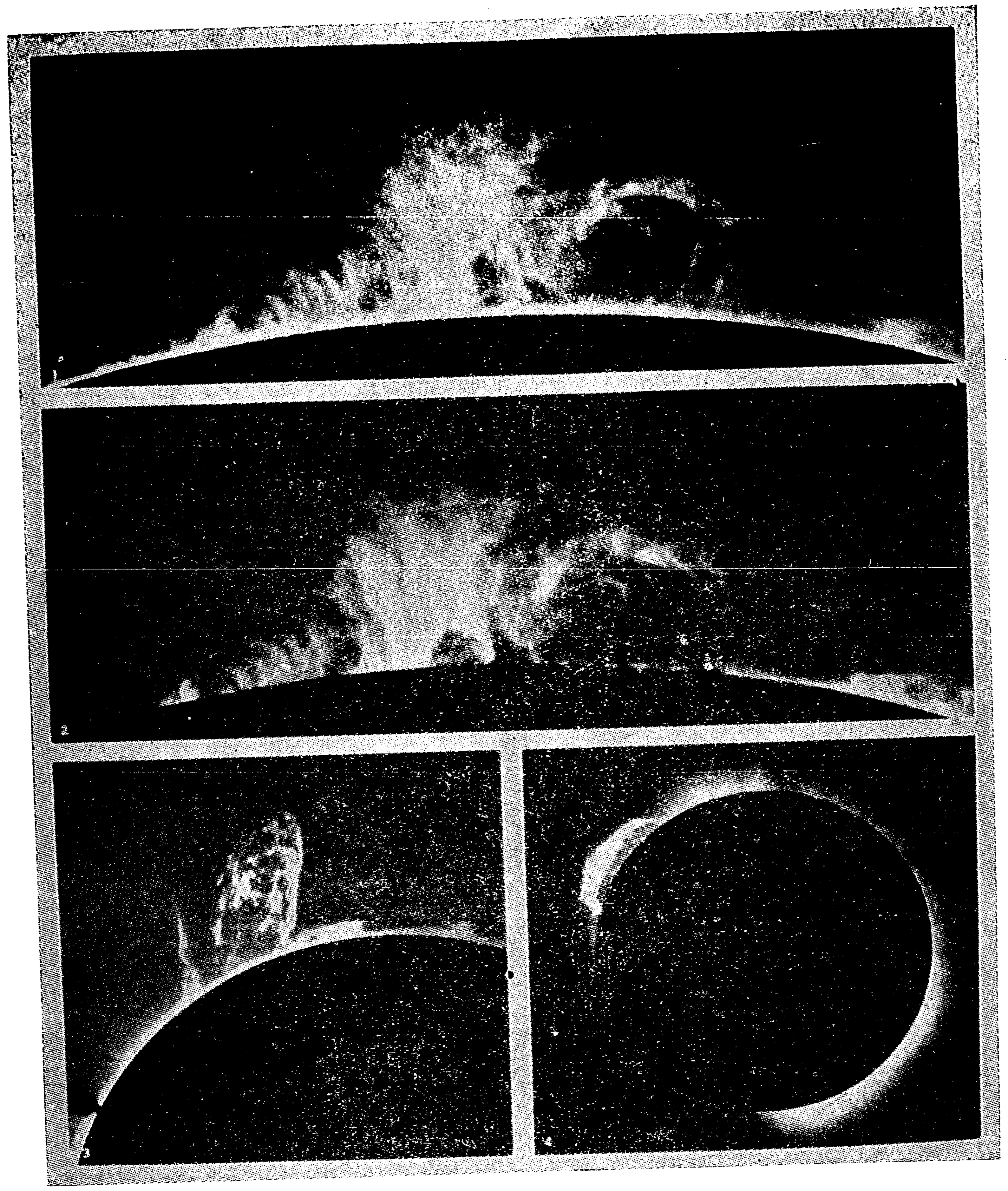

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে টেলিস্কোপে সূর্য্যের চেহারা
(১), (২) আমেরিকা থেকে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ ; (৩) কাশ্মীর থেকে, ১৯১৬ ; (৪) ব্রেজিল থেকে, ১৯১৯।
চতুর্থ ছবিতে সূর্য্যের যে অগ্নিশিখার আলোড়ন দেখা যাচ্ছে—
৫০০,০০০ মাইল এই অগ্নিশিখা সূর্য্য থেকে উচ্চে উঠেছিল। পৃষ্ঠা ২৯০

সূর্য্য এবং অন্যান্য তারাগুলি এক একটি অগ্নিকুণ্ড; সেখানে কোনরকম জীবনধারণ অসম্ভব। কাজেই ঐ ছিন্ন সূর্য্যখণ্ডগুলিও যে অতি মাত্রায় গরম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমশঃ এই সূর্য্যখণ্ডগুলি ঠাণ্ডা হতে থাকল—যেটুকু গরম আজ রয়েছে তা ঐ সূর্য্যের কাছাকাছি থাকার দরুণ।

ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে হতে এই গ্রহ-উপগ্রহের অন্ততঃ একটির মধ্যে, কখন্ আমরা ঠিক জানি নাকিন্তু এক পরম রহস্যের মধ্যে দিয়ে, প্রথম জীবের আবির্ভাব হল। যেখানে জীবের আবির্ভাব হল সেটি আমাদের এই পৃথিবী।

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী তাহলে কতটুকু? অর্থাৎ একটি বালুকণার অণু পরমাণুর একটি অংশের (পৃথিবী) ওপর দাঁড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ঘরবাড়ী স্থানকাল কতটুকু! প্রথম উপলব্ধিতেই তো ভয়ে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি! এই অসীম অর্থহীন শূন্যপথ, এই অকল্পনীয় সৃষ্টিছাড়া কালপ্রবাহ যাতে মানুষের ইতিহাস চোখের একটি পলকের মত মনে হয়, পৃথিবীর এই করুণ নির্জ্জনতা, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের থাকবার জায়গার এই অতি-নগণ্যতা—সবকিছু আমাদের মনে বিপুল ভীতি জাগিয়ে তোলে। আমাদের আশা আকাজ্ঞা, স্নেহভালবাসা, আমাদের আবিষ্কার, আমাদের ধর্ম্ম, কলা, প্রতিষ্ঠা সবকিছুই এই বিশ্বের বিপুলতায় অর্থহীন হয়ে পড়ে তাদের যে একটা জায়গা আছে তার যেন কোন ইঙ্গিত নেই। বিশ্বের সমস্ত নিয়ম কানুন আমাদের একেবারেই বিপক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্য জায়গাগুলো এতই নির্ম্মমভাবে ঠাণ্ডা যে মানুষের জীবন সেখানে এক মূহুর্ত্তে জমে যেতে পারে; বিশ্বের গ্রহতারাগুলি আবার এতই গরম যে সেখানেও দগ্ধ হয়ে যেতে হবে। শূন্যপথে আবার গ্রহ নক্ষত্র ক্রমাগত দিকবিদিক চলাফেরা করছে আর কখনও সংঘর্ষিত হচ্চে। মনে হচ্চে বিশ্বের সমস্ত নিয়ম কানুনই নিদারুণ মৃত্যুময়।

এই রকম নির্ম্মম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আমরা দুর্ঘটনায় বা ভুল করে যেন হোঁচট খেয়ে এসে পড়েছি!

তারাগুলি সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। এই অগ্নিপুঞ্জ অতিক্রম করে আবার অচিন্ত্যনীয় ঠাণ্ডা; তাদের নিকটেই আবার হাজার হাজার ডিগ্রির এত উত্তাপ যে সেখানে সমস্ত শক্ত পদার্থ গলে গলে পড়ে, সমস্ত জলীয় পদার্থ সেখানে টগবগ্ করে ফোটে।

এই সমস্ত অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে যে পাতলা পরিমিত কটিবন্ধটুকু বা আবরণ আছে, মাত্র সেখানেই জীব বাঁচতে পারে। এর বাইরে ঠাণ্ডায় জীব আড়ষ্ট হয়ে যায়, এর মধ্যের উত্তাপে জীবন দগ্ধ হয়ে যায়। এই জীবনধারণ উপযোগী ক্ষীণ আবরণ এর আয়তনও বিশ্বের মাঝে অতি নগন্য, তাতেও আবার জীবের উপযুক্ত থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়া অসাধারণ ব্যাপার। এটাই অস্বাভাবিক, যে অন্যান্য সূর্য্যেরা আমাদের সূর্য্যের মত গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করবে। বোধ হয় এক লক্ষ তারার মধ্যে একটি মাত্র গ্রহ আছে যেখানে সামান্য একটু জায়গা জীবন ধারণের উপযোগী হতে পারে।

এই সমস্ত কারণে একটি কথাই বার বার মনে হয়। মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কানুন এ নয় যে

আমরা বেঁচে থাকি। সৃষ্টি করা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিয়মের বাইরে ; ধ্বংস করাই যেন তার নীতি। কিম্বা হয়ত জীবন সৃষ্টি করা ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে একটা নিতান্ত উপেক্ষনীয় অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীরা তার আপন নিয়মের একেবারেই সৃষ্টি ছাড়া।

আমাদের জীবন যে কত নগন্য আরো সহজে বোঝা যাবে। আলো ও উত্তাপের কয়েকটি বিশেষ উপযোগী অবস্থার মাত্রাতেই জীবনধারণ সম্ভব এ কথা আমরা জানি। সেই মাত্রা কম বেশী হলেই আমাদের জীবন টলমল করে উঠে। সূর্য্য থেকে ঠিক উপযুক্ত মত উত্তাপ পেলে আমরা বেঁচে থাকি। সূর্য্যের উত্তাপ বাড়া কমার ওপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আর আসল ব্যাপার এই, যে, সূর্য্যের উত্তাপ বাড়া বা কমা অতি সহজেই ঘটতে পারে! সে প্রাচীন প্রাগ ঐতিহাসিক মানব এক বিরাট তুষার প্রবাহ দেখেছিল পৃথিবীর বুকে নামতে। প্রতি বৎসর উপত্যকায় তাদের বাসভূমিতে মানব নিশ্চয় সে ঘটনায় দারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তুষার নদী নেমে এসে তাদের ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করত, মনে হোত সূর্য্য বুঝি ক্রমশঃ নিভে আসছে। আমাদের মত তাদেরও নিশ্চয় মনে হয়েছিল—বেঁচে থাকা এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম নয়। "ট্যান্‌টেলাস্"

সুদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ এক তুষার আক্রমণ আমাদের মনেও ভীতি সঞ্চার করছে। যেমন গভীর হ্রদে ডুবতে ডুবতেও তৃষ্ণায় মরতে বসেছিল, তেমনি আমরাও শীত সমুদ্রের মধ্যে জমে মরব, হয়ত এই ভাগ্য আমাদের ঠিক হয়ে আছে। সূর্য্যের নিজের উত্তাপের কোন অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার উত্তাপ আসছে কমে। বাসোপযোগী যে ক্ষীণ কোন জায়গাটুকু আজও আমাদের আছে—সে জায়গাও গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। আমাদের বাঁচতে হলে ঐ মরণাপন্ন সূর্য্যের কাছেই সরে যাওয়া চাই। কিন্তু সূর্য্যের কাছাকাছি যাওয়া দূরে থাকুক, আমরা বাস্তবিক যেন তার থেকে ক্রমশঃ দূরেই সরে যাচ্ছি। আর নানা আকর্ষণের ফলে অন্ধকারে ও

আমাদের জন্ম ও জীবন দাতা সূর্য্য তো নিজেই মরণাপন্ন। বাইরের নির্ম্মম ঠাণ্ডার ধ্বংসের পথে আমাদের পৃথিবী এগিয়ে চলেছে!

যতদূর প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়, ক্রমশঃ দূরে চলে যেতে যেতে শীতে জমে আমরা বিলুপ্ত হব; কিম্বা হয়ত, ব্রহ্মাণ্ডের তারকারাশি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে কোন বিপুল সংঘর্ষে ও প্রলয়ে আমরা তার অনেক আগেই আকস্মিক ভাবে একেবারে লয় প্রাপ্ত হব। এই চরম দুর্ভাগ্য কেবল যে একা আমাদের পৃথিবীর পক্ষেই স্বাভাবিক তা নয়—অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে যদি কোনরূপ প্রাণী থাকে তাদের মৃত্যুও ঠিক এমনি দুর্ভোগের মধ্যে দিয়েই ঘটবে।

তবে একটা আশার কথা আছে। সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করে যাবে।

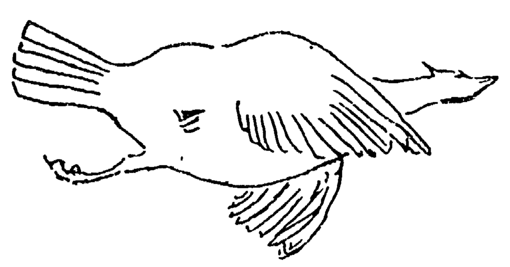

ছুটির ঘন্টা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস

এবার কলকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়রা যোগ দেওয়াতে খেলাগুলি বেশ উপভোগ্য ও উঁচু দরের হয়েছিল। সিঙগ্‌লস্ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় ডন ম্যাকনিল ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদকে তিনটি সোজা সেটেই হারিয়ে দিলেন। ফলাফল হোল: ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩। প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে তরুণ আমেরিকানটির খেলা কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া খেলায় তাঁর মত ব্যাক-হ্যাণ্ড ড্রাইভিং ও ভলি আর কেউ দেখাতে পারেন নি। সেদিন ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদ ম্যাকলিনের কাছে খেলায় ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন।

মিক্সড্ ডাবলস্ খেলাতে অবশ্য ভারতবর্ষ আমেরিকান দলকে হারিয়েছে। এতে খেলেছিলেন সাহনী ও মিস হার্ভে জনষ্টন্ (ভারতবর্ষ) এবং এণ্ডারসন ও মিসেস বিশপ (আমেরিকা)।

ভারতবর্ষ—আমেরিকা প্রদর্শনী খেলাগুলিতে ডন্ ম্যাকলিন (আমেরিকা), ৬-২, ৬-৮, ৬-৩ এই ফলাফলে সাহনীকে (ভারতবর্ষ) হারালেন। অন্যদিকে অবশ্য ভারতবর্ষ (ঘাউস মহম্মদ) হারাল আমেরিকাকে (এণ্ডারসন). তার এই ফলাফল: ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ আর ঠাঁই পেলে না ; সেদিন আমেরিকার জয়জয়কার। এণ্ডারসন আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড় কিন্তু এই খেলোয়াড়টি সেদিন অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে ভারতবর্ষের দোস্‌রা নম্বর খেলোয়াড় সাহনীকে হারিয়ে দিলেন—তার ফলাফল হল: ৭-৯, ৬-২, ৬-১।

এদিকে ডন্ ম্যাকনিল তো বেশ সোজাভাবেই আবার ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়কে ১-৬, ৬-৪, ৬-৩ এ হারিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ডাব্‌লস্ খেলাটিতেও আমেরিকার জয় হল। সেদিন ভারতবর্ষের বড় অপয়া দিন গিয়েছে। ডাব্‌লস্ এ রবার্টসন ও এণ্ডারসন হারালেন বেটি ও মিসেলমুরকে।

এসব দেখে শুনে টেনিসে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণ হয়। অথচ আমেরিকার যাঁরা সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তাঁরা এ আমেরিকান দলে কেউ দিলেন না!

ক্রিকেট ঃ রঞ্জিট্রফি

ক্রিকেট খেলাতেও কলকাতায় এবার বেশ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হয়েছিল। বিশেষ করে ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ক্রীকেটে রঞ্জি ট্রফির প্রতিযোগিতায়। বেঙ্গল ও মধ্য-ভারত এর খেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অবশ্য মধ্য ভারতীয় দল বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। নাইডুরা ও মাস্তাক আলি না থাকার দরুণ এ দলটি বেশ দুর্ব্বল ছিল বলতেই হয়। যা হোক বেঙ্গল এক ইনিংস ও ১২১ রাণে মধ্য-ভারতকে পরাজিত করে। মধ্য-ভারতের খেলোয়াড়ের মধ্যে জে, এন, ভায়া খুব চমৎকার খেলা দেখিয়েছিলেন ও একাই ৮৯ রাণ করেছিলেন।

রঞ্জি ট্রফিতে দক্ষিণ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে যে খেলাটি হয়েছিল তাতে দক্ষিণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের দলকে একেবারে গো-হারাণ হারালে। ফলাফল হল ঃ পাঞ্জাব এক ইনিংস্ ও ৭২ রাণে জয়ী হল।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার এখনও মীমাংসা হয় নি। খেলা এখনও কিছুদিন চলবে। শীঘ্রই বেঙ্গলটীম মাদ্রাজ এর সঙ্গে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবে। বেঙ্গল টীম নির্ব্বাচিত হয়ে গিয়েছে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা যোগদান করবেন ঃ—

লঙফিল্ড—ক্যাপ্টেন; ভ্যান ডার গুট্; এম্ ডাবলু বারেণ্ড; কার্ত্তিক বোস; নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী; তারা ভট্টাচার্য্য; কমল ভট্টাচার্য্য; বি ম্যালকম্; পি মিলার; এ জাব্বর; হজেস।

এই নির্ব্বাচনে দুটি ভাল খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে—এস্ গাঙ্গুলী ও বাপি বোস, এঁরা দুজনেই বেশ ভাল খেলছিলেন। এঁদের বাদ দিয়ে কেন ম্যালকম ও হজেসকে নেওয়া হল, এ নিয়ে ক্রিকেট আসরে তুমুল তর্ক উঠেছে।

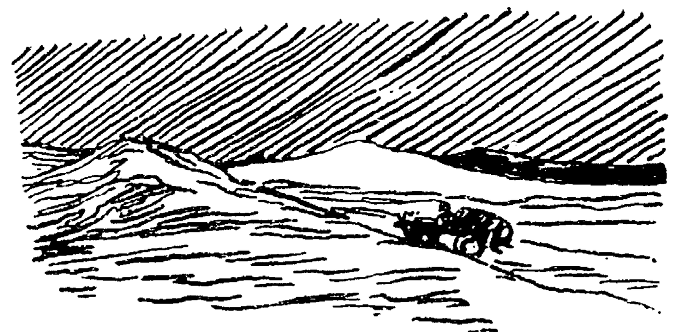

রংমশাল-বৈঠক

মৃত্যু

শ্রীশুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

অপারেশন থিয়েটার।

সাদা মার্ব্বেলের টেবিলটা ঘিরে আমাদের বসবার গ্যালারী; বড় বড় কাঁচের জানলা-ভরা ঘরখানি পরিষ্কার সাদা ধবধবে। সর্ব্বাঙ্গ সাদা এ্যাপ্রণে ঢেকে আমরা বসে আছি। এমনিই পোষাক পরে ব্যবস্থা করছে দু'একজন নার্স, সার্জ্জেনের এ্যাসিষ্টাণ্ট, এ্যানেস্থেটিক। সবাই উদ্‌গ্রীব, কখন্ সুরু হবে অপারেশন।

একটা ট্রলিতে ক'রে রোগীকে নিয়ে আসা হ'ল। ছোট বাচ্চা একটি ছেলে—দুরারোগ্য অন্ত্রের অসুখে সে ভুগছে। ঘরের গন্ধে, আর এই সব অদ্ভুতপোষাকপরা মূর্ত্তি দেখে তার দুই চোখে নেমে এসেছে ভয়ের ছায়া। বোবা বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে যেন বুঝতে পারছে না সে কোথায় এসেছে—তাকে নিয়ে কি করা হবে।

সাদা পোষাক পরা সার্জ্জেন ঢুকলেন একটি কাঁচের দরজা ঠেলে। নিঃশব্দে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। মাথা নাড়িয়ে আমাদের বসতে বলে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রোগীকে টেবিলের উপর শুইয়ে এ্যানেসথেটিক তাকে অজ্ঞান করে ফেলেছে। নিঃশ্চল, নিজ্জীব অবস্থায় সে পড়ে রয়েছে, পেটের খানিকটা বাদে দেহের সবটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। পাশে দাঁড়িয়ে এ্যাসিষ্টাণ্ট যন্ত্রপাতি ঠিক করছে।

'রেডি?' নিস্তব্ধ ঘরে সার্জ্জেনের গলার আওয়াজে আমরা চমকে উঠলাম।

'ইয়েস্ সার', এ্যাসিষ্টাণ্ট আর এ্যানেস্থেটিক একসঙ্গে উত্তর দিলে। দৃঢ়পদক্ষেপে সার্জ্জেন এগিয়ে এলেন। ছুরি নিয়ে অকম্পিত হাতে তিনি অপারেশন সুরু করলেন। মুহূর্ত্তের মাঝে চামড়া, মাংস সরিয়ে বার করে নিয়ে এলেন একরাশি অন্ত্র; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন কোথায় তার ক্ষত। অবাক্ বিস্ময় আর শ্রদ্ধার চোখে আমরা দেখছি। ঐ যে সাদা কাপড় ঢাকা দেহ পড়ে রয়েছে—ও কি আমাদের মতই

মানুষ—সুখ দুঃখ, হাসি কান্না জীবনের সব মাধুর্য্যে জড়ান ? হয়ত, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ও কতকগুলি হাড় ও মাংসের সমষ্টি ছাড়া আমাদের কাছে কিছুই নয়—ওরই মাঝে লুকিয়ে রয়েছে জ্ঞান, আর তারই সন্ধানে এসেছি আমরা।

'ষ্টপ ! রেস্পিরেশন ফেলিং—' চাপা ভীতগলায় এ্যাসিষ্টাণ্ট বলে উঠল। ছুরি ফেলে সার্জ্জেন নাড়ী ধরলেন—এক মুহূর্ত্ত—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন 'অক্সিজেন।' চোখের পলকে সমস্ত বদলে গেল। এতক্ষণ যে জীবনের অস্তিত্বের কথা মনেও আসে নি তারই জন্যে অসাধারণ ব্যস্ততা পড়ে গেল। অক্সিজেন—বাঁচাতেই হবে ঐ জীবনটিকে, বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে। এক মিনিট, দু মিনিট······পাঁচ মিনিট। না, হল না। ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভে গেল ···।

ম্লানমুখে সকলে ফিরে এলাম—কিন্তু সে কি ঐ মৃত্যুর জন্যে ? না। জ্ঞানের মশাল হাতে ধরে মানব সভ্যতাকে আলোক দিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। সে মশাল জ্বালিয়ে রাখতে এমন কত মৃত্যু হচ্ছে—হবে······সেকথা ভেবে দেখবার সময় নেই, সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি, অবিচলিত দৃঢ়পদে।

মায়াবাড়ী

শ্রীমীরেন্দ্রকুমার সরকার

ঐযে দেখছ নদীর বাঁক, ওরই ঠিক পূবে আছে এক রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে গেলে দেখতে পাবে এক বন। সেই বনের ভেতর আছে একটী সুন্দর বাড়ী। সেই বাড়ীর নামই হ'চ্ছে 'মায়াবাড়ী'। বনের ভেতর ঢুকতে গেলেই দু'টি কুকুর আসবে তোমায় তাড়া করে; আর তুমি যদি ঘাবড়ে না গিয়ে ঢুকতে পার সেই বনে তবেই দেখতে পাবে 'মায়াবাড়ী'। আর কুকুর দু'টোর ভয়ে যদি পালাবার চেষ্টা কর তবেই তারা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু এমনিই মজা যে মায়াবাড়ীর ভেতর ঢুকে তুমি তাদের যা' আদেশ করবে তাই তারা বিনা আপত্তিতে করে যাবে।

সেবার এক বুড়োর কাছে ঐ 'মায়াবাড়ীর' এ রকম আশ্চর্য্য গল্প শুনে আমার ভারী লোভ হল সেখানে যাওয়া চাই-ই। গ্রামে ডানপিটে ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। রোজই ভাবতাম কেমন করে যাওয়া যায়। শেষে একদিন সকাল বেলা সবার কথা অগ্রাহ্য ক'রে রওনা হলুম মায়াবাড়ীর পথে। পথে এক বুড়ীর সাথে দেখা। বুড়ী আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কোথায় যাচ্ছি। সব কথা তাকে খুলে বললাম। সে আমায় খুব উৎসাহ দিলে এবং সাবধান করে দিলে যে কুকুর দু'টোকে না তাড়ালে বাড়ী ফেরা যাবেনা।

মায়াবাড়ীর বনে যেই গেছি ঢুকতে অমনি কুকুর দু'টো এল আমায় তাড়া করে। ভয়ে আমার মুখ গেল শুকিয়ে। দু'চোখ বুজে মনে সাহস এনে বহু কষ্টে এগুতে লাগলুম। বনের ভেতর ঢুকেই দেখি কুকুর দু'টো যেন কোথায় উধাও হয়েছে। তারপর সোজা পূবে এগিয়ে গিয়ে দেখি মণিমুক্তো দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটী ঘর। ঘরটীর ভেতর তিনটী মাত্র কামরা—একটী শোবার, একটী বসবার আর একটী খাবার। কিন্তু প্রত্যেকটী কামরাই সুন্দর করে গোছান রয়েছে। মনে হয় যেন এই মাত্র কেউ গুছিয়ে গেল। কিছুক্ষণ এঘর ওঘর ঘুরে খাবার ঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এলুম। কিন্তু একলা কিছুতেই মন টিকছিল না। আমি

বেরিয়ে পড়বার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলুম। তখনই সে বুড়ীর কথা পড়ল মনে। কুকুর দুটোকে ডেকে আদেশ করলুম—'আমি স্নান করব, আমার জন্য দুধ সাগরের জল নিয়ে এস।' তারা ছুটল দুধ সাগরের পথে, আর এই অবসরে আমিও ধরলুম আমার বাড়ীর পথ। সেই থেকে আর ওপথ কোনদিন মাড়াইনি; তবে তোমরা যদি কেউ যেতে চাও তা'হলে আবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমার প্রতিবেশী কে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

তোমার প্রতিবেশী ?—তোমার প্রতিবেশী সে, যাকে তুমি পার সাহায্য ক'রতে এবং সেবা ক'রতে; যার
বেদনা-ব্যথিত চিত্ত ও চিন্তা-জ্বালা-জর্জ্জরিত ললাট যুগল তুমি তোমার হস্তের স্নেহপরশ দিয়ে ক'রতে
পার সুশীতল।

তোমার প্রতিবেশী সেই মুমূর্ষু দীন দরিদ্র—রিক্তের আতিশয্যে যার চক্ষু নিরুজ্জ্বল ও ম্লান হ'য়ে পড়েছে;
ক্ষুধার তাড়না যাকে মানুষের নির্দয়-দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যাও, তাকে কিছু
সাহায্য করগে।

তোমার প্রতিবেশী—সেই জীবন পথের ক্লান্ত পথিক, যার কঠোর পথ চলা প্রায় সাঙ্গ হ'য়ে এসেছে; যার
পিঠের শিরদাঁড়া—রোগ, শোক ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে একেবারে বক্র হ'য়ে পড়েছে। যাও, তাকে
একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর!

এ জগতে, জীবনের আদরের ধন—তাদের যারা হারিয়ে ফেলেছে সেই বৈধব্য দশা প্রাপ্ত অসহায় মেয়ে ও
মাতৃপিতৃহীন অনাথ শিশুদল তোমার প্রতিবেশী। তাদের তুমি আশ্রয় দান কর!

তোমার প্রতিবেশী—ঐ দূরে যারা মুখ বুজে কাজই ক'রে যাচ্ছে—সমাজ যাদের শারীরিক, মানসিক সকল
স্বাধীনতাই ছিনিয়ে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে—সুখ ব'লতে ইহলোকে যাদের আর কোন
আশা ভরসা নেই। যাও, এমন যেসব তোমার প্রতিবেশী, যদি পার, গিয়ে, তাদের উদ্ধার কর!

শোন, শোন, ভাই! তুমি অমন আনমোনা চ'লে যেও না। তুমিই হয়ত' সেই বীর হৃদয় যে তাদের এই
সকল অসহনীয় দুঃখ, কষ্ট থেকে মুক্ত ক'রতে পারবে। আহা! তোমরা তাদের জন্য ভাব,
ভাব—তাদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর! *

অজ্ঞাত লেখকের Who is my neighbour নামক
কবিতার সরল অনুবাদ

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা !

আরও একটা মাস চলে গেল পায়ে পায়ে—এবার এল মাঘ ! শীত কমে এসেছে—পাতাঝরা কাঙাল গাছগুলো কান পেতে আছে কার পদধ্বনি শোনার জন্য। বিবর্ণ রুক্ষ পাণ্ডুর প্রকৃতি চেয়ে আছে উৎকণ্ঠিত হয়ে—কে যেন আসবে তারই বেণু বাজছে।

পৌষ গেল কিন্তু যদি কখনও বাংলার পল্লীর ভিতর এই পৌষ মাসের আয়ু ফুরোবার আগে যেতে পারো যেখানে যন্ত্রদানব পৌছতে পারেনি—সেখানে শুনবে আনন্দের সুর, দেখবে সুন্দর দৃশ্য কারণ পৌষ সংক্রান্তি উৎসব চলেছে।

পৌষ-এর এই শেষ দিনে—লক্ষ্মী পৌষকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা চলছে। মেয়েরা ভোর বেলা উঠে উৎসবের আয়োজন করে—গিন্নি বান্নিরা সুর করে লক্ষ্মী পৌষকে বলেন—

এসো পৌষ যেওনা
সোনার পৌষ যেওনা
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেওনা
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেওনা।

এই ইঁট কাট দিয়ে তৈরী পাষাণ সহরে এরই সুর বাজছে আমার কানে।

কল্পনা, অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) গ্রাঃ ৮৩৩

না ভাই, আমি অভিমান করে চিঠির বাক্স বন্ধ করিনি আর সম্পাদক মশাইও জায়গাটুকু কেড়ে নেননি। আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি ? অমলি ! তোমার কথামত আবার চিঠির বাক্স নিয়ে বসেছি—আর রাগ নেইতো ? হ্যাঁ সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলুম আর তোমাদের ইন্দিরাদির সঙ্গে দেখা ও গল্প শোনা দুইই হয়েছে। আমার কথা শোননি বুঝি ? কল্পনা ! তোমার হাতের লেখা

ভাল, আমি লেখা দেখে হাসিনি—তুমি নিজে আমায় লিখেছ দেখে আনন্দে হেসেছি ভাই। প্রথমবার যে ব্যাজ হয়েছিল তা ফুরিয়ে গেছে আবার তৈরী হচ্ছে, হলেই পাঠাবো।

অমলা চক্রবর্ত্তী (মীরাট) ১২০৫

এত দেরাতে চিঠি কেন ? আপনার করে নেবো আমি, না তোমরা আমায় নেবে ভাই ? কাকে লেখনী বন্ধু নেবে তুমি নাম জানিও।

পিন্টুরাণী, মিন্টুরাণী বসু, (চুঁচড়া) ১১১৮

পিন্টু ! লীলা ব্যানার্জ্জি বলে কোনও গ্রাহিকা আমাদের নেই—তাই ঠিকানা দিতে পারবো না।

মিন্টু ! সুনন্দার ঠিকানা তোমায় পাঠালাম। সেলাই-এর কথা ওবাড়ীতে বলেছি কিন্তু তোমাদের ইন্দিরাদি স্থানাভাবে কয়েকমাস লিখতেই পারেন নি। সুরথকে বলো রথীশের ঠিকানা পাঠাচ্ছি। দেখা একদিন হবেই ভাই, ব্যস্ত কেন ?

রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (ভবানীপুর) ১২০০

রাণু ভাই ! রংমশাল দেরীতে প্রকাশের জন্য তুমি যে কারণ দেখিয়েছ তা মোটেই নয়—আমি বলি—তোমাদের সংস্পর্শে রংমশাল আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। ক্ষমা চাইতে হবে কেন ? আমরা খুব চেষ্টা করি যাতে খুব তাড়াতাড়ি রংমশাল প্রকাশিত হয়—কিন্তু গত কায়েক মাস বড্ড দেরী হচ্ছে—আমি কর্ত্তৃপক্ষকে এবার তোমাদের কথা জানাবো। তুমি আর ওসব কথা ভেবোনা ভাই কেমন ?

পঞ্চানন রুই (কলিকাতা) ১১৬৩

তুমি চাঁদার কথা যা লিখেছ তাতে জানাচ্ছি যান্মাষিক গ্রাহকরা টাকা দেবার সময় বার্ষিক চাঁদা দিতে পারে।

জ্যোৎস্নাকুমার সেন গুপ্ত (দিনাজপুর) ১১৬৯

রংমশাল সম্বন্ধে যা বলেছ তার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করবো ভাই, বুঝেছ ?

শ্রীলেখা বসু, গ্রাঃ ১১৪১

আমার ভুল কি, তোমার ভুল জানিনা। তোমার নামের 'শ্রী'টী উড়ে গিয়েছিল—এখন কিন্তু যথাস্থানে ফিরে এসেছে ভাই দেখে নিও ঠিক হয়েছে কিনা। তোমার সব নাম কয়টাই আমার ভাল লেগেছে। মেজদির নামটা আমায় বলে দিও, তাহলে **তাঁকে** তুমি আমি দুজনেই জব্দ করে দেবো—কি বল ?

নীরেন্দ্রনাথ রায় (আঠার বাড়ী) ১১৮৮

'চিঠির বাক্স'—পৌষের সংখ্যায় নতুন নয় তুমি বুঝতে ভুল করেছ। কার্ত্তিকের রংমশাল পেয়েছ আশা করি ? না পেলে পরিচালক মশাইকে চিঠি লিখো তুমি বোধ হয় নতুন গ্রাহক ?

কামাখ্যাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ) ৮০৩

মাখন ভাই ! তোমার বাবা গত ৬ই সেপ্টেম্বর মারা গেছেন শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তোমাদের মানসিক অবস্থা আমিও বুঝতে পেরেছি, শ্রীভগবান তোমাদের মনে শান্তি দিন। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠালাম।

রহিমা খাতুন—গ্রাঃ ৭৭৭

তোমার আগের চিঠি আমি তো পাই নি দিদু, পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। ব্যাজ আমাদের ফুরিয়ে গেছে—আবার তৈরী হচ্ছে—হলেই পাবে। তোমার কথা শুনে আমি একটু হাসিনি তোমার ইচ্ছাটা অতি সহজ তো ভাই—করে ফেলো—তাতে আমারও খুব ভাল লাগবে বোনটী।

শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তোমাদের উৎকণ্ঠার সীমা নেই জানি। না ভাই অসুখ করেনি, আর তোমাদের ভুলিনি বা চিঠির বাক্স তুলে দেওয়াও হয়নি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এক বছরের গ্রাহক হলে ২।৶০ পাঠাতে হবে। তোমার রংমশাল আর একখানি পাঠান হয়েছে, পেয়েছ আশা করি।

জয়ন্তী সিংহ (কলিকাতা) ৮১৩

তোমার এটা প্রথম চিঠি, কিন্তু তোমার কথা ঠিক হয়নি—চিঠি পড়তে বিশেষ আমার এই সব স্নেহের ভাইবোনদের চিঠি পড়তে কোন দিন ধৈর্য্যের অভাব ঘটে না, তোমার লেখা ? সেও খু-উ-ব ভাল। এখন তো ছোট্ট বড় হলে আরও ভাল হবে।

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (হাওড়া) ১০৮৮

তোমার পূর্ব্বের চিঠিতে ভাই উত্তর দেবার বিশেষ কিছু ছিল না তাই একসঙ্গে দিয়েছিলুম—তারজন্য দুঃখ হয়েছে বলে এইবার আলাদা লিখলাম। তোমার কবিতা যদি সম্পাদক মহাশয় মনোনীত করেন তাহলে নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। লেখা যখন পাঠাবে কপি রেখো। দিলীপ রায়ের ঠিকানা তোমায় পাঠাবো। রংমশালকে তোমরা কত ভালবাস তা আমি জানি।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ১০০৯

রংমশাল দলের গত প্রীতি সম্মিলনীতে এসে তারপর তুমি যা চিঠি লিখেছ তা আমরা পেয়েছি। চিঠিটী খুব বড় আমি তার কিয়দংশ তোমার ভাইবোনদের পড়তে দিচ্ছি···"সেই দিন পরিচালক মহাশয়ের" ইচ্ছাটীর বিষয় কিছুক্ষণ ভেবেছিলাম, তাঁর ইচ্ছা অন্ততঃ বছরে চার, ছয়বার বা দুইবার এইরূপ সম্মেলনীর আয়োজন করা।···তার ইচ্ছা যদি সফল হয় আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের কথা। এ বিষয়ে তিনি আমাদের সাহায্য আশা করেন কিনা জানি না, তবে আমরা বিশেষ আমি তাঁকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আর একটী কথা চুপি চুপি আপনাকে জানাই যে প্রতি সম্মিলনী উৎসবের আগে বা সময়ে যে সমস্ত প্রতিযোগীতার আয়োজন হ'বে তার জন্য প্রতিবারেই আমি ছয়টী পর্য্যন্ত মেডেল দিতে প্রস্তুত। এ ছাড়া প্রতি বৎসরের একটী সম্মিলনীতে গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে যিনি গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধে

আপন প্রতিভা রংমশালের মধ্যে দিয়ে বৎসরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবেন তাঁকে একটী Shield (Running) ও একটী মেডেল দেবার ইচ্ছা রইল।" নিশানাথ ! তোমার মতামত ভাল, আমি এ বিষয় পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমায় পরে জানাবো।

গুলজার গ্রাঃ ১১৮৫

তোমার ২৮শে অগ্রহায়ণের চিঠির কাজ আশাকরি মিটে গেছে সেজন্য আর তার উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলাম না।

অরুণ ঘোষ (কলিকাতা) ১০৬৬

তোমরা যদি ভাই অত বেশী অভিমান করো আমি তাহলে কোথায় যাই ? ভুল একটু হয় তো, থাক এখন আর রাগ করতে পাবে না লক্ষী ভাইটী আমার ! শিবপ্রসাদ সেন এর ঠিকানা তোমায় পাঠিয়ে দেবো।

রেখা (পাটনা) ৩৭২

তোমাদের 'বাসন্তিকা' আর 'হীরার নূপুর' সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে জেনে খুব আনন্দ হলো। শামুককে বলো ছোটবোনকে ভালবাসতে হয় তার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। পরীক্ষা কেমন হলো ?

কমলাদাস (শিলং) ৫৮১

এতদিনে তুমি বোধহয় অগ্রহায়ণের রংমশাল পেয়েছ। বাণী ঘোষের চিঠি না পেয়ে দুঃখ করেছ, কিন্তু সে তোমার চিঠি পেয়েছে লিখেছ—তার পদবী হঠাৎ বদলে গেল কিন্তু আমাদের একেবারে ফাঁকি দিয়ে—বুঝেছ ? সেইজন্য ব্যস্ত ছিল এইবার সে তোমায় চিঠি লিখবে। আমার মনে হয় চিঠির সঙ্গে সন্দেশও এসে পৌছবে কি বল ? আর কাকে লেখনী বন্ধু নেবে নাম জানিও ভাই।

শান্তি কুণ্ডু (শান্তিনিকেতন) ১১৮৯

প্রথমবার তোমার চিঠির উত্তর ছোট হয়েছিল বলে দুঃখ করেছ ভাই কিন্তু জানো তো দিদু, জায়গা বড্ড কম তাই বড় করে উত্তর দেওয়া যায় না। তোমার চিঠিটী আগা গোড়া খুব চমৎকার। দিদি তোমার তো অনেক হয়েছে ভাই তাছাড়া এই দিদিভাইও রয়েছে। তোমার অনুরোধ নিশ্চয় আমি রাখবো ভাই, যথাসময়ে আমায় জানিও। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাচ্ছি।

বাণী সেন (পাটনা) ১০১২

বাণী, তুমি খুব দুষ্ট হয়েছ কিন্তু, এতগুলি ভাই বোন এবং দিদিভাইকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি পদবী বদলে ফেললে। উল্টো চাপ দিয়েছ আমরা নাকি তোমায় ভুলেছি ! সেটী একেবারে ভুল তোমার এ চিঠি পাওয়ার আগে যে চিঠির কথা তুমি বলেছ তা আমি পাইনি পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। বয়সের কথা যা বলেছ তার উত্তর তো আগেই দিয়েছি ভাই, আর দল থেকে বাইরেই বা যাবে কেন ? তুমি অভিমান করেছ, কিন্তু এবার অভিমান করবার কথা আমার। শিবানী কেন চিঠি দেয়নি তাতো জানিনা। ঠিকানায় কথা যা বলেছ হবে। আশাকরি এবার আর ভাই বোনদের ভুলে থাকবে না। তোমাদের নূতন যাত্রাপথ মধুময় হয়ে উঠুক—এই আশীর্ব্বাদ জানাই।

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)

যে দুটো কারণের জন্য তুমি রংমশাল দলে আসছিলে না—সে দুটোর জন্য ভাবনার কোনও কারণ নেই—ওকথার উত্তর আমি বহু পূর্ব্বেই তো দিয়েছি ভাই। রংমশাল দলের নিয়ম কানুন রংমশালের পাতাতেই আছে দেখে নিও।

কল্যাণকিশোর মুখোপাধ্যায় (গয়া) ৬৮৮

'প্রতিহিংসা' গল্প সম্বন্ধে যা বলেছ তার উত্তর হচ্ছে ওটা অনুবাদ গল্প, সুতরাং অনুবাদ করবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। নিজস্ব রচনা হলে অন্য কথা ছিল। কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা তোমায় পাঠিয়ে দেবো। বেশী লিখলে লেখা ভাল হবে।

কুমুদবন্ধু সেন গ্রাঃ ১১৭

ধাঁধা সম্বন্ধে যা বলেছ সে কথা পরিচালক মশাইকে জানিও। শৈলেন সেন আমাদের গ্রাঃ নয়। সুরমা, সমরেশ, সুজাতা রক্ষিত, আনোয়ারা বেগম তোমাদের অনেক দিন খবর নেই কেন? সুজাতা! তুমি কি বাড়ী চলে এসেছ? কই কোনও খবর আজ পর্য্যন্ত দাওনি কেন? শরীর কেমন আছে সব জানিয়ে শীঘ্র চিঠি লিখো, চিন্তিত আছি।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

ছোট ছেলেমেয়ে পড়বার মত বই কতকগুলির নাম তুমি জানতে চেয়েছিলে। বয়সের দিক থেকে কিছু বলনি। মাট্রিকক্লাশে যারা পড়ে তাদের মত আমি কতকগুলি বইএর নাম ঠিক করে রেখেছি। তোমার চিঠি পেলে আমি সেগুলির নাম তোমায় পাঠাবো—যদি রংমশালের পাতায় যায় ভালই না, হলে ডাক যোগে তোমার বাড়ী যাবে।

সকলে আমার ভালবাসা নিও।
শুভার্থিনী তোমাদের

দিদিভাই

বিজ্ঞাপন

কয়মাস থেকে আমাদের প্রেসের অত্যন্ত কাজ বাড়াতে রংমশাল ঠিক সময়ে তোমাদের হাতে দিতে পারছি না। সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। রংমশাল যে তোমাদের কত আদরের বস্তু তা তোমরাই আমাদের টেলিফোনে, চিঠিতে জানিয়েছ।

তোমাদের একটা সুখবর জানাচ্ছি যে সম্প্রতি আমাদের প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ এই পত্রিকার পরিচালনায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়েছেন। তোমাদের অভাব অভিযোগ তাঁকে জানালে তিনি তাঁর যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ঠিকানা, ১০ নং, ইন্দ্ররায় রোড, টেলিফোন নং সাউথ ৪৭৯।

আশা করি এবার থেকে রংমশাল মাসের প্রথম সপ্তাহেই তোমাদের হাতে যাবে।

নূতন ধাঁধা

কে বলতে পারো?

বাঁ দিকে মানে তো বলে দেওয়া হ'ল—ডান দিকের কথাগুলো মানে ধরে পুরো করা চাই। এক একটি তারকা চিহ্নতে এক একটি অক্ষর বসালেই কথাটি খুঁজে পাবে। কে বলতে পারো কি কথাগুলি—?

(১) এ ছাড়া এখন উপায় নেই	১	অ	*	ধা	*	
(২) ভালও নয় মন্দও নয়	২	*	ঝা	*		
(৩) আধখানা বাদ দিলে খাতির বেড়ে যায়	৩	*	ধ	*	য়	*
(৪) না বুঝলে সব পণ্ড	৪	মা	*			
(৫) সবাকেই খেতে হয়, কিন্তু কেউই খেতে চায় না	৫	*	কু	*		
(৬) হাতেই আছে	৬	*	*	ম	*	ল
(৭) টক মোটেই নয় বরং কাজে লাগালে মিষ্টি পাওয়া যায়	৭	*	টক			
(৮) একটি অক্ষরেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়	৮	*	রব			

নতুন প্রতিযোগিতা

এবারের নতুন প্রতিযোগিতা হচ্ছে: ভারতবর্ষের কি জিনিষ তোমাদের ভাল লাগে ও কেন ভাল লাগে?

ধর যেমন এরকম জিনিষ—

ভারতবর্ষের বনজঙ্গল মাঠঘাট ক্ষেত	ভারতবর্ষের ফলফুল
ভারতবর্ষের পশুপাখী	ভারতবর্ষের পূজা পার্ব্বন মেলা
ভারতবর্ষের লোকজন	ভারতবর্ষের সাহিত্য
ভারতবর্ষের খেলাধূলা	ভারতবর্ষের গ্রাম
ভারতবর্ষের শিল্পকলা	ভারতবর্ষের আধুনিক পরিবর্ত্তন
ভারতবর্ষের নৃত্যগীত বাদ্য	ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগুলি, ইত্যাদি—

এরকম আরো অনেক যোগ করা যেতে পারে। এখন, তোমাদের, ভারতবর্ষের এই রকম, কি ভাল লাগে ও কেন লাগে, তাই নিয়ে ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখতেহবে। রংমশালের ২৫ লাইনের বেশী হবে না। পাঠাবার শেষ দিন ১২ই ফাল্গুন। পুরস্কার—ছোটদের একটি, বড়দের একটি।

গত মাসের

ধাঁধার উত্তর

১। বুলাই বাবু মুখস্থ করছিল,
ফানুস ওড়ানো মানে অকারণে ব্যয় করা।

২। রবি দাদা বাড়ী আছো, বড়দা বাড়ী নেই,
কোথায় গেল? জানি না।

৩। কি হচ্ছে রে? উনুন খুড়ছি।
কি হবে? ভাত রাঁধবো।

৪। খোকন মণি খোকন মণি
কচ্ছ তুমি কি?
এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি।

গত মাসের ধাঁধার

উত্তর দাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতা

জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর)। প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)। কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ)। অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার মুখার্জ্জি, (ভবানীপুর) সুরেখা বসু, (কলিকাতা)। ধ্রুবেন্দুকুমার সেন, (কালীঘাট)। সাধনা, অর্চ্চনা, গোদাল ও রাখাল, (গৌহাটী)। ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়, (বালীগঞ্জ)। নিবেদিতা, সব্যসাচী ও ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা। পিনু, মিনু, কাবুল (কলিকাতা)। জীমূত বাহন রায়, কলিকাতা। নীলিমা, নমিতা, নির্ম্মলেন্দু, অমলেন্দু, (নিউ দিল্লী)। জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (নাওয়াদা)। অমিতাভ্য, মনোজিৎ, অপরাজিতা, নমিতা, ধ্রুবজ্যোতি, অদিতি, সুবোধ ও নির্ম্মল, (পুরুলিয়া)। রবীন্দ্র, সরিৎ, অরুণ, রণেন্দ্র, নীরেন্দ্র রায়, (আঠার বাড়ী)। জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খিদিরপুর)। অজয়নাথ ঘোষ, (ভেড়ামারা)। অসীম, অশোক, অসিত, অশেষ রণজিৎ, (পুরুলিয়া। কুমুদবন্ধু সেন ও অজিত, রুবী, (কালীঘাট)। যশোধন ভট্টাচার্য্য, (বাঁকুড়া)। অরুণিমা ও প্রতিমা চক্রবর্ত্তী, (চট্টগ্রাম)। সন্দীপ রাও, (কটক)। শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী। (শ্রীরামপুর) তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) সুনীলা বল (লাহোর) দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুণ) দুর্গাদাণী দেবী (শ্রীয়ামপুর) ইন্দিরা, কল্যাণী, রণেশ ও শিপ্রা ঘোষ (ফেণী)।

একটী ভুল উত্তর দাতার নাম

প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী (কলিকাতা) কল্পনা ও অঞ্জলী আচার্য্য (নাগপুর) তারারাণী মুখার্জ্জী (আলমোড়া) দিলীপ ব্যানার্জ্জী (বালিগঞ্জ) গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) দিলীপকুমার রায় (চাইবাঁশা) কল্যাণকিশোর মুখার্জ্জী (গয়া) মনু, পারুল, হৃষিকেশ, অজিত, মোহিত (শ্রীহট্ট) রূপবানী রায় (ভবানীপুর) রাসমোহন ভট্টাচার্য্য (বর্দ্ধমান) গীতা দত্ত (কালীঘাট) মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর)।

অভিযান

রংমশাল
তৃতীয় বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
ফাল্গুন
১৩৪৫

বাদশাহী

গল্প

ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

দাদাভাই !

—আরে কে ও ? কাবুলিদিদি যে ! ষষ্ঠির দিনে হঠাৎ, মা কই বাবা কই, দুলালী কই !

—তারা পূজোবাড়ীতে, তুমি তো গাড়ী পাঠালেনা তাই মিশিরের গাড়ীতে আমি চলে এলেম, আকাল আগমনী ! দাদাভাই—বাবা মা নেই, রাধাকান্তকে এইবেলা খেল্না আনতে বলে দাও !

—রাস্তায় আসতে কিছু দেখলে ভাল খেলনা কাবুলিদিদি ?

—একটি দেখেছি, চমৎকার মাটির পুতুল ঃ

—বল কেমন শুনি ?

—ষষ্টিবুড়ি ষষ্টি হাতে গুড়ি গুড়ি যায় ।

—ওই শোনো দিদি যষ্টি ঠক্ ঠক্ সিঁড়িতে উঠছে পুতুল !

—না দাদাভাই আমার ভয় করছে, আমি ও পুতুল নেবোনা !

—দামটা লোকসান যাবে যে !

—ও তুমি নিয়ো ! আমি কি পুতুল খেলি ?

—না খেল তাকে তুলে রাখবে ঘর সাজিয়ে! আচ্ছা রাধাকান্তকে বলে এসো নতুন পুতুল জোগাড় করুক!—দাম!—সে ভাবনা নেই, বল আমার ঐ যে হাতঘড়িটা আছে সেইটের মধ্যে পয়সা আছে—চুপি চুপি বার করে নিয়ে, বুঝলে? হাঁ কাউকে বোলোনা।

—ও দাদাভাই এযে দাহু এলো লাঠি হাতে, যষ্টিবুড়ো ত নয়!

—আমাকে দিয়ে দিয়েছ আর ফিরে পাবে না!

—ইস্ আমার দাহু!

—তোমার দাহু হতে পারে কি, দাম তো দিয়েছি আমি।

—কত হলে ছেড়ে দিতে পারো?

—দাম কেন, তুমি নাও না অমনি।

—দিয়ে নিলে যে কালিঘাটের কুকুর হয়!

—আচ্ছা কানাকড়ি একটা!

—আমি জানি সে ভয়ানক শক্ত পাওয়া!—আচ্ছা, কাবুলীওয়ালার সেই নাচগানটা একবার দেখিয়ে দাও।

—ঝুলি লাঠি তো আনিনি

—এই নাও তাকিয়া এই নাও লাঠি, লাগাও নাচগান কাবুলীদিদি :—

(ছড়া) পেশওর সে আতাহুঁ অয়েস চায়ন মেরা কাম, অব রাহিগীর হেন্দকা হুঁ
লেও লেও বাবু আঙ্গুর পেস্ত বদকৃসান কা খিসমিস্ বাদাম সস্তা বদত্তা হুঁ
সালুন্ মিছরী সালাম সালাম

(গীত) আঙ্গুর খরবুজ আহালু বখরা কাবুল কশমীর মশ্‌কট হালবা
খিসমিস খিসমিস অখরোট পিস্তা!
গুর্জ্জিন্ পুস্তিন্ জাফেরাণ হোর হিং থোড়ি খড়ি খড়ি বিচ্‌তা
খাজুর খাজুর মিষ্কই কাফুর কাবুলী ধুস্‌সা উনী কম্বল
বুনবন বোস্তা সিস্তান সহরা সস্তা জোড়!

—এইবার দাদাভাই ধর লাঠি, তোমার সেই ভিখিরি বুড়োর গান গাও

—কোন্ ভিখিরি ভাই

—সেই যে তোমার ছেলেবেলায় আগমনীর দিনে গান গেয়ে গেয়ে দোরে দোরে কেঁদে বেড়াত পয়সার জন্যে?

—অমন কথা বলো না, পয়সার জন্যে কাঁদতো না সে

—তবে?

সে তার মায়ের জন্যে কাঁদতো—মায়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে তার দুটি চোখই কাণা হয়ে গিয়েছিল, সে লাঠি নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে আসতো ধুলোয় বসে গাইতো—

মা ওমা জগতের মা সবার মা হয়ে কি আমার মায়া ভুলেচো

—এই টুকখানি মনে আছে আর মনে নেই।

—তারপর! দাদাভাই আমার চোখে কি একটা পড়লো!

—কচলিওনা লাল হয়ে যাবে।—মন্তর মন্তর চোখ জ্বলার মন্তর জল পড়ার মন্তর যাঃ ফুঃ উড়ে যা, দেখ দেখি আর চোখ জ্বলছে?

—না, মা আসচেনা কেন দাদাভাই?

—এই আসেন আর কি, আচ্ছা সেই যে ভিখিরিটা বসে গাইলে তার নামটি কি ছিল বলতো দিদি?

—কেন জগত্!

—তুমি ত দেখনি তাকে কেমন করে জানলে তার নাম?

—গানের মধ্যে রয়েছে যে জগতের মা। পূজো বাড়ীতে খেয়ে মা বাবা দুলালী বসে রইলেন আসবার নামটি নেই! নিশ্চয় মা গল্প জুড়ে দিয়েছেন, বুঝেছো দাহু?

—গেছে তো খানিক বসে গল্প করবেনা, থাকনা আসবে যখন খুসি।

—শুনলে কাবুলীভাই তোমার দাহুর কথাটা শুনলে।

—যখন খুসী আসবেন আমরা না খেয়ে বসে থাকি, বাদশাদাদাও নেই

—সে তার মামার বাড়ী যাবেনা;

—আমি তাই বুঝি বলছি, দাহু কি বলেন তার ঠিক নেই দাদাভাই তুমি এর বিচার করো--

—আচ্ছা তুমি কি বলছো শুনি কাবুলীদিদি—তবে এর বিচার!

—আমি বলছি এতক্ষণ ধরে গাড়ী বসিয়ে রেখেছেন কত তেল পুড়ছে বল।

—তা পুড়েছে বইকি।

—তবে ? যদি আসবার সময় তেল ফুরিয়ে যায় ?

—ফুরিয়ে যায় যাবে তোর তাতে কি লা ?

—আঃ থামোনা দাদু, আমি এক বলছি দাদু আর এক বলছেন আমাকে বলতে দাও

—দাদু কি বুঝবে তুমি চুপি চুপি বলো তোমার মনের কথা

—শোনো, বুঝলে তো—

—ঠিক বুঝেছি

—দাদুকে বুঝিয়ে দাও !

—বুঝলে তো বোঝাবো—পূজোর দিন টেক্সি পাওয়া শক্ত, মিশিরের গাড়ীও চলবেনা—বাবা মা দুলালী রিস্‌ক ডেকে সোজা বাড়ী যাবে ; এইতো তোমাব ভাবনা কাবুলীদিদি ?

—তিনজনের বেশী চাপলে রিস্‌ক ভেঙে পড়বে কি দাদাভাই ?

—রিস্‌ক ভাঙতে না পারে রিস্‌কওয়ালার কোমর ভেঙে যাবে, এতো মিশির ড্রাইভার নয় ?

—যায় যাবে, তুই এইখেনে থেকে যাবি লুচী খেয়ে

—আরে না না, এই দেখ আবার কি চোখে পড়লো—যাঃ ফুঃ সেরে যাঃ গেছে তো ?

—গেছে একটু একটু আছে !

কোথায় গেছেন পূজো দেখতে বাবা মা—বলে ফেলো ও কাবুলীদিদি, জেনে রাখি

—বাবার মায়ের মামার বাড়ী

—তাহলে ভয় নেই তেলকলঘাট কাছেই।

—ভাবিস্ কেন আজ ষষ্টি, আসতেই হবে তোর মাকে বাপের বাড়ী

—এইবার পাকা কথা বলেছেন তোমার দাদু,—চন্দর সুয্যি উল্‌টে যেতে পারে কিন্তু পাঁজীতে যা লিখেছে কেউ উল্‌টাতে পারবেনা,—আসতেই হবে

—এলো বলে দেখ্‌না লা

—ঘর্ঘর করে কিসের শব্দ হচ্ছে ?

—ও ইসক্রীম কল ঘোরাচ্ছে রাধু

—তাহলে এখনো রাত হয়নি—তুমি ছড়া বলো দাদাভাই, আমি শিখে নিই—

—সব ছড়া মনে নেই

—একটু একটু বলোনা আমি জুড়ে জাড়ে নেবো বাড়ী গিয়ে—

—ছড়া কই তবে ঃ

গোরচাঁদের মেলায় যাবো মেলায় গেলে হেলায় পাবো ; দয়াল নিতাই দয়া করে
খেতে দেবে পেট ভরে
মোণ্ডা মিঠাই যা চাই পাবো
গোরা বাজারের বুড়া কর্ত্তা খায় একশুড়ি বেগুন ভর্ত্তা
গিন্নিটি তার পেঁচা চিক্কি পাঁঠা চাই তার হপ্তা হপ্তা
খেয়েছে শতাবধি পাঁঠার মুড়ো একটি ফেলেনি হাড়ের গুঁড়ো, সেখানে কেনো যাবো !
পাতড়া চাটতে অক্কা পাবো ! গোরাচাঁদের মেলায় যাবো
বলে ঠোঁটকাটা মুটে সকালে উঠে—খেংরাপটির নোংরা গলিতে আর কি রবো

—দাদাভাই আমাদের পাড়ায় গোরাচাঁদের মেলা হয়, কোনদিন তো ঠোঁটকাটা মুটেকে দেখিনি

—রোসো সে আগে তার খেংরাপটির বাসাভাড়া চুকোক, রাধুকে আজও সকালে ধরেছিল—আমি যদি তার বাসাভাড়াটা দিয়ে দিই..

—তুমি দিয়েছ নাকি দাদাভাই ?

—দিয়েছি তো !

—তবেই হয়েছে, সে ঠোঁটকাটা এখন কত্তাগিন্নির মত তোমার নাম ছড়া বেঁধে ফেলেছে

—আমি রাধুকে বলে দিয়েছি ঝাঁকাভরে মাটির পুতুল মুর্গিহাটা থেকে পৌঁছে দেবে তবে পাবে পয়সা।

—না হলে থাকো খেংরাপটীতে ! বেশ বুদ্ধি করেছো দাদাভাই !

—একি আমার বুদ্ধি বাদশাবাবুর বুদ্ধি !

—তুমি হলে হয়তো বলতে আহা গরীব দিয়ে দে ক'টা পয়সা

—তাহলে কি হতো ?

—পয়সা নিয়েই সরে পড়তো মুটে, পুতুলও আসতো না মুটেও আসতো না

—এখনো তো এলোনা কে জানে রাধাকান্ত কি করে বসে আছেন, দেখিতো—

—আবার অন্ধকারে যায় মেয়েটা

—না দাদু, বারাণ্ডা থেকে দেখছি, রাধাকান্তো—

—কি বলচো ?

—ঠোঁটকাটা ঝাঁকা মুটে এয়েচে ?

—না পাওয়া গেলনা

—পুতুল এলোনা! আঃ জবাব দেয়না? এলোনা দাদাভাই! এই যে এগুলো কি?

—রোস্ ভেঙে যাবে!

—এই দাদাভাইয়ের টেবেলে রাখলেই হতো

—এটা কে নেবে, এটা কে নেবে, এটি বাপু ছুলালী নেবে, এটি বাদশা নেবে, এটি আমি ......

—হিহি দাদাভাই, দাছু কি করচেন দেখ, এমন হাসি পাচ্ছে আমার!

—আচ্ছা দেখা যাক পুতুলগুলোর দাম কত

—রাধাকান্ত এদিকে আনো এই টেবিলে, দেখো পড়ে না যায়! দাদাভাইকে ফর্দ্দটা দাও।

—'দাদাভাই চালভাজা খাই ময়না মাছের মুড়ো'—এপুতুলটা কি দাদাভাই?

—এ সেই খেংরাপটির বাড়ীওউলী, দেখচোনা ঝাঁটা হাতে...

—ঠোঁটকাটা এখানে নেই, তুই যাঃ আমাদের ঘর ঝাঁটাবার লোক আছে

—ওটা তুই নিবিনে তো রাখ রাধুর কাছে

—থাকনা, আগে কোন্টা কি বুঝে দেখি দাছু!

—কাবুলীদিদি, এটি যে দেখছি কর্ত্তা বেগুন ভর্ত্তা

—ও আমি চাইনে রাধুর কাছে থাক্ ছুলালী নেবে এলে

—এযে দেখি জীভ বার্ করে মেমাচ্চে কচি পাঁঠার মুড়ো

—বুঝেচো দাদাভাই ও সেই গিন্নির, আমি নিচ্চিনে

—রেঁধে খেয়ে ফেলাবে

—আর মাগো দেখলে ঘেন্না করে ও আবার খাবে! একরকমের নাট্পুতুল ছুটি আনলে কেন রাধাকান্তো।

—ও জোড়া ছাড়া বিকোয় না নিতাইগৌর

—ঠিক হয়েছে, এছুটি রাখতে হবে দাদাভাই, গোরাচাঁদ দয়াল নিতাই ভুলে গেলুম যে ছড়াটা।

—এটি কে নেবে কাগজে মোড়া?

—ঐ দেখ দাছু একটা পুতুল লুকিয়ে রেখেছেন

—বোধ হয় মুড়ির ঠোঙা

—না পুতুল, আঃ হাতে দাওনা একবার টিপে দেখি

এ সেই খেংরাপটীর বাড়ীওউলী

—তা হবে না, ঐ ছুলালী মা বাবা সবাই এসে গেল ...

—বাদশা দাদা মামিমা রোসো দাহ্ একটু থির হয়ে বলছি, ভেবে নিই, ভেবে পাইনে যে দাদাভাই—

—আচ্ছা স্মরণ কর দেখি, সেই দোরে দোরে কেঁদে বেড়াচ্ছে

—ঠোঁটকাটা নাকি ?

—না সেতো আসেনি রাধু বলে তবে ! মনে পড়ছে

—বুক ঠুকে বলে ফেল তার নাম

—জগৎ ভিখিরী

—কাগজ খুলে দেখ্না লা শিবঠাকুর

—দাদাভাই তুমি ভেবেছিলে মুড়ি

—তাইতো ষষ্টির দিনটাতে কেবল আমি-ই ঠকলেম না, বাদশাবাবুও ঠকলেন, গল্প শুনতে না পেয়ে এতেই খুসি !

তালপাতার সেপাই

শ্রীসুকুমার দে সরকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছেলে নকীবের প্রবেশ ।

এই যে মহারাজ এই যে—

রাজা খাজার পাত্র হাতে নিলেন । একটা খাজায় কামড় দিয়ে—

রাজা । যা তোরা সভাসদদের খবর দে এখুনি সভা বসাতে হবে । রাজকন্যেকে এখুনি উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

নকীবরা । যো হুকুম মহারাজ

রাণী । খালি খাওয়া খালি খাওয়া, তাও আবার এত জিনিষ থাকতে খাজা

রাজা । খাজা খাবনা ত রাজা হয়েছি কেন ?

সভাসদদের প্রবেশ ।

সভাসদগণ । মহারাজের জয় হোক

রাণী । জয় ? কিসের জয় ? দৈত্যরাজ রাজকন্যেকে ধরে নিয়ে গেল, লড়াইয়ের নাম নেই, একটা তরোয়াল উঁচু করা হোলনা, খামোখা জয় হোক ।

রাজা । হ্যাঁ দেখ সেনাপতি, আজই রাজকন্যেকে উদ্ধার করে আন ।

সেনাপতি । ওরে বাবা দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের সঙ্গে কে লড়াই করবে ?

রাজা । কেন তুমি ?

সেনাপতি । ওরে বাবা হুঙ্কার শুনেই আমি মারা যাব

রাজা । তবে কোটাল

কোটাল । ওরে বাবা আমি নয়

রাজা । তবে কে ?

কোটাল, সেনাঃ । (একসঙ্গে) ওই প্রহরী

প্রহরী । (কাঁপতে কাঁপতে) হাতী ঘোড়া গেল তল
মশা বলে কত জল ?

রাজা । তা হলে ?

BLEED THROUGH.

সকলে। মহারাজ আপনি থাকতে আমরা ?

রাজা। (খাজায় কামড় দিয়ে) না না ওরে বাব্বা !

রাজদূতের প্রবেশ।

রাজদূত। মহারাজ

রাজা। কেন দূত ?

রাজদূত। দুজন সেপাই এসেছে বাইরে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রাজা। নিয়ে এস।

রাজদূতের সঙ্গে লালকমল আর তালপাতার সেপাইয়ের প্রবেশ। দুজনেরই হাতে তলোয়ার। তালপাতার সেপাইয়ের কোমরে ভেঁপু ঝুলছে

সেপাই। জয় হোক মহারাজ !

রাজা। কি চাও তোমরা ?

সেপাই লালকমল। (একসঙ্গে) লড়াই—

রাজা। লড়াই ? ওরে বাবা, ও রাণী এরা যে লড়াই চায়। কি করি কোথায় লুকুই ?

তালপাতার সেপাই। না মহারাজ আপনার সঙ্গে নয়

রাজা। (স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে) অ্যাঁ আমার সঙ্গে নয় ? বেশ বেশ লক্ষ্মী সেপাই, তবে কার সঙ্গে ?

সেপাই। দত্যিদের সঙ্গে

রাজা। দত্যিদের সঙ্গে ? হুহুঙ্কারের সঙ্গে ?

সেপাই। হ্যাঁ মহারাজ

রাজা। (সভাসদদের পানে ফিরে) হোঃ হোঃ বুজেছ, হোঃ হোঃ দত্যিরাজ হুহুঙ্কারের সঙ্গে লড়াই চায় বুঝেছ ?

সেনাপতি। হাঃ হাঃ হুঙ্কারে হুহু করে মরে যাবে

সেপাই। হুঙ্কারে করি না ভয়

রাজা। তালপাতার সেপাই ফুঁয়ে উড়ে যাবে

সেপাই। ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বাতাস ঘোড়ায় চড়ি

রাণী। সত্যি তোমরা দত্যিরাজের সঙ্গে লড়বে ? রাজকন্যেকে উদ্ধার করে আনবে ?

সেপাই। আনব মহারাণী

রাণী। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দত্যিপুরী জয় করে ফিরে এস।

সেপাই। কিন্তু রাজা আমাদের পুরস্কার ?

রাজা। (খাজা খেতে খেতে) পুরস্কার অর্দ্ধেক খাজাত্ব আর খাজকন্যে।

লালকমল। খাজকন্যে ? খাজকন্যে কি ?

রাজা। খাজকন্যে না বললে মেলেনা যে। খাজকন্যে মানে রাজকন্যে

সেপাই। আর খাজাত্ব মানে কি রাজত্ব নাকি ? রাজত্ব টাজত্ব চাইনে বাপু, ও বড় হেঙ্গাম।

রাজা। না না অর্দ্ধেক খাজাত্ব মানে আধখানা খাজা।

সেপাই। আধখানা খাজা
খেতে বড় মজা
রাজী মোরা কঙ্কণ-না রাজা

আচ্ছা মহারাজ চললাম। রাজকন্যেকে উদ্ধার করে তবে ফিরব। চল লালকমল।

রাণী। জয় তালপাতার সেপাইয়ের জয়।

সভাসদেরা। জয় অর্দ্ধেক খাজাত্বের রাজার জয়।

চলে গেল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সামনে দিগন্তজোড়া ধূ ধূ মাঠের বাঁ দিকে পাহাড়। পাহাড়ের নীচেই তিনটি গুহা। মাঠ চিরে রাঙামাটির লালপথ, সূর্য্য যেখানে অস্ত যায়, সেখানে গিয়ে হারিয়ে গেছে। কঙ্কণ-না রাজার দেশ ছাড়িয়ে দত্যিপুরীর ওপর সূর্য্যাস্তের আকাশ যেন রেগে লাল হয়ে গন্ গন্ করছে। মাঠের ওপর ঘূর্ণি হাওয়া সোঁ সোঁ করে এসে সবেগে খড় কুটো পাতা আকাশে তুলে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আবার নেমে এসে পাগলা মোষের মত নিঃশ্বাস ফেলতে গুহা তিনটির পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে একটা মেঘের দলা কালো বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে আছে।

গুহা তিনটের থেকে তিনটে বুড়ি বেরিয়ে এল। তাদের মুখের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। কোটরে বসা চোখ জলছে ভাঁটার মত। খাঁড়ার মত নাক, মাথায় শণের মত পাকা চুল। পরণে রাতের মত অন্ধকার কালো কাপড়। বুড়ি তিনটে গুহার বাইরে এসে সার হয়ে দাঁড়াল, তারপরে চোখের ওপর হাতের ছাউনি দিয়ে একদৃষ্টে মাঠের পারে তাকাল।

প্রথম। তেপান্তরের মাঠে আজ বীরবাতাস উঠেছে

দ্বিতীয়। আকাশে বিষ কালো মেঘের থাবা

তৃতীয়। আর বাতাসে ঘুরে ঘুরে কার যেন কান্না ভেসে আসছে। বন্ধজলার ওপার থেকে আলেয়া উঠছে নেচে নেচে। ডাইনি পাহাড়ের ভেতর থেকে আহত পৃথিবীর গোঙানির গর্জ্জন কেঁপে কেঁপে ঠেলে উঠছে। কে যেন আসছে, কে যেন দিগন্ত কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে, বিদ্যুতের তলোয়ার ঝলসে ছুটে আসছে। চারিদিকে কি যেন অমঙ্গলের সূচনা আমাদের ডাইনি বুকও থেকে থেকে ভয়ে চমকে উঠছে।

দূরে ভেঁপুর আওয়াজ

ওকি? ওকি ও? ও কা'র ভেঁপুর আওয়াজ? এ পথে কে আসে?

হাতে তরোয়াল খোলা তালপাতার সেপাই আর লালকমলের প্রবেশ।

তরোয়ালে আজ ঝলক উঠেছে বিদ্যুৎ খান খান
পথের পাথর আথাল পাথাল শত্রুরা সাবধান

মানুষ? দত্যিপুরীর পথে পা বাড়িয়েছে ভয় নেই?

সেপাই। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।

লালকমল। ও ভাই সেপাই ওখানে কারা?

সেপাই। এই ও তোমরা কে?

বুড়িরা। আমরা ডাইনি পাহাড়ের ডাইনি বুড়ি। আদ্যিকালের আদ্যি থেকে খড়ি পেতে বসে পৃথিবীর বয়স আমরা হিসেব করি। তা তোমরা কারা বাছা চলেছ কোথায়?

সেপাই। আমরা চলেছি দৈত্যপুরে। দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের অত্যাচারে পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দৈত্যরাজের সাথে আমরা লড়াই করব।

বুড়িরা। খবরদার খবরদার ওপথে যেও না। ওই দেখ দৈত্যপুরের পাহাড়ের মাথায় আজ আগুন জ্বলেছে, ওই দেখ আকাশে কালপুরুষের কালো মুখ জ্বল জ্বল। শুধু শুধু প্রাণ খোয়াবে? শুনছ না কালপেঁচার ডাক? আর ওই শ্মশানে, থেকে থেকে মরাকুকুর আকাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠছে? ভয় নেই তোমাদের, প্রাণের মায়া নেই?

সেপাই। না, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভাবনা নেই, পায়ের নীচে পথ আমাদের ডাকছে, আমরা দুরন্ত হাওয়া।

বুড়িরা। কিন্তু ওই যে দেখছ বীরবাতাস, ওকে ঠেলে তোমরা যাবে কি করে?

সেপাই।

আমরা ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বীর বাতাসে চড়ি
আমরা জীবন করেছি জয়
মরণে নেইক ভয়।

চল লালকমল

লালকমল। চল

চলে গেল।

১ম বুড়ি। যাক যাক যাক, হয়ে যাক। চল বোন আমরা ঘরে যাই। ঘরছাড়াদের পথে চেয়ে থাকলেও আমাদের চলে না। আকাশে রাতের কালো ওড়না উড়েছে আমাদের তারা গোণবার সময় হোল। বিধাতা পুরুষের অলক্ষ্য হাসি বেয়ে যে সব দুষ্টু তারা ঝরে পড়বে পৃথিবীর বুকে, তাদের আবার কুড়িয়ে রাখতে হবে। ওই যে ওই একটা নীল তারা খসে পড়ল। চল বোন চল।

সকলে। চল চল চল!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালপথ প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের বুকে এসে রুখে গেছে। পাহাড়ের মাঝখানে প্রকাণ্ড লোহার দরজা। দরজার সামনে লালকমল আর তালপাতার সেপাই।

সেপাই। এসে গেছি লালকমল এসে গেছি। এই যে দত্যিপুরীর ফটক

লালকমল। কিন্তু ফটক যে বন্ধ

সেপাই। তৈরী হয়ে দাঁড়াও, এখুনি ফটক খুলে যাবে দত্যিরাজ হুহুঙ্কারে এখুনি আসবে ছুটে।

সেপাই ভেঁপুতে ফু দিল

পাহাড়ের ভেতরে একসঙ্গে যেন কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। একটা প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে পাহাড় উঠল কেঁপে।

সেপাই। ওই এল এল—

লোহার ফটক সশব্দে খুলে গেল। তার ভেতর দিয়ে বিরাট চেহারা, ভয়ঙ্কর আকৃতি দৈত্যরাজ গর্জ্জন করতে করতে বেরিয়ে এল!

দৈত্যরাজ। কেরে দৈত্যপুরীর ডঙ্কাতে ঘা দেয়? কার এত সাহস? তোরা কেরে ছোঁড়া?

দুজনে। আমরা তোমার যম!

দৈত্যরাজ। যম? যম? ঘাড়ে কটা মাথা?

সেপাই। একটা

দৈত্যরাজ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে?

সেপাই। আমি তালপাতার সেপাই

দৈত্যরাজ। তোকে ত ফুয়ে উড়িয়ে দেব। আর তুই?

লালকমল। আমি লালকমল

দৈত্যরাজ। কি চাই তোর?

লালকমল। লড়াই

দৈত্যরাজ। বটে? আজ লড়াইয়ের সখ দিচ্ছি মিটিয়ে, বার কর তরোয়াল।

তালপাতার সেপাই তরোয়াল হাতে ছুটে এল। কিন্তু দৈত্যরাজের বিরাট এক ফুঁয়ে সে সাতহাত দূরে গিয়ে ঠপ করে পড়ল।

সেপাই। ওরে বাবা

তখন লালকমল আর দৈত্যরাজের তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি চলেছে।

সেপাই। সাবাস লালকমল! সাবাস সাবাস! দৈত্যরাজের পড়ন্ত তরোয়াল লালকমল তার মাথার ওপর রুখল। তারপরে দৈত্যরাজের হাতে এক খোঁচা

দৈত্যরাজ। উহু গেছি গেছি

সেপাই আবার উঠে তরোয়াল উচিয়ে ছুটে এল আর আবার দৈত্যরাজের ফুঁয়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল, আবার লালকমলের সঙ্গে লড়াই চলতে লাগল।

লালকমল। সেপাই সেপাই আমি আর পারছি না, আমার হাত অবশ হয়ে আসছে।

দৈত্যরাজ হেসে উঠল

সেপাই। ভয় নেই লালকমল তুমি আমার পেছন থেকে ঠেলে থাক দেখি, যেন উড়ে না যাই।

সেপাই উঠে এল লালকমলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লালকমল দুহাতে তাকে ঠেলে রইল।

সেপাই। সামাল হুহুঙ্কার

দৈত্যরাজ। (চীৎকার) উঃ!

সশব্দে পতন আর মৃত্যু

সেপাই। ব্যস্ দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের হুঙ্কারে আর পৃথিবীকে কোনদিন ভয় পেতে হবে না

লালকমল। কিন্তু রাজকন্যে?

সেপাই। চল যাই দৈত্যপুরে, দেখি কোথায় আছে সে রাজকন্যে!

ফটকের ভিতর দিয়ে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মস্ত এক বাগান। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাগানের একপাশে একটা কুঁড়ে ঘর। ঘরে রাজকন্যে ঘুমুচ্ছে। দূরে ভেঁপুর আওয়াজ।

রাজকন্যে। (চমকে জেগে) কে? কে? কে আসছে এ পথে? আমার বড্ড ভয় করছে। আমি ছেলে মানুষ এত বড় বাগান পাহারা দিতে আমার বড্ড ভয় করে। আমার মার জন্যে মন কেমন করে কিন্তু কেউ সে কথা শুনবে না, বুঝবে না। তাই ফুলেদের আমি আমার দুঃখের কথা শোনাই। ওরা তবুও বোঝে, বুঝে ঘাড় নাড়ে।

খোলা তরোয়াল হাতে সেপাই আর লালকমলের প্রবেশ

সেপাই। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও—

তরোয়ালে আজ ঝলক উঠেছে বিদ্যুৎ খান খান
পথের পাথর আথাল পাথাল শত্রুরা সাবধান

রাজকন্যে। না না আমায় মেরোনা, আমায় মেরোনা।

সেপাই। তুমি কে গো?

রাজকন্যে। আমি রাজকন্যে। দত্যিরাজ আমায় ধরে এনে এই বাগানের মালিনী করে রেখেচে। আমার মার কাছে যাবার জন্যে এখন মন কেমন করে।

লালকমল। আর তোমার ভয় নেই রাজকন্যে। দৈত্যরাজকে আমরা মেরে ফেলেছি।

রাজকন্যে। সত্যি? তুমি বুঝি রাজপুত্তুর, সাতসমুদ্দর তেরো নদী পার হয়ে এসেছ?

সেপাই। এই দেখ যা বলেছিলুম। দেখা হতে না হতেই রাজপুত্তুরের বায়না। না বাপু ও রাজকন্যে টন্যে আমার চাইনা। লালকমল, ও রাজকন্যে নিতে হয়ত তুমি নিও। আমার আধখানা খাজাই ভাল, সারা জীবন ধরে আর খাওয়ার ভাবনা থাকবে না।

লালকমল। না রাজকন্যে, আমি রাজপুত্তুর নই, আমি গরীবের ছেলে কুঁড়ে ঘরে থাকি, তবে আমার কিছু অভাব নেই। একটি অভাব ছিল খেলার সাথীর, সে অভাবও এখন এই তালপাতার সেপাই মিটিয়েছে।

রাজকন্যে। তোমার আল্লাদী পুতুল আছে ?

লাল। না

রাজকন্যে। তোমার পুঁতীর মালা আছে ?

লাল। না

সেপাই। দেখেছ দেখেছ স্থুরু হয়েছে বায়না

লাল। না রাজকন্যে, আমার কিছু নেই, আছে শুধু এই তালপাতার সেপাই।

রাজকন্যে। তালপাতার সেপাইত ভারী !

সেপাই। ভারী নয়, ভারী নয় হাল্কা।

ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বাতাস ঘোড়ায় চড়ি।

রাজকন্যে। (লালকমলকে) তোমার নাম কি ভাই ?

লাল। আমার নাম লালকমল

রাজকন্যে। আচ্ছা লালকমল, তুমি আমাদের রাজ্যে চল, তোমায় কত খেলনা দেব, তারপরে একদিন তুমি রাজা হবে। যাবে ?

সেপাই। যাও লালকমল তুমি রাজা হওগে, আমার জন্যে দখিন থেকে মলয় ঘোড়া ছুটে আসছে আমি যাই।

লাল। না না, আমি রাজা হতে চাইনা, আমি আমার মাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে চাই না।

সেপাই। বেশ তবে চল।

রাজকন্যে। আমিও মার কাছে যাব

সেপাই। সেই ভালো। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে রাজার কাছ থেকে অর্দ্ধেক খাজাত্ব নিয়ে আমরা রওনা হই।

লাল। চল, চল

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

লালকমলের ঘর বিছানায় তেমনি মশারী ফেলা। ঘরের প্রদীপ নিভানো। লালকমল আর সেপাইয়ের প্রবেশ। সেপাইয়ের হাতে আধখানা খাজা।

লালকমল। আঃ কতপথ ঘুরে, কত পরিশ্রমের পর এই ঘরটি আমার কি মিষ্টি

সেপাই। (খাজায় কামড় দিয়ে) ঠিক এই খাজার মত। আমার মিষ্টি খাজা লাভ, তোমার মিষ্টি ঘর লাভ।

লাল। ঘর ত আমার ছিলই

সেপাই। কিন্তু ঘর ত তখন মিষ্টি ছিল না। ঘর ছেড়ে বেরোলে কি ঘর মিষ্টি হয় ?

লাল। (হাই তুলে) সেপাই আমার ঘুম পাচ্ছে

সেপাই। যাও তুমি শুয়ে পড়—

লাল বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে বকুল গন্ধের সঙ্গে চাঁদের আলো আসছে। সেপাই সুর করে বলতে লাগল।

মায়াকাজল মায়াকাজল লালকমলের চোখে
ফুলের পানে তারার মালা মিটমিটিয়ে দেখে
লক্ষ তারার জ্বলে সেই যে দেশে ভাই
হাওয়ার পিঠে ওপর নীচে সেথায় আমি যাই
ওপর নীচে ওপর নীচে ফুলের রেণু মেখে
দোলন চাঁপায় দোলায় দোলায় চিহ্নখানি রেখে
চাঁদের আলোর হাল্কা চাদর যেথায় ওড়ে ভাই
হাওয়ার পিঠে মেঘের ভেলায় সেথাই আমি যাই।

ঘুমোও, লালকমল ঘুমোও। আমি আসি। এই যে হলুদ পুকুরের পাড়ে একানড়ে তালগাছ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে, আমি যাই আমি যাই। ধনুকছাড়া তীরের মত আমি যাই।

(সেপাই যে জানলা দিয়ে এসেছিল সেইপথে বেরিয়ে গেল)

লালকমল। (হঠাৎ জেগে) একি একি? সেপাই কোথা গেল! একি স্বপ্ন মা মা!

লালের মা ছুটে এলেন

মা। কি, কি হয়েছে লাল?

লাল। মা আমি আশ্চর্য্য এক স্বপন দেখেছি।

মা। ঘুমো ঘুমো লাল, এখনও রাত অনেক। প্রদীপটা আমি জ্বালি।

লালের মা প্রদীপ জ্বাললেন

লাল। মা, তুমি আমার কাছে বোস না

মা। এই যে বাবা—

মশারীর ভেতর গিয়ে বসলেন

ঘুমো এবার ঘুমো। আমি গান গাইছি শোন।

লালকমলের মায়ের মৃদুস্বরে গান। মশারীর ভেতর থেকে আবছা অস্পষ্ট চেহারা। গানের শেষের দিকে ধীরে ধীরে যবনিকা।

গান

নীল আকাশে চাঁদের হাসি
সাদা মেঘের খেলা
ছায়া পথে ভেসেছে মোর
স্বপন পুরীর ভেলা।
বেলা যে আজ পড়ে এল
পথ হোল চঞ্চল,
যাত্রী ওরে রাত্রি আসে
আগেই ছুটে চল!
ছায়াপথে পথ হারাল
দিক্‌ভোলাদের দল,
অশ্রুজলেই মুছে গেল
চোখেরই কাজল,
আঁখি তাদের মুছে নিতে
আমাদের এই ভেলা;
আয়রে পাগল আয় ক্ষ্যাপাদল
এল যাবার বেলা

ওলটু বাঘ

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

পুরী সহরে কয়দিন ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা গেল। সন্ধ্যা না হতে হতেই সমুদ্র তটের যেদিকটায় বাসস্থানগুলি বিরল হয়ে এসেছে, লোকালয়গুলি দূরে দূরে, সেই দিকে লোক চলাচল একদম বন্ধ। রাত দশটা বাজতে না বাজতে সহরের দোকান পাট বন্ধ, যারা খোলা বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাতো, তারা ঘরে খিল দিয়ে শোয়, জানালার কাছে খাট টেনে কেউ শুতে চায় না। আমাদের মালী, তার বৌ, আর আমাদের বুড়ী ঝি এরা তো সন্ধ্যের দিকে কাজ করতেই এলনা দু'দিন। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কি হয়েছে রে? আসিস্ না কেন্ রাতে?" বুড়ী ঝিটা চোখ কপালে তুলে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে, "আলো দিদি. একটা বড্ডো বাঘ-ত আউছি।" অমনি মালীও চোখ গোল গোল করে বল্লে, "হঁা দিদি গোটে মনুষ্য আর ছিটা গাউ খাই সারি লানি।" আমাদের এখানকার নতুন দিদি অমনি তাঁর কুকুর ছানা টিকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে বল্লেন, "এই খানে বসে থাক্, খবরদার বেরোবিনি—বাঘ এসেছে।" কুকুর তো মহানন্দে লেজ নাড়তে সুরু কর্‌লেন, যেন বাঘ আসা ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক। চারিদিকে রব উঠল—"বাঘ" "বাঘ"! সেই দিন সন্ধ্যাবেলা এক পাল গরুকে দৌড়ে বাড়ীর দিকে আসতে দেখে তো আমাদের চাকর হুঁকো ফেলে দে ছুট একেবারে সামনের স্কুল বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরে, সেখানে গিয়ে দরজা এঁটে সে বসে পড়ল। আর মোটর ক্লিনারটা বাইরে হল ঘরে কাঁউ মাঁউ সুরু করল।

তার পরদিন পাশের বাড়ীর মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় হুড়মুড় করে ছুটে এলো আমাদের আশ্রমে। তাদের ভীত চকিত মুখ দেখে সবাই ত্রস্ত ব্যস্ত—"কি হয়েছে? কি হয়েছে?" তাদের মা ছিলেন আশ্রমে, সন্ধ্যাবেলার স্তবে যোগ দেবেন বলে। মেয়েরা বল্লে, "ওমা, বড় ভয় কর্‌ছে, শীগগির বাড়ী এসো, কেউ ডাকছে।" আর কি! আশ্রমের কয়েকটী মেয়ে চোখ পর্য্যন্ত খুল্‌তে চায় না। যেন তারা চোখ না খুল্‌লে বাঘ আর বার হবে না কি আসবে না।

সকাল বেলা বুড়ী ঝিটা এসে বল্‌ছে কি—"দিমিমণি কাল 'ফেউ' শুনেছিলে?" আমি বল্লাম, "শেয়াল তো রোজই চেঁচায়—কালও চেঁচিয়েছিল, তবে 'ফেউ' ডেকেছিল কি এমনি 'ক্যা হুয়া' বলেছিল তা বাপু আমি মন দিয়ে শুনি নি।" ও তখন হাতের ঝাঁটা গাছটা না মেঝেয় ফেলে বেশ আরাম করে পা মুড়ে মেঝেয় বসল, তার পর বল্ল, "না, না, ক্যা হুয়া বলে নি, বাঘের পিছনে 'ফেউ' হয়েই লেগেছিল। আমার ছেলে দেখেছে।"

"তাকে বাঘে খেল না ?

"না, দিদিমণি, ঠাট্টা নয়। ও বাঘটা যে ওলটু বাঘ, ওলটু বাঘ জান না তো ? (আমি সত্যি ওলটু পালটু কোনই বাঘ জানি না, তোমরা তাদের চেন কি ?) ঐ বাঘ দিনের বেলা মানুষ হয়, আর রাতে দশটার পর বাঘ হয়ে যায়। এখন আমার ছেলে কাল রাত ৯টার পর বাজার থেকে সওদা কিনে আস্‌ছে বাঘটাও তখন বাজারে গিয়েছে, সেও ছেলের সঙ্গে ফির্‌ছে। স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি এসে বাঘ-মানুষটা সমুদ্রের ধার ধর্‌ল। আমায় ছেলেও তো ঐ পথ দিয়ে আসে, বাড়ীটা কাছে হয় কি না ?—ছেলেতো একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছে—ঐ মানুষটার গা থেকে বার হচ্ছে। কিছু দূর যেতে যেতেই মানুষটা কেমন মাথা দুলিয়ে চলতে আরম্ভ করল। ছেলের তো ভয় ভয় কর্‌তে লাগল—ও ছুট্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী এসে পৌঁছালো। তারপর আমরা জান্‌লা দিয়ে দেখি কি, লোকটা কেমন কেমন করে চল্‌ছে, সামনে হাত দুটো ঝুলে পড়েছে, গাটা ঝুঁকে পড়েছে, আর মাথা চালাচ্ছে। এমন সময় ও বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজ্‌লো আর অমনি মানুষটা বাঘ হয়ে দে ছুট। সে কি যেমন তেমন বাঘ! রাজার ছোট হাতীটার মত মস্ত এক বাঘ। জান, রাজা মারতে গিয়ে

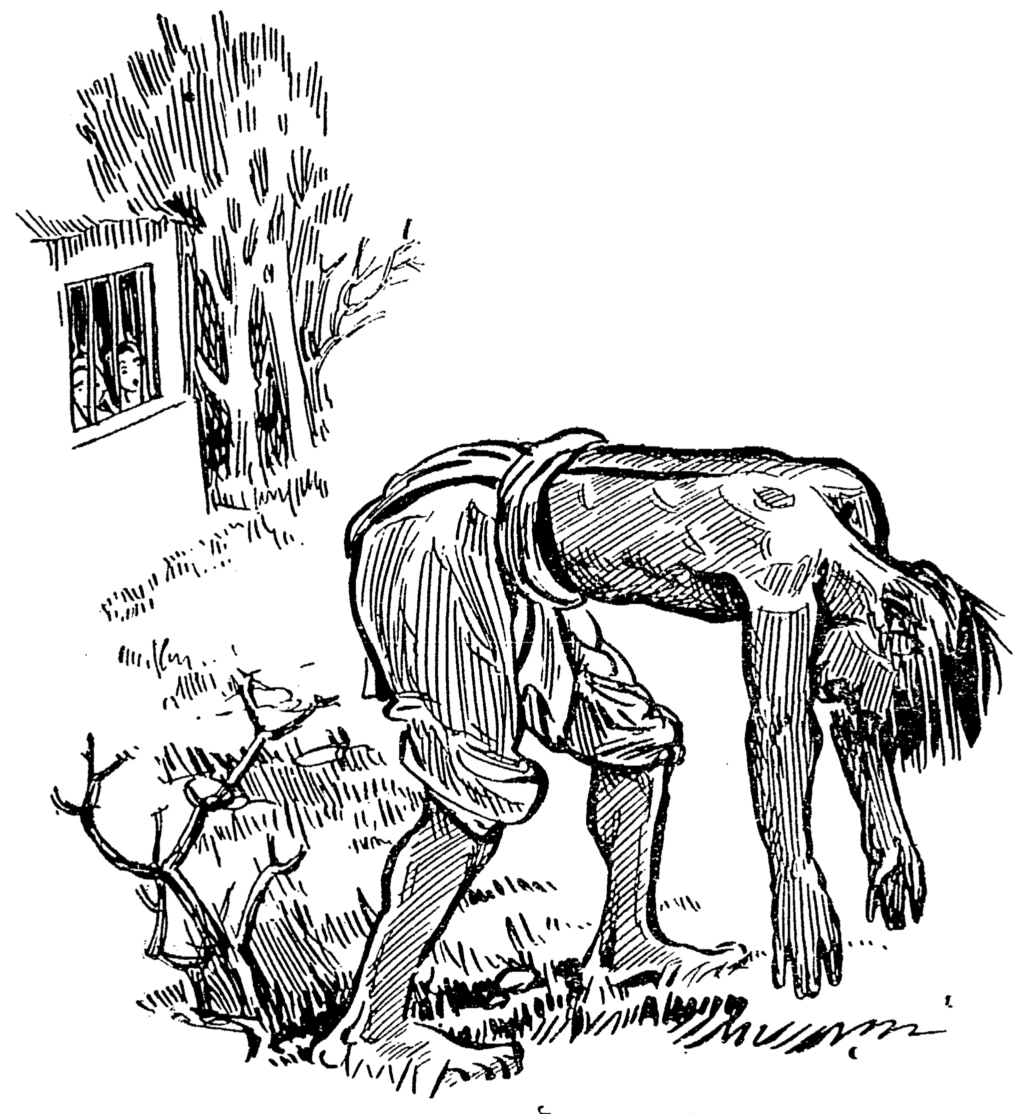

সামনে হাত দুটো ঝুলে পড়েছে

ফিরে এসেছে। ওঃ বাবা, ওলটু বাঘ কি মার্‌তে পারা যায় ? সে যে কোন্ ফাঁকে পালাবে তার কি কিছু ঠিক আছে ?—ও কি! হাস্‌ছো কেন, দিদিমণি ? বিশ্বাস কর্‌ছ না—"

"না না, বিশ্বাস করছি! সব বাঘই তো পালায়, সে ওলটুই হোক্ আর পালটুই হোক্।

"না, না, ওলটু বাঘ বড্ড ফাঁকী দেয়। দিনে মানুষ রাতে বাঘ—ও ভারী চালাক হয়।"

বাঘটা নাকি বারো হাত লম্বা বৃহল্লাঙ্গুল আচার্য্য মহাশয়দের একজন। তোমাদের ধরণীবাবু নিশ্চয়ই ওলটু বাঘ দেখেন নি ? তাঁকে একবার এদিকে পাঠাতে পার না ? তা হলে রংমশাল কার্য্যালয়ে ওলটু বাঘের গায়ের চামড়ার 'র‍্যাগ' পাতা হতে পারে।

ছন্দরবিস্তোত্র

শ্রীসতীকান্ত গুহ

'শান্তি নিকেতন' গেহে প্রকৃতি মায়ের স্নেহে
আপনি আছেন সুখে ছন্দে কথা কন,
আমরা মিলের খোঁজে এত ঘুরি লোকে বোঝে!
ক্রিটিক তবুও রুষ্ট কভু তুষ্ট নন।

করে শত ছল ছুঁতো মারেন রুলের গুঁতো
সমালোচনার ফাঁস কবিত্রাসপাশ—
লিখিয়ের বড় জ্বালা পিঠেতে তুলোর ছালা
সদা কর্ণ ঝালাপালা, ভয়ে হাসফাস।

ছাপার ভরসা নাই মাসিকে লিখিনা তাই
সম্পাদক ছুঁচো মর্ম্ম পারেনা বুঝিতে,
বলে 'মৌলিকতা নেই ভাবের বহর এই ?
মশায়ের ছন্দে হাত হবে পাকাইতে!'

মৌলিকতা হলে ল্যাঠা বলে 'ছোঁড়া বখা জ্যাঠা'!
প্রকাশ্যে বলেনি 'ব্যাটা' বলেছে গোপনে,
বয়স নয়ত বিশ সংসার হয়নি বিষ
না হলে যেতাম ভেক নিয়ে বৃন্দাবনে।

'স্বপ্রতিভা তীক্ষ্ণধার'— নেই মনে অহঙ্কার,
প্রতিভা শানায়ে তবু এনু ভীতমনে,
হবে শ্রুতি ছিন্নভিন্ন তবু না হবেন খিন্ন
এই ভরসায় ছন্দ রাখিনু চরণে।

ছন্দে রবি চলেন হেসে রঙ ছিটিয়ে,
ছন্দে রবি ফেরেন গ্রহের দলটি নিয়ে,
ছন্দে রবি নিত্য জাগান চাঁদের হাসি,
ছন্দে তো তাই জোয়ার ভাটা ; আলোর বাঁশী
ছন্দে যে তাই বাজান এবং ফোটান কমল,
ছন্দে জাগে সূর্য্যমুখী, রঙ-শতদল,
ছন্দে রবির আসর জমে ; চোখ ধাঁধিয়ে
পূবআকাশে দিলেন দেখা ঝল্‌মলিয়ে।

রবির আগে কী হাল ছিল ? ফুটতো জরা ?
তখন শুধু তারার আলোয় চলত সভা ।
মিট মিটে ওই আব্‌ছা আলোয় আকাশতলে
ফুটত শুধু রাতের কুসুম , অলির দলে
ভিড় হোতনা এখন যেমন ; নেহাৎ যারা
ছন্দপাগল এবং খ্যাপা লক্ষ্মী-ছাড়া,
তারাই শুধু জুটত কেমন প্রাণের টানে,
হঠাৎ রবি এলেন পূবে রঙের গানে ।

ছন্দরবি অনেক দেশেই ছিলেন যাঁরা,
ছন্দে উঠে ছন্দে ডুবে গেছেন তারা ;
এই জগতের সবখানেতেই তাঁদের ডেরা,
তবুও মোদের পূবের রবিই সবার সেরা ।
প্রথম রবি পূবেই ছিলেন অনেকশত
তাঁদের আলোর ছন্দসুরের বাহার কত !
সব জমিয়ে এই রবি যে এলেন চলে'
তাই এ রবির চটক দেখে জগত ভোলে !

যদিও আমি নইকো গ্রহ কিম্বা তারা
যদিও বুকে নেই অতি ক্ষীণ আলোর ধারা,
ছন্দে দখল নেই এতটুক, পথ বিপথে
বেড়াই ঘুরে, তবুও আশা, ভবিষ্যতে,
রবির আলোয় হাসেন যাঁরা তাঁদের পাশে
উঠবো ফুটে জোনাই আলোয় ক্ষীণ আভাষে ।
ছন্দ ভেঙে ছন্দরবির গাঁথনু ছড়া,
রবির কিরণ ধার করেছি, কি আর করা !

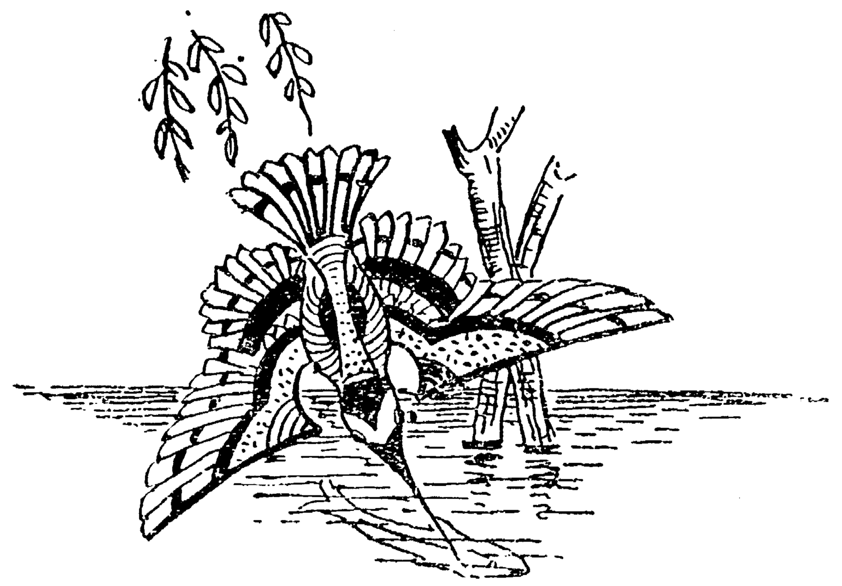

মঙ্গলগ্রহে প্রাণী

শ্রীকমলেশ রায়

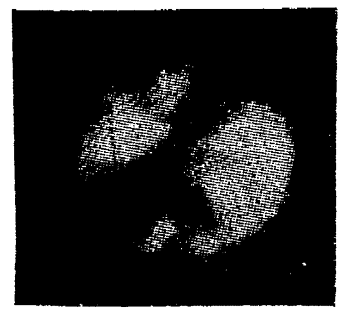

মঙ্গলগ্রহ

মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে কিনা তাই নিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব হৈ-চৈ ওঠে। সূর্য্য থেকে পৃথিবী যতদূর—মঙ্গলগ্রহ তার চেয়ে একটু বেশী দূরে। মঙ্গলগ্রহকে পৃথিবীর প্রতি-বেশী বলা চলে, কারণ মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রহ। পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়াও নাকি অনেকটা একপ্রকার—মঙ্গলে নাকি একটু বেশী ঠাণ্ডা এবং জল কম। আবহাওয়া ও উষ্ণতার মাত্রা বিচার করলে মনে হয়, মঙ্গলগ্রহ অনেকটা যেন পৃথিবীর মতই।

তা হ'লে সেখানে কি মানুষ, পশু-পাখী, গাছপালা থাকতে পারে না ?

আর যদি সেখানে জীবজন্তু থাকে, তবে তারা কি নতুন হয়েছে, না পৃথিবীর জীবজন্তুর অনেক আগে থেকেই সেখানে তারা আছে ?

টেলিস্কোপে দেখা গিয়েছে মঙ্গলগ্রহের গায়ের চেহারাটাও নাকি পৃথিবীর মত উবড়ো-খেবড়ো একটা শক্ত বা নরম আবরণ দেওয়া। আর চাঁদের গায়ে যেমন আমরা দেখতে পাই সাদা কালো ছায়া, তেমনি মঙ্গলগ্রহেও নাকি ঐ রকম দেখতে পাওয়া যায়। তবে চাঁদে যেমন ঠাণ্ডা—মঙ্গলগ্রহে তেমন নাকি নয়, কাজেই মঙ্গলগ্রহে জীবজন্তু, গাছপালা থাকা অসম্ভব নয়।

মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মত নাকি শীত গ্রীষ্ম আছে! ফটোগ্রাফে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন যে শীতের সময় মঙ্গলগ্রহের এক রকম চেহারা আর গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম চেহারা। মঙ্গলগ্রহের কোন কোন অংশে দেখা গিয়েছে একসময় কালো কালো ছায়া আবার অন্য সময় সে বিশেষ অংশের চেহারা একেবারে সাদা। তাঁরা বলেন এই কালো ছায়াগুলি গাছপালার—তখন মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্ম ; আবার যখন তার চেহারা সাদা—তখন সেখানে শীত ; শীতে গাছপালা আর নেই। তবে, মঙ্গলগ্রহে যখন গাছপালা থাকার এরূপ সম্ভাবনা—জীবজন্তু থাকাটাও বিচিত্র কী ?

মঙ্গলগ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে—সূর্য্যের অপেক্ষা দূরে বলে হয়ত মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর আগেই ঠাণ্ডা হতে সুরু হয়েছিল। উপযুক্ত ঠাণ্ডা হলে পৃথিবীতে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার

অনেক আগেই মঙ্গলগ্রহ ঠাণ্ডা হতে সুরু হয়েছিল—তাই মনে হয়, সেখানে যদি প্রাণী থাকে তারা আরো অনেক আগে জন্মেছে। তারা হয়ত আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

আর একটা মজার কথা। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন,—"আমরা দূরবীণ দিয়ে মঙ্গলগ্রহের ওপর লম্বা লম্বা খাল দেখতে পেয়েছি।" তাঁরা বলেন,—মঙ্গলগ্রহে জল কম, তাই মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশ থেকে মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষাকৃত গরম অংশ পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করার জন্য লম্বা খালগুলি খেটেছে! আশ্চর্য্য, খালগুলি সরল রেখার মতই সোজা, যেন অঙ্ক কষে এই খালগুলি কাটা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করলেন, মঙ্গলের লোকেরা খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বড় ইঞ্জিনীয়ার!

এই সব মিলিয়ে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে সকলের এক অদ্ভুত ধারণা হল। হবার কথাই! সকলে ভাবতে লাগলেন, যদি মঙ্গলগ্রহে লোক থাকে, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কেমন করে কথাবার্ত্তা বলা যায়? প্রথমে তাদের জানান দরকার যে, পৃথিবীর উপর আমরা আছি, তা হ'লে তারাও আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কি ক'রে জানান যায় যে এখানে আমরা সভ্য, শিক্ষিত মানুষ আছি আর আমরা ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে চাচ্ছি? একজন বললেন,—সাহারা মরুভূমির ওপর আগুন দিয়ে বড় বড় করে কতকগুলি কথা লিখে দেওয়া যাক ঃ মঙ্গলগ্রহ থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখতে দেখতে কারো হয়ত নজর পড়তে পারে! কিন্তু মুস্কিল এই যে তাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা তো এক হ'তে পারে না। সকলে ভাবতে লাগলেন, তাইতো কী করা যায়!

তখন একজন একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি বল্‌লেন,—সাহারা মরুভূমিতে কোন রকম কথা লিখে লাভ নেই, কারণ, মঙ্গলগ্রহের লোকেরা সে ভাষা বুঝতে পারবে না। তারচেয়ে সেখানে আগুন দিয়ে বড় বড় ক'রে জ্যামিতির চিত্র এঁকে দেওয়া হোক্। তারা যখন এত বুদ্ধিমান, ইঞ্জিনিয়ার, তখন নিশ্চয়ই তারা অঙ্ক আর জ্যামিতি জানে। ভাষা তফাৎ হ'তে পারে, কিন্তু জ্যামিতির চিত্র তো আর বদ্‌লাবে না! তিনি বল্‌লেন,—সুবিখ্যাত পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যটির (সাধারণ স্কুল জ্যামিতির ২৯ নং প্রতিপাদ্য) চিত্র এঁকে দেওয়া যাক্। এই প্রতিপাদ্যটি এত প্রয়োজনীয় যে, কোন দেশের কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছে অজানা থাকতে পারে না। মঙ্গলগ্রহে যদি বাস্তবিকই সুসভ্য প্রাণী বা বুদ্ধিমান মানুষ থাকে তবে তারাও এই মূল্যবান জ্যামিতির চিত্রটি নিশ্চয়ই জানবে। তা হ'লে মঙ্গলের কোনও বৈজ্ঞানিক যদি দূরবীণ দিয়ে হঠাৎ এই ছবি পৃথিবীর বুকে দেখতে পায়, তৎক্ষণাৎ বুঝতে

পারবে পৃথিবীতে সুসভ্য উন্নত প্রাণী আছে, যারা তাদেরি মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে। তখন তারাও আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করবে।

সকলে এই ফন্দির খুব তারিফ করলেন। তখন তাঁরা ভাবতে লাগলেন, কী ক'রে সাহারা মরুভূমির উপর আগুন দিয়ে জ্যামিতির ছবি আঁকা যায়। যাই হোক্, নানা কারণে তা আর হ'য়ে উঠল না।

এরপর বড় বড় টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়াতে, তার দ্বারা মঙ্গলগ্রহকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন—মঙ্গলগ্রহে কোন খালের চিহ্ন তাঁরা দেখতে পান নি—ওগুলি হয়ত চোখের ধাঁধাঁ মাত্র।

মঙ্গলগ্রহে হয়ত কোন জীবজন্তু নেই, হয়ত বা ছিল, কে জানে তারা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে কিনা! এর সঠিক খবর আজও আমরা জানি না।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন—মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন কম। সেখানকার পাথর—হাওয়া থেকে নাকি অক্সিজেন শুষে নেয়। টেলিস্কোপে মঙ্গলগ্রহকে অনেকটা লাল দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—সেখানকার পাথরে যে লোহার অংশ আছে—অক্সিজেন শুষে নেওয়ার দরুণ সে লোহা ও পাথরের পরিবর্ত্তন হচ্ছে ও এই লাল রং সেই লোহা পাথরের। আমাদের পৃথিবীতেও পাথরে যদি হাওয়া থেকে ঐ রকম অক্সিজেন শুষে নিতে থাকে—তা হ'লে এখানের অবস্থাও মঙ্গলগ্রহের মত হবে।

একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—মঙ্গলগ্রহে যদি প্রাণী থাকেও—প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে এসেছে। অক্সিজেনের অভাবে তাদের জীবন আজ বিপন্ন। হয়ত কয়েক হাজার বছর পরে মঙ্গলগ্রহ চাঁদের মতই প্রাণহীন হবে।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহটি সূর্য্য থেকে যেমন একটু বেশী দূরে, শুক্রগ্রহটি তেমনি একটু কাছে। ফলে, শুক্রগ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে একটু বেশী গরম। বৈজ্ঞানিকরা বলেন—সেখানে হয়তো কিছুকাল হয় কীটপতঙ্গ জন্মাতে সুরু করেছে। শুক্র ও মঙ্গলগ্রহ এ দুইটি প্রাণীবাসের অযোগ্য না হ'লেও সেখানে জীবজন্তু গাছপালা আছে কিনা একেবারে সঠিক বলা যায় না। এত বিশাল আকাশের আর কোথাও পৃথিবীর মতো গ্রহ দেখা যায় না যেখানে জীবজন্তুর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিরাট বিশ্বের বুকে শুধু পৃথিবীর উপর আমরাই হয়তো জীবন্ত প্রাণী!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেইদিন বিকেলে মংলু নদীতে সাঁতার কাটতে চলল। এটা তার একটা নতুন খেলা। যে দিন তার বিশেষ ময়লা মনে হয় নিজেকে, গায়ে অনেক পথের ধূলো জমে, সে নদীতে চলে যায়। মনের আনন্দে বহুক্ষণ মাছের মত সাঁতার কাটে। জলের নীচে বৃদ্ধ কাছিম অবাক হয়ে মানুষের ছানার এই খেলা দেখে।

সেদিন সাঁতার কেটে মংলু যখন উঠল তখন পশ্চিমের আকাশ উদাস রিক্ত লাল থেকে ধূসর কালো বর্ণ ধারণ করেছে। পাখায় পাখায় অদ্ভুত সারে পানকৌড়ি আর বকের দল বাসায় ফিরছে! বন থেকে, থেকে থেকে কি যেন সন্ধ্যার একটা করুণ শব্দ উঠছে। ভাল্লুকরা গেছে অন্যদিকে চরতে।

বনের পথে বাসায় ফিরতে মংলুর মনে হোল পেছনে কি যেন একটা সামান্য শব্দ। এত সামান্য যে শুনেও মংলুর মনে হোল তার মনের ভুল। সে পেছনে চেয়ে দেখল দূরের বড় ঘাসগুলো নড়ছে, যেন বাতাসেই। কিন্তু বনের জীবনে অভ্যস্ত ভাল্লুকদের মংলু তখন

বিপদ বুঝতে পেরেছে আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আকাশে চীল চেঁচিয়ে উঠল—বাঘ বাঘ; সাবধান মংলু!

কালকেতু পেছনে ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে তুলল।

মংলু ততক্ষণে ঘুরে আবার নদীর দিকে মারল ছুট। নালুখ সঙ্গে নেই। এখনও কালকেতুর সঙ্গে যোঝবার মত বল ছোট্ট মংলুর হয়নি। সে কথা সে জানে, সে বুঝছে তার একমাত্র আশা এখন নদী। তাই পাথর টপকে শালের দলের ফাঁকে ফাঁকে এঁকে বেঁকে বিদ্যুতের মত ছুটল মংলু। আর কালকেতু গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে, তার পেছু নিল। সে ভাবছিল—ব্যস্ আজকে মানুষের ছানাটাকে হাতে পাওয়া গেছে। বাঘের সঙ্গে ছুটে আর কতদূর?

মংলু তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে কিন্তু কালকেতুর প্রতি লাফে তাদের ব্যবধান কমে আসছে। মংলুর বুক ফেটে যাবার যোগাড়। সে ছুটেছে প্রাণপণে তবু সামনে একটা টিলা, তারপরেই নীচে দিয়ে নদী কুলকুল করে ছুটে চলেছে। বাঘও বুঝল যে তারা নদীর কূলে এগিয়ে চলেছে সামনেই নদীর বাধা, সে আরও আনন্দে গর্জ্জন করে উঠল কারণ সে ভেবেছিল নদীর কূলে গিয়ে নিশ্চয় মানুষের ছানাটা থমকে দাঁড়াবে। মংলুর মতলব সে বোঝেনি। কালকেতু আনন্দে আবার গর্জ্জন করে উঠল। এদিকে ক্ষিপ্র পায়ে মংলু টিলার ওপর উঠেছে। কালকেতু আর তার ব্যবধান মোটে দশ হাত। আর দুই লাফে কালকেতু তাকে ধরে ফেলবে কিন্তু ওই দেখা যায় টিলার চূড়া। কালকেতু ভাবল মানুষের ছানাটা আর যাবে কোথায়! তবু পলায়মান শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত আনন্দ বাঘেদের আর কিছু নেই। ততক্ষণে ঠিক টিলার মাথায় গিয়ে পৌঁচেছে মংলু। নীচেই গভীর নদীর কুলকুল শব্দ। টিলাটা খাড়া নদীর বুকে নেমে গেছে। কাল্‌কেতু শিকার গর্জ্জন করে মারল লাফ। আর সঙ্গে মংলু লাফাবার আগে, উ উ ই ই!—করে ডেকে উঠে ঝাঁপ দিল নদীতে। একটা দ্রুত তীরের মত নদীর জলে মিলিয়ে গেল সে।

কালকেতু মংলুর পরিত্যক্ত জায়গায় লাফিয়ে পড়ে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকটা তাকিয়ে রইল তারপরে সেও জলে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু মংলু তখন নদীর স্রোতে তীরের মত সাঁতরে বহুদূর এগিয়ে গেছে। জলে বাঘ আর তার অনুসরণ করে কি করবে? দেখতে দেখতে বিদ্যুতের মত গতিতে ছোট হতে হতে কালো একটা ছোট্ট বিন্দুর মত হয়ে বহুদূরে মিলিয়ে গেল মংলু।

বাঘ ভিজে জুবড়ি, ব্যর্থ হয়ে গোঁ গোঁ করতে কূলে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল। মংলু আবার তাকে ফাঁকি দিয়েছে।

সেদিন মংলু যখন বাসায় ফিরল, রাত তখন গভীর হয়েছে। বনের মাথায় প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ আর বনের গভীর উষ্ণ অভ্যন্তরে পাণ্ডুর উদাস রিক্ততা। বাসার ফিরে মংলু দেখে মহা হৈ চৈ। ভাল্লুক-মা পড়ে কাৎরাচ্ছে আর বাচ্ছারা ভীষণ হৈ চৈ লাগিয়েছে, নালুখ একঠারে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে চুপ।

—কি হয়েছে? মংলু জিগেস করল

কালা জবাব দিল—মায়ের পায়ে কাঁটা ফুটেছে

—কাঁটা ফুটেছে ত বের করে ফেললেই ত হয়।

এখন ভাল্লুকরা কাঁটার কাছে ভারী জব্দ। ছোট কাঁটা হলে কোন রকমে তারা বের করে ফেলে নয়ত কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেটাকে অভ্যেস করে নেয়। তাদের বিশাল থাবা দিয়ে সরু কাঁটা বার করে ফেলবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই মংলু যখন বলল যে—"বের করে ফেললেই ত হয়—"ভাল্লুকরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। নালুখ বলল—কাঁটা আবার বার করা যায় নাকি? কিছুদিন খুঁড়িয়ে চললেই ও কাঁটা অভ্যেস হয়ে যাবে। ভাল্লুকমা কাৎরে উঠল—না গো এ প্রকাণ্ড সরু কাঁটা, এ পায়ে থাকলে পা ফুলবে পেকে পুঁজ পড়বে। হয়ত পাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মংলু বলল—কই এদিকে এসোত দেখি। ভাল্লুকমা তিন পায়ে নেংচাতে নেংচাতে মংলুর কাছে এগিয়ে এল। মংলু তার আহত থাবাটা চাঁদের দিকে তুলে ধরে দেখল যে থাবার নরম জায়গাটায় একটা কাঁটা একেবারে গোড়া পর্য্যন্ত বিঁধে রয়েছে। প্রথমবারে তার সরু সরু আঙ্গুলের নখ দিয়ে কাঁটা ধরতে গিয়ে ফসকে গেল। কাঁটাটা খচ্ করে ওঠায় ভাল্লুকমা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।

মংলু বলল—মিছিমিছি ভীরু শেয়ালের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

নালুখ বলল—বেশ বলেছে মংলু, বেশ!

আবার নখ দিয়ে একবার মংলু কাঁটাটাকে সজোরে চেপে ধরল তারপরে বাঁ হাতের মুঠোয় থাবাটা প্রাণপণে চেপে একটানে কাঁটাটাকে বের করে ফেলল। ভাল্লুকমা বন ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল—উহুহু, গেছি গেছি!

ততক্ষণে ভাল্লুকের বাচ্ছারা এমন কি নালুখও অবাক হয়ে কাঁটাটা দেখছে।

নালুখ বলল—সাবাস মংলু

পাঁচমিনিটের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। ভাল্লুকমা বলে উঠল—আর মুখ ফুটে কথা বলতে হবে না। মোটা বুদ্ধি! একটা কাঁটা বার করবার ক্ষমতা নেই! ভাগ্যে মংলু ছিল তাইত বেঁচে গেলুম।

নালুখ হেসে বলল—মানুষের ছানাত! কেউটের বাচ্ছা তার বিষ ভোলে না, মানুষের বাচ্ছা তার বুদ্ধি ভোলো না।

তার আহত থাবাটা চাঁদের দিকে তুলে

ভাল্লুকমা তখন মংলুর ঝাঁকড়া মাথায় থাবা দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে আদর করে বলছে—তোর কি ভয় নেই মংলু? আজ একা এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? কালকেতুর হাতে কি শিকার হতে চাস?

ও যে তোর চির শত্রু!

মংলু শুধু বলল—জানি। আজ আমায় তাড়া করেছিল।

ভাল্লুকমা লাফিয়ে উঠল—অ্যাঁ?

—হ্যা! চিল আমায় জানিয়ে দিল যে পেছনে কালো বাঘ তাড়া করেছে।

—তারপরে?

মংলু হেসে বলল—সে আমায় ধরতে পারবে কেন? নদীতে সাঁতরে পালিয়ে এলুম।

ভাল্লুকরা বলে উঠল—সাবাস মংলু!

নালুখ বলল—ওই কালকেতুর একদিন মংলুর হাতেই শেষ—এ আমি বলে দিলুম।

মংলুর চোখে তখন গভীর পিপাসা। সারা ঘুমন্ত বনে ঝিম ঝিম আওয়াজ, আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা, আর প্রকাণ্ড হলদে চাঁদ। বনের প্রান্তে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো খাড়া দেবদারু আর শালের সার। বিরাট বিশাল যুগান্তরের শ্রান্ত বিশ্রান্ত কালো বন।

তারপরে ধীরে ধীরে তাদের চোখে ঘুম নেমে এল।

সেই আধো জাগা আধো ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে মংলু শুনল ভাল্লুকমা গাইছে—

বাদুড়ের কালো পাখা আলো দিল মুছে
খোকা এবার ঘুমো।
কালো বাঘ ঘরে গেল লেজ বুকে গুঁজে
খোকা এবার ঘুমো।
শাল বনেতে কাল পেঁচার ঘুম ভেঙ্গেছে
খোকা এবার ঘুমো।
রাত বিরেতে বন বেরালের চোখ জ্বলেছে
খোকা এবার ঘুমো।
নীল চাঁদা কপালে তোর এঁকেছে যে চুমো
খোকা এবার ঘুমোরে তুই খোকা এবার ঘুমো॥

ক্রমশঃ

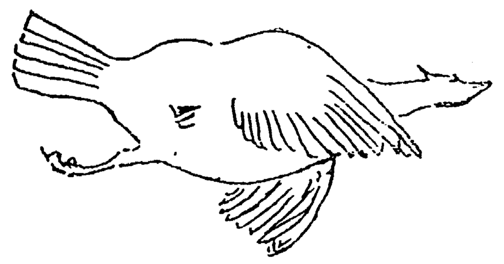

নটরাজের চোখ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নিশুতি রাত থম থম করছিল।

অনেক দূরে পূব ঘাট পাহাড়ের ধূসর শ্রেণী, অন্ধকার দিগন্তকে আরো অন্ধকার করে দুর্গের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে চাঁদ নেই, আল্‌কাতরার মতো মিশকালো শূন্যের বুকে অসংখ্য জল্‌ জ্বলে তারা যেন দাঁত বের করে হাসছিল।

তারার নিস্তেজ আলোতে অন্ধকারের গভীর কৃষ্ণতা একটু তরল হ'য়ে এসেছে, তা'র মাঝখানে চার পাশের সমস্ত গাছ পালা, পথ ঘাটকে অস্বাভাবিক ভূতুড়ে ব'লে মনে হচ্ছিল। পূবঘাট পর্ব্বতের কালো কালো উদ্ধত চূড়োগুলো পার হ'য়ে সমুদ্রের দিক থেকে রাতের ভিজে বাতাস ব'য়ে আসছে আর সেই বাতাসে মাদ্রাজ উপকূলের অসংখ্য নারকেল শ্রেণীর পাতায় পাতায় একটা কান্নার স্বর যেন গুমরে গুমরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভিজে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে রঘু কামার অন্ধকারের ভেতর থেকে ঘাপটি মেরে এগিয়ে এলো। বেড়ালের মতোই তা'র দুটো চোখের তারা যেন সেই জমাট আঁধারের মাঝখানে ঝক মক্ ক'রে জ্বলে' উঠছে। তার কোমরে গোঁজা ষোল ইঞ্চি লম্বা একখানা ছোরা, ডান হাতে একটা কালো লোহার ডাণ্ডা, বাঁ হাতে টর্চ লাইট।

সামনে নটরাজের মন্দির।

মন্দিরের দেশ এই দাক্ষিণাত্য। দ্রাবিড়ী শিল্প প্রতিভা এবং আর্য্য সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য বোধের সংমিশ্রণে এদেশের মন্দিরগুলো ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়। তা' ছাড়া এ দেশে আর কিছু থাক বা না থাক, ধর্ম্মের প্রতি মানুষের প্রকাণ্ড একটা মোহ আছে। তিন দিক সমুদ্র ঘেরা মাদ্রাজ অন্তরীপের পথে ঘাটে তাই অসংখ্য মন্দির ছড়ানো। দেবতারা দরিদ্র ন'ন, হীরে মুক্তো সোনাদানার রাশি রাশি সমারোহে তাঁরা প্রায় রাজা রাজ্‌ড়ার মতোই বিরাজ করেন।

রঘু কামার দাগী আসামী! একটা খুনের মোকর্দ্দমায় ওর নামে ওয়ারেণ্ট বের হওয়ায় দেশ থেকে ফেরার হ'য়ে একেবারে মাদ্রাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কাজের লোক সে, ব'সে থেকে তার সময় নষ্ট করবার উপায় নেই।

অন্ধকারের গভীর কালো আস্তরণের মাঝখানে মন্দিরটাকে প্রেতপুরীর মতো মনে হ'চ্ছে। সদর দরজার পাশে ঝাঁক্‌ড়া একটা শিরীষ গাছ থেকে কী যেন একটা পাখী ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে কর্কশ ভাবে ডেকে' উঠল, রঘু কামারের বুকের পাটাও একবার কেমন একটু শিউরে গেল।

রঘু টর্চটা জ্বালালো, তীক্ষ্ণ আলোটা দরজার উপরে পড়ল বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে। দেখা গেল, লোহার দরজার মোটা মোটা কড়ার সঙ্গে একটা মস্ত ভারী তালা আঁটা—সেটাকে ভাঙা দুঃসাধ্য।

রঘু এজন্যে তৈরী হ'য়েই এসেছিল, দু'চার বার সে তালাটা নাড়া চাড়া করলে, তারপর পকেট থেকে বে'র ক'রে আনলে কাঁচের ছিপি আঁটা শিশিতে খানিকটা ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড।

ছিপিটা খুলে তালার মুখে একটু খানি ঢেলে' দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র—মুহূর্ত্তে বুজ বুজ করে খানিকটা নীল ফেনা জমে' উঠ্‌লো আর উগ্র একটা ধাতব গন্ধের সাথে লালাভ বিষাক্ত ধোঁয়া জায়গাটাকে কিছুক্ষণের জন্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। এক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, তালার প্রায় অর্দ্ধেকটা পরিমাণ গলে গিয়ে একটা বিকৃত রূপ গ্রহণ ক'রেছে।

এইবার রঘু একটা হ্যাচকা টান দিতেই তালাটা চট্ ক'রে খুলে' গেল। রঘু আস্তে আস্তে দরজা খুলে' ফেললে। 'ক্যাঁচ্' ক'রে কব্জার একটুখানি শব্দ হ'ল, রঘু আরেকবার চম্‌কে চারিদিকে তাকাল কোথাও কেউ শুন্‌তে না পায়।

কিন্তু কারো শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মন্দিরের কাছাকাছি কোনো মানুষের বসতি নেই পূজারীরাও কেউ এখানে থাকে না, রোজকার মতো পূজো শেষ ক'রে তা'রা নিজেদের বাড়িতে ফিরে' যায়। তা' ছাড়া সমুদ্রের অশ্রান্ত ঝোড়ো হাওয়ায় নারকেল বীথি এমনি ভাবেই মর্ম্মরিত হচ্ছিল যে দরজা খুলবার সামান্য একটু শব্দ কেন, এখানে বন্দুকের আওয়াজ করলেও বোধ হয় ত' কা'রো কানে যেত না। চারদিক কেমন একটা নিঃশব্দ নির্জনতায় যেন ভরাট হয়ে আছে।

রঘু সামান্য একটু দ্বিধা ক'রে মন্দিরের মধ্যে পা বাড়ালো। লম্বা পাথর বাঁধানো একটা প্রাঙ্গন পেরিয়ে নটরাজের মন্দির। রঘুর টর্চের আলো লেগে' আশে পাশের সমস্ত অন্ধকার যেন একটা কালো পাখীর মতো ছট পট ক'রে দু' পাশে ডানা গুটিয়ে নিলে, সাপের জিভের মতো তীক্ষ্ণ খানিকটা আলো মার্ব্বেল পাথরে চক্ চক্ ক'রে উঠল।

রঘু মন্দিরের বারান্দায় উঠে' এল। দুপাশে সারি সারি থাম যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে, তাদের গায়ে নানা রকম শিল্প কার্য্যের বহু পরিচ্ছদ। মন্দিরের দরজার চৌকাঠের উপরে দুটো পাথরের সাপ জড়াজড়ি করে উঠেছে, ফণা দুটো তাদের ছোবল মারবার ভঙ্গীতে উদ্যত। মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন একটা ভয় রঘুর মনকে আচ্ছন্ন করে ধরল, ওর মনে হতে লাগল: সাপ-দুটো এখুনি জীবন্ত হয়ে উঠে যেন ফোঁস করে গর্জে উঠবে।

কিন্তু দাগী আসামী রঘু, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওর পরিচয়, তাই নিজের মনের

ভয়ের কথা ভেবে' ওর নিজেরই হাসি আসছিল। মন্দিরের দরজায় আস্তে একটা আঘাত করতেই দরজাটা খুলে গেল, টর্চের আলোয় সামনের বেদীর উপরে নটরাজের মুর্ত্তিটা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

কয়েক মিনিট একটা বিচিত্র আশঙ্কা এবং দ্বিধায় রঘু মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। মূর্ত্তিটা আকারে অত্যন্ত বড়, দৈর্ঘে প্রায় তিন হাতের মতো। নাচের তালে তালে উড়ছে মাথার জটাজুট আর নটরাজের চারপাশে বেষ্টিত একটা চক্র থেকে আগুনের শিখা ছিটকে বেরোচ্ছে। এক হাতে ডমরু, আরেক হাতে অগ্নিময় উদ্যত ত্রিশূল। মুখের ভাবে একটা প্রচণ্ড কঠোরতা, তিনটে চোখের ভাব আরো ভয়ানক।

মূর্তির সর্বাঙ্গে পূজারীদের শ্রদ্ধা এবং জনসাধারণের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার টর্চের আলোয় সেগুলো চিক্‌চিক্ করছিল। ক্ষুধার মতো একটা হিংস্র লোভে ওর মুখের ভাব অমানুষিক হ'য়ে উঠেছে: গয়নাগুলোর দাম সব শুদ্ধু চার পাঁচ হাজার টাকার কম হ'বে না, রঘু মনে মনে একটা হিসেব করলে।

কিন্তু সব চাইতে মূল্যবান এবং সবচেয়ে লোভনীয় হ'চ্ছে নটরাজের তৃতীয়-নেত্রটি। রঘু আগেই লক্ষ্য ক'রেছিল, নীল রঙের একখানা বহুমূল্য পাথর সেখানে বসানো, ওজনে সেখানা একশো ক্যারেটেরও বেশি। তার দাম—"

রঘু কামারের ছেলে, ঠকবার পাত্র ও নয়। ওর মনে হ'তে লাগল, ওর সারাজীবন আর এরকম চুরি ডাকাতি ক'রে বেড়াতে হ'বে না, এইবারে দিন কতক পায়ের উপরে পা তুলে' ব'সে খেতে পারবে। এতবড় দাঁও ও শীগগির মারতে পারেনি' আর তা' ছাড়া এমন নিবিঘ্নে চুরি করবার সুযোগও সচরাচর ঘটে' ওঠে না।

রঘু আস্তে আস্তে মূর্তির গা থেকে গয়নাগুলো খুলে' নিতে লাগল। বক্র একটু হাসির রেখাও ভেসে' উঠেছে ওর মুখের উপর: হায়রে দেবতা! পুরাণে তো তোমার কত বিক্রমের কথাই শুন্‌তে পাওয়া যায়, এই কলিকালে কি তুমি নিজেকেও রক্ষা করতে পারো না!

এবারে চোখের মহামূল্য রত্নটা। রঘু ভাবলে: সার্থক হ'য়েছে, একান্ত সার্থক হ'য়েছে আজকে ওর এ ভাবে চুরি করতে আসা, এই একখানা হীরেই ওকে রাজা ক'রে দেবে। দশ হাজার টাকার কমে এখানা কে ছাড়ে! তারপরই সারাজীবন নিশ্চিন্তে পায়ের উপর পা তুলে' দিয়ে বসে খাওয়া। এই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই ছোট মতন একখানা বাড়ি সে করবে। পুলিসের সাধ্য কি যে এখানে ওর নাগাল পায়?

কিন্তু নটরাজের ওই ভীষণ মূর্তি আর চোখের ওই ভয়ানক দৃষ্টি যেন রঘুকে শাসাচ্ছিল। আলো লেগে' কপালের হীরেটা চারপাশে একটা নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছে, রঘুর একবারের জন্য মনে হ'ল, পাথরের ওই তীব্র নীলাভা কেমন যেন অস্বাভাবিক! একবার ভাবলে: থাক্, ও পাথরখানা নিয়ে দরকার নেই।

কিন্তু এসব কী দুর্ব্বলতা! নিজের মনের উপরেই রঘু চটে যাচ্ছিল। বার কয়েক ইতস্তত ক'রে ও হীরেটার দিকে হাত বাড়ালো।

হাতটা যেই চোখের কাছাকাছি এসেছে, অমনি কে যেন সজোরে ওর বুড়ো আঙ্গুলে পিনের মতো কি একটা ফুটিয়ে দিলে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে রঘু আঙুলটাকে সামনের আলোয় নিয়ে এলো, দেখলে আঙুলের মাথায় অদ্ভূত ধরণের একটা ক্ষত চিহ্ন। খানিকটা চামড়া কী ক'রে কেটে' গিয়ে ছোট্ট একটা ক্ষত হ'য়েছে আর সেই গর্ত্তের ভেতর থেকে নীল রঙের এক বিন্দু রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

রঘু আঘাতটার দিকে বিস্মিত ভাবে তাকালে, কারণ মূর্তির চোখের কোথাও এমন কোনো একটা তীক্ষ্ণ জিনিষের অস্তিত্ব ছিল না, যার জন্যে আঙুলে এমনি একটা ক্ষত হওয়া সম্ভবপর। রঘু আবার হাত বাড়ালো।

আবার আঙুলে সেই পিন্ ফুটানোর অনুভূতি, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় রঘুর সর্বাঙ্গ শিউরে' উঠল। হাত থেকে ঝন্ ঝন্ ক'রে টর্চটা খসে পড়ল, রঘুর অচেতন দেহটাও লুটিয়ে পড়ল তারি সঙ্গে সঙ্গে! পাথরটা তীব্র বিষে ভরা।

সকালে মন্দিরের পূজারীরা এসে' দেখলে, রঘুর বিষে-নীল বর্ণ মৃতদেহটা নটরাজের পায়ের নীচে প'ড়ে রয়েছে আর নটরাজের চোখ যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

ছায়া নিয়ে লেখা

দেশ-বিদেশের হ্যাঁচ্চো

শ্রীঅজয় শঙ্কর ভাদুড়ী

হাঁচি সম্বন্ধে সংস্কার পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কিছু-না কিছু আছে। আমাদের যাদের ছোট ভাই বোন আছে, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে ভাই বোনটি হাঁচলে মা যদি কাছে থাকেন, তবে ব'লে ওঠেন 'জীবসহস্রং'। কোথাও যাবার সময় যদি পিছন থেকে কেউ হাঁচে তবে বুড়োদের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়—'যাত্রা নাস্তি'। অর্থাৎ হাঁচি মানেই কোন একটা বাধা।

এ সব সংস্কার তা আমরা জানি। কিন্তু কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই এই হাঁচি সম্বন্ধে নানারকম সংস্কার আছে, নানা মজার ব্যাপার আছে।

মাওরী নিউজিল্যাণ্ডের একটা অসভ্য জাতি। ওদের ছেলেদের নামকরণ এক ভারী মজার কাণ্ড। মাওরীদের পুরুতঠাকুর ওদের পূর্ব্বপুরুষদের নামের একটা তালিকা গড় গড় ক'রে পড়তে থাকেন। ছেলে ইতিমধ্যে হেঁচে ফেল্লেই সেই মুহূর্ত্তে যে নামটী বলা হয়েছিল সেইটে ওর নাম হয়ে যায়!

কেনিয়াতে কারো রোগ হ'লে সকলের আগে খোঁজ নেওয়া হয় রোগটা কি—মৃত আত্মীয়ের আত্মার ভর্ না সাধারণ রোগ! এর জন্যে সে গ্রামের জ্ঞানী বৃদ্ধার উপদেশ চাওয়া হয় আর তিনি এক চমৎকার ওষুধ বেছে দেন। সেটা এই ঃ—পরের দিন সকালবেলায় সে কি করেছে, তা তার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতে যাবে। সে যদি হেঁচে থাকে—বুঝতে হবে রোগটা সাধারণ, আর না হেঁচে থাকলে রোগটা হচ্ছে আত্মার ভর্।

লিপার দ্বীপে যদি কোন ছোট ছেলে হাঁচে তবে বুঝতে হবে তার আত্মা চলে গিয়েছিল এইমাত্র ফিরে এসেছে; আর অমনি আশেপাশের লোকজন তার মঙ্গল কামনায় চেঁচামেচি সুরু করে দেয়। এই দ্বীপের লোকেরা আরো একটি মজা করে। যে নাম ধরে একজনকে ডাকা হয়, সে নাম তার আত্মার পছন্দ হয়েছে কিনা এইটে ঠিক তারা করে এইভাবে ঃ—নাম ধরে ডাকার সময় সে যদি আস্তে হাঁচে তবেই বুঝতে হবে নামটা ঠিক হয়নি এবং এই হাঁচিটা আত্মার অসন্তুষ্টির পূর্ব্বাভাষ।

মিলানশিয়াতে কোন লোক হাঁচলে লোকে মনে করে কেউ তার নাম ধ'রে ডাকছে; আর যদি সে হাঁচতে না পারে তবে বুঝবে কেউ তার নাম ধ'রে ডাকার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মালয়বাসীরা হাঁচলে তাদের আত্মাকে খুব জোরে এক ডাক দেয়। ডিয়াক (Dyak) শিশু হাঁচলে তার মা ডাক দেন—'আত্মা! শীগ্‌গীর এখানে চ'লে এস।' টোবা বাটাক (Toba Batak)-রা খুব তাড়াতাড়ি হাঁচলে তাদের দেশের ডাক্তারকে ডেকে পাঠায় যাতে সে তৎক্ষণাৎ আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে হাঁচলেই সে তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'আমি না, অন্য কেউ নিশ্চয়।' সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ধূম পড়ে যায়। এ কথাটির অর্থ হচ্চে—'আমার আত্মাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। (এদের বিশ্বাস আত্মা নাকের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়)। তুমি যাকে ভাবছ, আমি সে নই।' জুলুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মৃতের আত্মা স্বপ্নে তাদের মধ্যে বিচরণ করে ও রোগ জন্মায়। জুলু হাঁচলে বল্‌বে,—'আমি ধন্য। আমার পূর্ব্বপুরুষের আত্মা এখন আমার কাছে এসেছেন; আমাকে হাঁচিয়েছেন ব'লে এখনই আমি তাঁর পূজা করব।'—এই ব'লে তাদের বংশের মহিমা কীর্ত্তন করতে থাকে।

বৃটিশ নিউগিনির কোয়টারা ঘুমের মধ্যে হাঁচলে, মনে করে তার আত্মা ফিরে এলো। পলিনেশিয়েন্‌রা বলে,—হাঁচিটা হচ্ছে আত্মার অস্থায়ী অনুপস্থিতি। প্যারেটোঙ্গাতে আবার একটা মজার ব্যাপার হয়। যে হাঁচে—তার কাছাকাছি যারা থাকে, তারা তার আত্মাকে সম্বোধন ক'রে বলে—'ওহে, তুমি কি ফিরে এসেছ?'

সাইবেরিয়ার বারিয়াটেরা ভাবে ঘুমের মধ্যে হাঁচা খুবই বিপজ্জনক, কারণ তখন আত্মা হঠাৎ লাফিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আর দুষ্ট প্রেতাত্মারা যারা ব্যাপারটা দেখে, আত্মাকে পালিয়ে যাবার আগেই ধ'রে নিয়ে যায়। নরওয়ের চাষাদের ধারণা—রোগী হাঁচলে সেটা সুলক্ষণ—সে মরবে না। ছোট ছেলে হাঁচলে তারা ব'লে উঠবে—'বেড়ে ওঠ।' কারণ এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তাদের আরও ধারণা—কোন লোক কিছু ভাবতে ভাবতে হেঁচে ফেল্লে তার ভাবনা সত্যি হবে।

ফ্লোরিডাতে কেহ হাঁচলে তারা মনে করে, যে হেঁচেছে তার সম্বন্ধে কথা কইতে কইতে কেউ রেগে উঠেছে—হয়ত নিজের টিণ্ডালোকে (Tindalo—নিজের আত্মা) বল্‌ছে তাকে খেয়ে ফেলতে। তখন যে হেঁচেছে সে নিজের টিণ্ডালোকে বলে—যে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। ঠিক এইভাবে 'সা'তে কেউ হাঁচলে সে বলে ওঠে—'কে আমায় ডাক্‌ছে, যদি ভালোর জন্যে হয়—বেশ; আর যদি মন্দের জন্য ডাকে—তবে 'অমুক' (যেমন প্রেতাত্মা) আমাকে রক্ষা করুক।' ব্যাঙ্ক দ্বীপেও এই রকম হয়—হাঁচলে মনে করে—কেউ তার ভালোর জন্য বা খারাপের জন্য ডাক্‌ছে। মোট্‌লাভেতে যদি ছেলে হাঁচে তবে তার মা ডেকে ওঠেন—'ওকে থাকতে দেও, ওকে এই পৃথিবীতে আস্‌তে দাও।' 'মোটা'তে ছেলে হাঁচলে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে,—'ওকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও।' ওরা ভাবে কোন ভূতটুত বুঝি ছেলের আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছে।

এইত গেল সব বুনো জাতের কথা। এবার সভ্য জাতির কথাও কিছু বলি।

প্রাচীন ইউরোপে সব চেয়ে সুসভ্য ছিল গ্রীস্ আর রোম। গ্রীসে ওরা হাঁচিটাকে একটা ভাল জিনিষ বলে মনে করে। কেউ যদি হাঁচে তবে তাকে নমস্কার করে বলা হয়,—'বেঁচে থাক।' রোমেও অনেকটা এই ধরণের। যে হাঁচবে তার স্বাস্থ্য ভাল হোক এই কামনা সকলে করে।

মধ্যযুগে ও তার পরের যুগে ইউরোপের নানা জায়গায় হাঁচলে এক রীতি চলিত ছিল। হাঁচলে বল্‌তে হত—'ভগবান রক্ষা করুন' অথবা 'ঈশ্বর রক্ষা করুন'। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে, লোকে হাঁচলে, বুকের উপর দু'হাত তুলে ক্রশের মত করত। কিন্তু পরে পুরুতঠাকুরদের উপদেশে হাঁচিটাকে ওরা আর তত বেশী আমল দিত না।

মুসলমানগণ হাঁচিটাকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করেন। কেউ যদি হেঁচে ফেলে, বলে উঠতে হয়—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'; তবে দলের অন্ততঃ একজনকে বল্‌তেই হবে, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' মিশরে কেউ হাঁচলে বল্‌ত, 'ভগবানকে ধন্যবাদ।' যারা কাছে থাকত তাদের প্রত্যেককে বল্‌তে হত, 'ভগবান তোমায় দয়া করুন।' যে হেঁচেছে, সে তখন বল্‌ত,—'ভগবান আমাদের সবাইকে চালিত করুন।'

রাজারা যখন হাঁচেন তখন ভারী সব মজার কাণ্ড হয়। মেসোপোটেমিয়ার রাজা একবার হাঁচলেই সারা রাজ্য জুড়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। আসান্তির রাজা হাঁচলে তার পার্শ্বচরেরা দুটো আঙ্গুল বুকে রেখে মঙ্গলের সূচনা করে।

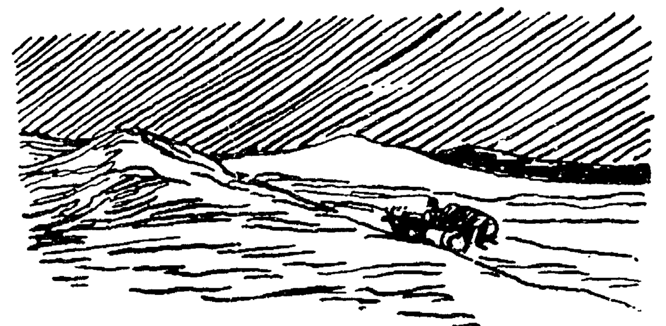

অদ্ভুত সংবাদ

শ্রীনিখিলকুমার চক্রবর্ত্তী

কাল রাতে চুপি চুপি ও-পাড়ার নন্দ
গিয়েছিল 'হনলুলু' না নিয়ে সনন্দ।
দেখে এলো কত শত অদ্ভুত কাণ্ড ;—
বলি যদি হয়ে যাবে গল্প প্রকাণ্ড।

মুসুরির ডালে হোথা নেই নাকি ছন্দ,
কবিতার মাঝে নেই হলুদের গন্ধ !
আকাশের বুকে নেই লাল নীল ঝর্ণা,
পশুপাখী সেথা নাকি পরেনাকো ওড়না !

হিপোপটেমাস্ নাকি করে নাকো নৃত্য,
প্রভুর আদেশ নাকি মেনে চলে ভৃত্য।
জিরাফের গ্যাং নাকি গায় নাকো কোন গান ;
অদ্ভূত ! কেহ তবু করে নাকো অভিমান।

মানুষের পাখা নেই অদ্ভুত সংবাদ,
মরিলে বাঁচে না কেহ, হোথা এ প্রবাদ।
এ সকলি শুনে এলো ও-পাড়ার নন্দ ;
বিশ্বাস না কর তো কর গিয়ে জব্দ।

রুশদেশের গোগল

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

রুশ দেশের গোগল ছিলেন এক সাহিত্যিক ! নামটী যেমন অদ্ভুত তেমনি লোকটীর জীবনও ছিল অদ্ভুত। অদ্ভূত লোককে—অর্থাৎ যাদের জীবন প্রণালী আমাদের সঙ্গে মেলেনা, আমরা প্রায়ই বলে থাকি, লোকটার মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে—কিংবা পাগল। গোগলের কিন্তু মাথার স্ক্রু ঢিলে ছিলনা। তিনি ছিলেন অসাধারণ সাহিত্যিক। অসাধারণ এই হিসেবে যে, গোগল সাহিত্য সাধনাকে জীবনের সঙ্গে একভাবে গেঁথে ফেলেছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চাকে তিনি সখ বা বিলাস হিসাবে দেখতেন না। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য সাধনাই হচ্ছে জীবন—আর জীবনই সাহিত্য সাধনা ! এ দুটী তাঁর কাছে এক বস্তু ছিল !

১৮০০ খৃষ্টাব্দে Czar-এর সময়ে রুশ দেশের এক গ্রামে গোগল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নামের মত, তাঁর জন্ম-স্থানের নামটীও অদ্ভুত ধরণের। গ্রামের নাম Sorotchintz. গোগলের মত তাঁর গাঁয়ের নামটীও উচ্চারণ করতে আমাদের গণ্ডগোল লাগে। বয়স যখন খুব অল্প তিনি কলেজ ছেড়ে, সেন্টাপিটার্সবার্গ সহরে চাকরী করতে যাত্রা করেন। কিন্তু সে চাকরী বেশী দিন তিনি রাখতে পারলেন না। সেই সময় তাঁর মনে দুটো ইচ্ছা জাগলো। একটা ইচ্ছা, সাহিত্য চর্চ্চা করা, আর অন্যটী থিয়েটারে অভিনয় করা। কিছুদিন সরকারী কাজ করবার পর, একদিন দেখা গেল মাত্র একটা সুটকেশ হাতে করে, গোগল আমেরিকা-গামী এক জাহাজে উঠে বসেছেন ! আমেরিকায় বহুদিন ঘুরে বেড়ালেন—কিন্তু কোন কিছুই যোগাড় করতে পারলেন না ! অভিনেতা হওয়ার সখ তাঁর দারুণ ছিল ! তার জন্যে অনেক থিয়েটারে যাতায়াত করলেন—কিন্তু তাঁর গলার স্বর ছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল ! থিয়েটারের কাজে গলার আওয়াজ দুর্ব্বল থাকলে অভিনেতা হওয়া যায় না। অতএব তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

গোগলের চেহারাখানাও মোটেই ভাল ছিল না। দেহের তুলনায় পা দুটো ছিল ছোট—আর সব সময় তিনি ঘাড় হেঁট করে রাস্তা চলতেন। মুখখানা বিন্দু মাত্র খুসী ছিল না—আর মাথার বড় বড় রুক্ষ চুলগুলো সেই কুশ্রী মুখের চারপাশে উড়তো। তাঁর চেহারা দেখে লোকে হাসতো।

কিন্তু গোগল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিলেন তখন একটা নূতন যুগ সৃষ্টি হ'ল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গোগল মস্ত বড় সাহিত্যিক বলে লোক সমাজে পরিচিত হলেন। একে একে তাঁর বই বেরুতে লাগলো—তার মধ্যে—Dead souls, The Cloak, Imperial-General, The memoirs of a mad man ইত্যাদি বিখ্যাত বইগুলি। এর মধ্যে The Cloak, আর Dead-souls জগৎবিখ্যাত বই। এই সব বই যখন তোমরা পড়বে গোগলের প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আনন্দও পাবে ! গোগলের সাহিত্যে রুশদেশের প্রকৃত অন্তরের ছায়া তাঁর লেখার বুকে ফুটে উঠলো। লোকে প্রকৃতভাবে খাঁটী সাহিত্য পেল আর দেশকে সত্যরূপে চিনতে শিখলো—। রুশদেশের বিখ্যাত সাহিত্যক টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, গোর্কী এঁরা প্রত্যেকেই গোগলের লেখায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন !

রুশদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ডষ্টয়ভস্কি একসময় বলেছিলেন—We have all issued out of Gogol's Cloak—অর্থাৎ আমাদের সব লেখা গোগলের Cloak হ'তে অনুপ্রাণিত হয়েছে। গোগলের Dead-souls এটী তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি, আর Cloak এটী আজও পৃথিবীর গল্পের আদর্শ হয়ে রয়েছে।

রাশিয়ায় তখন সার্ফডামের যুগ। এক কথায় বলতে গেলে তখন রাশিয়ায় দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন যেমন বড় লোক বলতে আমরা বুঝি ব্যাঙ্কে যার যত বেশী টাকা কিংবা যার বিরাট জমিদারী আছে! কিন্তু সেই সময় যে ব্যক্তির যত বেশী দাস থাকতো সে তত বড় লোক। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধীনে যত মানুষ বা প্রাণী (souls) থাকতো—তাকে সেই সব প্রাণীর মাথা পিছু গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হ'ত।

যদি কোন প্রাণী (souls) মারা যেত, তবুও তদানীন্তন আইন অনুযায়ী সেই মালিক কর হ'তে রেহাই পেত না। এই সব মালিকের লক্ষ প্রাণীর নাম—করের পরিমাণ কত সমস্তই গভর্ণমেণ্টের ঘরে (আদম সুমারীর খাতায়) লেখা থাকতো। তবে এতে একটা সুবিধা ছিল যে, ঐ সব মৃতপ্রাণী (Dead souls) দের নামকরে স্থানীয় ব্যাঙ্ক হ'তে টাকা ধার করা যেত। 'Dead souls' বইখানির নায়ক Tchitchikoff একটা মজায় যুক্তি আঁটলো। সে ভাবলো, ঐ মৃত প্রাণীগুলি যদি সে অল্প মূল্যে মালিকদের কাছ হ'তে কিনে নেয়—আর সেই সব মৃত প্রাণীগুলির নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেয় তবে তার এই দৈন্য দশা ঘুচে যায়। রাতারাতি লাখপতি হ'তে পারে—অর্থাৎ সেই টাকা দিয়ে বেশ বড় রকমের ব্যবসা খুলতে পারে। ঐ সব 'মৃতপ্রাণী'গুলির মালিকেরা অল্পমূল্যে তাদের বিক্রী করতে রাজী হ'বে—কারণ তাতে তারা গভর্ণমেণ্টকে কর দেওয়া থেকে মুক্তি পাবে! এই মতলব এঁটে, Tchitchikoff "মৃতপ্রাণী" কেনবার জন্য রুশদেশের সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগল। Dead-souls এর ভেতর Tchitchikoff এর চক্ষে রুশদেশের গ্রামগুলির দীন মূর্ত্তি ফুটে উঠল, তাঁর লেখায় এত সজীবতা যে আমরা তাঁর কলমের তুলিতে নূতন ছবি দেখলাম। কিন্তু এই ছবি কি করুণ।

Dead-souls এর ভেতর অনেক হাসির অনেক কৌতুকের ব্যাপার আছে। কিন্তু সেই সব হাসি ও কৌতুকের পিছনে অশ্রু-প্রবাহ জমাট বেঁধে রয়েছে। ফল্গু-ধারার মত সেই অশ্রুপ্রবাহ সকলের অলক্ষিতে বয়ে যাচ্ছে। গোগল যে সব হাসিও কৌতুকাঙ্কন করেছেন—সে হাসি তাঁরই দুঃখময় জীবনের বাহিরের রূপ। এই ব্যথাময় হাসির তুলনা বুঝি কোন সাহিত্যে নেই। গোগল যখন পুস্কিনের সম্মুখে Dead-souls পড়লেন, তখন পুস্কিন চীৎকার করে বলেছিলেন God, what a sad country Russia is (ঈশ্বর কী দুর্ভাগ্য এই রাশিয়ায়)।

গোগল অনেকগুলি হাস্য-রসাত্মক অথচ তীব্র ব্যঙ্গময় নাটকও লিখেছিলেন। এগুলি যখন নাট্যমঞ্চে অভিনীত হ'ত, তখন প্রত্যেক দর্শক হেসে গড়াগড়ি দিত অথচ এই সব হাসির পেছনে ও কৌতুকের পেছনে সব সময় একটী জিনিষ ছিল যা হচ্ছে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকৃত বস্তুকে কৌশলে দেখান।

গোগলের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটে! শেষে তিনি বই লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কখন যে কোথায় থাকতেন তা কেউ জানত না! আজ এখানে কাল ওখানে এইরূপ ভাবেই ঘুরে বেড়াতেন। তিনি

কিছুকালের জন্য রুশদেশে ছেড়ে রোমে চলে যান। তারপর রোম থেকে জেরুসালামে তীর্থ পর্য্যটনে বের হয়ে যান। তীর্থ পর্য্যটন সেরে তিনি আবার রুশদেশে ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর হাতে একপয়সাও ছিলনা—মাত্র সম্বল একটী ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ। এই ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটী হাতে করে তিনি পদব্রজে সমগ্র রুশদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়টা প্রায়ই অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর কেটে যেতো। রাস্তার ওপর শীতের মধ্যে বরফের মধ্যে অনাহারে হয়তো চুপ করে বসে থাকতেন। কখনও লোকে দেখতে পেতো গোগল রাস্তা দিয়ে চলেছেন: হাতে একটা সুটকেশ—মাথায় বড় বড় লম্বা লম্বা এলোমেলোচুল—পরণে পুরাতন প্যাণ্ট আর একটা মাত্র কোট—। গোগল আপন মনে চলছেন, কিজানি বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে ঘাড় হেঁট করে রাস্তা ভাঙ্গছেন।

অথচ এই উপবাসের মধ্যেই যখনই তিনি হঠাৎ কিছু টাকা পয়সা পেতেন, তখন সে সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন।

শেষজীবনে সব সময় তাঁর মনে হত তিনি বই লিখে এক মস্ত পাপ কাজ করেছেন। কেন যে এ ধারণা হ'ল তা বলা যায় না। অনেকে বলেন, শেষ জীবনে গোগল সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি দিনরাত প্রার্থনা করতেন। নিদ্রাহীন রাতে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক-ভাবে চীৎকার করতেন—দিবসে একা একা নির্জ্জন নদীতীরে বা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন।

গোগলের মৃত্যু সেও এক অদ্ভুত!

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে—তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন: আমার সিঁড়ি কই—সিঁড়ি! পরক্ষণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রংমশালের মাসিক প্রতিযোগিতায় যারা এখনও পুরস্কার পাওনি তাদের শীঘ্রই পুরস্কারগুলি পাঠাবার বন্দোবস্ত আমরা করছি।

—সম্পাদক।

মাকষা ও মাছি

শ্রীবসুধা সেন

ঝালর দেওয়া ফিরফিরে জালের ঘর বুনে মাকষাবিবি ঘুরে ফিরে সকালের মিষ্টি রোদ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় দেখলে, এক সোণালী মাছি গুণগুণিয়ে প্রভাতী গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। মাকষাবিবি তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে একেবারে জালের দোরে এসে ভালমানুষী গলায় শুধাল, সুপ্রভাত—ও সোণালী মাছি। ভারী মিষ্টি রোদ উঠেছে, না?

ফুরফুরে হাল্কা হাওয়ায় সাবধানে গা ভাসিয়ে সোণালী মাছি বললে, সুপ্রভাত, মাকষাবিবি। ভারী সুন্দর রোদ, যা বলেচ। তা ভাই আমাকে যে এখনই যেতে হচ্ছে, বেলা বয়ে যায়—

মাকষাবিবি মিষ্টি করে বললে, আহা কাজের সারাদিন তো ভাই পড়ে রয়েছে! এত সুন্দর সকাল, এসো না ভাই একটু বোসো কাছে, ছুটো গল্পস্বল্প করি—

সাবধানে চেয়েচিন্তে ছুষ্টু হেসে সোণালী মাছি বললে, কাজ যে ভাই অনেক পড়ে। বসবার কি সময় আছে? ইচ্ছে তো করে, কিন্তু—

তা গরীবের ঘরে আসবে কেন ভাই, তোমরা হলে যাকে বলে সুখী লোক—হাওয়া খেয়ে বেড়াও কত দেশ বিদেশ! আর আমি, আমি বন্দিনী এই জালের আড়ালে।—বলতে বলতে মাকষাবিবির ছুচোখ ভোরে যেন রাজ্যের ছুঃখু নেমে এলো।

সোণালী মাছি ভারী ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, ষাট্‌বালাই, কিসের ছুঃখ ভাই তোমার! আমি এই প্রভাতী গানের শেষ কটা লাইন গেয়ে তোমার ছুঃখ একটু হাল্কা করে যাই। বসতে গেলে বেলা বয়ে যাবে—

না বসলে গরীবের ঘরে মনের কথা কি কওয়া যায়—সই? এসো না সই ভাই ভেতরে চলে, ভেতরে বসে গাও তোমার মিষ্টি কণ্ঠের ঐ প্রভাতী গান, আর আমি শুনি। আহা কি সুন্দর গাও তুমি! এই যে আমার ঘর, এতো তোমার মত কবিদের জন্যেই না—

মাকষাবিবির ব্যগ্র নিমন্ত্রণ ও সই-পাতান শুনে সোণালী মাছির চোখে মৃত্যু হাসি খেলে গেল। চোখে হাসি রেখে সে বললে—কি সুন্দর তুমি কথা বলো, মাকষাবিবি। মন আমার ভুলে যায়! কিন্তু সইর মুখটি যে ভারী শুকিয়ে আছে—খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি? সকাল বেলা উঠে পেটটি ভরিয়ে, তবে না রোদ পোয়াতে হয় সই! তা তুমি সেরে সুরে নাও, আমি চট্ করে মধু বন থেকে ঘুরে আসি।—বলেই সোণালী মাছি হেসে ফুর-র্ করে উড়ে গেল—।

আর পেটের নাড়ি শুকিয়ে লোভীর মত সারাদিন বসে রইল মাকষাবিবি—সোণালী মাছি কখন্ ফিরবে সেই পথ চেয়ে—

কিন্তু সোণালী মাছি তো আর অত বোকা নয়।

রাত্রে মধুবনের মিষ্টি মধু খাওয়াতে খাওয়াতে সোণালী মাছি বাসায় তার ছানাদের বলছিল, আহা! আমার সই মাকষা রাক্কুসীর আজ সারাদিন বোধ হয় একাদশী গেল।

ও রজনীগন্ধা

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

ও রজনীগন্ধা
আজ এ বাতাসে তুই ভাসিয়ে দিলি
কোন্ অলকানন্দা?

কাননে আজ রিণিরিণি
তাই কি নাচে মন্দাকিনী
তোর আনন্দে আজ তাই কি এমন
ঝর্ণা-ঝরা ছন্দা
ও রজনীগন্ধা

ওই মায়াবী তোর গন্ধে
ওই ঝর্ণা-ঝরা ছন্দে
আমার নয়ন কোণে ঘনিয়ে আসে
স্বপ্ন-রঙিন তন্দ্রা
ও রজনীগন্ধা

———

আকাশ-দেশের খেলা-ধূলা

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সে আবার কি ? আকাশের কোলে উড়োজাহাজ নিয়ে কোনো নতুন রকমের খেলা আবিষ্কার হয়েছে না কি ? হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। স্থলে জলে হরেক রকমের এত খেলা মানুষ খেলছে, আর আকাশটাই বুঝি যাবে বাদ ? যাই হোক্, আজ আমি যে খেলাধূলোর কথা বলছি তা মানুষের আবিষ্কৃত কোন খেলা নয়। সেই আদিমকালের মানুষ খেলা করতে যার কাছে শিখেছে সেই প্রকৃতির খেলা ধূলোর কথাই বলছি। আমাদের মাথার উপর যে আকাশ, তার মধ্যে খেলা করতে আসেন তিনটী বন্ধু—এক নং হচ্ছেন বাতাস, দুই নং জল আর তিন নং ধূলো ! এই তিন জনে মিলে যত কিছু বৃষ্টিবাদল ঝড়-ঝাপ্‌টা, ঘূর্ণি-হাওয়া, বজ্রাঘাত, তুষারপাত, শিলা-বৃষ্টি সব রকম খেলা খেলে চলেন। এই খেলাধূলোর কিছু কিছু পরিচয় এবং নিয়ম-কানুন তোমাদের আজ শোনাব।

জানালার ধারে বসে লিখছি—ঝির ঝির করে দক্ষিণে বাতাস এসে আমার গায়ে লাগছে। ঐ দেখ কোথা থেকে আবার একটা উড়ো হাওয়া এসে আমার খাতার পাতাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। বাতাসটা তো জল মাটি এদের মত একটা জড়-পদার্থ, কিন্তু কে তাকে নিয়ে এমনধারা হুটোপাটি করিয়ে বেড়ায় জানো ?—আমাদের ঐ সূর্য্যমামা !

সারাদিন ধরে সূর্য্যের তেজে পৃথিবীর মাটি ওঠে তেতে। মাটির ঠিক উপরকার যে বাতাসের স্তর, তপ্তমাটির ছোঁয়ায় সেটাও তেতে যায়। তেতে ওঠা বাতাসটা আকারে বেড়ে ওঠে, কাজেই উপরকার ঠাণ্ডা বাতাসের চেয়ে সেটা হয়ে যায় হালকা। হালকা বাতাসটা বেলুনের মতো ক্রমাগত উপর দিকে উঠে যায়। কিন্তু পৃথিবীর রাজ্যে কোন জায়গায় ফাঁক থাকবার হুকুম নেই। গরম হালকা বাতাস যেই উপরে উঠে যায় অমনি তার ফাঁকা জায়গা দখল করতে ছুটে আসে উপরের ঠাণ্ডা বাতাস। এমনি করে একটা হাওয়ার স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই হাওয়ার স্রোত কখনো আসে মলয় বাতাসের মতো, কখনো কন্‌কনে শীত-বাতাস, কখনো বর্ষাকালের উড়ো-ঝুঁটি পূবে-হাওয়া, কখনোও বা রুদ্রমূর্ত্তি কাল-বৈশাখীর সাজে !

আকাশ-দেশে জলের খেলাও বড় কম নেই। গ্রীষ্মকালে পুকুর খাল বিল সব শুকিয়ে যায়। ভিজে কাপড়টাকে বাতাসে মেলে ধরলে সেও যায় শুকিয়ে ! কিন্তু শুকিয়ে ঐ জলগুলো কোথায় যায় বলতে পারো ? সব যায় ঐ বাতাসের মধ্যে। বাতাস এমনি করে

বড় বড় সমুদ্র থেকে ক্রমাগত জল শুষে নিচ্ছে। বাতাসের বুকের এই অগাধ জলীয় বাষ্প এদেরই খেলায় কখনও শিশির পড়ে, কখনও বৃষ্টি হয়, কখনও বা তুষারপাত দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে সব কথা বলছি।

কিন্তু আমাদের তিন নম্বরের বন্ধু ধূলোর কথা বাদ দিলে তো চলবে না। বাতাসের মধ্যে জলীয় বাষ্প যেমন অগাধ আছে—ধূলিকণাও বড় কম নেই। এই ধূলিকণা পৃথিবীর সেই গোড়া থেকে বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। হাজার ঝড় হোক, হাজার বৃষ্টি হোক এদের ঝেঁটিয়ে ফেলবার সাধ্য কারো নেই। এই ধূলিকণার কি কাজ জানো ? যে বৃষ্টির জন্যে আমরা এত উপকার পেয়ে থাকি, প্রধানতঃ এই ধূলিকণার সাহায্যেই সেই বৃষ্টি হয়। তাছাড়া আমাদের আকাশের এমন যে সুন্দর নীল রং, এ রং কার দেওয়া জান ? ঐ ধূলিকণার ! বাতাসে যদি ধূলিকণা না থাকত তা হলে আকাশে রং হত রাতের অন্ধকারের মতো ঘুটঘুটে কালো !

যাক সে কথা। এইবার আকাশদেশের প্রধান প্রধান খেলাধূলো, অর্থাৎ শিশিরপাত, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতির কথা সুরু করা যাক।

বাতাস হল জলীয় বাষ্পে ভরা একথা তোমাদের আগেই বলেছি। বাতাস যত গরম হয় এই জলীয় বাষ্প গ্রহণ করবার শক্তি তার তত বাড়ে। তেমনি বাতাস যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে সে আর যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না। বাষ্প তখন জলের আকার ধারণ করে আকাশের রাজ্য ছেড়ে স্থল-রাজ্যে নেমে পড়েন। হেমন্তকালের ভোর রাতে আমরা দেখতে পাই ঠাণ্ডা জিনিষ, যেমন পাথর, লোহা, গাছের পাতা, ঘাসের ডগা প্রভৃতির গায়ে শিশির পড়েছে। ভোর রাতের বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে কানায় কানায় ভরা, সেই বাতাস ঠাণ্ডা জিনিসের গায়ে লাগবামাত্র জলীয় বাষ্প ক্ষুদে ক্ষুদে জলের বিন্দুর আকারে জিনিষের গায়ে জমা হয়—এরই নাম 'শিশির পড়া'।

কিন্তু মাটি থেকে অনেক উঁচুতে যে বাতাস আছে, সেখানে যখন শিশির পড়বার মতো অবস্থা হয় তখন হয় এক মজা ! আকাশের মধ্যিখানে ঠাণ্ডা পাথরও নেই, ঘাসের ডগাও নেই। বাষ্প থেকে যে ক্ষুদে ক্ষুদে জলকণা সৃষ্টি হয় তাদের বাতাসের মধ্যেই ভেসে বেড়াতে হয়। এমনিধারা একদল ভেসে-বেড়ানো-জলকণা পেলে আমরা বলি 'মেঘ'।

এই মেঘের রাজ্যে মধ্যে মধ্যে এক রকম উপর-মুখো হাওয়া বয়। এই হাওয়ার সঙ্গে যত উপরে যাওয়া যায় ততই ঠাণ্ডা ! এই হাওয়ার কবলে পড়ে মেঘ যখন উপর দিকে উঠতে উঠতে ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে থাকে, তখন বাতাসের মধ্যে যে অসংখ্য ধূলিকণা ভেসে বেড়ায় সেই ধূলিকণার উপর জলবিন্দু জমা হতে থাকে। প্রত্যেকটি ধূলিকণাকে ঘিরে ছোট ছোট

জলের ফোঁটা তৈরী হয়। আবার প্রত্যেকটি ছোট ফোঁটার গায়ে জলবিন্দু জমা হয়ে অল্প-বড় ফোঁটা তৈরী হয়। ক্রমে একটা ফোঁটার গায়ে আর একটা ফোঁটার জোড়া লাগে। এমনি করে দেখতে দেখতে বেশ বড় বড় জলের ফোঁটা তৈরী হয়ে পড়ে। তখন উপর-মুখো বাতাসের স্রোত আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। মাটির কোলে ঝরে পড়ে বৃষ্টি !

তারপর তুষারপাতের কথা। এ জিনিসটি খুব শীতের দেশ না হলে মোটেই দেখা যায় না। বাতাস যখন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে তখন মেঘ আর জলকণার সমষ্টি থাকে না। জলকণাগুলি হয়ে পড়ে ছোট ছোট চিনির দানার মতো বরফের দানা। যারা তুষারের রূপে দেখা দেয় শীতের দেশে !

'কাল-বৈশাখী'র সঙ্গে তোমাদের বোধ হয় পরিচয় আছে। এ রকম ঝড় বছরের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এই ধরণের ঝড়ের সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত আর প্রায়ই শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টির একমাত্র কারণই হল ঐ 'কাল-বৈশাখী' কিংবা ঠিক ঐ ধরণের কোন ঝড়। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবীর মাটি এবং সেই সঙ্গে মাটির সংলগ্ন বাতাসের স্তর এত তাড়াতাড়ি এবং এত ভীষণ তেতে উঠে যে উপরকার ঠাণ্ডা বাতাস এবং নীচেকার গরম বাতাসের মধ্যে একটা মস্ত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। উপরে থাকে ঠাণ্ডা ভারি বাতাস এবং নীচে থাকে হালকা গরম বাতাস। কিন্তু হালকা জিনিসের নীচে তলিয়ে থাকবার নিয়ম নেই, কাজেই সমস্ত বায়ুমণ্ডলের সমতার মধ্যে রীতিমত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই সূর্য্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গে নীচের হাল্‌কা বাতাসটা একটা ফানেলের আকারে ঠাণ্ডা বাতাসকে ভেদ করে প্রচণ্ড বেগে উপর দিকে উঠে পড়ে। উপরের ঠাণ্ডা বাতাসকে বাধ্য হয়ে সমান বেগে নীচে নেমে আসতে হয়। সমস্ত বায়ুমণ্ডলে একটা ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়। এরই নাম "কাল-বৈশাখী"।

এই ফানেলরূপী হাওয়ার স্রোতের মধ্যে মেঘের দল এসে পড়লে তাদের বৃষ্টিতে পরিণত হতে একটুও দেরী হয় না। কিন্তু এ বৃষ্টি নীচে পড়তে পায় না। উপর-মুখো হাওয়ার স্রোতে এরা এত উপরে চলে যায় যে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়। এই বরফের উপর আবার তুষারের প্রলেপ পড়তে থাকে। যাই হোক বরফের ফোঁটাগুলি উপর দিকে উঠতে উঠতে ক্রমে ফানেলএর বাইরে ছটকে পড়ে। তখন তাঁরা নীচের দিকে নামতে থাকে। নামতে নামতে হয়ত আবার তাদের ফানেলএর মধ্যে এসে পড়তে হয়। আবার তাদের উপর তুষারের প্রলেপ পড়তে থাকে। এমনি করে তুষারের প্রলেপ পড়ে তাদের আকার বড় হতে থাকে। শেষকালে হাওয়ার স্রোত যখন আর তাদের উপর দিকে ঠেলে তুলতে পারে না—তারা মাটির দিকে নেমে আসে। আমরা বলি—উঃ কি ভীষণ শিলাবৃষ্টি !

চলন্তিকা

মঙ্গলগ্রহে কি প্রাণী আছে ? বৈজ্ঞানিকেরা আজ পর্য্যন্ত কেউ ঠিক করে বলতে পারলেন না। কেউ কেউ বললেন, আছে ; কেউ কেউ আবার প্রমাণ যুক্তি দিয়ে বললেন, আছে কি না আমরা সঠিক জানি না, তবে 'নেই' একথাও জোর করে বলতে পারছি না। ফলে দাঁড়াল, মঙ্গলগ্রহে প্রাণী থাকা বিচিত্র নয়, অসম্ভব নয়। সেদিন এক সভায় ডাঃ মেঘনাথ সাহা বললেন, যদি মঙ্গলগ্রহে প্রাণী থাকেও, তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কারণ সেখানে জল ও অক্সিজেনের ভয়ানক অভাব। হিসেব করে নাকি দেখা হয়েছে হিমালয় পর্ব্বতের ওপরের হাওয়ায় যে অক্সিজেন আছে তারও মাত্র ২, ভাগ অক্সিজেন নাকি মঙ্গলগ্রহের বাতাসে আছে ! অর্থাৎ আমাদের মত মানুষের বাঁচবার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার মঙ্গলগ্রহে তা নেই। ডাঃ সাহা বলেন, কিছুকাল পরেই মঙ্গলগ্রহ চাঁদের দশা প্রাপ্ত হবে। অথচ মঙ্গলগ্রহে শীত আছে, গ্রীষ্ম আছে তার আকাশে মেঘ আছে, এমন কি গাছপালাও নাকি আছে ! কি জাতের গাছপালা সেখানে আছে অবশ্য জানবার কোন উপায় নেই কিন্তু যদি প্রাণী থাকে—তারা কি ধরণের প্রাণী ? এমনও তো হতে পারে, যে তাদের শরীরে এমন উপাদান আছে, যার দ্বারা অল্প অক্সিজেনেও তারা বেঁচে থাকতে পারে। অবশ্য অক্সিজেন যদি মঙ্গলগ্রহ থেকে একেবারেই উবে যায়—তাহলে হয়ত তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ডাঃ মেঘনাদ সাহা তাই বলেছেন, যে যদি মঙ্গলগ্রহে প্রাণী থাকে তারা লোপ পেতে বসেছে। এ মাসের রংমশালে 'মঙ্গলগ্রহে প্রাণী' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁকে অভিনন্দন করেছে। সুভাষ বসুর এই জয়লাভ, শুধু সুভাষ বাবুর নয়, সমস্ত বাংলা দেশের, সমস্ত নবীন ও তরুণ ভারতবর্ষের। আজ প্রবীন ও প্রৌঢ় ভারতবর্ষকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। তরুণ ভারতবর্ষ চেয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, বিদেশীদের সমস্ত শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আজ সে প্রয়াসী হয়েছে। শুধু ইংরাজদের বিরুদ্ধে আজ ভারতবর্ষের যুদ্ধ নয়, সমস্ত পরাধীনতার বিরুদ্ধে আজ সে অহিংসার অস্ত্র ধরেছে। কামান বন্দুক ও বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে পাশ্চাত্য নীতি অনুসরণ করে ভারতবর্ষে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে না। ভারতের যুদ্ধের নীতি হচ্ছে একান্তই তার নিজের। এর পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন সময়ে কোন দেশেই ভারতবর্ষের এই নতুন যুদ্ধ পদ্ধতি, পরাধীনতা ও হীনতা থেকে রেহাই পাবার এমন পন্থা আর কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে আবিষ্কৃত হয় নি। সুভাষ বাবুকে নেতা বলে মেনে সকলের চুপ করে থাকলে চলবে না, বাড়ী বসে তাঁকে বাহবা দিলেই চলবে না। নিজেদের সকল প্রভেদ ভুলে গিয়ে সকলে পাশাপাশি পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষ আজ যদি সোজা হয়ে মাথা তুলে না দাঁড়াতে শেখে আর কোন দিনই সে শিখবে না। নবীন ভারতবর্ষে আজ যে সাড়া পড়ে গিয়েছে, সুভাস বাবুর সভাপতি নির্ব্বাচন তার উপলক্ষ্য। এই সাড়াকে তাজা রেখে তাকে মলিন না করে, ব্যক্তিগত ও প্রাদেশিক স্বার্থ ভুলে গিয়ে সমস্ত দেশের মিলিত লক্ষ্য মেঘমুক্ত করে আজ আমাদের সকলকে জয়ধ্বনি করতে হবে।

* * * *

রামধনু সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুতে আজ ছাত্রেরা তাদের এক প্রিয় অধ্যাপককে হারাল, ছেলেমেয়েদের কাগজের সুকুমারচিত্ত কিশোর কিশোরীরা এক প্রিয় সাহিত্যিককে হারাল আর আমরা সকলেই হারালাম আমাদের এক প্রিয় বন্ধুকে। মনোরঞ্জন বাবু রিপণ কলেজের জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন; 'রামধনু' কাগজের সম্পাদক হয়ে তিনি ছেলেমেয়ে মহলে নাম করেছিলেন। তিনি সদালাপী মিষ্টভাষী ও হাস্যরসিক মানুষ ছিলেন। আমাদের রংমশাল অফিসে যখনই তাঁকে আসতে দেখেছি তাঁর অমায়িক বন্ধুবৎসল ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আজ তাঁর মৃত্যুতে, তাঁর আত্মীয় বন্ধু ও পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। মনোরঞ্জন বাবু ছেলেমেয়েদের জন্য কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন—তার মধ্যে, নূতন পুরাণ, হাস্য ও রহস্য—তাঁর হাসির বই;

ও ছোটদের উপন্যাস—পদ্মরাগ ও ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৃত্যুতে রামধনু পত্রিকার যে ক্ষতি হল তার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি, মনোরঞ্জন বাবুর স্মৃতি-রক্ষার্থ রামধনু কাগজখানি চালাবার ভার কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতেই দেওয়া হবে।

* * *

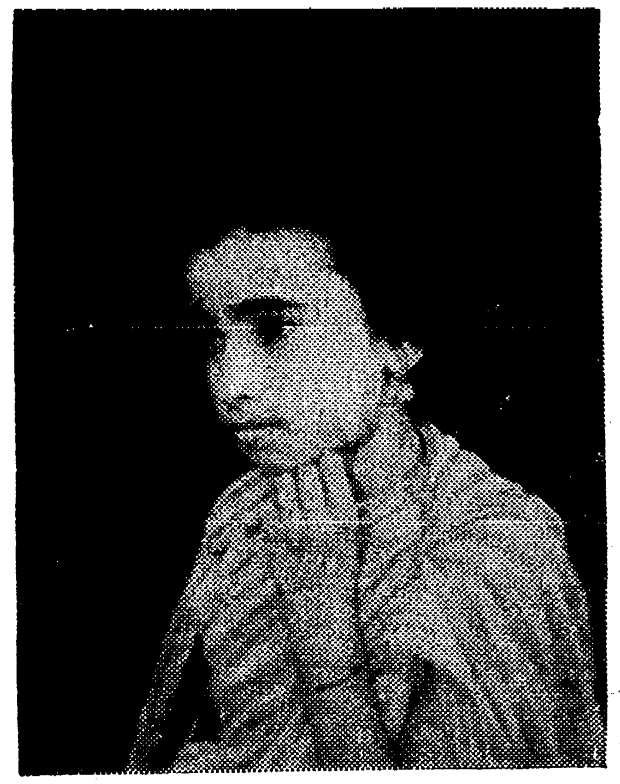

বাসন্তী সেনগুপ্তা

আর একটি মৃত্যু সংবাদ এ মাসের রংমশালে আমাদের জানাতে হচ্ছে। আমাদের একজন গ্রাহিকা শ্রীমতী বাসন্তী সেনগুপ্তা দুবছর কঠিন রোগে ভুগে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে পরলোকে গমন করেছেন। বাসন্তী রংমশালের প্রিয় গ্রাহিকা ছিলেন, শিশু সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা। তারপর তাঁর এই অল্প বয়সেই নৃত্য গীতে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর সরল ও মধুর ব্যবহারে কঠিন রোগ শয্যাতেও সকলের মুখে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। রংমশালের পক্ষ থেকে আমরা আজ বাসন্তীর পিতামাতা ভাই বোন আত্মীয় বন্ধুদের আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। কঠিন রোগ থেকে বাসন্তী মুক্তি পেয়ে চলে গিয়েছেন, দুঃখ না করে আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

* * *

কলিকাতা সহরে মহামারী সংক্রামক রোগ দেখা দিয়েছে। বসন্ত টায়ফয়েড, মেনিনজাইটিস্, কলেরা প্রভৃতি মহামারী রাক্ষসরূপী রোগ সহরবাসীদের আক্রমণ করছে। ফলে এই কয়েক সপ্তাহে কত লোক যে মারা পড়ছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কখন যে কোন রোগ কার হয় সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু যদি সাবধানী থাকা যায়, তাহলে বোধ হয় কিছুটা রক্ষা পাওয়া যায়। নিত্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, খোলা হাওয়ায় বাস করা, ব্যায়াম করা, এগুলি করলে অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়। সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে এসে হাতমুখ নাক পরিষ্কার করে জলে ধুয়ে ফেলা, সিনেমায় ভীড় না করা, হোটেলে না খাওয়া এসব করা দরকার। অপরিষ্কার ছোঁয়াচে জিনিষ থেকে যতটা নিজেকে বাঁচান যায়। টিকে নেওয়া, ইনজেকসন নেওয়া এখন সকলেরই উচিত। এই সময় অসুখ বিসুখ হওয়ার অপর একটা বড় কারণ আছে। এটা ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়—চট করে শরীরে

ঠাণ্ডা লাগিয়ে দেওয়া আবার গরমে হঠাৎ সর্দ্দি গর্ম্মি করা এ এখন প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু নিজে সাবধানে চললে এগুলো অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু আমরা ভাল স্বাস্থ্যে থাকার নিয়মকানুন অভ্যাস ভুলে গিয়েছি। কলিকাতার আজ এই বিপদে আমাদের উচিত সকলে সাবধান হওয়া, সকলকে সাবধান করা। জেনে রেখো, কলকাতার আকাসে বাতাসে আজ নানা ব্যাধির সহস্র বীজ ছড়িয়ে পড়েছে। যারা দুর্ব্বল যারা অসাবধানী ও অপরিচ্ছন্ন আজ তারাই এই মহামারী ব্যাধি চারিদিকে নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতায় ছড়িয়ে দিচ্ছে।

* * * *

মধ্য উপসমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশগুলিতে এক কিংবদন্তী—Lost Atlantis বলে সেখানে এক রাজ্য ছিল ও এক অধুনালুপ্ত জাতি সে রাজ্য নাকি শাসন করত। কোথায় সে লুপ্ত সহর! সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক মধ্য উপসমুদ্রের তলদেশে এক আশ্চর্য্য সহরের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ সেই Lost Atlantis! সমুদ্রের নিষ্ঠুর তাণ্ডবে আজ সে অমৃত নগর তার গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে আছে। ডুবুরীদের সাহায্যে ও নিজেরাও ডুবুরী হয়ে বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রগর্ভ থেকে এই সহরের নানা অদ্ভুত জিনিষ উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছেন। ব্রঞ্জের মূর্ত্তি, তামার পাত্র সহরের বাড়ী ঘরগুলির ভগ্নাংশ ইত্যাদি আরো কত কি এর মধ্যেই পাওয়া যাচ্চে। একজন বৈজ্ঞানিক নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেছেন যে ডুবুরী সেজে তিনিই প্রথম বোধ হয় এই নষ্ট সহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছেন—বাড়ীঘর দোর—সব অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিষ তাঁর চোখে পড়েছে। এসব দেখতে দেখতে তিনি এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর সময়ের জ্ঞান ছিল না হঠাৎ জলের মধ্যে ওপরের অক্সিজেন কম পড়ায় তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন—পরে তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় টেনে তোলা হয়।

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয় বিশেষ অসুস্থ থাকায় এবার তিনি কিছু লেখা দিতে পারলেন না।

—ডাইনি বুড়ী—

ডাইনিবুড়ী সঙ্গে চলে কে!
'ফেউ'এর পাল সঙ্গে চলে যে।
ডাইনিবুড়ী বেড়াও ঘুরি
রাত ছম্‌ছম্‌ নিঝুম পুরী
আকাশ জুড়ি বেড়াও উড়ি
পেত্‌নি পাখি যে—
ভয়েই মরি রামলক্ষ্মণ সঙ্গে নাহি যে!

বাঁশবেড়ের ‘দহ’

সুনীল কুমার ব্যানার্জ্জী

চাঁদনী রাতে বাঁশবেড়ের ‘দহ’ কি রহস্যময়! প্রকাণ্ড দহতে হাজার হাজার কুমুদ ফুল ঘোমটা খুলে চাঁদের সঙ্গে কথা কয়। চারিদিক নীরব। তীরের গাছগুলো ঝুঁকে প’ড়ে যেন জলের সঙ্গে খেলা ক’রতে চায়। ক্বচিৎ কোন গাছ থেকে কোন পাখীর পাখা নাড়ার ঝট্‌ফট্ শব্দ ভেসে আসে।

যত রাত বাড়তে থাকে, একটা অদ্ভুত শব্দ শন্ শন্ করে ‘দহের’ চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যত রাত গভীর হয় শব্দও বিকট্‌তর হ’তে বিকট্ হ’তে থাকে। বিশেষ করে অমাবস্যার রাতে ঐ শব্দ যেন অসম্ভব বেড়ে ওঠে। মাঝরাতে কা’রা যেন দহের জল নিয়ে খেলা করে। জল তোলপাড় করবার শব্দ অনেক দূর থেকে গ্রামবাসীরা শুনতে পায়। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কা’র যেন করুণ বুক ফাটান কান্না শুনতে শুনতে দূর গ্রামের শিশুরা ভয়ে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। বড়রা সজল চোখে ঈশ্বরের নাম ক’রতে থাকেন। ভোরের দিকে শব্দ মিলিয়ে আসে। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ‘দহে’র জল শান্ত শিষ্ট হয়ে পড়ে। যেন রাত্রে কিছুই হয় নাই। কিন্তু রাত্রে ভুলেও কেউ দহের দিকে পা বাড়ায় না। কোন পথিক যদি ভুলে ওপথে যায়—সে নাকি আর ফেরে না। কোথায় যায়—কি হয়—কেও ব’লতে পারে না। অথচ দিনের বেলায় রাখালেরা দহের চরে গরু চড়ায়—জেলেরা মাছ ধরে। ভয়ের কোন কারণ থাকে না।

•

গ্রামের অতি বৃদ্ধদের মুখ থেকে শোনাঃ অনেক, অনেক দিন আগে বাঘডাঙ্গার বিখ্যাত ডাকাত হারু সর্দ্দার দল বল নিয়ে এখানে নাকি ডাকাতি কর’ত। কত লোককে যে খুন করে ‘দহ’তে পুঁতেছে তার কোন হিসাব নেই, কত মানুষের রক্তে দহের জল যে হোলী খেলেছে কেউ বল্‌তে পারে না। প্রতি অমাবস্যায় দহের ধারে ডাকাতের দল কালী পূজো ক’রত। অমাবস্যায় নরবলি দিয়ে কপালে জয়টিকে লাগিয়ে ডাকাতের দল বেরুত ডাকাতি ক’রতে। দয়া মায়ার ধার তারা ধারত না। মায়ের কোলের ছেলেকে কেড়ে নিয়ে তারা ‘বলি’ দিতে পিছু পা হত না।

সেদিন ডাকাত দলে প্রবল উত্তেজনা! ডাকাতি করতে গিয়ে হারু সর্দ্দার বাঁ হাত খানি ভেঙ্গে ফেলেছে। নিশ্চয়ই মা কালী রুষ্ট হয়েছেন। খুব ঘটাকরে আগামী অমাবস্যায় মায়ের পূজো দিতে হ’বে। সর্দ্দার যাতে শীঘ্র সুস্থ হয়ে ওঠে, রূপ্‌পুর থেকে একটি সুন্দর ছেলেকে আনা হয়েছে—বলির জন্য বিশেষ করে’। আহা, বেচারা মা বাপের একমাত্র ছেলে!

অমাবস্যার রাত্রি!—

ঘোর মিস্‌মিসে অন্ধকার! দহের ধারে ডাকাতদের সারি সারি মশাল ঘন অন্ধকার ভেদ করে ধূ ধূ জ্বলছে, আগুনের প্রতিচ্ছবি ‘দহের’ জলে নাচ’ছে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে জবাফুল দিয়ে পূজা ক’রছেন। কপালে রক্তটিকে হারু সর্দ্দার হাত জোড় করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে। সাকরেদ্‌রা সারি সারি চেলী পরে মশাল হাতে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ পাগলিনীর বেশে এক নারী মূর্ত্তি ছুটে মন্দির মধ্যে ঢুকে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল! মুহূর্ত্তে হারু ডাকাতের প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অনুচরদের রক্ত চক্ষু ঘু’রতে লা’গল। বিকট রবে হারু সর্দ্দার হুঙ্কার করে উঠল, “বাঁধো—।”

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর একযোগে ছু’টল। পাগলিনী মা ছেলেকে প্রাণপণে বুকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্ত্তের জন্য ডাকাতের দল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আবার তা’রা আক্রমণ ক’রতে ছুটল।

হঠাৎ একি! গুরুগুরু রবে সমস্ত মন্দির কেঁপে উঠল। একি ভূমিকম্প! পরমুহূর্ত্তেই মন্দির সবশুদ্ধ ধরাশায়ী হ’ল। আর দহের জল প্রবলবেগে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে মন্দিরের সমস্ত চিহ্ন একেবারে ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল।

তারপর হতে রোজ রাতে বাঁশবেড়ের জলে..... ......

কে জানে, বোধ হয় সে ডাকাতদেরই প্রেতাত্মারা....!

—:*:—

পরিচালিকা—**দিদিভাই**।

আমার আদরের ভাইবোন—

শীতবুড়ি আস্তে আস্তে চলে গেল; রুক্ষ বিবর্ণ গাছে গাছে কচি পাতার জন্মোৎসব সুরু হয়েছে। ফাগুন এলো বুঝি? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি উৎকর্ণ হয়ে ছিল যার পদধ্বনি শোনবার জন্য। সে সুন্দর বুঝি এলো। তাই পাণ্ডুর প্রকৃতি আবার জাগছে পত্রে পুষ্পে, গন্ধে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে সুরভিতে! বসন্তের বাতাস এসেছে দখিণ দুয়ার হতে।

প্রকৃতি আজ আনন্দমুখরা হ'য়ে উঠেছে, আমাদের মনও খুসীতে উপছে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের যোগাযোগ! এক অপরকে বাদ দিয়ে আনন্দ পেতে পারে না।

অমিয়কুমার পাল (শ্রীরামপুর) গ্রাঃ ১১৮৬

অমুভাই! তোমার প্রথম সুন্দর চিঠি পেয়ে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। ছোট ভাই বোন নিয়ে মিলে মিশে থাকতে কার না আর ভাল লাগে বলো ভাই? তোমার দাবী পূর্ণ হয়েছে তো? সরস্বতীপূজা উপলক্ষে তোমাদের ক্লাবে 'বন্দীবীর' অভিনয়ে তুমি আলেকজান্দারের অংশ গ্রহণ করেছিলে—তুমি রাজা হওয়ার আনন্দে যে বিল্বপত্র পাঠিয়েছ আমি অতি আনন্দে গ্রহণ করেছি। আচ্ছা অমু! সত্যি তুমি কখনও আসল আলেকজান্দারের মত হও—তখন দিদিভাইকে মনে থাকবে?

মিণ্টুরাণী, পিণ্টুরাণী ও সুরথ বসু (চুঁচড়া) গ্রাঃ ১১১৪

কল্পনাদের ঠিকানা তোমায় পাঠাবো। সুরথ, তুমি যে রংমশালে কোনও প্রতিযোগিতায়, নিশানাথএর মত পদক দিতে চেয়েছ এজন্য আমরা আনন্দিত—আমি একথা পরিচালক মহাশয়কে জানাবো।

তারারাণী মুখার্জ্জি গ্রাঃ ৭৮৭

তুমি নতুন এসেছ বলে বলছি ভাই, তোমরা প্রত্যেকেই যখন চিঠি লিখবে, চিঠিতে নাম ঠিকানা ও গ্রাঃ নম্বর ভাল করে লিখবে। তুমি কোথা থেকে চিঠি লিখছ বুঝতে পারলাম না, অথচ লিখেছ—দিদিভাই, লেখাপড়া খেলা ছেড়ে দিয়ে এখানে পড়ে আছি, কতদিনে ভাল হবো জানি না।' তোমার চিঠিটা

পড়ে খুব দুঃখিত হলাম। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো প্রার্থনা করি। কি হয়েছে—আর কোথায়ই বা আছ—আমায় রংমশালের ঠিকানায় জানিও।

আরতি সেন (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫১

তোমার কথামত অলকা ঘোষ ও শিবানি সিংহের ঠিকানা পাঠালাম ভাই।

শেখর সেন (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫১

তোমার চিঠিটা ভাই একটু দেরীতে আমার কাছে পৌছয় সেইজন্য তোমাদের আমন্ত্রণ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও নিজে যেতে পারিনি। কি করে আমায় চিনলে? সত্যি?

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী)

তোমাদের ব্যাজ এখনও আসেনি—এলেই পাবে ভাই। অল্পনা তো গ্রাহিকা নয়—সেজন্য তার ঠিকানা আমাদের কাছে নেই।

শান্তিলতা বসু মল্লিক (সাঁত্রাগাছি) গ্রাঃ ৭৩৫

তোমার আগের চিঠি আমি পাইনি, কতদিন আগে দিয়েছিলে ভাই? দিদিকে কি ওসব কথা বলতে হয় পাগল? গরীব যদি তুমি হও তা'হলে দিদিও তাই হবে। মাধুরীকেও আমার ভালবাসা জানিও, চিঠি না লিখলে প্রণাম গ্রহণ করা হবে না তাকে বলো। লেখনীবন্ধু তোমার কাকে পছন্দ জানালে ঠিকানা পাঠাবো।

শ্রীলেখা বসু (কালীঘাট) গ্রাঃ ১১৪১

মিনু! কোন্ মাসের রংমশাল তুমি পাওনি, ভালভাবে লিখে জানিও। দীপ্তির কথা আমার মনে রইল—ব্যবস্থা করবো—কেমন ভাই?

কল্পনা আচার্য্য (নাগপুর) ৮৩৩

খুকু! তোমার চিঠি পড়ে খুব হেসেছি, লিখেছ—"তোমার পাশের বাড়ীর ইন্দিরাদি' নিশ্চয় ব্যাঙের অত্যাচারে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। আবার ঐ বিশ্রী ব্যাঙগুলো কি বলছে জানো? বলছে তোমাদের তো যথেষ্ট পাতা রয়েছে—যদি পাতাই থাকবে তাহলে আমাদের চিঠির উত্তর আরো বেশী করে দিতে পারো না কেন? আমরা তা শুনবো না, ওরা যদি দুটো পাতা নিতে পারে তবে আমাদের আরো দুটো পাতা সম্পাদক মশায়কে বাড়িয়ে দিতে বলো"—ইত্যাদি। খুকু! তোমার ব্যাঙের উপর এত রাগ কেন ভাই? বাণীসেনকে বলতে বলেছ—সে যেমন আমাদের না জানিয়ে পদবী বদলেছে তেমনি তার শাস্তিস্বরূপ আমাদের সব ভাই বোনকে (দিদিভাই সমেত?) সন্দেশ পাঠান চাই। উঃ শাস্তি ভীষণ, বাণী ফেল হয়ে যাবে। ব্যাজ এলেই পাঠাবো।

জয়ন্তী সিংহ (শ্যামবাজার) ৮১৩

লেখনীবন্ধু সম্বন্ধে নির্ব্বাচনের ভার তোমার উপর দিলাম। প্রতিমাকে চিঠি দিতে বলো। ভাবী গৃহিণীর বৈঠক তুলে দেওয়া হয়নি, স্থানাভাবে বন্ধ আছে। তোমাদের সকলেরই মত যাতে ওটা নিয়মিত

যায়—এ বিষয় আমি পরিচালক ও সম্পাদক মহাশয়কে বলবো। হ্যাঁ 'তুমি' ডাকটা আমিও খুব পছন্দ করি ভাই।

রেবা ও রেখা দাশ গুপ্তা (কলিকাতা)

পিনু ও মিনু ! তোমাদের চিঠি পেয়েছি ভাই। ব্যাজ এলেই পাঠান হবে। পিণ্টুরাণীদের ঠিকানা তোমাকে পাঠাচ্ছি।

সাধনা সরকার (গৌহাটী) ৭৬৫

বহুদিন বাদে চিঠি লিখেছ। জানি দিদিভাইকে মনে ছিলনা—খালি লেখনীবন্ধু চাই বলে চিঠি—না ? আচ্ছা এবার আমিও রাগ করতে জানি তখন কি করবে ভাই ?

সচ্চিদানন্দ সেন (দেবীগঞ্জ) ৮০৯

এর আগে তুমি কবে চিঠি দিয়েছিলে ? বহুদিন পূর্ব্বে একটা পেয়েছিলাম সেতো উত্তর দিয়েছি ভাই। তুমি অভিমান করোনা আমি তোমাদের প্রত্যেককেই সমান ভালবাসি। কে বলেছে আব্দার সহ্য করতে পারি না ? লেখনীবন্ধু কিন্তু নিজের নির্ব্বাচন ভাল বলে আমার মনে হয়। দেবীগণ সম্বন্ধে ভাল করে লিখো তাঁহলে তোমার ভাইবোনদের পড়তে দেবো।

সুরেখা বসু (কলিকাতা) ১০৪৬

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত। তোমার ছবিগুলো কিন্তু খুব চমৎকার ! 'তুমি' বল্লে দিদিভাই রাগ করবে কিনা তা জানোনা ? তোমার ধাঁধাটী আলাদা কাগজে লিখে পাঠিও ভাই।

গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) ১১৮৩

তোমার দু'খানা চিঠি আমি সম্পাদক মহাশয়কে দেবো এবং তাঁর কথামত জবাব পাবে। রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকার পাতায় তাদেরই লেখা প্রকাশিত হবে।

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) ১০৬৬

হ্যাঁ ভাই একজনের বেশী লেখনীবন্ধু নিশ্চয় পেতে পারো। গ্রাহকগ্রাহিকাদের লেখা প্রকাশ করতে আমরা খুব চেষ্টা করি ভাই।

রথীশচন্দ্র ঘোষ (রাজসাহী) ৩৩৬

তোমাদের অভিযোগ সত্যি, কিন্তু একথা সত্যি নয়, যে তোমাদের সকলকে সমান ভালবাসিনা, তোমার ছবিটা আমি যোগ্যস্থানে দিয়েছি—যথাসময়ে খবর পাবে।

শান্তিকুণ্ডু (শান্তিনিকেতন) ১১৮৩

তোমাদের ওখানে সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জহরলাল কন্যাসহ গিয়ে তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেছেন শুনে আমারও খুব লাগল। তোমার আমন্ত্রণ যথাসময়ে জানিও—চেষ্টা করবো রাখতে।

আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিন্তু সত্যি নয়। বাঁশরী গ্রাহিকা নয় ভাই। গ্রীষ্ম বা পূজার ছুটী যখনই হোক ঐ ঠিকানাতে লিখলেই পাবো বা উত্তর দেবো ভাই। সুজাতা ঘোষ বোনটীকে জিজ্ঞাসা করোতো দিদু, কেন সে চিঠি লেখে না ?

কুমুদবন্ধু সেন (কলিকাতা) ১১৭৮

রমা এখন কেমন আছে ভাই আমায় শীঘ্র জানিও, চিন্তিত আছি। ঠিকানা পাঠাচ্ছি।

জগদীশ দাস (তেলিনীপাড়া) ১১১৭

অরুণ বসু আমাদের গ্রাহক না হলেও তোমাদের সকলকে খুব ভালবাসে কিন্তু গ্রাহক নয় বলে তার ঠিকানা আমি জানিনা। তোমাদের অভিযোগ জানাবো কর্ত্তৃপক্ষকে।

শিবানী সরকার (কলিকাতা) ৪১৮

তুমি লিখেছ বাণীকে বলতে, যে তুমি ওকে চিঠি দিয়েছিলে—তুমিই বরং চিঠির উত্তর পাওনি। এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য পোষ্টঅফিস দায়ী—থাক আমার বক্তব্য উভয়ে উভয়কে চিঠি লেখা। আমায় চিনতে না পারার জন্য তোমার চেয়ে আমি বিশেষ দুঃখিত ভাই।

জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায় (আরা) ৯৩৭

চারমাস আগে কি চিঠি দিয়েছ ভাই ? পাইনি—পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম, তুমি দুঃখ করোনা—দিদিভাই তোমাদের সবার জন্যই। তোমার বয়স মোটে ১১, আমি ভাবছিলাম তুমি আমারই বা দাদা হবে বুঝি। তুমি কি আমায় লেখনীবন্ধু চাও ? এইবার হাসিয়েছ কিন্তু।

শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তোমার পাঠান নামে কেউ আছে কিনা জানতে হলে ভয়ানক মুস্কিল হবে—তার চেয়ে সে আছে বা নিশ্চিত জানো এমন নাম পাঠিও। তুমি রংমশাল পাওনি—আমি আবার খবর নিচ্ছি।

সুধীরকুমার নন্দী (চুঁচুড়া)

তুমি যা জানতে চেয়েছ রংমশালের পাতাতেই আছে। গ্রাহক না হলে চিঠির উত্তর দেবার নিয়ম নেই ভাই। তোমার কবিতা সম্পাদকমশাই মনোনীত করবেন—এবিষয়ে তোমাদের 'দিদিভাই'এর হাত নেই। দুঃখ করোনা, যদি মনোনীত হয় নিশ্চয় প্রকাশিত হবে।

প্রভাত দে (মজিদপুর) ১১০৫

তোমার বিশ্বাসটা ঠিকই—আমি তোমাদের সব্বাইকে খুব ভালবাসি। কবিতার বিষয় যথাসময়ে জানতে পারবে ভাই।

দিলীপ ব্যানার্জ্জি (কলিকাতা) ১১৪৫

যখনই পাঠাবে তখনই রচনা নেওয়া হবে। আগের চিঠি দেখতে গেলে বড় মুস্কিল হবে তার চেয়ে নামটা চটপট জানিয়ে ফেলো।

সুবোধকুমার গুপ্ত (আসানসোল) ১০৭১

তুমি অনেকটা রাগ করেছ দেখছি—কিন্তু অভিযোগ করেছ তা সব ভুল ভাই। পক্ষপাতিত্ব করবার উপায় নেই আমার, আর তোমাদের ে ়তর থেকে সেটা আমি চাইও না। অভিমান হয়েছে তাই ওকথা বলেছ—ঠিক না? দেশের নাম লিখে -কেউ গ্রাহক আছে কিনা বার করতে বড় অসুবিধা হয়—নাম করো যদি দিতে পারি, যাদের নাম এবার করেছ তাদের ঠিকানা পাঠাবো। তোমাকে এইবার বলছি তুমি নিশ্চয় খুব দিঠি দেবে—কেমন? তোমার কোনও চিঠিতে ঠিকানা থাকে না কেন বলতো?

রবীন্দ্র মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

আমি যা তোমার বইএর নাম দিচ্ছি তার লিষ্ট আলাদা পোষ্টে যাবে; বইগুলি ম্যাট্রিকক্লাসের ছেলেমেয়ের উপযোগী। আর যা জানতে চেয়েছ তা খোঁজ নিয়ে জানাবো পরে ভাই।

রবীন্দ্র সৈন, কামাখ্যাচন্দ্র বল, হৃষীকেশ দে ইত্যাদি, তোমাদের চিঠি পেয়েছি, অভিযোগগুলো সব জানাবো যথাযোগ্য স্থানে।

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা নিও।

শুভার্থিনী

দিদিভাই

গত মাসের রংমশালে 'ছুটির ঘণ্টা'তে আমাদের দুটি ভুল ছিল, আমরা এখানে সংশোধন করে নিচ্ছি। ভুলটি দেখিয়েছেন আমাদের এক গ্রাহক শ্রীমান এস্ এন্ দেব। টেনিসে যে ডাবল্‌স্ ম্যাচ রবার্টসন-হ্যারিস ও বিটি-মিসেলমোর খেলেছিলেন, সেটি exhibition match ছিল, international match নয়। আর হ্যারিসের বদলে লেখা হয়েছিল ভুল করে এণ্ডারসন।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের লেখা

ব্যাঙএর পাতা

—এক—

ঝিঁঝিপোকা দিব্যি আরামে গাছের ডালে বসে গান করে যাচ্ছে, এমন সময় কাণে শুন্‌তে পেল, একটা দারুণ গম্ভীর 'ঘাঁক্' শব্দ। শব্দটা শুনেই ঝিঁঝিপোকা গাছের গোড়ার দিকে চম্‌কে উঠে চাইলে। "টির্‌র্‌র্ টিক্ টিক্ টিক্—আরে একেবারে স্বয়ং সম্পাদকমশাই যে, পেন্নাম হই—তা' আপনাকে ত আর দেখ্‌তেই পাই না—বলি ব্যাপার কি?"

"আরে ছোঃ! এতকরে আয়োজন কর্‌লুম আমাদের 'ব্যাঙের পাতা'টা সাজিয়ে তুল্‌ব আর সম্পাদক মশায় কিনা গতমাসে আমাদের পাতাটা ছাপালেনই না—কি অপমান, কি অপমান—"বলে ব্যাঙ এক কাঁড়ি থুথু ফেল্‌লে।

"টির্‌র্‌র্ তাই নাকি?" ঝিঁঝি বললে, "আহা হা আমার অত সাধের কবিতাটা—

টির্‌র্ টিক্ টিক্ টর্‌রে
বনের গাছে গাছে,
যতেক পোকা আছে
লুকোও এখন শীগ্‌গির কর্‌রে;
শুক্ সারী দুইজন,
এসে যাবে এইক্ষণ
দেখ্‌লেই তোমাদের পেটে দেবে পুর্‌রে।"

ব্যাঙ মুখগম্ভীর করে বল্লে,—"আরে খোঁক্ এর চেয়ে আমি একটা ভাল গান লিখেছিলাম—শোন তার খানিকটা—একেবারে মধু, প্রতি ছন্দে প্রতি অলঙ্কারে মধু ঝরে পড়ছে; শুনেছ কি মোহিত হয়েছ—

ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙর্ ঘাক্
মেঘ দিয়েছে ডাক্
চারটে দিক্ কালো করে, মেঘরা আছে আকাশ ভরে
জল হবে নির্ঘাত
ঘ্যাঙর ঘ্যাত্ ঘাত্ ।
ওরে সোণা, ওরে কোলা
থাকিস্‌নে আর আপন ভোলা
গর্ত্ত ছেড়ে বেরিয়ে আয় মাটির ঘাসের প'র
আনন্দে আর উচ্ছ্বাসে আজ বাদ্‌লা গানটী ধ'র ।

ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্
ভগবানের সৃষ্টি এই যে এই বৃষ্টি
কি মধুর কি মধুর ;
ঘ্যাঙুর ঘ্যাঙ ঘ্যাঙুর্ ।"

ইতিমধ্যে ব্যাঙ সম্পাদক মশা'য়ের বাঁজখাই গলার আওয়াজ পেয়ে চারিদিকে অসংখ্য ব্যাঙ, কেন্নো, ঝিঁঝি, গুবরে, শুঁয়ো, কেঁচো, পিঁপ্‌ড়ে, উই আরও নানা মহাত্মা এসে জড়ো হয়েছে। তারা সবাই খুব হাততালি দিলে। ব্যাঙের পাতায় একে না ছাপালে চলবে না। ব্যাঙমশায়, হাজির হ'ন সম্পাদকের কাছে—যেমন করে হোক ওটা দেওয়া চাই।

ব্যাঙমশায় গলাটা ফুলিয়ে একটী ছোট খাটো বলের মত করে তুল্‌লেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন "উপস্থিত বন্ধুরা আপনাদের অভিনন্দনে ভারী সুখী হলুম। আপনারা রসিকজন আর সম্পাদক…। আচ্ছা দেখি ঃ চলি আজ, বন্ধুগণ নমস্কার।

আগের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফলগুলি চৈত্রের রংমশালে প্রকাশিত হবে।

ব্যাঙএর পাতা

—দুই—

শ্রীঅজয়কুমার দত্ত

ঘ্যাঙর ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্— ! ব্যাঙ সম্পাদক কথা বল্‌ছেন সকলে অবধান করুন।

অগ্রাণ মাসে স্থানাভাবে ঝিঁঝিপোকার যে কবিতাটি দেওয়া সম্ভবপর হয়নি সে'টি এখানে এবার না দিয়ে পারা গেল না ঃ—

ঝিঁ—ঝিঁ—ঝিঁ—ঝিঁ—
বাদলধারায় নাইছে আজি তেলাপোকা, টিক্‌টিকি।
ছাতার নীচে ব্যাঙটি নাচে, ফড়িং গাছের ডালে,
কিলবিলিয়ে হিলহিলে সাপ নদীর জলে চলে।
দিক্ ভরেছে বাণের জলে, গাছ ভরেছে ফলে,
হাংলা পাখী তাইনা দেখে ভাসে জিভের জলে।
কাছিম বুড়ো ব'সে আছে নল-খাগড়ার বনে,
রুইএর খোকা গল্প শোনে কাৎলা ছানার সনে।
পাখীর ভয়ে পোকামাকড় লুকোয় সবুজ ঘাসে,
বক-ধার্ম্মিক নদীর ধারে মাছের লোভে আসে।

দেখেছ আস্পর্দ্ধা ? তবু আমি নির্ভয়ে ছাপালাম। অন্য সম্পাদক কি এত সাহস করত ? হুঁ, এ কেবল কোলা ব্যাঙই পারে।

আমাদের দলের লোক হয়েও ঝিঁঝিঁ আমাদের অপমান করতে চেষ্টা করছে। আবার সেই ব্যাঙের ছাতা ! তোমাদের ভাষায় একে নিশ্চয় 'বিদ্রোহী' বলবে ; আমিও তাই বলি। এক চড়ে ঝিঁঝিঁকে যদি ঝাঁঝা'য় পাঠাতে পারি তবে রাগ থামে। ওকে জব্দ করতেই হবে।

কাজেই কৌশল দরকার। 'তেলাপোকা কর্ম্মকার'কে দিয়ে প্রকাণ্ড এক '—' যাকে তোমরা মেডেল বল, তাই তৈরী করালাম, উদ্দেশ্য, পুরস্কার দেবার অছিলায় ওর ঘাড়ে যদি ভারী মেডেলটা চাপিয়ে দি তাহ'লে ওকে আর নড়তে হবে না।

কিন্তু হায় হায় ! সভার মধ্যে যখন ঝিঁঝিঁপোকার গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে মেডেলটি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছি তখন হঠাৎ পা পিছলে মঞ্চের নীচে পড়ে গেলাম এবং মেডেলটি পড়ল ঠিক আমার ঘাড়ের উপরে। মনে হল সভার সকলেই জোরে হেসে উঠল। ঝিঁঝিঁপোকাই সকলের চেয়ে জোরে হেসেছিল। রাগে আমার চোখে জল এসে পড়ল।

কিন্তু তখন আমার নড়বার পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল না—মেডেলটি আমি সরাতে হয়ত পারতাম, কিন্তু অত উঁচু জায়গা থেকে পড়ায় আমার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। তবু আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম।

তোমরা যদি দয়া ক'রে কোন কৌশল জানাও তবে আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস ক'রো না

শ্রীপ্রদ্যোৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সে দিন স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি ক্লাসে Teacher আসেন নি। পেছনের বেঞ্চে কতকগুলো ছেলে খুব হল্লা কর্‌ছে। তাদের কাছে গিয়ে দেখি মোহিতের হাতে একটা বাংলা খবরের কাগজ। সে বেশ জোর গলায় বলছে, "আচ্ছা ধর একটার দাম আধ পয়সা, তা হলেও একশ চৌষট্টিটার দাম এক টাকার বেশী। উঃ! এ রকম উপহার বোধ হয় পৃথিবীর কোন দোকান দেয়নি! সত্যি ভীষণ সস্তায় ছেড়েছে।" কাছে গিয়ে জিগ্যেস্ করলাম, "কি ব্যাপার?" মোহিত কাগজটা এনে বল্লে, "এই দেখ বেনারাসের একটা ফার্ম্ম নতুন খুলছে। এরা ভীষণ সস্তায় নানারকম উপহার দিচ্ছে। এক টাকায় ১৬৪টা উপহার। আজই পাঠিয়ে দেব।" কাগজটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে পড়ে দেখলাম, সত্যি! একটা ফার্ম্ম এক টাকায় ১৬৪ রকম উপহার দেবে, বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তার মধ্যে রিষ্ট-ওয়াচ, গরদের চাদর ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা তক্ষুণি উপদেশ দিলাম, "নিশ্চয়—আজই পাঠিয়ে দে। নইলে পরে যদি ফুরিয়ে যায়?" আলোচনা আর বেশী দূর এগোল না কারণ মাষ্টারমশাই এসে পড়লেন।

বিকেলে বাড়ী যাবার পথে আমাদের সামনে মণিঅর্ডার ও চিঠি লেখা হল। ঠিকানাটা স্কুলের দেওয়া হল, সবাইর সামনে খোলা হবে বোলে।

ত্ব'দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন থার্ড পিরিয়াডে দপ্তরী একটা পার্শ্বেল মাষ্টারমশাইকে দিয়ে গেল। দেখলাম তার ওপর বেশ বড় বড় করে লেখা—Mohitlal Mazumdar। মোহিতের মুখ আনন্দে, গর্ব্বে ফুলে উঠেছে। আমরা বার বার তার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম, "কেন আনতে দিলাম না!" তারপর টিফিনে সবাই মোহিতকে ঘিরে ধরলাম। সে আস্তে আস্তে বাক্সটা খুলতে লাগল, তার দিকে প্রায় ত্রিশ জোড়া কৌতুহলী চোখ চেয়ে রইল। প্রথমে খালি প্যাকিং খড়—সে যেন আর ফুরায় না। তারপর আরও কিছুক্ষণ খড় তোলার পর আর একটা বাক্স বেরল। মোহিত বল্লে, "পাছে ভেঙ্গে যায় তাই এই ব্যবস্থা করেছে রে।" এ বাক্সটা খুলেও কিছু খড় বেরল, তবে আগের মত নয়—ঢের অল্প। খড় সরিয়ে দেখা গেল……তাতে শুধু মোহিতের কেন, আমাদেরও মুখ কালো হয়ে গেল। তার মধ্যে শুধু এক গজ কাপড় আর একটি ভাঙ্গা ঘড়ি। তা বাদ, ১৬২ খানা কালীর বড়ি। কে একজন বল্‌ল, যাক্ তাহ'লে ১৬৪ খানা ঠিকই দিয়েছে!……

সেইদিন থেকে আজও আমি বলে আসছি—বিজ্ঞাপনে কেউ বিশ্বাস কোরোনা।

নূতন ধাঁধা

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

বল তো?

(১) কোন্ ফুল চোখ বুজলেও দেখা যায়?
(২) কোন্ পাখি ফুল হয়?
(৩) কোন্ দেশ ঝাল?
(৪) কোন্ দেশ শ্রীমান্?
(৫) কোন্ সমুদ্র মরেচে?
(৬) কোন্ সমুদ্র দ্বীপ?
(৭) কোন্ কুকুর ডালে থাকে?
(৮) কোন্ মানুষ মানুষ নয়?
(৯) কোন্ নোন্‌তা খাবার জলে তৈরী হয়?
(১০) কোন্ দেশ ভাগ্‌ল?

কোথা থেকে?

একটি লোকের কাছে নানা—দেশ থেকে অতিথি এসেছে। তারা কোন্ দেশ থেকে এসেঁছে জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যেকে হেঁয়ালির মত উত্তর দিল। সাধারণ জ্ঞানেএ সবগুলিই জানা যায়—আসলে একটিও হেঁয়ালি নয়। তোমরা কি বল্‌তে পার, কে কোন্ দেশ থেকে এসেছে? হেঁয়ালি উত্তরগুলি এই।—

(১) যে দেশে পৃথিবীর সব চেয়ে প্রাচীন গাছ (জীবন্ত) আছে।
(২) যে দেশের একটি মরুভূমিকে মানুষ নিজ চেষ্টায় উর্ব্বরা করেছে।
(৩) যে দেশের নদীর জলের মাছ বৈদ্যুতিক 'ঝটকা' (shock) লাগাতে পারে।
(৪) যে দেশে সব চেয়ে উঁচু জায়গায় মানুষ বাস করে।
(৫) যে দেশে নাকে নাক ঘ'ষে অভিবাদন করে!
(৬) যে দেশে পাখী পুষে তা'দের দিয়ে মাছ ধরান হয়।
(৭) যে দেশে সব চেয়ে বেশী ভূমিকম্প হয়।
(৮) যে দেশে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা রেল-প্ল্যাটফর্ম আছে।
(৯) যে দেশে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় আবাদ আছে।
(১০) যে দেশে ওকাপির বাস।

উঃ পাঠাবার শেষদিন ৩০শে ফাল্গুন

নূতন প্রতিযোগিতা

এবার একটি মজার গল্প লিখতে হবে তোমাদের। গল্পের নায়ক হচ্ছেন তিন বন্ধু! জল, হাওয়া ও রোদ্দুর। গল্প এখন তোমাদের হাতে। রংমশালের ত্ব পাতা নিতে পারো। পাঠাবার শেষ দিন ৭ই চৈত্র। পুরস্কার আছে—সকলের যোগ দেওয়া চাই।

মাঘ মাসের

ধাঁধার উত্তর

১। অভিধান। ২। মাঝারি। ৩। আধ পয়সা। ৪। মানে। ৫। বকুনি।
৬। রংমশাল। ৭। ঘটক। ৮। নীরব।

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতা :—

রবীন্দ্র, মেজবৌদি, সুন্দরবৌদি, মা, বাবা ও নীরেন্দ্র রায়, (আঠার বাড়ী); ইন্দিরা ঘোষ, নীহার, কমল ও রেণু বোস, (ফেণী); পঞ্চানন রুই, (উল্টাডাঙ্গা); সুধীন্দ্র নাথ গুহ, (ভবানীপুর); সুকুমার মুখার্জ্জী, (ভবানীপুর); প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর); অমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); কুমারী কমলা চাটার্জ্জী, (শ্যামবাজার); জগদিন্দ্র নাথ রায়, (ভবানীপুর); রবীন্দ্র নাথ নাগ, (লক্ষ্ণৌ); দিলীপকুমার সোম, (মীরাট); অসীমা, অনিলা ও অনিমা, (ভাগলপুর); অরুণ, অজয়, অমর ও অনন্ত, (পুরী); ইলা, লীলা ও সমর, (শিলং); বুধু, মিণ্টু, লিলি, (ভবানীপুর); প্রভাত কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর); মীরা, প্রদীপ, বুন্থ, কেয়া, গিনিপিগ, (কলিকাতা); অরুন্ধতী, মধু ও মৌ, (কলিকাতা); শ্যামলী, ফুলু, (কালীঘাট); দীনবন্ধু সেন, (কলিকাতা); রুণা মিত্র, (রাওয়ালপিণ্ডি)।

যাদের একটিমাত্র ভুল হয়েছে :—

প্রীতিময় ও মিস জবা, (কলিকাতা); অজয় নাথ, কমলারাণী ও অর্চ্চনা রাণী ঘোষ, (ভেড়ামারা); কুমারী ইলা নন্দী, (লাহোর); অমিয়া ও আরতি দত্ত, (কলিকাতা); গীতা দত্ত, (বালীগঞ্জ); পিন্থ, মিন্থ ও বাবলু, (কলিকাতা); তরুণ ঘোষ, (বালীগঞ্জ); কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর)।

কয়েকটি উত্তর দেরী করে আসায় তাদের নাম আমরা দিতে পারলাম না।

নতুন উপন্যাস বৈশাখ থেকে সুরু হবে।

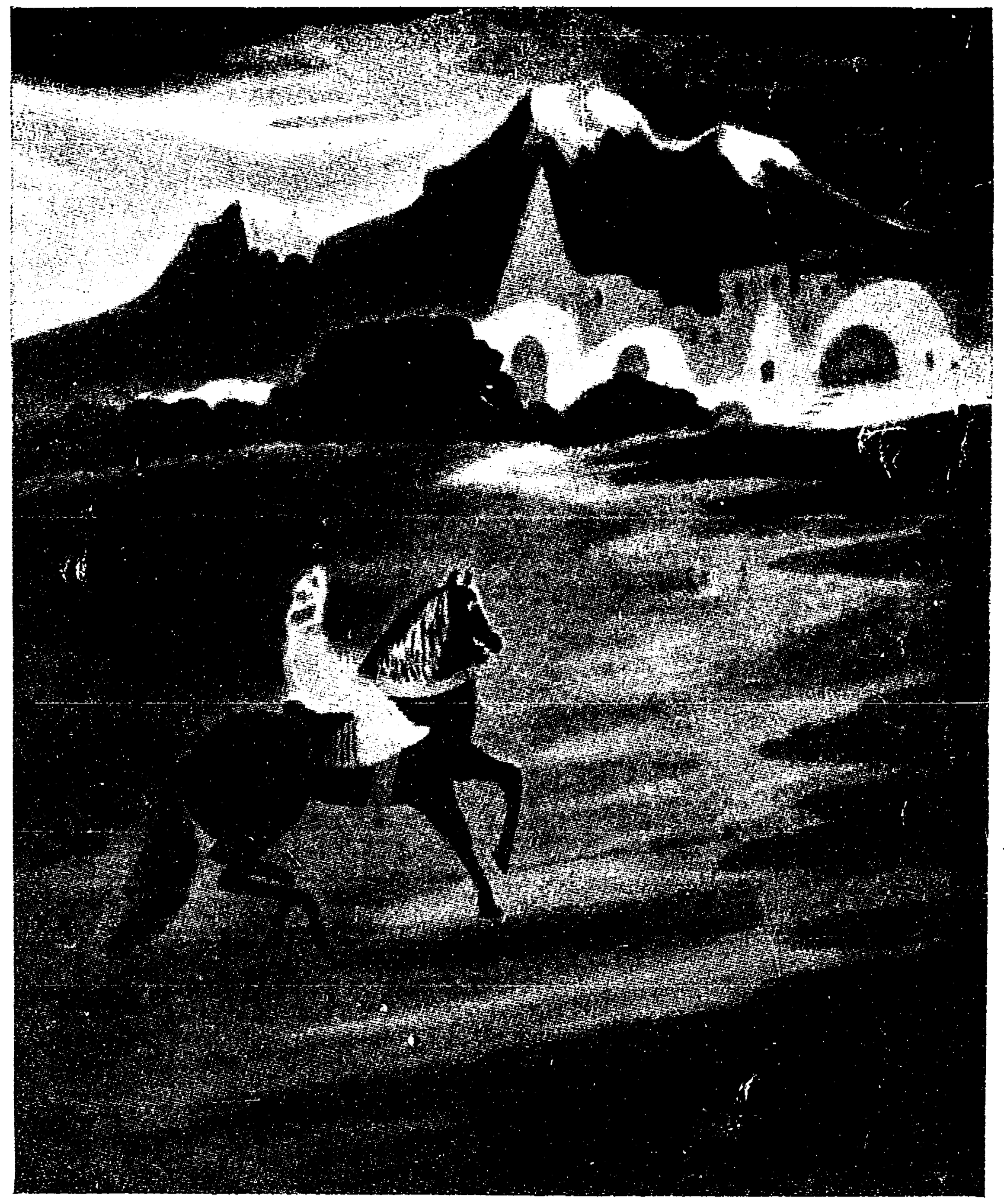

অগমদেশে রাজপুত্তুর

শিল্পী আচার্য্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রংমশাল

তৃতীয় বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র
১৩৪৫

দত্যিরাজ

শ্রীসতীকান্ত গুহ

মেঘের শেষে নীলের দেশে দত্যিরাজের বাড়ি,
ইট পাথরের বাড়ি তো নয়, মেঘের পুরী তারি,
মেঘের গাড়ি চাপেন তো নেই ঘোড়ায়-টানা গাড়ি।

দত্যি হুহুঙ্কার,
হাওয়ার দেশে হাওয়ার রাজা খোঁজ রাখে কে আর ?
দত্যিরাজের আছে তবু বেজায় অহঙ্কার।

হাওয়ার দেশে হাওয়ার রাজা ফন্দি জানেন মেলা,
সব হাওয়া তার চাকর হুকুম খাটে সকল বেলা,
ঝড় বাতাসে খেলেন কভু ভয় দেখানো খেলা।

দত্যি হুহুঙ্কার,
ঝোড়ো হাওয়ায় কালো মেঘে রথ ছোটে যে তার,
বাজের মুখে ধমকে ওঠেন, ছিরিষ্টি চূরমার।

খেয়াল ভরে থাকেন রাজা, বিষম খেয়ালী,
ভোরের মেঘে রঙটি ফলান, আলোর দেয়ালী,
গোধূলি তার রঙের বাঁশী, সুরটি সোণালী।

জ্যোছ্না রাতে আলোর গাঙে মেঘের ভেলা ভাসে,
হুকুমে তার মেঘ ছোঁয়ানো নরম হাওয়া আসে,
চাঁদের সাথে খেলতে রাজা তখন ভালোবাসে।

খেয়াল বোঝা ভার,
কালো মেঘে ক্কড়ক্কড়াক্কড় ধমকখানা তার,
ভয়েই মরে ধমক শুনে ছিরিষ্টি সংসার।

কোন্ খেয়ালে থাকেন রাজা খবর কে আনে?
হেসে কেঁদে আছেন রাজা—তাদের কি মানে!
আছেন রাজা দুঃখে সুখে—আছেন কে জানে?

বীর স্যামসন

শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য

অনেকদিন আগে সেই বাইবেলের যুগে, প্যালেষ্টাইনের জোরা পাহাড়ের ওপর থাকতো স্যামসনের মা বাপ। তখনো স্যামসন জন্মায়নি। পাহাড় থেকে খানিক তফাতে দেখা যেতো ফিলিষ্টিয়া। পাহাড়ে বসে ফিলিষ্টিয়ার পানে চেয়ে স্যামসনের মা ভাবতো ফিলিষ্টাইনদের কথা। কি অত্যাচারই না করতো ফিলিষ্টাইনরা ইস্‌রায়েলের লোকদের ওপর! সহরের দিকে চেয়ে, স্যামসনের মা ঈশ্বরের কাছে চাইতো, এমন একটী বীর ছেলে, যে ইস্‌রেলাইটদের এই ফিলিষ্টাইনদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে।

ফিলিষ্টাইনরা ঈশ্বরকে ভুলে, সারাদিন তাদের দেবতা ড্র্যাগনের পূজোয়, নাচগানে, আমোদে মেতে থাকতো।

একদিন রাতে স্যামসনের মা স্বপ্ন দেখলে, ঈশ্বর তার কোল আলো ক'রবার জন্যে একটি ছেলে দেবেন। সে ছেলেকে উৎসর্গ করতে হবে ঈশ্বরের নামে আর তাকে গড়ে তুলতে হবে এমন করে, যাতে সে স্বজাতির উন্নতি করতে পারে। তবে এটা মনে রাখতে হবে, তার চুল যেন কখনো কাটা না হয়, কারণ তার শক্তির মূল হবে ওই চুলের রাশি!

শেষে একদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদ সফল হোল। তাদের একটি ছেলে হোল। সেই ছেলের নাম রাখা হোল—স্যামসন। ছেলে যতই বড় হতে লাগলো, মা বাপের আশা হতে লাগলো, হয়তো এই ছেলেই তাদের সব দুঃখ কষ্টের অবসান করবে। কিন্তু স্যামসন ফিলিষ্টাইনদের ঘৃণা করা তো দূরের কথা, উল্‌টে সে তাদের সঙ্গে বেশী করে মিশতে লাগলো। শেষে যখন স্যামসন, ফিলিষ্টাইনদেরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করবার অন্যে বাপকে বল্লে, তখন তারা মর্ম্মাহত হল। কিন্তু বলবান যুবক ছেলেকে কোন কথা বলতে তাদের ভরসা হোল না। তারা ছেলেকে ছেলেবেলা থেকেই দেহ শক্তিশালী করতে শিখিয়েছে, মনের শিক্ষা তো কোনদিন দেয়নি।

একদিন স্যামসন তার ভাবী বৌয়ের কাছে যাবার সময় দেখলে, এক সিংহী থাবা উঁচিয়ে তার দিকে ছুটে আস্‌ছে, শুধু হাতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্যামসন সিংহীটার চোয়াল দুটো ধরে, তাকে কাগজের মত ছিঁড়ে দু'খানা করে ফেল্লে!

কিছুদিন যায়। স্যামসন আর একদিন পথে যেতে যেতে দেখলে, মরা সিংহীটার দেহে মৌমাছিরা বাসা বেঁধেছে আর তাদের চাক থেকে মধু গড়িয়ে পড়ছে। স্যামসন মৌমাছিদের পিষে মেরে সেই মধু প্রাণ ভরে খেয়ে নিলে।

আর কিছুদিন পরে স্যামসনের বিয়ের ঠিক হোল। বিয়ের উৎসবের মাঝে হঠাৎ স্যামসন তার আমুদে বন্ধুদের এক প্রশ্ন করে বসলো। যে তার জবাব দিতে পারবে সে পাবে তিরিশ রকমের পোষাক। তখন সবাই প্রশ্নটা জানতে চাইলে। স্যামসন সিংহীর ঘটনাটাকে ধাঁধার মত করে বল্লে—"খাদক হলো খাদ্য, তার ফলে বলবান পেলে মধু।"

সিংহীর ব্যাপারটা এদের ভেতর কেউ জানতো না! কাজেই কেউ জবাব দিতেও পারলে না। শেষে তারা স্যামসনের বৌয়ের কাছে গিয়ে, জবাবটা স্যামসনকে ভুলিয়ে জেনে নিয়ে, তাদের জানাতে বল্লে। তারা স্যামসনের বৌকে ভয় দেখালে, যে ধাঁধার জবাব না পেলে তাকে আর তার বুড়ো বাপকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। প্রাণের ভয়ে স্যামসনের বৌ, স্যামসনকে ভুলিয়ে জবাবটা জেনে নিয়ে, বন্ধুদের বলে দিলে।

স্যামসনকে কথামত তিরিশ রকম পোষাক দিতে হোল। সেগুলো জোগাড় করবার জন্যে স্যামসন তিরিশজন নিরীহ লোককে খুন করলে। কিন্তু কাজটা করে ফেলেই স্যামসনের মনটা গেল খারাপ হয়ে। বন্ধুদের কারসাজি টের পেয়ে স্যামসন বৌকে ছেড়ে চলে গেল একটা নির্জ্জন পাহাড়ে। পাহাড়ের নির্জ্জনতায় দু'চারদিন কাটিয়ে স্যামসনের রাগটা পড়ে গেল। বৌয়ের কষ্টের কথা ভেবে স্যামসন ছুটে গেল তার কাছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার বাপ আর একজনের সঙ্গে মেয়ের আবার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। রাগে অন্ধ হয়ে স্যামসন ফিলিষ্টাইনদের ওপর ভীষণ প্রতিশোধ নিলে। তিনশো শেয়ালকে লেজে লেজে বেঁধে, তাদের লেজে আগুন ধরিয়ে, ফিলিষ্টাইনদের ক্ষেতের দিকে স্যামসন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ফসলশুদ্ধ ক্ষেত আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এই ভীষণ অত্যাচারের শোধ নেবার জন্যে ফিলিষ্টাইনরা তখন একজোট হোল। কিন্তু স্যামসনের কাছ ঘেঁসবার মত সাহস তাদের ছিল না। কাজেই তারা স্যামসনের বৌ আর তার বুড়ো বাপকে পুড়িয়ে মেরে, গায়ের ঝাল মেটালে।

এতে স্যামসনের রাগ আরো বেড়ে গেল। একদিন ফিলিষ্টাইনদের পল্লীতে ঢুকে, বিস্তর লোককে খুন করে তার রাগ একটু পড়লো। কিন্তু ভীষণ প্রতিশোধ নেবার পরই যেমন বলবান পুরুষের রাগ পড়ে যায়, তেমনি নিজের ক্ষমতার কথা ভেবে মনটা গর্ব্বে ফুলে উঠে। দুঃখ আর গর্ব্বের ভার থেকে মনটা হালকা করবার জন্যে আবার স্যামসন পাহাড়ের চূড়ায় চল্লে গেল। বার বার ঘা খেয়ে, বার বার নিজের ক্ষমতার গর্ব্বে মত্ত হয়ে, সে ঈশ্বরকে ভুলে গেল!

ফিলিষ্টাইনরা তখন ইস্‌রেলাইটদের কাছে গিয়ে ভয় দেখালে, যদি তারা স্যামসনকে বেঁধে তাদের হাতে না দেয়, তবে তারা ইস্‌রেলাইটদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রাণের ভয়ে ইস্‌রেলাইটরা তখন ফিলিষ্টাইনদের কথায় রাজি হোল। তখন জনকয়েক লোক গেল পাহাড়ের উপর স্যামসনের কাছে। ফিলিষ্টাইনদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যে, তাকে গালমন্দ করে, শেষে তারা স্যামসনকে বেঁধে ফিলিষ্টাইনদের হাতে দিলে। স্যামসনের মন তখন বড় খারাপ। কাজেই সে এই সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সইলে। কিম্বা এও হতে পারে, স্যামসন জানতো নিজের শক্তির কথা। ঠিক সময়ে সেটা কাজে লাগাতে পারবে ভেবেই, বোধ হয় সে এত সহজে ধরা দিলে। আর সত্যি হোলও তাই।

মোটা মোটা দড়িগুলো সুতোর মত পট পট করে ছিঁড়ে—

এদিকে স্যামসনকে হাতে পেয়ে ফিলিষ্টাইনদের আনন্দ দেখে কে? তাকে বেঁধে তারা নিজেদের পল্লীতে নিয়ে এলো। সময় বুঝে স্যামসন তার বুকের ছাতি আর পেশীবহুল হাত দু'খানার চাড়ে, মোটা মোটা দড়িগুলো সূতোর মত পট্ পট্ করে ছিঁড়ে ফেল্লে। তারপর একটা গাধার চোয়ালের হাড় দিয়ে বিস্তর ফিলিষ্টাইনকে পিটিয়ে শেষ করে, স্যামসন গাজা সহরে গিয়ে ঠাঁই নিলে।

শোধ নেবার জন্যে ফিলিষ্টাইনরা স্যামসনের পিছু পিছু গাজায় গেল। সেখানে তারা স্যামসনকে গুম্খুন করবার মতলব আঁটলে। স্যামসন ভোরবেলা যে পথ দিয়ে যায়, সেটা জেনে নিয়ে গুপ্তঘাতকের দল রাস্তার ফটকের ওপর চেপে রইলো। তাদের মতলব জানতে পেরে, মাঝরাতে হঠাৎ চড়াও হয়ে, স্যামসন গুপ্তঘাতক শুদ্ধ ফটকটা তুলে নিয়ে, দিলে এক পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে। এবারেও ফিলিষ্টাইনদের ওপর এইভাবে শোধ নিয়ে স্যামসনের বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো!

এরপর থেকে কেউ আর স্যামসনের সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস করে না। ক্ষমতার গর্ব্বে মত্ত হয়ে স্যামসন যেখানে সেখানে যা খুশী তাই করে বেড়াতে লাগলো।

এই সময়ে স্যামসনের ধ্বংশের মূর্ত্তি ধরে দেখা দিলে ডেলিলা। সে ছিল ফিলিষ্টাইনদেরই মেয়ে। দেখতে সে যেমন সুন্দরী, তার বুদ্ধিও তেমনি ছিল অসাধারণ। ডেলিলার ফাঁদে পা দিতে গর্ব্বে উন্মত্ত স্যামসনের একটুকুও দেরী হোল না।

নিরুপায় ফিলিষ্টাইনরা তখন ডেলিলার শরণ নিলে; স্যামসনের অত শক্তির মূল কোথায়, তাকে ভুলিয়ে সেটা জেনে নিতে, তারা ডেলিলাকে ধরলে। ডেলিলা অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু দেহের বলে বলীয়ান স্যামসন শক্তির কথা উঠলেই সাবধান হয়ে যায়। তাহলেও গর্ব্বে পাগল স্যামসনের তখন বিচার বুদ্ধি ছিল না। শেষে ডেলিলার চাতুরীতে ভুলে, স্যামসন নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনলে। একদিন স্যামসন বলে ফেল্লে যে, তার বাবরি কাটা বড় বড় চুলের রাশিই তার সব শক্তির মূল।

বেইমানী করে ডেলিলা কথাটা ফিলিষ্টাইনদের কাছে ফাঁস করে দিলে।

তখন ফিলিষ্টাইনরা, ঘুমন্ত অবস্থায় স্যামসনের মাথার চুলগুলো কেটে নিয়ে, তাকে বেঁধে ফেল্লে। জেগে উঠে বাঁধন ছেঁড়বার জন্যে স্যামসন বিস্তর চেষ্টা করলে। কিন্তু মাথার চুলের সঙ্গে স্যামসন দেহের সব জোরই হারিয়েছিল। কাজেই তার সব চেষ্টাই মিছে হোল। রাগে চোখ লাল করে স্যামসন ডেলিলার পানে তাকালে। শক্তিহীন স্যামসনের সব আস্ফালন মিথ্যে জেনে, ডেলিলা একটুও ভয় তো পেলেই না, উল্টে বাবরি কাটা চুলের গোছা স্যামসনের নাকের ওপর দুলিয়ে, তাকে ঠাট্টা করতে লাগলো। প্রথমে স্যামসনের চোখ দুটো কানা করে দিয়ে ফিলিষ্টাইনরা তাদের এতদিনের জমা করা রাগের প্রতিশোধ নিলে। তারপর স্যামসনকে গাজার এক গারদে গম-পেষা যাঁতায় গরুর মত জুতে দিলে। এত করেও তাদের রাগ পড়লো না। শেষে স্যামসনের ওপর তাদের এই জয়টাকে চূড়ান্ত করে উপভোগ করবার মতলব করে, ফিলিষ্টাইনরা তাদের দেবতা ড্র্যাগনের পূজো আর ভোজের ব্যবস্থা করলে। সেই উৎসবে খাওয়া দাওয়া, নাচ গান হতে থাক। শেষে সবাই ঠিক করলে, স্যামসন এসে তার গায়ের জোরের

কসরৎ দেখিয়ে তাদের আমোদ দিক। একটা ছোট ছেলে কানা স্যামসনের হাত ধরে তাকে আসরে নিয়ে এলো। স্যামসন নানা রকমে ফিলিষ্টাইনদের আনন্দ দিতে লাগলো। তাই দেখে ফিলিষ্টাইনদের আনন্দ আর ধরে না। তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, "দেখ হে দেখ, যে ছিল সিংহী, সে আজ শেয়ালেরও অধম হয়েছে। বাঃ! বেশ নাচ হচ্ছে স্যামসন! চালাও! চালাও!"—বলে তারা হেসে লুটোলুটি খেতে লাগলো।

স্যামসন অপমানের ভারে ভেঙ্গে পড়লো। পা যখন আর উঠে না, তখন স্যামসন একবার বাইরে গিয়ে, একটু জিরিয়ে নেবার হুকুম চাইলে। মোড়লদের কাছে সে আর্জ্জি পেশ করা হোল। শুনে তারা তো হেসেই আকুল!—আঁা! তুমি ক্লান্ত! বল কি হে বীর স্যামসন? এই একটু খেলা দেখিয়েই তুমি এলিয়ে পড়ছো? তুমিই না এককালে শুধু হাতে একটা সিংহীকে কাগজের মত ছিড়ে দুখানা করে ছিলে? তুমিই না আবার শুধু দেহের চাড়ে, দড়ির বাঁধন সূতোর মত পট্ পট্ করে ছিঁড়ে, একটা গাধার চোয়ালের হাড় দিয়ে পিটিয়ে, ফিলিষ্টাইনের দফা রফা করেছিলে? বল কি হে স্যামসন, তুমি জিরোবে? হাসালে যা হোক্! 'আচ্ছা যাও, বাইরে গিয়ে হাওয়া খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে এসো গে। তারপর ফের্ নাচ সুরু করা যাবে। কি বল হে তোমরা? বীর স্যামসনের নাচ তোমাদের ভাল লাগবে তো?

চিৎকার করে সবাই হেসে উঠলো। কেউ কেউ স্যামসনকে ঠাট্টা করতে লাগলো। তার মধ্যে ডেলিলার হাসি স্যামসনের কানে ছুঁচের মত এসে বিঁধলো।

বাইরে গিয়ে স্যামসন বসে পড়লো। তার তখন মনে হতে লাগলো—বাপ মায়ের আদর, ভালবাসা; মধুর কৈশোরের কথা; যৌবনের সে দৃপ্ত তেজ! তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার কুকীর্ত্তির কথা। চেষ্টা করলে সে যে মোসেস্ যস্থুয়ার একজন হতে পারতো! সে আজ এই অসভ্য ফিলিষ্টাইনদের হাতে খেলার পুতুল! যে ছিল সিংহ, সে আজ শেয়ালেরও অবজ্ঞার পাত্র! যারা এককালে তার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করতো না, তাদের কাছে সে আজ দয়ার ভিখারী!—দুঃখে, ক্ষোভে, অনুতাপে, অপমানে তার কানা চোখের কোটর বেয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। যে ভগবানকে সে সুখের দিনে কখনো মনে করেনি, আজ তাঁর কাছে, শুধু একবার, তার পূর্ব্ব শক্তি ফিরে পাবার প্রার্থনা জানালে।

ভেতর থেকে হল্লা তার কানে আসছিল।—"কোথা গেল হে, তোমাদের বীর স্যামসন? তাকে নিয়ে এসো। খানিক নাচ দেখা যাক্।"

ছোকরা ছেলেটি স্যামসনের হাত ধরে তুল্লে। স্যামসনের মনে হোল, যেন সে তার পূর্ব্বশক্তি ফিরে পেয়েছে। প্রতিহিংসার আগুন বুকে পুরে নিয়ে, স্যামসন আসরে এসে আবার খেলা সুরু করলে। ফিলিষ্টাইনরা মহা খুশী। মাঝে মাঝে ডেলিলা চিৎকার করে হেসে উঠে বলতে লাগলো, "কই গো, নাচো না বাপু! আজকের দিনে মজাটা জমুক্!"

একদফা নাচ শেষ করে স্যামসন তখন একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর একবার সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালে। তারপর বল্লে, "হ্যাঁ, এই মজা দেখাচ্ছি। এইবার বেশ ভাল করেই দেখে নাও সব! হয় তো আর দেখা বরাতে জুটবে না—"

এই বিদ্রূপে ডেলিলা যেন জ্বলে উঠলো ; তবু রাগ চেপে ঠাট্টার স্বরে বল্লে,—"সে কি বাপু ! তুমি বেঁচে থাক্‌তে মজা দেখা শেষ হবে কেন ? যতদিন তুমি বেঁচে আছো, ততদিন কি আর মজার অভাব হবে ? কি বলগো তোমরা ?"

সবাই হেসে তার কথায় সায় দিলে।

তখন স্যামসন তার প্রাণপণ শক্তিতে থামে চাড় দিয়ে বলে উঠলো, "বেঁচে আর কেউই থাকবে না, ডেলিলা সুন্দরী। তুমিও না, আমিও না, আর এরাও না। দিন সবাইকারই ঘনিয়ে এসেছে—"

দেখতে দেখতে থামটা প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়লো ! আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটা কেঁপে উঠলো। তারপর নেমে এলো সমস্ত ছাদটা। আর তার তলায় যাঁতার চাপে গমের মত পিষে গেল সবাই !

বেতারে পঠিত

নীলকণ্ঠ পাখী

একাঙ্ক নাটিকা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

রাজকুমারী চন্দ্রার অন্তঃপুরে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাজকন্যার স্বয়ম্বর। সখিদের তাই আনন্দের সীমা নেই। দল বেঁধে সঙ্গীতে প্রাসাদকে তারা মুখরিত করে তুলেছে।

সখিদের গান

আজকে সখির সফল হ'ল মনে মনে মালা গাঁথা
তোরণ দ্বারে আসার আগেই হৃদয় পুরে আসন পাতা
আজকে সবাই মনের কোণে
রামধনুকের স্বপণ বোনে
গগনপারে হাত বাড়ালো কচি-তরুণ-শ্যামল-পাতা !

হাওয়ায় হাওয়ায় ব্যাকুল হ'ল কোন অদেখার মোহন বেণু
ফুলের ঘ্রাণে পাখীর তানে কাহার যেন পরশ পেনু
আজকে দোলন চাঁপার বনে
কে দোলা দেয় ক্ষণে-ক্ষণে
কিসের তরে আজ মাধবী সহকারে বাঁধা।

সেই উৎসবের মাঝখানে আলুথালু বেশে ছুটে এলো চন্দ্রা। চোখে তার স্বপ্নের আভাস, অধরের কোণে বিস্ময়ের ভাব।

চন্দ্রা—থামাও গান—গান থামাও।

সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের সুর এবং যন্ত্রের মূর্চ্ছনা বন্ধ হয়ে গেল

চন্দ্রা—এ গান আমার ভালো লাগ্‌ছে না, এ উৎসব আমার প্রাণে কোনো সাড়া জাগাতে পারেনা ! বন্ধ করে দাও এই ব্যর্থ আয়োজন !

এবার ছুটে এলেন মহারাণী

মহারাণী—সে কিরে চন্দ্রা ! উৎসব বন্ধ হবে ! আজ যে তোর স্বয়ম্বর—

চন্দ্রা—না মা ! এ স্বয়ম্বর হতে পারে না।

মহারাণী—তুই বল্‌ছিস্ কি? দেশবিদেশ থেকে কত রাজপুত্র এসেছে—তারা কি ফিরে যাবে?

চন্দ্রা—হ্যাঁ মা, ফিরে যাবে।

মহারাণী (সস্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে)—চন্দ্রা মা আমার, তোর আজ কি হয়েছে আমায় বল্‌না—

চন্দ্রা—(মায়ের বুকে মাথা রেখে আবদারের সুরে) মাগো, আজ শেষ রাত্তিরে আমি স্বপন দেখেছি! জানো তো ভোরের স্বপন সত্যি হয়!

মহারাণী—স্বপন? কি স্বপন দেখেছিস্ মা!

চন্দ্রা—স্বপন দেখেছি, যে নীলকণ্ঠ পাখী নিয়ে আস্‌তে পারবে সে-ই হ'বে আমার স্বামী!

মহারাণী—এ আবার কী অলক্ষুণে স্বপ্ন? আমি মহারাজকে বলে তোকে কত নীলকণ্ঠ পাখী কিনে এনে দেবোখন—।

[সখিদের উদ্দেশ্য] ওরে তোরা চন্দ্রাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দে—

চন্দ্রা—না মা, তুমি বুঝছনা। নীলকণ্ঠ পাখী পৃথিবীতে শুধু একটিই আছে। যার কাছে আছে সে-ই আমার স্বামী। স্বয়ম্বর বন্ধ করে—রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও—নীলকণ্ঠ পাখী আমার পণ...

মহারাণী—এ কি রকম গোলমেলে কথা হ'ল বল্ দেখি! যাই আমি মহারাজকে গিয়ে বলিগে—তিনি যদি কোনো উপায় করতে পারেন!

ব্যস্তভাবে মহারাণী চলে গেলেন।

১ম সখি—রাজকুমারী, রোজ আমাদের গান শুনে তুমি কত খুসী হও; সবাইকে দাও পুরস্কার। আজ তোমার স্বয়ম্বর দিনে আমরা প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে গাইলুম ওই গান—তা তোমার ভালো লাগলোনা?

চন্দ্রা—সখি, আজ ও গান নয়, আজ আমার সমস্ত মনপ্রাণ ছেয়ে আছে সেই নীলকণ্ঠ পাখির সুরে! সেই সুরে সুর মিলিয়ে শোনাতে পারিস্ আমায় গান?

২য়া সখি—নীলকণ্ঠ পাখি! কৈ দেখিনি ত!

৩য়া সখি—কেমন দেখ্‌তে বলো দেখি?

৪র্থা সখি—কি সুরে সে গান গায়?

চন্দ্রা—নীলকণ্ঠ পাখি! আছে আমার স্বপ্নে জড়িয়ে আধেক সত্যি...আধেক কল্পনা...! আমিও ত কখনো চোখে দেখিনি! আমার গলায় যে নীলকান্তমণি সেই নীলের

আভাষ পেয়েছি তার কণ্ঠের রঙে! সে গান গায়! গান নয়ত, যেন কুলকুল ধ্বনি!

১মা সখি—নাই বা দেখলুম চোখে! তোমায় খুসী করবার জন্যে আমরা সেই গান...

২য়া সখি—সুর হয়ত তেমন ফুটবে না...

৩য়া সখি—ছন্দ হয়ত তেমন ফুট্‌বেনা...

সকলে—তবু আমরা সবাই মিলে গাইব, তুমি শুন্‌বে বলে—

সখিদের গান

নীলকণ্ঠ পাখি!

মন-কাননের গোপন শাখায় ডাক্‌ছে থাকি থাকি।
ডাক্‌ছে নিতুই নতুন সুরে
কোন অলকায় গানের পুরে
সুখের খেলার মন ভেসে যায় বুঝ্‌ছ তুমি তাকি!

তোমার মধুর গানের ভেলায় আমরা দুজনে।
সূর্য্যি ডোবে, চন্দ্র ওঠে তোমার কুজনে।
কোন অজানার এ কোন মায়া
রূপ অরূপের কোমল ছায়া
মরুর দেশে স্বর্গলোকের ঝর্ণা ধারা নাকি!

নীলকণ্ঠ পাখি!

গানে গানে রাজকুমারীর প্রাসাদে সুর-বন্যা বয়ে গেল! স্বয়ম্বরার উৎসব বন্ধ হয়ে যেতে যারা মনক্ষুন্ন হয়েছিল তারাও এসে এই সঙ্গীতে যোগদান করল।

চন্দ্রা—আমি মুগ্ধ! এই গান...এই সুরই ছিল আমার ভোরের স্বপনে লুকিয়ে! সখি! তোরা আমায় ধন্য করেছিস্...নে তোদের পুরস্কার...

একে একে নিজের গলার হার খুলে সখিদের দিতে লাগ্‌লো এমন সময় মহারাণী এসে এই ব্যাপার দেখে চীৎকার করে উঠলেন!

মহারাণী—এ আবার কি অলক্ষুণে কাণ্ড, গলার হার খুলে বিলিয়ে দেয়া! আজ কিছু একটা ঘট্‌বে বুঝ্‌তে পাচ্ছি—

TORN PAGE(S).

..র কাছে এসে] তুমি রাগ কোরো না মা! আমার রাতের স্বপনের ওরা ..দিয়েছে। শুনবে তুমি?

মহারাণী—আর শুনে কাজ নেই। স্বয়ম্বর হবেনা শুনে মহারাজ ভারী রাগ করেছেন।

চন্দ্রা—আচ্ছা, আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলে আস্‌ছি—

মহারাণী—আর বুঝিয়ে বল্‌তে হ'বেনা, আদুরে মেয়ের আবদারেও তিনি মত দিয়েছেন। তিনি আদর দিয়েই ত তোমার মাথাটা খেলেন।

চন্দ্রা লজ্জায় মায়ের বুকে মুখ লুকালো।

এমন সময় নেপথ্যে ঘোষণা শোনা গেল: স্বয়ম্বর আজ বন্ধ। রাজকুমারী চন্দ্রা পণ করেছেন—যিনি নীলকণ্ঠ পাখি নিয়ে আস্‌তে পারবেন—রাজকুমারী তারই গলায় বরমাল্য অর্পণ করবেন। ঢ্যাং—ঢ্যাং ঢ্যাং—

মহারাণী—ওই শোনো—মহারাজের কাণ্ড। এরি মধ্যে ঘোষণা পর্য্যন্ত হয়ে গেল। আমি ভাবলাম বুঝি মেয়ের মত ফিরবে। দেখছি শেষকালে উনিই ওকে বিগ্‌ড়ে দিলেন।

বিরক্তভাবে প্রস্থান

চন্দ্রা—শোনো মা—শোনো...

১মা সখি—মহারাণী বড্ড রেগে গেছেন—

চন্দ্রা—মার রাগ যেমন সহজে আসে তেমনি সহজে চলে যায়। দেখ্‌বি সক্কলের আগে মা-ই তখন আমায় আশীর্ব্বাদ করে বুকে টেনে নেবে—

সহসা প্রতিহারিণীর প্রবেশ

চন্দ্রা—কি সংবাদ প্রতিহারিণী?

প্রতিহারিণী—মহারাজের ঘোষণা শুনে জনকয়েক রাজপুত্র কয়েকটি পাখি নিয়ে এসেছে...

চন্দ্রা—আমি দেখ্‌বো—আমি দেখ্‌বো!

২য়া সখি—সে কি সখি? রাজপুত্রদের কি তুমি এইখানে ডেকে আন্‌বে নাকি?

৩য়া সখি—তা হলে আমরা পালাই—

চন্দ্রা—না—না, রাজপুত্রদের দেখ্‌বো তোমাদের কে বলেছে? আমি দেখ্‌বো পাখি—

৪র্থ সখি—তাই বলো, আমি ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

চন্দ্রা—প্রতিহারিণী, সকলের আগে যে রাজপুত্র পাখী নিয়ে এসেছেন—সেই পাখীটি এইখানে নিয়ে এসো—

প্রতিহারিণী চলে গেল। সখিরা সব নীলকণ্ঠ পাখি দেখবার আশায় রাজকুমারীকে ঘিরে দাঁড়াল। এমন সময় সেই প্রতিহারিণী খাঁচায় পোরা একটি নীল পাখি নিয়ে প্রবেশ করল।

১মা সখি—এই নাকি সেই নীলকণ্ঠ পাখি?

২য়া সখি—এরকম পাখি ত' আমরা ছেলেবেলায় কত দেখেছি—

৩য়া সখি,—স্বপ্নে কি তুমি একেই দেখেছিলে?

চন্দ্রা—প্রতিহারিণী, পাখি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আর তোরণ দ্বারের প্রহরীকে বলো রাজপুত্রকে বিদায় দিতে—

প্রতিহারিণী পাখীর খাঁচা নিয়ে চলে গেল

১মা সখি—আচ্ছা রাজকুমারী, পাখি যে আন্‌বে তারই গলায় তুমি মালা দেবে।

চন্দ্রা—হ্যাঁ সখি, সেইত আমার পণ—

২য়া সখি—তা হলেই ত তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে?

৩য়া সখি—আচ্ছা, যদি আমরা কেউ পাখী ধরে আনতে পারি?

চন্দ্রা—তবে আজীবন তার দাসী হয়ে থাকবো।

৩য়া সখি—তবে আমি চল্লাম পাখির সন্ধানে। সখিকে তাহ'লে আর চোখের আড়াল করতে হবেনা—

প্রস্থান

আবার প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী—রাজকুমারী, অবন্তীপুরের রাজকুমার নিয়ে এসেছে এক অপূর্ব্ব পাখী! শুধু কণ্ঠই তার নীল। সভাসদগণ সবাই দেখে বল্লেন এই-ই নীলকণ্ঠ পাখী।

চন্দ্রা—নীলকণ্ঠ পাখী! আমি যাচ্ছি—না—না—এইখানে পাখীটাকে নিয়ে আয়—

প্রতিহারিণী চলে গেল

২য়া সখি—কী চমৎকার ব্যাপারই না হবে—

৪র্থা সখি—কি রে কি?

২য়া সখি—যদি অবন্তি রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়।

১মা সখি—আগে নীলকণ্ঠ পাখি প্রমাণ হোক, তারপর ত—

২য়া সখি—ঐযে পাখিটাকে নিয়ে প্রতিহারিণী এই দিকেই আস্‌ছে।

পাখী নিয়ে প্রতিহারীর প্রবেশ

৪র্থা সখি—হ্যাঁ ! নীলকণ্ঠই ত' বটে !

১মা সখি—দাঁড়া, আগে রাজকুমারীর বুকের নীলকান্ত মণির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি—

২য় সখি—কি সখি, চিন্‌তে পাচ্ছ ? স্বপ্নের কথা কি তোমার এতক্ষণ মনে আছে ?

১মা সখি—তোরা দাঁড়া দেখি ! (পাখীর কাছে গিয়ে) একটু জল নিয়ে আয় না কেউ—

একজন ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এলো। জল দিয়ে পাখির গলা ধুইয়ে দিতেই দেখা গেল রঙটা হাতে আঁকা।

চন্দ্রা— একি ! এযে হাতে আঁকা রঙ ! অবন্তীকুমার প্রবঞ্চক !

১মা সখি—তাত' হবেই সখি। ওরা যে যুদ্ধে মহারাজের কাছে হেরে গিয়েছিল। মহারাজ দয়া করে ওদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বুঝি সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছে—

চন্দ্রা—কিন্তু মিথ্যায় জয় কি কখনো হতে পারে ! প্রতিহারিণী, তুমি মহারাজকে বল-- অবন্তীকুমার প্রতারণার অপরাধে আমাদের বন্দী হয়ে থাক্‌বেন।

প্রতিহারিণীর প্রস্থান

১মা সখি—দেখি এবার আবার কোন বীরের আবির্ভাব হয়—

প্রতিহারিনীর পুনঃ প্রবেশ

প্রতিহারিণী—সত্যই এবার বীরের আবির্ভাব হয়েছে দেবী—রাজকুমার বিক্রম সিংহ এসেছেন—সঙ্গে তার অসংখ্য পাখি—

চন্দ্রা—আচ্ছা নিয়ে এসো এইখানে।

প্রতিহারিণী চলে গেল এবং মুহূর্ত্তেই রাশি রাশি মৃত পক্ষী এনে স্তূপীকৃত করে ফেল্লে

চন্দ্রা—[শিউরে উঠে] একি এত মৃত পাখি ! জীব হিংসা করতে তাকে কে বল্লে ?

প্রতিহারিণী—রাজকুমার বিক্রম জানিয়েছেন, অদ্ভুত শীকার-নৈপুণ্যে তিনি বনের সমস্ত পক্ষী নিঃশেষ করেছেন। আপনি এর ভিতর থেকে নীলকণ্ঠ পাখি খুঁজে নিন।

প্রস্থান

চন্দ্রা—[উত্তেজিত হয়ে] না—না—এর ভেতর নীলকণ্ঠ পাখি নেই। তাকে মারবার ক্ষমতা কারো নেই ! এই রক্তস্রোত আমি সইতে পাচ্ছিনে—

মহারাণীর প্রবেশ

মহারাণী—ক্ষত্রিয়ের মেয়ে হয়ে রক্ত দেখে তোমার ভয় ! তুমি জানো চন্দ্রা আমরা অপুত্রক। যার গলায় তুমি বরমাল্য দেবে, ভবিষ্যতে সেই হবে এদেশের রাজা। রাজকুমার বিক্রম সিংহের মতো যোদ্ধা ক্ষত্রিয় সমাজে দুর্ল্লভ। এই রাজকুমারকেই তুমি বরণ কর—

চন্দ্রা—[কেঁদে উঠে আঁচলে মুখ ঢেকে] সে আমি পারবো না—না—না—

মহারাণী—মহারাজেরও ত সেই ইচ্ছে—

চন্দ্রা—আচ্ছা, যাচ্ছি আমি বাবার কাছে—

মহারাণী—আর বাবার কাছে যেতে হবে না—তিনিই ত আদর দিয়ে তোমার মাথা খেয়েছেন—

রেগে প্রস্থান

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী—একটি তরুণ তাপসের সন্ধান পাওয়া গেছে রাজকুমারী—

১মা সখি—মর মুখপুড়ি ! তরুণ তাপস দিয়ে কি হবে রে ?

২য় সখি—তুই কি বল্‌তে চাস্ আমাদের রাজকুমারী তপস্বিনী হবে—?

প্রতিহারিণী—না দেবী, সে কথা নয়—

৪র্থা সখী—তবে কোন্ কথা শুনি—!

প্রতিহারিণী—সেই তরুণ-তাপসের উত্তরীয়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব্ব এক পাখীর কাকলী ! সবাই বলছে ও স্বর্গের পাখী—

চন্দ্রা—অ্যাঁ ! বলিস্ কি ? কোথায় সেই তাপস ?

প্রতিহারিণী—মহারাজা এই সংবাদ পেয়ে তাপসকে ডেকে এনেছেন প্রাসাদে।

চন্দ্রা—নিয়ে আয় সেই পাখী—

প্রতিহারিণী—সে পাখী ত' সে কাউকে দেবে না ! উত্তরীয়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে।

১মা সখি—তার কি প্রাণের ভয় নেই ?

প্রতিহারিণী—মহারাজ তাকে পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন...সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাকে কঠিন দণ্ডের ভয় দেখিয়েছিলেন......সে নীরবে হাসল !

চন্দ্রা—যা তাঁকে আমার নাম করে এখানে নিয়ে আয়—

প্রতিহারিণীর প্রস্থান

২য়া সখি—তুমি বলছ কি রাজকুমারী ? একটা পথের ভিখিরীকে নিয়ে আসবে তোমার অন্তঃপুরে ?

চন্দ্রা—আমি নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে চাই—না দেখলে পাগল হয়ে যাবো—

প্রতিহারিণীর সঙ্গে এক তাপসের প্রবেশ

তার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একটি মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হতে লাগলো অন্তঃপুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু কোথা থেকে যে গান ভেসে আসছিল তা কেউ বুঝতে পারলে না।

গান

নীড় হারা নীল পাখি—!
বাসা বাঁধিবারে এসেছে দুয়ারে দূর করে দেবে নাকি ?
গগন ঢাকিয়া ওঠে কালো মেঘ
কেবলি বাড়িছে পবনের বেগ
বিজলি চমকে দিশেহারা হয়ে বলনা কোথায় থাকি !
নীড়হারা নীল পাখি !
ঝরে ঝর-ঝর ধারা অবিরল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে…
পাখা ভিজে যায়, পথ কোথা মোর শুধাইব বল কাকে !
মেঘে ও তড়িতে বিপদ ঘনায়
ডাকিতেছি তাই আপন জনায়
কার পদতলে ক্লান্ত পরাণ বলনা আজিকে রাখি
নীড়হারা নীল পাখি !

চন্দ্রা—[কান পেতে শুনে] হ্যাঁ ! এই সুরে—আজ প্রভাতে স্বপনের মাঝে আমার হৃদয়কে ছুলিয়ে দিয়ে গেছে ! ওগো বন্ধু—তোমারি কাছে আছে নীলকণ্ঠ পাখী.....

এগিয়ে গেল

নখিদল—[বিস্ময়ে] রাজকুমারী ! ওযে পথের ভিক্ষুক—ওযে সন্ন্যাসী—ওযে—

চন্দ্রা—[অভিভূত হয়ে] জানিনা পথের ভিক্ষুক কি স্বর্গের দেবতা—শুধু এইটুকু জানি যে তার গলায় ছুলিয়ে দিতে হ'বে আমার বরমাল্য—

চন্দ্রা মালা পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে…সে তাপস এক অনিন্দ্যসুন্দর রাজপুত্রের মূর্ত্তি গ্রহণ করল।

রাজপুত্র—রাজকুমারী ! মেঘলোকের রাজপুত্র হয়েও মর্ত্ত্যের মানবীকে দেখে মুগ্ধ হই। নীলকণ্ঠ পাখীর স্বপ্ন আমার ছলনা—তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যে—! সে পরীক্ষায় জয়ী হয়েছ তুমি চন্দ্রা। আজ তোমার বরমাল্য আমার শ্রেষ্ঠ-সম্পদ।

যবনিকা

ইয়েস্ স্যার্

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

হারাধনের বড়দা রতনবাবু বড়ো সরকারে চাকুরে ছিলেন। সাহেব মহলে তাঁর খাতির প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর একমাত্র ছোট ভাই হারাধন যখন অনেক চেষ্টা করে চতুর্থ বারেও বি, এ, পাশ করতে পারল না তখন রতন বাবু ভাইকে আর পড়তে দিলেন না। তাকে এক সরকারী অফিসে কেরাণীর পদে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু হারাধন কেরাণী হয়েও কিছুতেই ভুলতে পারে না, যে সে এক পাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একমাত্র আদরের ভাই—The Great হারাধন !

দুই এক বছর হারাধন এক রকম থাকে। কিন্তু বেশী দিন একস্থানে থাকলেই তার মেজাজ যায় বিগড়ে। একদিন অফিসের বড়বাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে গিয়ে রেগে সে তাঁর নাসিকাতে এমন জোরে ঘুসি বসালে, যে বড়বাবুকে হাঁসপাতালে যেতে হল।

হারাধন চাকরী রাখতে পারল না।

হারাধন যে বেকার জীবন ভাল বিবেচনা করে তা নয়। তবে হঠাৎ কেন তার এত রাগ হয়, হঠাৎ কেন এত ঘুঁষী মারতে উদ্যত হয়, কেন সে সকলের মত খাপ খাইয়ে অফিসের কাজ চালাতে পারে না, তা সে নিজেও বুঝতে পারে না।

চাকরী যাওয়া অবধি হারাধন আজকাল বড়দাকে একটু এড়িয়ে চলে। একদিন সে বাড়ীর পেছন দিকে লুকিয়ে প্রকাণ্ড এক হুইলশুদ্ধ ছিপ ও চারের মসলার পুঁটুলি হাতে করে পুকুরে মাছ ধরতে চলেছে, এমন সময় সে হঠাৎ রতন বাবুর সামনা সামনি পড়ল। রতনবাবু তাকে ডেকে বললেন, "খোকা, আর মাছ ধরতে হবে না। ম্যাকিনটস্ সাহেব এই শেষবার তোকে কাজ দিয়েছেন, সোনবর্ষা ষ্টেটে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্এ,—মাইনে ১০০৲ টাকা। বাড়ি, বাংলো সব ষ্টেট থেকে দেবে। মনে থাকে যেন এই শেষবার। সেখানে গিয়ে এবার আর তর্কাতর্কি নয়, সাহেব বা অফিসের ওপরওয়ালা যা বলবে, তার কোন রকম প্রতিবাদ না করে বলবি—ইয়েস্ স্যার্।" The Great হারাধন তখন প্রতিজ্ঞা করলে অফিসের ওপরওয়ালাদের সে জীবনে "ইয়েস্ স্যার্" ছাড়া আর কখনও কিছু বলবে না !

সোনবর্ষায় এসে হারাধন দুবছর বেশ কাজ চালালে। ম্যানেজার ম্যাকলিওড্ সাহেব হারাধনের ওপর খুব খুসী হয়ে রতনবাবুকে লিখলেন যে, হারাধন খুব ভাল কাজ করছে আর সে ভারী বিনীত।

একদিন হারাধন ম্যানেজার সাহেবকে বললে, "স্যার, আপনার নামে রোজ দশ আনা খরচ অফিসের

খাতায় জমা করি তাতে আপনি বিরক্ত হয়েছেন। ছাগল গরু হরিণ সবইত আপনার, তাদের দানা ছোলা এই সবেরই তো খরচ দশ আনা রোজ—?" সাহেব সিগার টানতে টানতে বললে, "হারাধন, ওয়ার্ডস্ এর কাজ তুমি কিছু জান না, তুমি বড় বোকা।" হারাধন বললে, "ইয়েস্ স্যার।" সাহেব খুসী হয়ে বললে, "হারাধনবাবু, এটুকু তোমার বুদ্ধিতে এল না, যে ষ্টেট ম্যানাজারকে ১০০৲ মাসে মাইনে দেবে, তার ওপর গরু ছাগল হরিণ পুষেছেন বলে তাদের জন্য রোজ দশ আনা করে খরচ দেবে—এ কখনও হয়?" হারাধন বললে, "স্যার কি লিখব তা হলে?" সাহেব হেসে বললেন, "কি লিখবে তাও বলে দিতে হবে? তুমি একটা গাধা—fool! হারাধন বললে, "ইয়েস্ স্যার্"। সাহেব তখন বললে, "খরচের খাতায় রাজার হাতির হাওদা মেরামতের জন্য রোজ দশ আনা করে খরচ—এই লিখে যাবে, বুঝেছো?" হারাধন বললে, "ইয়েস্ স্যার্।" সেই থেকে হারাধন খরচের খাতায় রোজ হাতির হাওদা মেরামতের খরচ দশ আনা করে লিখে চলল।

একদিন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এলো, কলকাতা থেকে হিসাব পরীক্ষক এক সাহেব আসছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে হারাধনকে সাহেব ডাকলেন। হারাধন 'ইয়েস স্যার্' বলে দাড়াল। সাহেব বললেন, "হেড্ক্লার্ক, টেলিগ্রাম ব্যানার্জ্জীর লেখা বোধ হচ্ছে, ব্যানার্জ্জিই হবে, না?" হারাধন বললে, "ইয়েস্ স্যার্।" সাহেব তৎক্ষণাৎ নীরু খানসামাকে দুর্জ্জয় সিং দারওয়ানকে ডাকতে বললেন। দুর্জ্জয় সিং তার দুর্জ্জয় গোঁফ গালপাট্টা নিয়ে, দুর্জ্জয় নাগরা পায়ে দিয়ে, সেলাম করে হাজির হল। সাহেব তাকে বললেন যে রাত্তিরে তাকে মাহুতের সঙ্গে যেতে হবে ষ্টেশনে। তারপর ডাক পড়ল—সাহেবের আরদালী—ইমদাদ আলী, তাকে সাহেব বললেন যে, বাংলোর ছোট ঘর খুলে দেবে, বড় সাজান ঘর খুলে দরবার সেই, বারান্দায় কুপি যেন জালা হয়, আর সে যেন ছোট স্যাম্পনী (কাঠের ছাউনি দেওয়া গরুর গাড়ী) রাত্রে ষ্টেশনে নিয়ে যায়। যিনি আসছেন তিনি পদস্ত রাজকর্ম্মচারী হলেও যখন বাঙ্গালী—তখন এই ব্যবস্থাই ভাল। হারাধনকে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "হেড্ ক্লার্ক, ব্যবস্থা ভালই হোল, কি বলো?" হারাধন বললে, "ইয়েস্ স্যার্।"

রাত আড়াইটের ট্রেন আসবে। ইমদাদ আলি ও দুর্জ্জয় সিং হাতি ও স্যাম্পনী নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করছে। যথা সময়ে ট্রেন আসবার ঘণ্টা দিলে। ইমদাদ আলি হারিকেন জ্বেলে রাখলে। দুর্জ্জয় সিং হাতি ঠিক করতে গেল আর স্যাম্পনীর গাড়োয়ান গাড়ীতে গরু জুতে প্রস্তুত হোল।

ট্রেন এসে উপস্থিত হোল। ইমদাদ কোন বাঙ্গালী সাহেবকে খুঁজে পেলে না—শেষে হতাশ হয়ে যখন ফাষ্ট ক্লাশের কামরার কাছ দিয়ে যাচ্ছে,—এক সাহেব নাবলেন কামরা থেকে। ইমদাদ আলীকে সামনে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "সোন্বরসা—কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্?" ইমদাদ আলী সেলাম ঠুকে বল্লে, "জী হুজুর"। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "গাড়ী হ্যায়—?" ইমদাদ্ বল্লে, "হুজুর—স্যাম্পনী।" সাহেব চটে বল্লেন "স্যাম্পেন্ নেই মাংতা (স্যাম্পেন্ এক রকম ফরাসী মদ)—গাড়ী গাড়ী—।" এই সময়ে সাহেবের বিরাট চাপরাশ পরা আরদালী এসে উপস্থিত হলো। আরদালীকে দেখে ইমদাদ আলীর প্রান যেন ফিরে এল। সাহেব ওয়েটিং রুমে গিয়ে বস্লেন।

ইমদাদ আলীর চোখ চড়ক গাছ হয়ে গিয়েছে—বাঙ্গালী সাহেব ব'লে ছোট স্যাম্পণী এনেছে—ভাল হাতী আনেনি—মস্ত হাতী এনেছে বাঙ্গালী সাহেবকে আশ্চর্য্য ক'রে দেবার জন্য। কিন্তু সবই গোলমাল হয়ে গেল। দুঃখিত হয়ে সে সাহেবের আরদালীকে ব'ললেন যে ব্যানার্জ্জী সাহেবের আসার কথা ছিল। আরদালী চ'টে ব'ল্লে, ব্যানার্জ্জী সাহেব নয়—F. W. Ben সাহেব।

ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে বেন সাহেব আরদালী ও ইমদাদ আলীর সঙ্গে যেখানে স্যাম্পনী আর হাতী ছিল সেখানে গেলেন। হাতীকে সাহেব খুব মনযোগের সঙ্গে দেখলেন। তারপর ইমদাদ আলী ও আরদালীর সাহায্যে বুঝলেন যে ঐ গাড়ীরূপ ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বাক্সের মধ্যে তাঁকে প্রবেশ ক'রতে হবে। যেমন সাহেব গাড়ীর মধ্যে গেলেন, ফটাস্ ক'রে লাগলো মাথায়। সাহেব বলে উঠ্লেন, "Oh God!"

স্যাম্পনী চ'লেছে। মেটে রাস্তায় স্থানে স্থানে জল জমে আছে। দুই একটা বড় বড় গর্ত্তে মাঝে মাঝে গাড়ী কোন রকম নোটিস্ আগে না দিয়ে হড়াৎ করে নেবে যাচ্ছে, তাতে সাহেব কোমরে আঘাত পাচ্ছেন আর চ'টে জোরে জোরে বুট ঠুক্ছেন।

নদীর ধারে এসে অতিকষ্টে দড়ী ধরে সাহেব কোন রকমে হাতির পিঠে বসলেন—। সাহেবকে নিয়ে হাতী যখন তাড়াতাড়ি নদীতে নেবে গেল সাহেব যে ভয় পেয়েছিলেন তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

যখন সাহেব ডাক্বাংলোতে এসে উপস্থিত হ'লেন তখনও রাত্রি। বাংলোর বারান্দায় গিয়ে দেখ্লেন, এক বিরাট কুপী জ্বল্ছে ও ধুঁয়োতে বারান্দা ধূমায়িত! সাহেব বিস্মিত হয়ে ব'লে উঠলেন, "What is this? Vesuvius?" (ভিসুভিয়াস্ আগ্নেয়গিরি—ইতালীতে)। সাহেব আর ঘরে প্রবেশ করলেন না। চেয়ার নিয়ে বাইর বস্লেন।

ইমদাদ ম্যাক্লিওড সাহেবের বাড়ী গিয়ে সাহেবকে ডেকে তুল্লো। সাহেব বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, "কেয়া হুয়া।" ইম্দাদ ব'ল্লে, "হুজুর বাঙ্গালী সাহেব নেহি হ্যায়, খাস বিলাতী পলটন।" ম্যাক্লিওড্ সাহেব ছুট্লেন ডাক্ বাংলোতে আর ইমদাদ আলীকে ব'লে গেলেন, "হেডক্লার্ক বাবুকে আভি বোলাও।"

ইমদাদ হারাধনের বাড়ী গিয়ে ডেকে তুল্লো হারাধনকে। হারাধন সব শুনে ব'ল্লে, "ইমদাদ সাহেবকো বোলো—তবিয়ৎ বহুৎ খারাপ—।" ইমদাদ আলী ব'ল্লে, "চালিয়ে না কেয়া হোগা?" হারাধন ভয়ে ভয়ে সাহেবের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোল। ততক্ষণ সাহেব ফিরে এসেছেন হিসাব পরীক্ষক সাহেবের বাংলো থেকে, সাহেব হারাধনকে দেখে ব'ল্লেন, "হেড ক্লার্ক, তুমি একটা Solid block head! তোমার জন্যই এ সমস্ত গোলমাল, you uderstand?" হারাধন ব'ল্লে, "ইয়েস্ স্যার্"।

পরের দিন হিসাব পরীক্ষা আরম্ভ হোল। যথাক্রমে হাতীর হাওদা মেরামতের জন্য রোজ দশ আনা করে কি প্রকারে খরচ হ'তে পারে, সেই নিয়ে পরীক্ষক সাহেব হারাধনকে প্রশ্ন কর্লেন। হারাধন ব'ল্লে, "হিসাব ঐ রকম লেখাই নিয়ম। হিসাব লেখার ভার আর টাকা কড়ি খরচ করবার ভার ম্যানেজার সাহেবের—তিনিই ভাল বল্তে পারবেন।" ম্যাক্লিওড্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা ক'রে পরীক্ষক সাহেব কোন সদুত্তর পেলেন না। রিপোর্ট লিখে গেলেন যে একমাত্র হারাধন যোগ্য লোক আর ম্যানেজার অপদার্থ।

বলা বাহুল্য তারপর ম্যাকলিওড্ সাহেব হারাধনের পেছনে ভয়ানক লাগলেন। কাজেই মেডিক্যাল অফিসারকে খাইয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে হারাধন ছুটীর দরখাস্ত করে দিল।

এখন হারাধন একটা হরিণ পুষেছিল হরিণটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার অবস্থা নয় অথচ রেখে গেলে ম্যানেজার সাহেব কেটে খেয়ে ফেল্‌বে। তাই হারাধন বড়দাকে চিঠি লিখলো। বড়দা লিখলেন, "হরিণ নিয়েই আসিস্। ছুটীর দরকার নেই একেবারে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আয়। তোকে আমি জমী জারাত সব দিয়েছি, তোর আর চাকুরী কর্ত্তে হবে না—

দাদার পত্র পেয়ে হারাধন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ ছেড়ে দিল! সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "হারাধন বাবু, কাজ ছেড়ে সত্যিই চ'লে যাচ্ছো?"

হারাধন বল্‌লে, "ইয়েস্ স্যার্।"

শ্বেত বামন আর লোহিত দানব

কমলেশ রায়

তোমরা হয়তো ভাবছ রাক্ষস খোক্কসের গল্প বলব। কিন্তু তা নয়। শ্বেত বামন আর লোহিত দানব—রাক্ষসের নাম নয়, আকাশের দুইদল অদ্ভুত নক্ষত্রদের নাম। এরকম মজার নাম কেন হ'লো সে কথা তোমাদের বলছি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা করা দরকার।

আকাশের বুকে কত তারা ঝিক্‌মিক্ করে, গোনা যায় না। খালি চোখে কতগুলিই বা আমরা দেখতে পাই? রাত্রিবেলা শুধু চোখে যেখানটা কেবল অন্ধকার আর ফাঁকা আকাশ ব'লে মনে হয়, দূরবীণ দিয়ে দেখলে সেখানে অসংখ্য নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। খুব ভালো দূরবীণ দিয়ে সবশুদ্ধ আজ পর্য্যন্ত প্রায় এক লক্ষ কোটি নক্ষত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছে। দূরবীণের সাহায্যে শুধু যে বেশী তারা দেখা যায় তা'ই নয়, তারাগুলির আকৃতি প্রকৃতিও কিছুটা বোঝা যায়।

বৈজ্ঞানিকরা চাঁদ, সূর্য্য ও গ্রহদের দূরত্ব মেপেছে। চাঁদ পৃথিবী থেকে আড়াই লক্ষ মাইল ও সূর্য্য ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সব আলোই প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে যায়, এক মিনিটে চলে প্রায় ১১০ লক্ষ মাইল তাহ'লে সূর্য্য থেকে আমাদের

কাছে আলো আসতে লাগে সাড়ে আট মিনিট। বৈজ্ঞানিকরা নক্ষত্রের দূরত্ব মেপে দেখেছেন, তা'রা এতই দূরে, যে কোন কোন নক্ষত্র থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে লাগে চার পাঁচ বছর, কোনটা থেকে দশ বিশ বছর! কোন কোন নক্ষত্র আবার এত দূরে, যে তাদের থেকে আলো এসে পৌঁছাতে হাজার হাজার বছর লাগে!

কিন্তু এত দূরে থেকেও নক্ষত্রগুলি কেমন স্পষ্ট ঝক্‌ঝকে দেখায়। আমাদের সূর্য্যকে যদি অত দূরে সরিয়ে দেওয়া যেতো, তাহ'লে তাকেও ঠিক তেমনি একটি ঝিক্‌মিক্ জোনাকীর মত দেখাতো। নক্ষত্রগুলি সত্যিই সূর্য্যের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুনের ভাঁটা। সূর্য্যটা পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গুণ ভারী। এই প্রকাণ্ড আগুনের 'বল্'টি আয়তনে পৃথিবীর দশ লক্ষ গুণ বড়, কিন্তু ৯৩০ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে বলে তাকে এত ছোট দেখাচ্ছে। সূর্য্যের মতো নক্ষত্রদের ওজন আর আয়তন মাপা হ'য়েছে। এইভাবে মেপে দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন তারা খুব ছোট, কোনটা মাঝারী (সূর্য্যের মতো), কোন কোনটা আবার সূর্য্যের চেয়েও অনেক অনেক গুণ বড়!

ফন্ মানেন নামে এক জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ এক জাতীয় ছোট তারা আবিষ্কার করেছেন। এগুলি খালি চোখে দেখা যায় না, এত ছোট যে শুধু দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায়। এই ছোট তারাগুলি ঝক্‌ঝকে সাদা, আর আকারে পৃথিবীর চেয়ে কিছু বড়। কিন্তু তা হ'লে কী হয়? তাদের ওজন প্রায় আমাদের সূর্য্যেরই সমান! আকারে ছোট হয়েও ওজনে এত ভারী ব'লেই এই শ্রেণীর তারাকে—'বামন নক্ষত্র' নাম দেওয়া হ'য়েছে। আবার, রং সাদা ব'লে তাদের বলা হয়, 'শ্বেত বামন নক্ষত্র' (White Dwarf)।

শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলি আকারে ছোট, অথচ ওজনে খুব ভারী, তার মানে এই যে, যে বাষ্প দিয়ে এই সব বামন নক্ষত্র গঠিত তা' অত্যন্ত ঘন। মনে করো, যে গ্লাসে তুমি জল খাও, তাতে আধ সের জল ধরে। সেই গ্লাসে যদি শ্বেত-বামন নক্ষত্রের বাষ্প এক গ্লাস নাও, তার ওজন হবে একশ' মন! কোন জিনিষ কী ক'রে এত ঘন হ'তে পারে তা' ভেবে বৈজ্ঞানিকরা অবাক্ হ'য়ে গিয়েছেন।

এখন শীতের শেষে বসন্তকাল আসছে। রাত্রি ৮।৯ টার সময় আকাশের মাঝামাঝি একটা খুব উজ্জ্বল তারা ধ্বক্‌ধ্বক্ ক'রে জ্বল্‌তে দেখ্‌বে। এই তারাটির নাম লুব্ধক, ইংরাজী নাম Sirius। দূরবীণ থাকলে দেখতে পেতে, এখানে খুব কাছাকাছি দু'টি নক্ষত্র আছে, তার ছোটটি একটি শ্বেত বামন। এ ছাড়া আরো অনেক শ্বেত বামন নক্ষত্র আকাশে আছে।

ছোট তারা যেমন আছে তেমনি খুব প্রকাণ্ড তারারও অভাব নেই। কোন কোন তারা

সূর্য্যের লক্ষ লক্ষ গুণ বড়ও হয়। এইরকম বড় বড় নক্ষত্রদের দানব নক্ষত্র বলে। এই রকম একটি দানব নক্ষত্রের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ক'রে দিচ্ছি। আগেই লুব্ধক নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিয়েছি। লুব্ধকটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা, তাকে চিনতে একটুও কষ্ট হয় না। লুব্ধকের একটু পশ্চিমে একটি চতুষ্কোণের মধ্যে কতগুলি তারা সাজানো, যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ি উড়ছে! এর চার কোণায় দেখবে চারটি উজ্জ্বল তারা—মধ্যেখানে তিন্‌টি, তা'ছাড়া আরো কতগুলি তারা ভেতরে আছে। এরই নাম কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জ (Orion)। এরই উত্তর কোণে যে নক্ষত্রটি আছে, দেখবে, সেটার রং বেশ লাল্‌চে। এটির নাম আর্দ্রা। মেপে দেখা গিয়েছে এটি সূর্য্যের আড়াই কোটিগুণ বড়। রংও লাল, কাজেই এই প্রকাণ্ড নক্ষত্রকে লোহিত দানব নক্ষত্র বলা হয়। ইংরাজীতে একে বলে—Red Giant Star. এইরকম আরো লোহিত দানব নক্ষত্র আকাশে আছে।

আবার কতগুলি এইরকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দানব নক্ষত্র আছে, যাদের রং লাল নয়, হলদে। তাদের বলে পীত দানব বা Yellow Giants। কালপুরুষের উত্তরে একটা হলদে রঙের বড় তারা আছে, তার নাম ব্রহ্মহৃদয় (Capella), সেটাও লুব্ধকের মতো যুগল নক্ষত্র। কিন্তু এই যুগলের দুটিই অতি প্রকাণ্ড, অর্থাৎ, দুটিই পীত দানব নক্ষত্র, বড়টি সূর্য্যের দেড় হাজার গুণ, অন্যটি তিনশ' গুণ বড়!

এবারে তোমাদের শুধু খুব ছোট আর খুব বড় নক্ষত্রের কথা বললাম। ভবিষ্যতে তোমাদের আজব তারার কথা বলব।

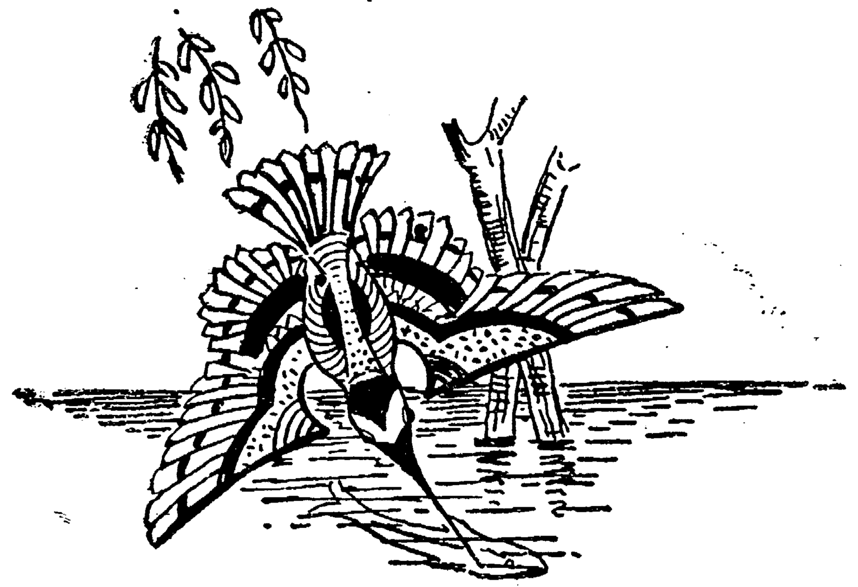

চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ

পাঞ্জাবী উপকথা

[ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য]

শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

এক বনে এক মস্ত ছাগল থাকে। তার চারটি সুন্দর মোটা মোটা বাচ্চা। বাচ্চাদের নাম—চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ। ছাগলের মস্ত বড় বড় শিং, তাই বাঘেও সাহস করে না কাছে আসতে। দূর থেকে দেখে লোভে বাঘের জিবে জল আসে কিন্তু ছাগল যেই শিং নাড়ে অমনি বাঘ ভয়ে সরে পড়ে।

ছাগল যখন সহরে যায়, তার ছানাদের দরজা বন্ধ করতে বলে যায়। আবার যখন ফিরে আসে, তখন ডাকে,—"চুন্নু খোলো কিবাড় (দরজা), মুন্নু খোলো কিবাড়, চ্যাঁ খোলো কিবাড়, ম্যাঁ খোলো কিবাড়!"—আর অমনি চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ ছুট্টে এসে দরজা খুলে দেয়।

এখন একদিন একটা বাঘ কি করল, যেই সে দেখল ছাগল সহরে গিয়েছে, অমনি দরজা নেড়ে ছাগল যেমন করে তার বাচ্চাদের ডাকত. তেমনি সেও সেরকম করে তাদের ডাকল; আর ছাগলের বাচ্চারাও 'মা এসেছে' ভেবে দৌড়ে যেই দরজা খুলেছে অমনি দেখে,—বাপ্! একটা মস্ত বাঘ! তখন কেউ খাটের তলায়, কেউ বাক্সের পেছনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু দুষ্টু বাঘ সব ছানাকটাই খুঁজে বার করে তাদের খেয়ে দেয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল।

ছাগল সহর থেকে ফিরে এসে—"চুন্নু মুন্নু কিবাড় খোল, চ্যাঁ ম্যাঁ কিবাড় খোল"—বলে বারবার ডাকতে লাগল, কিন্তু হায়রে কে খুলবে কেউ তো নেই! তখন সে দরজা ঠেলে দেখে যে দরজা খোলাই রয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখে চারিদিক রক্তারক্তি! বেচারা বুঝতে পারল যে কেউ এসে নিশ্চয় তার ছানাদের খেয়ে গিয়েছে।

তখন সে আবার সহরে গেল। গিয়ে করল কি, লোহার সিং তৈরী করাল। তারপর

তারপর নদীর ধারে, যেখানে সব জন্তুরা সন্ধ্যের সময় জল খেতে আসে, সেখানে গিয়ে বসে রইল।

এক সিংহ জল খেতে এল। অমনি ছাগল তার কাছে গিয়ে জিগেস করল, "তুনে মেরা (তুই আমার) চুন্নু খায়া (খেয়েছিস), তুনে মেরা মুন্নু খায়া, তুনে মেরা চ্যাঁ খায়া, তুনে মেরা ম্যাঁ খায়া?—"

সিংহ বললে, "কৈ না তো।"

তারপর ভাল্লুক এলো, চিতাবাঘ এলো, বরাহ এলো, একে একে সকলকেই সে ঐ কথা বলে জিজ্ঞাসা করে, আর সকলেই 'না' বলে চলে যায়।

এমন সময় এলো সেই বাঘটা, যে ছাগলের ছানা খেয়েছিল। চারটে চারটে ছানা খেয়েছে কাজেই তার পেট ঠেকছে মাটিতে, নড়তে চড়তে কষ্ট হয়। হেলতে দুলতে নদীর ধারে যেই সে এসেছে, ছাগল জিজ্ঞাসা করল, "তুনে মেরা মুন্নু খায়া, তুনে মেরা চুন্নু খায়া, তুনে মেরা চ্যাঁ খায়া, তুনে মেরা ম্যাঁ খায়া—?"

বাঘ দেখলে আর লুকোবার উপায় নেই! তখন সে বললে, "হ্যাঁ, খেয়েছি তো, কি হয়েছে?"

যেই বলা—ছাগল কোন কথা আর না বলে তার লোহার শিং দিয়ে বাঘের পেটে মারলে এমনি এক গুঁতো যে বাঘের পেট তখনই ফেটে চৌচির। আর পেট থেকে হৈ হৈ করে চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ বেরিয়ে এলো!

বাঘ গেল মরে। আর তখন ছাগল—চুন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ ম্যাঁ কে নদীর জলে বেশ করে স্নান করিয়ে বাড়ী গেল। তারাও সব মাকে আবার পেয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ী গেল।

এবার ছাগল তার বাড়ীর দরজায় তার সিং দিয়ে একটা ফুটো করিয়ে নিলো। আর ছানারা তখন থেকে দরজা খোলার আগে সেই ফুটো থেকে দেখে নিত কে এসেছে, তারপর দরজা খুলতো।

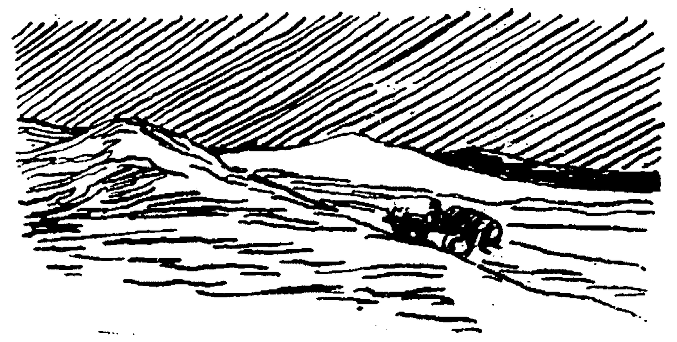

চাঁদের দেশের মেয়ে

জাপানী রূপকথা

শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী

জাপান শীতের দেশ। তাই জাপানে শীত পড়বার আগেই খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে না পারলে গরীব গৃহস্থদের কষ্টের সীমা থাকে না। একদিন গোধূলি বেলায় আগামী শীতের খাদ্যাভাবের কথা স্মরণ করে বৃদ্ধ কাঠুরে মিয়াক্কোর মনটা দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হয়ে উঠল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সামনেকার জলাভূমির শরগাছগুলোর ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়া একটা আলোর রেখা। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে নীচু হতেই সে দেখলে যে একটী ছোট্ট মেয়ে, লম্বায় মাত্র আটদশ আঙুল, ভিজে শরের ফাঁকে পড়ে আছে অসহায় ভাবে। মেয়েটী জীবন্ত—আর তার সেই ছোট্ট দেহটী থেকে কমল হীরের মত উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে শরবনের দিকে দিকে।

নানা চিন্তা করতে করতে বুড়ো মিয়াক্কো মেয়েটীকে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করল। তার বড় ভয় ছিল যে তার বৌ বোধ হয় মেয়েটীকে রাখতে দেবেনা বাড়ীতে? কিন্তু ভগবানের দয়ায় সে রকম কোন খেয়াল হলনা বুড়ীর— সেও ওই অনাথা মেয়েটীকে খুব ভালবাসতে লাগল। তারা মেয়েটীর নাম দিলে 'কাগুয়া'।

এরপর এক অদ্ভুত উপায়ে মিয়াক্কোর ভাগ্য ফিরে গেল। সে যখন তখন সেই শরবনের মধ্যে থেকে অনেক অনেক সোনা দানা, হীরে মণিমুক্তো পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই খুব ধনী হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে কাগুয়াও অলৌকিকভাবে বাড়তে বাড়তে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই এমন রূপশ্রীময়ী হয়ে উঠল যে সে যে কোন রাজকন্যার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর হয়ে উঠল আর তার স্বভাবটী হলো ছোট ছোট মেয়েদের চেয়েও সরল ও নির্ম্মল। বুড়ো মিয়াক্কো আর তার বৌ গভীরভাবে ভালবাসতে লাগল তাদের কুড়োনো মাণিকটীকে।......

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতি কাগুয়ার রূপগুণের কথা দিক বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল আর নানা দেশ থেকে এসে জুটল কাগুয়ার পাণিপ্রার্থীরা। তারা মিয়াক্কোর কাছে তাদের মনের বাসনা জানিয়ে নানা রকমের বহুমূল্য উপহার দিয়ে বুড়োর মনটা নরম করবার চেষ্টা করতে লাগল। একদিন কাগুয়া মিয়াক্কোর কাছে গিয়ে বললে যে, কোনদিনই বিয়ে করা তার ইচ্ছে নয় বলে, মিয়াক্কো যেন ওকথা জানিয়ে তাদের বিদায় করে দেয়। জগতের শ্রেষ্ঠ রাজপুত্রকে বিয়ে করার চেয়ে কাগুয়া তার বাবা মা'র স্নেহ-আদরেই দিন কাটিয়ে যে অনেক বেশী সুখী হবে একথা সে মিয়াক্কোকে জানালো।

এ খবরটা শুনে পাণিপ্রার্থীদের অনেকেই যে যার নিজের দেশে ফিরে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে নিতান্ত একগুঁয়ে চারিটী রাজকুমার যাবার নাম করলো না। তারা দিনরাত মাথা ঘামাতে লাগল কি উপায়ে বুড়ো মিয়াক্কো ও শ্রীমতি কাগুয়াকে কৌশলে জয় করা যায়! তাদের ব্যবহারে শেষ পর্য্যন্ত বুড়ো মিয়াক্কোও বিরক্ত হয়ে উঠল। একদিন কাগুয়া তার কাছে গিয়ে বল্লে—"বাবা, আমি তোমার দুশ্চিন্তা দূর করছি। তুমি বরং ওই রাজকুমার চারটীকে ডেকে দাও আমার কাছে— বলগে আমি যাকে যা বলব তিনি যদি অন্য তিনজনের পূর্ব্বে সে জিনিষ আমায় এনে দিতে পারেন, তবে আমি তাকেই বিয়ে করব। আর না পারলে অবিলম্বে তাকে এদেশ ছেড়ে যেতে হবে।"

বুড়ো মিয়াক্কোর মুখে কাগুয়া তাদের ডেকেছে শুনে মহানন্দে কুমারেরা গিয়ে উপস্থিত হল তার সামনে। কাগুয়া রাজপুত্রদের স্মিত মুখে বল্লে—"আপনারা নিশ্চয় আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছেন, এখন যা বলি শুনুন। সর্ব্বপ্রথম আমি কুমার ইসিযুকুরীকে বলছি যে তিনি যেন ভারতবর্ষে গিয়ে শ্রীবুদ্ধদেব যে ভাণ্ডটি ভিক্ষা করবার জন্যে ব্যবহার করতেন সেইটী আমাকে এনে দেন। তার পর বলছি কুমার কুরামুচিকে, যে তিনি যেন পূর্ব্বসাগর অতিক্রম করে 'হোরাই' পাহাড় থেকে এমন একটী গাছের ডাল আমাকে এনে দেন, যার শিকড় হচ্ছে রূপোর, গুঁড়িটী সোনার আর ফল ধরে মুক্তোর। এইবার কুমার ডিনাগণকে বলছি যে তিনি যেন মোরোকোসি দেশের ইঁদুরের চামড়া দিয়ে তৈরী এমন একটী পোষাক আমায় এনে দেন, যা কিনা আগুন লাগলে পোড়েনা। সবশেষে কুমার চিনাগনের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, যে তাঁর কাজ হবে সাতরঙা রামধনুর মত একটী বহুমূল্য রঙিন মরকতমণি আমার জন্যে সংগ্রহ করা যেটী কিনা সমুদ্রশয়তানের মাথার খুলির মধ্যে লুকোন আছে। আপনাদের মধ্যে যিনি আমার কথামত জিনিষ সর্ব্বপ্রথম আমায় এনে দেবেন, আমি তাকেই বিয়ে করব, কিন্তু যিনি সে কাজে অসমর্থ হবেন তাঁকে তৎক্ষণাৎ এরাজ্য ছেড়ে যেতে হবে।"

কাগুয়ার কথা শেষ হলে তারা চারজনেই কাগুয়াকে জানালে যে কাগুয়ার ইচ্ছামত জিনিষ সংগ্রহ ক'রবার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করবে—এই বলে তারা একে একে চলে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু আসলে তারা নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে, বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকেই বাইরে রটিয়ে দিলে, যে তারা শ্রীমতি কাগুয়ার অনুরোধে মরণ পণ করে তার কামনার জিনিষগুলি আনবার জন্যে দেশ বিদেশে বেরিয়ে গিয়েছে।

তিন বছর পরে রাজকুমার ইসিযুকুরী ফিরে এলো, একটা পুরোনো পাথরের ভাণ্ড কাগুয়ার সামনে রেখে সে বলতে লাগল—"কী যে বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে এটাকে সংগ্রহ করেছি তা তোমাকে কি বলবো শ্রীমতি! কিন্তু শুধু তোমার কথা ভেবে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা আমার যেন স্বপ্ন বলে বোধ হয়েছে।"

কাগুয়া তখন ইসিযুকুরীর চাতুরী বুঝে বলে উঠল—"শ্রীবুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রের চারিদিকে একটা স্বর্গীয় আলো ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এতে তা কই?"

"তোমার পাশে রাখলে এমন কী আছে জগতে, যার আলো ফুটে উঠতে পারে শ্রীমতী! সূর্য্যের পাশে কে কবে তারার আলো দেখেছে"—ইত্যাদি নানা কথা বলে ভণ্ড ইসিযুকুরী কাগুয়ার মন ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কাগুয়া তার কথায় কর্ণপাত মাত্র না করে তক্ষুনি তাকে বিদায় করে দিল।

এরপর এলো রাজকুমার কুরামুচি, একটা মুক্তোর ফল ধরা সোনারগাছের ডাল হাতে করে এনে কাগুয়ার সামনে রেখে দিয়ে বলতে সুরু করল তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ব্যাপার দেখেইত কাগুয়ার মুখ শুকিয়ে গেল। কুরামুচি বললে, ওই ডালটা সে পেয়েছে হোরাই পাহাড়ের নিভৃতে চূণিপান্নার ফুলফোটান এক ঘন ঝোপের পাশে: আর ঠিক তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এমন একটি স্রোতোস্বতী যার জলের রং হচ্ছে সোনালী আর নীল।"...হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল এই সময়ে! যে সমস্ত জহুরী কারিকর কুরামুচির জন্যে এই সোনালী ডালটা তৈরী করেছিল, তাদের সেখানে ঢুকতে দেখে কুরামুচির মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। তারা তাদের পারিশ্রমিকের জন্যে বহুদিন ঘোরাঘুরির পর মূল্য না পেয়ে বিষম বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই তারা সরাসরি রাজকুমার কুরামুচির সামনে গিয়ে একসঙ্গে তাদের সমস্ত প্রাপ্য চুকিয়ে দেবার দাবী করল।

কাগুয়া বিয়ে করার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে খুব খুশী হয়ে জহুরীদের প্রাপ্যের দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে তাদের সকলকে বিদায় করল—আর কুরামুচিও লজ্জায় অধোবদন হয়ে সরে পড়ল সেখান থেকে। তারপর এলো রাজকুমার ডিনাগন; অঙ্গে তার ভারী চমৎকার

একটা পরিচ্ছদ—সবুজ তার রং, আর তার ওপর সোনালী ও লালের ডোরা দেয়া। যে সওদাগরের কাছ থেকে সেটা ও কিনেছিল, সেই ওকে বলেছিল যে পোষাকটা আসল মোরাকযি দেশের লোমশ ইঁদুরের চামড়া থেকেই তৈরী—আগুনে লাগলে কখনো পোড়েনা ওজিনিষ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কাগুয়া পোষাকটা ডিনাগণের হাত থেকে নিয়ে যেই না আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে অমনি সেটা সাধারণ কাপড়ের মত সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কাগুয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিনাগণকে বাড়ীর দরজা দেখিয়ে দিলো।

আর রাজকুমার চিনাগণ কিন্তু কোন দিনই ফিরে এলোনা কাগুয়ার কাছে। প্রথমে বাড়ী গিয়েই সে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে জাহাজে করে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিলে মরকৎমণির সন্ধানে। কিন্তু তারা যে গেল ত' গেলই। শেষে অধৈর্য্য হয়ে রাজকুমার চিনাগণ একদিন ময়ুরপঙ্খী ডিঙি সাজিয়ে সমুদ্র যাত্রা করলো মরকৎমণির উদ্দেশে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ভীষণ তুফান জেগে উঠল সমুদ্রের বুকে, বড় বড় সাপের মত কালো কালো ঢেউগুলো সাদা ফেণার টোপর পরে পালটাঙান ডিঙিটা ধাক্কার চোটে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করলো। ব্যাপার দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে চিনাগণ তখন আকুলভাবে প্রার্থনা করতে লাগল—হে সমুদ্রশয়তান, তুমি আমার জাহাজ ডুবিয়ে আমাকে হত্যা ক'রোনা, আমি ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমার মরকৎমণিতে কখনো আর লোভ করবো না।

ঝড়ের দাপটে নাকানি চোপানি খেয়ে পুরো তিনদিন ।তনরাত পরে তার ডিঙি ডাঙায় এসে ভিড়ল। সমুদ্রতীরের বিস্তীর্ণ বালুর উপর হতাশভাবে বসে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে চিনাগণ খালি বলতে লাগল যে লোভের ফলেই সে এখন কোন মরুদ্বীপে উপস্থিত হয়েছে—খাদ্যাভাবে ওই খানেই তাকে শুকিয়ে মরতে হবে।...অনুচরেরা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সে স্থানটা মরুদ্বীপ মোটেই নয়—তার দেশের নিকটবর্ত্তী এক সমুদ্রতীর। অবিলম্বে তারা ধরাধরি করে চিনাগণকে তার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত করলো। কাগুয়ার কাছে আর ফিরে গেল না।

এই সময়ে জাপসম্রাট মিকাডো কাগুয়ার রূপগুণের কথা শুনে কাগুয়াকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দেবার হুকুম করে মিয়াক্কোর কাছে দূত পাঠালেন। সম্রাটের ইচ্ছের কথা শুনে কাগুয়া ত কেঁদেই আকুল, সে মিকাডোর কাছে যাবার অনিচ্ছা জানিয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে অনুরোধ করল সে যেন তাকে জোর করে পাঠিয়ে না দেয়। মিয়াক্কো স্বয়ং মিকাডোর কাছে মেয়ের অবাধ্যতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাত্রা করলো।

বুড়ো মিয়াক্কোর নিবেদন শুনে মিকাডো বল্লেন—তাকে এখানে এনে দাও,আমি তাকে বিয়ে করে আমার পাটরাণী করে নেবো আর তোমায় দেবো মস্ত চাকুরী।"

কিন্তু কিছুতেই বোঝান' গেল না কাগুয়াকে। সে তার বাপ মাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না জীবনে, রাজদরবারের সম্পদের চেয়ে সে তার পিতামাতার স্নেহকেই মনে করে ঢের বেশী মূল্যবান।

এ খবর শুনে মিকাডোরও রোখ চেপে গেল—তিনি এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে মিয়াক্কোর বাড়ীতে এসে হানা দিলেন। হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেই সম্রাট দেখলেন কাগুয়াকে; তার রূপলাবণ্যে সম্রাট মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন কাগুয়াকে তাঁর রাণী হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কাগুয়া কিছুতেই শুনবে না, সে খালি কাঁদতে লাগল। সম্রাট তখন বিরক্ত হয়ে তাঁর অনুচরদের জোরকরে কাগুয়াকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার হুকুম করলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে থেকেই কাগুয়া অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে সম্রাট মিকাডো তখন অদৃশ্য কাগুয়ার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে মানে মানে সরে পড়লেন সেখান থেকে। কাগুয়াও মিকাডোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

ঐ ব্যাপারের পর আরো কয়েক বছর ধরে বুড়ো মিয়াক্কো আর তার স্ত্রী তাদের কুড়ানো মাণিক কাগুয়াকে নিয়ে বেশ সুখেসচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে কাগুয়ার কী যেন হোলো; সে প্রায় সর্ব্বক্ষণই অত্যন্ত বিমর্ষভাবে চিন্তা করতো আর কাঁদতো। সেই সময়ে চাঁদ কলায় কলায় হ্রাস পাচ্ছিল আর যেন তার সঙ্গে তাল রেখে কাগুয়াও দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল।

শেষে একদিন কাগুয়া বুড়ো মিয়াক্কোর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"বাবা, খুব শীগগীরই তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে ভেবে বুকটা আমার ভেঙে যাচ্ছে। আগামী পূর্ণিমার দিন ওরা আমায় নিতে আসবে।"—বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল—"আমি হচ্ছি চাঁদের দেশের মেয়ে, তোমরা যাকে পরী বল তাই। একটা অপরাধ করে ফেলার জন্যে শাস্তি স্বরূপ কিছুকালের জন্যে আমায় পাঠিয়ে পৃথিবীতে দেওয়া হয়—আগামী পূর্ণিমার দিন সে সময় উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু বাবা পৃথিবীকে আমি ভালবেসে ফেলেছি, তোমাদেরও ভালবেসেছি, তোমাদের ছেড়ে যাবো কি করে!" —বলে সে কাঁদতে লাগল।

বুড়ো মিয়াক্কো নিজে কিছু করতে পারবে না বুঝে সোজা মিকাডোর কাছে গিয়ে

সাহায্য ভিক্ষা করলো। মিকাডোও সকল কথা শুনে তৎক্ষণাৎ নানা অস্ত্রে সজ্জিত এক শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন মিয়াক্কোর বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে।

কিন্তু সমস্তই বৃথা হলো শেষ পর্য্যন্ত।

দেখতে দেখতে পূর্ণিমার রাত্রি ঘনিয়ে এলো। পূর্ণচন্দ্রের রূপোলী আলোয় সমস্ত জগৎটাই যেন ঝলমল করতে লাগলো। কিন্তু ঠিক মধ্যরাত্রির কিছু পরেই নির্ম্মল আকাশে হঠাৎ মেঘোদয় হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘটা আকাশের পূর্ব্ব কোণ থেকে ভাসতে ভাসতে এলো মিয়াক্কোর বাড়ীর মাথায়...তারপর সেই মেঘ আরো কাছে নেমে আসতে দেখা গেল, কতকগুলো ঝলমলে আলোর তৈরী মানুষের মত জীব ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই মেঘের ওপর, আর তাদের সঙ্গে রয়েছে কারুকার্য্যকরা পর্দ্দা দেয়া একটা চমৎকার চৌদোলা।

ঐ দৃশ্য দেখে সৈন্যদের অনেকেই ভয়ে পালাতে লাগলো। শুধু কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক তীর ছুড়তে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ তুলে তারা সভয়ে দেখলে যে তাদেরই তীরগুলো ফিরে এসে তাদেরই বুকে বিঁধছে। তখন চৌদোলাটা মিয়াক্কোর বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, মিয়াক্কোর বাড়ীর বারান্দার পাশেই, আর সঙ্গে সঙ্গে পরদা সরে গিয়ে চৌদোলার কপাট খুলে গেল। কে যেন তার মধ্যে থেকে বল্লে—"কাগুয়া চলে এসো সময় হয়েছে।"

কাগুয়া সেই কথা শোনা মাত্র বুড়ো মিয়াক্কোর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে সুরু করল। কিন্তু আর একবার চৌদোলার মধ্যে থেকে সে রকম ডাক শুনে সে মিয়াক্কোকে ছেড়ে দিলে। পরে দেখা গেল কাঁদতে কাঁদতে কাগুয়া ধীরে ধীরে মেঘের চৌদোলার মধ্যে উঠে যাচ্ছে আর হতভম্ব অসহায় মিয়াক্কো পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে।

কাগুয়া যখন চৌদোলায় উঠতে যাবে তখন সেই আলোকদূতদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে ওর হাতে এক পাত্র 'অমরসুধা তুলে দিল। কাগুয়া কিছু পান করে অবশিষ্টটুকু তার স্নেহময় বৃদ্ধ পিতা মিয়াক্কোর হাতে তুলে দিতে যাবার উপক্রম করতেই সেই আলোকদূত বাধা দিয়ে পাত্রটা কাগুয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর তারা কাগুয়াকে শাদা পালকের তৈরী বিস্মৃতির এক পোষাক পরিয়ে মেঘের চৌদোলায় চড়িয়ে শূন্য পথে সাঁ সাঁ করে উড়ে গেল। আর পৃথিবীর আত্মীয়দের কথা, তাদের ভালবাসার কথা, কাগুয়ার কিছুই মনে রইল না!

বনমালী

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

বাগানের উড়ে মালী নাম বনমালী,
রং তার ঠিক্ যেন দোয়াতের কালি।
দিনরাত ঘুম যায় বড় ফাঁকি বাজ,
টিকি নাড়া ছাড়া আর নাহি কোন কাজ।
বাগানের ফল মূল পাঁচ ভূতে খায়,
একটিও ফল নাহি বাবু বাড়ী যায়।
বাবু কন্ বনমালী তোকে নিয়ে আর,
বাগানটা রাখা মোর হ'ল শেষে ভার;
পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খায় মজা ক'রে,
পারিস্ না নিয়ে যেতে মোর কাছে ধ'রে?
বনমালী কয়—বাবু পাঁচ ভূত অছি!
মু না আউ ঢ়ৈবি এঠি যিবি বামুন্‌গছি।
মু কিমিতি ভূত ধড়ি মোড়ি দব ঘাড়,
রাম রাম রাম কুহঁ আজি মোতে ছাড়।
আরে ম'লো, ভূত কিরে তুই এক ভূত,
কেলো ভুলো, পেঁচো আর মনসার পুত,
এই পাঁচ ভূত মিলে সবে ক'রে চুরি
করেছিস্ বেশ তোরা বড় বড় ভুঁড়ি।
মু কিমিতি চোড়ি কিবি কেলো ভুলো হবো;
জগন্নাথ প্রভু অছি দেখুছি সে সবো।

এ ভূত মু ঠিক্ ধড়িবি পাঁচ টঙ্কা নেবি,
সবু পিলা ধড়ি কিঁড়ি তব পাখে দেবি।
বাবু কন তাই দেব দে তাদের ধ'রে,
বেটাদের শিক্ষা দি আচ্ছা সে ক'রে।
সেই হতে বনমালী থাকে পাহারায়,
সারা রাত থাকে জেগে ঘুম নাহি যায়।
ভয়ে কেহ বাগানেতে ঢোকে নাক আর,
বনমালী রাত জাগা হ'ল খালি সার!
তবুও সে জেগে থাকে বকসিস্ তরে,
দুটি মাস রাত জেগে পড়ে শেষে জ্বরে।
এক রেতে বাবু তার বাগানেতে গেলে,
বনমালী ধরে গিয়ে মুড়ি সুড়ি ফে'লে।
তারপর নিয়ে গেল ধরি' তাঁর ঘাড়,
মনে মনে ভাবে কত পাবে উপহার।
বাবু বাড়ী গিয়ে বলে ধড়িয়াছি চোড়,
দিয় বাবু আগে দিয় দিয় টঙ্কা মোড়।
এই কথা যেই বলা ট্যাঁক্ হ'তে তার,
পাচ টাকা নিয়ে বাবু দেয় উপহার।
বনমালী কয় কাঁদি তমে বাবু অছি!
ক্ষম বাবু ক্ষম মোতে কসুড় হউছি।

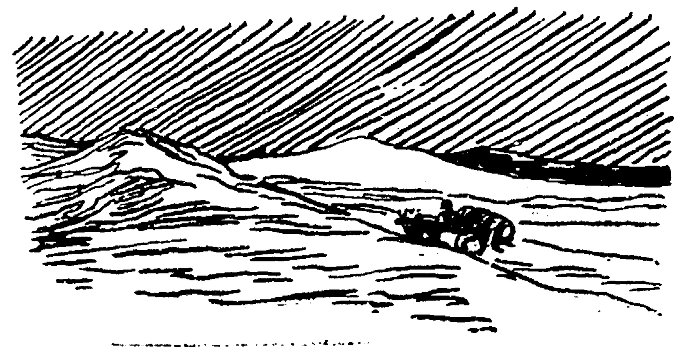

সমুদ্রের জন্ম

ধরণী সেন

রূপকথা নয়; একেবারে সত্য ঘটনা!

কিন্তু সে বহুদিন আগের ঘটনা। দু পাঁচ হাজার বছর নয়, সহস্র কোটি বছর আগের কথা।

এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীর বুকে বিন্দুমাত্র জল ছিল কি না সন্দেহ। আজকের এ পৃথিবী আর সেদিনকার সে পৃথিবী—অনেক্ তফাৎ। যে পৃথিবীর বুকে এক ফোঁটাও জল ছিল না, আজ তার বুক জুড়ে জল; তিন ভাগ জল আর এক ভাগ মাত্র স্থল! আজকের এ পৃথিবী আর সেদিনকার সে পৃথিবী! আজ পৃথিবী সুন্দর শস্যশ্যামলা, যার বুকে নীল শান্ত সমুদ্র নদ নদী, আজ পৃথিবীর নরম পিঠে তোমরা খেলা কর—আর সেদিনের পৃথিবী ছিল নিরস, কঠিন ও প্রাণহীন জড় পদার্থ!

হ্যাঁ, সমুদ্র জন্মাবার আগে পৃথিবীর অবস্থা ঐ রকম ছিল। সমুদ্রের চেয়ে পৃথিবী অনেক বয়সে বড়, কিন্তু তা হলে হবে কি, সমুদ্র যখন জন্মাল তখন পৃথিবীও নিতান্ত ছেলেমানুষ।

তাহলে কেমন করে পৃথিবীর সেই কঠিন বুকে সমুদ্রের জন্ম হল? কেমন করে বিরাট গভীর সমুদ্র-গর্ভ সৃষ্টি হল?

সে রূপকথা নয়; একেবারে খাঁটি সত্য ঘটনা।

পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গ এক সময় অগ্নিকুণ্ড ছিল; বাইরেও, ভেতরেও। গলিত ধাতু ও নানা গ্যাসের সমষ্টিতে তার গড়ণ সুরু হয়েছিল বিশ্বকর্ম্মার হাতে। আজও পৃথিবী অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, তবে বাইরে নয়, তার ভেতরে। আমরা ওপরের মানুষ, আমরা টের পাই না। আজ পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে আগুনের যে আশ্চর্য্য কারখানা, সেখানে পৃথিবীর সে আদিম ধাতু টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। আগ্নেয়গিরির উদ্গমে মাঝে মাঝে আমরা সেই চাপা আগুনের সামান্য কিছু টের পাই বটে কিন্তু একদিন যদি সেই চাপা গলা আগুন বাইরে বেরিয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষে নেই! সমস্ত পৃথিবী পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে, মহাসমুদ্রের বিরাট জলরাশি পর্য্যন্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠবে।

আজ পৃথিবীর ওপরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম প্রথম যখন পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে সুরু হয়েছিল, তখন এক কাণ্ড ঘটেছিল। পৃথিবীর সব অংশই যে সমানভাবে ঠাণ্ডা হতে থাকল তা নয়, অনেক অংশে যেন তুবড়ে ও চুপসে যেতে থাকল। ফলে জায়গায় জায়গায় গভীর গহ্বর থেকে গেল। পৃথিবীর হাল্কা ধাতব অংশগুলি যেন চাপ দিয়ে ফুলে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে তার উঁচু স্থলভূমি সৃষ্টি করতে সুরু করল। আর

ভারী ধাতব অংশগুলি যেন নিজের ভারে নেমে গিয়ে পৃথিবীর গভীর গহ্বরে পরিণত হতে থাকল। আর পৃথিবীর এই ভারী অংশের ভাগই হল বেশী।

এই রকম করে পৃথিবীর আদি সমুদ্র গর্ভ সৃষ্টি হল। আর বহু যুগ ধরে এই পাতালপ্রায় গভীর পাথুরে গহ্বরগুলি পৃথিবীর কলঙ্ক হয়ে থেকে রইল!

তারপর এই গভীর গহ্বরগুলিতে যেখানে একদিন জমাট অন্ধকার ছিল, যেখানে জলবিন্দু মাত্র ছিল না, সেখানে সমুদ্র জন্ম নিল ধীরে ধীরে। পৃথিবী কি ভাবতে পেরেছিল তার অন্ধকার অতল গর্ভে একসময়ে মহাসমুদ্র জন্ম নেবে আর একদিন সে মহাসমুদ্রই তার জন্মদাতৃর সমস্ত জায়গাটুকু দাবী করে জোর করে দখল করে বসবে!

কিন্তু পৃথিবী বোধ হয় এটা আন্দাজ করেছিল। নইলে এত বিরাট গভীর গহ্বরের কি দরকার ছিল সৃষ্টিকর্ত্তার? পৃথিবী যেন একটু সময় নিয়ে একটু নিংশ্বেস নিতে লাগলো। তার আয়তন সে আরো শক্ত করে তুলতে লাগল। যখন তার আয়তন তার ব্যাস আজকের পৃথিবীর মত হয়েছিল তখন সে তার পাথুরে গহ্বরে তার ভাবী সন্তান—মহাসমুদ্রের আবির্ভাব এর জন্য যেন তৈরী হল।

পৃথিবীর নিঃশ্বাস যখন ভারী হয়ে উঠতে লাগল তখন পৃথিবীর বুকে নামলেন এক দেবতা। তিনি আর কেউ ন'ন—পৃথিবীর সে আদিম সাথী—আবহ বা বাতাস। এই বাতাস নাকি সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীরও আগে, কেউ বলেন, না পৃথিবীর জঠর থেকেই তার জন্ম।

সমস্ত পৃথিবীর ওপরে এই বাতাসও ক্রমশঃ পৃথিবীর গরম নিঃশ্বাসে যেন ভারী ও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে তার তপ্ত নিঃশ্বাস দিয়ে সে পৃথিবীর নিঃশ্বাস গলাতে সুরু করল। এদের নিঃশ্বাসে ছিল লুকিয়ে নানা গ্যাস—বাতাস এই গ্যাসের মিলন ঘটিয়ে গলন কার্য্য সুরু করল। সেই গলন থেকে একদিন তৈরী হল জলবিন্দু বাতাসের বুকে ও পৃথিবীর বুকে। চঞ্চল বাতাস ক্রমশঃ এই জলবিন্দুর সংখ্যা বাড়াতে থাকল। ক্রমশঃ সেই জল পৃথিবীর বুকের পাথরগুলো আসতে আসতে ভাঙ্গতে সুরু করল। ছোট বড় নানা টুকরো, নানা পদার্থ ধুয়ে ধুয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে একদিন নানা পদার্থ জড় করে জল নিজে জমা হয়ে পৃথিবীর নিম্নস্তরে তার আকর্ষণে নামতে লাগল, পরিশেষে গিয়ে পড়তে লাগল পৃথিবীর তৈরী সেই গভীর গহ্বরের মধ্যে। বিন্দু বিন্দু জল পৃথিবীর নানা অংশে জমা হয়ে একত্রে পৃথিবীর টানে পড়তে লাগল ঐ গহ্বরগুলিতে।

জল জমা হতে থাকল এই গহ্বরগুলিতে আর গহ্বরগুলি সেজন্য ওজনে ভারী হয়ে উঠতে লাগল। ফলে তার চাপে ও ভারে গহ্বরগুলি আরো নীচে নামতে থাকল, আরও গভীর হতে থাকল। জল আর তার ধোয়া পদার্থও ক্রমে বেড়ে চলতে লাগল। গহ্বরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর হতে লাগল তার আয়তনও তার চারপাশে বাড়তে লাগল। যুগ যুগান্ত ধরে এই কাণ্ড চলতে থাকল এবং পরিশেষে কানায় কানায় সমুদ্রগর্ভ জলে নানা পদার্থে পরিপূর্ণ হয়ে আজকের মহাসমুদ্রের জন্ম হল।

এমনি করে একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর সমুদ্রের মধ্যে সেই হল সবচেয়ে

বুড়ো আদিম সমুদ্র। তারপর সৃষ্টি হয়েছিল ভারত মহাসমুদ্র, তারপর হয়েছিল অতলান্তিক—তারপর অন্য ছোট বড় সমুদ্রগুলি।

এই হোল সমুদ্রের আদি জন্মকথা। আজ সমুদ্রের বয়স—১,৩০০,০০০,০০০ বৎসর!

তারপর একদিন এই বিরাট গহ্বরগুলিও সমুদ্রজলের পক্ষে অকুলান হল। জল উপছে প'ড়ে বন্যার সৃষ্টি করতে লাগল। স্থলভাগগুলি তারা ভাঙ্গতে সুরু করল! এমনি করে পৃথিবীর কত স্থলভাগ যে সমুদ্র ভাঙ্গতে সুরু করল তার ঠিক নেই। যে স্থলভাগে একদিন দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি 'গণ্ডোয়ানা' নামে এক মিলিত ভূমি ছিল, একদিন সে গণ্ডোয়ানা ভূমিকে সমুদ্র এসে ভেঙ্গে চুরমার করে তাদের মধ্যের স্থলভাগ গ্রাস করে ফেললে। আজ তাই দেখতে পাও—দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মাঝে মহাসমুদ্রের রাজত্ব। এমনি করে আস্তে আস্তে সমুদ্রের জলরাশি পৃথিবীর চার ভাগের একভাগ দখল করে নিলে। যে সমুদ্র একদিন বাতাসের নিঃশ্বাসে ও পৃথিবীর বুকে লুকিয়েছিল আজ সে রূপান্তরিত হয়ে যেন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে আছে।

পৃথিবীর এই নগন্য একভাগ স্থল তার জীবন বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ যুদ্ধ করতে থাকল সমুদ্রের সঙ্গে—। কখনও কখনও সমুদ্রও হার মেনেছে, তাকে জায়গা ছাড়তে হয়েছে। ভারতের উত্তরে যেখানে আজ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়—এক সময়ে সেখানেও সমুদ্রের একছত্র রাজত্ব ছিল। কিন্তু হিমালয় আস্তে আস্তে তার জায়গা দখল করে নিলে। সমুদ্রকে তার গর্ভ থেকে হটিয়ে দিয়ে ক্রমশঃ মাথা তুলে দাঁড়াল একদিন হিমালয়!

পৃথিবীর জায়গা দখল করবার জন্য স্থলে ও সমুদ্রে আজও যুদ্ধ বেধে আছে। আজও চলেছে তাদের সে চিরন্তন টাগ্-অফ্-ওয়ার্। যে স্থলভাগের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা মানুষ সামান্য ভূমি কাড়াকাড়ি করবার জন্য আজ লড়াই করছি—সেই এক খণ্ড স্থলভূমি নিজেই সমুদ্রের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করছে। কাটাকাটি মারামারি করতে করতে হয়ত আমরা একদিন সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবো।

সমুদ্রে ও স্থলভাগে এই টাগ্-অফ-ওয়ারে আজ যেখানে স্থল, কাল সেখানে জল; আজ যেখানে জল, কাল সেখানে একটু জমি মাথা তুলে উঠছে। কিন্তু মহাসমুদ্র তার সে আদি জন্ম থেকে সুরু করে আজও তার প্রতিপত্তি খাটিয়ে পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করছে।

কিন্তু স্থল ও জল দুজনারই জীবন মরণ নির্ভর করছে পৃথিবীর সে আদি দেবতা—বাতাসের ওপর। আজ যদি হঠাৎ পৃথিবীর ওপর থেকে সমস্ত বাতাস কেউ টেনে নেয়—সমস্ত সমুদ্রের জল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! আজ চাঁদের যা অবস্থা হয়েছে পৃথিবীরও অবস্থা হবে তেমনি। আজকের সুন্দর পৃথিবী সে সৃষ্টির আদি কঠিন পৃথিবীর মত বিরাট গহ্বরে আবার মুখব্যাদান করবে। জল ও বাতাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে কলঙ্কে পৃথিবী আবার সে আগের মতন প্রাণহীন জড় হয়ে পড়ে থাকবে। এই আবহ বা বাতাস পৃথিবীর মহাসমুদ্রগুলোকেই শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি, আজ সে সমস্ত পৃথিবীর প্রাণসঞ্চার করে তাকে শস্যশ্যামলা ও সজীব করে রেখেছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এর পর পুরো একটা বছর কেটে গেল। ভাল্লুক মা'র আবার ছানা হবে। নালুখও বহুদিন এক জায়গায় থেকে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ভাল্লুক মা ওদিকে দিন দিন তার পেটের ছানাদের জন্যে ব্যস্তহয়ে উঠতে লাগল। আজকাল আর নালুখের দলে প্রায়ই তাকে দেখা যায় না। আবার ভাল্লুক মা'র সাথে ভাল্লুকদের এক বছরের ছাড়াছাড়ি হবার দিন ঘনিয়ে এল। ছানা হবার সময় থেকে এক বছর অন্ততঃ ভাল্লুক মা একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। নালুখ যাবে এক বছরের জন্যে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বনান্তরে। এবার তার সঙ্গে যাবে কালারা। মংলুও নালুখের সঙ্গে যেতে পারত, কিন্তু অভিজ্ঞ নালুখ ঠিক করেছে, যে শুধু ভাল্লুকের জীবন যাপন করলে মংলুর চলবে না। তা' ছাড়া তাতে ভয়ও অনেক। বনে থাকতে হলে মংলুর এখনও অনেক শিক্ষা বাকী কারণ মংলুত আর আসলে ভাল্লুক নয়। ভাল্লুকদের চেহারা দেখেই অনেক বলশালী জানোয়ারও ভয় পায়। পৃথিবীতে আকৃতির একটা দাম আছে। তাছাড়া বনে জানোয়ারদের ঠিক কোন শত্রু নেই। এক জানোয়ার আর এক জানোয়ারকে শিকার করে বটে কিন্তু সেটা শত্রুতায় নয় আহারের প্রয়োজনে, প্রাকৃতিক তাগিদে। কিন্তু বনে মংলুর শত্রু অনেক। তাই তাকে নানা জিনিষ এখনও শিখতে হবে।

যেমন মংলু এখনও বড় বড় গাছে চড়তে পারে না। বনে থাকতে হলে অন্ততঃ মংলুর ওই শিক্ষাটা বিশেষ দরকারী। তাই সেদিন ভাল্লুক মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মংলু ভাল্লুক ছানাদের সঙ্গে চরতে গেছে। নালুখ বলল—আমাদের ত যাবার সময় হোল মংলুর কি হবে?

ভাল্লুক গিন্নী বলল—কেন ওত তোমাদের সঙ্গে যাবে।

—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? ভেবে দেখ আমরা ভাল্লুক কিন্তু ও মানুষ-ছানা, ওর কত দিক থেকে বিপদের ভয়। অন্য বনে কেঁদো বাঘ আছে, ডোরা-কাটা চিতা আছে, হায়না আছে আরও কত কি আছে!

—কিন্তু তা' হলে কি হবে?

—তা'ছাড়া ওর অন্য সব জানোয়ারদের জীবন অভ্যাস করা দরকার। বিশেষতঃ বড় বড় গাছে চড়া শেখাত ওর খুব দরকার।

নালুখের কথা বলার ধরণ দেখেই ভাল্লুক গিন্নী বুঝেছিল যে তার মাথায় একটা কিছু মতলব আছে। তাই ভাল্লুক গিন্নী জিজ্ঞেস করল—তা হলে কি করবে ঠিক করেছ?

—ওর এখন কিছুদিন লঙ্গুরদের সঙ্গে থাকা দরকার।

ভাল্লুক গিন্নী বলল—ঠিক বলেছ। ঠিক ঠিক!

লঙ্গুররা পাহাড়ে বানর। আকারে বেশ বড়, গায়ে অসীম ক্ষমতা। শেষ পর্য্যন্ত তাই ঠিক হোল, যে মংলু লঙ্গুরদের দলে থাকবে। তা ছাড়া এই বনেই থাকলে সে মাঝে মাঝে ভাল্লুক মাকে দেখে যেতে পারবে। তাতে দুপক্ষেরই সুবিধা। মংলুও কিছুদিন থেকে এই একঘেয়ে জীবনে ছটফট করছিল। তার ইদানীং মনে হোত কি যেন তার ফস্কে যাচ্ছে। জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কত রহস্য আছে, সে সব সে খুঁজে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তার চোখে জেগে উঠত কি এক অদ্ভুত পিপাসার ছাপ। ভেতরের অন্ধ তাগিদে সে অস্থির হয়ে উঠত। তাই সেদিন মংলুরা ফিরে এলে নালুখ বলল—মংলু তোর মায়ের আবার ছানা হবে আমাকে এবার চলে যেতে হবে।

বন্য জীবনে প্রাণীদের স্থির হতে হয়। কোন অবস্থায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করা জানোয়ারদের একটা লজ্জার কথা। বন্যজীবনে গড়ে উঠা মংলু তাই বলল—ও!

নালুখ আবার বলল—এখন থেকে ভাল্লুক মা একা থাকবে একবছর তার নতুন ছানাদের নিয়ে। আমরা চলে যাব। তুমি থাকবে লঙ্গুরদের সঙ্গে। লঙ্গুর লোকরা ভাল। চল আজ তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই গে।

হাজার হোক বহুদিন একসঙ্গে কেটেছে, মংলুর চোখ ছল ছল করে উঠল। ভাল্লুক মা ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল—মংলু আমার সোনা আমার। লঙ্গুরদের সঙ্গে থেকে আমায় ভুলিস নি যেন মংলু। তোকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি আমি। আমার নিজের ছানাদের চেয়ে তোকে ভালবেসেছি। সেই মা হারা তো'কে শেয়ালের মুখ থেকে যেদিন কেড়ে এনে আমার বুকে তুলে নিলুম, সেই দিন থেকে তুই আমার বাচ্ছা হয়ে গেছিস। যা বাছা যা, ভাল্লুক মাকে যেন কখনও ভুলিস নি।

মংলুর বুকের ভেতর কি রকম গুরগুর করে, কি যেন অস্ফুট একটা ব্যথা হয়। চোখের জল কি মংলু তা জানে না তবু সে উদ্যত চোখের জল চাপতে চাপতে ছুটে বনের একদিকে চলে যায়। নালুখ আর তার বাচ্ছারা ভাল্লুক মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে মংলুর অনুসরণ করে। সকলেরই বুক ভারী তখন।

গারো পাহাড় ঘিরে উচ্চ আসামের বিস্তৃত বিশাল বন। সারাদিন ধরে পথ দেখিয়ে নালুখ চলতে থাকে। জমি ক্রমশই চড়াই। বন কখনও ঘন গভীর কখনও অপেক্ষাকৃত হাল্কা। সেদিন সন্ধ্যায় নালুখ বনের খানিকটা হাল্কা অংশ পার হয়ে গভীর এক অংশে প্রবেশ করার আগে গর্জ্জন করে উঠল—আমি নালুখ বলছি শোন। লঙ্গুরদের জয় হোক, তাদের ফলমুল ভাল করে জুটুক। লঙ্গুরদের সঙ্গে আমার সভা হবে আজ। নালুখের সে হাঁক কাঁপতে কাঁপতে বনের অভ্যন্তরে ঢুকে মিলিয়ে যায়। কোথা থেকে হুপ্ করে একটা শব্দ হয়। কোন অদৃশ্য শূন্য থেকেই যেন তাদের মাথার ওপরের ডালে প্রকাণ্ড এক লঙ্গুর বানরের আবির্ভাব হয়। বানর রাজ্যে প্রবেশের পথের ওই লঙ্গুর প্রহরী।

লঙ্গুর গাছের ডাল থেকে হা'ক দেয়—ভাল্লুকদের জয় হোক, শিকার টিকার ভাল জুটুক। কি গো নালুখ কি খবর?

নালুখ বলল—দল কোথায়? সভা আছে।

প্রহরী লঙ্গুর আকাশে মুখ তুলে—হুপ্ হুপ্ করে ডেকে উঠল। কোথা থেকে অমনি হাজার হাজার কণ্ঠের হুপ্ হাপ আওয়াজ শোনা গেল। আর দেখতে দেখতে নিঃশব্দে হাজার হাজার ডাল বেয়ে চোখের নিমেষে হাজার হাজার লঙ্গুরের আবির্ভাব হোল। লঙ্গুরেরা সার সার ডালে বসে গেল। তারপরে এল একটা প্রকাণ্ড লঙ্গুর। এমন কি লঙ্গুরদের দলেও এতবড় বানর আর একজনও নেই। নালুখ তাকে দেখেই বলে উঠল—লঙ্গুরদের জয় হোক, গোদাবরের জয় হোক, ফলমূল বেশী করে জুটুক!

গোদাবর জবাব দিল—ভাল্লুকদের ভাল হোক! কি খবর ভায়া?

—আমরা গারো পার হয়ে ওপারের বনে যাচ্ছি।

গোদাবর বলল—সুযাত্রা হোক তোমার। গিন্নির বুঝি আবার ছেলে পুলে হবে?

নালুখ বলল—হ্যাঁ! শোন গোদাবর, আমাদের এই মংলুকে তোমাদের দলে রেখে যেতে চাই।

গোদাবর হাল্কা পায়ে এক লাফে নীচে নেমে এল, তার পরে একমনে মংলুকে দেখতে লাগল।

নালুখ বলল—মংলু—লঙ্গুরদের ভাল কথা বল।

মংলু বলে উঠল—লঙ্গুরদের জয় হোক! ফলমূল বেশী করে জুটুক!

তখন গোদাবর বলল—ও, এই বুঝি ভাল্লুকদের মংলু? বেশ বেশ ওর কথা আমরা অনেক শুনেছি। চীলের কাছে, কাঠবেড়ালীর কাছে, বাদুড়ের ডানার ইসারায়। বেশ বলেছ মংলু বেশ। বেশ ত নালুখ, মংলু আমাদের সঙ্গে থাকবে, আমাদের সঙ্গে ছুটবে। আজ থেকে ও আমাদের ভাই।

তারপরে গোদাবর আকাশে হাত তুলে হাঁক দিল—শোন শোন, আমি গোদাবর লঙ্গুরদের দলপতি বলছি: আজ থেকে ভাল্লুকদের মংলু লঙ্গুরদের ভাই। লঙ্গুরদের বন্ধু আজ থেকে মংলুর বন্ধু, লঙ্গুরদের শত্রু আজ থেকে মংলুর শত্রু। আর মংলুরও বন্ধু আজ থেকে লঙ্গুরদের বন্ধু, মংলুর শত্রু আজ

গোদাবর আকাশে হাত তুলে হাঁক দিল—

থেকে লঙ্গুরদের শত্রু। গাছের ডাল থেকে হাজার হাজার লঙ্গুর একসঙ্গে হুপ্ হুপ শব্দে বন ভরিয়ে ফেলল। সেই আওয়াজে বনের খরগোস, ময়ূর, কাঠবেড়ালী চমকে উঠল। পানকৌড়ির দল আকাশে সার বেঁধে উড়ে যেতে যেতে নীচের পানে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। চীল সে খবর ছড়িয়ে দিল আকাশে আকাশে বনে। কালকেতু সে খবর শুনে রাগে হিংসেয় জলে উঠল।

তখন নালুথ বলল—আচ্ছা মংলু, আমরা আসি তা হলে এখন।

বলতে বলতে নালুথ মংলুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল।

—কিছু ভাবিস নি মংলু, আবার একবছর পরে আমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

মংলু ছুটে গিয়ে কালাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তখন আর তার চোখের জল বাধা মানছে না। সেই প্রথম চোখের জল দেখে মংলু নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে বলল—এ কি জল পড়ছে কেন? জানিনা, কিন্তু আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

নালুথ বলল—মানুষদের অমন হয়। ওকে বলে চোখের জল। পড়ুক পড়ুক একটু কেঁদে নে, মন হাল্কা হয়ে যাবে।

চোখের জলে মংলু সব ভাল্লুক ছানাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। তারপরে নালুথ তার দুই কাঁধে আদর করে থাবা দিয়ে থাবড়া মেরে বলল—এবার আমরা যাব মংলু তুমি ভাল হয়ে থেকো। মংলুর ভাল হোক, খুব ভাল, খুব ভাল।

—আচ্ছা আসি তাহলে গোদাবর দাদা, মংলুকে তুমি দেখো। লঙ্গুরদের জয় হোক, গোদাবরের জয় হোক!

গোদাবর বলল—ভাল্লুকদের ভালো হোক! সুযাত্রা! ভাল্লুকরা লম্বা সারে গারো পাহাড়ের গা বেয়ে ভারী বুকে চলে গেল। তাদের বিশাল কালো আকার ছোট হতে হতে আরো ছোট হয়ে ক্রমশঃ গুটিকত কালো বিন্দুতে পরিণত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

যতক্ষণ তাদের দেখা যায় একদৃষ্টে তাদের যাত্রা পথে দৃষ্টি রেখে মংলু পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুচোখ বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরে তার বুক সিক্ত করে দিলে লাগল।

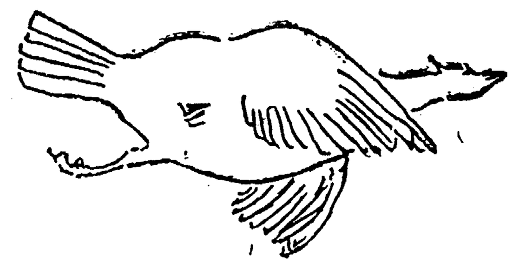

বাদশাহী গল্প

ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

বস্ দাদামশায়, একদম ডিসাপিয়ার!

—কি গজা না খাজা?

—তোমার রূপোর ঘটির ঢাকা!

—কি হবে এখন? একদম পুলিশ কেস্ দাদামশায়!

—তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, বাদোশা বাবু! এতো সেকাল নেই যে প্যাঁজ খেলে মুখে গন্ধ করবে না! চোর ধরা যাবেই, জিনিষটা একদম যখনডিসাপিয়ার করলে তখন তুমি কোথায় ছিলে বাদোশা বাবু?

—দাঁত মাজচ্ছিলেম সকালে উঠে

—তোমার সামনে থেকে ডিসাপিয়ার?

—একদম দাদামশায়!

একদম ডিসাপিয়ার নট্ হিয়ার নট্ দেয়ার নো হ্বোএ্যার!
হু ইট্ আগুন, মষ্ট ভমিট্ কয়লা
ফায়ার কখনো ছাই চাপা রয়না
ঢাকা আছে হয় নিকটে
নয় দূরে মেল্টিং পটে
বাদোশা বাবু নো ফিয়ার
ঘটি বাটি টেবিল চেয়ার নাইট্ মেয়ার
এই এ্যাপিয়ার এই ডিসাপিয়ার!

—বাদোশা বাবু, ঢাকনির ভাবনা ভেবে আর লাভ নেই। বলতো ঘটিটা এখন দেখতে লাগছে কেমন?

—ভারত যুদ্ধে কাটা পড়া ঘটোৎকচ যেমন!

—হিয়ার হিয়ার, থ্রী চিয়ার, হেড্ ডিসাপিয়ার টেল এ্যাপিয়ার!

—চোখের সামনে থেকে ঢাকনাটা ডিসাপিয়ার দাদামশা!

—তা না হলে ঘটোৎকচ তো এ্যাপিয়ার হতে পারে না, বাদোশাবাবু—।

—আচ্ছা সচক্ষে ডিসাপিয়ার এ্যাপিয়ার হতে দেখেচো কিছু তুমি!

—কেন এ প্রশ্ন হল আগে বল।

—আমার তো মনে হয় দাদামশা, একবার ডিসাপিয়ার হলে আর এ্যাপিয়ার হয় না—

—হয় ভাই যদি না বগীচাসাই হয়ে যায় জিনিষটা।

—বলতো শুনি কেমন?

—বলি শোনো সচক্ষে দেখেছি সকর্ণে শুনেছি যা—।

পাল্কি গাড়িটি ছোট্ট, তার চেয়ে ছোট্ট ঘোড়াহুটি, গাড়ি ঘোড়ার চেয়ে ছোট্ট কোচমানটি, শনিবারে শনিবারে তাতে চড়ে ও বাড়িতে এসে নামতেন একটি ভদ্রলোক, নাম ভুলে গেছি—ঐ মিশিরের মতো লম্বাচওড়া শুধু রংটা কালো আর গোঁফ জোড়া পাকা ঠিক যেন বেলা হুটো। দেখতে পাচ্ছো তোবাদশাবাবু?

—পষ্ট দেখছি ছোট্ট পাল্কিতে চারখান চাকা, তাতে হুটি ছোট ছোট সাদা ঘোড়া জোতা, বাচ্ছা কোচমান কোচবাক্সে বসে—

—বলে যাও থামলে কেন?

—দাদামশায়, তার মধ্যে কি করে অতবড় মানুষটি ঢুকতেন বার হতেন তাতো বুঝলেম না!

—তুমি বুঝবে কি! আমি এখনো বুঝলেম না।

—তুমি দেখেছিলে ঢুক্‌তে বার হতে?

—সচক্ষে দেখা মানুষটি গাড়িতে ঢুকতেন যেন ডিসাপিয়ার হয়ে যেতেন, বার হতেন যেন এ্যাপিয়ার হতেন।

—এ তো ভারি মজার কথা!

—আরো মজা আছে শোনো—বাড়ির উত্তর ধারে আস্তাবোল, সেখানে থানজুড়ে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা থাকে! ছোট্ট গাড়ি ছোট্ট কোচমান অশথতলায় ঘোড়া খুলে দেয়, গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে রোদে, ঘোড়া চরে খায় ঘাস পাতা যা পায়, ছোট্ট কোচমান ছুটি পেয়ে খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোয়; এমনি প্রতি শনিবার দেখি।

একদিন দেখি সোর গোল পড়ে গেছে। বাড়ির যত সহিস কোচমান দরোয়ান চেঁচাচ্ছে এ ক্যা তাজ্জব ঘোড়া কাঁহা গিয়া? ঘোড়া না পেয়ে কাঁদতে লেগেছে ছোট্ট গাড়ির ছোট্ট কোচমান।

দৌড়লেম দেখতে! রৈ রৈ পড়ে গেছে। এবাড়ি ওবাড়ি সবাই খুঁজছে ঘোড়া—ঘোড়া একদম ডিসাপিয়ার! কেউ বলে বাবা এ সাগর রাজার ঘোড়া ইন্দর রাজা চুরি করলে নাকি, কেউ বলে, আরে অকি হয় দেখনা ছাগল হয়ে চরছে; আরে না না দেখ্—ঐ বাগানের বাঁধা নহরে জল খেতে গিয়েছিল, পড়ে ভেসে গেছে গঙ্গামুখে! আর একজন বলে, ওরে দেখ চিলে খরগোস ভেবে তেঁতুল গাছে তুলে নেয়নি তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি আকাশ পাতাল ভাবা চিন্তা করা চুকতে রোদ পড়ে এলো—হটাৎ সেই সময় ঘোড়ার লাথালাথি চিঁহি চিঁহি শব্দ শুনে খেলা ছেড়ে গিয়ে দেখি, বাগানের মধ্যে একটা ভাঙা ইষ্টিমারের বয়েলার, তার মধ্যে থেকে একটা ঘোড়ার ল্যেজ ধরে টেনে বার করলে ছোট্ট কোচমান—আর একটা ঘোড়া পিছু হেঁটে এ্যাপিয়ার হল ওইভাবে বয়েলার ছেড়ে।

ঘোড়া হুটো কত বড় ছিল দাদামশায়?

—বয়েলারের চোঙার ব্যাস্‌টা যত বড় তার চেয়ে কিছু ছোট ছিল সেটা ঠিক!

—তাই একেবারে বগীচাসাই হয়ে গেল না, ডিসাপিয়ার হয়ে খানিক বাদে আবার এ্যাপিয়ার হল!

—বাগীচাসাই কথার মানে কি বলতে পারো দাদামশায়—

—ঐতো বলেছি—যেমনি বগীচাসাই অমনি আর দেখা নাই, ইংরিজীতে ওর মানে হয় না, বাংলাতে উর্দ্দূতে সমষ্‌কৃততে পালিতে উড়িয়াতে ওর জোড়া কথা আছে কি না!

—কথার মানে বার করবার জন্যে তোমার এত ঝোঁক কেন বলতো, অনেক কথা আছে যার মানে ডিসাপিয়ার করেছে অথচ কথাটা চল্‌ছে।

—যেমন?

—এই তো ভাই বাদশাবাবু জবাবদিহিতে ফেল্লে—এই যেমন, এই যেমন—

—বুঝেছি দাদামশায়, বিত্তেসাদ্দি ও বগীচাসাই হয়ে গেছে তোমার।

—এই মনে পড়েছে—বোম্‌কালী কল্‌কাত্তালী—ওয়েব্‌ষ্টর শব্দকল্পদ্রুম বিশ্বকোষ বাংলা পরিভাষা চাপা পড়ে, দেখ ওর মানে কোথাও পাবে না খুঁজে!

—আচ্ছা ওকথা যাক্ তারপর দাদামশা?

—এতক্ষণে তারপর কি চলে আর, আজ রাতে বাদশাবাবু, বগীচাসাই হয়ে গেছে সাতের গল্পটা।

—দাদামশা, ও সব কোনো কাজের কথা নয়, সাতের গল্প তোমার সাত পাক নাগ ফাঁসে পড়ে গেছে।

—কেন বলতো বাদশাবাবু!

—ষষ্টির দিনে কাবুলীকে তুমি দুর্গা নাম শুনিয়েছো, এ তারি ফল।

—কেন শোনাবোনা! সে যে আমাকে এত আঙুর পেস্তা খিস্‌মিস্‌ বাদাম দিয়ে গেছে!

—সেগুলো কোথায় গেল, ডিসাপিয়ার হ'য়ে গেছে নাকি?

—আরে ডিসাপিয়ার হলেতো এ্যাপিয়ারের আশা ছিল, বগীচাসাই হয়ে গেছে—

—আঙ্গুরের বিচিগুলো—

—বাগানে ফেলেছি তো—

—তাহলে গজাবে—এ্যাপিয়ারও হবে।

—যতন করতো তবে!

—কেমন করে যতন করতে হবে আঙ্গুর গাছের, কে বলে দেয়।

—কেন ঈশ্বর গুপ্ত

—তিনি আছেন না—

—নাই থাকুন, তাঁর উপদেশ আছে—ছাপার অক্ষরে ছাপা, বলি শোনো—

"আঙুর গাছের কিছু করি বিবরণ, মাচা বিনা তর-বর বাড়ে না কখন
ফলফুল সমধুর কিছুই ধরে না, অল্প দিনান্তে বৃক্ষের প্রাণও রহে না.
কিন্তু এক মঞ্চ যদি পায় সে আশ্রয়, শাখাপল্লবে প্রতিদিন উন্নত সে হয়।"

—কাল সকালেই একটা মঞ্চ বাঁধা চাই দাদামশা।

—"বিনাশ্রয়ে আঙুরলতা না পারে বাড়িতে, নিতান্তই মরে যায় পড়িয়া মাটিতে—"

—ফলবে তো দাদামশায়!

—নিশ্চয়! "ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল, তবেই সফল সব যদি হয় ফল।"

—মঞ্চ কে বাঁধবে?

—কেন, বাগোয়ান মালী তো আছে—।

অকাণ্ডের কাহিনী

মানুষের অবকাশ কাটানোর কাহিনী কখনো কখনো যেমন বিচিত্র তেমন হাস্যকরও বটে। মানুষের খেয়ালের তো অন্ত নেই—সময় পেলেই মানুষ কাণ্ড যত না করে, তার চেয়ে ঢের বেশী করে অকাণ্ড আর কুকাণ্ড।

হাসির দিকটাই প্রথম ধরা যাক। কিন্তু খুব বেশী হেসো না—পাশের ঘরে বৌদি আছেন, তিনি যেন না শোনেন। তাঁর খেয়ালের একটা অদ্ভুত নমুনা দিয়েই আজকের তাজ্জব কাহিনী সুরু করতে হচ্ছে! আমার এই বৌদিটি বড় ঘরের মেয়ে, সায়েবী ইস্কুলে কলেজে লেখাপড়া শিখেছেন, ফ্যাসন কায়দাতে দুরন্ত। দিবারাত্র একটি পরী সেজে থাকতে ভালোবাসেন, থাকেনও তাই। কিন্তু তাঁর খেয়ালটা কি জানো? পিদিমের আধপোড়া তেলেভেজা বাসি সলতে খেতে তিনি খুব ভালোবাসেন। রাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ উঠে বসেন, তারপর পা টিপে টিপে আস্তে কপাট খুলে ঠাকুরঘরে যান, সেখানে বিগ্রহের সামনের পিলসুজ থেকে আধপোড়া সলতের টুকরো তুলে নিয়ে, তোমরা যেমন লঙ্কার আঁচার খাও, তেমনি খুব আগ্রহভরে খান। কাণ্ডটা অবশ্য তিনি ঘুমের ঘোরেই করেন।

তারপর, আমাদের নামজাদা লিখিয়ে শ্রী——বাবুর সেজদার কাণ্ডটা ধরা যাক। তাঁর একটা খেয়াল, সময় পেলেই যেখানেই থাকুন না কেন, কাগজ নিয়ে তিনি কুটি কুটি করে' ছেঁড়েন। ভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত উকিল, দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি মার্জ্জিত রুচি, বিদ্বান, কিন্তু তা হলে হবে কি তাঁর এই অদ্ভুত খেয়ালে ইতিমধ্যে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি কারো টেবিলে গিয়ে বসলে তাঁর হাতের কাছ থেকে কাগজপত্র সরিয়ে ফেলা হয়। একদিন কোন্ এক উকিলবন্ধুর টেবিলে বসে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি একটা দলিল ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। পুরো একঘণ্টা লেগেছিল দলিল ছিঁড়তে, অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর হুঁস হয়নি। আজকাল তিনি হাত মুঠ করে বেঁধে রাখছেন এবং দুপাটী দাঁতের মাঝে ফাউন্টেনপেন নিয়ে লেখার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই মহৎ চেষ্টা সফল হোক।

বাংলাদেশে অসামান্য প্রতিভাশালী এক গায়ক আছেন—অল্প বয়সেই সারা ভারতবর্ষে তিনি বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তাঁর খেয়ালটা একটু উৎকট রকমের। যতক্ষণ তিনি গান করেন, দিব্যি সভ্যভব্য মানুষ। যেই হার্ম্মোনিয়ম তানপুরো ছেড়েছেন—অমনি আর যায় কোথা! ভদ্রলোক হঠাৎ ছাদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, নিজের দুটো কান আগ্রহভরে

টানতে থাকেন, নাকটা মলতে মলতে রীতিমত ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করেন। উপরি সময় পেলে তাঁর এই রুটিনের আর ব্যতিক্রম হয় না। শোনা যাচ্ছে, তাঁর এই উদ্ভট খেয়ালের জন্যই সমজ্‌দারমহলে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে।

বিখ্যাত ক্রিকেটখেলোয়াড় টেটয়ের অসম্ভব খেয়াল ছিল—খেলার ফাঁকে ফাঁকে আম্পায়ারের কাণে কাণে তিনি কী একটা কথা বলে আসতেন। সকলের মনেই একটা সন্দেহ ছিল, টেট নিশ্চয়ই আম্পায়ারের সঙ্গে কোনো ষড়যন্ত্র করছেন, অন্ততঃ কোনো গর্হিত আলোচনা করছেন! শেষে টেট-য়ের গোপনীয় কথাটা প্রকাশ পেল। টেট আম্পায়ারের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁর বাড়ীতে কোনো কালো বেড়ালের ছানা আছে কিনা! আম্পায়ার প্রতিবারই হেসে বলতেন, না মশাই! কিন্তু সে কথা পাঁচমিনিট যেতে না যেতে টেট বেমালুম ভুলতেন, পাঁচমিনিট পরে বেচারা আম্পায়ারকে কাণে কাণে ফের সেই গোপন প্রশ্ন শুনতে হত—মশাইয়ের বাড়ীতে কালো বেড়ালের ছানা আছে কি না!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত এক অধ্যাপকের খেয়াল ছিল—সময় পেলেই কাণ নাড়ার চেষ্টা করা। ট্রামে, বাসে, সভাসমিতিতে যেখানেই হোক না কেন—স্থান কাল ভুলে তিনি এই অদ্ভুত চেষ্টা করতেন। কাণ ক্বচিৎ নড়ত, কিন্তু কাণ নাড়ার চেষ্টায় মুহুর্মুহু তাঁর বিরাট শরীর দুলে উঠত। পাশের লোকের মনে হত ভূমিকম্প হচ্ছে হয়তো, কিম্বা ভদ্রলোককে হয়তো সিটের তলা থেকে সাপে কামড়েছে। সম্প্রতি হেয়ার ইস্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের একটি ছেলে এই চেষ্টা করছেন শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে ফরাসীবিদ্রোহ হয়—ফ্রান্সে রাজতন্ত্র লোপ পায়, ষোড়শ লুই গিলোটিন হন। এইজন্য ইতিহাসে তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু লুই-য়ের একটা বিকট খেয়াল ছিল—সেজন্যও তাঁর নাম কম বিখ্যাত হওয়া উচিত নয়। লুই অহোরাত্র অধ্যবসায় সহকারে কুলুপ তৈয়ারী করতেন। তাঁর স্ত্রী মারী আঁতিয়োনিয়াতের জন্মদিনে একবার তিনি একটা বিরাট কুলুপ উপহার দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের লুই-য়ের উপর টেক্কা দিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের উকীল শ্রী—বাবু তাঁর একটা খেয়াল, ফুরসৎ পেলেই তিনি ইংলণ্ডের রাজপদের জন্য দরখাস্ত করতেন। তাঁর এই ঘন ঘন দরখাস্তের ধাক্কায়ই পরলোকগত সম্রাট কাহিল হয়ে পড়েছিলেন কি না কে জানে! সম্প্রতি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছু কমেছে বলে প্রকাশ। এবার বাংলার লাটসায়েবের মৃত্যুর পর তিনি একটা লম্বা দরখাস্ত দিয়ে নিজের গুণগ্রাম ব্যাখ্যা করে' ঐ পদটি চেয়ে পাঠিয়েছেন।

তবে সম্ভবত সকলকেই টেক্কা দিয়েছেন—পাড়ার জমিদার শ্রী—বাবু। তাঁর একটা অভ্যাস যখন তখন পকেট থেকে পেনটি বার করে নিয়ে লেখেন, 'আমার মতে তুমি একটি আস্ত

গাধা।' কাগজ পেলে কাগজ, না হলে টেবিলের চাদর, দেয়াল, না হলে সামনের মানুষের মুখের উপর লিখতে কসুর করেন না। সম্প্রতি তাঁর এই মহৎ কাজের দরুণ একটি দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ভদ্রলোক ধনী শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে বিয়ে করেছেন বিষয় আশয়ের লোভে। শ্বশুরকে একদিন ঘটা করে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। খাওয়া দাওয়ার পর শ্বশুর জামাই বসে আছেন, শ্বশুর দুচোখ মুদে আলবোলা ফুঁকছেন। আরামে আলস্যে শ্বশুর মশাইয়ের দুটি চোখ মুদিত। শ্রী—বাবু হঠাৎ অন্যমনস্ক হলেন, কী একটা কথা ভাবতে থাকলেন। তারপর ফাউণ্টেন নিয়ে শ্বশুরের পাঞ্জাবীর গিলে করা আস্তিনায় লিখলেন, 'আমার মতে তুমি একটি আস্ত গাধা!'

তারপর,—শ্রী——বাবুর শ্বশুর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বিন্ধ্যাচলে চলে গিয়েছেন।

—·—

আবদার

শ্রীঅপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত

দোহাই তোমায় মাগো
সুশীল সুবোধ বালক করে
আমায় রেখো নাগো।
যারা শান্ত যারা শিষ্ট
যারা সদাই ভয়ে ক্লিষ্ট
তাদের মত হয়ে থাকতে
আমায় বলো নাগো,
সুশীল সুবোধ বালক করে
আমায় রেখো নাগো।

গোপাল বড় ভাল ছেলে
হাজারেতে একটি মেলে
কারণ সে খায় যা পায় তাহাই
হয় না বাড়ীর বাহির,
করে নাক কভু খেলা
শুধু কেবল সারা বেলা
ঘরের কোণে আপন মনে
পাতা উলটায় বহির।

সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে
ভাবে জুজু পথের ধারে
মুখের বড়াই করি শুধু
সাহস করে জাহির,
সে সব ছেলে এমনি করে
রোগা পটকা হয়েই পড়ে
অমন করে আমায় মাগো
কীট করোনা বহির।

আমায় মাগো লক্ষ্মীছাড়া করে
ছেড়ে দিও মাটির তেপান্তরে।
ছুটব আমি আপন মনে
জুঝব আমি কাঁটার সনে
হব আমি ঝড়ের সাথী
ঝঞ্ঝা সাথে উতাল,
সাগর জলে গহন বেলা
দিব পাড়ি ভাসিয়ে ভেলা
যাব অচিন দেশের পথে
কিম্বা যেথা পাতাল।

শ্বেত ভালুকের দলটি যেথায়
বরফ মাঠে ঘুরে বেড়ায়
আমি মাগো সেথায় যাবো
মেরু দেশের পারে
কিম্বা যেথায় নেকড়েগুলি
সুখেই আছে ভয়কে ভুলি
তাদের মাঝে গিয়ে আমি
ভয় পাবোনা কারে।

যেথায় মাগো সাগর তলে
ডুবুরিরা মুক্তা তোলে
কুমীর হাঙ্গর মারব আমি
চোখের লহমায়,
হিমালয়ের শিখর চূড়ায়
বিদেশীরা নিশান উড়ায়
আমিও মাগো জীবন পণে
উঠব তাহার মাথায়।

আফ্রিকারই হিংস্রবনে
বন্য পশু আপন মনে
খেয়াল ভাবে বেড়ায় ঘুরে
আমি সেথায় যাবো,
নামটি তোমার বিপদ-বারণ,
সেই নামে মোর জীবন সাধন,
লক্ষ্মীছাড়ার সাহস মাগো
তোমার কাছে পাবো।

———*———

দৃষ্টিহারার দেশ

শ্রীমতী পুষ্প চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টিহারার দেশ—অনেকদিনের কথা। পৃথিবী যেখানে ফুরিয়ে যায় যায়, সেই শেষ সীমায় ছিল সেই দেশ, সভ্যতা থেকে অনেকদূরে, পৃথিবীর সকল সম্পর্কের বাইরে। দেশটা ছিল পাহাড়ী; সমুদ্রের কোলঘেঁষা—ফলে ভূমিকম্প হত ঘন ঘন। সেই ভূমিকম্পে একদিন, কবে কে জানে, এই পাহাড়ী দেশের চারপাশের দেশ কেঁপে কেঁপে ধ্বসে গেল, সমুদ্র উঠল ফুলে, ফেণিয়ে ওঠা সমুদ্রের তলায় সমাধি পেল চারপাশের সেই সব দেশ। জেগে রইল শুধু দৃষ্টিহারার দেশ।

একখানা ছবির মত, ফুলেফলে পাখীর গানে ছিল এই পাহাড়ী দেশ—প্রকৃতির স্বর্গ যেন। আর এই স্বর্গকে রক্ষা করবার জন্য দেশের তিনদিকে তিন পাহাড়প্রহরী বসিয়েছিলেন প্রকৃতি। দুর্গের তিনটা বিশাল দেয়ালের মত পাষাণ পাহাড় তিনদিকের আকাশে ভ্রুকুটি করে ছিল দাঁড়িয়ে—একদিকে ছিল শুধু বন, অফুর অসীম গহন দুর্ভেদ্য বন। একদিকের বনের কালো অন্ধকার উঠত আকাশে, আর তিনদিকের আকাশে তিনটে পাহাড়ের অগণ্তি বরফের মুকুট ঝকমক করত—মাঝে মাঝে রোদে আয়নার মত ঝকমকিয়ে এক একটা বিশাল রকমের চাক পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়ত নীচেয়—কোন সুদূর গভীর নীচের কে জানে!

সুখের দেশে হঠাৎ দুঃখ এলো ঘনিয়ে। হঠাৎ দেখা গেল, যে সব ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে, তারা কেউই চোখে দেখে না। শেষে 'অন্ধ' রোগটা ছোঁয়াচে রোগের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, যারা দৃষ্টি নিয়ে জন্মেছিল, তারাও ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে যেতে থাকল। দেশের বুড়োরা তখন মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন—অন্ধের দেশ, দেশ চলে কী করে? কিন্তু তাঁরা মুষড়ে পড়লেন না, অন্ধ ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁরা দেশময় ঘুরে বেড়াতে থাকলেন, দেশের কোথায় কী আছে, কাকে কী বলে, কী দিয়ে কী হয়, কোন্ পথ কোথায় গেছে, কোথায় নদী, ঝর্ণা, ফুলের বাগান, ফলের বর্ণ—অন্ধ ছেলেমেয়েরা একে একে সব শিখে নিলে। এই অন্ধ ছেলে মেয়েরা বড় হল, তাদের বিয়ে হল, ছেলেপুলে হল,—সেই ছেলেপুলেরা যখন চলতে বলতে শিখল তখন তাদের অন্ধরূপ মা তাদের দেশ চিনিয়ে দিলে। এমনি করে চলতে থাকল দৃষ্টিহারার দেশ—কোনো অসুবিধাই আর রইল না। তারা আগের অনেক কিছু ভুলে গেল, চোখ থাকতে যে ক্ষমতা থাকে মানুষের সেরকম অনেক ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেললে; কিন্তু নূতন ক্ষমতা পেল তারা, নূতন ক্ষমতা খাটিয়ে অন্ধের মনের মতন জিনিষ তৈরী করতে থাকল তারা। একটা নূতন সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকল।

অনেকদিন, প্রায় হাজার বছর যখন কেটে গেছে, দৃষ্টিহারার দেশের ইতিহাসে তখন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল—বাইরের পৃথিবী থেকে হঠাৎ একদিন একটি মানুষ এসে সেখানে হাজির হল। লোকটির নাম বাহাদুর। দৃষ্টিহারার দেশে আসবার কাহিনীটা তার অদ্ভুত। পাহাড়ীদেশের মানুষ ছিল বাহাদুর—

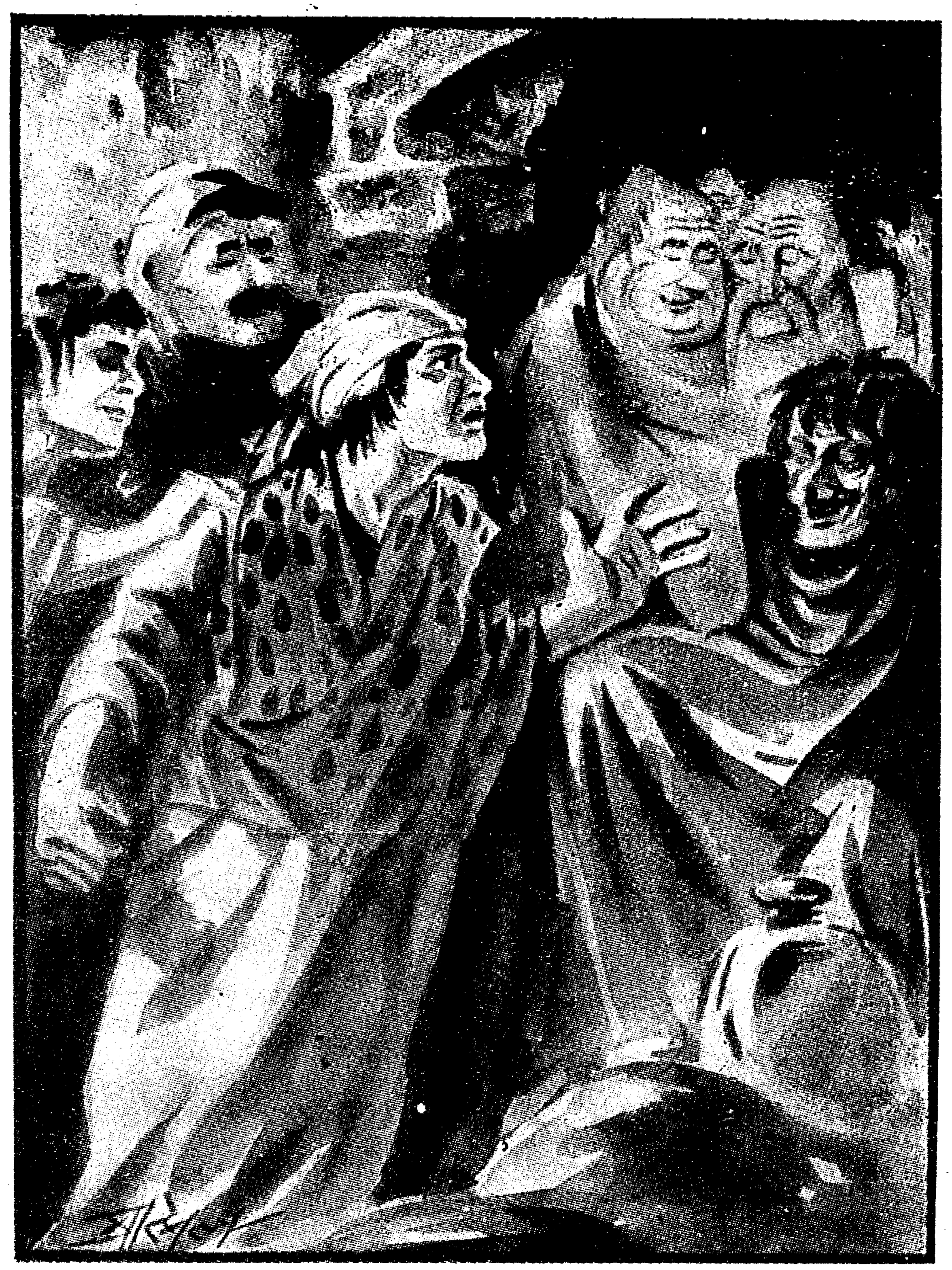

তারপর তারা ওকে নিয়ে—

টিকটিকি যেমন দেয়াল বেয়ে ওঠে, তেমনি সে বেয়ে উঠত পিছল বরফ-ঢাকা পাহাড়। একদল ইংরেজ হিন্দুস্থানে পাহাড় চড়তে এলো। তারা বাহাদুরকে বললে, সঙ্গে চল, মেলা বকশিষ মিলবে। তাদের সঙ্গে বাহাদুর পাহাড় চড়তে এলো। পাহাড়ের উঁচু চুড়ো তাক করে তারা উঠচে—অনেকটা উঠে পাহাড়ের গায়ে একদিন ইংরেজরা তাঁবু ফেললে। রাত নিঝুম, তখন একজন বললে—বাহাদুর কই? তখন কই কই ডাকহাক সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু বাহাদুরের খোঁজ আর হলনা। সকালে দেখা গেল—পাহাড়ের একটা কিনারায় বরফদেয়াল ধ্বসে পড়েছে। সকলে বুঝলে বাহাদুর 'ধ্বসে'র সঙ্গে নিচেয় পড়েছে। কোথায় আর পাওয়া যাবে তাকে? তার শেষ নিঃশ্বাস কখন বেরিয়ে গেছে!

কিন্তু বাহাদুর মরেনি, পাতালেও যায় নি। বরফের পিছল দেয়ালে পা ফসকে সে বরফের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পড়েছে দৃষ্টিহারার দেশে। হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিহারার দেশ, যেখানে 'দৃষ্টির' আর কোনো অর্থ নেই—সেই দেশ ছিল বরফ পাহাড়ের তলায়, বরফের খাড়াই দেয়াল ঢাকা লুকোন কোণে।

পাহাড়ের গা থেকে প্রায় হাজার ফিট নীচেয় গড়িয়ে এলেও বাহাদুর প্রাণে মরলনা—হালকা নরম বরফগুড়োর উপর এসে পড়েছিল সে। শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হওয়ার পর প্রথমটা সে ভাবলে—বুঝি তাঁবুতে বিছানায় শুয়ে আছে। তারপর চারিপাশে তাকিয়ে, ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে। নিজের দিকে তাকিয়ে সে দেখল, কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে গেছে। টুপিটা কোথায় যে উড়ে গেছে, কে জানে? ছুরি আর বরফকাটা কুড়ুলটারও আর পাত্তা নেই। তাহলে—শেষে বাহাদুর স্থির করলো সে নিশ্চয়ই পাহাড় থেকে পা ফস্‌কে পড়ে গেছে। উপর দিকে তাকিয়ে সে দেখল—বিশাল অসীম পর্ব্বত, চাঁদের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। পাহাড় যেন হঠাৎ বড় বেশী উঁচু হয়ে উঠেছে—বাহাদুর পাহাড়কে দেখচে তখন একেবারে পাহাড়ের পায়ে তলায় পাতাল থেকে। নিজের অদৃষ্টের কথা ভেবে, কেমন যেন পাগলের মত হঠাৎ সে হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর সে পাহাড়ের গায়ের একটা ঝরণা থেকে একটু জল খেলো। পরমুহূর্ত্তেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'ল। পাখীর ডাকে তার ঘুম ভাঙ্‌ল। দেশটী তার কাছে ভারী অদ্ভুত পাগ্‌ল। তার মাঝখান থেকে একটী ছোট খাল বয়ে এসেছে, বোধহয় চাষের সুবিধার জন্য। এর দুপাশে বুক পর্য্যন্ত পাঁচিল দেওয়া। বাড়ীগুলি আশ্চর্য্য রকমের পরিষ্কার, আর অন্যান্য পাহাড়ী-দেশের মত এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো করে তৈরী নয়—বেশ লাইন করে বাড়ীগুলি চলেছে। তাতে একটাও জানলা নেই। দরজাগুলো নানারঙে রঙীন। এই অদ্ভুত রঙের সংমিশ্রণ দেখে "অন্ধ" কথাটি বাহাদুরের প্রথম মনে হ'ল। সে ভাব্‌ল, যে লোকটী এইগুলি করেছে সে নিশ্চয়ই অন্ধ। নেমে এসে বাহাদুর দেখল, কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীলোক ও শিশু। কিছুদূরে তিন-জন লোক কাঠের বস্তা বয়ে চলেছে। তাদের গায়ে রয়েছে নানা জন্তুর চামড়ার তৈরী পোষাক আর পায়ে সেই চামড়ার জুতো। বাহাদুর তাদের দেখে, নিজের অস্তিত্ব তাদের কাছে জানবার জন্য প্রচণ্ড একটা হাঁক দিলে। লোক তিনটে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো কোথা থেকে শব্দটা এলো। কিন্তু তারা বাহাদুরের হাত পা নাড়া কিছুই দেখতে পেলো না—এবং সে যেদিকে ছিলো তার সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে ঘুরে চীৎকার করে উত্তর দিলো। বাহাদুর তারপর আরও দুবার চীৎকার করল,

ইসারা করল। তার ইসারা করা সম্পূর্ণ বৃথা হ'ল। তখন আবার তার একটা কথা মনে হল—"অন্ধ"। ঐ লোকগুলো নিশ্চয় অন্ধ! সে ভাবল এইটী নিশ্চয় "দৃষ্টিহারার দেশ", যে আশ্চর্য্য দেশের গল্প তারা ছোটবেলা থেকে শুনে আস্‌ছে। তখন তার মনে বেশ একটা 'অ্যাডভেঞ্চারের ভাব এলো। লোক তিনজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল না বটে কিন্তু তাদের কানগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলো, কারণ তারা তার পায়ের শব্দে বুঝেছিলো যে এ নিশ্চয়ই নতুন লোক। তাদের মুখ দেখে তারা যে ভয় পেয়েছে, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। একটি অন্ধ বল্‌ল, "এ নিশ্চয়ই একটা লোক কিংবা ভুত; ঐ পাহাড়ের উপর থেকে এসেছে।" কিন্তু বাহাদুরের মনে পড়ছিল দৃষ্টিহারার দেশের সমস্ত কথা। তার মনে হ'ল—একটা পুরোণ প্রবাদ, "দৃষ্টিহারার দেশে একচক্ষু-বিশিষ্ট লোকই রাজা।"

সে বেশ ভদ্রভাবেই তাদের নমস্কার জানালো।

প্রথম অন্ধ দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করল, "হাঁ ভাই, ও কোত্থেকে আস্‌ছে?"

—"পাহাড় থেকে।"—দ্বিতীয় লোকটী বল্‌ল।

বাহাদুর বল্‌লো, "দৃষ্টিহারার দেশের বাইরে যেখানে মানুষ দেখতে পায়—পাহাড়ের ওপারে সেই দেশ থেকে আমি আসছি।

তারা বল্‌ল, "দেখতে পায়? সে আবার কি—?"

বাহাদুরের সমস্ত গায়ে তারা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল। তার চোখের উপর তারা বার বার হাত বোলাতে লাগল, কারণ ওটা তাদের কাছে বড় আশ্চর্য্য লাগল। বাহাদুর চোখের উপর হাত দিয়ে চেঁচাতে লাগ্‌ল,—"আস্তে আস্তে।" তারা বল্‌তে লাগল "এটা ভারী অদ্ভুত জন্তু!" তাদের হাত থেকে ছাড় পাবার জন্যে বাহাদুর কিছুক্ষণ চেষ্টা করল—কিন্তু তাতে কী লাভ! ওরা তাকে শক্ত করে ধরেচে। ওদের মধ্যে তৃতীয় লোকটী বলল, "দেখো; এটা কথা বলছে, নিশ্চয়ই এটা মানুষ!" প্রথম অন্ধ বল্‌লে, "তুমি এসেছ আমাদের এই পৃথিবীতে?" বাহাদুর বল্‌ল, "পৃথিবীর বাইরে থেকে পাহাড়ের ওপারের প্রকাণ্ড পৃথিবী থেকে এসেছি।" দ্বিতীয় অন্ধ বল্‌ল, "চল, একে আমরা আমাদের বুড়োদের কাছে নিয়ে যাই।" তারা যাবার আগে খুব খানিকটা চেঁচামেচি করে সকলকে সাবধান করে দিল, তারপর বাহাদুরের হাত ধরে নিয়ে চলল। বাহাদুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি, হাত ধর্‌তে হ'বে না।"

তৃতীয় অন্ধ বল্‌ল, "দেখতে পাচ্ছ, মানে? লোকটার দেখছি এখনও ঠিক জ্ঞান হয়নি। এমন সব বোকার মত কথা বল্‌চে! ওকে হাত ধরে নিয়ে চল্‌।" বাহাদুর হেসে বল্‌ল, "বেশ তাই হোক্‌।"

মনে হ'ল, দৃষ্টি সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না। বেশ তো, সময় হ'লেই বাহাদুর তাদের শিখিয়ে নেবে। অনেকগুলি লোক চীৎকার করতে করতে এসে জড় হ'ল। সকলে তাকে ঘিরে তার গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। প্রথম তিনটী লোক তাকে একেবারে চেপে ধরল (কারণ তাদের মনে তার উপর একটা দাবী জেগে উঠেছিল,—তারাই তো প্রথম তাকে আবিষ্কার করেচে) আর ক্রমাগত বলতে লাগল "পাহাড়ের ওপারের বুনো লোক।"

বাহাদুর বলল, "পাহাড়ের ওপারে বিরাট দেশ, সেখান থেকে আমি আসছি।"

প্রথম অন্ধ বলল, "ও একটা বন্য লোক, যত সব বাজে বক্‌ছে। ওর মনটা এখনও শিশুর মত, ঠিক তৈরী হয় নি। সবেমাত্র কথা বল্‌তে স্থরু করেছে বোধ হয়।"

বাহাদুর কিন্তু বলে চলেছে, "হ্যাঁ, বিরাট দেশ—কত—প্রকাণ্ড—এ তো তোমাদের একটা ছোট্ট গ্রাম! সেখানে কত লোক, তাদের চোখ আছে, তারা দেখতে পায়।"

তারপরে তারা ওকে নিয়ে বুড়োদের ঘরে ঢুক্‌ল। ঘরটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার; ঢুক্‌তে গিয়ে বাহাদুর খেলো আছাড়, আর পড়লো গিয়ে কার একটা পায়ের তলায়। অনেকগুলো হাত তার দিকে এগিয়ে এলো। সে উঠতে পারে না বল্‌ছে, "আমি পড়ে গেছি। কি অন্ধকার—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।" একজন বল্‌ল, "ও খুব অল্পদিন আগে জন্মেছে, এখনও ভাল করে কথা বলতে পারে না।" বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বলল, "আমি উঠতে পারি?" তারা খানিক্ষণ ধরে পরামর্শ করে তাকে উঠবার অনুমতি দিল। একজন বৃদ্ধ তাকে প্রশ্ন কর্‌তে আরম্ভ করল। বাহাদুর সেই দৃষ্টিহারার দেশের অন্ধকার ঘরের বাসিন্দাদের এই বিশাল বিশ্বের কথা যতদূর সম্ভব বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তার অনেক কথাই তারা বুঝতে পারল না। কারণ শত শত বৎসর পূর্ব্বে এই দৃষ্টিহারার দেশ সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। বাইরের পৃথিবীর কথা তাদের কাছে এখনও ছেলেমানুষের গল্প—তাদের এই ছোট্ট দেশই এখন তাদের কাছে পৃথিবী। এখানেই তাদের মধ্যে দার্শনিকেরা জন্মেছে—যারা অনেক গবেষণার পর স্থির করেচে যে ঐ সব গল্প মিথ্যা—সত্যি হ'চ্ছে এই দেশ। তাদের চোখের অভাবে তাদের কান এবং স্পর্শ প্রায় চোখের মতই সজাগ হয়ে উঠেছে। কাজেই বাহাদুর "দৃষ্টি" বোঝাবার জন্য যতই চেষ্টা করতে লাগল ততই তারা তাকে বুদ্ধিহীন, বন্যলোক বল্‌তে লাগল।

সেই বুড়ো লোকটী তখন তাকে বোঝাতে লাগল যে এই দেশ প্রথমে পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্ত্ত ছিল। ক্রমে এখানে প্রাণহীন বস্তু সব এল। তারপর এল প্রাণবন্ত জন্তু জানোয়ার এবং এল মানুষ। অবশেষে এল সব দেবতা। তারা গান গায় সুন্দর কিন্তু কেউই দেবতাদের ধরতে পারে না। শেষের কথাটা বাহাদুরের কাছে বড় আশ্চর্য্য ঠেকেছিলো, কিন্তু সে যখন ভাবল পাখীদের কথা, তখন বুঝ্‌ল যে পাখীরাই হচ্ছে এদের দেবতা—সেইজন্য তারা গান গায়, কিন্তু ধর্‌তে তাদের পারে না কেউই।

বুড়ো বলল আরও অনেক জ্ঞানের কথা, এবং অবশেষে অভিমত প্রকাশ করল যে, বাহাদুর নিশ্চয়ই এই সব শিখে' তার বোকামী ভুল্‌বে। বাহাদুরকে উপদেশ দেওয়া শেষ হ'লে, সকলে ঘুমোতে চল্‌ল—কারণ দিনের বেলা গরমেতে ঘুমোতেই এদের আরাম, চোখে আলো লাগবার ভয় নেই। রাত্রে ঠাণ্ডায় এরা কাজ করে।

চারদিন কাটল; পাঁচদিনের দিন দৃষ্টিহারার দেশের ভবিষ্যৎ রাজাকে তাদের প্রজাদের কাছে ছদ্মবেশে দেখা গেল।

অন্ধলোকগুলি শ্রমিকজীবন যাপন করত। তাদের আহার বিহারের কোন অসুবিধা ছিল না; দরকার হ'লেই তারা বিশ্রাম করতে পারত, আর গান বাজনা করে আনন্দ উপভোগ করতো। তাদের শোনবার শক্তি আশ্চর্য্য রকমের। দূরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা যেন তার হৃৎস্পন্দন পর্য্যন্ত শুন্‌তে পেত! ঘ্রাণশক্তিও ওদের তীব্র; কুকুর যেমন গায়ের গন্ধ পেয়ে মানুষ বোঝে, ওরাও তেমনি প্রত্যেকের পৃথক গায়ের গন্ধ বুঝতো এবং সেই অনুসারেই মানুষ চিনত।

বাহাদুর প্রথমে তাদের দৃষ্টি যে কি বস্তু তাই বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু দু একবার শুনেই ওরা হেসে উড়িয়ে দিল, বল্‌ল, "ও সব বাজে কথা। দেখতে পাওয়া মানে কি?"

বাহাদুর তখন প্রকাণ্ড পাহাড়, সীমাহীন আকাশ আর উজ্জ্বল সূর্য্যের কথা তাদের বলল—কিন্তু সেও তারা শুনল না, তাদের মতে পাহাড় বলে' কিছু পৃথিবীতে নেই—ঐখানে যেখানে লামা জন্তুরা চরছে ঐ হ'ল পৃথিবীর শেষ। উপরে একটা ছাদ আছে, তাই থেকে শিশির আর বরফের টুকরো পড়ে। সূর্য্য বা চাঁদের দুটোই তাদের কাছে অবিশ্বাস্য। যারা বাহাদুরের কাছে বসে' তার কথা শুনত—যদিও মানত না—তাদের ভিতর একটী সুন্দরী মেয়ে ছিল—সে যেন একটু বিশ্বাস করতো বাহাদুরের কথা। বাহাদুর তাকে খুব ভালবাসত—প্রতিদিন তাকে দেখে দেখে সে তার নাম জেনে নিল, তার বাবার সঙ্গেও পরিচয় করল এবং একদিন তার বাবাকে বলল মেয়েটীর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। মেয়েটীর বাবা কিন্তু রাজী হ'লেন না—কে একটা বন্য বর্ব্বর লোক, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি! কিন্তু মেয়েটীরও বাহাদুরকে ভাল লেগেছিল, সে বাবার কাছে কান্নাকাটি সুরু করে দিল। তার বাবা তখন দেশের বুড়ো লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল যে, যদি বাহাদুর তার মুখের উপরের অদ্ভুত জিনিষ দুটী ডাক্তারের কাছে কাটিয়ে নেয়, তবেই তাদের বিবাহ হবে। কারণ ডাক্তারের মতে ঐ দুটো জিনিষই (অর্থাৎ বাহাদুরের চোখ দুটো) বাহাদুরের সাধারণ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—এবং ও দুটো কেটে ফেললেই বাহাদুর তাদের মত জ্ঞানী হয়ে উঠবে।

বাহাদুরকে কিন্তু রাজী করান শক্ত হল। মেয়েটী তার কাছে এসে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং অবশেষে তারই জয় হ'ল—বাহাদুর রাজী হ'ল! চোখ কাটার দিন ঠিক হয়ে গেল—কিন্তু নির্দ্ধারিত দিনের একসপ্তাহ পূর্ব্ব থেকে বেচারী বাহাদুর ঘুম কাকে বলে তা ভুলে গেল। সকলে যখন দিনের আলোয় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতো, সে তখন উদ্দেশ্যহীনভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াতো এবং তার এই উভয় সঙ্কটের মীমাংসা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠত।

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে এক একদিন তার মনের ভিতর জেগে উঠত, সেই বিশাল বিশ্বের ছবি, যেখান থেকে সে এসে পড়েছে, এই অন্ধদের দেশে। সে ভাবল, হয়তো এই পাহাড় বেয়ে উঠে আবার সেখানে গিয়ে পৌছবে সে একদিন, যেখানে আছে দৃষ্টির আলো। সে পাহাড়ে উঠতে উঠতে ফিরে দেখল—মনে পড়ল তার সেই মেয়েটীর কথা, কিন্তু সে তখন তার কাছে থেকে চলে গেছে অনেক দূরে—এবং অনেক ছোট হয়ে গেছে তার এই ঈশ্বরদত্ত দৃষ্টির কাছে!

সে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। সূর্য্য তখন ডুবে গেল। এর মধ্যেই সে চলে এসেছে অনেক ওপরে, দৃষ্টিহারার দেশ থেকে অনেক দূরে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, হাত-পা রক্তাক্ত, সে শুয়ে পড়ল—তার মুখে একটু মিষ্টি হাসি, যেন বড় আরামে রয়েছে!

অস্তমিত সূর্য্যের শেষরশ্মি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। কিন্তু বাহাদুর তখনও শুয়ে রয়েছে—সেই তারাভরা আকাশের নীচে—মুখে তার অপূর্ব্ব শান্তিময় মৃদু একটু হাসি।

H. G. Wells—'The Country of the Blind'এর অনুবাদ

সত্যি নাকি?

'পান্থপাদপ'এর নাম শুনেছ? এরা একরকম বৃক্ষ; দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি এরা দারুণ গ্রীষ্মে ক্লান্ত পথিকদের পিপাসা নিবারণ করে। কোথাও হয়ত এক ফোঁটা জল নেই কিন্তু এই গাছগুলির ডাঁটা কাটলেই ঝুরঝুর করে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যায়! দূর থেকে ময়ূরপুচ্ছের মত এদের ডাঁটা ও পাতা ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত গাছগুলি প্রথম পাওয়া যায় 'ম্যাডাগাস্‌কারে'এ—পরে তাকে ভারতবর্ষে এনে তার চাষ করা হয়।

*   *   *   *

খুব গরমের সময় আমরা নাকি ওজনে বেড়ে যাই! শীতের সময় ওজন নিয়ে হয়ত দেখা গেল, কারুর ওজন হল চল্লিশ সের—তারপর খুব গরমে তাকে ওজন ক'রে দেখা গেল, অন্ততঃ সে একছটাক বেড়ে গিয়েছে। আমরা জানি, গরমে জিনিষপত্র বাড়ে, তা'হলে কি আমাদের শরীরের ওজনও ঐ মাপে বাড়ে নাকি! কিন্তু শীতে আমরা ওজনে কমে যাই কি না সেকথা কেউ আমাদের জানায় নি।

*   *   *   *

হিসাব করে দেখা গিয়েছে, যে গড়ে এক মিনিট সময়ে পৃথিবীর ওপর সূর্য্যের যে আলো এসে পড়ে তাকে যদি কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা যায়—তা'হলে পৃথিবীর একবছরের উপযোগী যা আলো উত্তাপের দরকার, সূর্য্যের একমিনিটের সেই আলোই তা যোগান দিতে পারে।

চলন্তিকা

এ মাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা—মহাত্মা গান্ধীর যুদ্ধজয়। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব মহাত্মার তপস্যার সম্মুখে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছেন।

ব্যাপারটা মোটামুটি এই: ঠাকুরসাহেব প্রজাদের শাসনসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে একটা চুক্তিপত্র খসড়া হয়, ঠাকুরসাহেব কয়েকটা সর্ত্ত মেনে নিতে রাজী হন। হঠাৎ ঠাকুরসাহেব কথা ফিরিয়ে নেন, রাজকোটরাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী এই সময়ে নিজে রাজকোটরাজ্যে গিয়ে হাজির হন। স্বচক্ষে স্বকর্ণে সকল ব্যাপার দেখে শুনে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, যে ঠাকুর সাহেব মিথ্যাচরণ করছেন। মহাত্মা ঠাকুরসাহেবকে দু'একবার ব্যর্থ অনুরোধ করে শেষে অনশনব্রত আরম্ভ করেন। যতক্ষণ না ঠাকুরসাহেব প্রতিশ্রুতি রাখতে রাজী হন, তিনি উপবাসী থাকবেন। অবশেষে পাঁচদিনের দিন ঠাকুরসাহেব হার মানতে বাধ্য হয়েছেন।

মহাত্মার এই অনশনব্রত সম্বন্ধে এবার অনেক কথা উঠেছে। অনেক বুদ্ধিমান লোক বলেন, একি অন্যায় কথা! উপবাস করে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করা, এতো রীতিমত যুদ্ধ! এর চেয়ে ঢাল তলোয়ারের যুদ্ধ ভালো। তাতে প্রতিপক্ষের জিতবার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এই উপবাসের ব্যাপারটা—'তুমি একাজ করো, নয়তো না খেয়ে মরব।' ভয়ে ভয়ে অপরপক্ষ হার মানতে বাধ্য হন। তিনি প্রথম হতেই হেরে বসে আছেন।

যাঁরা এই ধরণের তর্ক করেন, তাঁদের বুদ্ধি যতটাই থাক, গভীর জ্ঞান একেবারেই নেই। 'আমাকে খেলনা দাও, না হলে আমি না খেয়ে মরব'—মহাত্মার উপবাস এই রকমের একটা ছেলেমানুষী নয়। মহাত্মা উপবাস করেন আত্মার ইঙ্গিতে, প্রতিপক্ষকে অসত্য হতে সত্যে ফিরিয়ে আনতে। মহাত্মা সামান্য মানুষ নন। সাধনায় তিনি জীবনের অনেক রহস্য জেনেছেন। আমরা যেমন মোটরের ভেঁপু, পাখীর গান কাণে শুনতে পাই, তেমনি তিনি আত্মার বাণী শুনতে পান। কোনটা সত্য, তা তিনি তাই এত সহজে বোঝেন। যখন তাঁর

মনে হয় কেউ মিথ্যাচরণ করছে, অন্যায় করছে তখন তাকে তিনি মিথ্যা ও অন্যায়ের হাত হতে মুক্ত করতে চান।

কী করে? ঢাল তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে নয়। তিনি জানেন, ঢাল তলোয়ার দিয়ে মানুষ খুন করা যায়, ভয় দেখানো যায়, কিন্তু মিথ্যা দূর করা যায় না। কারো মনের মিথ্যা দূর করতে হলে, তার মনের সত্যকে জাগাতে হবে। সত্য জাগানো যায় তপস্যায়। তপস্যার অর্থ আর কিছু নয়—ঈশ্বরকে একমনে ডাকা এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কষ্ট সহ্য করা। মহাত্মার উপবাস এই রকমের তপস্যা। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি শরীর পাত করতে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের উদ্দেশে একান্তে প্রার্থনা করছিলেন। সবকিছুই করছিলেন ঠাকুরসাহেবের মঙ্গলের জন্য, তাঁকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার জন্য। ঠাকুরসাহেব সত্য ফিরে পেয়েছেন। সত্য ফিরে পাওয়ার পর এখন প্রজাদের মঙ্গল তিনি অনায়াসে করতে পারবেন। যে সত্যে অটল থাকে, পরের মঙ্গল করার শক্তি তার হয় অসীম।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হয়েছে। বিষ্ণুদত্তনগর স্বপ্নপুরীর মত আলোক-মালায় সেজেছে। যেখানে ছিল নির্জ্জন প্রান্তর সেখানে এখন মানুষের হাট বসেছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে এবার নবীন আর প্রবীনে বেধেছে সংঘাত। নবীনরা অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁরা বলছেন, চল চল। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল।' প্রবীণরা বলছেন, 'চলতে কে তোমাদের মানা করে বাপু! তবে একটু আস্তে, হোঁচট না খাও। তাছাড়া হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে তো, ভুলপথ ধরলে খামোকা হায়রাণ হতে হবে। প্রবীণেরা দলে ভারী, কিন্তু নবীনদের রক্ত গরম। যাহোক শেষটা জিতবেন প্রবীণরা। চিরকাল তাঁরা জিতে এসেছেন, অভিজ্ঞতার পরম ঐশ্বর্য্য তাঁদের আছে। কিন্তু নবীনদের হারালে চলবেনা। প্রবীণদের বুদ্ধিতে শক্তি দেবেন তাঁরা। তাঁরাই কথায় আগুন ধরাতে পারেন। আলস্য যদি কখনো প্রবীণদের এসে ধরে. নবীনরাই ঠেলে জাগাতে পারেন তাঁদের। আমাদের একান্ত প্রার্থনা, মন্ত্রণাসভার জন্য প্রবীণদের রেখে চিরনবীন মহাত্মা গান্ধী নবীনদের অধি-নায়ক হয়ে যুদ্ধজয়ে বার হোন। মহাত্মাকে সেনাপতি পেলে নবীনরা অচিরে লড়াই ফতে করবেন।

ইংলণ্ড ফ্রান্স একে একে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্বতন্ত্ররাজ্যের অস্তিত্ব মেনে নিলে গণতান্ত্রিকরা ক্রমশই হটে যাচ্ছে। এই দলের পাণ্ডারা একে একে ইউরোপের নানাস্থানে

আত্মরক্ষার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, বিদ্রোহীরা রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। স্পেনের বেশ খানিকটা তাহলে আবার রাজার দেশ হবে। কে জানে সবটাই পুরোপুরি বিদ্রোহীদের মুটোয় এসে পড়ে কি না। মুসোলিনীর বুদ্ধিবল আর বাহুবলের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমরা পেয়েছি। তাঁর সাহায্যে বিদ্রোহীরা সারা স্পেনটাই দখল করে বসলে কেউ বিস্মিত হবে না। কিন্তু তারপর?—জেনারেল ফ্রাঙ্কো তো মুসোলিনীর হাতের পুতুল! স্পেনের বিদ্রোহী নরনারী, যারা এখন ফ্রাঙ্কোর পতাকা হাতে নিয়ে প্রাণপণ লড়ছে, তারা কি খুব বেশী দিন ইটালীর খবরদারি সহ্য করবে?

হিমালয় ক্রমশই মাথা তুলছেন। অবশ্য এখনও খুবই ধীরে ধীরে, তিলে তিলে। কিন্তু সে যাহোক, হিমালয়ের এই মাথা তোলা ব্যাপারটাই বৈজ্ঞানিকদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। হিমালয় যদি সত্য সত্যই ক্রমশই উঠতে থাকে, তবে সেই আকর্ষণে বিরাট ভূমিকম্প হয়ে উত্তরভারতের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—কে জানে হিমালয়ের আকর্ষণে মাটি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে কি না, হিমালয়ের টানে সারা ভারতবর্ষ হয়তো ফেটে একখান হয়ে হিমালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বসে পড়বে। এখন যেখানে আজ ভারতবর্ষ হয়ত সেখানে মহাসমুদ্র ধেয়ে আসবে।

রঞ্জিট্রফির শেষখেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব বাংলাদেশের কাছে ১৭৮ রাণে হেরেছেন। প্রথম ইনিংসে বাংলার সকলে মিলে রাণ তোলেন ২২২। দক্ষিণপাঞ্জাব রাণ তোলেন ৩২৮, এক উজির আলী নট্ আউট থেকে, করেন ২২২। ২য় ইনিংসে কিন্তু দক্ষিণ পাঞ্জাব ১৩৪ রাণে সকলে আউট হয়ে যান, বাংলার রাণ সংখ্যা কিন্তু ৪০০ ছাড়িয়ে যায়। দক্ষিণ পাঞ্জাব মোটেই ভালো খেলতে পারেন নি, অমরনাথ ও আমির ইলাহি ভালো বল দিয়েছেন, কিন্তু অমরনাথের ব্যাটিং তাঁর প্রতিভা ও সুনাম কলঙ্কিত করেছে। বাংলার পক্ষে কে ভট্টাচার্য্য, বেরেণ্ড ও জে এন ব্যানার্জ্জি চমৎকার বল করেছেন, ভ্যাণ্ডারগুট্, ম্যালকম, মিলার, কে বোস, জব্বর ভালো ব্যাট করেছেন। এই খেলায় সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিষ—উজীর আলির ২২২ নট আউট।

সম্প্রতি একটি নতুন ধুমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে। তুজন বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর তুই প্রান্ত

থেকে একই সময়ে এই ধুমকেতুটি দেখতে পেয়েছেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদ ধুমকেতুটি দেখতে পেয়েছেন আমেরিকা থেকে, আর একজন এক প্রফেসর দেখতে পেয়েছেন মধ্য এসিয়া থেকে। সাব্যস্ত হয়েছে যে, মধ্য এসিয়া থেকে প্রফেসর ধুমকেতুটি আগে দেখেছেন কারণ মধ্য এসিয়াতে আমেরিকার দশ ঘণ্টা আগে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মধ্য এসিয়া থেকে ধুমকেতুকে দেখা গেল কুয়াসাচ্ছন্ন একটা রংএর মত ও পুচ্ছ দেওয়া এবং আমেরিকা থেকে তাকে দেখা গেল একটা আলোক রেখার পথে উজ্জ্বল গোল আলোর মত।

সামনে গুড্‌ফ্রাইডে ছুটির দরুণ ঈস্‌টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তোমাদের কাছে তাঁদের কন্‌সেসন্ ভাড়ার কথা জানাতে অনুরোধ করেছেন। রংমশালে তাঁদের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। দেশ ভ্রমণের আনন্দ ও শিক্ষা চিরকালের; তারপর স্কুল কলেজের ছুটি ও আমাদের রেল কোম্পানীদের সে ছুটিতে কন্‌সেসন্ দেওয়ার এই উদারতা—দেশ ভ্রমণের এই সুযোগগুলি ছাড়া উচিৎ নয়। ই. বি. রেলওয়ে আর একটি নতুন রকমের সুযোগও দিয়েছেন—'অবাধ ভ্রমণ টিকিট'—যাতে করে, যেখানে খুসী যাওয়ার, যেখানে যতবার ইচ্ছে ওঠা নামার কোন বাধা নেই অর্থাৎ অবাধ গতি।

হাসির টুক্‌রো

মণ্টু, তুই একটা গাধা!

—ভাল হবে না, আমাকে গাধা বোলো না বলছি!

—বেশ, তোকে গাধা বলব না, কিন্তু গাধা দেখলে তাকে 'মণ্টু' বলব!

* * * *

এই মিনু, বেরাল ছানাটার লেজ ধরে অমন টানছিস কেন, দুষ্টু?

—বারে বেশ ত! আমি টানছি কোথায়? আমিতো শুধু লেজটা ধরে আছি, বেরাল ছানাটাই ত টানছে!

* * * *

রুনু, তোমার প্রবন্ধটা খুব ভাল হয়েছে, ঠিক—মিঃ জন্‌সনের লেখার মত। আচ্ছা এ থেকে আমি কি ধারণা করব?

—মিঃ জন্‌সনের লেখাও খুব ভাল—মণ্ট উত্তর দিলে!

পরিচালিকা——দিদিভাই

আমার সোনার ভাই বোনেরা!

ক্লান্ত পথিক এসে থেমেছে পথের শেষে! পিছন পথে ফেলে এসে অনেক হাসি, অনেক কথা অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি। বর্ষ পথিক থেমেছে তার বিদায় পথের প্রান্তে।

ম্লান হাসি আর আনন্দ উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত এসেছে পৃথিবীতে।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) ৮৩৩

বাণীভাই! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখি সত্যিই আমায় ধাঁধাঁয় ফেলেছ—তাই তোমার ভাই বোনদের এ ধাঁধাঁর উত্তর দিতে বলছি। বাণী লিখেছে, "দিদিভাই, বলতে পারো রংমশাল এলে আমরা প্রথম দিক থেকে না দেখে কেন শেষের দিক থেকে দেখতে আরম্ভ করি?" ভাইবোনেরা উত্তর দিয়ে দিও—সম্ভবতঃ এ ধাঁধাঁয় বাণী পুরস্কার ঘোষণা করেছে। কি বল বাণী? খুকু! তোমাদের গল্প ও ব্যাঙের পাতার কবিতা 'কেলোর কর্ত্তামী' পেয়েছি—এ সম্বন্ধে পরে জানাব ভাই কেমন? সুজাতা রক্ষিতের খবর আমিও তো পাইনি অনেকদিন—সে বাড়ী চলে এসেছে জানতাম—কিন্তু অনেকদিন তার খবর না পেয়ে আমিও চিন্তিত হয়েছি। বাণী! তুমি সতী মৈত্রকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাওনি বলে খুব দুঃখিত হয়েছো, সতীর কোনও খবর জানি না—সুতরাং বিশেষ কিছু বলতে পারছি না ভাই যদি খবর পাই জানাবো।

আনোয়ারা বেগম (কলিকাতা) ১১০৯

আনু বোনটী! তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেয়ে খুসী হলাম। তুমি শেষে ঐ মিথ্যের বোঝাটা আমার ঘাড়ে চাপালে? ভাইবোন অনেক পেয়েছি সত্য কিন্তু ভুলিনি কাউকে—তাছাড়া গত-

পূর্ব্ব বারে আমি তোমাদের কয়েক জনের নাম করায়—যাদের করিনি তারা তো অভিমানে অস্থির। তুমি যদি নিয়মিত পড় ভাই তাহলে কেন একথা বল্লে? তোমরাই তো দিদিভাইকে ভুলে থাকো। এবার কিন্তু আমি রাগ করবো সত্যি বোনটী! যাইহোক এবার থেকে নিয়মিত চিঠি দেবে। অভিমান যখন এবার দুপক্ষেরই তখন এবার 'ভাব' কেমন? তোমার দিদিমা যে চিঠি দিয়েছেন পেয়েছি—উত্তর দিচ্ছি।:—

'ছোটবোন' (কলিকাতা) ১১০৯

আপনি ছোটবোন বলে লিখলেও আপনি যখন আমার দিদিমা তখন আমাদের সকলেরই দিদিমা। এ আসরে আমাদের ঠাকুমা (অজয়ের ঠাকুমা) আছেন—দিদিমাকে পেয়েও আমি ও আমার ভাইবোনেরা খুব খুসী হবো। হলেই বা বয়স ৫৬ বছর তার জন্য কি! নিশ্চয়ই আপনি রংমশালের ব্যাজ নেবেন এবং রংমশালের আসরে আর সব কিছু আনন্দোৎসবে যোগ দেবেন। আপনি জিজ্ঞাসা করছেন আমি নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে ছোট সুতরাং দিদিভাই হবো কিনা? আমি বয়সে বড় কি ছোট তা জানিনা তো তবে দিদিভাই আমি হবো এ নিশ্চয়ই, আর আমার ভাইবোনরাও ভাই বোন হবে।

মণিমালা (ভবানীপুর) ৫৭৭

তোমার সুন্দর কবিতায় চিঠি পেয়েছি। ভারী ভাল লাগলো, ইচ্ছা করছে কবিতায় উত্তর দিই কিন্তু আমি যে কবিতা লিখতে পারি না। তবে আমার কাছে তোমার ঠাঁই নেই বলে যে অভিযোগ করেছ তা কতখানি সত্যি তা তুমি কি জান না মণি? লক্ষীমালা, অভিমান করো না—তোমার দিদি-ভাইকে ভুলে থেকো না ভাই কেমন? তোমার শেষ লাইনের আড়ি, আড়ি, আড়ি'র উত্তরে আমি বলছি ভাব, ভাব, ভাব।

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৬৬

যে কথার উত্তর না পেয়ে রাগ করেছ ভাই—সেকথা তোমাদের সকলকে তো বলা আছে, তাই বার বার এককথা বলিনি ভাই, তোমরা তো জানো 'তুমি' বল্লেই আমি বেশী খুসী হই। তোমরা স্কুল থেকে সব টাটানগর ঘুরে এলে কেমন লাগলো ভাই সব লিখো। প্রভাত দে ও জ্যোতির্ম্ময় মুখার্জ্জির ঠিকানা তোমায় পাঠালাম।

নীরেন্দ্র নাথ রায় (আঠারোবাড়ী) ১১৮৮

তোমার প্রথম কথার উত্তর তরুণ ভাইটীর চিঠিতে আছে। তোমরা যা রচনা পাঠাও তা সব সম্পাদক মহাশয়ের কাছে দেওয়া হয়, তিনি মনোনীত করলেই যথা সময়ে যোগ্যস্থানে যাবে।

গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) ১১৮৩

তোমার সুখবর পেয়ে আনন্দিত হলাম। তবে তুমিও কলম্বাসের মত ভুল করেছ। কলম্বাস

ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করে বলেছিলেন—'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করছি।' তোমার উক্তিও ঠিক তাঁর মত।

তুমিও রবীন-মিত্রের মত ম্যাট্রিক ক্লাশের ছেলের পড়বার মত বই-এর নাম চেয়েছ—আমি পাঠাবো। আলোচনা সভার কথা বলবো কর্ত্তৃপক্ষকে। গল্প দিয়েছি।

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউ দিল্লী)

খুকু! তোমার পরীক্ষা এতদিনে হয়ে গেছে নিশ্চয়? কেমন হলো জানিও। ভালই হবে নিশ্চয়। হ্যাঁ ভাই আশীষ তো নিশ্চয় করবো, করছিও। তোমরা 'মানুষ' হও বলিষ্ঠ মন নিয়ে। তুমি লিখেছ 'কল্পনা বোনটী ঠিক বলেছে, বানীসেন দিদির ঐ শাস্তি হওয়া উচিত, তাকে বলো আমাদের সন্দেশ পাঠাতে।' খুকু! তোমাদের সকলের মত একদিকে দেখে বাণী একেবারে ফেরার—কারণ বোধহয়—তার দিদিভাই ও ভাইবোনদের সন্দেশ দিতে গেলে সে ফেল হয়ে যাবে, দেখছ না সেই তারপর থেকে বাণীর একেবারে পাত্তা নেই। শিবানী সরকার আর কল্পনা অঞ্জলির ঠিকানা তোমায় পাঠালাম।

পিণ্টু রাণী মিণ্টু রাণী ও সুরথ বসু (চুঁচড়া) ১১১৮

তোমরা যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাচ্ছি। মিণ্টু! তোমার সব ভাইবোনদের ও আমায় যে যাবার আমন্ত্রণ করেছ, যাবো—কিন্তু এখন নয়, পদবী বদলানোর সময়, বাণীর মত করোনা তখন ঠিক যাবো।

রেখা দাসগুপ্তা (কলিকাতা) ১০৩৬

সাধনা সরকারের ঠিকানা পাঠালাম। আমার পরিচয় কি আজও পাওনি? আমি 'দিদিভাই'।

নিবেদিতা, সব্যসাচী ও ইন্দ্রনীল বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা)

তোমরা নূতন গ্রাহক হয়েছ কিন্তু গ্রাহক-নম্বর জানতে পারনি— একটা চিঠি পরিচালক মহাশয়কে লিখে জানিয়ে দেবে। সম্পাদক মহাশয় অসুস্থ বলে 'মিষ্টিমুখ' হয়নি।

কল্যান কিশোর মুখোপাধ্যায় (গয়া)

তোমার লেখা যোগ্যস্থানে দেওয়া হয়েছে। কল্যানকুমারের ঠিকানা পাঠিয়েছি। যা জিজ্ঞাসা করেছ গল্প সম্বন্ধে পরে জানাবো।

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ১১৭৭

রংমশাল সরু হয়ে যাচ্ছে বলে অনুযোগ করেছ তা আমি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবো। ভাইবোন পেলে

দিদিরা 'আপদ' বলে কখনও ভাবতে পারে না একথা অনেকদিন বলেছি। তুমি কোন ক্লাশে পড় বা অন্য কিছু তো লেখনি। মাসের ১৮।১৯ তারিখের ভিতর চিঠি পাঠিয়ে দিও।

মৃগাঙ্ক শেখর সামন্ত ১২৪১

তুমি নূতন তাই আহ্বান জানাচ্ছি। যাদের ঠিকানা চেয়েছ, পাঠাচ্ছি। ঠিকানাটা এমনভাবে লিখেছ আমি বুঝতে পারলাম না। অন্য কোন শিশু মাসিকে কি আছে ভাই—সেরকম করা বা সেভাবে চলা উচিত নয়—রংমশাল যেন তার স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পারে একথাই বলো।

সুজাতা রক্ষিত !

বোনটী তুমি সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছ—সেই আশ্বিন মাসে চিঠি লিখেছিলে! দিদিভাইয়ের কথা ছেড়ে দাও, ভাইবোনেরা যে হাঁপিয়ে উঠেছে—শীঘ্র খবর দাও কোথায় ও কেমন আছ?

সুরমা, সমরেশ, অজয় মিত্র, ঠাকুর মা এবং আরো অনেকের খবর নেই কেন? সকলে আমার প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করো।

শুভার্থিনী

দিদিভাই

গ্রাহক গ্রাহিকাদের প্রতি

যে সব গ্রাহক গ্রাহিকাদের চাঁদা চৈত্রমাস পর্য্যন্ত দেওয়া আছে অর্থাৎ চৈত্রমাসে যাঁদের চাঁদা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাঁরা যেন অবিলম্বে আমাদের কাছে রংমশালের বার্ষিক বা সান্মাষিক চাঁদা (বৈশাখ থেকে) মণিঅর্ডার যোগে পাঠিয়ে দেন। যদি মণিঅর্ডার পাঠাতে কোন অসুবিধে হয়, তাঁরা যেন পত্রদ্বারা জানিয়ে দেন—ভি, পি, করবার জন্য। মনিঅর্ডারেই সবদিক থেকে সুবিধে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

পৌষ মাসের ব্যাঙের পাতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন—যে গ্রাহকের লেখা, 'ব্যাঙএর পাতা' (এক) ফাল্গুনের রংমশালবৈঠকে ছাপা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সে গ্রাহকটির নাম আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ঐ লেখাটি যে লিখেছে সে যেন আমাদের পত্রপাঠ তার নাম ও ঠিকানা জানিয়ে দেয়। দ্বিতীয় হয়েছেন—শ্রীমান অজয়কুমার দত্ত, তার লেখাও ফাল্গুনের রংমশাল বৈঠকে—ব্যাঙের পাতা (দুই) তে ছাপা হয়েছে।

মাঘ মাসের প্রতিযোগিতায় দুঃখের বিষয় কারুর প্রবন্ধ আমাদের পছন্দ হল না। যারা পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়ের (আরা) ভারতের ফলফুল, সাধনা সেনগুপ্তের (আমেদাবাদ) ভারতের শিল্পকলা ও প্রীতিময় সরকারের ভারতের গ্রাম উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এগুলি পুরস্কার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় নাই।

নূতন ধাঁধা

খুঁজে বার-করা

নিম্নলিখিত এগারটি লাইন আমরা এ মাসের রংমশালের বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ থেকে তুলে দিলাম। এখন তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে কোন্ লাইন কোন্ লেখা (বিষয়) থেকে নেওয়া ও রংমশালের কত পৃষ্ঠায় সে লাইনটি আছে। যেমন উদাহরণস্বরূপ—এক নম্বর (১) লাইন: 'কাণ্ডটা অবশ্য তিনি ঘুমের ঘোরেই করেন'—এটা অকাণ্ডের কাহিনীর ও রংমশালের ৪১৪ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া। একটু বুদ্ধি খরচ করলে আর যারা রংমশাল মন দিয়ে পড় তাদের এই লাইনগুলি বার করতে কিছু অসুবিধে হবে না।

(১) কাণ্ডটা অবশ্য তিনি ঘুমের ঘোরেই করেন (২) আজও চলেছে তাদের চিরন্তন টাগ-অফ-ওয়ার (৩) আমার মতে তুমি একটি আস্ত গাধা (৪) Oh God! (৫) তিনিই তো আদর দিয়ে তোমার মাথা খেয়েছেন (৬) ফায়ার কখনও ছাই চাপা রয় না (৭) মনে করো যে গ্লাসে তুমি জল খাও, তাতে আধসের জল ধরে (৮) খাদক হোল খাদ্য তার ফলে বলবান পেলে মধু (৯) তখন সে দরজা ঠেলে দেখে যে দরজা খোলাই রয়েছে (১০) শুধু কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিক তীর ছুড়তে লাগল (১১) তার ইদানীং মনে হোত কি যেন তার ফস্কে যাচ্ছে।

নূতন প্রতিযোগিতা

বাংলা বই নির্ব্বাচন

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় মন দিয়ে শোন: ছেলেমেয়েদের উপযোগী পঁচিশ খানি শ্রেষ্ঠ বাংলা বই তোমাদের নাম করতে হবে। অবশ্য তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মতানুযায়ী বইর নামগুলি পাঠাবে আর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি করে পঁচিশ পর্য্যন্ত বইর লিষ্ট পাঠাবে।

তোমাদের এই রকম in order of merit বইর লিষ্ট পেলে, তারপর আমরা সে লিষ্টগুলি থেকে যাচাই করে দেখব তোমাদের কোন্ কোন্ বই বেশী ভোট পাচ্ছে। তখন সেই ভোট অনুযায়ী আমরা বইগুলির একটা লিষ্ট তৈরী করে রংমশালে ছাপাব। আর তোমাদের যার বইর লিষ্ট ভোট অনুযায়ী লিষ্টএর সবচেয়ে কাছাকাছি মিলবে—সে পুরস্কার পাবে সেই বাছাই-করা লিষ্টের তার নিজের পছন্দমত যে কোন দুখানা বই। আর দ্বিতীয় যে হবে সে আমাদের পছন্দমত দুখানা বই পাবে।

সকলের যোগ দেওয়া চাই। কারণ এতে করে তোমরা কি কি বাংলা বই সব চেয়ে ভালবাস তা আমরা জানতে পারব। আর এই লিষ্ট সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৬শে চৈত্র।

ফাল্গুন মাসে

ধাঁধার উত্তর

"বল তো"র উত্তর

১। সর্ষে ফুল ২। বক ৩। লঙ্কা (সিংহল) ৪। শ্রীনগর (বা শ্রীহট্ট) ৫। মরু সমুদ্র (ডেড্ সী) ৬। সাগরদ্বীপ ৭। ডালকুত্তা ৮। বনমানুষ ৯। সিঙ্গাড়া ১০। ভাগলপুর

"কোথা থেকে"র উত্তর

১। অষ্ট্রেলিয়া (Red wood গাছ) ২। আমেরিকার যুক্তরাজ্য (কলোরেডো মরুভূমি) ৩। ব্রেজিল (ইলেক্ট্রিক ঈল্) ৪। তিব্বত ৫। নিউ জিল্যাণ্ড (মাওরি অভিবাদন) ৬। চীন (কর্মোর‍্যান্ট পাখী পুষে) ৭। জাপান ৮। ভারতবর্ষ (শোনপুর ষ্টেশন) ৯। রুশিয়া (জাইগ্যান্ট নামে আবাদ) ১০। কঙ্গো (আফ্রিকা)

"বল তো" ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তর দাতাদের নাম ঃ—

পিন্টু, মিন্টু, রবি ও বাবুল (কলিকাতা); প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী (ভবানীপুর); গোপাল ও অমরেন্দ্র (কলিকাতা); জগদিন্দ্র নাথ রায় ও অমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); মীরা, খোকা, কেয়া, বুন্টু ও গিনিপিগ (ভবানীপুর); শ্রীবসুধা সেন (কলিকাতা); মণ্টু রায় (কলিকাতা) ধনগোপাল দে (ভবানীপুর); শ্রীরামচন্দ্র বসু; (কলিকাতা) অনিমা, সুরেশ, তারক, বরণ, খোকা (কলিকাতা)।

যাদের একটি ভুল হয়েছে ঃ—

সুরথ, মিন্টুরানী ও পিন্টুরানী বসু (চুঁচড়া); জয়ন্ত, সুশান্ত, আরতি, বিনয় ও জিতেন (পাটনা)।

যাদের একটির বেশী ভুল হয়েছে ঃ—

বাবা, মা, জ্যোতির্ম্ময় ও জগদীশ (তেলিনীপাড়া); পার্থসারথি, বিম্বিসার, মনা, আরতি ও বাণী সেন (পাটনা); নীলাক্ষিনাথ সেন (কলিকাতা); অরুণকুমার সরকার (বিকানীর); সুনন্দা দে (কলিকাতা); গোড়াদি, মেজদি, ধনদি, দিদিমণি, চিনিদি, ছোড়দি ও নরেন্দ্রনাথ রায় (আঠারবাড়ী)।

"কোথা থেকে" ধাঁধার উত্তর কেহই নির্ভুল দিতে পারে নাই।

রংমশাল সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৪৬

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
অমরলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সতীকান্ত গুহ	৬৯৫, ৮২০
অক্ষর ও ভাষা (প্রবন্ধ)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৬৩৯
অহঙ্কারী (দামী কথা)		৬১৪
আধুনিক যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা (জীবনী)		৭৯৫
আমরা রেগে গেলে কি করি	শামুক	৬১০
আমাদের লাইব্রেরী		৫১২, ৫৬৮, ৬১৫, ৬৮৩, ৭৫২
আমার চিঠি		৮২৮
আলেকজাণ্ডারের চীন অভিযান (গল্প)	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৬৪
ইস্কুল (কবিতা)	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮৯
ইস্কুল ঘরে (প্রবন্ধ)		৮০০
ঊষা ও গোধূলি (প্রবন্ধ)	প্রীতিলতা দেবী	৭০৫
কাগজের ম্যাজিক (প্রবন্ধ)	বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল	৫০৪
কিরণবালার কাণ্ড (গল্প)	ধরণী সেন	৬৪৮
কিং লিয়ার (গল্প)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৭৮১
কে কার গুরু (গল্প)	রবীন্দ্রলাল রায়	৭২৩
কৈশোরক (কবিতা)	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৬৫৩
কোলকাতা (কবিতা)	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৫০
খুকুর খেয়াল (এক পাতার গল্প)	শামুক	৮১
গাঙচিল (কবিতা)		৮১৩
ঘরের বাহিরে (প্রবন্ধ)		৭৭৮
ঘুতুম দেশের রাণী (হাসির কবিতা)		৫৯৯
ঘুম-এ (কবিতা)	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৭১১
ঘোড়ার পিঠে হাজার মাইল (প্রবন্ধ)		৭৭০
চট্ জলদী (কবিতা)	ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	৬৯১, ৭৬৮
চলন্তিকা		৪৯৩, ৫৫৪, ৬১৯, ৬৭৭, ৭৪৩, ৮১৫
চার্লি চ্যাপলিন	শ্রীধর	৫০৫
চিঠির বাক্স	দিদিভাই	৫০৭, ৫৬৩, ৬২৫, ৬৮৭, ৭৫৬, ৮২৬
চিনতে পারেন (হাসির ছড়া)		৭০৪
চোর ধরা (ছড়া)		৫২৯
ছবি আঁকা (প্রবন্ধ)	গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬৩১
ছুটির ঘণ্টা		৬২২, ৬৭৩, ৭৪০, ৮২৪
ছুটির চিঠি (কবিতা)	পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৩

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
জঙ্গল (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুকুমার দে সরকার	৪৬০, ৫৩০, ৫৮১, ৬৪৩, ৬৯৯
জাতভাই (প্রবন্ধ)	সুবিনয় রায় চৌধুরী	৪৭২
জানালার বাইরে (কবিতা)	পূর্ণেন্দু সেন	৬৫৯
জানোয়ারের খেলাধূলা (প্রবন্ধ)		৫৯০
জীবন (গল্প)	ষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত	৬৬৭
তীর্থ-পরিক্রমা (ভ্রমণ)	মৃগেন্দ্রনাথ খান	৪৫৯, ৫৫৮
দূরের আলো		
খবর ছড়ানোর কলকৌশল		৭৮৫
পৃথিবীপূজা		৭২৯
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি	প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯৬
সোনার ডাক		৬৮০
দুষ্ট পরী (রূপকথা)	প্রীতিলতা দেবী	৮১১
ধাঁধা		৫১৩, ৫৭০, ৬২৯, ৬৮২, ৮৩৪
ধাঁধার উত্তর		৫১৩, ৫৬৯, ৬৩০, ৬৯০, ৭৫৯
ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম		৫১৪, ৫৬৯, ৬৯০, ৭৫৯
নতুন বছর (প্রবন্ধ)	শান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৪০
নব বর্ষ (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩৫
নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	৫৪৪, ৬০১
নূতন ডাকটিকিট		৭৯৪
পথে বিপথে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	যোগেন্দ্র গুপ্ত	৪৮
পুস্তক নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার ফলাফল		৫৬৭
পৃথিবী ঘুমোয় (কবিতা)	সতীকান্ত গুহ	৭৭৬
প্রাণধন পোদ্দার	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৪৯১, ৬০৬
বাদশাহী গল্প (নক্সা)	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩৬, ৫১৭, ৬৯২
বাবা মুস্তাফার দাড়ি (গল্প)	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৫২১
বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্ব লাভ	শিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪৫১
ব্যাঙের পাতা		৫৮৩
ভাবীগৃহিণীর বৈঠক	ইন্দিরা দেবী	৪৯৯, ৫৫৮
ভীমপলশ্রী (কবিতা)	শৈল চক্রবর্ত্তী	৪৯৬
ভুলের ফসল (গল্প)	...	৬৩৩
মাকড়সা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	রজত সেন	৭৩৫, ৭৮৮
মাকড়সার জালে রহস্যভেদ (প্রবন্ধ)	দীনেন্দ্রকুমার রায়	৫৫২
মানুষেরে রাখো (কবিতা)	...	৭৬৩
মারাত্মক স্বাস্থ্যরক্ষা (গল্প)	বুদ্ধদেব বসু	৪৪৩
মৃত্যুহীন দেশে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুকুমার দে সরকার	৭১৩, ৭৭১
যাদুকরের যাদুগিরি (গল্প)	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৭৩১
যাঁরা আমাদের স্মরণীয়		
কবীর		৭২১
গুরুগোবিন্দ সিং		৮১৮

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
রংমশাল বৈঠক :—		
আহরিকা	হৃষীকেশ দে	৬৮৬
খোলা জানলা	শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়	৬৮৪
ছাতা বিভ্রাট (রূপক)	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৭৪৭
পাথেয়	শিবানী সিংহ	৫০২
বিদায় (কবিতা)	রতনকুমার রায়	৭৫৮
রংমশাল (কবিতা)	মিহিরকুমার গোস্বামী	৭৫৬
সাড়া	কুমারী শিবানী সরকার	৫৬১
রাখাল রাজা (কবিতা)	সতীকান্ত গুহ	৪৬৫
রাজপুত্তুর রাজকন্যা কার (কবিতা)		৫১৫
রাজা সেদিন গেল চটে (ছড়া)	...	৬১৩
রাতের পাখী (কবিতা)	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৭১
রূপকথা	যূথিকারাণী মিত্র	৪৭৬
রোমিও জুলিয়েট (গল্প)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৬৫১, ৭০৭
লালকোর্ত্তার রোমাঞ্চ (গল্প)	পূর্ণেন্দু সেন	৮০২
শব্দচৌকি প্রতিযোগিতা		৭৫১
শিল্পী (অনুবাদ)	দীপ্তেন্দ্র সান্যাল	৪৯০
সত্য আর মিথ্যা (গল্প)	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৯৩
সত্যি নাকি		৫৬০, ৬১২, ৬৭২
সন্ধানী		
কেঁচোর কেরামতি	হেমেন্দ্রকুমার রায়	৬০৪
গাছের কথা		৭১৯
চাঁদের দেশে টেবু	বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	৮০৭
নতুন বছর	শান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৪০
সাবমেরিণ	...	৭১৮
সাপ! সাপ !!	রজত সেন	৬৫৫
সিরাজের স্বপ্ন (গল্প)	সতীকান্ত গুহ	৫৭৩
সুলতানের মুক্তো (গল্প)		৬০৯
হিটলার (জীবনী)	অমর সরকার, এম্-এ	৫৩৪
হোপলেশ চোর (সত্য ঘটনা)	বসুধা ঘোষজায়া	৫৪০

রংমশাল—সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র, ১৩৪৬

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
অতীত কালের ঐশ্বর্য্য (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্তা	১৪৭, ১৮৩
অদ্ভুত (গল্প)	মিহির রায়	১৪৯
অমরলতা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সতীকান্ত গুহ	৮৬, ১৭৯, ২৮২, ৩০৪
আকাশের দেশে	বিনয়েন্দ্রনারারায়ণ সিংহ	১২৬
আনন্দময়ীর আগমনে (প্রবন্ধ)	রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	৬
আপন বুড়ো (কবিতা)	...	১৭৭
আমাদের লাইব্রেরী	...	৭৩, ১৮৩
আমাদের চিঠি	সম্পাদক	৯৯, ১২০, ২২৫
আল্পনা (প্রবন্ধ)	ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	১০২
ইস্কুল ঘর (প্রবন্ধ)	...	৭১, ১১৬
একদিন দুপুরে (ঘরের বাহিরে)	শ্রীমতী প্রীতিলতা গুহ	৭৭
একটী ছোট চারকোণা বাক্সের কাহিনী (গল্প)	সুবলচন্দ্র ভড়	২৪২
এ মেয়ে কার মেয়ে (কবিতা)	বিজয় সেনগুপ্ত	২৩৬
কবিতার অপমৃত্যু (কবিতা)	রমা নিয়োগী	২০৭
করবে কাদের জয়গান (কবিতা)	সমরেন্দ্রনাথ সেন	৩০৩
কিং লিয়ার (গল্প)	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
কুকুর (নক্সা)	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৬২
গল্পের আরম্ভ (প্রবন্ধ)	রজত সেন	১৭৪
গল্পের শেষ (গল্প)	ধরণী সেন	২৮৭
গোপন কথা (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দ্রিরা গুপ্ত	৩৪৭
চটু জলদী (কবিতা)	ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই	১২, ১০৫, ১৭৩, ২২১, ২৭১, ৩২১
চলন্তিকা	...	৫৯, ১১৬, ২১৫, ২৬৫, ৩১৩, ৩৬৪
চাণক্য (কবিতা)	শ্রীমতী রেণু গুপ্তা	৩০০
চাঁদের দেশে	উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৬৩
চিঠির বাক্স	দিদিভাই	৯৫, ১৬৫, ৩১৬
চীনে বাদাম (কবিতা)	শ্রীকান্ত	৩৪৯
ছুটীর ঘণ্টা	...	৬৫, ১৬১, ২১১, ২৬১
ডাকটিকিট	...	৪৫
দুগগা এলেন ঘরে (কবিতা)		৩
দূরের আলো		
জাপানী মাস্ক	সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী	১
জাপানী সভ্যতায় ডাচ প্রতিভা	ঐ	১৯২

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
জাপানী সেরুরয়েড	সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী	১৫৮
জাপানী সৈনিকের এক পাতা	ঐ	৩০৪
সম্রাট মেইজী	ঐ	২৩৯
দেবশিশু (গাঁথা)	রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর	১৮
দোতকলমে (কবিতা)	পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়	৪১
ধাঁধা		১০১, ১৭১, ২৭৭, ৩৬৮, ৩১৯
নিরক্ষরতা দূর করো (গল্প)	বুদ্ধদেব বসু	১৩
পরিবর্ত্তন (গল্প)	নিখিলেশ সেন	২৯২
পরীর প্রতিশোধ (রূপকথা)	উপেন্দ্রকুমার নন্দী	২৭৯
পানসী নিয়ে আয় না মাঝি (কবিতা)	পূর্ণেন্দু সেন	১৫৯
পুরণো খাতা (সংগ্রহ)		
গাছের বন্ধু ও শত্রু (উদ্ভিদতত্ত্ব)	রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০৮
ন্যাংলা ব্যাঙএর ছানা (ছড়া)	জীবনময় রায়	৩০৬
সোন নদ (ভ্রমণ কাহিনী)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৩০৭
পুজোর পাতা	...	৯
ফুলের সাথে (কবিতা)	...	১৫১
ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল (জীবনী)	অনিলকুমার দাসগুপ্ত	২৫৩
বিশ্বম্ভর পাঁড়ে (কবিতা)	পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩[illegible]৩
ভাবীগৃহিণীর বৈঠক	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৩৫৮
ভারতের শেষসীমানায় (ভ্রমণ)	শামুক	৩৫৫
ভিখারী (গল্প)	দীপেন্দ্র সান্যাল	৬৩
ভৈরবানন্দের মঠ (গল্প)	সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত	৩১৩
ভৌতিক কাহিনী	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৫৩
মহাযুদ্ধের আর একটি পুরনো গল্প	...	১১৪
মাকড়সা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	রজত সেন	৬৭, ১৩১, ১৯৭, ২২৩, ২০৭, ৩১০
মিকি ও এক-কো (গল্প)	শ্রীধর	২২৮
মুক ও মুগর (গল্প)	শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র	৪৬
মৃত্যুহীন দেশে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুকুমার দে সরকার	৩৮,১৪১,১৯৪,২২৩,২৯৭,৩৫০
যাঁরা আমাদের স্মরণীয়		
অনিক	বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ	৪৩
যুদ্ধের পুরণো গল্প (ঘটনা)		৮২
রংমশাল বৈঠক		
অধিকারী অবিনাশ	অরুণকুমার রায়	৯২
এবার ঈদে	শ্রীমতী মানহুর বেগম	৩১০
জয়পুরে দুদিন	অরুণকুমার রায়	২৫৩
দাদুর দুধের বাটী	শ্রীমতী আনোয়ারা বেগম	৩৬০
পুরাণ খাতা	নীপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী	৯১
পৌবুলী	শ্রীমতী বাণী সেন	২২০

বিষয়	লেখকলেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
বাসন্তি	শ্রীমতী সুরেখা বোস	৩৬৩
মুক্তির ডাক	শ্রীমতী ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়	২১৮
রস্তনে	রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার	৩৬২
সবই সত্য	শ্রীমতী নমিতা গোস্বামী	২১৯
রিকসাওলা (কবিতা)	পূর্ণেন্দু সেন	২৩৭
লুসার (গল্প)	সুকুমার দে সরকার	১৯
শব্দচৌকি	...	১১৯, ২৬৯, ৩১৯
শব্দচৌকির ফলাফল	...	১০০, ১৮৮
শরতের ঊষা (কবিতা)	কালিদাস রায়	৫২
শীতে কাশ্মীর, কাশ্মীরে শীত (ভ্রমণ)	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৭৫, ৩২৯
সঙ্কল্প (কবিতা)	কালিদাস রায়	২৪৮
সঙ্গীহারা (গল্প)	রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস	২০৫
সন্ধানী :—		
আলোকের ...ন	মাষ্টার তারা	৩৪৭
পদার্থ	অজ্ঞাত	২১৩
পেঙ্গুইনের দেশে	...	৫০
মরণের পথে ঘুমিয়ে মামা	শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র	২৪৯
সাগর (কবিতা)	বিজয় সেনগুপ্ত	৫৭
হট্টমালার দেশে (ধারাবাহিক উপন্যাস	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৭৭, ১০৭, ১৮১
হিরক কণ্ঠী (গল্প)	অজ্ঞাত	১৮২

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখকলেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩৫
২।	বাদশাহী গল্প (গল্প)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩৬
৩।	নতুন বছর (প্রবন্ধ)	শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৪০
৪।	মারাত্মক স্বাস্থ্যাক্ষা (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	৪৪৩
৫।	কোল্‌কাতা (কবিতা)	শ্রীকামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪৫০
৬।	বিশ্বপতিবাবুর স্বত্ব-লাভ (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪৫১
৭।	তীর্থ-পরিক্রমা (ভ্রমণ)	শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খাঁন	৪৫৯
৮।	রাখাল রাজা (কবিতা)	শ্রীসতীকান্ত গুহ	৪৬৫
৯।	জঙ্গল (উপন্যাস)	শ্রীসুকুমার দে সরকার	৪৬৭
১০।	জাতভাই (প্রবন্ধ)	শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী	৪৭২
১১।	রূপকথা	শ্রীমতী যুথিকারাণী মিত্র	৪৭৬
১২।	খুকুর খেয়াল (এক পাতার গল্প)	শ্রীশামুক	৪৮২
১৩।	ব্যাঙের পাতা		৪৮৩
১৪।	পথে বিপথে (উপন্যাস)	শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত	৪৮৫
১৫।	শিল্পী (অনুবাদ)	শ্রীজীতেন্দ্র সান্যাল	৪৯০
১৬।	প্রাণধন পোদ্দার (কবিতা)	শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	৪৯১
১৭।	চলন্তিকা		৪৯৩
১৮।	ভীমপলশ্রী (কবিতা)	শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী	৪৯৬
১৯।	ভাবী গৃহিণীর বৈঠক	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৪৯৯
২০।	রংমশাল বৈঠক	শ্রীশিবাণী সিংহ	৫০২
২১।	কাগজের ম্যাজিক (প্রবন্ধ)	বালক যাতুকর দেবকুমার ঘোষাল	৫০৪
২২।	চার্লি চ্যাপলিন	শ্রীধর	৫০৫
২৩।	চিঠির বাক্স	দিদিভাই	৫০৭
২৪।	আমাদের লাইব্রেরী		৫১২
২৫।	ধাঁধাও ধাধার উত্তর তাদের নাম		৫১৩

পূজা-পার্ব্বণে ছোটদের হাতে দেবেন

শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত

আরতি

সব রকমের গল্প, বিজ্ঞানকথা, কবিতা, নাটক, গান, গাথা, কার্টুন-ছবির গল্প প্রভৃতির অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রায় ৫০০ পাতার বই

এ যেন শ্রেষ্ঠ ফুলগুলির মধু-আহরণ। নামকরা চিত্রকরের তুলির আঁচড় পাতায় পাতায়।

দাম এক টাকা চার আনা !!

—শিশু-সাহিত্যে নামকরা ক'খানা বই—

হেমেন্দ্রকুমার রায়—আজবদেশে অমলা (Alice in wonderlan) (২য় সংস্করণ) ॥০

সুনির্ম্মল বসু—লালন ফকিরের ভিটে (২য় সংস্ক) ॥৶০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী—মণ্টুর মাষ্টার (২য় সংস্করণ) ৸০

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—সোনার পাহাড় ॥৶

শৈল চক্রবর্ত্তী—বেজায় হাসি (কবিতার বই) (২য় সংস্করণ) ৷৷৴০

সুধাংশু দাশগুপ্ত—মায়াপুরীর ভূত ৷৴৭

গোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগল্পগুচ্ছ (৪র্থ সং)—৷৶০ গল্পবীথি (য় সং)—৷৶০

শিশু সারথি—৷৶০ জাতকের গল্পমঞ্জুষা—৷৶০

● এই মাসের নূতন বই ●

প্রভাতকিরণ বসু—রাজার ছেলে ॥৬

হেমেন্দ্রকুমার রায়—মানুষ-পিশাচ

—শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—দুর্গম পথে

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিক[াতা]

এ বছরের নতুন বই

শ্রীসুবিনয় রায় চৌ[ধুরী]
বল তো
ধাঁধার বই। চোখের ধাঁধা, শব্দের ধাঁধা, হেঁয়ালি, সমস্যা প্রভৃতির বই। এ ধরণের বই শিশুসাহিত্যে এই প্রথম। ছেলেরা বড়রা এ বই পড়ে বেশ আনন্দ পাবে—ধাঁধার ছবিও আছে। **দাম দশ আনা**

শ্রীবুদ্ধদেব বসু
গল্পঠাকুরদা
তোমাদের কত বন্ধুবান্ধব নাওয়া খাওয়া, পড়াশুনার মধ্যে কেমন সব মজার মজার গল্প গড়ে তোলে, তা হয় ত তোমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু "গল্পঠাকুরদার মুখে" সেগুলো শুনলে অবাক্ হবে! ভাববে—তাই ত! নূতন বই।

এক পেয়ালা চা
বুদ্ধদেব বাবু নতুনের পূজারি তোমরাও নতুন, নতুনকে তোমরাই আহবান করবে! এ বইয়ের প্রত্যেকটি নাম নতুন ঢংয়ে লেখা—নতুন অদ্ভুত আইডিয়া প্রচ্ছন্ন হাসি যা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত
পরীর গল্প
রূপকথার গল্প। প্রত্যেকটি গল্প মধুময়। তোমাদের মনকে ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে কল্পলোকে নিয়ে যাবে—ভুলে যাবে তুমি গল্প পড়ছ। মনে হবে তুমিই যেন গল্পের নায়ক। **দাম ছয় আনা**

বুদ্ধির লড়াই
কয়েকটি সুন্দর গল্প। প্রত্যেকটি গল্পে নায়কদের বুদ্ধির লড়াই একটা পড়বার মত জিনিস! **দাম ছয় আনা**

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু
জীবনের সাফল্য
মণ্টুর মাষ্টারের মতই তেমনি চমৎকার, তেমনি মজার সব হাসির গল্প। তেমনি প্রকাণ্ড বই, পাতায় পাতায় ছবি। শিবরামবাবুর সঙ্গে আবার যোগ [দি]য়েছেন গৌরাঙ্গবাবু, অল্পদিনেই হাসির গল্প লিখে নাম কিনেছেন যিনি। **দাম ছয় আনা**

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র
খাদে ডাকাতি
ধর্ম্মদাস বাবুর লেখা এই বইখানি ছেলেরা একযোগে ভাল বলছে। ৷৶০

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে
অঞ্জলি
গোষ্ঠবাবুর অন্যান্য বইয়ের মতই এ বইখানাও শিক্ষাপ্রদ গল্পগুলি। [প্রত্যে]কটি গল্প যেন হীরের টুকরা। **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুনির্ম্মল বসু
গুজবের জন্ম
[নে]শা না করিয়া নেশাখোর হওয়া কত কঠিন তাহা সুনির্ম্মল বাবুর গুজবের জন্মলে বুঝিবেন। **দাম ছয় আনা**

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

জগতের বাংলা বই

নিখিল ক্লাসিক
বঙ্গোপন্যাস
দুই টাকা
পৃথিবীর মেঘপুরী
ঠাকুরমার ঝুলি
দেড় টাকা
অনুভবনীয় দান
কিশোর উপন্যাস
সিরিজ
১৲ ৮০ ॥০

দক্ষিণারঞ্জনের

নূতন সবুজ বই
— সবুজ লেখা —
পৃথিবীর রূপকথা
সবুজ লেখা ১॥০ পৃথিবীর রূপকথা ১॥০

লেখায়
ছবিতে
ছাপায়
জগতের
যেকোন
দেশের
আনন্দ

দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র

এম. বি. সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন অব লেট বি. সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার এবং রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা

আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত একমাত্র গিনি-স্বর্ণের নানা-প্রকার আধুনিক ডিজাইনের গহনা সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। অর্ডার দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গহনা প্রস্তুত করিয়া ডেলিভারী দেওয়া হয়। পুরাতন সোনার বদলে নূতন গহনা দেওয়া হয়।

মজুরী সুলভ

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে আমাদের নূতন ডিজাইন সমন্বিত
বি, ৩ নং ক্যাটালগ পাঠান হয়

ফোন বড়বাজার ১৭৩১
১২৪. ১২৪-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়
টেলিগ্রাম ব্রিলিয়াণ্টস্

রূপকথার রাজপুত্তুর

শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

রংমশাল

চতুর্থ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৪৬

নব বর্ষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব বর্ষ এলো আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে,
আনেনি আশার বাণী, দেবে না সে করুণ প্রশ্রয়,
প্রতিকূল ভাগ্য আসে হিংস্র বিভীষিকার আকারে,
তখনি সে অকল্যাণ যখনি তাহারে করি ভয়।

যে জীবন বহিয়াছি পূর্ণ মূল্যে আজ হোক কেনা,
দুর্দিনে নির্ভীক বীর্যে শোধ করি তার শেষ দেনা॥

বাদশাহী গল্প

ঠাকুরদাদা অবনীন্দ্রনাথ

দাদামশায়, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য কি ?

—যে গল্পটা আমি আজ সকালে উঠে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি !

একেবারে ছিঁড়ে ফেলে দিলে, রাখলে কাজ হতো, মাসিকে বেচে ছোড়দাদা দুটো পয়সা আদায় করতো !

তারপর কি হতো বাদশাবাবু !

আমি তার থেকে কিছু আদায় করে নিয়ে চট্‌পটী কিনতেম ! চট্‌পটী দেখেছো দাদামশায় !

দেখিনি আবার ! চট্‌জলদীর ছোট ভাই !

আশ্চর্য্য তুমি কি সব দেখেছো !

সব আশ্চর্য্য দেখে কি কেউ শেষ করতে পারে, এখনো দেখার বাকি আছে অনেক !

শুধু দাদা বলে, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য 'কিং কং' নতুন একেবারে।

—হেঃ নতুন ! কতকাল আগে কিং কংএর উপরে ছড়া তৈরি হয়ে গেছে আমার ছেড়া খাতায় তা জানো !

—বলতো শুনি ছড়াটা !

"কে তুমি জীব মীন কে তোমার বহে ভার কারে বা তুমি বও তাই কও !
কং স্বরূপের অংশরূপে ব্রহ্মকুণ্ডে অন্ধকূপে বন্ধ হয়ে করি কিং
ডাঙায় উঠে ডিম পাড়ি জলে নামি ধরি মীন
কাদাজলে বোদাজলে কং ক বক বংশ
জগতে কং জানো সার কং বিনা কিং আছে আর
কিং থাকে আর কং হলে ধ্বংস ভেবে লও !

—আচ্ছা পৃথিবীতে তাহলে অষ্টম আশ্চর্য্য নেই ?

—নেই যদি না কষ্টম হাউস্‌টাকে বল অষ্টম আশ্চর্য্য !

—আর কি হবে ছেড়াগল্পটাকে সাড়ে সাতের কোঠায় ফেলে দিয়ে নতুন করে অষ্টমে চড়ানো যাক্ আটের গল্পটা।

—অষ্টম আশ্চর্য্য গল্পটা লিখে ছিঁড়লে কেন দাদামশায়, ভারি অন্যায় করেছো !

—কেন ছিঁড়লেম বলি যদি তো অষ্টম আশ্চর্য্যের চেয়ে আশ্চর্য্য লাগবে তোমার।

—আচ্ছা বল শুনি কেন ছিঁড়লে ?

—তাও বলবার যো নেই তাহ'লে তো বলতুম্।

—তবে কি হবে দাদামশায়

—অষ্টম চড়ানোর মানে কি দাদামশায় ?

—সে ভাই কষ্টমের একশেষ ! চুলোতে চড়ালে একমুঠো ছাই পাঁস্‌ও পাওয়া যায় কিন্তু অষ্টমে চড়ালে—ধন দৌলত মানসম্ভ্রম ঘর বাড়ি খাট বিছানা গহনাগাঠি জমীজমা, জমীদারি কিছু আর থাকেনা।

—কোথায় যায় ?

—পাঁচভূতের কবলে পড়ে উপে যায় বাষ্প হয়ে শূন্যে।

—দাদামশায় তোমার ভুল হ'ল, বাষ্প হলে মেঘ হয় মেঘ হয়ে বিষ্টি হয় পড়েছি ; তুমি চড়াও গল্প অষ্টমে নির্ভয়ে দাদামশায়।

—আচ্ছা তাই হোক—

"শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কাণে তবু কতক বাঁচি প্রাণে
বক্‌বকানি ঢের হয়েছে বসি এবার কোমর এটে
অষ্টমিতে আসবে যারা আমার হয়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেবো হাত বুলায়ে তাদের পেটে"

—ছেলে বেলায় ঘোষাল-মাষ্টার ছিলেন আমাদের, তাঁর ভুঁড়ি এত শক্ত ছিল যে মেড়া তেড়ে ঢুসোলে মেড়ার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যেতো বোধ হয়, বিদ্যেতে ঠাসা ভুঁড়ি সর্ব্বদা তাতে আমি হাত বোলাতেম—ঠিক যেন একটা হলুদে চামড়ার রাবুনে ফুটবল !

—তোমাদের তখন ফুটবল খেলা হতো ঐ মাঠে দাদামশায় ?

—আরে না ভাই ও মাঠও ছিলনা ফুটবলও ছিল না—মাঠের জায়গায় ছিল পুকুর, ফুটবল ওঠেনি তখন ; সেই পুকুরে চিৎসাঁতার দিতেন মাষ্টর ; মনে হতো যেন একটা সোনাবেঙ প্রকাণ্ড গামলা-পেট উঁচু করে ভেসে বেড়াচ্ছে পুকুরে ! রোদ জল তেলে চিক্‌চিক্ সেই ভুঁড়ি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের মতো ঠেকতো আমার কাছে !

—তারপর ?

—তারপর একদিন ভাই সেই ভুঁড়ির জুড়িদার আর এক কালো চিনেমাটির জালার মতো, ভোজপুরী ভুঁড়িদার এসে উপস্থিত—যুদ্ধং দেহি বলে।

--কিসের যুদ্ধ !

—শোননা বলি, আগেতো ফুটবল খেলার রেওয়াজ ছিলনা, কার ভুঁড়িতে কত ধরে, এই নিয়ে লড়ালড়ি চলতো টাকা বাজি রেখে !

—তারপর ?

—যুদ্ধং দেহি বলে তো এলো ভোজপুরী, কিন্তু কে যুদ্ধ দেয় তার সঙ্গে ?

কুম্ভকর্ণের প্রায় তার খাওয়ার বাড়াবাড়ি
দেখে লাগে হৃদকম্প কে করে আড়াআড়ি !

পেটুক অনেক ছিল চাকর নফর
কেহ না আগাতে চায় তার বরাবর !
ঘোষাল বলেন খোসাল হয়ে ভঙ্গ দিব কি কারণ
বঙ্গের রাখিতে মান আমি দিব রণ
ছাতুখোর ভোজপুরীর কিসের বড়াই
জানেনা ফলারে পুরী কত গণ্ডা খাই।
বজ্রসম ভুঁড়ি দেখ নিরাট কঠিন
হেসে খেলে তলাতে পারি মণ তুই তিন
কুড়ি তঙ্কা বাজি পড়ে তবে শর্ম্মা লড়ে,
নচেৎ লোটা কম্বল নিয়ে যাক্ বেটা ঘরে।
সহি বলে তিন হাঁড়া দহি করি পার
ভোজপুরি গোঁফ মুচড়ি হল আগুসার।
রামলাল বলে বুঝি টুটে এবার বাংলার অহঙ্কার
ঘোষাল বলে পাল্লা দেয় এত শক্তি কার !

—তারপরে ?

—তারপর ভাই কুড়িটাকা বাজি ফেলে লড়াই সুরু হল। তুই মুদী এলো, একজন হিন্দুস্থানী, একজন বাঙালী ! তুটো চুলো ধরানো হলো গাড়ি বারাণ্ডার তুই মুখে। মধ্যে একদিকে যত বাঙালী চাকর বাকর সরকার গোমস্তা, আর একদিকে যত খোট্টা, বেহারা

আর দরোয়ান। মথুর দেওয়ানকে মধ্যস্থ করে বাজিখেলা আরম্ভ হল—কে কত রসগোল্লা খেতে পারে, যে প্রথমে এলৃবে তারি হার।

চুলোতে রস আর রসগোল্লা যেমন পাকছে অমনি তুজনের পাকযন্ত্রে চলে যাচ্ছে টপাটপ।

"রসগোল্লা ওড়ে পর্ব্বত প্রমাণ সমান উভয়ে কেহ না পিছান
কস্ বেয়ে রস গড়ায় দেখতে বিপরীত, কে জানে কেবা হারে কার হয় জিৎ।

ছুঁচটি পড়ে তো শোনা যায় এমন স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে, কি হয় কি হয়। যে ওজন ফুকরে চলেছে সে হাঁকলে—রামলাল তেওয়ারী একমণের পরে সাড়ে সাত্—অমনি তেওয়ারী বাপ্ বলে চিৎপাৎ। ঘোষাল মাষ্টার একমণ আটসের উড়িয়ে ধীরে সুস্থে কড়াই ধরে রসগোল্লার রস সবটা গলায় ঢেলে কুড়িটাকা টেঁকে গুজে তুগ্গা তুগ্গা বলে আচমন করতে উঠলেন।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? সব চুপচাপ্ ঘরে সরলো যে যার, বৈঠখানার একতলায় চেঁচামেচি করবে হুররো ওঠাবে এত সাহস তখন কারো ছিল না !

—তা'হলে কি হতো দাদামশায় ?

—চাকর বেহারা হলে মথুর দেওয়ানের চটি, ছেলেপিলে হলে গদাধর চাকরের, ঘোড়া-চিমটি—

—ঘোড়া-চিম্‌টি কি রকম দাদামশায় ?

—সে না খেলে বুঝবেনা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য কষ্টের চূড়ান্ত !

—তুমি খেয়েছিলে ?

—অনেকবার !

—এখনো খেতে ইচ্ছে হয় ?

—এ বয়সে নয়, সে বয়স যদি ফিরে পাইতো রাজি আছি—।

———

সন্ধানী

নতুন বছর

শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায়

বৈশাখের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বছর আরম্ভ হ'ল। বছরের পর বছর এমনি আসছে আর আমরা একটু একটু বড় হয়ে যাচ্ছি। সারা বছর যে বিশেষ খোঁজ খবর রাখি এমন নয় কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিনটি সকলেই একটু সচেতন হয়ে পড়ি। এটা যে একটি বিশিষ্ট দিন, আনন্দ উৎসবের দিন, একথা অস্বীকার করতে পারে আজকাল পৃথিবীতে এমন লোক কেউ নেই।

বছরের এই প্রথমদিনের কথা ভাবতে গেলে কয়েকটি কথা মনে এসে যায়। বছর, মাস এ সবের হিসাব আরম্ভ হ'ল কি করে? সমস্ত পৃথিবীতে যদি মানুষের বাস ত' নতুন বছর এক সঙ্গে একই দিনে আরম্ভ হয় না কেন? আর ২৩৪৬, ১৯৩৯ এদের মানে কি? একের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

সারা পৃথিবীকে নিয়ে বড় বড় প্রশ্নের ভিতর পথ হারিয়ে লাভ নেই। জিনিষটিকে একটু ছোট করে দেখা যাক। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কথাই ধরি। এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির নতুন বছর একসময়ে একসঙ্গে হয়না। একজনের আজ যদি ১৩৭৬ সাল হয় ত' অন্যের হবে ১৮৬০। এ দেখে মনে হয় না কি যে আমরা বোধ হয় কোন হিসাব মেনে চলি না, বেহিসাবীর মত যা ইচ্ছা তাই করে যাই। কিন্তু খামখেয়ালীভাবে কাজ হবার যো কই? বছর, মাস সপ্তা সব যে অঙ্কর হিসাবে বাঁধা। সুতরাং একটা কিছু নিয়ম আছেই আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক বছরের হিসাব কোথা থেকে কি ভাবে এল। একটা কথা মেনে নিতে হবে যে মানুষ যেদিন থেকে গুনতে শিখেছে তখন থেকেই এই সব হিসাব সুরু হয়েছে, কিন্তু তখনও লিখতে পড়তে জানে না। এই মজার ব্যাপারটুকু বলতে চাই।

একজন জ্ঞানী লোক বলেছেন—যদি কোন মানুষদের সম্বন্ধে জানতে চাও ত' তাদের সঙ্গে মিলে তাদের মত হয়ে থাকতে হবে—তবেই জানা যায়।

আমরা এখন জানতে চাচ্ছি সেই গুনতে—জানা মানুষের কথা। কিন্তু তারা ত' আর কেউ নেই পৃথিবীতে, সব যে লোপ পেয়ে গেছে! তাহ'লে? বেশ ত' এস আমরা ইচ্ছাপূরণ বুড়োকে বলি যে আমাদের সেই সময়কার মানুষ করে দাও। ব্যস্ হয়ে গেলাম সেই সময়কার মানুষ—তুমি আর আমি। নদীর ধারে পাহাড়ের গুহায় থাকি। পাখীর গানে পাতার বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠি সকালে। ঘুরে ঘুরে জীবজন্তু শীকার করে, গাছের ফল পেড়ে যাই। আজলা ভরা নদীর জলে তৃষ্ণা মেটাই। আর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে শুকনো পাতার খস্‌খসানি শুনতে শুনতে ঘুমিড়ে পড়ি। লিখতে পড়তে কিচ্ছু জানি না।

এই অবস্থায় যখন লোকজন নেই, গাড়ীঘোড়া নেই, ফুটবল সিনেমা কিছু নেই আমাদের অবসর থাকবে প্রচুর আর প্রকৃতির সঙ্গে দিনরাত ঘনিষ্টভাবে মিশে থেকে থেকে সেই হবে আমাদের দেখবার, আমাদের আনন্দ দেবার একমাত্র বস্তু। কয়েকটা জিনিষ বিশেষ করে আমাদের চোখে পড়বেই পড়বে। যেমন সূর্য্য ওঠা আর ডুবে যাওয়া। চাঁদ একটু বাড়তে বাড়তে পুরো গোল হয়ে গেল—আবার কমতে কমতে অদৃশ্য। আর আকাশের তারা। এক একটি করে বিচার করা যাক।

যতক্ষণ সূর্য্যের আলো থাকে সেটা দিন আর বাকী রাত্রি এ ধারণা খুব আগে থেকেই মানুষের হয়েছে। আরেকটি জিনিষ দেখতে পাবো যে সূর্য্য রোজ ঠিক এক জায়গায় উঠে না। হয় একটু একটু উত্তরদিকে আর না হয় দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। সূর্য্যের এই উত্তর দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও বদলে বদলে যাবে। প্রথমদিন সূর্য্য কোথা থেকে উঠলো দেখে ঠিক করে রাখলাম। তারপর রোজ রাত্রে শোবার সময় আমাদের গুহার পাথরের দেওয়ালে একটা করে আঁচড় কাটতে লাগলাম একটি দিন ফুরালো। যেদিন তিনশো পঁয়ষট্টির আঁচড় পড়বে তার পরের দিন দেখতে পাবো সূর্য্য উত্তর-দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে তার আগের জায়গাটিতে ফিরে এসেছে। এই ব্যপারটি তখনকার মানুষ লক্ষ করেছিল এবং এর থেকেই প্রথমে বছরের হিসাব সুরু। এর পরে অবশ্য মানুষ জেনেছে যে ঠিক এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী সূর্য্যের চারপাশে একবার ঘুরে এল।

ঋতুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে। আগে ত' ছিলই এখনও অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে দেখতে পাবে ঋতু গুণে গুণে তারা বয়সের হিসাব করে। তুমি একটি ছোট মেয়েকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে এর বয়স কত? তার মা কি বাবা উত্তর দেবে—ও পাঁচটি শীত দেখেছে। বুঝলে ত'? ওর বয়স পাঁচ বছর। শীতের দেশে এরকম কথা বলবে।

এবার চাঁদের কথা বলি। আমরা গুহায় বসে দেখবো চাঁদ বাড়ছে, কমছে প্রতিদিন। প্রতিপদের এক ফালি চাঁদটুকু দেখে যদি রোজ হিসাব রাখতে থাকি তবে দেখবো পূর্ণিমা অমাবস্যা ফিরে যখন প্রতিপদ আবার এল তখন প্রায় তিরিশদিন কেটে গেছে। এই সময়ে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসে। এটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হবে না যে মাসের হিসাব এল এই চাঁদ থেকে? সত্যিই তাই। চাঁদের এই নিয়মমত কমা বাড়া আমাদের মাসের হিসাব দিয়েছে।

আকাশের তারাগুলিও মানুষকে অনেক সাহায্য করে। তারারা আকাশে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো নেই তোমাদের পড়ার টেবিলের বই খাতার মত। ছোট ছোট দলে জোট পাকিয়ে থাকে।

এদের সব নামও আছে। এই তারাপুঞ্জেরা পৃথিবী ঘুরছে বলে ঠিক নিয়মমাফিক আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আসে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। সেজন্য এর থেকেও আমরা বছরের হিসাব খুব সুন্দর ভাবে পাই।

সপ্তাগুলির কিন্তু চাঁদ বা সূর্য্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এ সব মানুষের মনগড়া তৈরী। এজন্য কারুর সপ্তা তিন দিনে কারুর বা পাঁচদিনে খেয়াল মত। আমরা অবশ্য জানি যে বেশীরভাগ পৃথিবীর লোক সাতদিনে সপ্তা হিসাব করে। একবারও যেন ভেবে বসো না যে এই সব হিসাব বা পাঁজিপুঁথী তৈরী ভারী সহজ কাজ। এর মধ্যে অনেক নটখটী হিসাব-নিকাশ আছে।

বছর মাসের হিসাব বোঝা গেল কিন্তু বাকী রইলো একটি সমস্যা। সালগুলি তফাৎ হয় কেন? সাল প্রচলন হয় নানা কারণে। কোন রাজা সিংহাসন পেলেন অমনি হুকুম হ'ল—আজ থেকে আমার নামে নতুন সাল চলুক। ব্যাস অমনি পরের বছর থেকে এক দুই তিন আরম্ভ হ'ল। কেউ বা যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসে সেদিন থেকে নতুন সাল আরম্ভ করলেন। এ ছাড়া মহাপুরুষদের জন্মবছর থেকেও নতুন সাল আরম্ভ হয়েছে। হিন্দুদের শকাব্দা, সন, মুসলমানের হিজরী, ইউরোপীয় সাল এই রকম একটা না একটা কারণে বিভিন্ন সময়ে সুরু হয়েছে সেজন্য আজ এদের পরস্পরের মধ্যে এত অমিল।

মারাত্মক স্বাস্থ্যরক্ষা

বুদ্ধদেব বসু

কলেজে ভর্তি হ'য়ে হষ্টেলে বাসা নিলুম। প্রথম কয়েকদিন ভারি মন-কেমন করতো কিন্তু আস্তে-আস্তে স'য়ে এলো। তারপর একে-একে ক্লাশ পালানো, চপ-কটলেট, আড্ডা, সিনেমা ইত্যাদির স্বাদ পেয়ে কলকাতায় ছাত্রজীবনের সফলতার খুব একটা উঁচু ধাপেই যখন পা দিয়েছি তখন হঠাৎ খবর এলো যে আমার মামা কলকাতায় বদলি হ'য়ে এসেছেন, এবং এর পর থেকে আমাকে তাঁর সঙ্গেই থাকতে হবে।

আমার মামা বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার। সরকারী চাকুরীতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁকে অনেকদিন দেখিনি। সুতরাং তাঁর বাড়ীতে থাকতে আমার একটু লজ্জা বোধ করা অন্যায় নয়। তাছাড়া, এমন অবাধ স্বাধীনতা পাব না সে তো জানা কথা। তাই খবরটা শুনে খুব যে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলুম সে কথা বলতে পারিনে। তবে আমাদের উড়ে ঠাকুরের রান্না, যা একেবারেই আর-না বলিয়ে ছাড়ে, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে, এই যা আশার কথা।

মামা বাড়ী নিয়েছিলেন বালিগঞ্জে, লেকের কাছে। এক বিকেলবেলায় ঘোড়ার গাড়ীর মাথায় আমার সামান্য সম্বল চাপিয়ে সশরীরে গিয়ে তো হাজির হলুম। সামনের ঘরটিতে ঢুকেই দেখি মামা চশমা চোখে কী একখানা বই পড়ছেন। আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'কী চাই আপনার?'

আমি একটুখানি কেশে বললুম, 'আজ্ঞে আমি নন্তু।'

'য়্যাঁ, নন্তু! এত লম্বা হ'য়ে গেছিস!' মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার কাঁধ ধ'রে ক'সে দু'চারবার ঝাঁকুনি দিলেন। 'বাঃ, বেশ, বেশ দিদিকে আমি লিখেছিলুম তোর কথা, আমি কলকাতায় থাকতে তুই কেন হস্টেলে থাকবি? চল্, চল্। মালপত্র কোথায়? এই? মশারি আছে তো?'

'মশারি—'

'নেই তো? যা ভেবেছি! আরে এখানে যে বড্ড মশা।'

'তাই নাকি?'

'তাই নাকি সন্ধেটি হোক না, মজা দেখবি। আর এর মধ্যে তুই কি ভেবেছিস য়্যানোফিলিস নেই? আছে, আছে, আলবৎ আছে। ধর্ না, কোনো রকমে একবার যদি য়্যানোফিলিস কামড়ায়, তবে কি আর উপায় আছে! সঙ্গে-সঙ্গে ম্যালেরিয়া। চল্ দেখি, মশারির একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

আমি লজ্জা ভেঙে বললুম, 'তুমি এত ব্যস্থ হচ্ছ কেন, মামা। শোবো তো সেই রাত্তিরে।'

'তা এখনই ব'লে দিচ্ছি তোকে, মশারি না টাঙিয়ে কিন্তু শুবি নে কখনো,'– বলতে বলতে মামা ভিতরে গেলেন, আমি পিছনে। মামীমা খাবার টেবিলে ব'সে চায়ের ব্যবস্থা করছিলেন, আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে দিতে যাচ্ছিলেন, মামা হেসে বললেন, 'আরে—ও আমাদের নন্তু যে।'

'তাই তো! বাঃ, দিব্যি ফিটফাট বাবুটি হ'য়ে গেছো যে। এসো। বসো এখানে।'

আমার ছুই মামাতো ভাই মোহন আর শোভনের সঙ্গে দেখা হ'লো। মোহন এবারে ম্যাট্রিক দেবে, শোভনের বছর বারো বয়েস। ছেলেবেলায় মোহন আমার খেলার সঙ্গি ছিল, বড়ো হ'য়ে এই প্রথম দেখা। ছু'চারটে কথার পরেই ওর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হ'য়ে গেলো।

মামীমা বললেন, 'বোসো নন্তু চা খাও।'

ডিম্বাকৃতি টেবিলে আমরা সকলে বসলুম। মামীমা আমার সামনে এক পেয়ালা চা আর চীনে বাসনে কিছু খাবার সাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও।'

প্লেটের উপর গোল চাকতি করে কাটা কতকগুলো টোম্যাটো কয়েক টুকরো গাজর আর শশা, আর ঘাসের মতো দেখতে কী খানিকটা জিনিস। আমি মুখ নিচু ক'রে চায়ে চুমুক দিলুম, মনে হ'লো ছুধ-চিনি-মেশানো গরম জল খাচ্ছি। মামীমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললুম, 'চা-টা আর-একটু কড়া হ'লো ভালো হ'তো।'

কথাটা কিন্তু মামার কানে পৌঁছলো, এবং শুনেই তিনি এমনভাবে আঁৎকে উঠলেন যেন কী সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। একখণ্ড কাঁচা গাজর চিবোতে চিবোতে বললেন, 'না না, কখনো না, কড়া চা কখনো খাবিনে। হষ্টেলে থেকে এ-সব বদভ্যাস করেছিস বুঝি? ভাগ্যিস আমি এখানে এসেছিলুম। বরং চায়ে আর-একটু ছুধ মিশিয়ে নে।'

আমি আর কি করি, মাথা নিচু ক'রে ঐ গরম জলই খেতে লাগলুম। মামা

এক টুকরো কাঁচা গাজর চিবোতে-চিবোতে বললেন, কী রে নন্তু, কিছু খাচ্ছিস না যে?'

আমি আড়চোখে একবার থালা-ভর্তি কাঁচা তরকারির দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কিছু খাবো না, মামা। আমার খিদে নেই।'

'খিদে নেই মানে! এই বয়সে খিদে না থেকে পারে! নে, নে, খেয়ে ফ্যাল্। কিছু খারাপ জিনিষ নয়। সব একেবারে ভিটামিনে ভর্তি। খা।'

আমি করুণ সুরে বললুম, 'সত্যি খিদে নেই মামা।' চোখ তুলতেই মোহনের সঙ্গে চোখাচোখি। অতি কাতর চেহারা ক'রে ব'সে ব'সে সে টোম্যাটো চুষছে।'

মামীমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আহা, তোমার ও-সব ঘাসপাতা সকলেই খেতে পারে কিনা! তুমি বোসো নন্তু, আমি তোমাকে একটা ওমলেট আর ভালো এক পেয়ালা চা ক'রে এনে দিচ্ছি।'

সত্যি বলছি, তখন আমার মামীমার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু মামা ব'লে উঠলেন, 'সাবধান, চা কড়া করো না কিন্তু। কড়া চা খেলে কি মানুষ বাঁচে! ওমলেট একটা দিতে পারো—তা ও খাওয়া যা না খাওয়াও তাই। রান্না করলে কি আর ডিমের কিছু থাকে! হ্যাঁঃ, ঘাসপাতা ব'লে ঠাট্টা করলেই হ'লো কিনা! আরে ঘাসই তো আসল! এই যে স্পাইনাক্ শাক দেখছো, এতে যা ভিটামিন আছে, পৃথিবীর আর কোনো খাদ্যে তা নেই। মোহন, শাকটা ফেলে রাখলি যে?'

'খাচ্ছি, বাবা।' সেই অতুলনীয় সাক গলাধঃকরণ করবার সময় মোহনের যা চেহারা হ'লো তা দেখে আমার আর আহারে রুচি রইলো না। মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই নন্তু, তুই দোকানের চপ-কটলেট খাস না তো?'

আমি ঢোঁক গিলে বললুম, 'না তো, মানে—তা—'

'তাহলে তুই ও-সব খাস!' মামা এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি একটি নরমাংসভোজী রাক্ষস বিশেষ। লজ্জায় আমি টেব্‌ল্-ক্লথের সঙ্গে মিসে গেলাম, গলা দিয়ে টুঁ আওয়াজ বেরুলো না। 'ও-সব কুকুর বেড়ালের পচা মাংস নামলো তোর গলা দিয়ে! উঃ! বেঁচে যে আছিস এই ভাগ্যি। যাক্ যা হয়েছে হয়েছে, আর না। যেদিন চপ-কটলেট খেতে ইচ্ছে করবে আমাকে বলবি, বাড়িতেই তৈরী হবে। আমি নিজেই যাবো ম্যুনিসিপাল মার্কেটে, বেছে সেরা মাংস নিয়ে আসব—মাংস চিনে আনা তো সোজা কথা নয়—একটু আনাড়ি লোক পেলেই ওরা দিনকে রাত করে দেয়। আমার বাড়িতে জানিস তো, বাজারের কোনো খাবার কখনো ঢুকতে পায় না; স্বাস্থ্য না থাকলে বেঁচে সুখ কী, আর স্বাস্থ্যের প্রথম সোপানই হচ্ছে—ডায়েট।'

মামার বক্তৃতা শেষ হ'তে-হ'তে মামীমা চা আর একটি ধোঁয়া-ওঠা অমলেট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—'বেচারাকে আর বিরক্ত কোরো না তো বাপু, আমার সামনে ও-সব দিয়ে তিনি বললেন, 'নিশ্চিন্ত হ'য়ে খেতে দাও।'

মামা জবাব দিলেন, 'তোমাদের ভালোর জন্যেই এ-সব করি, কেউ বিরক্ত হ'লো কিনা অত ভাবতে গেলে আমার চলে না। নন্তুর চায়ে দুধ বড়ো কম হয়েছে।' বলতে-বলতে তিনি নিজেই আমার পেয়ালায় গব্ ক'রে কতগুলো দুধ ঢেলে দিলেন। প্রায় কান্না পাচ্ছিলো আমার।

যাক্‌গে, চা-টা মাটি হ'লো কিন্তু অমলেটটা বেশ আরাম করেই খাওয়া গেলো। আমি যতক্ষণ চা খাচ্ছিলাম, মোহন আর শোভন এমন তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো যে আমার মনে হচ্ছিলো ওদের ঈর্ষায় আমি পুড়ে যাবো।

চা-পর্ব শেষ হ'লো ; তারপর মোহনের সঙ্গে গল্প ক'রে, এদিক-ওদিক খানিক ঘুরে বেড়িয়ে সময়টা কাটলো মন্দ না। হস্টেলের বন্ধু-বান্ধবদের জন্য মাঝে-মাঝে মন খারাপ লাগছিলো বটে, কিন্তু সহরের দম-আটকানো হট্টগোল ছেড়ে লেকের ধারের খোলা আকাশ বাতাস ভালোই লাগছিলো। কিন্তু এই লেকের জন্যেই যে এমন শাস্তি পেতে হবে তা কি তখন জানতাম!

রাত্তিরের খাওয়াতেও দেখলুম, সেদ্ধ তরকারির ভাগই বেশী ; লাল রঙের ইয়া মোটা মোটা ভাত, মশলাহীন মাছের ঝোল...যাকে বলে গিয়ে স্বাস্থ্য! সন্দেহ হ'লো, এ-ভাবে কিছুদিন চললে শিগগিরই স্বাস্থ্যের জন্য দেশ-বিদেশে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে, নানা মাসিকপত্রে ছবি ছাপিয়েই আমি দিন-গুজরাণ করতে পারবো, চোখ বুজে পাশ ক'রে বেকার হ'য়ে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

আমার আর মোহনের এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা হ'লো। ঘরের দু'দিকে দু'খানা খাট, আলাদা আলাদা টেবিল চেয়ার, মামা নিজে এসে সব ঠিকঠাক ক'রে দিলেন। যতক্ষণ না আমরা যার যার মশারি ফেলে তার তলায় ঢুকলাম ততক্ষণ তিনি ঘর থেকে গেলেনই না। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, 'তোর মশারিটা একটু পুরোনো রে, ভালো ক'রে গুঁজে-টুঁজে নিস। কালই তোর জন্যে নতুন মশারি আসবে। আর হ্যাঁ—এখন আর পড়াশুনো কি গল্প-টল্প না, আলো নিবিয়ে একেবারে ঘুম।' ব'লে আলোটা তিনি নিজেই নিবিয়ে দিয়ে গেলেন।

খানিক পরে মোহনের গলা শুনলুম, 'নন্তু-দা ঘুমুলে?'

'না, জেগেই আছি।'

'হাতটা একটু বাড়াও তো?'

'কেন, ভয় করে নাকি তোর?'

'আরে না—বাড়াও না।'

আমি লম্বা ক'রে হাতটা বাড়াতেই ওর হাতের সঙ্গে ঠেকলো। মোহন আমার হাতে একটা জিনিস দিয়ে বললে, 'এই নাও।'

'কী এটা?'

'খেয়ে দ্যাখো।'

মুখে দিয়ে দেখি, বিস্কুট।

'এ কী! এখন বিস্কুট খাচ্ছিস নাকি শুয়ে শুয়ে?'

'রোজই খাই।'

'রোজ!'

'কোনোদিন চপ-কটলেটও খাই। পয়সা কম থাকলে ডালমুট কি চীনেবাদাম। কিছু না খেলে রাত্তিরে কি ঘুম হয়! শোভনটা বালিশের নিচে চকোলেট নিয়ে শোয়। ও লুকিয়ে লুকিয়ে এত চকোলেট খায় যে আর-কিছু না খেলেও চলে। আর একখানা নেবে?'

তারপর খানিকক্ষণ দু' বিছানা থেকে শুধু কুড়মুড় শব্দ শোনা যেতে লাগলো। খান আষ্টেক বিস্কুট খেয়ে আমার মনে হ'লো যে এবার পেটটা ভরেছে। বললুম, 'বেশ তোর বুদ্ধি আছে রে মোহন। জীবনে তোর উন্নতি হবে।'

মোহন উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'কাল খানকয়েক কটলেট আনিয়ে রাখবো কেমন?'

'কিন্তু মামা যদি টের পান?'

'পাগল নাকি! বাবা এ-কথা স্বপ্নেও কখনো মনে আনতে পারেন না।' তিনি যদি নিজের চোখেও দেখেন যে আমি কটলেট খাচ্ছি তাহলেও বিশ্বাস করবেন না, মনে করবেন চোখের ভুল।'

আমি পাশ ফিরে বললুম, 'এবার তাহ'লে ঘুমোনো যাক্।'

'তুমি কি খুব শিগগির ওঠো?' মোহন জিজ্ঞেস করলে।

'না, দেরী ক'রেই উঠি। বড্ডই দেরী হ'য়ে যায় এক-একদিন। কেন বল্ তো?

'না, এমনি।'

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম যেন ইস্কুলের ক্লাশে ব'সে আছি, সারা ইস্কুল যাঁর নামে থরথর ক'রে কাঁপে, সেই ভয়ঙ্কর ভবানীবাবু ভূগোল পড়াচ্ছেন। তিনি আমাকে বজ্র-স্বরে জিজ্ঞেস করছেন, 'হোম-টাস্ক এনেছো?' আমি এনেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই

খাতাটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললুম, 'স্যর, আমার খাতাটা—' 'আমার খাতাটা!' দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে একথা ব'লেই ভবানীবাবু আমার চুল ধ'রে ক'ষে টানতে লাগলেন। আমি যতই বলি উঃ, উঃ! ততই তিনি আরো জোরে টানেন। তারপর একবার খুব জোরে তিনি য়্যাসা এক টান মেরেছেন যে সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় ক'রে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি, মামা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্তিরে তিনি এখানে কেন?

মামা আমার কাঁধে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই ওঠ, ওঠ্। চল লেকে বেড়াতে যাই। পাঁচটা বাজে যে!'

পাঁচটা বাজে! কথাটা শুনেই মাথাটা যেন একবার বোঁ ক'রে ঘুরে উঠলো। ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখি, মামার পরনে এক হাফ-প্যাণ্ট আর সার্ট, আর মোহন-শোভনও ঐ বেশে কাঁচুমাচু মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে। মামা বললেন—'শিগগির, আর দেরি না! বাস্‌রে, তোর ঘুম ভাঙাতেই তো পনেরো মিনিট কেটে গেলো। চুল ধ'রে কি সোজা টানতে হয়েছে! চল্ এবার হাফ-প্যাণ্ট প'রে নে।'

টলতে-টলতে বিছানা থেকে নেমে বললুম, 'আমার তো হাফ-প্যাণ্ট নেই।' আচ্ছা ধুতিকে মালকোঁচা দিয়ে নিলেই হবে। কালই একটা হাফ-প্যাণ্ট আনিয়ে দেব তোকে! ও ছাড়া কি আর দৌড়নো যায়!'

দৌড়নো! আমার ইচ্ছে হ'লো, ডুকরে কেঁদে উঠি, কিন্তু বড়ো শক্ত পাল্লায় পড়েছি, ছাড়াছাড়ি নেই। সুতরাং সেই আবছা ভোরে মামার পিছন-পিছন আমরা তিনজন লেকের দিকে চললুম, হাঁটতে-হাঁটতে মনে হচ্ছিলো, রাস্তার উপরেই ঘুমে ঢলে পড়বো।

মামা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন যে রোদটা উঠবে সেটা অল্‌ট্রা ভায়োলেট রেজ্-এ একেবারে ভর্তি। বেলা আটটার পরে আর রোদের কোনো গুণ থাকে না। কিন্তু এ রোদটা যদি রোজ গায়ে লাগাতে পারিস তবে আর কোনো অসুখের ভয় নেই।'

তারপর লেকে গিয়ে সুরু হ'লো দৌড়। মামা দৌড়ন, পিছন-পিছন আমরা দৌড়ই। মামার আদেশে খানিক জিরিয়ে নিই, আবার এক দমক দৌড়ই। রোদ উঠলো, চারিদিকে লোকজন দেখা দিলো, তখন আমরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ডীপ-ব্রীদিং করছি। অবশেষে বাড়ি যখন ফিরে এলুম আমার ঠিক মনে হ'লো যে আমি ম'রে গেছি।

সেদিন আর কলেজে গেলুম না; মামার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সারা দুপুর প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোলাম। বিকেলে মামাকে বললুম, 'মামা একবার মা-কে দেখে আসতে ইচ্ছে করছে বড্ড।'

মামা হেসে বললেন, 'তুই দেখছি ভারি ছেলেমানুষ।'

আমি আরো একটু ছেলেমানুষ সেজে বললাম, 'যাই একবার, কেমন? আজ রাত্রেই যাই। কাল রবিবার, তারপর সোম মঙ্গল ঈদের ছুটি—কি বলো?'

"আচ্ছা, যা।'

পরের দিনই রংপুর। মা দেখে বললেন, 'কী রে, হঠাৎ চলে এলি যে?

আমি বললুম 'তোমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে করলো, মা।'

কথাটা শুনে মা খুব খুসি হলেন এবং তারই সুযোগ নিয়ে আমি বললুম, 'ছ্যাখো মা, কলকাতার কলেজে আমি আর পড়বো না। মোটে ভালো লাগে না সেখানে। আমাদের রংপুরের কলেজ তো বেশ ভালো।'

সেই থেকে রংপুর কলেজেই পড়ছি।

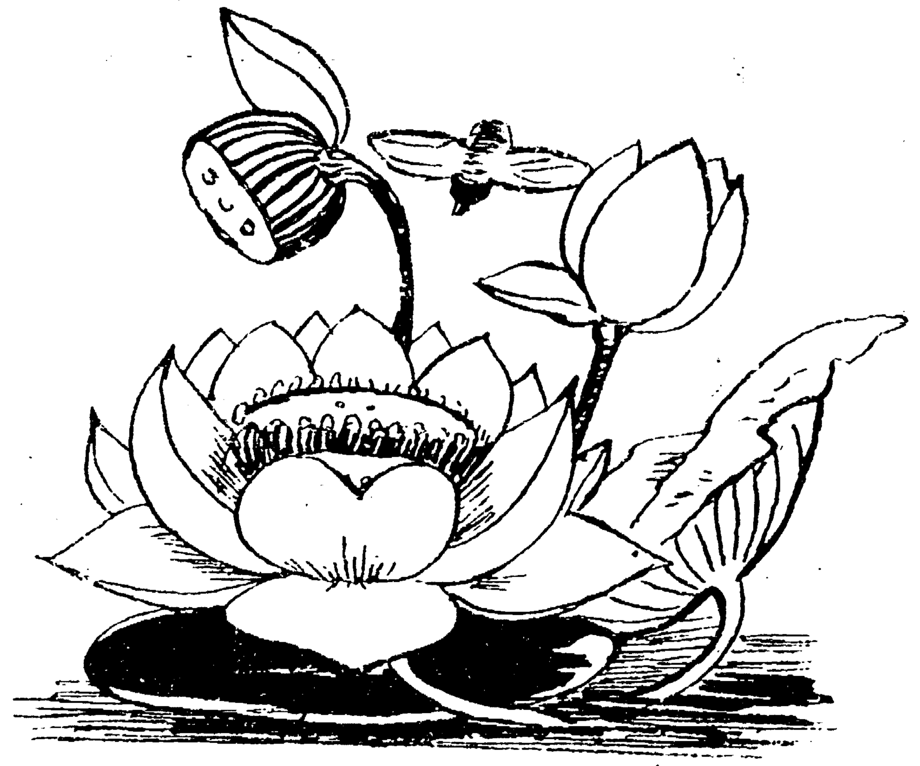

কোল্‌কাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পথ :

নির্জ্জন রাত্তিরে পথ বেয়ে চলো গো,
এই সহরের :
কালো পথে বাঁকা পথে এঁকে বেঁকে চলো গো,
এই প্রহরের।

নির্জ্জন আলোগুলি ঘুমে ঢুল ঢুল্‌ছে
বাড়ীগুলি চুপ্‌চাপ্‌, স্তব্ধ :
নীল নীল নীল রাত যেন হাই তুল্‌ছে
কোথা গেল রকমারি শব্দ ?

কোল্‌কাতা ঢুল্‌ছে
আর হাই তুলছে ;
চলো যাই বার হই নির্জ্জন পথে গো!
কালো পথে বাঁকা পথে এঁকে বেঁকে চলো গো।

পার্ক :

পার্কেই ভালো ; বোস্‌বো না তবু বেঞ্চিতে।
এতো আলো ছাই কে চেয়েছে বলো : বিচ্ছিরি।
চলো মাঝখানে, ওখানেতে ঘাস : ঝুম্‌ঝুম্‌ ;
ঘাসেতেই ভালো, বোস্‌বো না আমি বেঞ্চিতে।

পথে পথে শোনো 'কুল্পি'র ডাক, কি সুন্দর
হ্যাপি-বয়' খাবো, ছ আনায় ছুটো ; বেশ, কেমন ?
গল্পের ফাঁকে ঠাণ্ডায় ওই মিষ্টি বরফ
ভাবতেও ভালো ; পার্কেই চলো ; কি সুন্দর!

পার্কেই যাবো আমি আর ঝুনু ; বেশ, কেমন ?
ফুরফুরে হাওয়া ; ঝুম্‌ঝুমে ঘাসে গড়াতে বেশ!
চিনাবাদামের খোলাগুলি শুধু ভাঙ্গবে, আর
'কুল্পি'র ডাক শুন্‌বো আমরা ; বেশ, কেমন ?

বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্র-লাভ!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

পটল আর কদিন খাওয়া চলে ? ঐ পৌষমাসের গোড়ার কদিনই যা! হ্যাঁ, ঐ **প্রথম** উঠ্‌তির মুখেই, যা এক-আধটা পটল-ভাজা মুখে তোলা যায়। কিন্তু কদিনই বা **পটলের** দর থাকে ? ষোলো টাকা হতে না হতে চার টাকায় নেমে গেছে, আর, চার টাকা **থেকে,** দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, সটান্‌ একেবারে চার-চার-আনা সের!

তারপর আর পটল খাওয়া পোষায় না।

অন্ততঃ, বিশ্বপতি বাবুর পোষায় না। রামাশামা যত্নমধু যে-ই চার আনা ফেল্‌তে পারে, সে-ই যখন পটল তুল্‌তে পারে, তখন আর তাঁর পটলে রুচি থাকে না, পটলের ওপর থেকে তাঁর চিত্তই চলে যায় : তাঁর লোলুপতা লোপ পেয়ে, পটল-ভীতিই জাগ্‌তে থাকে তখন।

পটলের সাধারণ-তন্ত্রে তাঁর উৎসাহ নেই। বাজারে পটলের দর গেল, তো, বিশ্বপতি বাবুর কাছে তার আদরও গেল।

সেদিন সাহেব পাড়ার ইউয়িং কোম্পানীর দোকানে জামাটা করিয়ে অবধি মনটা ওঁর ভালো নেই। প্রাণের মধ্যে কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে,—সত্যি, ওহেন দুর্ঘটনার পর, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কোনো মানেই হয় না, জীবন ধারণের আনন্দই তাঁর অন্তর্হিত হয়েছে সেদিন থেকে।

অমন যে ইউয়িং কোম্পানী, কতবার ওখানে জামা করিয়েছেন, কত ডজনই তো করিয়েছেন, সেখানে কি না এবার পঞ্চাশ টাকা গজের উপরে সার্জ্জই নেই! বরাত মন্দ আর কাকে বলে ? এই তো গেল শীতেও, ছুশো টাকা গজের ভিনিসিয়ান্‌ সার্জ্জ পেয়েছেন, পীকক্‌ রঙের, এবং কত সব তোফা ডিজাইনের,—কিন্তু এবার কি দুঃসময় পড়েছে, দ্যাখো দিকি ? পঞ্চাশ টাকা গজের সস্তা খেলো কাপড়ে কখানাই বা জামা করানো যায় ? বা করতে সাধ হয় মানুষের ? আর সে-জামা গায়ে দিয়ে কি বাইরে বেরুনো চলে ? কোনো রকম দায়-সারা-গোছ্‌ ঘরে পরে থাকা ছাড়া গতি কি ? একেবারে ঘর-জামাই হবার গতিক্‌!

কারা যে আগে এসে তাঁর ওপরে টেক্কা মেরে গেছে, টের পাচ্ছেন না বিশ্বপতিবাবু। নেটিভ্‌ ষ্টেটের রাজারাই কি না কে জানে! কিন্তু মনটা ওঁর খুঁত খুঁত কর্‌ছে সেদিন থেকেই।

কিন্তু যখন তিনি দেখ্‌তে পান্, তাঁর আলাপীদের অনেকে, তিন টাকা গজের সার্জ্জের শার্ট করিয়েই আনন্দে আটখানা, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। নিশ্চয় ওরা চার আনা সেরের পটলও খায়। হ্যাঁ, তিনি ঠিক ধরেছেন। এমন কি জিজ্ঞাসাবাদে এও জানা যায়, চার পয়সা সের হলেও ওদের মুখে তুলতে বাধে না। এত সস্তার পটল খেয়ে কি করেই যে টিকে থাকে এবং কেনই বা খায়? ভেবেই পান্ না তিনি, বাস্তবিক কী আশ্চর্য্য টেঁকসই এরা! যতই ভাবেন ততই বিস্মিত হন্ বিশ্বপতিবাবু।

সত্যি, এত বিস্ময় জনক বস্তুও আছে এই পৃথিবীতে! চার আনা সেরের পটলও খায়, চার টাকা গজের জামাও গায়ে ছ্যায়! অদ্ভুত! ভেবেই পান না বিশ্বপতিবাবু! ভাব্‌তেই তাঁর গায়ে কাঁটা ছ্যায় কিরকম!

আসল কথা বল্‌তে কি, সস্তার কিস্তিতেই তো তিনি মাৎ হবার দাখিল! আক্রা জিনিষের অভাবেই বেজায় কাবু হয়ে রয়েছেন, বল্‌তে গেলে! দামী জিনিস, বেশি কই আর বাজারে? অথচ এই সব সস্তা আর খেলো জিনিষ নিয়েই তো চলে যাচ্ছে দুনিয়ার! এবং ব্যবহার করে, সবাই বেঁচেও তো আছে বেশ। ভাবেন আর অবাক্ হন বিশ্বপতি বাবু।

এহেন বিশ্বপতিবাবুর বরাতে বোধ করি আরো বিস্ময়ের ধাক্কা লেখা ছিল। তা নইলে একদা বিকেলে, গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়ে তাঁর মোটরের কল বিগ্‌ড়োবে কেন হঠাৎ?

বছর-পুরণো গাড়ীখানা বদ্‌লে কদিন আর এটা কিনেছেন! নাইন্‌টিন থার্‌টি নাইনেরই মডেল্! কিন্তু সেই বস্তুই যে বলা নেই কওয়া নেই, বদ্‌মাইসি স্থরু করবে, কে আর জানে বলো! বিরক্ত হয়ে বিশ্বপতি গাড়ী থেকে নেমে পড়েছেন। বিড়ম্বনা আর কাকে বলে!

শোফার্ বলেছে: "পেছন থেকে একটু ঠেল্‌লে বোধ হয় গাড়ীটাকে চালু করা যায়! কিন্তু—কিন্তু আমার একার দ্বারা হবে কি?"

ইঙ্গিতটা সে ইসারাতেই সারে।

কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মনে কোনো 'কিন্তু' নেই, তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন: "না বাপু, ও-সব ঠেলাঠেলি-কর্ম্ম আমার না। গায়ে অত জোর নেই আমার। চার আনা সেরের গোঁয়ার পটোল্‌খোররাই পারে মোটর ঠেলতে। আমি পার্‌বনা বাপু। তুমি বরং তার চেয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলে' তিনি পকেট্ থেকে গ্রিণ্ড্‌লে ব্যাঙ্কের খুদে চেক্ বইটা বার করেছেন এবং তাঁর দামী পার্কার্-কলমে একটা মোটা অঙ্ক লিখে, পাতাটিকে বৃন্তচ্যুত করে' শোফারের হাতে দিয়েছেন:

"—এইটা নিয়ে দ্যাখো গে সাহেব-কোম্পানিগুলোয়। ডজ্ হয়, শেভ্‌রলে হয়, বুইক্ হয়—যাহয় একটা কিনে আনো গে পছন্দ করে'। আমি এধারে হাওয়া খাচ্ছি—বেড়িয়ে-বেড়িয়েই হাওয়া খাচ্ছি ততক্ষণ।"

ট্রামে করে', এমন কি ট্যাক্‌সি চেপে, বাড়ী ফেরার কথা, ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে জাগেনি। দায়ে পড়ে ট্যাক্‌সিতে দুএকবার চাপ্‌তে হলেও, ট্রামে তিনি জীবনে কখনো পদার্পণ করেন নি। কি করে' যে অত লোক একটা মাত্র কাম্‌রায় কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করে যায়! কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি না হলেও, গুঁতোগুঁতিতো বটেই! কিছুতেই তিনি ভেবে পান্ না। আর ট্যাক্‌সি-মিটারের আট আনা মাইল, ভাব্‌তেই তো তিনি কাহিল হয়ে পড়েন! মাত্র আট আনা! বাড়ী পৌঁছতে তাঁর দেড় টাকাও হয়ত পড়বে না—ছি ছি চক্ষু লজ্জার চরম!

যাক্‌গে! ততক্ষণ হাওয়াই খাওয়া যাক্। প্রথম-শীতের পড়ন্ত রোদের সঙ্গে শির্‌শিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বেশ মিষ্টিই লাগে! কিন্তু অত সস্তা দামের জামা গায়ে, পাছে কেউ দেখে ফ্যালে, এই যা তাঁর আশঙ্কা! গরীব লোক বলে' আজ্ঞা-ভাজন হতে নিতান্তই তিনি নারাজ।

তবে তাঁর ভাগ্য ভালো! মাঠের ও-ধারটায় দুটি ছোট্ট ছেলে আর মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। কেবল তারাই দুজনে খেলা কর্‌ছিল। হুটোপাটি করে' ছুটোছুটি লুটোপুটি করে' খেল্‌ছিল নিজেদের মধ্যে।

নাঃ, সন্দিগ্ধস্বভাব কোনো ব্যক্তি—এমন কি, ভদ্র লোক বলে সন্দেহ করা যেতে পারে এমন কোনো প্রাণীরই প্রাদুর্ভাব নেই। বিশ্বপতি বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি কর্‌লেন—আঃ!

কিন্তু কতক্ষণেরই বা স্বস্তি! দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, টুনু লাফিয়ে এসেছে তাঁর কাছে: "দাওতো তোমার ফাউন্টেন্‌টা!"

ঈষৎ ইতস্ততঃ করে' বিশ্বপতি বাবু কলমটা হাতছাড়া করেছেন।

নেড়ে চেড়ে দেখে শুনে টুনু বলেছে: "এর চেয়ে আমার ফাউন্টেন্‌টা ঢের ভালো। কেমন রঙচঙে সেটা। বড়দা দিয়েছিল আমায়। বা-রো আ-না দাম! বুঝ্‌লি বেণু, বারো আনা?"

বেণু এগিয়ে আসে বিশ্বপতি বাবুর কাছে: "আমার কপালে একটা টিপ্ এঁকে দাও।"

উপু হয়ে বসে—হ্যাঁ, সেই মাটীর ওপরেই, ঘেসো জমির ওপরেই উপু হয়ে বিশ্বপতি টিপ্ আঁকার দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হন্। আশ্চর্য্য কাণ্ডই বটে!

"আর গোঁফ করে' দাও আমার।" গুম্ফ লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা টুনুর। এক নিশ্বাসে বড় হবার দুরভিসন্ধি।

বিশ্বপতি বাবুকে গোঁফ বানিয়ে দিতে হয়। গুম্ফলোভী ছোড়্‌দা এবং টিপ্‌-লুব্ধ তার ছোট বোন্ দুজনেরই। যথাসাধ্য ভালো করে' আঁক্‌তেই চেষ্টা করেন, তবু তাঁর শিল্প রচনায় খুঁৎ থেকে যায়, এক পাশের চেয়ে অন্য পাশের গোঁফটা বেশি লম্বা হয়ে পড়ে, একটার চেয়ে আরেকটা অধিকতর ঘনীভূত দেখায়, বিশ্বপতি বাবুর ঠিক মনঃপূত হয় না। নাঃ, তাঁর নিজের পরিপুষ্ট এবং লীলায়িত গোঁফের কাছে এসব গোঁফ দাঁড়াতেই পারে না, নিজের ঘন-সন্নিবিষ্ট সূচ্যগ্রতায় তা দিতে দিতে তিনি ভাবেন।

কিন্তু টুনু-বেণুর কোনো বিকার নেই। ততক্ষণে তারা নতুনতর প্রস্তাব পেড়ে ফেলেছে, বোধ করি, বিশ্বপতি বাবুকে পুরস্কৃত করার মৎলবেই?

"তুমি ঘোড়া হও। হও না?"

বিশ্বপতি বাবুর বিস্ময় লেগেছে। "ঘোড়া? ঘোড়া আবার কি?" প্রশ্ন করেছেন তিনি।

"বাঃ, ঘোড়া হতে জানো না? এই যে, এম্‌নি করে' ঘোড়া হতে হয়। হও না তুমি।"

টুনু স্বয়ং উদাহরণ হয়ে' চতুস্পদ সেজে, তাঁকে পথ প্রদর্শন কর্‌তে চেয়েছে।

"কেন? ঘোড়া হতে যাবো কেন?" বিশ্বপাত বাবুর তথাপি বিস্ময় যায় নি।

"বাঃ, আমরা চাপ্‌ব যে! চাপ্‌ব তোমার পিঠে!" টুনুর সরল স্বীকারোক্তি।

বিশ্বপতি বাবু কিন্তু বিব্রত বোধ করেছেন—হ্যাঁ, একটু বিব্রতই! অবশ্য, উপু যখন হতে পেরেছেন, তখন ঘোড়া হওয়া আর বেশি কি, খুব সুদূর পরাহত ছিল না, সত্যিই,—তেমন কল্পনাতীত কাণ্ড কিছু নয়তো! তথাপি বিশ্বপতি বাবু গ্রীবা বক্র করে' মৌন অসম্মতি জানিয়েছেন—ঘোড়াদের যেমন চিরকেলে দস্তুর!

জানোয়ারদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য করা টুনুর স্বভাবসিদ্ধ নয়। সে তাঁর পিঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং বেণু তার ঠিক পিঠেই। কাজেই চতুস্পদে পরিণত হতে যেটুকু বাকী ছিল, এ-হেন পৃষ্ঠ-পোষকতার ধাক্কায়, তার আর বিলম্ব থাকেনি।

তারপর মহাসমারোহে, তারা তাঁকে চালিয়ে নিয়ে ফিরেছে। যদিও, তাঁর নিজের ধারণায়, তিনিই চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তাদের। বলাবাহুল্য, এই পরিচালনা-ব্যাপারে কি আসল আর কি ভেজাল, সব ঘোড়ারই ধারণা একেবারে একরকম। এবং দস্তুরমতো বদ্ধমূল।

অশ্বত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুলকিত হন্‌নি বিশ্বপতি, এমনকি, তিনি যে পদমর্য্যাদায় বঞ্চিত হয়েছেন, এহেন সন্দেহও তাঁর মনে উদিত হয়নি, কিন্তু যখন টুনু, লাগামের অভাবে, এবং বোধ করি, নাগালের মধ্যে পেয়ে, তাঁর লীলায়িত বিলাসিতায়, তাঁর পরিপুষ্ট গোঁফের দুই সীমান্ত প্রদেশে হস্তক্ষেপ করতে চাইল, তখন তিনি সত্যিই ভারী বিচলিত হয়ে পড়্‌লেন। তিনি ঘাড়-ঝাঁকি দিলেন, কাল্পনিক কেশরদের মধ্যে আন্দোলন-সৃষ্টির চেষ্টা কর্‌লেন—কিন্তু সমস্তই বৃথা। টুনু যেন মুক্তহস্ত এবং তাঁর গো-বেচারা গোঁফ-দুটি একান্তই একাকী আর অসহায়। অগত্যা তাঁকে হ্রেষাধ্বনি কর্‌তে হলো। স্বভাবতঃই, না করে' তিনি পারেন না।

কেন যে শিশুপালের প্রতি মনে মনে তাঁর ভয় ছিল, এখন বুঝ্‌তে পার্‌লেন বিশ্বপতিবাবু। কেন যে সেই মর্ম্মান্তিক ভয়ের বশবর্ত্তী হয়ে, এতদিন বিয়ে পর্য্যন্ত কর্‌বার তাঁর দুঃসাহস হয়নি, তাও এখন তাঁর হৃদয়ঙ্গম হোলো। হ্যাঁ, এইজন্যই তিনি নিজের বিয়ে দিতে পারেন নি এতদিন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে এতদূর মারাত্মক হতে পারে, এতখানি তাঁর ধারণার বাইরেই ছিল। অথচ, এমন এক আধটা নয়—কত গণ্ডা, কত লক্ষ গণ্ডাই এজাতীয় দুর্ব্বহভার পিঠের ওপর নিয়ে পৃথিবীকে চল্‌তে হচ্ছে। পৃথিবী যে কি করে' সঠিক চল্‌ছে, সেইটাই আশ্চর্য্য ঠ্যাকে বিশ্বপতির।

হ্রেষা-ধ্বনিতে ঘাবড়াবার ছেলে নয় টুনু। এমন কত দুষ্টু ঘোড়াকেই সে সায়েস্তা করেছে অনতিদীর্ঘ জীবনে। উক্ত হ্রেষা রবে সে পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরুক্তি শুন্‌তে পায়। গোঁফ ছেড়ে দিয়ে সে বিশ্বপতির কান পাক্‌ড়ে ধরে।

এবার অশ্ববরের অসহ্য হয়ে পড়ে। ভারী এবং ভরাট্ গলায়, ভারিক্কি চালের তিনি গগনভেদী এক চিঁহিহি চিঁহিহি ডাক ছাড়েন। সমুচ্চ কণ্ঠে তাঁর প্রতিবাদ ঘোষণা করেন। এবং উৎকণ্ঠাও।

টুনু কিন্তু নাছোড় বান্দা। পাকাসওয়ার মাত্রই তাই। সহজে তারা লাগাম ছাড়ে না। টুনুও আরো শক্ত করে' ধর্ত্তব্যকে বাগিয়ে ধর্‌ল, এমনকি টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বার মতই করে' ফেল্‌ল প্রায়।

অন্য ঘোড়ার কথা বলা যায়না, কিন্তু বিশ্বপতির নিজের লাগামের প্রতি কিছু মমতা ছিল। অস্বাভাবিক তো বটেই, এমন কি, সেটাকে অন্যায় রকমের পক্ষপাতই বলা যেতে পারে। লাগাম বাঁচাবার জন্য তিনি ঘাড় ঝাঁকিয়ে, টুনুর হাত কাম্‌ড়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু পেরে উঠ্‌লেন না। ঘোড়াদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি সফল হয়?

কি করবেন বিশ্বপতিবাবু? তাঁর পিঠের উপর টুনু, এবং টুনুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে—

প্রায় পৃথ্বিরাজ আর সংযুক্তার মতই (ঐতিহাসিক ছবিতে যেমনটি দেখা যায়)—একেবারে অব্যবহিত ভাবে বিজড়িত শ্রীমতী বেণু। ওজনে অবশ্য খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশি। বিশ্বপতিবাবু এবার পিঠ নাড়তে স্বুরু ক'রে দিলেন, পছন্দসই সওয়ার না পেলে সব ঘোড়াই সাধারণতঃ যা করে' থাকে। এমন কি ওদের ধরাশায়ী কর্‌বার জন্য, বদ্ধপরিকর হয়ে, পৃষ্ঠদেশে তিনি ভয়ানক রকম ভূমিকম্পই লাগিয়ে দিলেন শেষটায়।

টুনুদের কিন্তু ওস্তাদ অশ্বারোহী বল্‌তে হবে, ঘোড়ার দুর্ব্ব্যবহারে ওরা ভড়্‌কায় না। হেলে পড়ে, কাৎ হয়, দুল্‌তে থাকে, পড়-পড় হয় পর্য্যন্ত, কিন্তু ভূমিসাৎ হয় না কিছুতেই। সুবিধে কর্‌তে না পেরে, বিশ্বপতিবাবু অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর্‌লেন—ঘোড়াদের অব্যর্থ অস্ত্র। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে তিনি সোজা খাড়া হয়ে উঠ্‌লেন। অন্য উপায় না দেখে অবশেষে।

ঘোড়ার বেচালের মুখে টুনু কান ছেড়ে কামিজ ধরে ফেলেছিল, ফলে ইউয়িং কোম্পানীর অমন দামী জামাটা, ঘাড় থেকে বরাবর দু'ফালি হয়ে নেমে এসেছে। টুনুর নামার সঙ্গেই এবং বিশ্বপতিবাবুর প্রতিক্রিয়া হয়েছে টুনুর পিঠে, বেণুর শ্রীহস্তে। বেণুও দাদার জামাটা ছিঁড়তে পেরেছে একই সময়ে।

বিশ্বপতিবাবুর কামিজে নিজের কীর্ত্তি দেখে টুনুর লজ্জা হয়, সে নিজের জামার বিচ্ছিন্ন দুরবস্থা দেখিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বিশ্বপতিবাবু টুনুর দ্বিধান্বিত শার্ট ছ্যাখেন, অনাবৃত পিঠও দেখতে পান। অস্তমান সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশ—গোলাপী গায়ের রঙ্‌! বিশ্বপতিবাবুর বিস্ময় লাগে। ভগবান নিজের হাতের জ্বল্‌জ্বলে পোযাক পরিয়ে ওকে পাঠিয়েছেন, তারওপরে, জামাপরা ওর বাহুল্যমাত্র! এমনকি ইউয়িং কোম্পানীর জামাও। খালি গায়েই ওকে ভালো মানায়। বিধাতার স্বহস্ত-রচনা ওর সর্ব্বাঙ্গে ওতোপ্রোতো,—অচিন্ত্যনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় এ হেন পরমাশ্চর্য্য দেখে বিশ্বপতিবাবুতো বিস্ময়াবনত হয়ে পড়েন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই।

বিশ্বপতিবাবু নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পান্‌না, কিন্তু তাঁর আব্‌লুস্‌ বিনিন্দিত রঙের সঙ্গে তাল্‌ রেখে, সেটা কেমন খোল্‌তাই হয়েছে আন্দাজ করা শক্ত হয়না তাঁর পক্ষে। বিশ্বের লজ্জা বিশ্বপতির পিঠে ভারী হয়ে ওঠে—বিশ্বপতির নগ্ন পিঠে। জীবনে এই প্রথম নিজের জন্য তিনি দুঃখবোধ করেন,—ষোলোটাকা সেরের পটল খেয়েও, অমন বহুমূল্য মোটরে চেপেও, নিজেকে তাঁর নগণ্য মনে হয় আজ। একটুক্‌রো সোনার কাছে এক গাদা লোহার মতো অকিঞ্চিৎকর বোধ হতে থাকে।

ততক্ষণে বেওয়ারিশ মোটরকারটা নজরে পড়েছে টুনুর। সে এক ছুটে দৌড়ে গেছে তার কাছে।

"কার গাড়ী? তোমার?"

বিশ্বপতি ঘাড় নেড়েছেন: "কে জানে কার!"

"বেণু আয়, ঠেলি এটা। তুমিও ঠেলনা কেন, ভদ্রলোক! কেউতো নেই এখানে, বক্‌বে না কেউ।"

তাঁরা তিনজনে মিলে মহা উৎসাহে মোটরটা ঠেল্‌তে স্বুরু করেছেন। এবং কী আশ্চর্য্য, ঠেলেও নিয়ে চলেছেন, বেশ অনেক দূর পর্য্যন্ত। ঠেলাগাড়ীর মতো হেলাভরেই নিয়ে চলেছেন। বিশ্বপতির আজ আর বিস্ময়ের সীমা রইলনা! টুনু এবং বেণুর ঔদার্য্যে, নেহাৎ বাজে-বাজে নামমাত্র অশ্বই তিনি হন্‌নি, সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের অশ্বশক্তিও সাক্ষাৎ অর্জ্জন করেছেন! নইলে অত বড়ো গাড়ী তিনি ঠেল্‌তে পারেন, ঘুণাক্ষরেও তা কোনোদিন তাঁর ধারণার মধ্যে ছিল না।

মোটর চালনা সাঙ্গ হলে, বেণু বল্ল: "সন্ধ্যে গেল ছোড়্‌দা, বাড়ী যাবিনে?"

টুনু বল্ল: "কাল্‌কে তুমি এসো আবার! কেমন, আস্‌বে তো? কাল তোমাকে হাতী বানাবো।"

টুনুর জবাবে বিশ্বপতিবাবু কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেন। তার মানে, বয়েই গেছে আমার হাতী হতে! ওদের আস্পর্দ্ধা দেখে বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। হাতীত্বের সম্ভাবনাতেও তেমন উল্লসিত হতে পারেন না। বাক্যস্ফূর্ত্তি তো গেছেই, মনের স্ফূর্ত্তিও তাঁর চলে যায়।

বিশ্বপতিবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে মাঠ ভাঙ্‌তে স্বুরু করেন। কোন্‌দিকে যে চলেছেন তাঁর খেয়াল থাকে না। তাঁর একটা মোটর বান্‌চাল, এবং আর একটা সদ্য-আসন্ন সে কথাও তিনি ভুলে যান্‌। চেক্‌ বই পকেটে থেকেও তিনি নিঃস্ব আজ, বিস্ময়ের ভাবে মুহ্যমান্‌।

বাস্তবিক্‌ কী ভয়ানক এই সব ছেলে মেয়ের দল! কী বিভীষিকা এরা পৃথিবীর! এদের জন্য কী না করা যায়, কী যে না হওয়া যায়! হাতী কিম্বা ঘোড়া হওয়া তো সামান্য কথা, হয়ত চেষ্টা কর্‌লে, উট্‌ও হওয়া যায় এদের খাতিরে। এদের আওতায় থাক্‌বার জন্য কোন রকমে টিকে থাকাটাই চমৎকার, কায়ক্লেশে বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয়, দুঃখের মধ্যেও যেন সুখের বিষয়! এদের জন্যই চার পয়সা সেরের পটল খেয়েও জীবিকা নির্ব্বাহ করে' পৃথিবীর

প্রায় পৃথ্বিরাজ আর সংযুক্তার মতই (ঐতিহাসিক ছবিতে যেমনটি দেখা যায়)—একেবারে অব্যবহিত ভাবে বিজড়িত শ্রীমতী বেণু। ওজনে অবশ্য খুব বেশি নয়, কিন্তু প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশি। বিশ্বপতিবাবু এবার পিঠ নাড়তে স্বুরু ক'রে দিলেন, পছন্দসই সওয়ার না পেলে সব ঘোড়াই সাধারণতঃ যা করে' থাকে। এমন কি ওদের ধরাশায়ী কর্‌বার জন্য, বদ্ধপরিকর হয়ে, পৃষ্ঠদেশে তিনি ভয়ানক রকম ভূমিকম্পই লাগিয়ে দিলেন শেষটায়।

টুনুদের কিন্তু ওস্তাদ অশ্বারোহী বল্‌তে হবে, ঘোড়ার দুর্ব্ব্যবহারে ওরা ভড়্‌কায় না। হেলে পড়ে, কাৎ হয়, দুল্‌তে থাকে, পড়-পড় হয় পর্য্যন্ত, কিন্তু ভূমিসাৎ হয় না কিছুতেই। সুবিধে কর্‌তে না পেরে, বিশ্বপতিবাবু অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ কর্‌লেন—ঘোড়াদের অব্যর্থ অস্ত্র। পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে তিনি সোজা খাড়া হয়ে উঠ্‌লেন। অন্য উপায় না দেখে অবশেষে।

ঘোড়ার বেচালের মুখে টুনু কান ছেড়ে কামিজ ধরে ফেলেছিল, ফলে ইউয়িং কোম্পানীর অমন দামী জামাটা, ঘাড় থেকে বরাবর দু'ফালি হয়ে নেমে এসেছে। টুনুর নামার সঙ্গেই এবং বিশ্বপতিবাবুর প্রতিক্রিয়া হয়েছে টুনুর পিঠে, বেণুর শ্রীহস্তে। বেণুও দাদার জামাটা ছিঁড়তে পেরেছে একই সময়ে।

বিশ্বপতিবাবুর কামিজে নিজের কীর্ত্তি দেখে টুনুর লজ্জা হয়, সে নিজের জামার বিচ্ছিন্ন দুরবস্থা দেখিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। বিশ্বপতিবাবু টুনুর দ্বিধান্বিত শার্ট ছ্যাখেন, অনাবৃত পিঠও দেখতে পান। অস্তমান সূর্য্যালোকে সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশ—গোলাপী গায়ের রঙ্! বিশ্বপতিবাবুর বিস্ময় লাগে। ভগবান নিজের হাতের জ্বল্‌জ্বলে পোযাক পরিয়ে ওকে পাঠিয়েছেন, তারওপরে, জামাপরা ওর বাহুল্যমাত্র! এমনকি ইউয়িং কোম্পানীর জামাও। খালি গায়েই ওকে ভালো মানায়! বিধাতার স্বহস্ত-রচনা ওর সর্ব্বাঙ্গে ওতোপ্রোতো,—অচিন্ত্যনীয় এবং অনির্ব্বচনীয় এ হেন পরমাশ্চর্য্য দেখে বিশ্বপতিবাবুতো বিস্ময়াবনত হয়ে পড়েন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই।

বিশ্বপতিবাবু নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পান্‌না, কিন্তু তাঁর আব্‌লুস্ বিনিন্দিত রঙের সঙ্গে তাল্ রেখে, সেটা কেমন খোল্‌তাই হয়েছে আন্দাজ করা শক্ত হয়না তাঁর পক্ষে। বিশ্বের লজ্জা বিশ্বপতির পিঠে ভারী হয়ে ওঠে—বিশ্বপতির নগ্ন পিঠে। জীবনে এই প্রথম নিজের জন্য তিনি দুঃখবোধ করেন,—ষোলোটাকা সেরের পটল খেয়েও, অমন বহুমূল্য মোটরে চেপেও, নিজেকে তাঁর নগণ্য মনে হয় আজ। একটুক্‌রো সোনার কাছে এক গাদা লোহার মতো অকিঞ্চিৎকর বোধ হতে থাকে।

ততক্ষণে বেওয়ারিশ মোটরকারটা নজরে পড়েছে টুনুর। সে এক ছুটে দৌড়ে গেছে ...র কাছে।

"কার গাড়ী? তোমার?"

বিশ্বপতি ঘাড় নেড়েছেন: "কে জানে কার!"

"বেণু আয়, ঠেলি এটা। তুমিও ঠেলনা কেন, ভদ্রলোক! কেউতো নেই এখানে, ...বে না কেউ।"

তাঁরা তিনজনে মিলে মহা উৎসাহে মোটরটা ঠেল্‌তে সুরু করেছেন। এবং কী আশ্চর্য্য, ...ও নিয়ে চলেছেন, বেশ অনেক দূর পর্য্যন্ত। ঠেলাগাড়ীর মতো হেলাভরেই নিয়ে চলেছেন। বিশ্বপতির আজ আর বিস্ময়ের সীমা রইলনা! টুনু এবং বেণুর ঔদার্য্যে, নেহাৎ ...জে-বাজে নামমাত্র অশ্বই তিনি হন্‌নি, সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের অশ্বশক্তিও সাক্ষাৎ অর্জ্জন করেছেন! নইলে অত বড়ো গাড়ী তিনি ঠেল্‌তে পারেন, ঘুণাক্ষরেও তা কোনোদিন তাঁর ধারণার মধ্যে ছিল না।

মোটর চালনা সাঙ্গ হলে, বেণু বল্ল: "সন্ধ্যে গেল ছোড়দা, বাড়ী যাবিনে?"

টুনু বল্ল: "কাল্‌কে তুমি এসো আবার! কেমন, আস্‌বে তো? কাল তোমাকে হাতী বানাবো।"

টুনুর জবাবে বিশ্বপতিবাবু কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেন। তার মানে, বয়েই গেছে আমার হাতী হতে! ওদের আস্পর্দ্ধা দেখে বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরয় না। হাতীত্বের সম্ভাবনাতেও তেমন উল্লসিত হতে পারেন না। বাক্যস্ফূর্ত্তি তো গেছেই, মনের স্ফূর্ত্তিও তাঁর চলে যায়।

বিশ্বপতিবাবু বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে মাঠ ভাঙ্‌তে সুরু করেন। কোন্‌দিকে যে চলেছেন তাঁর খেয়াল থাকে না। তাঁর একটা মোটর বান্‌চাল, এবং আর একটা সদ্য-আসন্ন সে কথাও তিনি ভুলে যান্। চেক্ বই পকেটে থেকেও তিনি নিঃস্ব আজ, বিস্ময়ের ভাবে মুহ্য-মান্।

বাস্তবিক' কী ভয়ানক এই সব ছেলে মেয়ের দল! কী বিভীষিকা এরা পৃথিবীর! এদের জন্য কী না করা যায়, কী যে না হওয়া যায়! হাতী কিম্বা ঘোড়া হওয়া তো সামান্য কথা, হয়ত চেষ্টা কর্‌লে, উট্‌ও হওয়া যায় এদের খাতিরে। এদের আওতায় থাক্‌বার জন্য কোন রকমে টিকে থাকাটাই চমৎকার, কায়ক্লেশে বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয়, দুঃখের মধ্যেও যেন সুখের বিষয়! এদের জন্যই চার পয়সা সেরের পটল খেয়েও জীবিকা নির্ব্বাহ করে' পৃথিবীর

লোক। সস্তা জামা গায়ে, কিম্বা বিনা জামাতেই জীবনযাত্রা চালায়! বিস্ময়াতুর বিশ্বপতিবাবুর সবই যেন কিছু কিছু বোধগম্য হতে থাকে এখন।

হ্যাঁ, অশ্ব-হওয়া আর এমন কি! উঠে-পড়ে লাগ্‌লে, হয়ত কষ্টে-সৃষ্টে উটও হওয়া যায় এদের অজুহাতে, এদের পৃষ্ঠে ধারণের মহৎ সংকল্পে। অন্যের কথা কি, বিশ্বপতিবাবু নিজেই হতে পারেন। কাল যে তিনি আর এ মাঠে আস্‌বেন না, পা-ই বাড়াবেন না এধারে, ওই সব রাক্ষুসে ছেলে মেয়ের ছায়াও মাড়াবেনা, এমন গ্যারাণ্টি তিনি দিতে পারেন না কাউকে। না, নিজেকেও না। বিশ্বপতি ক্রমশই বেশী বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়্‌ছেন, নিজের সম্বন্ধেই বেশীরকম আরও। এমন কি, কাল যদি আবার তিনি ঘোড়া হবার সুযোগ পান্, তাহলে আজ্‌কের চেয়ে ঢের ভাল ঘোড়াই তিনি হতে পারবেন! কাল্‌কে তাঁর গতিবেগ আরো ক্ষিপ্র, আরো নিরুদ্বেগ, এবং আরো খরতর হবে এবং চিঁহিঁহিটাও তিনি আশানুরূপ করতে পারবেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বেশী কথা কি, কানকেও তিনি আমল দেবেন না কাল্‌কে; প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ কর্‌বেন।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে, সন্ধ্যার আব্‌ছায়ায়, মাঠের নির্জ্জনতার মধ্যে, বিশ্বপতিবাবু অনেক বিবেচনা করে, আবার চতুষ্পদ হয়ে পড়েন অকস্মাৎ। একাকী এখন থেকেই, রীতিমত রিহার্সেল্ দিতে সুরু করে দ্যান্ তিনি।

তীর্থ-পরিক্রমা

শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ খাঁন

গয়া সহরের জেল রোড ধরে যদি সোজা চলে যাও তবে দেখবে—ঐ যেখানে গিয়ে পাহাড়ের বুক ঘেঁসে সেরঘাটী অভিমুখে গিয়েচে—সেখানে একটি ক্যাটলিস্ গাছে ঘেরা বাড়ী—যার রূপোর নেমপ্লেটের উপরে মীনার অক্ষরে লেখা আছে—"অমলা-বিতান।"

সেই বাড়ীতে সন্ধ্যার চায়ের টেবিলে সেদিন কি হট্টগোল! তাদের এই হট্টগোলের কারণ—প্রতি গ্রীষ্মের মত এবারকার ছুটীতে কোথায় ভ্রমণে বেরুনো হবে—তাই স্থির করা!

ছোট্‌কা ইতিহাসের ছাত্র—সুতরাং তিনি নালন্দায় নেবে য়ুনিভারসিটির গোড়াপত্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে চাইলেন—ননীদা অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক মানুষ—মোটারের কলকব্জা নেড়ে তাঁর মনটাও হয়ে উঠেচে একান্ত কলকব্জার মত—সুতরাং তিনি হাঁক্‌লেন—তেপান্তরের মধ্যে বসে ওসব ইতিহাস লিখলে মোটেই পেট ও মন ভরে না—বরং এমন জায়গা ঠিক করুন যেখানে আছে অবাধ মাঠ—সুন্দর পথ ও খাবারের বিশেষ সমারোহ! তারপর আমার ইচ্ছে—কোথাও না থেমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মোটারে ছুটে যাওয়া—পাহাড় বন পেরিয়ে—অবশেষে কাশ্মীরে গিয়ে 'ডাল লেকে' জোছনারাতে নৌকো বাওয়া। এইত গেল সবে তিনজন—তারপর আছে রবি—রমেন—কম্‌লি, গৌরী, লক্ষ্মী, অভি, রঘুনাথজী .... খুড়োর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—আমরা সকলে যেখানে টানব, তাঁকে সেখানে যেতেই হবে।

সুতরাং যখন গৃহিনী বল্লেন—"তোমরা তাজমহল দেখেচ? তাজ না দেখাকে আমি জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ বলে মনে করি। সুতরাং—আমার মতে তোমরা আগ্রা যাত্রা করো।"

সভার কয়েকজন করতালি দিয়ে এমন সমর্থন জানালেন যে আমরা কতিপয় সভ্য ভীত ও সচকিতভাবে নীরবে "মৌনংসম্মতিলক্ষণম্" জানালুম। কমলা বল্লে—"যদি তোমরা আগ্রা যাও তবে আমি পথের চা ও কোকো জোগানোর ভার নিলুম"—রমেন বল্লে—'আমি ফোটো তোলবার'—লক্ষ্মী বল্লে—'আমি গান শোনাবার'—অভি তাল ঠুকে বল্লে—'আমি

কুস্তি লড়বার'—প্রভৃতি। সুতরাং সেদিনের সভা যখন ভঙ্গ হ'ল—তখন আগ্রা যাওয়া সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়েই আমরা উঠলুম।

সেদিন অনেক রাত্রি অবধি জেগে প্রোগ্রাম করে—জিনিসপত্তর গুছিয়ে বারটার পরে শয্যাশ্রয়ী হয়েছিলুম—হঠাৎ কানের কাছে ক্রিং ক্রিং এলার্ম বেজে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলুম—সবে তিনটে। ভাবছি উঠ্‌ব কিনা—কিন্তু পাশের ঘরে ননীদা-দের সাড়া পেয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর দুটো গাড়ী বোঝাই হয়ে যখন যাত্রীদল ষ্টেশনে এসে পৌছুলুম, তখন সবে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েচে। টিকিট আমাদের পূর্ব্বেই করা ছিল—সোজা গিয়ে একটা ছোট দেখে ইন্টারমিডিয়েট কামরা দখল করলুম। ক্রমে নীল আলো দেখিয়ে গার্ড বাঁশী বাজালে—'দীল্লি-কাল্‌কা' তার বিরাট দেহ বৃহৎ অজগরের মত এঁকিয়ে বেঁকিয়ে প্লাটফর্ম্মের আলোর পোষ্টগুলি একে একে পেছনে ফেলে এগিয়ে চল্‌ল। নবীনতার ঔৎসুক্যে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছিলুম বটে—তবু ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্মে বিদায়ের বেদনায় ম্লান ছোট ভাইবোনদের ও বন্ধুস্বজনের ব্যথা স্মরণ করে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠ্‌ছিল।

তখন সবে ফাল্গুন তার দ্বিতীয় সপ্তাহকে শেষ করে তৃতীয়ে পদার্পণ করচে—সর্ব্বহারা শীতের সমাপনে শুভ বসন্তের কল্যাণ স্পর্শে পূর্ণ প্রকৃতির বুকে শ্যামলিমার আভাস আবার জেগে উঠেচে। তবু শীতের আমেজ যায়নি—একটু একটু শীত করছিল—চেষ্টারফিল্ডের বোতামগুলো এঁটে দিয়ে নীরবে বাহিরে ঘুমন্ত প্রকৃতির পানে চাইলুম। ট্রেন নক্ষত্র বেগে ছুটে চলেচে—গাছ পালা বন—ছোট ছোট গ্রামগুলি একটানা অস্পষ্ট ছবির মত ক্রমাগত পেছনে মিলিয়ে চলেচে। অর্দ্ধ আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে শোন নদের বিরাট পোল পেরিয়ে গেল। ক্রমে উদয়াচলের শীর্ষশেষে অরুণের সুপবিত্র আলো এসে স্পর্শ করল। ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌ল পাখী—তাদের সমবেত কলকাকলীতে মনে হ'ল যেন তারা এই অতি পবিত্র মূহূর্ত্তে বেদ মন্ত্র গাইচে! আমরা সবাই চুপচাপ—যেন কোন বিরাট পবিত্র দেবায়তনের মধ্য দিয়ে আমরা চলেচি—সমাধিমগ্ন সেই মন্দিরের নিত্য অর্চ্চনার ব্যাঘাত হবে—যদি আমরা কথা কই।

গাড়ীর গতি ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো—বুঝ্‌লুম মোগলসরাই আস্‌চে। ষ্টেসনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই ননীদা নেবে গিয়ে চা, রুটী, ডিম প্রভৃতির বন্দোবস্ত করে এল—বাহান্ন বছরের 'বয়' এসে 'ট্রে' নাবিয়ে রেখে সেলাম জানিয়ে গেল। কমলা পরিবেশন করলে—আমরাও অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত পানভোজন করতে করতে এগিয়ে চল্‌লুম। এরপর এল এলাহাবাদ—তারপর মিরজাপুর। দিন ক্রমে বেড়ে চল্‌চে সূর্য্যের উত্তাপও তীব্রতর

চলেচে—গরম কাপড়জামা অনেক পূর্ব্বেই খুলে ফেল্‌তে হয়েছিল। দুই পাশের বেঞ্চের [illegible]খানে সুটকেশের উপর সুটকেশ সাজিয়ে দিব্যি ফরাস পাতা হয়েছিল—ছোট্‌কা-ননীদা, [illegible] ও আমি এধারে Bridgeএ বসেছিলুম ওধারে ছোটদলও সেতুবন্ধনে ব্যস্ত। কমলা [illegible] প্রিয় অবসর-সঙ্গী "Patience" সুরু করেচে। অন্য আরোহীদের মধ্যে কেবল ছিলেন এক বৃদ্ধ শেঠজী ও তাঁর একটি কিশোরী কন্যা—যাঁদের সম্মুখে আমাদের লজ্জিত হবার কোন কারণই ছিলনা।

এগিয়ে চল্‌চি—যতদূর দৃষ্টি চলে ক্রমাগত মাঠের পর মাঠ—গ্রাম অবধি বিশেষ চোখে [illegible]—কেবল প্রপর্ণ বৃক্ষরাজি সেই রিক্ত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে করুণ নয়নে চেয়ে [illegible]—আশা নেই—ভরসা নেই—যেন অস্তাচলের সীমানায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা [illegible]। কতকগুলি হরিণ দেখা গেল—ছোট ছোট শ্যামায়িত অরণ্যানীর মধ্যে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে—ট্রেণের শব্দে ভীত চকিত নয়নে তাকিয়ে দূর বনানীর মধ্যে পালিয়ে যাচ্চে।......ক্রমে এলো টুণ্ডলা জংসন। এখানে আমাদের সহযাত্রী শেঠজী সকন্যা নেমে গেলেন—তাঁরা যোধপুর না জয়পুর কোথা যাবেন—এখানে তাঁদের বদ্‌লী করতে হবে। আমরা গয়া থেকে বেরুনোর আগেই ঠিক করেছিলুম—যাবার পথে হাত্‌রাশ জংসনে গাড়ীবদল করে মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে, পরে আগ্রা যাত্রা করা হবে। সেই অনুযায়ী মথুরায় আমাদের আত্মীয় ডাক্তার প্রমথ গোস্বামীকে 'তার' করা হয়েছিল। সুতরাং হাত্‌রাশে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই আমরা ডাক্তার সাহেবের সুযোগ্যপুত্র পরম অতিথিপরায়ণ নিতাইবাবুর দর্শন পেলুম—চট্‌পট্‌ নেবে পড়া হোল। নিতাইবাবু তাঁদের বাড়ীর গাড়ী নিয়ে এসেচেন—সেই মোটারেই আমরা মথুরা চল্‌লুম। মথুরা যেতে হলে এখানে নেবে ট্রেণ বদ্‌লি ক'রে যেতে হয়—মাত্র আটাশ মাইল পথ। চমৎকার রাস্তা—ছোট ছোট কয়েকটী খাল পাওয়া গেল—পূর্ত্তবিভাগ থেকে কৃষির সুবিধের জন্য কাটা হয়েচে—সরু স্রোতস্বিনীর মত কত প্রান্তরের ঊষর বুক চিরে শ্যামলিমার সস্নেহ রেখা কেটে তারা যতদূর দৃষ্টি গেছে চলেছে। মোটারের পথ প্রায়ই রেল-পথের সমান্তরালভাবে গেছে। পথে কতগুলি উটে-টানা-গাড়ীর সাক্ষাৎ পেলুম—বেশ যাত্রীবহন করে চলেচে—দোতালা গাড়ী অবধি দেখ্‌লুম—উটে টান্‌চে। বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ক্রীড়ারত হরিণদলের দর্শন পাওয়া গেল—আর সংখ্যাহীন অজস্র ময়ূর—এ গাছ থেকে ও গাছে যাচ্চে—মাঠের বুকে নির্ভয়ে উড়চে—কিছুমাত্র মনে তাদের দ্বিধা নেই—যেন এ তাদের নিজস্ব রাজত্বে স্বাধীন জীবনযাপন। এত চমৎকার লাগ্‌ছিল—যতই মথুরার পানে এগিয়ে চল্‌ছিলুম। সেই অতীতদিনের বিস্মৃত কাহিনী মনের দুয়ারে এসে বিচরণ

করছিল। পথ সবটা পিচ্ দেওয়া নয়—কাজেই ধূলো উড়ছিল। খুড়ো গম্ভীরভাবে বল্লে—ধূলো নয়—এ ব্রজরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে নাও।

মথুরার নিকটবর্ত্তী হয়ে যখন আমরা চিরস্মরণীয়া প্রবাহিণী যমুনার দর্শন পেলুম—তখন সবিতা অবগুণ্ঠনতলে অবলুপ্ত প্রায়। লক্ষ্মী ও অর্ণব মনের অনন্ত উল্লাসে গেয়ে উঠ্‌ল—"যমুনে—এই কি তুমি সেই যমুনে—প্রবাহিনী—"

তারপর কমলা—গোবিন্দ—ননীদা—ক্রমে সবাই সমস্বরে গাইতে গাইতে চল্‌লুম—করতাল বাজিয়ে তার সঙ্গত রেখে।

ঠিক গোধূলি-লগনে মথুরার সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টি হ'ল। যখন যমুনার পোলের উপর উঠ্‌লুম—তখন সবে ওপারের সহরের আলোর দীপালী জ্বলে উঠেছে—তাদের ছায়া এসে পড়েচে যমুনার কালো বুকের উপরে—তরঙ্গের আঘাতে মৃদু মৃদু কাঁপচে!

এমনি সময়ে কি শ্রীরাধাও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতেন?

পোল পার হয়ে এপারে সহরের ভেতরে এসে পড়লুম—বিজ্‌লী আলোয় সমুদ্ভাসিত সুসভ্য নগরী—মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল—সভ্যতার আলোকে গোপ-রমণীদের পরণেও কি আজ ছাপ-দেওয়া বৃন্দাবনী ছাড়িয়ে জর্জ্জেট উঠেচে?

সহরের একপ্রান্তে নিতাইবাবুদের বাসা—অবিশ্যি ডিস্‌পেন্সারী ভেতরেই। তবু রক্ষা! অত্যন্ত আনন্দে সেখানে রাত্রিযাপন করা গেল।

পরদিন সকালে উঠে প্রাতরাশ সেরেই আমরা শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করলুম। মথুরা থেকে বৃন্দাবন মাত্র ৬ মাইল পথ—চমৎকার রাস্তা। বৃন্দাবনে গিয়ে মোটার রেখে আমরা ত্ব'খানা টাঙা নিলুম—সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখে বেড়ানোর জন্য—কারণ রাস্তা এখানে এতই সরু যে ত্ব'খানা টাঙার সামর্থ্য নেই পাশাপাশি চল্‌বার—মোটার ত বলাই বাহুল্য। মথুরায় আমরা যে হতাশ হয়েছিলুম—বৃন্দাবনে এসে তার হাত থেকে উদ্ধার পেলুম। এখানে সহরের বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই—সবাই গেরুয়া পরনে—শূন্য পায়ে মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন ক'রে ও ভজন গেয়ে বেড়াচ্চে। তাপসের চেয়ে তাপসিনীর সংখ্যাই অনেক বেশী দেখ্‌লুম—ভজনরতা সেই মেয়েদের পানে তাকিয়ে বারবার মীরার কথাই মনে পড়ছিল—সেও কি এম্‌নি বৃন্দাবনের পথে পথে তার গিরিধারীলালকে ডেকে ডেকে বেড়াত?

গোবিন্দজীর মন্দির দেখ্‌লুম—ভাস্কর্য্যের একটি গৌরবময় নিদর্শন। মন্দির যে বৃন্দাবনে কত আছে—তার সংখ্যা গণনা করা দুঃসাধ্য। তার ভেতরে সাহজীর মর্ম্মর-স্মৃতি—

দক্ষিণভারতীয় কারুকার্য্যের বিরাট দুর্গ-সদৃশ লালাজীর মন্দির—তার ভেতরে আছে সোনার তালগাছ। মন্দির সেরে চল্‌লুম বনে—সেই নিধুবন—নিকুঞ্জবন—যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার শত প্রেম ও অনন্ত লীলার অশেষ মধুমাধুর্য্যে পবিত্র—সেগুলি বৃন্দাবনের ভেতরেই প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রক্ষা করা হয়েচে। বনে বানরের অত্যন্ত প্রাবল্য—স্বাধীনভাব, যেন তাদেরই রাজত্ব—সেখানে জুতো পায়ে যাওয়া বারণ। পাণ্ডারা কিছুতেই ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবে না—অবিশ্যি আমরা লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম—ছবিও তুলেচি। নানা জাতীয় পাখীও বনে আছে অনেক—পাণ্ডাদের মুখে শুন্‌লুম—রাত্রিতে নাকি সে সব বনে বেণু-রব শোনা যায়!

সেখান থেকে চল্‌লুম যমুনায় কালীয়-দমন ঘাট দেখতে—মথুরার যমুনায় তবু জল আছে—স্নান অবধি করা চলে কিন্তু বৃন্দাবনের যমুনায় শুধু ব্রজ-রেণুই অঙ্গে মাখা চলে—জলের সেখানে অস্তিত্বও নেই! কালীয়-দমন ঘাটে গিয়ে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করলুম—বাঁধানো ঘাটের উপরে যে যেখানে খুসী বসে ও শুয়ে পড়লুম—মেয়েরা সবাই সমস্বরে সুরু করলে—"মোর আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল"—সতী কোমরে কাপড় জড়িয়ে মনের আনন্দে নাচ্‌তে সুরু কর্‌লে।

সেখানে ব'সে ব'সে পুরাতন যুগের কত কাহিনীই না মনে পড়ছিল—মন কিছুতেই চাইছিল না উঠ্‌তে—তবু হ'ল চল্‌তে। যখন বাসায় পৌঁছুলুম—তখন স্নান এবং আহার—দুটিরই সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেচে।

বিকেলের দিকে চা-পান করে আমরা বেরুলুম মথুরা সন্দর্শনে। ধ্রুবঘাট—সাবিত্রীঘাট প্রভৃতি দেখে আমরা সন্ধ্যার সময়ে একটি মন্দিরে এলুম—শুনলুম সেইটেই নাকি মথুরার সব চেয়ে বিখ্যাত মন্দির। কতকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তবে মন্দির—চমৎকার ব্যবস্থা দেখলুম—সদর রাস্তার উপরে জুতো ছেড়ে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে গিয়েও নিরাপদে জুতোকে ফিরে পাওয়া যায়—অর্থাৎ জুতো যে সে পবিত্র মন্দির-অঙ্গনে অপহৃত হতে পারে এ ধারণা তাদের মনেও আসেনা! সেখানে আরতির অত্যন্ত সমারোহ—সমানে সংকীর্ত্তন চল্‌চে।

যমুনায় আর একটি জীব খুব বেশী দেখ্‌লুম—কচ্ছপ, যেন তাদের শেষ নেই—জলও দেখা তাদের জন্যে দুস্কর। কিন্তু আশ্চর্য্য—এত পোষ মেনে গেছে যে যাত্রীরা কেউ ঘাটে গেলেই খাবার পাবার লোভে ছুটে আসে—এবং কেউ স্নানে নাব্‌লে কিছুমাত্রও তারা অনিষ্ট করেনা। মথুরা বৃন্দাবনে সবাই প্রায় নিরামিষভোজী—কাজে কাজেই নিরাপত্তিতে তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এখন অসংখ্য দাঁড়িয়েচে।

মথুরায় কংস-কারাগার দেখলুম—অক্ষত দেহে শতাব্দীর ঝঞ্ঝা বাঁচিয়ে আজো বেঁচে আছে। কিন্তু মুসলমান রাজত্বে তার কারাগারত্ব ঘুচে গিয়ে এখন সে হয়েছে মস্‌জিদ্। মথুরার মিউজিয়মও একটি অপূর্ব্ব জিনিস। এত চমৎকার ও প্রচুর এর সংগ্রহ—যা একদিনে কখনও শেষ করে দেখা সম্ভব নয়। অনেকগুলি 'পার্ক' মথুরায় আছে—তার মধ্যে ভিক্টোরিয়া পার্কই দেখ্‌লুম চমৎকার।

মথুরায় আমরা তিনদিন ছিলুম—তৃতীয়দিন ভোরের ট্রেণে রওনা দিলুম আগ্রার উদ্দেশে। ট্রেণে মথুরা থেকে আগ্রা মাত্র ৪৮ মাইল—দেড় ঘণ্টার ভ্রমণ। মথুরা—আগ্রায় নিয়মিত Bus Service আছে—রাস্তাও কিছু কম হয়। তবুও আমরা ট্রেণেই চল্‌লুম—সে কেবল অর্ণবনাথের জন্যে—কারণ তার বি, বি, সি, আই ট্রেণে ভ্রমণ করার ইচ্ছে কেন অপূর্ণ থাকে ?

মথুরা ষ্টেসনটী অতি চমৎকার—যেন একটি বিরাট দেবায়তন। ট্রেণ ছাড়্‌ল—সংযুক্ত প্রদেশের প্রান্তরের ভিতর দিয়ে ট্রেণ এগিয়ে চল্‌ল। "ভৈসা" ষ্টেসনে এসে গাড়ী দাঁড়ালে অতি চমৎকার 'মালাই' দেখা গেল— দুধের মত ধব্‌ধবে ও চমৎকার পুরু। আমরা সকলে যে যত পারল্‌ুম খেয়ে নিলুম। ক্রমে ট্রেণ এসে আগ্রা ফোর্ট ষ্টেসনে দাঁড়াল। আমরা অবতরণ করলুম। আগ্রাতে পাঁচ ছয়টী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে—আগ্র দেখ্‌তে আস্‌তে হ'লে এই ষ্টেসনে নাবাই সুবিধাজনক। কারণ এখানে নাবলে Fort এক মিনিটের পথ। তাজমহলও কাছে হয় সব চাইতে।

আগামী বারে সমাপ্য

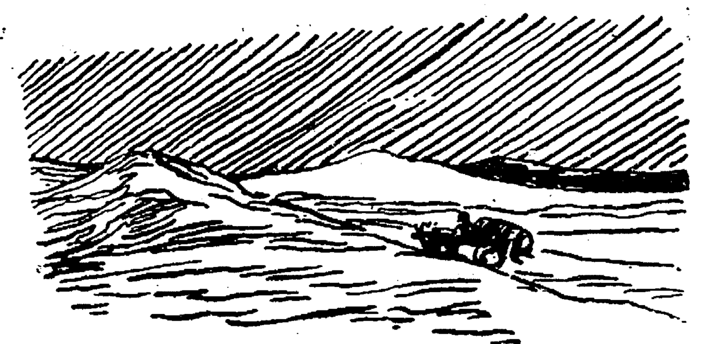

রাখাল রাজা

সতীকান্ত গুহ

মউয়াতলায় বাঁশী বাজায় রাখাল রাজারে
রাখাল রাজা রাখাল রাজা রাখাল রাজা রে
আয় ধবলী আয় শ্যামলী পুষ্পে সাজা রে।

রাখাল রাজা ছিলে তুমি কোন্ গহনের পার !
কোন আকাশের রঙীন পাখী খবর রাখে তার !
রাখাল রাজা রাখাল রাজা খেলার সাথী কার !

মউয়াতলায় আসছে ছুটে
গাঁয়ের ছেলেমেয়ে
সাধ জাগে হায় খেলার সাথী
গানটি উঠি গেয়ে।

রাখাল রাজা রাখাল রাজা রাখাল রাজা রে !
আয়রে তোরা ঘণ্টা কাঁসর নাকড় বাজারে !
মউলতলা পাতায় ফুলে লতায় সাজারে !
রাখাল রাজা এলে তুমি ডাকটি শুনে কার ?
এলে বুঝি ডাক শুনে হায় খেলার সাথী তার !
হায়রে রাজা আর জনমে ডাক ছিল আমার !

সেই জনমের স্বপন তারা
স্বপ্নে আসে ধেয়ে
সাধ জাগে হায় খেলার সাথী
নামটি উঠি গেয়ে।

রাখাল রাজা মউলতলার শ্যামল সাথীরে !
ভোর আকাশে রঙীন হল আঁধার রাতিরে !
বউল কানন দিল ফুলের মাল্য গাঁথিরে !

রাখাল নেবে কোন্ মালাটি ? আলতো বুনন কার !
হায়রে রাখাল পরবে গলায় কোন্ বঁধুয়ার হার ?
যে বঁধু হায় বাসে শ্যামল হারটি বুঝি তার !

হায়রে রাখাল সেই বঁধুয়ার
ঘরটি চেন কি ?
আমার বুকে বাসা বেঁধে
হায় সে ছিল কি ?

রাখাল রাজা দিন ফুরোবে আসবে রাতিরে
অন্ধকারে আসবে চুপে বন্ধু সাথী রে
কালো চুলে দেবে বিজন বাসর পাতিরে !

রাখাল রাজা মাথায় দেবে আপন সিঁথি-হার,
গলায় দেবে খুলে আপন বকুলদানা হার,
হায় সে বঁধু এঁকে দেবে চোখে কাজল পার !

হায়রে রাখাল স্বপন খণের
বন্ধু আমি সে
চির যুগের তুমি আমার
স্বপন-সাথী যে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লঙ্গুরদের দলে

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভাল্লুকরা অদৃশ্য হয়ে গেলে পর. গোদাবর বল্ল—মংলু, তুমি গাছে চড়তে পার ?

—কৈ না ত !

গাছের উপর থেকে কে যেন খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে হেসে উঠল। বানরেরা মহা স্ফুর্ত্তিবাজ লোক ; একটুতেই হেসেই আছে !

—কে রে ? হুম্‌কী দিল গোদাবর—কি হয়েছে, হাসছিলি কেনরে গুপী ?

গুপী হল গোদাবরের ছেলে।

গুপী আরও হেসে উঠল— হোঃ হোঃ গাছে চড়তে পারে না—হোঃ হোঃ !

সমস্ত বানর মহলে একটা হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেল যেন।

—হোঃ হোঃ গাছে চড়তে পারেনা—হোঃ হোঃ—এমন কি গোদাবর পর্য্যন্ত মুখ ফিরিয়ে মুচ্‌কে হেসে নিল।

মংলু বল্‌ল—এতে হাসবার কি আছে ?

বানরের দল সমস্বরে হেসে উঠল—হোঃ হোঃ গাছে চড়তে পারে না—হোঃ হোঃ।

মংলু বল্‌ল—আমি সাঁতার কাটতে পারি, তোমরা পার ? এক নিমেষে বানরদের হাসি মুছে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল—সাঁতার কি ?

মংলু হাততালি দিয়ে হেসে উঠল—হোঃ হোঃ সাঁতার কি তাই জানেনা—হোঃ হোঃ।

বানরেরা ত একদম বোকা !

এদিকে গোদাবর গাছের একটা নীচু ডালে লাফিয়ে উঠে কি একটা হুকুম দিল আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে লঙ্গুরেরা গাছের নীচু ডাল থেকে সুরু ক'রে সার সার ক্রমশঃ উঁচু ডালে ব'সে গেল। সে যা অদ্ভুত দেখ্‌তে ! সার সার বানরেরা ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে গেছে, তাদের কালো কালো মুখের চারপাশে গোল সাদা লোমগুলো চক্‌চক্ করছে আর প্রত্যেক ডালের নীচে তাদের লম্বা লম্বা লেজগুলো দুলছে।

গোদাবর বল্‌ল—মংলু, তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাওত ! মংলু তার হাতটা গোদাবরের দিকে তুলে দিল। গোদাবর একটা শব্দ কর্‌ল—হুপ্। সঙ্গে সঙ্গে একটানে মংলু গোদাবরের পাশে উঠে এসেছে।

মংলু চেঁচিয়ে উঠল—পড়ে যাব, পড়ে যাব !

—ছিঃ ভয় পেতে নেই, হাত বাড়াও, হাত বাড়াও !

তারপরে প্রত্যেক বানরের মুখ থেকে খানিকক্ষণ হুপ্ হুপ্ শব্দ শোনা গেল আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে মংলু বানরদের হাতে হাতে গাছের একটা উঁচু ডালে উঠে এসে মাথার উপরের একটা শাখা ধ'রে আঁকুপাকু কর্‌তে লাগল।

গোদাবর একলাফে তার পাশে এসে বল্‌ল—ওরকম কোরো না, চুপ ক'রে দাঁড়াও মংলু। এমনি ক'রে পায়ের পাতা দিয়ে গাছের ডালটা চেপে ধর। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, ঠিক ঠিক ! এইবার নীচের দিকে তাকাও দেখি। ভয় পেওনা যেন ! জঙ্গলে ভয় জিনিসটাই সর্ব্বনেশে, সে-ত নালুখ নিশ্চয় তোমাকে শিখিয়েছে।

মংলু সেই ডালের ওপর থেকে নীচের দিকে তাকাল। নীচে সার সার লঙ্গুরেরা নেমে গেছে, তারও নীচে জমিটা ছোট্ট লাগ্‌ছে। মংলুর মনে একটা অদ্ভুত ভাব জাগ্‌ল, একটা আশ্চর্য্য সাহস এল তার মনে। আজন্ম মাটিতে গ'ড়ে ওঠা মংলুর মাটি ছাড়িয়ে

অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে মনে হোলো সে বিশাল, সমস্ত বন তার পায়ের নীচে প'ড়ে ঝিম্ ঝিম্ ক'রে কাঁপছে। দূরে দিকচক্রবালে রঙিন রক্তাভ রেখা দেখা যাচ্ছে।

মংলু তার মাথার ওপরের ডালটা ছেড়ে দিয়ে হাঁক দিল—হু-উ-ই-ই !

সে হাঁক কাঁপতে কাঁপতে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে দূরে বহুদূরে বিবর্ণমান বনে মিলিয়ে গেল। মংলু গাছের ওপর আকাশের পটে আঁকা একটা ছবির মত নিথর।

গোদাবর বল্‌ল—সাবাস্ মংলু সাবাস !

রাত্তির হ'য়ে এল, মংলুকে নিয়ে সেদিন আর ভেতরে যাওয়া যাবে না। গোদাবর ঠিক কর্‌ল—সে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে। আকাশে মুখ তুলে গোদাবর হাঁক দিল। লঙ্গুররা দল ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেল নানা গাছে।

মংলু গোদাবরকে জিজ্ঞেস্ কর্‌ল—শোব কোথায় ?

—কেন এই গাছের ডালে—

—এই গাছের ডালে ? কেন নীচে শুলে কি হয় ?

গোদাবর জবাব দিল—না ভয় আছে।

যে ডালটায় তারা বসেছিল সেখান থেকে গোদাবর দেখ্‌ল ঠিক তার নীচেই প্রকাণ্ড একটা মোটা ডাল আড়াআড়িভাবে আর একটা ডালের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে। ডালটার গুঁড়ির কাছে খানিকটা ফাঁপা বেশ বড় গোছের। গোদাবর হাঁক দিল—গুপী নীচে থেকে শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আয় ত !

গুপী হুপ্ ক'রে নীচে নেমে গেল। তারপরে নীচে শুকনো পাতার মধ্যে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি খেল সে। চারটি পাতা তুলে নিজের মাথায় দিয়ে হাঁক দিল—হুপ্, আমি কেমন সেজেছি দেখ !

গোদাবর বল্‌ল—আয় আয় দেরী করিস্ নি !

গুপী তার বুকেব মধ্যে একরাশ পাতা চেপে ধ'রে আর এক হাতে ঝুলতে ঝুলতে ওপরে এসে হাজির। গোদাবর দেখিয়ে দিল—নে ওই গুঁড়িটার মধ্যে পাতাগুলো বিছিয়ে দে ! তারপরে আরও নিয়ে আয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মংলুর জন্য পাতার বিছানা তৈরী হ'য়ে গেল।

গুপী বল্‌ল্—আর চাই ?

তার এ একটা বেশ মজার খেলা লাগ্‌ছিল।

গোদাবর জবাব দিল—না !

গুপী বল্‌ল—দুটো পাতা আরও রয়েছে যে—

—কৈ ?

—এই যে।

গুপী তার মাথার ওপর থেকে একটা আর লেজে জড়ান একটা পাতা দিয়ে বল্‌ল— ব্যস্‌!

গোদাবর বল্‌ল—মংলু ওই ডালটা ধ'রে ঝুলে নীচে নেমে এস।

মংলু ঝুলে পড়ল।

—ব্যস্‌, এবার ওই ডালটা ছেড়ে দাও আর নীচে না তাকিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে যাও।

বন্যজীবনে অভ্যস্ত মংলুর এ সব শিখতে দেরী লাগে না। তা ছাড়া তার হাত পা অদ্ভুত ক্ষিপ্র, চোখের দৃষ্টিও খর, স্থির। ফস্কান তার অভ্যাস নয়। গোদাবরের কথামত টুপ ক'রে সে হাল্কা পায়ে নীচের ডালে নেমে পড়ল। তাই দেখে এমন কি গুপীও অবাক।

সে বল্‌ল—হুঁ! নামতে পারলেই হোল না—এই রকম ডিগ্‌বাজী খেতে পার ?

গুপী সেই ডালের ওপর ডিগ্‌বাজী খেতে সুরু ক'রে দিল।

মংলু বল্‌ল—দাঁড়াও না ছদিনে শিখে যাব। হাত ছুটো উঁচু ক'রে ভারের সমতা রেখে মংলু তার পাতার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

গোদাবর বল্‌ল—আমি এই ওপরের ডালে রইলাম মংলু। আয় গুপী আয়।

গুপী কিন্তু গেল না। সে খানিকক্ষণ গাছের ডালে বসে লেজ দুলিয়ে কিচ্‌কিচ্‌ ক'রে বাঁছুরে ভাষায় তার গান ধরল। নিঃশব্দ বনের মাথায় তখন প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ উঠ্‌ছে। ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় পাতায় পাতায় মর্ম্মর।

আকাশ কালো
দিন ফুরালো
লেজটা সামাল ভাই।
বনের মাথায়
হেথায় হোথায়
পাকা ফলের চাঁই।

'পাকা ফলের চাঁই' লাইনটা গুপী অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল। পাকা ফলের চাঁই যে বনের মাথায় ফ'লে আছে অথচ আকাশ কালো হ'য়ে দিন ফুরিয়ে এল, এটা যে

তার সহ্য হচ্ছিল না। তাই ওই লাইনটা বার বার গেয়ে, ব্যাপারটা কালকের জন্যে মনের মধ্যে স্মরণীয় ক'রে নিয়ে গুপী থামল। তারপরে চুপি চুপি এসে মংলুর গা ঘেঁসে বল্‌ল।

—আমি আজকে এখানে শোব, তোমার আপত্তি আছে ?

মংলু হেসে ফেল্‌ল।

—শোও না।

গুপী মংলুর গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ল।

একটু পরে তার লেজটা মংলুর নাকে এসে ছপাং ক'রে পড়ল।

মংলু বল্‌ল—আঃ গুপী! কি হচ্ছে ?

গুপী বল্‌ল—মশা তাড়াচ্ছি।

ক্রমশঃ

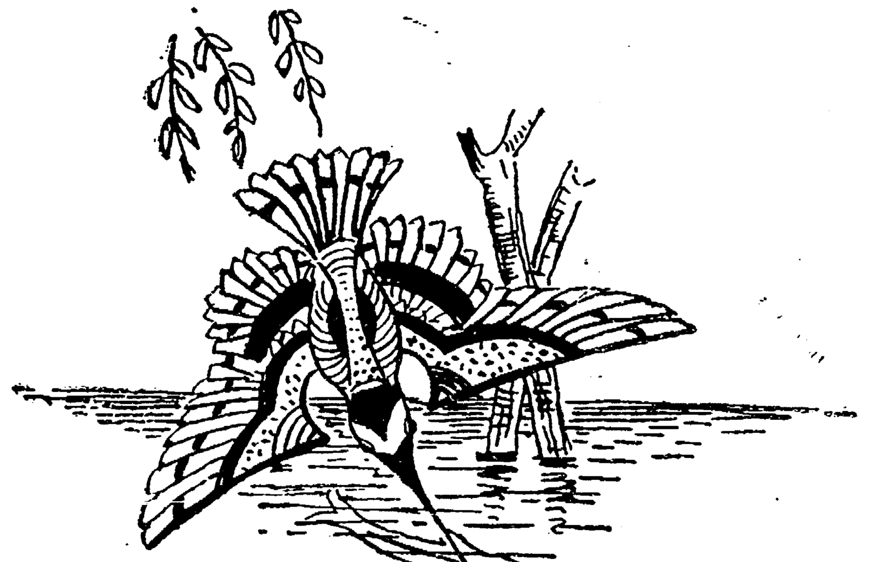

জাতভাই

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

আমাদের বাড়ীর দেয়ালে যে ছোট্ট টিকটিকি ঘুরে বেড়ায়, বাগানে যে গিরগিটি দেখা যায়, আর জলার ধারে যে গোসাপ দেখা যায়, এদের সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল অতীত যুগের অতিকায় ডাইনোসর-নামে সরীসৃপ—যারা লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। আজও বোর্ণিও, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে বিরাট আকারের গোসাপ দেখা যায়—যারা অনায়াসে একটা আস্ত শূয়ার গিলে খেতে পারে।

আর একটি কথা তোমরা জান কিনা বল্‌তে পারি না ;—সে-টি এই যে, গিরগিটিদের পূর্ব্বপুরুষদের কেউ কেউ হচ্ছেন পাখীদেরও পূর্ব্বপুরুষ! তোমরা বল্‌বে—"তাও কি হয়? পাখীর চেহারায় আর গিরগিটির চেহারায় যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। গিরগিটির গায়ে পালক নেই, তাদের ঠোঁট নেই ; পাখীর দাঁত নেই,—আরো কত রকমে তফাৎ। একমাত্র মিলের জায়গা হচ্ছে—ডিম থেকে ফুটে বের হওয়া।"

হ্যাঁ, এ যুগের পাখীতে আর গিরগিটিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ আছে বটে ; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীতে টেরোড্যাকটিল নামে যে পাখী—বা পাখী জাতীয় জন্তু ছিল তার কথা শুনেছ কি? তার গায়ে পালক ছিল না, গিরগিটির মত লেজ ছিল, মুখের ভিতর দুই সারি দাঁত ছিল, ডানায় ডগায় নখ ছিল, লম্বা গলা ছিল। চেহারাখানা কেমন বিরাট ছিল একবার ভেবে দেখ! আকারেও তারা বেশ বড় ছিল। এদের "উড়ুক্কু গিরগিটি" বলা যেতে পারত।

এরাই ছিল গিরগিটিদের পূর্ব্বপুরুষদের কারো কারো বংশধর। এদের থেকে ক্রমে পরিবর্ত্তন হয়ে পাখীর গায়ে পালক দেখা দিল, দাঁতগুলি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, দু'টি পা বেশ সবল হয়ে দেখা দিল, ঠোঁটের আকারও বদ্‌লিয়ে গেল ; লম্বা লেজের পরিবর্ত্তে পালকের লেজ দেখা দিল। এই ব্যাপার ঘট্‌তে লক্ষ লক্ষ বৎসর লেগেছে! পৃথিবীর নানা জায়গায় পালকওয়ালা এবং দাঁতওয়ালা পাখীর পাথরে-পরিণত হাড় এবং শরীরের অন্যান্য নানা অংশের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাদের এক জাতের নাম দেওয়া হয়েছে "র‍্যাম্‌-ফোরিঙ্কাস্।"

গিরগিটি জাতীয় সরিসৃপ থেকে, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হ'য়ে হ'য়ে

যুগের পাখী সৃষ্টি হবার আগ পর্য্যন্ত যতগুলি জীব মাঝে জন্মিয়েছিল, তাদের সকলের চিহ্ন পাওয়া যায় নি ; তবে যতটা পাওয়া গেছে তা' থেকে পরিবর্ত্তনটা বেশ পরিস্কার ধরা যায়।

দাঁত বহুদিন ধ'রে পাখীদের মুখে দেখা গিয়েছিল ঃ—যখন প্রথম পালকধারী পাখী জন্মায়, তখনও তাদের দাঁত আর ডানায় নখ দেখা যেতো এখনও বাদুরের ডানায় নখ দেখা যায়। তারপর এলো এক শ্রেণীর পাখী, যারা অনেকটা উট পাখীর জাত, আর আকারে খুব বড়। তা'র ঠিক পরেই কি পরিবর্ত্তন হ'লো আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না ; মাঝে অন্য কোনও জাতের পাখী ছিল কি না তা'রও কিছু প্রমাণ নাই।

এ যুগের সুন্দর সুন্দর রং-বেরঙের পাখী দেখে কিছুতেই বিশ্বাস হবে না যে, এদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিল গিরগিটিজাতীয় জন্তু।

প্রথমে এল চারপায়ে-হাঁটা গিরগিটি জাতীয় জন্তু (ডাইনোসর) ; তারপর (লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে) এল দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটা ডাইনোসর। ক্রমে এল ঐ শ্রেণীর জন্তুর মত ডানাওয়ালা জন্তু ;—অর্থাৎ পাখীর পূর্ব্বপুরুষ। তারপর, ক্রমে সেই উড়ুক্কু গিরগিটি বদ্‌লে গিয়ে এই যুগের পাখীরা জন্মাল। কত পরিবর্ত্তন হয়েছে একবার ভেবে দেখ তো!

বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে এই সব পরিবর্ত্তন চ'লেছে। সে কালের পাহাড়ের পাথরে এই সব পাখীর অস্তি বা শরীরের অংশ পাথরে পরিণত অবস্থায় পাওয়া যায় ; তা' থেকে পণ্ডিতেরা এই সব পাখী এবং পাখী জাতীয় জীবের আকৃতি-প্রকৃতি জান্‌তে পারেন। পাহাড়ের কোন্ স্তর কত কালের পুরাণো, ভূতত্ত্ববিদেরা তা' মোটামুটি জানেন ; কাজেই, কোন্ স্তরের পাথরে অস্তি পাওয়া গেছে জান্‌লে পাখীর জীবিতাবস্থার যুগও জান্‌তে পারা যায়। বরং, অল্প-কাল আগে (অর্থাৎ দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার বৎসর আগে) পাখীদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার চিহ্ন পাওয়াই কঠিন ; কারণ, এখন আর অস্তির ঐ রকম পাথরে পরিণত হবার সুযোগ ঘট্‌তে পার্‌ছে না।

অষ্ট্রেলিয়ার 'হংসচঞ্চু' নামে অদ্ভুত জীব সরীসৃপ, পাখী, স্তন্যপায়ী জন্তু—এই তিন শ্রেণীর জীবের স্বভাব কিছু কিছু পেয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া, পৃথিবীর আর কোথাও এই ধরণের জীব দেখা যায় না। এদের দুটি পা হাঁসের মত, ঠোঁট হাঁসের মত আবার পাখীর মত বাসা বেঁধে বাস করে। ডিম পাড়ে, কিন্তু ছানারা স্তন্যপায়ী জন্তুর মত মায়ের দুধ খায়। গায়ের চামড়া অনেকটা ইঁদুরের চামড়ার মত, ছোট লোমযুক্ত। ছোট একটি লেজ আছে, আবার দুটি পায়ে নখ আছে। ঠিক যেন পাখী, সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ী জন্তু মিলিয়ে সৃষ্টি

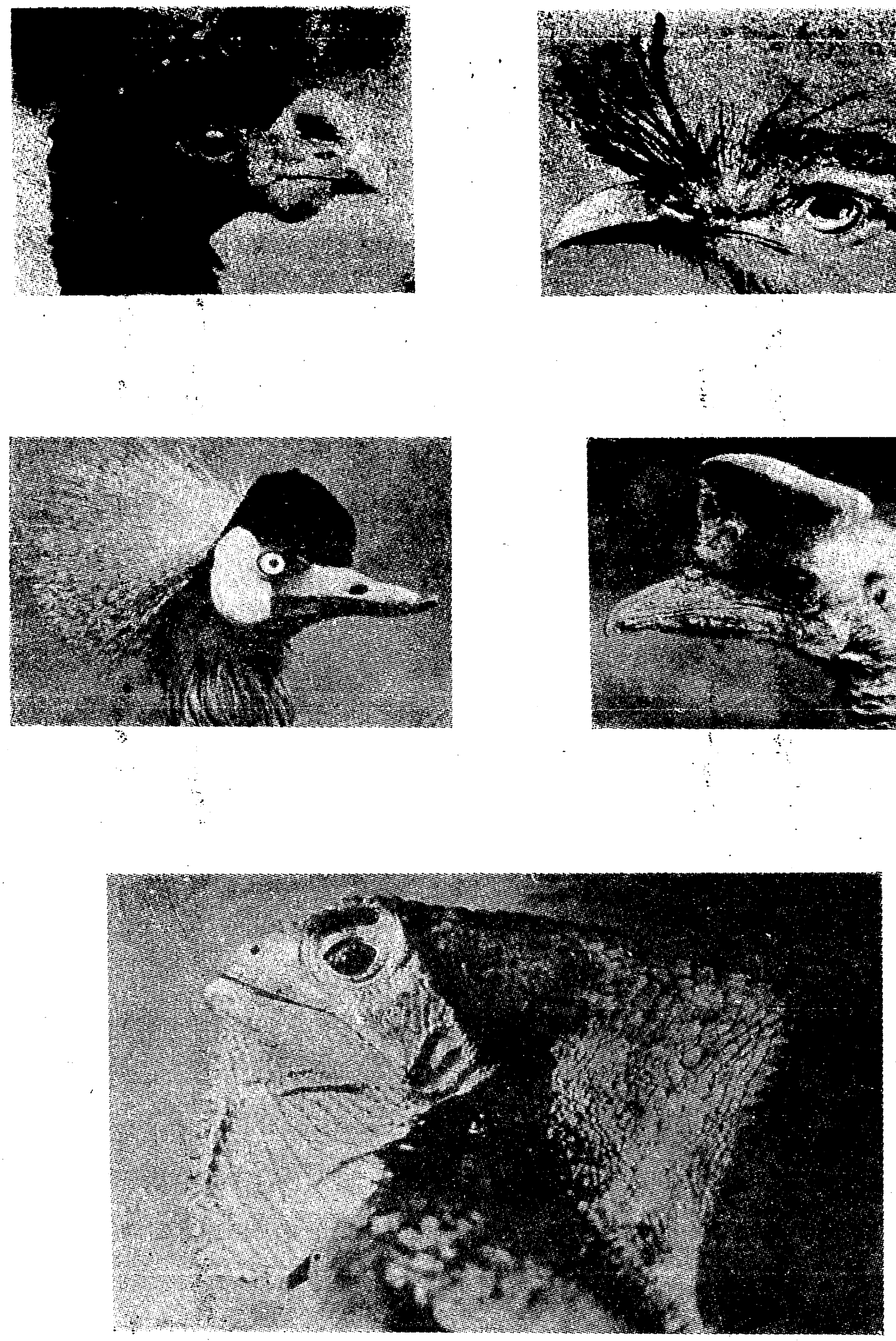

একটি গিরগিটি আর কয়েকটি পাখীর মাথার ছবি

া হয়েছে। এদের বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে, তাই অষ্ট্রেলিয়ার সরকার থেকে হংসচঞ্চু া নিষেধ হ'য়ে গেছে।

কেউ যদি বলে—"ঐ যে কুমীর দেখ্‌ছ, আর ঐ যে চড়াইপাখী দেখ্‌ছ—এদের দুজনেরই এক পূর্ব্বপুরুষ ;"—তুমি কি সে কথা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে? অবিশ্যি 'পূর্ব্বপুরুষ' বল্‌তে দু'চার হাজার বা দু'চার লক্ষ বৎসরের আগের কথাও বলা হচ্ছে না ;—বল্‌তে গেলে, কোটি বৎসর আগের কথা।

এ যুগের পাখীর মাথা আর গিরগিটিজাতীয় জন্তুর মাথা তুলনা কর্‌লে দেখা যাবে, দুই জাতীয়ের মাথায়ই নানা রকমের ঝুঁটি, গলাবন্ধ, শিংজাতীয় মুকুট প্রভৃতি আছে।

একটি গিরগিটি আর কয়েকটি পাখীর মাথার ছবি দিলাম। সকলেরই মাথায় কোন না কোন অলঙ্কারের জিনিষ আছে ; কিন্তু তার রকমারি একবার দেখ !

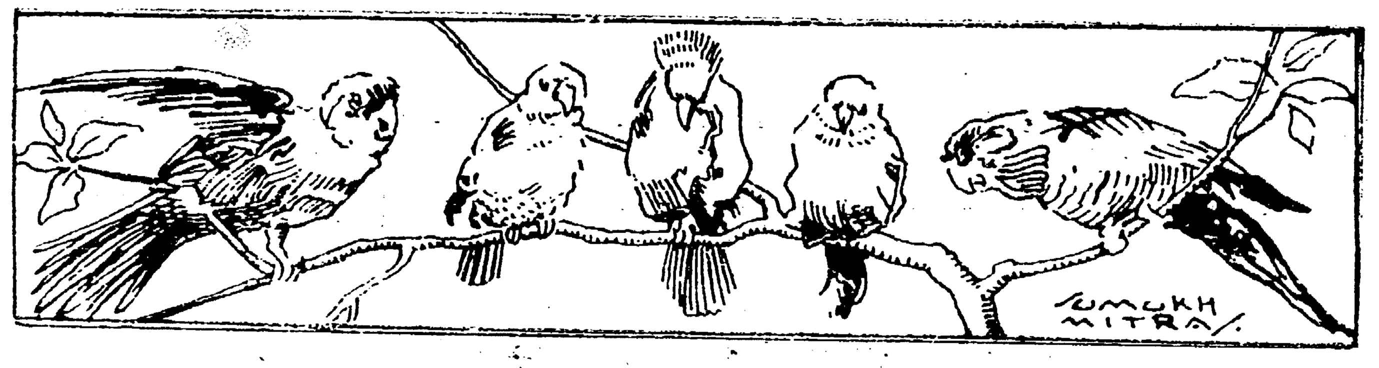

রূপকথা

শ্রীমতী যুথিকারাণী মিত্র

আজব পুরের অচিন কুমার, নাম তার বাণীকুমার।

বর্ণ তার কাঁচা সোণা, মাথায় এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মিষ্টি মুখখানিতে নীল পদ্ম তুটী নীল আঁখি। ধব্‌ধবে শ্বেত পাথরের রাজপুরীতে করে বাস, তার চারদিকে সিপাই, শান্ত্রী দেয় পাহারা—উঠতে করে আহা! বসতে করে উহু! রাজা রাণীর চোখের মনি, বুকের মানিক।

এমন যে রাজকুমার ঘুমায় সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা, সোনার ঝাড়ে জ্বলে সবুজ বাতি, গোলাপ রজনীগন্ধার গন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে ওঠে...বাণীকুমার ঘুমায়, নিঝুম নিস্তব্ধ রাত আকাশের বুক চিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুট্‌ছে, সারা পৃথিবী আলোয় ঝলমল করছে...এমনি সময় বাণীকুমারের খোলা জানলা ধারে কে যেন গেয়ে ওঠে—

রাজার কুমার রাজার কুমার
নিদ্‌মহলের দ্বার খোল—
প্রবাল দ্বীপের তুধকন্যা,
ডাকছে তোমায় চোখ মেল!

বাণীকুমার চম্‌কে ওঠে, কে, কে ডাকে এতো রাতে? এদিক চায়, ওদিক চায়, কোথাও কেউ নেই, জান্‌লার পানে চায়...দেখে ছোট্ট মনুয়া পাখী...বাণীকুমার বলে—

কে তুমি গো ছোট্ট পাখী
কোথায় তোমার ঘর?
প্রবাল দ্বীপে যাবো পাখী
কোন সে দেশান্তর?

ছোট্ট পাখী তার ছোট্ট পাখনা নেড়ে বলে—

তেপান্তরের মাঠের শেষে
সাত-পাহাড়ের পার
ক্ষীরের সাগর তুধের সাগর
পেরিয়ে যাবে আর
নীল কমলের বনের মাঝে
সেই সে প্রবাল দ্বীপ
যাতুকরের বন্দিনী মেয়ে
ভালে তারার টীপ।

ফুড়ুৎ, পাখী উড়ে যায়, বাণীকুমার ডেকে বলে, পাখী! পাখী! বলে যাও কী করতে হবে? উড়তে উড়তে পাখী বলে—

একলা যাবে, একলা যাবে
পক্ষীরাজের সাথে
সাতনলা সে মুক্তামালা
জড়িয়ে নিও মাথে।

বাণীকুমারের ঘুম আর হয় না, ছটফট করে রাত কেটে যায়। পাখী আকাশে মিলিয়ে যায়। পুবাকাশে তখন সূয্যি মামা লাল মুখখানি বার করে উঁকি মারচে, তাই দেখে, গাছে গাছে পাখীরা প্রভাতী গান গাইতে লেগেছে, এমনি সময় বাণীকুমার যায় মার কাছে, রাণীকে ডেকে বলে—আমি যাবো দেশ ভ্রমণে।

মাতো চমকে ওঠেন, তাঁর ওইটুকু তুধের ছেলে, সে কিনা দেশ ভ্রমণে যেতে চায়? তাকে কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেন—তুমি ছোট্ট ছেলে তুমি কোথা যাবে? তাছাড়া তোমায় ছেড়ে আমরাই থাকবো কেমন কোরে? বাণীকুমার অটল...রাজা আসেন আদর কোরে বোঝান, কিন্তু বাণীকুমারের সেই এক কথা, আমি যাবোই...রাজা রাণী বলেন তবে সঙ্গে যাক হাজার সিপাই শান্ত্রী, বাণীকুমার বলে—না আমি একলা যাবো আর যাবে আমার সোনালী পক্ষীরাজ। কি আর করেন...রাজা রাণী চোখের জল মুছে কুমারকে সাজিয়ে দেন—বাসন্তী রংয়ের পাটের ধুতি পরণে, গায়ে জরদা রঙের উত্তরীয়, মাথায় বেঁধে দেন জাফ্‌রাণি রঙের পাগড়ী, তাতে সাতনলা মুক্তার মালা জড়িয়ে দেন, কানে কুণ্ডল, কোমরে মেখলা, কোটিতটে বেঁধে দেন সর্ব্বজয়ী তরোয়াল, ললাটে এঁকে দেন আশীষ চুম্বন।

মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে, বাণীকুমার চড়েন পক্ষীরাজের পিঠে, পক্ষীরাজ উড়তে থাকে শন্ শন্ শন্...পক্ষীরাজ ছুটে আর ছুটে, ঝড়ের গতিতে, গোধূলি বেলায় এসে নামে তেপান্তরের মাঠের শেষে। সূয্যি মামা তখন ঘরপানে ছুটে চলে, তাঁর সোনালী কিরণটুকুও ম্লান হয়ে আসে। বাণীকুমার থমকে দাঁড়ায়।

সামনে সাতটী তুষারের পাহাড়, অস্তরবির লাল আভাটুকু তার উপর পড়ে ঝল্‌মল্ কোরছে।

পক্ষীরাজের মাথা চাবড়ে বাণীকুমার বলে—চলো পক্ষীরাজ? এবার আমাদের যাত্রা স্নুরু হোক।

পক্ষীরাজের পাখ্‌না বাজে শন্ শন্ শন্

হঠাৎ আকাশ ঘিরে উঠে নিকষ কালো মেঘ, শন্ শন্ কোরে উঠে কালবৈশেখীর ঝড়, কক্কড় বাজ হাঁকে, অঝোর ধারে নামে বৃষ্টি ধারা—আর সেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারিয়ে বাণীকুমার হয় দিশেহারা—। হঠাৎ তার মনে পড়ে রংমশালের কথা। সেই ঘোর অন্ধকারে রংমশালের রঙীন আলোয় পথ চিনে আবার ছুটায় পক্ষীরাজ! আর সেই ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে পক্ষীরাজের পাখনা বাজে শন্ শন্ শন্—। ক্রমে রাত্তির কেটে যায়, ঝড় বৃষ্টি ও যায় থেমে। বাণীকুমার দুধ সাগর পেরিয়ে ক্ষীর সাগরে আসে, দূর হতে দেখা যায় প্রবাল দ্বীপের শঙ্খ ধবল ঝিনুকের পাঁচ মহলা পুরী—

সহস্র দল নীল কমলের মাঝে সেই পুরীর বাতায়নে দাঁড়িয়ে দুধবরণ রাজকন্যা নীলিমা—নীল সাগরের মতো তার অতলস্পর্শ দুটি নীল আঁখি, এলিয়ে পড়েছে তার দীঘল কাজল কেশ...কে তার নীলাম্বরী আঁচল নেড়ে ইসারায় ডাক দেয়। বাণীকুমারের বুকে ওঠে আনন্দের শিহরণ, সে এগিয়ে নামে রাজপুরীর ছাদের পর নিশুতি নিঝুম ভরা। সাত রঙা ঝিনুকের সিঁড়ি বেয়ে, নেমে আসে রাজকুমারী নীলিমার ঘরে—

হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে কে চেঁচিয়ে ওঠে—

যাদুকর, যাদুকর
উঠো উঠো ত্বরা—
তেপান্তরের রাজপুত্তুর
পড়েছে আজ ধরা।

বাণীকুমার চমকে চায় মাথার উপর, দেখে এক সোনার দাঁড়ে লাল কাকাতুয়া—তার পিছনে এসে দাঁড়ায় কালো আলখাল্লা পরা বিকট মূর্ত্তি যাদুকর, তিনটি হাততালি দিয়ে যাদুকর হেঁসে উঠে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

কুমারের সারা অঙ্গ যেন হিম হয়ে আসে...চোখের সামনে নামে আঁধার যবনিকা...শুধু দেখতে পায় যেন বহুদূরে...রাজকন্যা নীলিমার কক্ষে স্ফটিকাধারে জ্বলে নীলার বাতি—অচৈতন্য বাণীকুমার লুটিয়ে পড়ে মাটীর বুকে—

গভীর নিস্তব্ধ রাত। ধীরে ধীরে বাণীকুমারের চেতনা ফিরে আসে ...সে চোখ মেলে দেখে এক টুকরো আলোর মতো একটী ছোট মেয়ে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সে চাইতেই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে...বাণীকুমার এগিয়ে আসে সে আস্তে আস্তে বলে—আমি রাজকুমারীর সখি মঞ্জুলা...তুমি এই কালো ওড়নাখানা দিয়ে পিছন হতে কাকাতুয়াকে বেঁধে ফেল, তারপর দাও তাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে তাহলেই যাদুকর মরে যাবে।—কিন্তু সাবধান! এক নিশ্বাসে সব কাজ সারতে হবে।

বাণীকুমার তাই করে।

কাকাতুয়া পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর এসে আছড়ে পড়ে অঙ্গনে, তার প্রাণহীন দেহটার পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাণীকুমার ও মঞ্জুলা হঠাৎ সেই ছোট্ট মনিয়া পাখীটি এসে বসে বাণীকুমারের কাঁধে—

মঞ্জুলা চীৎকার করে ওঠে—রাজকুমার! রাজকুমার! ধরো ধরো ওই পাখীকে, দাও অগ্নিকুণ্ডে ফেলে, কোন কথা বলোনা যেন—

কিন্তু তার প্রিয় বন্ধু সেই ছোট্ট পাখীটীকে পুড়িয়ে ফেলতে বাণীকুমারের মন চায় না তার চোখে আসে জল—মঞ্জুলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—দেরী নয় রাজকুমার' শিগগীর ওই পাখীকে পুড়িয়ে ফেলো।

বাণীকুমারের হাত কেঁপে উঠে সে আর একবার আদর করে মনিয়াকে অগ্নিকুণ্ডে

রূপকথা

শ্রীমতী যূথিকারাণী মিত্র

আজব পুরের অচিন কুমার, নাম তার বাণীকুমার।

বর্ণ তার কাঁচা সোণা, মাথায় এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মিষ্টি মুখখানিতে নীল পদ্ম তুটী নীল আঁখি। ধব্‌ধবে শ্বেত পাথরের রাজপুরীতে করে বাস, তার চারদিকে সিপাই, শান্ত্রী দেয় পাহারা—উঠতে করে আহা! বসতে করে উহু! রাজা রাণীর চোখের মনি, বুকের মানিক।

এমন যে রাজকুমার ঘুমায় সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা, সোনার ঝাড়ে জ্বলে সবুজ বাতি, গোলাপ রজনীগন্ধার গন্ধে ঘর আমোদিত হয়ে ওঠে...বাণীকুমার ঘুমায়, নিঝুম নিস্তব্ধ রাত আকাশের বুক চিরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুট্‌ছে, সারা পৃথিবী আলোয় ঝলমল করছে...এমনি সময় বাণীকুমারের খোলা জানলা ধারে কে যেন গেয়ে ওঠে—

রাজার কুমার রাজার কুমার
নিদ্‌মহলের দ্বার খোল—
প্রবাল দ্বীপের তুধকন্যা,
ডাকছে তোমায় চোখ মেল!

বাণীকুমার চম্‌কে ওঠে, কে, কে ডাকে এতো রাতে? এদিক চায়, ওদিক চায়, কোথাও কেউ নেই, জান্‌লার পানে চায়...দেখে ছোট্ট মনুয়া পাখী...বাণীকুমার বলে—

কে তুমি গো ছোট্ট পাখী
কোথায় তোমার ঘর?
প্রবাল দ্বীপে যাবো পাখী
কোন সে দেশান্তর?

ছোট্ট পাখী তার ছোট্ট পাখনা নেড়ে বলে—

তেপান্তরের মাঠের শেষে
সাত-পাহাড়ের পার
ক্ষীরের সাগর তুধের সাগর
পেরিয়ে যাবে আর
নীল কমলের বনের মাঝে
সেই সে প্রবাল দ্বীপ
যাতুকরের বন্দিনী মেয়ে
ভালে তারার টীপ।

ফুড়ুৎ, পাখী উড়ে যায়, বাণীকুমার ডেকে বলে, পাখী! পাখী! বলে যাও কী করতে হবে? উড়তে উড়তে পাখী বলে—

একলা যাবে, একলা যাবে
পক্ষীরাজের সাথে
সাতনলা সে মুক্তামালা
জড়িয়ে নিও মাথে।

বাণীকুমারের ঘুম আর হয় না, ছটফট করে রাত কেটে যায়। পাখী আকাশে মিলিয়ে যায়। পুবাকাশে তখন সূয্যি মামা লাল মুখখানি বার করে উঁকি মারচে, তাই দেখে, গাছে গাছে পাখীরা প্রভাতী গান গাইতে লেগেছে, এমনি সময় বাণীকুমার যায় মার কাছে, রাণীকে ডেকে বলে—আমি যাবো দেশ ভ্রমণে।

মাতো চমকে ওঠেন, তাঁর ওইটুকু তুধের ছেলে, সে কিনা দেশ ভ্রমণে যেতে চায়? তাকে কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেন—তুমি ছোট্ট ছেলে তুমি কোথা যাবে? তাছাড়া তোমায় ছেড়ে আমরাই থাকবো কেমন কোরে? বাণীকুমার অটল...রাজা আসেন আদর কোরে বোঝান, কিন্তু বাণীকুমারের সেই এক কথা, আমি যাবোই...রাজা রাণী বলেন তবে সঙ্গে যাক হাজার সিপাই শান্ত্রী, বাণীকুমার বলে—না আমি একলা যাবো আর যাবে আমার সোনালী পক্ষীরাজ। কি আর করেন...রাজা রাণী চোখের জল মুছে কুমারকে সাজিয়ে দেন—বাসন্তী রংয়ের পাটের ধুতি পরণে, গায়ে জরদা রঙের উত্তরীয়, মাথায় বেঁধে দেন জাফ্‌রাণি রঙের পাগড়ী, তাতে সাতনলা মুক্তার মালা জড়িয়ে দেন, কানে কুণ্ডল, কোমরে মেখলা, কোটিতটে বেঁধে দেন সর্ব্বজয়ী তরোয়াল, ললাটে এঁকে দেন আশীষ চুম্বন।

মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে, বাণীকুমার চড়েন পক্ষীরাজের পিঠে, পক্ষীরাজ উড়তে থাকে শন্ শন্ শন্...পক্ষীরাজ ছুটে আর ছুটে, ঝড়ের গতিতে, গোধূলি বেলায় এসে নামে তেপান্তরের মাঠের শেষে। সূয্যি মামা তখন ঘরপানে ছুটে চলে, তাঁর সোনালী কিরণটুকুও ম্লান হয়ে আসে। বাণীকুমার থমকে দাঁড়ায়।

সামনে সাতটী তুষারের পাহাড়, অস্তরবির লাল আভাটুকু তার উপর পড়ে ঝল্‌মল্ কোরছে।

পক্ষীরাজের মাথা চাবড়ে বাণীকুমার বলে—চলো পক্ষীরাজ? এবার আমাদের যাত্রা সুরু হোক।

পক্ষীরাজের পাখ্‌না বাজে শন্ শন্ শন্

হঠাৎ আকাশ ঘিরে উঠে নিকষ কালো মেঘ, শন্ শন্ কোরে উঠে কালবৈশেখীর ঝড়, কক্কড় বাজ হাঁকে, অঝোর ধারে নামে বৃষ্টি ধারা—আর সেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারিয়ে বাণীকুমার হয় দিশেহারা—। হঠাৎ তার মনে পড়ে রংমশালের কথা। সেই ঘোর অন্ধকারে রংমশালের রঙীন আলোয় পথ চিনে আবার ছুটায় পক্ষীরাজ! আর সেই ঝড়ের সঙ্গে তাল রেখে পক্ষীরাজের পাখনা বাজে শন্ শন্ শন্—। ক্রমে রাত্তির কেটে যায়, ঝড় বৃষ্টি ও যায় থেমে। বাণীকুমার দুধ সাগর পেরিয়ে ক্ষীর সাগরে আসে, দূর হতে দেখা যায় প্রবাল দ্বীপের শঙ্খ ধবল ঝিনুকের পাঁচ মহলা পুরী—

সহস্র দল নীল কমলের মাঝে সেই পুরীর বাতায়নে দাঁড়িয়ে দুধবরণ রাজকন্যা নীলিমা—নীল সাগরের মতো তার অতলস্পর্শ দুটি নীল আঁখি, এলিয়ে পড়েছে তার দীঘল কাজল কেশ...কে তার নীলাম্বরী আঁচল নেড়ে ইসারায় ডাক দেয়। বাণীকুমারের বুকে ওঠে আনন্দের শিহরণ, সে এগিয়ে নামে রাজপুরীর ছাদের পর নিশুতি নিঝুম ভরা। সাত রঙা ঝিনুকের সিঁড়ি বেয়ে, নেমে আসে রাজকুমারী নীলিমার ঘরে—

হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে কে চেঁচিয়ে ওঠে—

যাদুকর, যাদুকর
উঠো উঠো ত্বরা—
তেপান্তরের রাজপুত্তুর
পড়েছে আজ ধরা।

বাণীকুমার চমকে চায় মাথার উপর, দেখে এক সোনার দাঁড়ে লাল কাকাতুয়া—তার পিছনে এসে দাঁড়ায় কালো আলখাল্লা পরা বিকট মূর্ত্তি যাদুকর, তিনটি হাততালি দিয়ে যাদুকর হেঁসে উঠে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

কুমারের সারা অঙ্গ যেন হিম হয়ে আসে...চোখের সামনে নামে আঁধার যবনিকা...শুধু দেখতে পায় যেন বহুদূরে...রাজকন্যা নীলিমার কক্ষে স্ফটিকাধারে জ্বলে নীলার বাতি—অচৈতন্য বাণীকুমার লুটিয়ে পড়ে মাটীর বুকে—

গভীর নিস্তব্ধ রাত। ধীরে ধীরে বাণীকুমারের চেতনা ফিরে আসে ...সে চোখ মেলে দেখে এক টুকরো আলোর মতো একটী ছোট মেয়ে দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সে চাইতেই তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে...বাণীকুমার এগিয়ে আসে সে আস্তে আস্তে বলে—আমি রাজকুমারীর সখি মঞ্জুলা...তুমি এই কালো ওড়নাখানা দিয়ে পিছন হতে কাকাতুয়াকে বেঁধে ফেল, তারপর দাও তাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে তাহলেই যাদুকর মরে যাবে।—কিন্তু সাবধান! এক নিশ্বাসে সব কাজ সারতে হবে।

বাণীকুমার তাই করে।

কাকাতুয়া পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর এসে আছড়ে পড়ে অঙ্গনে, তার প্রাণহীন দেহটার পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাণীকুমার ও মঞ্জুলা হঠাৎ সেই ছোট্ট মনিয়া পাখীটি এসে বসে বাণীকুমারের কাঁধে—

মঞ্জুলা চীৎকার করে ওঠে—রাজকুমার! রাজকুমার! ধরো ধরো ওই পাখীকে, দাও অগ্নিকুণ্ডে ফেলে, কোন কথা বলোনা যেন—

কিন্তু তার প্রিয় বন্ধু সেই ছোট্ট পাখীটীকে পুড়িয়ে ফেলতে বাণীকুমারের মন চায় না তার চোখে আসে জল—মঞ্জুলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—দেরী নয় রাজকুমার' শিগগীর ওই পাখীকে পুড়িয়ে ফেলো।

বাণীকুমারের হাত কেঁপে উঠে সে আর একবার আদর করে মনিয়াকে অগ্নিকুণ্ডে

ফেলে—ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় রাজপুরী....তার পরক্ষণেই ধোঁয়া সরে গিয়ে জ্বলে উঠে হাজার হাজার আলো... সানাই বাঁশী বেজে উঠে মধুর সুরে। কল কোলাহলে রাজপুরী মুখর হয়ে উঠে; কোথা হতে জেগে উঠে হাজার হাজার লোকজন, রাজা রাণী, সিপাই সান্ত্রী!

আর সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে ফুলের সাজে রাজকুমারী নীলিমা—অস্ফুট কণ্ঠে বাণীকুমার বলে নীলিমা? মঞ্জুলা এসে গলা জড়িয়ে ডাকে সখি! ধীরে ধীরে নীলিমা আপন গলার ফুলের মালা দেয় বাণীকুমারের গলায় তুলিয়ে, বাণীকুমারও পাগড়ী থেকে সাতনলা মুক্তো মালা খুলে নিয়ে দেয় নীলিমার কণ্ঠে—পাশ হতে মঞ্জুলা করে শঙ্খধ্বনি।

তারপর রাজা রাণী ছুটে এসে বাণীকুমারকে নিয়ে যান ঘরে, সোনার ঘর, শাঁখের মেঝে, মিনার কাজ করা দেওয়াল। মণি মুক্তার সিংহাসনে বসিয়ে, জিজ্ঞাসা করেন—কে তুমি গো অচিন কুমার? আজ আমাদের জীবন দিলে? বাণীকুমার আপন পরিচয় দিয়ে, জানতে চায় কেমন করে তাদের এ দশা হয়েছিল? রাজা বলেন, আমি এই প্রবাল দ্বীপের রাজা, আর ওই নীলিমা আমার একমাত্র কন্যা। আমরা যখন মনের সুখে রাজত্ব করি, সেই সময় একদিন এক ঝড়ের রাতে আসে এক অতিথি, তাকে আমরা আদর কোরে থাকতে দিলাম, কে জানে সে যাদুকর, সেই রাতেই সে তার যাদুমন্ত্রে আমার লোকজন ও আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তারপর জানে মঞ্জুলা—।

তখন মঞ্জুলা বলতে থাকে—যাদুকর ওঁদের ঘুম পাড়িয়ে, শুধু জাগিয়ে রাখলে সখিকে ও আমাকে, তাও সখিকে সকালে উঠে একটী রূপোর মায়াকাটি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতো, আর সন্ধ্যাবেলা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে মন্ত্র পড়ে মনিয়া পাখী করে দিতো, তখন রাজকুমারীতে আমাতে পরামর্শ হতো কী করে মুক্তি পাবো,—

তারপর শুনলাম একদিন যাদুকর মায়া পাখীকে বল্‌ছে, যদি কোন দিন আজবপুরের অচিন কুমার এসে তোমায় পুড়িয়ে ফেলে তাহলে হবে আমার মরণ—

সেই থেকে প্রতি রাতে মনিয়া পাখী রূপে রাজকুমারী তোমায় খুঁজে ফিরেছে, শেষে দশ বৎসর পরে পেলে তোমার দেখা—আর আমরা পেলাম মুক্তি।

তারপর খু—ব ঘটা করে বাণীকুমারের সাথে নীলিমার বিয়ে হয়ে যায়—আর মহা আনন্দে তাদের দিন কেটে যায়। তারপর—

দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে যায়, বাণীকুমার দেশের কথা ভুলে যায়, বাপমার কথা ভুলে যায়।

সেদিন তারা ঝরণায় স্নান কোরতে গেছে, হঠাৎ নীলিমার গলা হতে খুলে পড়ে সাতনলা সে মুক্তামালা—বাণীকুমার চমকে ওঠে মনে পড়ে দেশের কথা, বাপমার কথা—মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাণীকুমার রাজাকে বলে আমি দেশে যাবো—সাজ সাজ রব পড়ে—মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে রাজাকে বলে আমি দেশে যাবো। সাজ সাজ রব পড়ে—সাত ময়ুরপঙ্খী ভরে রাজা মণি মুক্তা যৌতুক দেন, পাল তুলে ময়ূরপঙ্খী ছোটে ঢেউয়ের তালে তালে—

নীলিমা ও বাণীকুমার যায় পক্ষীরাজের পিঠে—রাজা রাণী চোখের জল মুছে মেয়ে ও জামাইকে বিদায় দেন, মঞ্জুলা ছুটে এসে সহস্র দল নীল কমলটী দেয় বাণীকুমারের বুকে পরিয়ে আর নীলিমার কপালে দেয় বিদায় চুম।

পক্ষীরাজ উড়ে যায় শন্ শন্ শন্—

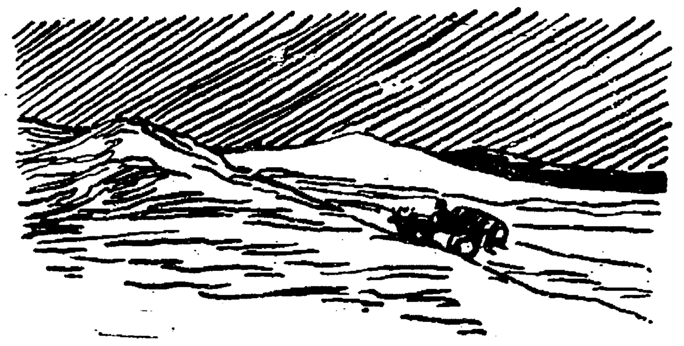

খুকুর খেয়াল

শ্রীশামুক

সকালবেলা হৈ হৈ বাড়ীতে। কাগ চিল দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পায় না।

খুকু ঘুম ভেঙ্গে বিছানায় উঠে বসলো, গা মোড়া দিয়ে হাই তুললো বড় বড় তিনটে। এতে কিছু না। একটার বদলে ভুলে তিনটে হাই না হয় তুলেছে, দু'বছর ত' বয়স। এর পরে আরম্ভ হ'ল যত গোলমেলে কাণ্ড। মিট্ মিট্ করে চেয়ে ফিক্ করে হাসে, বলে—হুম্, আঙ্গুল দিয়ে নাকের ডগায় টুপ্ টুপ্ করে আঘাত করে, তারপর হাত থেকে কি যেন ঝেড়ে ফেলতে থাকে চারিদিকে। একবার নয়, দু'বার হলেও বা কথা চলতো, বারবার, অনেকবার, মিনিটে মিনিটে।

মা বুকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে বল্লেন—খুকুমা ছিঃ ছিঃ ওরকম করে না, সোণা, আমার মাণিক। খুকু মিট্ মিট্ করে চায়, ফিক্ করে হাসে—আবার যে কে সেই! মেজদা চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে বলে—ও বোধ হয় কাল চার্লী চ্যাপলিনের কমিক দেখে এসেছে নিউ এম্পায়ারে। বুন্থদির হাসির আওয়াজে মুখ কাচু মাচু করে বল্ল—তাও ত' বটে ও কি করে দেখবে।

বিপিনবাবু প্রফেসর। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন। হাতে আঙ্গুল ঢোকানো মোটা একটা বই, অন্য হাতে কোঁচার খুট আর চশমার খাপ। সামনে ধপ্ করে বসে খাপ খুলে দেখেন চশমা নেই। ঝুঁকে পড়ে বলেন—দেখছি মানসিক বিকার, কারণ খুঁজতে হবে। বাবা শেষে ডাক্তার ডাকতে বাধ্য হন। ডাক্তারবাবু নাক টিপে টিপে দেখেন। খুকুর সুড়সুড়ি লাগে। হাসে আর বলে—হুম্। আর কি? আরম্ভ হয়ে যায়। ভাবনায় সব মুখ শুকিয়ে গেল। মা তুলসীতলায় একটা পয়সা পুঁতে দিয়ে আসেন। ভগবান যা করেন।

বিকাল। বারান্দায় খুকু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। ছোড়দা ডান্‌গুলি খেলছিল রাস্তায়। চটাস করে মেরেই বিকট চেঁচিয়ে উঠলো—মা দেখ দেখ ঠিক—বাকীটা শোনা যায় না, এক ছুটে বাড়ীর মধ্যে অন্তর্দ্ধান, হাতে ডান্ গুলিটা পলটুদের রান্নাঘরে। পরের মিনিটে বারান্দায় ভিড় জমে যায়, আশপাশের বাড়ীরও। মুদির দোকানের রকে বসে একটা বুড়ো, মটরভাজা খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। পাশে একটা ঝোলা, তার পাশে দড়ি বাঁধা, লাল ছোট ঘাগরা পরা একটি বাঁদর, হাত নাড়ছে অবিকল খুকুর মত।

বিপিনবাবু বলে উঠলেন— এবার জানতে হবে বাঁদরটা শিখলো কোথায়? এর জবাব দিল না কেউ।

বাইরের মায়া

শিল্পী গৌরী ভঞ্জ — এচিং

জয়শ্রীর সৌজন্যে

ব্যাঙের পাতা

ঘ্যাঙ্ ঘ্যাঙর ঘ্যাঁক্—!

হে পাঠকপাঠিকা সম্প্রদায় বহুদিন পর ভাই আবার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ !
আমার শরীরটা কিঞ্চিৎ অসুস্থ হওয়াতে গিয়েছিলাম পুরী বেড়াতে। সেখানে পুরীর
কাছে এক কূয়ায় আমার বন্ধু আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সে কূয়ার জল খুব চমৎকার—সহজে
হয়। পুরীর সমুদ্রও দেখে এলাম—সেখানে আমার এক দূর সম্পর্কীয়
দলের সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা কিন্তু কোলা নয়—তাঁদের চেহারা বেশ
খাটো আর গায়ের রং ফর্সা। প্রথমে আমাকে দেখে ভয়ে তাঁরা পালিয়ে
পরে চিনতে পেরে তখন কোলাকুলি। তাদের সঙ্গে সমুদ্রের জলে স্নান
কিন্তু জলটা মোটে ভাল লাগল না—রাত্তিরে একটু জ্বরও হল। সমু
আমাদের পোষাবে কেন—কূয়ার ঠাণ্ডা পরিস্কার জল তার চেয়ে অনেক
তারপর ঐ সমুদ্রের ধূধূ রোদ্দুর—বাপরে কেমন করে ঐ পুঁটকে ব্যাঙরা

যাক্ ফিরে আসতেই দেখি সম্পাদক মশাইএর মস্ত চিঠি : আমাদে
আসর জমাতে হবে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝিঁ গুবরে গঙ্গা ফড়িং
এসে হাজির। উঃ!

ফাল্গুণ মাসে আমি এখানে ছিলাম না—সে মাসের রংমশাল খুলে
অবাক কাণ্ড! রংমশাল বৈঠকে তোমাদের একজন ত্বজন গ্রাহক
ত্বটো কোলা ব্যাঙকে ধরে কিছু লিখিয়ে নিয়েছে আর ত্বটো ঝিঁ
কোলাদের ঠিকানা নিয়ে তাদের কবিতা ও গান পেশ করেছে। যাক্ আ

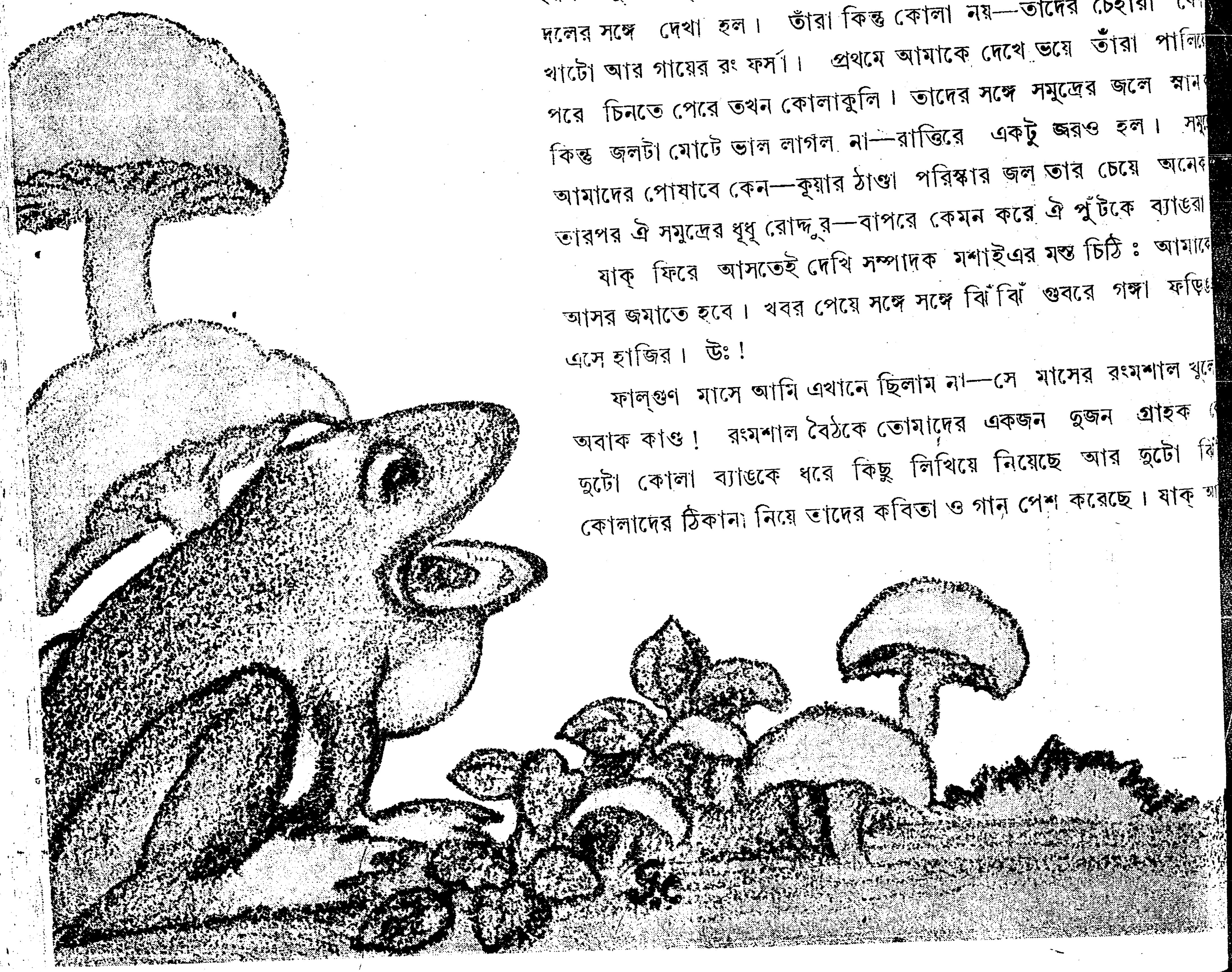

। ঐ ঝিঁঝিঁ ত্বটো আমাকে বড় বিরক্ত করছিল। কিন্তু আসল ব্যাঙ সম্পাদক যে আমি সে ভুল
া করো না। তোমাদের বৈঠকে ঝিঁঝিঁ পোকার গলায় মেডেল পরিয়ে দিতে তার চাপে ব্যাঙ পিছলে পড়ে
্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। বুঝছি এ সমস্তই বানিয়ে লেখা। যদি সত্যিই হয়, ঐ রকম
ত শাস্তিই হয়েছে। তবে গতস্য শোচনা নাস্তি।

আগে তোমাদের কাছে আমেরিকাবাসি আমার খুড়তত ভাই সম্প্রদায়—ষণ্ড ব্যাঙদের পরিচয় পত্র
ও আমাদের নানা কীর্ত্তি কাহিনীর কথা বলছিলাম।—

াদের ব্যাঙ বংশ বহু প্রাচীন, বহুদিন থেকে তাঁরা নানা সাধনায় ব্রতী হয়ে আছেন। আমাদের এই
ঙ বংশের এক আশ্চর্য্য কৃতিত্বের কথা আজ তোমাদের বলি : আমাদেরই উচ্চ পরিবারের একটি দল মধ্য
লে বহুদিন ঘরবাড়ী করে আছেন। বহু চেষ্টা সাধনা করে এঁদের হাতে পায়ে মাকসার জালের মত
ন্দর ফুরফুরে শিল্কের মত পাখা বানিয়েছেন, তার সাহায্যে তাঁরা স্বচ্ছন্দে যেখানে খুসী উড়ে যেতে পারেন
টের মত নামতে পারেন। তাঁরা উড়ো ব্যাঙ বলে পৃথিবীতে পরিচিত। কিন্তু আজকাল এঁরা একটু
পড়েছেন, দেশে ও সমাজের হিতকর কাজ তাঁরা উপেক্ষা করছেন।

রা এই সোনার বাংলার কোলা ব্যাঙ পরিবার আজও পৃথিবীতে ব্যাঙএর মর্য্যাদা রেখেছি।
কর কার্য্যে, শিল্পকলা খেলাধূলাতেও আজও আমরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছি।
ছাড়িয়ে বিশাল ভারতেও আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসার করেছি। পুরীতে
র এক স্থানীয় সভায় সভাপতি হয়ে আমি পৃথিবীতে ব্যাঙদের দান সম্বন্ধে এক
তা দিলাম আর পরিশেষে বললাম : ভারতবর্ষকে তোমাদের বড় করতেই হবে
রতবর্ষ হবে সমগ্র পৃথিবীর ব্যাঙদের তীর্থক্ষেত্র। অবশ্য ভারতের জল হাওয়া
ঙদের পক্ষে একটু অসুবিধের হতে পারে কিন্তু কিছুদিন এখানে অবস্থান করে
ঙদের বাণী তাঁরা বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন।

পাঠিকা! আজ একটু ভাই গম্ভীর কথাবার্ত্তা হয়ে গেল। আমরা যে উপেক্ষনীয় নয়
যে ভারতের অধিবাসী তার উপর আমাদের যে মস্ত দাবী আছে সেকথাই জানাবার
ানুষ সমাজের অনেক পাজি লোক ব্যাঙদের অনেক ক্ষতি অনেক অত্যাচার
যে মানুষ আমাদের ভালবাসে তাদের কাছেই আমরা আমাদের সুখত্বঃখের কথা
র আমরাও ভাই ভালবাসি। নমস্কার—

চ :—তোমাদের কাছে ত্বদণ্ড যে গল্পগুজব করব তার কি আর উপায় আছে! নীচে
া গুবরেরা চেঁচামেচি লাগিয়েছে। সোনাকে পাঠিয়েছি কিন্তু সে বোধ হয় তাদের
পারছে না। তাই আমাকেই উঠে দেখতে হোল।

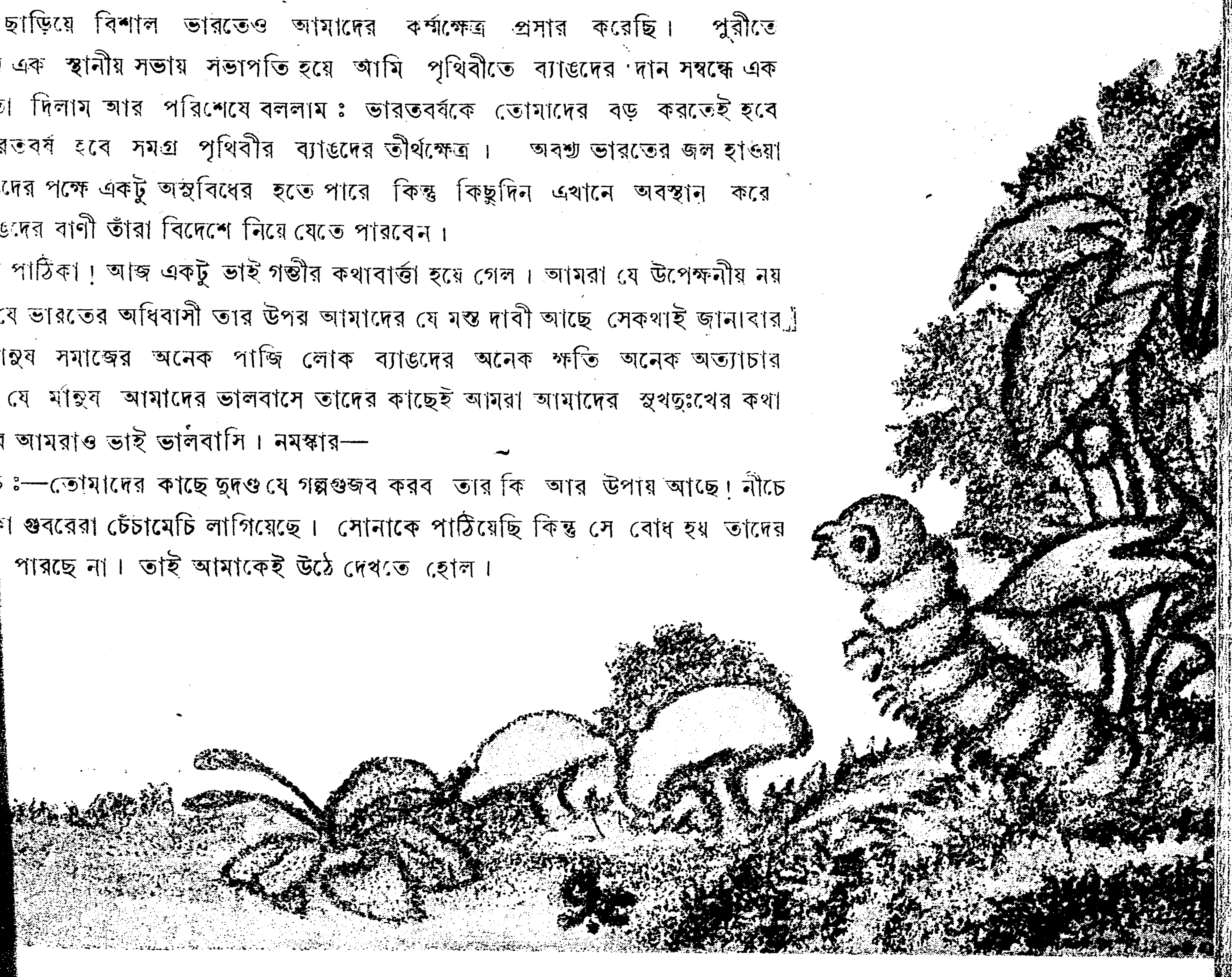

সত্যি নাকি?

তোমরা বহুরূপী দেখেছ। মানুষ যে বহুরূপী সাজে তা নয়, আসল বহুরূপী গিরগিটির মত দেখতে হয় আর যে জিনিষের ওপর বসবে তার রঙ তার গায়ে ফুটে উঠবে! মানুষের এরকম রং বদলানো শুনেছ? লজ্জায় লাল ও ভয়ে নীল হবার কথা বলছিনা। এই কিছু দিন আগে—মা তার ছোট ছেলেটির হাত ধরে সহরের হাঁসপাতালে নিয়ে এলেন। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গায়ের রঙ সবুজ হতে থাকে, দুপুরে হয় গাঢ় সবুজ আবার সন্ধ্যে হলেই তার নিজের রং ফিরে পায়! যে ছেলেটির কথা বলছি সে মারাঠী। ডাক্তারে বল্লে—ওর শরীরের ঘাম ভাল করে বেরুতে পারে না বলে এই দশা।

*　　　*　　　*

গুজরাটের রাজধানী আমেদাবাদের পূর্বদিকে একটি দেখবার জিনিষ আছে। সাধারণ একটি ছোট-খাটো মসজিদ নবাবদের আমলে তৈরী। একে বলে—ঝুল্‌তি মিনার, সহর থেকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে। মসজিদের সামনে দু'পাশে ছোট দুটি মিনার আছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে উপরে উঠা যায়। উপরে উঠে যদি দেওয়াল ধরে একটু জোরে ধাক্কাধাক্কী কর ত' মিনারটি দুলতে থাকে। জোরে জোরে দুলবে বেশ খানিকক্ষণ! লোকেরা অবাক হয়ে হাঁ করে ভাবতে থাকে ব্যাপারখানা কি, কেউ কেউ আবার ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসে। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছু নেই। একরকম বালুপাথর (flexible sandstone) দিয়ে তৈরী। এ পাথর রাজপুতানায় অনেক পাওয়া যায় এবং এক টুকরো ছোট পাথর নিয়ে যদি একটু চাপ দাও ত মচ্‌মচ্‌ করে উঠবে। এই মিনার দুটির একটি কিছুদিন আগে ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেছে—অপরটি আছে বোধহয় আর একটি ভূমিকম্পের আশায়—উপায় ত' নেই।

পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক-বিংশ অধ্যায়

তীর্থ দর্শনে

একদিন সন্ধ্যার সময় হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রীদলের ভিড়ের মধ্যে দেখা গেল একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তিনজন চেলা সহ একখানি পশ্চিমগামী যাত্রী গাড়ীর দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ, বলিষ্ঠ বাহু এবং জানুলম্বিত জটাজুট ও মুখে-চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি। জনতাও তাঁহাকে ভক্তি ও সম্ভ্রমের সহিত পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। সন্ন্যাসীর সঙ্গী তিনজন শিষ্যই নবীন। চুলে মাত্র জটা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। কপালে সিন্দূরের ফোঁটা। পরিধানে গেরুয়া কাপড় ও আলখোল্লা। সঙ্গে ছোট এক একটি পুটলি, কেবল একটী পুটলি বেশ বৃহৎ।

যাত্রীগণের গাড়ী ধরিবার একটা তাহাহুড়া পড়িয়া গিয়াছিল, কেবল এই সন্ন্যাসীর তেমন কোন ব্যগ্রভাব দেখা যায় নাই। বেশ ধীরভাবে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার মাত্র দশ মিনিট বাকী। সন্ন্যাসী একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। সেই গাড়ীতে যে সকল যাত্রী ছিল তাহারা সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর জন্য স্থান করিয়া দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে সন্ন্যাসী "জয় মা তারা" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। চেলারা তাঁহার জন্য কল্কে ভরিতেছিল, তিনি সঙ্গের ব্যাঘ্রচর্ম্মখানা গাড়ীর বেঞ্চের উপর বিস্তৃত করিয়া এইবার বেশ আরাম করিয়া বসিলেন। তিনি যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন তাহার বিপরীত বেঞ্চে বসিয়া একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক পড়িতেছিলেন। সহসা ভদ্রলোকটী একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি দিন কাল পড়েছে! কলকাতার সহরেও আজকাল ছেলেমেয়ে নিয়ে নিরাপদে বাস করা যায় না।" ভদ্রলোকটীর পাশে আর একজন বাঙ্গালী যুবক বসিয়াছিল—সে কহিল, "কি হয়েছে মশাই?" তখন ভদ্রলোক খবরের কাগজ খানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "আপনারা ছেলেমানুষ এসব খবর তো আর আপনারা রাখেন

না। আজকাল একদল ছেলেধরা সন্ন্যাসীর জন্য ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। এই দেখুন না কি লিখেছে। রামগড়ের রাজার ছেলেকে নিয়ে তাঁর দুইজন চাকর ও দাসী বিকালবেলা হাওয়া খাওয়াতে বেরিয়েছিল—সেই ছেলেটীর আর খোঁজ মিলছেনা—দু'জন সন্ন্যাসী নাকি তাদের কাছ থেকে ছেলেটাকে নিয়ে পলকের মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল—দাসী ও চাকরেরা তা বুঝতেই পারলোনা। রাজা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে ছেলের সন্ধান দিতে পারবে তাকে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেবেন ও তার আজীবন ভরণ পোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ ক'রবেন। ছেলেটীর বয়স দেড়বৎসর, তার হাতে দু'গাছি সোনার বালা এবং গলায় সোনার একটী ছোট হার, হারের সঙ্গে একটী পদক ও পদকের মাঝখানে একখানা নীল পাথর, পদকের উপরে দুটী ছোট কথা লেখা আছে।"

যুবকটী খবরের কাগজ খানা একবার হাতে লইয়া উহাতে চোখ বুলাইয়া তারপরে একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল "হবে না মশাই। যত সব গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী দেখে আমরা মনে করি যেন স্বয়ং বাবা তারকেশ্বর এসে হাজির হ'য়েছেন—যত সব ভণ্ডের দল, কেউ তো ওদের কিছু ব'লবেনা! সেই জন্যই আমাদের দেশে এইসব অত্যাচার।"

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যুবকটীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন "বাবাজীর কোথায় যাওয়া হবে?" যুবক কহিল "সে কথায় আপনার দরকার?" সন্ন্যাসী তেমনই হাস্য করিয়া বলিলেন "দরকার কিছু নেই বাবা, তবে একসঙ্গে গাড়ীতে যাচ্ছি, পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়টা হ'লে মন্দই বা কি?"

যিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন সেই ভদ্রলোকটী হাত দুইখানি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন বাবাজীর কোথায় যাওয়া হবে?" সন্ন্যাসী কহিলেন "আমাদের কি কিছু ঠিক আছে বাবা? মা তারা যখন যেখানে নিয়ে যান সেখানে যাই—জয় মা তারা!"

এমন সময়ে এক শিষ্য একটী কল্কেতে বেশ করিয়া তামাক সাজিয়া ছোট একটী হুকা সন্ন্যাসীর হাতে দিল। যুবক বিরক্ত হইয়া কহিল "এ সব চলবেনা মশাই, কি বিশ্রী গন্ধ! আপনি Passenger-দের Comfort দেখবেন না? আপনার কোনও right নাই যে এমন করে আমাদের কাছে গাঁজা খেতে পারেন"।

সন্ন্যাসী কিছুই বলিলেন না—তাহাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যুবকটী কাছে আসিলে পর অনুভব করিল সন্ন্যাসীর দেহ হইতে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ বাহির হইতেছে আর তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুঁই ফুলের মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। যুবক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল সন্ন্যাসী যোগ-শক্তিসম্পন্ন। তাহার সঙ্গে এইরূপ রূঢ় ব্যবহার করা ঠিক হয় নাই। সন্ন্যাসী যুবকের দিকে চাহিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তারপর উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন "দেখ বাবাজী, সন্ন্যাসী হ'লেই সে চোর অসাধু হয় না, আর সন্ন্যাসীর পোষাক প'রলেই সে সাধু হয় এমন কথাও আমি বলিনা। বাবাজী তো বর্দ্ধমান যাচ্ছ?" যুবক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "আপনি কি করে জানলেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "তা বাবা, ভূত ভবিষ্যৎ একটু ব'লতে পারি বই কি! এ সবই কি জান—সব পাগলী মায়ের কৃপা।" যুবক সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিল—সে কহিল "আজ্ঞে, আমাদের সঙ্গে তো আর আপনাদের মতন মহাপুরুষদের দেখা হবার সৌভাগ্য হয় না সব ভণ্ড সন্ন্যাসীদের দেখে দেখে কেমন

একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে তো সত্যি কথা! বাবাজীর কি করা হয়?" "আজ্ঞে, এবার আমি ল পাশ করেছি।" "ওঃ, তাই শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছ—শ্বশুরমশাইর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক ক'রতে কোথাকার Bar-এ join করবে।"

"আজ্ঞে, ঠিক ব'লেছেন।"

যে ভদ্রলোকটী খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার আশ্রম কোথায়?" সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে কহিলেন, "বিন্ধ্যাচল, মা বিন্ধ্যেশ্বরীর পায়ের তলায় প'ড়ে আছি বাবা।" ভদ্রলোক নীরব রহিলেন।

গাড়ী চলিতে লাগিল। রাত্রিও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই গাড়ীর এদিকে ওদিকে একটু স্থান করিয়া লইয়া ঘুমাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কেহ গান ধরিয়াছিল, আর পথের দুই দিকের ঘন তরুছায়া সমাচ্ছন্ন পল্লী ও মাঠ পলক মধ্যে অন্তর্হিত হইতেছিল।

যুবকটিও একটু পরেই তাহার ছোট বিছানাটির উপর শুইয়া পড়িয়া একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতে-ছিল। সন্ন্যাসীর চেলা তিনজনও গেরুয়ার মাহাত্ম্য প্রভাবে বেশ ভালভাবেই হাত পা ছড়াইয়া অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় ছিল।

ভদ্রলোকটিকে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোথায় যেতেছ বাবা?'

'আজ্ঞে আমি যাব ছোটনাগপুরের দিকে।'

'কোথার নামবে?'

'আসানসোল।'

'ছোটনাগপুরের কোথায় থাকা হয়?'

'আজ্ঞে সে এক বনের রাজ্যে, সাঁওতালদের দেশে।'

'কি কাজ কর?'

'আজ্ঞে গালার কেনাবেচা করি। কাঠেরও কারবার আছে, একটু জমি জিরাতও করেছি। তবে এই যে আসা যাওয়ার বড় অসুবিধে।'

'কাজকর্ম্ম কারা করে?'

'আজ্ঞে সাঁওতালরা।'

'তোমার নাম কি বাবা?'

'আজ্ঞে অনাদি চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বেশ বেশ!

'আপনি কি এখন বরাবরই বিন্ধ্যাচলে যাবেন?'

'মায়ের ইচ্ছা। যেতেও পারি, না যেতেও পারি। ফলে কোথাও নামতেও পারি, না নামতেও পারি! সবই সে পাগ্‌লী মায়ের খেয়াল। জয় মা জগদম্বা।'

ভদ্রলোক বলিলেন, 'যদি কোনদিন সাঁওতাল পরগণার দিকে যান, তবে এই অনাদি বাড়ুয্যেকে

ভুলবেন না। দেখুন, লেখাপড়া তেমন শিখিনি, পাশ-টাশের ধার ধারিনি, তবে এই কারবারি মহলে সকলেই একডাকে আমাকে জানে! মাড়োয়ারীদের বড় মহাজন ভিঘন রাম, সুঘন রাম, রামজীবন আগরওয়ালা সকলেই বুঝলেন আমাকে চেনে!'

'তা যেতে পারি! তোমাদের ওদিকে কোন পীঠস্থান আছে? জান ত মায়ের মন্দির যেখানে নেই সেখানে আমি বড় একটা যাইনা!'

অনাদি বাড়ুয্যে সগর্ব্বে কহিলেন—'কি বলেন? আমার বাংলোর ঠিক্ কাছে নয়, তবে এই প্রায় দশবারো ক্রোশ দূরে নীলাকণ্ঠেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। ভয়ানক স্থান। পূর্ব্বে সেখানে নরবলি হত। এখন ওখানে লোক বড় একটা যায় না। নিবিড় বনের ভিতর মন্দির!'

'তারা! তারা! তারা!—মায়ের সৃষ্ট এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত ক্ষুদ্র নয়। বেটি! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়েই লীলা করছে, জানবো কি করে, এ অঞ্চলেও আর বড় একটা আসিনি।'

ভদ্রলোক কহিল—'শুনেছি ওখানে নাকি অনেক তান্ত্রিক সাধু আছেন। তবে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ভয়ানক!' সন্ন্যাসী বেশ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—'কি রকম বলত বাবাজী!'

'শুনেছি ওখানে এখনও নাকি নরবলি হয়, গভীর রাত্রিতে ছোট ছোট ছেলেদের কান্নার মতন শব্দ শোনা যায়। সরকার বাহাদুর এর কোন প্রতিকার করেন না! কি করে করবেন? অসভ্য সাঁওতালেরা এসব বলে! শুনেছি, সময় সময় পশ্চিম থেকে যাত্রীরা আসা যাওয়া করে।—লোকে বলে ও একটি মহাপীঠ!'

সন্ন্যাসী ডাকিলেন, 'অঘোরানন্দ!'

অঘোরানন্দের তখন ঘুমের ঘোরে চোখ দু'টি বুজিয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসীর আহ্বানে ত্রস্ত জাগিয়া উঠিল—জড়িতকণ্ঠে কহিল—'কি আদেশ গুরুদেব!'

'দেখ বাবা! আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, তীর্থ পর্য্যটনই হচ্ছে প্রধান ধর্ম্ম। অনাদি বাবাজী বল্‌ছেন, তিনি যেখানে থাকেন, তাঁর কাছেই নাকি একটি পীঠস্থান আছে। একবার দেখে গেলে হয় না! সাধনানন্দ আর শ্যামানন্দকে ডাকত একবার!'

অনাদি বাবু সোৎসাহে কহিলেন—'অত বড় সৌভাগ্য কি আমার হবে যে আপনার মত মহাপুরুষ আমার গরীবের কুটিরে যাবেন?'

সন্ন্যাসী একেবারে ভাবে গদগদ হইয়া কহিলেন—'বলিস্ কিরে বাবা!' তারপর সুর করিয়া গাহিলেন,—

"বসে যোগাসনে সেই তারা বংশে.
যারা আছেরে তারা সঁপে, ওরে নন্দি, তারা কি
ধন জেনেছে রে তারা; তোরা কি এতকাল,
মিথ্যা করে কাল হরিলি, জ্ঞান হয়রে জ্ঞানচক্ষে;
মোর তারা না হেরিলি; জলাভাবে আকুল
সিন্ধুকুলে থেকে তোরা!"

সন্ন্যাসীর সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতে গাড়ীর মধ্যে যেন একটা আনন্দের ধারা বহিয়া গেল।

অনাদি ভক্তি গদগদ চিত্তে সন্ন্যাসীর চরণ স্পর্শ করিয়া কহিল,—'আমার পরম সৌভাগ্য। ষ্টেশনে আমার লোকজন, গরুর গাড়ী সব আসবে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।'

সন্ন্যাসী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—'অসুবিধে! কি আনন্দলাভ বাবাজী, মা আমার কোথায় কোন্ সাধন-পীঠে লুকিয়ে আছেন, তাঁর দর্শন লাভে তুষ্ট যে বাবা: আমার পরম বন্ধু! আর দেরী নয়! হুঁ তোমার সঙ্গেই যাব। সুযোগ হারালে আর সুযোগ মেলে না, এমনি করেইত রে বাবা দিন ফুরিয়ে আসে, তারপর ডাক আসে।'

আসানসোলে গাড়ী থামিল, তখন রাত একটা। সন্ন্যাসী তাঁহার চেলাসহ অনাদিচরণের সহিত সেখানে নামিলেন।

ক্রমশঃ

শিল্পী

শ্রীজীতেন্দ্র সান্যাল

উদয়াচলে সূর্য্য তখন তাঁর স্বর্ণরথের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলেছেন সোণা ছড়াতে ছড়াতে। ভোরের আলো গাছের কচি পাতায় ঝিলিক মেরে গেছে। পাখীর কণ্ঠে প্রভাতী সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

উন্মুক্ত প্রান্তরে তুলির প্রথম টান বোলাতে শিল্পী তখন ব্যস্ত। দু'চারজন লোক শিল্পীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

এখানে নাম তার অল্প লোকেই জানে, শিল্পী নামেই সে পরিচিত। সে যে ছবি আঁকে তার বিষয় বস্তুও সাধারণ. কিছুমাত্র অসাধারণ নয়। তার তুলির আঁচড়েও এমন কিছু নতুনত্ব নজরে পড়ে না। তবু তার নাম আজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—বহু লোক আসে তার ছবি দেখতে। তার ছবি লোকের যে ভাল লাগে সে শুধু তার ছবির ওপরকার একটি রহস্যমাখা লাল রংএর জন্যে। তার প্রত্যেক ছবিতে শিল্পী এই লাল রং দিতে যার আভায় ছবিটির আসল রূপ দর্শকের কাছে মূর্ত্ত হয়ে উঠত। কেউ জানতনা শিল্পীর এই গোপন লাল রংটির খবর।

আজও শিল্পী যখন তার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলে, তখনও সবাই তাকিয়ে আছে ছবির দিকে। আস্তে আস্তে ফুটে বেরুচ্ছে তার রূপ, যতই শিল্পী এঁকে চলে ততই সেই রহস্যমাখা অজানা লাল রংটি ছবিটির আসল রূপটিকে ফুটিয়ে তোলে।

শিল্পীর মুখে হৃদয়ের এক গোপন ব্যথার চিহ্ন ফুটে ওঠে।

দর্শকেরা মুগ্ধ। খেয়ালী শিল্পী আজ যেন বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্পর্কই ঘুচিয়ে দিয়েছে। দর্শকরাও আজ মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কখন্ ছবি শেষ হবে—এই আশায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে।

পাখীর কণ্ঠে বেলা শেষের স্বর বেজে উঠছে।

শিল্পীর ছবি প্রায় শেষ হতে চল্ল।

তার হৃদয়ের যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দর্শকরা ছবির দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে। তুলির শেষ টান্! সেই লাল রং অপরূপ! অপরূপ করে তুলেছে ছবিটিকে।

ছবির যা কিছু রূপ লাল আভায় মাঝে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এত ভাল ছবি বুঝি শিল্পী আর আঁকেনি। হঠাৎ শিল্পী মাটির ওপর টলে পড়ল। সেই উজ্জ্বল বড় বড় চোখদুটো নিয়ে শেষবারের মত ছবিটির দিকে তাকালে, তারপরই তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল! মাটির ওপর শিল্পীর প্রাণহীন দেহ রইল পড়ে। দর্শকরা তখন খুঁজতে আরম্ভ করলে সেই লাল রং। কোথায় কোথায়, সেই রহস্যমাখা অজানা গোপন রং?

কোথাও নেই। শিল্পীর জামা খোঁজা হল সেখানেও নেই। জামাটাকে খুলে ফেলে দেওয়া হল। শিল্পীর বুকের ওপর এক ফোটা রক্ত টলমল করছে!

পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য্য ঢলে পড়েছে।

ইংরাজি গল্পের ভাব নিয়ে লেখা

প্রাণধন পোদ্দার

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

আমাদের প্রাণধন
বাসা যার শালকে
খুসী তার প্রাণমন
বিয়ে তার কালকে

হবে নাক বিয়ে তার
হেথা কলকাতাতে
কারণ বা কি যে তার
খেলছেনা মাথাতে

বিয়ে যদি হেথা হোত
কলকাতা সহরে
ভোজ দিতে হোত কত
আত্মীয় বহরে

আত্মীয়ে দিতে ভোজ
হোত কত খরচা
আর কি হে রাখ খোজ
কত টাকা গচচা

প্রাণধন পোদ্দার
দেনাদার চালাক-ই
মহাজনে শোধবার
আগে ছায় তালাক-ই

বিয়ে তার কোনখানে
বলতে তা মানা যে
চুপি চুপি কানে কানে
যেতে পারে জানা যে

ভোজ খেতে যাবে সব
এই মোর ভাবনা
না যাওত কব সব
বিয়ে তার পাবনা

সেজে তাই আজ রাতে
ষ্টেশনে সে চলল
পৌছাবে পাবনাতে
ট্রেনে চেপে কল্য

ট্রেণ ফেল হারাধন
হৃদয়ে সে ভগ্ন
পরের ট্রেণেতে মন
পার তাও লগ্ন

চিন্তিত প্রাণধন
হবে বা কি হবে না
ভাবে নাকি যাবে বন
দুঃখ এ সবে না

ভেবে দিল করে 'তার'
ছুটে পোষ্টাপিসে
কাছে সেই কন্যার
শোন লিখল কি সে

ট্রেণ গেনু ফেল হয়ে
প্রাণধন আমি এ
হেথায় যে গেল রয়ে
তব ভাবী স্বামী হে

পরের ট্রেণেতে চেপে
যাই আমি এখনি
এর মাঝে তুমি ক্ষেপে...'
কাঁপে তার লিখনী

তবু সে জরুরী 'তারে'
করে দ্যায় ঘোষণা
এর মাঝে আর কারে
বিয়ে করে বসোনা

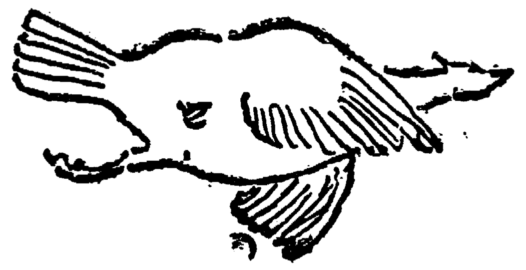

চলন্তিকা

বাংলার সাহিত্যিক কবি লেখক লেখিকারা যাঁকে জলধর-দাদা বলে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে সম্বোধন করতেন, সেই জ্যেষ্ঠতুল্য বন্ধুবৎসল জলধর সেন আর ইহজগতে নেই। তিনি সকলেরই "দাদা" ছিলেন, সকলকেই তিনি ভাইবোনের মত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। নানা পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি লেখক লখিকা ও পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন, তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। প্রথমে তিনি "বসুমতী" ও "হিতবাদী"র সম্পাদনা করেন। পরে বহু বৎসর ধরে তিনি "ভারতবর্ষ" সম্পাদনা করেন। লেখক হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল—প্রবন্ধ গল্প ও উপন্যাস লিখে তিনি সুধী সমাজে নাম করেন। তাঁর হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত একটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই। মৃত্যু সময়ে তাঁর অনেক বয়েস হয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধ হয়েও সাহিত্য সেবা পরম যত্নে ও শ্রদ্ধায় তিনি করে গিয়েছেন। আজ তাঁর মৃত্যুতে সমস্ত বাংলাদেশ হারাল একটি অতি-প্রিয় সত্যিকারের দাদাকে। এই সার্ব্বজনীন দাদাটিকে সাহিত্য আসরে সভা সমিতিতে আর আমরা দেখতে পাব না!

* * * *

আর একটি গুণী পুরুষের মৃত্যু সংবাদে আমরা পরম দুঃখিত হয়েছি, তিনি সন্তোষের মহারাজা স্যর্ মন্মথনাথ রায়চৌধুরী। বাংলার নানা হিতকর কার্য্যে সর্ মন্মথনাথের ঘনিষ্ঠ

সংযোগ ছিল। তিনি খুব ভাল বক্তা ছিলেন এবং বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সভাপতি হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। খেলা ধুলায় স্পোর্টসএ বিশেষ করে ফুটবলে তিনি সমস্ত বাংলাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আই এফ এর সভাপতি হয়ে খেলোয়াড়দের তিনি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গান বাজনায় তাঁর খুব সখ ছিল—তার তিনি কদর বুঝতেন। গানবাজনার নানা সভায় তিনি গাইয়ে বাজিয়েদের খুব উৎসাহ দিতেন ও অনেক বিখ্যাত ওস্তাদের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ ছিলেন। গুণীর আদর করতে তিনি জানতেন।

* * * *

ইউরোপের অশান্তি ক্রমশঃ ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে। মধ্য-ইউরোপের ছোট ছোট স্বাধীন দেশগুলি একে একে শক্তিশালী জাতিদের কাছে তাদের স্বাধীনতা বলি দিতে বাধ্য হচ্ছে। জার্ম্মানী—চেকোশ্লোভাকিয়া নেবার পর মেমেল দেশও বিনাযুদ্ধে দখল করে বসল। ইটালী আলবেনিয়াকে করতলগত করে নিলে। কেউ কিছু বললে না। এই রকম করে ছোট দেশগুলির মৃত্যু ঘটিয়ে জার্ম্মানী ও ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তার চলছে। জার্ম্মানী ও ইটালী সমস্ত মধ্য-ইউরোপে একছত্র রাজ্য শাসনের দাবী করছে। রোমানিয়া ও পোলাণ্ড এই দুই স্বাধীন দেশও আজ জার্ম্মানীর ভালমানুষী হুমকির দাপটে পড়েছে। আজ জার্ম্মানীর ভয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তটস্থ হয়ে আছে। কে জানে জার্ম্মানী হয়ত একদিন ফ্রান্স ও ইংলণ্ড দাবী করে বসবে—যুদ্ধং দেহি বলে! জার্ম্মানী বোধ হয় একমাত্র একটি জাতিকে সত্যিকারের ভয় করে—সে রাশিয়া। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী আছে। আজ তাই ইংলণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে!

* * * *

বম্বেতে আগা খাঁ হকি টুর্ণামেন্টে ভোপাল ওয়াণ্ডারারস্ ফাইন্যালে ভগবন্ত ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে। গতবারে এই ভগবন্ত ক্লাবই আগা খাঁ হকি কাপ পেয়েছিল। এবার ভোপাল ওয়াণ্ডারারস্ ভগবন্ত ক্লাবকে ভাল খেলে হারিয়ে দিয়ে আগা খাঁ কাপ জয়ী হল! বম্বেতে যেমন আগা খাঁ টুর্ণামেন্ট, বাংলাদেশে তেমনি হকি খেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা—'বাইটন কাপ্'।

* * *

বাইটন কাপএ যে সমস্ত হকি দল কলকাতায় খেলছে তাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস

যে আলিগড় ইউনিভারসিটি দল সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও তারাই বাইটন কাপ জয়ী হবে! আগা খাঁ টুর্ণামেন্টে ভোপালের কাছে ৫ গোলে ঝাঁসি হিরের দল হেরে যাওয়ায় বাইটনে ঝাঁসি হিরোদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে কিছুই এত গোড়াতে বলা যায় না! ঝাঁসি দলে বিখ্যাত খেলোয়াড় রূপ সিং খেলবেন শোনা যাচ্ছে, রূপ সিং বম্বেতে খেলতে পারেন নি। কলিকাতা কাষ্টমস্, কলিকাতা রেঞ্জারস্, বি এন্ আর—এই তিনটি দলকে হারানও ভারতের যে কোন ভাল দলের পক্ষে সহজ হবে না। বম্বের আর একটি দল—বম্বে লুসিটেনিয়ানস্ এরাও এবারকার বাইটনে একটি ভাল দল শোনা যাচ্ছে। আই এফ এ শীল্ড এর মত বাইটন কাপেও বহুবার অনেক আশা ভরসা উল্টে পাল্টে গিয়েছে। এবারও বাইটনে আশ্চর্য্য করবার মত অনেক কিছু ফলাফল ঘটতে পারে।

* * * *

আমরা প্রেসে যাবার আগে একটি ভয়ানক রেল দুর্ঘটনার খবর পেলাম। ই বি আর এ চুয়াডাঙ্গার কাছে মাজদিয়া ষ্টেশনে (কলিকাতা হতে ৬৬ মাইল দূরে) রাত্রি তিনটার সময় ডাউন ঢাকা মেল নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে 'কলিসন্' করেছে! নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস মাজদিয়া ষ্টেশনে কলিকাতা অভিমুখ দাঁড়িয়েছিল এমন সময় ডাউন ঢাকা মেল ঐ লাইনেই লাল সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের পেছনে ধাক্কা মারে। ফলে এক্সপ্রেসের ব্রেকভ্যান, লাগেজভ্যান ও একটি যাত্রী-গাড়ী চুরমার হয়ে যায় আর ঢাকা মেলের এঞ্জিন ও দুটি যাত্রী-গাড়ী লাইনচ্যুত হয়। প্রায় ৩০ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ও ৩০ জনএর উপর নিহত হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক খবর জানা যায়নি। যা হয়ে থাকে—যত অনুসন্ধান হবে ততই মৃত ও আহতদের সংখ্যা বাড়বে! কে জানে কত যাত্রীদের এই ভয়ঙ্কর মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে—কত যাত্রী নিহত হয়েছে! এরূপ ধরণের অদ্ভুত রেল দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। একটি ট্রেণ ষ্টেশনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে—আর ঐ লাইনেই সিগন্যাল আপ্ রাখা সত্ত্বেও আর একটী ট্রেণ এসে ধাক্কা লাগালে—এ অদ্ভুত মনে হয়। আর ঐ ষ্টেশনেই ঢাকা মেলের দাঁড়াবার কথা ছিল! গুজব—মেলের ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় নাকি গাড়ী চালাচ্ছিল! একটি অযোগ্য ড্রাইভারএর অসাবধানতায় কত যাত্রীদের মৃত্যু হল!

ভীমপলশ্রী

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

ভীমপলশ্রী সুর শুনেছো পুলক চাঁদের বাড়ী ?
সুরেতে তার মাস্‌ল্‌ গজায় সুরে চলে নাড়ী।
সুর দিয়ে তার অঙ্গে ব্যথা সুরে কামায় মাথা
সুরের গোড়ায় জল দিয়ে দেয় গায়ে সুরের কাঁথা।
গজট্‌ পটাশ্‌ ভৃত্য জমাট্‌ ঘাড়টী নেহাৎ ছিনে
গোঁফের চুলে লুকিয়ে রাখে হংসডিম্ব কিনে।
নিত্যি প্রাতে বিপুল হাতে গজট্‌ পটাশ্‌ বীর
পুলকচাঁদের ডলেন দেহ—ঘাড় গর্দ্দান শির
ডলেন্‌ ঘাড় গর্দ্দান শির ॥

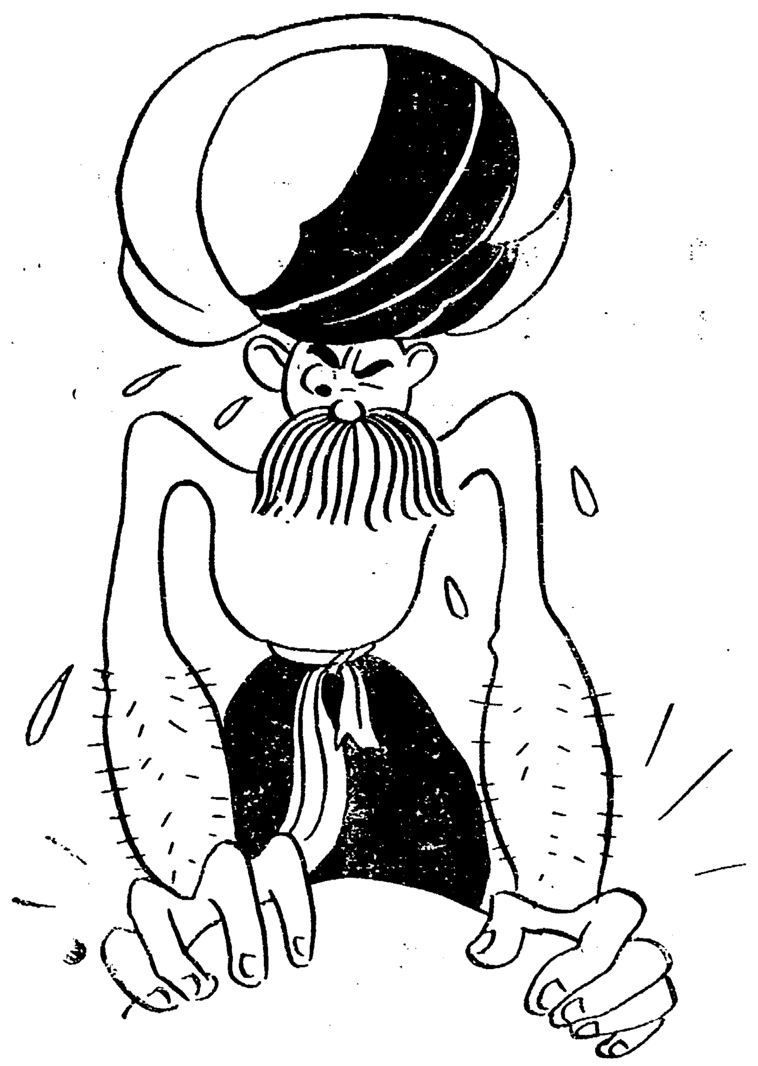

তেলের খোরা মাটীর সরা হাজির থাকে পাশে
সোমের মাথায় একটী চাপড় দিলেই হ'ল ক'সে।
উপুড় শুয়ে পুলক প্রভু ভৃত্য গলদ্‌ঘর্ম্ম
ধুপুস্‌ ধাপুস্‌ গুম্‌গুমাগুম্‌ চলছে দলাই কর্ম্ম।
খোস মেজাজে চোখ জড়িত আরামে ভরপুর
শুধালে কেউ পুলক বলে ভীমপলশ্রী সুর।
রান্নাঘরে কড়াই ফেলে খন্তি নিয়ে হাতে
মা জননী আসেন ছুটে— লাগলো বুঝি আঁতে
আহা লাগলো বুঝি আঁতে।

পাশের বাড়ীর গোবরা এসে ফেল্লে বেবাক্‌ কেঁদে
টঙ্কু খুড়ো হুম্‌কি দিয়ে ফেলেন জেরা ফেঁদে।
পাড়ার লোকে ভীড় করেছে পাঁচিল গেছে ভ'রে
আতা গাছের পাতার ঝোপে বাচ্ছা যত ঘোরে,
কেউ বা বলে পুলিশ ডাকো লাল পাকড়ি লাঠি
গজট্‌ বেটার তেজ হয়েছে হজম করুক চাঁটি।

এম্নি ধারা হরেক রকম হল্লা চলে তেড়ে
চুপড়ি ঢাকা খুলে ফেলে বেরুলো এক দেড়ে।
সবাই চেয়ে কটমটিয়ে অবাক হয়ে চটে
ম্যাজিক নাকি আরব দেশের গল্প যেন ঘটে।
কেউ বা বলে ফিস্‌ফিসিয়ে মজার বহর দ্যাখ,
দৈত্যকুলের রত্ন ওটী মাত্র আছে অ্যাক।
এক চাপড়ে গজট্‌টারে সাবড়ে তবে কথা
পুলিশ ফিরে মালিস থামায় অমন দেড়ে যেথা।
এমনি ধারা নানান্‌ কথা চলছে যখন তোড়ে
দেড়ে দাদা কনুই দুটী ব্লটিং দিয়ে জোড়ে।
পটাশ উঠে চুপড়ী দিয়ে ঢাকলো তাহার মুখ—
হুমড়ি খেয়ে দেড়ে ধরে পুলকচাঁদের বুক
ধরে পুলকচাঁদের বুক ॥

নতুন রকম ক্রিয়া যখন হোলো আবার সুরু
নানান লোকে অবাক মনে কাঁপছে দুরু, দুরু।
দেড়ে দাদার হাতের খেলা মোলাম যত প্যাঁচ
তুল্‌তুলে গায় চুলবুলে যায় ম্যাওয়ার যেন ম্যাচ্‌।
কাঁকের পাশে ঘাড়ের ধারে গাঁটের বাঁকে বাঁকে
কসরতি তার হাতটা যেন তুলোর ছবি আঁকে।
পুলকচাঁদের পুলক গেল অশ্রু এলো চোখে
দরদভরা হাতের পরশ সহ্য কি তার রোখে !
দৃশ্য দেখে সবার চোখে ভিজল জোড়া পাতা
কায়দা বটে কাঁদিয়ে দেবার নয়কো এটা যা তা।
সোজা নয়কো এটা যা তা ॥

গোবরা তখন চোপরা ছেড়ে শুধায় পুলকচাঁদে
কিসের গুণে দু'লাখ লোকে এমন করে কাঁদে ?
পুলক বলে সুরের প্যাঁচে হয়না কিরে বাপু
গায়ের দলা সুরের খেলা করতে পারে কাবু
গলায় সবে সুর ভেঁজে যায় সেতারে এসরাজে
বাঁশী দিয়ে কেউবা ফোঁকে নেহাৎ বেসুরায়ে।
কেউ বেহালা কেউ তবলা ধিনতা নানা ঠোকে
কেউবা নাকে সর্দ্দি ঝরায় কাঠবিড়ালীর শোকে।
দল্‌তে জানে কয়টা গুণী দলার আছে তান
খাম্বাজের ভোম্বা সেদিন লম্বা হয়ে যান।
পিলু দিয়ে টিপলে পিলে ম্যালোয়ারী সারে
ঠুংরী দিয়ে টেংরী টেপা ওস্তাদেতে হারে।
ঝিঁঝিট দিয়ে মিনিট খানেক খুঁটলে মাথার চুল
ভুলু বাবার ভরাট মাথার শুধ্‌রে যাবে ভুল।
ওসে শুধ্‌রে যাবে ভুল।

তালে কত তালকানারা সামলে চলে সংখ্যা নেই
কাওয়ালিতে কাবলিওলা চেঁচিয়ে ওঠে
হেঁইয়া হেঁই।
দাদরা তালে কত দাদা কাপড় ফেলে ছোটে
ঢিমে তালে ভীমের দলে ষণ্ডা কত জোটে।
ঢিমে ষণ্ডা কত জোটে।

ভীমপলশ্রী ভীমের মত গজট গেল সেধে
কানাড়াতে কান্না এল ফেল্লে সবাই কেঁদে।
আহা তাইতে সবাই কাঁদে।

—

পরম স্নেহের ছোট্ট বোনেরা আমার ! শ্রীইন্দিরা দেবী

সুপ্রভাত ! নববর্ষের শুভদিনে আমার অকৃত্রিম স্নেহপ্রীতি ও শুভকামনা তোমরা গ্রহণ করো ! তোমাদের ডাক আমি প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের সম্পাদক মশাইকে, দিদিভাই থেকে আরম্ভ করে ব্যাঙ মশাইকে পর্য্যন্ত এক একখানা পাতা ছাড়তে হয়েছে—কাজেই কি করে সুবিধে করি বলো ? এবারে এলুম, তোমাদের মিষ্টি ডাক অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। প্রবাদ আছে নববর্ষের প্রথম দিনে মানুষ যা করে তাই তাকে সমস্ত বছর করতে হয়। দেখা যাক ভাই এটা একবার পরীক্ষা করে।

উঃ কি রোদ বলতো ? হাওয়া দিচ্ছে গরম, ঘামও হচ্ছেনা। সমস্ত পৃথিবী যেন শুকিয়ে উঠলো।

কেন এমন হচ্ছে বলতো ? ঋতু পরিবর্ত্তনে এমনি হয়। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ জানো তো ? মায়ের আর ছেলের যেমন তেমনি। প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের চল্‌তে হয়—যেখানে এর অসামঞ্জস্য ঘটেছে সেখানেই মানুষ বিপদাপন্ন হয়েছে। দেখনা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতু পরিবর্ত্তনে আমাদের পরিবর্ত্তন আসে।

এখন তোমাদের বলবো শীতল পানীয় আর ঠাণ্ডা খাবার অর্থাৎ ফলমূলের কথা—যা এসময় তোমাদের একান্ত দরকারী ! গুরুমশায় যদি বলো তাহলে কি করবো বলো কিন্তু এগুলো শোনা চাই।

আগেই বলেছি এই দুরন্ত গ্রীষ্মে পৃথিবী যেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠে' জলের জন্য হাহাকার করে—মানুষের দেহও তেমনি করে' শীতল পানীয় পেতে চায়। দুপুরে ঘরের জানালা

বন্ধ করে' জানলায় খসখস টাঙ্গিয়ে তাতে জল দিয়ে, ঘরের ফ্যান খুলে ঘরখানা ঠাণ্ডা করে, কার না বসে থাকতে ইচ্ছা যায়? কিন্তু আমাদের দেহের ভিতর যে ঘর আছে সেগুলোও এমনি শীতল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে চায়---এসময় শীতল পানীয় একান্ত প্রয়োজনীয়।

গাছেরা কেমন করে তাদের জল সংগ্রহ করে জানো? মাটির বুক থেকে শিকড় দিয়ে জল সংগ্রহ করে। তারা তাদের এই শিকড় কতদূর পাঠিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। এমনি শীতল পানীয় আমাদের দরকার, অন্ততঃ এই দুরন্ত গ্রীষ্মে!

শীতল পানীয় বলতে আমরা কি বুঝি? বরফ দেওয়া মিষ্টিজলকে তোমরা শীতল পানীয় বলতে পারো—তাছাড়া ফলমূলের ভিতর অনেক ফলও আমরা ঠাণ্ডা খাবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি!

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রাখবার জন্য তাঁর উদার হস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। নদীজলকে করেছেন মানুষের পানীয়, গাছের ফলকে করেছেন শীতল। ফলের ভিতর দিয়ে শীতল রসের সন্ধান দিয়েছেন মানুষকে, যাতে সে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকৃতির দুরন্ত দাহনের ভিতরও নিজের দেহযন্ত্রকে শীতল করতে পারে। শীতল পানীয়ের ভিতর ডাবের জলের কথা আগে আসে। সুকঠিন আবরণে প্রকৃতি রেখেছেন মানুষের জন্য শীতল জল, মায়ের পরম স্নেহের মত। ডাবের জলের মত তার কচি শাঁসও আমাদের উপকারী। দুরন্ত গ্রীষ্মে কচি ডাবের জল কি মধুর, প্রাণদাতা তা বলবার নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। তারপর ঘোলের সরবৎ, বেলের পানা, তরমুজের সরবৎ শীতল পানীয়ের ভিতর বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ ও তৃষ্ণা নিবারক।

বরফটা এ সময় খুব বেশী খাওয়া ভাল নয়! এই ঘোলের, বেলের ও তরমুজের সরবতের সঙ্গে সামান্য একটু বরফ দিতে পারো কিম্বা তৈরী সরবৎ মিনিট দশেক রেফ্রিজেরেটারে রেখে দাও—এতে যাদের অসুবিধা আছে তারা একটা কাঁধা-উঁচু পাত্রে সরবৎএর গেলাসগুলো বসিয়ে গেলাসের বাইরে, পাত্রটার ভিতর বড় বড় বরফের টুকরো দাও—তাহলেই বেশ ঠাণ্ডা হবে। বরফ, জল বা সরবৎএর ভিতর ডুবিয়ে খাওয়ার চেয়ে বাহির থেকে ঠাণ্ডা করে নেওয়াই ভালো, কেন না অনেকরকম ময়লা বরফের সঙ্গে জমে থাকে। একটা কথা মনে রেখো—বাজারের সরবৎ যতদূর সম্ভব না খাবার চেষ্টা করবে। মা, দিদিদের বলে বা নিজেরাই তৈরী করে খেতে পারো—শেখা ও খাওয়া দুই-ই হবে। কচি ডাবের কথা আগেই বলেছি এটা সবসময় সব ঋতুতে খাওয়া চলে, স্বাস্থ্যের পক্ষে এর মত উপকারী আর কিছু নেই।

এবার এসো ঠাণ্ডা ফলের কথা কিছু বলা যাক—একথা বলতে গেলে সর্ব্বপ্রথম আসে

তরমুজ, পেঁপে, কমলালেবু, আম, ফুটি, কলা প্রভৃতি! এই পেঁপে, তরমুজ, আম, কলার ভিতর A জাতীয় ভাইটামিন আছে, কাজেই দেহের পুষ্টতার জন্য এদেরও বিশেষ প্রয়োজন। তাহলে দেখতে পাচ্ছ ঠাণ্ডা ফলের ভিতর পেঁপে, তরমুজ, আম দু'রকমের কাজ করছে, এতে ভাইটামিন আছে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করার শক্তিও এরা ধরে।

যাদের রেফ্রিজেরেটার আছে তারা এক কাজ করো—দুধের ভেতর ছোট ছোট আমের টুকরো দিয়ে রেফ্রিজেরেটারে রেখে কিছুক্ষণ পরে যখন দুধ খাবে তখন ঐ আমের কুচোগুলো মনে হবে বরফের টুকরো। ভারী ভাল লাগে খেতে।

এই দুরন্ত গ্রীষ্মে শরীর মন দুইই ঠাণ্ডা করে' রাখে শীতল পানীয় ও ফল।

আরও বলার ইচ্ছা থাকলেও জায়গা নেই। তোমাদের সকলের চিঠি আমি শুনেছি বা পেয়েছি—তোমাদের কথামত কাজ হবে জেনো।

পরের বার যখন দেখা হবে তখন সেলাই-এর বাক্স হাতে করে আসবো ভাই—কেমন?

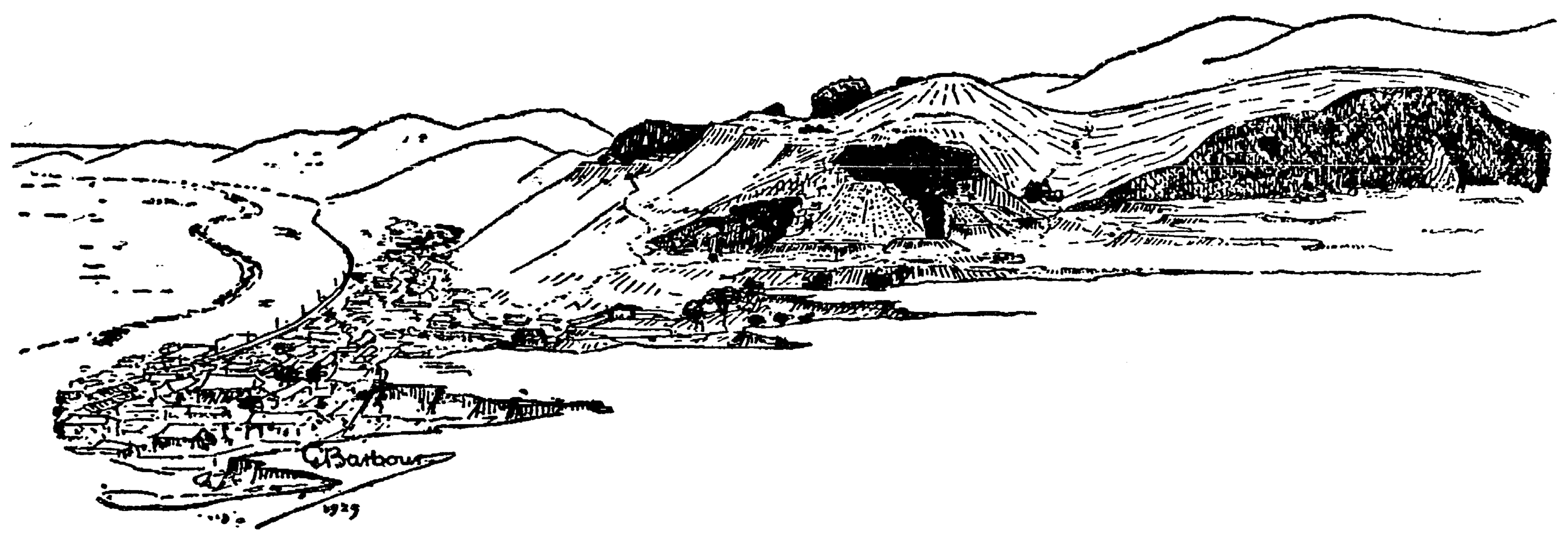

গ্রাহক নং ৪৮৪

পাথেয়

শ্রীশিবানী সিংহ

দীর্ঘদিন প্রবাসের পর বাড়ী চলিয়াছিলাম—হৃদয়ে আনন্দের পরিসীমা ছিল না। অতি প্রত্যুষে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ ধরিলাম।

কত নদী, প্রান্তর, ষ্টেশন পার হইয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল ; তবুও যেন পথ ফুরাইতেছিল না ; ভাবিলাম এঞ্জিনটার গতি যদি আরও বাড়াইয়া দেয়, শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী পৌছিতে পারি।

ক্রমে, কোন এক অখ্যাত ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল ; জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইলাম। কে একজন নীচজাতীয়া বৃদ্ধা তাহার পরিচিতা এক গ্রাম্যনারীর প্রশ্নে কহিল—"ছেলে সহরে গেল কি না, তাই তুলিয়ে দিয়ে এলাম।"

বৃদ্ধার কোলে একটি শীর্ণকায় ছেলে—কালো তাহার দেহের রং, উদরটি প্লীহা ও লীভারের চাপে প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, গণ্ডদ্বয় অস্বাভাবিক রকমে স্ফীত। দুই হাতে বৃদ্ধার গলদেশ বেষ্টন করিয়া, কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ছেলেটি ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। মাঝে মাঝে বৃদ্ধা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অতি কষ্টে বলিতেছিল—"তোর বাবা কাজ কর্‌তে গেল রে, নইলে খাবি কি ? কাঁদিস্ না, আবার ত আস্‌বে।"

বৃদ্ধার সারা অঙ্গে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কুঞ্চিত কপোল ও ভ্রূদ্বয়, মুখমণ্ডল অক্ষমতার স্পষ্ট ইঙ্গীত, চলিবার গতি মৃদু ও আড়ষ্ট, প্রতি বিক্ষেপে পদদ্বয় শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল—হয়ত এই ছেলেটির ভার সে বহিতে পারিতেছিল না।

আজ সে যাহাকে বিদায় দিয়া গেল, সে তাহার সন্তান এবং এই ছেলেটির পিতা হইবে—বৃদ্ধার কথায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বোধ করি অভাবের নিষ্ঠুর তাড়নায় লোকটি আজ গ্রাম ছাড়িয়া—আপন জন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরে চলিয়াছিল কর্ম্মের সন্ধানে, দুই মুঠা অন্নের সংস্থান করিতে। কারণ, গ্রামে থাকিয়া কাজ মেলা ভার, সেখানে লোকই বা কয়টি, আর রোজ রোজ কাজই বা কে দিবে, খাইতে দেওয়া ত দূরের কথা। তাই আজ যেখানে গেলে কাজ মিলিবে, পেট ভরিয়া দুই মুঠা খাইয়া বাঁচিতে পারিবে, আর তাহার মুখের দিকে যাহারা চাহিয়া আছে তাহারাও বাঁচিবে—এই ভরসায় সে চলিয়া গেল সহরের উদ্দেশে।

ইহাদের চিন্তায় আমার বাড়ী যাওয়ার একটানা আনন্দটুকু কোথায় উপিয়া গেল। গরীবের দুঃখ দেখিলে কষ্ট হয়—সাহায্য করিতে প্রাণ চায়, কিন্তু ক্ষমতায় কুলায় না ; কারণ আমার অবস্থা ভাল নয়, সামান্য কয়েকটা টাকার কেরাণী আমি ; আমারও মুখের দিকে চাহিয়া আছে অনেক পোষ্য ; তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া অপরকে দান করিবার মত মনোবল আমার নাই, তবুও পরের দুঃখ দেখিলে কষ্ট হয়—এমন বিড়ম্বনা কি আর আছে ?

ভাবিতেছিলাম, না জানি পল্লার ঘরে ঘরে এইরূপ দুঃখদারিদ্র্যের মূর্ত্তি কতই বা, কিন্তু সহরে সে বালাই নাই। ঐশ্বর্য্যের উল্লাসে কোলাহলমুখরা নগরীর বুকে এ দীনতার রেখাপাত নাই। দুর্দ্দান্ত দৈন্যের দাপটে দলিয়া পিষিয়া গ্রামবাসী নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে, মুখে তাহাদের হাসি নাই, পেটে অন্ন নাই, রোগে বিনা চিকিৎসায় তাহারা কুকুর, শৃগালের মত মরিতেছে—সেদিকে কেহ চাহে না। মানুষ হইয়া জন্মিবার আকাঙ্ক্ষা বুঝি বা তাহাদের আর নাই। পল্লীর সারা হৃদয় জুড়িয়া এইভাবে দৈন্যের একছত্র রাজত্ব চলিয়াছে—কেহ মাথা তুলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে না।

দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়া বলিলাম—"তোমার রাজত্বে একজন হাসিবে, আর একজন কাঁদিবে এ অসমতা, এ অবিচার কেন ? আর্ত্তের চোখের জল ঘুচাইবার মত আমায় শক্তি দাও, ভগবান।" কিন্তু অলক্ষ্যের দেবতার কাছে এ প্রার্থনা পৌছিল না কিংবা আমার এ ক্ষণিক সমবেদনায় সেই বৃদ্ধারও দুঃখের লাঘব হইল না।

হঠাৎ বাঁশীর শব্দে চমকিয়া উঠিলাম, তখন ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছে। অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম বৃদ্ধা চক্ষু মুছিতে মুছিতে ষ্টেশন পার হইয়া, বন ও আগাছাকীর্ণ গ্রামের আঁকাবাঁকা ফালিপথের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহার চিত্ত সেই বিদায়মুহূর্ত্তে যে-ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহা কে জানে !

———

কাগজের ম্যাজিক

বালক যাদুকর দেবকুমার ঘোষাল

রংমশালের তরুণ পাঠক পাঠিকা ভাই-ভগ্নিগণ, আজ আমি তোমাদিগকে একটী ম্যাজিকের কথা বলিব, যাহা যখনই তোমরা দেখিয়া থাক, তখনই দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হও এবং নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন যাদুমন্ত্র আছে মনে করিয়া লও। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার কিছুই নয়। দেশ-বিখ্যাত বড় বড় যাদুকরদের যেসব ম্যাজিক তোমরা দেখিয়া থাক তাহার অধিকাংশই জানিবে Tricks অর্থাৎ কোন না কোন কৌশল ভিন্ন কিছুই নয়। কোনটী বা হাতের কৌশল আবার কোনটী বা যন্ত্রের কৌশল। এই সব কৌশলগুলি এত আশ্চর্য্যজনক এবং এতদূর বুদ্ধি-সাপেক্ষ যে ইহাদিগকে মন্ত্র ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিবার উপায় নাই। তবে সত্যিকার বড় বড় ম্যাজিকের মধ্যে বাস্তবিকই যৌগিক-ক্রিয়া, দ্রব্য গুণ ও নানাবিধ শক্তির সাধনা আছে। সেগুলিকে আয়ত্ত্ব করা সকলের পক্ষে সহজে সম্ভবপর নহে; তবে ছোট বড় অন্য নানাবিধ ম্যাজিক তোমরা সকলে একটু চেষ্টা করিলেই আয়ত্ত্ব করিতে পারিবে।

আর ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এইবার তোমাদিগকে আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের ম্যাজিকটীর কথা বলিব। ম্যাজিকটি এই যে—কতকগুলি কাগজ খাইয়া ফেলিয়া উহা স্বাভাবিক ভাবে পেটের ভিতর হইতে বাহির করা। প্রথমে ম্যাজিসিয়ান অর্থাৎ বাজীকর একখানি পরিষ্কার ও ছোট রকমের প্লেট কিংবা রেকাবে কতকগুলি পাতলা কাগজের টুকরা লইয়া উঁচুভাবে সাজাইবে। কাগজগুলি যেন ঘুঁড়ির কাগজ হয়। আর প্লেটে উহা এমনভাবে সাজাইবে যেমন কোন দেব-দেবীকে পূজা করিবার রেকাবীতে নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্লেট হইতে ঠিক উঁচুভাবে গোলাকার হইয়া উঠিবে। আর কাগজগুলি এমনভাবে কাটিবে যেন দৈর্ঘ্য এক হাত ও প্রস্থে বেশী না হয়। তারপর আরও কতকগুলি কাগজ ঐরূপ কাটিয়া ক্রমে ক্রমে জোড়া দিয়া প্রায় ৬০ ফিট পরিমাণ অর্থাৎ ৪০ হাত লম্বা হইবে: ইহা অপেক্ষা বেশী দীর্ঘও করা যাইতে পারে; তবে মুখের ভিতর তাহা যেন লুক্কায়িত থাকিতে পারে। পরে ঐ জোড়া দেওয়া কাগজগুলি ক্রমে ক্রমে গুটাইতে থাকিবে, তারপর ঐ তৈয়ারী কাগজটী তোমার প্লেটের সাজান কাগজের ভিতর রাখিবে এবং খেলার যায়গায় উপস্থিত হইয়া দর্শকগণকে ঐ প্লেটের কাগজের কয়েকটী টুকরা লইয়া পরীক্ষা করাইবে। পরীক্ষা শেষ হইলে বলিবে—'মহাশয়গণ দেখুন, আমি এই প্লেটের সমস্ত কাগজ চিবাইয়া খাইব। পরে আবার মুখ দিয়া অনবরতঃ বাহির করিব। কিন্তু এই কাগজ ঠিক আগের মত বাহির হইবে। কোন ছেঁড়া বা কাটা থাকিবে না যোড়া লাগিয়া যাইবে।'

তুমি যখন কাগজগুলি খাইতে আরম্ভ করিবে, প্লেটটী তোমার মুখের কাছে লইয়া কাগজ মুখ দিয়া চিবাইবে। আবার যখন কাগজ মুখে লইবে তখন মুখের চিবান কাগজগুলি প্লেটে এমন করিয়া ফেলিবে যেন দর্শকগণ কিছুই বুঝিতে না পারেন। এইরূপ খাইতে খাইতে যখন সামান্য কিছু কাগজ থাকিবে তখন তোমার সেই জড়ান কাগজের গুটিকাটী মুখে ফেলিয়া দিবে। তারপর উহার একটি কোণ ধরিয়া টানিতে থাকিবে, আর ক্রমে ক্রমে যতই টানিবে ততই প্রকাণ্ড একটী বাঁশীর ন্যায় ঐ কাগজ বাহির হইতে থাকিবে। আর দর্শকগণ তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

চার্লি চ্যাপলিন

শ্রীধর

চার্লি চাপলিনকে জান? নিশ্চয়, তাতে কোন সন্দেহ আছে। সেই তো বায়স্কোপে যাকে আমরা দেখেছি—গম্ভীর মুখ ড্যাবডেবে চোখ ও ছোট একজোড়া বাটার-ফ্লাই গোঁফ। ঝল্‌ঝলে কোট, ব্যাগ-পায়জামা পেছনে পাচটা তালি মারা আর ঢিলি টুপি মাথায় আর গোদা বুট পায়ে—সে আর চার্লি চ্যাপলিন ছাড়া কে? ওঃ বলতে ভুলে গিয়েছি তার বেতের লাঠি গাছিটার কথা। ওটা না হলে চার্লির চলে না। রাস্তায় চল্‌তে গেলেই ওটা দরকার, না না ঐ রাস্তায় পাজী কুকুরগুলোর জন্যে। আমাদের কিন্তু চার্লিকে দেখলেই ভারী হাসি পায়—ওর রকম সকম চলন সব হয় ভারী হাসির। কিন্তু তোমরা সবাই জানো চার্লি হাসায় বটে তোমাদের কিন্তু ওর গল্পগুলি ভারী করুণ। তুমুল হাসির মধ্যে দিয়ে গল্প আরও করুণ হয়ে ওঠে, এক একজায়গা হাসি কান্না একসঙ্গে এসে পড়ে আমরা চোখের জলে নাকের জলে একশা হয়ে যাই। চার্লি তুমি ধন্য! এত হাসাতে কাঁদাতে তুমি পারো।

ছবির পর্দ্দায় চার্লি সুন্দর দেখতে নয়। কিন্তু ছবির বাইরের সত্যকারের যে চার্লি সে সুন্দর ও সুপুরুষ; বাটার-ফ্লাই গোঁফ আর তখন তার থাকে না। পরণে তার অতি আধুনিক মাজা ঘষা চমৎকার সুট। তোমরা দেখলে চিনতেই পারবে না। সত্যি একেবারেই পারবে না। আমিতো পারি নি।

ছবিতে চার্লি কথা বলে না—তার অভিনয় নির্ব্বাক। চার্লির মতে বক বক করে কথা বললে অভিনয়ের আসল জিনিষ নষ্ট হয়—এই আসল জিনিষটি হচ্ছে—ভঙ্গি ও ভাবব্যক্তি। চার্লি 'টকি'কে রীতিমত ঠাট্টা করে—'মডার্ণ টাইমস'এ তোমরা তা দেখেছ। একজায়গায় সে গান করছে, সে যে কোন দেশের ভাষা কোন ভাষাতত্ত্ববিদ তা বলতে পারবেন না। আসলে ওটা ভাষাই নয়—মুখে একটা ব্যা ব্যা করে আজকালকার টকির গানের চার্লি বিদ্রূপ করেছে।

সত্যি সত্যি চার্লি যদি ছবির পর্দ্দায় কোনদিন কথা বলতে আরম্ভ করে—তাহলেই সব মাটি। কারণ আজ এই টকির যুগে একমাত্র চার্লিই নির্ব্বাক যুগের মান রেখেছে।

তোমরা নিশ্চয় হারল্ড লয়েড ও লরেল-হার্ডির হাসির ছবি দেখেছ। চার্লির সঙ্গে তুলনা করতে গেলে কেমন লাগে? আমার তো মনে হয় হারল্ড লয়েডের দেখবে হাত পা নাড়া ও চোখমুখের ভঙ্গী একটু বিশেষ রকম বেশী—চার্লির এতটা নেই। চার্লির চলাফেরার মধ্যে এমন একটি ভাবের অভিব্যক্তি আছে যে কিছুই খাপছাড়া লাগে না, অথচ ওর সবই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া—আপনিই হাসি এসে যায়। যখন দুঃখের অংশ করে তখন তার করুণ মুখ দেখেই আমাদের মনে গভীর দাগ দেয়। আর এদিকে লরেল-হার্ডি যেন গোড়া থেকেই তৈরী হয়ে এসেছে হাসাবে বলে। একজন ভীষণ মোট্‌কা আর একজন তালপাতার সেপাই!

পাশাপাশি ওরা দাঁড়ালেই কেমন হাসি পায়। দেখবে যত রাজ্যের আজগুবী অসম্ভব জিনিষ ওরা করবেই করবে। এক চৌবাচ্চা জলে হাডি পড়ে গেল, উঠে এল কি জান? একটি ছোট মর্কট বাঁদর! একবার দেখলুম তুজনে হাঁসপাতালে গিয়েছে—দেহের কলকব্জা সব বিগড়ে। ডাক্তার তো প্রানপণ চেষ্টা করলেন। বললেন একজনের রক্ত আর একজনের শরীরে দিলে তুজনেই সেরে উঠবে। দেওয়া তো হল। ফল কি হোল যে না দেখেছ সে কিছুতেই বলতে পারবে না। হাডি হয়ে গেল লরেল আর লরেল হল হাডি—মায় তার গোঁফ জোড়া শুদ্ধ। অবশ্য একথা মানতে হবে তোমাদের, যে লরেলএর মত ঠিক ছোট ছেলের হাউ মাউ কান্না ও বোকার হাসি আর কেউ দেখাতে পারল না। চার্লির কাছে অবশ্য এ জিনিষ পাওয়া যাবে না তার প্রতি হাত পা নাড়ার মধ্যে মানে আছে। অনেক সময় গভীর মানেও খুঁজে পাওয়া যায়। সব চেয়ে ভাল লাগে চার্লি যখন মানুষের মনের চিন্তাগুলো শুধু নির্ব্বাক অভিনয় ইঙ্গিতে ছবি পর্দ্দায় দেখায়।

চার্লির কথা কমিকের কথা বলতে গিয়ে আমাদের সিনেমার কথা মনে পড়ে। কত তফাৎ—! আমরা যেন মানুষকে জোর করে কাতুকুতু দিয়ে গায়ে পড়ে হাসাই। সিনেমার কথা ছেড়ে দিলেও এমনি কয়জন কাতাকুতু না দিয়ে হাসাতে পারে, চার্লির মত কথা না বলে হাসাতে পারে? আর দেখবে যারা হাসাবার ভার নেয় তারা নিজেরাই হাসে বেশী!

চার্লি চ্যাপলীনের ছবির গল্পগুলির প্রত্যেকটি থেকে কিছু শেখবার বিষয়ও থাকে যা অন্য কমিকে পাওয়া যায় না। গল্পগুলি এমন সুন্দর ভাবে বাঁধা যে আমরা আন্দাজই করতে পারি না এর শেষ কি! সব ছবিতেই চার্লি নিজেই যায় হেরে—কিন্তু এ হারার মধ্যে মুখ ভার করে তুঃখ করা নেই—একটা যেন কেমন উদাসীন ভাব জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে নতুন উদ্দমের জন্য নিজেকে তৈরী করে নেয়—যেন ইঙ্গিত দেয় সংসারের তুঃখ-কষ্টকে এমনিভাবে মেনে নেওয়া উচিৎ।

তোমরা চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর নাম সকলেই শুনেছ। বাংলাদেশে হাসাবার তাঁর জুড়ি কেউ ছিলনা। অল্পদিন হল তিনি মারা গেছেন। একবার একটি স্কুলে তিনি কমিক করতে যান। একটি ছোট ছেলে তাঁকে জিগেস করেছিল—মশাই, আপনি কাঁদাতে পারেন? তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—ঐ বিদ্যেটি তার জানা নেই চড় চাপড় না মেরে। হাসান যাদের পেশা বেশীর ভাগই দেখবে তাঁরা একদম্ কাঁদাতে পারে না। কিন্তু চার্লির মধ্যে হাসান কাঁদান এমন সুন্দরভাবে মিশে প্রকাশ পায় যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

চার্লির বই দেখে বাড়ী ফেরবার সময় মনে হয় সমস্ত শরীর থেকে মন থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গিয়েছে। বার বার দেখলেও তার ছবি পুরান হয় না।

পরিচালিকা—**দিদিভাই**

আমার সোনার ভাই বোনেরা!

আজকে ধরণীর সূর্য্য এনেছে বছরের নতুন দিন! ওপারে যা পড়ে রইল তা যদি হয় নিরানন্দের—সেই পুরানো দিনের কথা ভেবে এই নতুন দিনকে আমরা যেন অভিনন্দন দিতে বিস্মৃত না হই। আমাদের নতুন করে যাত্রাপথ স্থরু হোক, সে পথে আস্থক নবোদিত সূর্য্যের শুভ্র রেখার মধুস্পর্শ!

রংমশালের অরুণ আলোয় তোমাদের কচি রাঙ্গা মুখগুলি স্বাস্থ্যের, তৃপ্তির, শান্তির ও জ্ঞানের বিভায় উজ্জল হয়ে উঠুক—

আজকের এই নতুন দিনে এই আমার প্রার্থনা তোমাদের জন্য!

জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায় (আরা) ৯৩৭

তোমার চিঠির প্রথম অংশ আমি বুঝতে পারলাম না ভাই—দোষটা কি এবং কেই বা করলে বলতো? আমার ভাই বোনেরা দিদিভায়ের কাছে দোষ তো করে না, জোর, আব্দার এই সব করে থাকে—তবুও যদি কারুর কোনটা ভুল হয় মনে করি নিশ্চয় সংশোধন করে দিয়েছি। তোমরা অনেকেই লিখেছ ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো বন্ধ হলো কেন? বন্ধ তো হয়নি, শেষে হয়ে গেছে! তা ছাড়া শীঘ্রই নূতন উপন্যাস দেওয়া হবে। তোমার ধাঁধা পেয়েছি—চিঠি ও ধাঁধা, প্রতিযোগিতা—সব আলাদা কাগজে লিখবে তোমরা সবাই।

মাধুরী সেন (ঢাকা) ৮৭৯

হ্যাঁ ভাই, রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকারা লেখনি বন্ধু পাবে। তুমি যা বলেছ তা ঠিকই—আমিও ভেবেছিলাম রবীন্দ্র মিত্রের পড়বার বই এর লিষ্ট রংমশালে ছাপিয়ে দিলে তাতে অনেক সুবিধা হতো তোমাদের সকলের—কিন্তু স্থানাভাবে হলো না। আচ্ছা আমি তোমাকে আলাদা পাঠিয়ে দেবো। তোমার অন্যান্য কথা পরিচালক মহাশয়কে জানাবো ভাই।

রেখা (পাটনা) ৩৭২

কল্পনা অঞ্জলির ধাঁধার মীমাংসা ঠিক কিনা তারাই বিচার করবে—কারণ এ ধাঁধা তাদেরই দেওয়া —আমি তাদের জানিয়ে দিচ্ছি—'চিঠির বাক্স পড়বার জন্য' এই কথা তুমি লিখেছ ভাই। রংমশাল রোগা হয়ে যাচ্ছে বলেছ ? বোধ হয় তোমরা আর ভালোবাস না—না রেখা ? ভালবাসলেই সেটা আবার মোটা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তোমরা পাতাগুণে বইর বিচার করোনা ! তুমি রেখা দাসগুপ্তার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছ ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো ভাই।

কেষ্ট (পাটনা) ৬৭০

তোমার পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনাবহুল লিষ্ট আমি পেয়েছি ভাই। সামনের এই ছুটীটা কি ভাবে কাটাবে তার লিষ্টটাও জানিও। তোমাদের চোর মশাই ধরা পড়লেন কিনা তাও জানিও।

লীলা ও ইলা ব্যানার্জ্জি ৪৮০

আমি যা বলেছি তা সত্যি নয় ভাই। তোমাদের এত বেশী চিঠি পাই যে তার জবাব দিতেই স্থানাভাব হয়—তার উপর তোমাদের প্রত্যেকের নাম যদি করি ভাই—তাহলে তো চিঠি কমাতে হয়—তাহলে তোমার ভাইবোনেরা রাগ করবে। লেখনী বন্ধুর নাম জানালেই পাঠাবো। তোমরা লিখেছ 'যে বা যারা আমাদের না জানিয়ে পদবী বদল করেছে তাদের ছুটো মিষ্টি ধমক দিয়ে মিষ্টি আদায় করে দাও'। জানো তো বোনেরা, তোমাদের মিষ্টি চাওয়ার ব্যাপার দেখে বাণী একেবারে গা ঢাকা দিয়েছে. একেবারে ফেরার। আদায় তোমরাই কর না ভাই—দিদিভাইকে ভুলোনা যেন।

সুনীল কুমার দত্ত (দার্জ্জিলিং)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ভাই ? তোমার চিঠি সত্যিই খুব আদরে গ্রহণ করা হয়েছে। Hobbyর মধ্যে একটী তোমার নতুন—কোনটা জানো ? নূতন মোটর গাড়ীর নম্বর লিখে রাখা ! তুমি কাউকে বলতে বারণ করেছ—আচ্ছা আমি কা-উ-কে বলবো না।

সুজাতা রক্ষিত (দেওঘর) ৮৩০

আচ্ছা বোনটী ! এত ভাবিয়ে তুলেছিলে কেন বলতো ? তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নাইনিতাল থেকে দেওঘরে এসেছ এ যেমন আনন্দের তেমনি সুখের কথা ! এ আনন্দ থেকে আমাদের এতদিন বঞ্চিত করে

রেখেছিলে বলে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত জানো ? ওখানে কি রকম থাক বা আছ জানিও, কবে কোথায় যাবে তাও জানাবে। উর্ম্মিলা সেনকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাওনি কেন তা বুঝলাম না।

জনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (খিদিরপুর) ১১৩৪

এমনভাবে তুমি নামটী লিখেছ ভাই আমি বুঝতে পারলাম না—দেখো ঠিক হয়েছে কিনা, নাহলে আমার ভুল সংশোধন করো। তোমাদের দ্বৈমাসিক পত্রিকাতে আমাকে লেখার জন্য বলেছ—কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না ভাই. আর গ্রাহক ? সে তো তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে বোঝা পড়া করবে—দিদিভাই কি করবে ভাই ? আব্দার নিশ্চয় করবে দিদিভাইএর কাছে—কিন্তু যা জানে না তা কেমন করে দেবে ?

শৈলেশ নাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

প্রত্যেক মাস ছেড়ে মাসে যদি তোমাদের ২।৩টা চিঠি আসে তাহলেও আমি রাগ করবো না ভাই। তোমরা যে সব জানিয়ে জবাব পাওনি—তার মীমাংসা যত শীঘ্র পারি করবো ভাই। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবে সে কখনও বন্ধুত্ব না করে থাকতে পারবে ?

অরুণ বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮২৩

তোমরা অত দেশ পর্য্যটন করে এলে শুনে খুব আনন্দ হলো। রেখার মত তুমিও ধাঁধার একই উত্তর দিয়েছ—কিন্তু বিচারের ভার তোমাদের কল্পনা অঞ্জলি দিদিদের উপর।

মাণিক (কলিকাতা) ৮৬৯

পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়ে একটী মেডেল ও চারটী বই প্রাইজ পেয়েছ শুনে খুব ভালো লাগলো। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সকলকে, জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা জয়ী হও। তোমাদের অনুযোগ আমি পড়েছি।

হীরেন গ্রাঃ ১২৩৪

অনেক দিন পরে চিঠি দিয়ে আবার দিদিভাইকে উল্টো চাপ ? তোমার দিদিকে বলো ভাবী গৃহিণীর বৈঠক যাতে যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তোমরা সবাই চিঠি লেখবার সময় একটা বিষয় নজর দিও—

১। প্রত্যেক বিষয় আলাদা কাগজে লেখা।
২। নাম ও গ্রাহক নম্বর ও ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা।

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী)

খুকু ! তুমি লিখেছ "দিদিভাই ! বাণীদিদিকে আর যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়, তাকে বলো সে যেন আবার আগের মতো চিঠিপত্র লেখে, গা ঢাকা না দেয়, আমরা আর কিছু বলবো না, সন্দেশ চাই না" ! খুকু—এ যদি তোমাদের সকলের মত হয়—তাহলে বোধ হয় বাণী এবারে চিঠি দেবে। ইন্দিরাদির বৈঠকের বিষয় হীরেনকে লিখলাম—পড়লেই বুঝতে পারবে। ঠাকুমা, দিদিমাকে যে নমস্কার দিয়েছ, তাঁদের পাঠালাম।

মাধুরী সেন (ঢাকা) ৮৭৯

হ্যাঁ ভাই, রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকারা লেখনি বন্ধু পাবে। তুমি যা বলেছ তা ঠিকই—আমিও ভেবেছিলাম রবীন্দ্র মিত্রের পড়বার বই এর লিষ্ট রংমশালে ছাপিয়ে দিলে তাতে অনেক সুবিধা হতো তোমাদের সকলের—কিন্তু স্থানাভাবে হলো না। আচ্ছা আমি তোমাকে আলাদা পাঠিয়ে দেবো। তোমার অন্যান্য কথা পরিচালক মহাশয়কে জানাবো ভাই।

রেখা (পাটনা) ৩৭২

কল্পনা অঞ্জলির ধাঁধার মীমাংসা ঠিক কিনা তারাই বিচার করবে—কারণ এ ধাঁধা তাদেরই দেওয়া—আমি তাদের জানিয়ে দিচ্ছি—'চিঠির বাক্স পড়বার জন্য' এই কথা তুমি লিখেছ ভাই। রংমশাল রোগা হয়ে যাচ্ছে বলেছ? বোধ হয় তোমরা আর ভালোবাস না—না রেখা? ভালবাসলেই সেটা আবার মোটা হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তোমরা পাতাগুণে বইর বিচার করোনা! তুমি রেখা দাসগুপ্তার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছ ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো ভাই।

কেষ্ট (পাটনা) ৬৭০

তোমার পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনাবহুল লিষ্ট আমি পেয়েছি ভাই। সামনের এই ছুটীটা কি ভাবে কাটাবে তার লিষ্টটাও জানিও। তোমাদের চোর মশাই ধরা পড়লেন কিনা তাও জানিও।

লীলা ও ইলা ব্যানার্জ্জি ৪৮০

আমি যা বলেছি তা সত্যি নয় ভাই। তোমাদের এত বেশী চিঠি পাই যে তার জবাব দিতেই স্থানাভাব হয়—তার উপর তোমাদের প্রত্যেকের নাম যদি করি ভাই—তাহলে তো চিঠি কমাতে হয়—তাহলে তোমার ভাইবোনেরা রাগ করবে। লেখনী বন্ধুর নাম জানালেই পাঠাবো। তোমরা লিখেছ 'যে বা যারা আমাদের না জানিয়ে পদবী বদল করেছে তাদের ছুটো মিষ্টি ধমক দিয়ে মিষ্টি আদায় করে দাও'। জানো তো বোনেরা, তোমাদের মিষ্টি চাওয়ার ব্যাপার দেখে বাণী একেবারে গা ঢাকা দিয়েছে. একেবারে ফেরার। আদায় তোমরাই কর না ভাই—দিদিভাইকে ভুলোনা যেন।

সুনীল কুমার দত্ত (দার্জ্জিলিং)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ভাই? তোমার চিঠি সত্যিই খুব আদরে গ্রহণ করা হয়েছে। Hobbyর মধ্যে একটী তোমার নতুন—কোনটা জানো? নূতন মোটর গাড়ীর নম্বর লিখে রাখা! তুমি কাউকে বলতে বারণ করেছ—আচ্ছা আমি কা-উ-কে বলবো না।

সুজাতা রক্ষিত (দেওঘর) ৮৩০

আচ্ছা বোনটী! এত ভাবিয়ে তুলেছিলে কেন বলতো? তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নাইনিতাল থেকে দেওঘরে এসেছ এ যেমন আনন্দের তেমনি সুখের কথা! এ আনন্দ থেকে আমাদের এতদিন বঞ্চিত করে

রেখেছিলে বলে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত জানো? ওখানে কি রকম থাক বা আছ জানিও, কবে কোথায় যাবে তাও জানাবে। উর্ম্মিলা সেনকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাওনি কেন তা বুঝলাম না।

জনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (খিদিরপুর) ১১৩৪

এমনভাবে তুমি নামটী লিখেছ ভাই আমি বুঝতে পারলাম না—দেখো ঠিক হয়েছে কিনা, নাহলে আমার ভুল সংশোধন করো। তোমাদের দ্বৈমাসিক পত্রিকাতে আমাকে লেখার জন্য বলেছ—কিন্তু আমি তো লিখতে জানি না ভাই. আর গ্রাহক? সে তো তুমি তোমার ভাইদের সঙ্গে বোঝা পড়া করবে—দিদিভাই কি করবে ভাই? আব্দার নিশ্চয় করবে দিদিভাইএর কাছে—কিন্তু যা জানে না তা কেমন করে দেবে?

শৈলেশ নাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

প্রত্যেক মাস ছেড়ে মাসে যদি তোমাদের ২।৩টা চিঠি আসে তাহলেও আমি রাগ করবো না ভাই। তোমরা যে সব জানিয়ে জবাব পাওনি—তার মীমাংসা যত শীঘ্র পারি করবো ভাই। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইবে সে কখনও বন্ধুত্ব না করে থাকতে পারবে?

অরুণ বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮২৩

তোমরা অত দেশ পর্য্যটন করে এলে শুনে খুব আনন্দ হলো। রেখার মত তুমিও ধাঁধার একই উত্তর দিয়েছ—কিন্তু বিচারের ভার তোমাদের কল্পনা অঞ্জলি দিদিদের উপর।

মাণিক (কলিকাতা) ৮৬৯

পরীক্ষায় ফাষ্ট হয়ে একটী মেডেল ও চারটী বই প্রাইজ পেয়েছ শুনে খুব ভালো লাগলো। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের সকলকে. জীবনের সব পরীক্ষায় তোমরা জয়ী হও। তোমাদের অনুযোগ আমি পড়েছি।

হীরেন গ্রাঃ ১২৩৪

অনেক দিন পরে চিঠি দিয়ে আবার দিদিভাইকে উল্টো চাপ? তোমার দিদিকে বলো ভাবী গৃহিণীর বৈঠক যাতে যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তোমরা সবাই চিঠি লেখবার সময় একটা বিষয় নজর দিও—

১। প্রত্যেক বিষয় আলাদা কাগজে লেখা।
২। নাম ও গ্রাহক নম্বর ও ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা।

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী)

খুকু! তুমি লিখেছ "দিদিভাই! বাণীদিদিকে আর যন্ত্রণা দেওয়া উচিত নয়, তাকে বলো সে যেন আবার আগের মতো চিঠিপত্র লেখে, গা ঢাকা না দেয়, আমরা আর কিছু বলবো না, সন্দেশ চাই না"! খুকু—এ যদি তোমাদের সকলের মত হয়—তাহলে বোধ হয় বাণী এবারে চিঠি দেবে। ইন্দিরাদির বৈঠকের বিষয় হীরেনকে লিখলাম—পড়লেই বুঝতে পারবে। ঠাকুমা, দিদিমাকে যে নমস্কার দিয়েছ, তাঁদের পাঠালাম।

রবীন্দ্র মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

তুমি আরও যে সব বইয়ের নাম পাঠাতে বলেছ সে একটু পরে পাঠাবো—আর ম্যাগাজিন সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছ তাও জানাবো। তোমার প্রায়ই অসুখ করে কেন বলতো? কি হয়? ব্যায়াম করো? রোজ সকালে উঠে করবে? কেমন, মনে থাকবে তো? আর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও সচেতন হবে একটু!

মায়া কমল গুহ (রেঙ্গুন)

কে বল্লে আমি ভেতরে রাগ করে বাইরে ভাব দেখাচ্ছি ভাই! 'চকোলেটের মত মিষ্টি দিদিভাই'! এই তোমার সম্বোধন আমায়—কিন্তু আমি সেটার যায়গা একটু বদল করে 'দিদিভাই'টা উঠিয়ে 'মায়াকমল' বসাচ্ছি। দেখো তো কোনটা ভাল! তোমার সঙ্গে সবাই ভাব করবে—তুমি কার সঙ্গে করতে চাও! বিদেশী বন্ধুদের কথা পরে জানাবো ভাই।

গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) ১১৮৩

তুমিতো সম্পাদক মশাইকে লিখেছ তাতেই হবে। কলম্বাসের মত ভুল করেছ কি ঠিকই হয়েছে তাতো জানি না ভাই—তবে কলম্বাস ভুল করেছিলেন তাই বলেছি। কোন্ ক্লাশের উপযোগী ও কি বিষয় বই এর নাম তুমি চাও লিখে জানিও পাঠিয়ে দেবো তার নাম।

সুরথ বসু (চুঁচড়া) ১১১৮

রংমশাল সরু হয়ে যাচ্ছে তাতে ওষুধ খাওয়াতে বলেছ—যা ওষুধ লিখেছ তাতে কি মোটা হয় রংমশাল—? তোমাদের সহযোগীতায় সে মোটা হয়ে উঠবে। তা ছাড়া, রেখাকে কি উত্তর দিয়েছি, দেখেছো ত?

মিণ্টুরাণী বসু (চুঁচড়া) ১১১৮

এবারে পিণ্টু বাদ পড়ল কেন ভাই? দিদিভাইয়ের পরিচয় 'দিদিভাই' এতো বহুবার বলেছি ভাই—লুকিয়ে রাখবো কেন বলো? মনে করছ ধাঁধা? তাও যদি হয় ধাঁধার উত্তর দেবার চেষ্টা করো। দেখবার সৌভাগ্য নিশ্চয় আছে তবে সেটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য ভাই? রংমশালের প্রীতি উৎসব তো আছেই, দেখা নিশ্চয় হবে—তাছাড়া সেই—'বাণী'র ব্যাপার! এই আশা তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে সে ভুল আর কেউ করবে না!

তারা মুখার্জ্জি গ্রাঃ ৭৮৭

তোমায় তো আগে বলেছি বোনটী, তোমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেক চিঠির উপরে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক

নম্বর বেশ স্পষ্ট করে লিখবে। না লিখলে আমাদের ভারী অসুবিধা হয়। সুজাতা রক্ষিতের ঠিকানা কেমন করে পাঠাবো—তুমি তো ঠিকানা দাওনি? আশা করি ভাল আছ!

রেবা গাঙ্গুলী (Lhaksar)

তোমার গ্রাহক নম্বর নেই কেন? তুমি কি এজেন্টের কাছে কাগজ নাও? হরিদ্বার তোমাদের ওখান থেকে মাত্র ১৯ মাইল, নিশ্চয় মাঝে মাঝে বেড়াতে যাও? লেখনী-বন্ধু কা'কে চাই নাম জানালেই পাঠাবো ভাই।

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপুর) ৬৭৮

তোমাদের চাকরের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলাম—কাছে হলে নিশ্চয় তা'কে কোনও একটা প্রাইজ দিতাম—। ঠিকানার বিষয় যা লিখেছ সত্যি এমনি গোলমাল আরো ২।১ জায়গায় হয়েছে। আচ্ছা শীগ্গীরই পাঠাচ্ছি তোমায় ঠিকানা। নীলিমার কোন চিঠি তো আমি পাইনি ভাই।

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

ভাবনা করে উপায় কি বল? ভাব না করলে ভীষণ রাগারাগি হতো কিন্তু ভাই। বাঃ কল্পনা অঞ্জলিরা প্রশ্ন করলো আর দোষ আমার? তোমরা কেন শেষ দিক থেকে রংমশাল পড়ো তাতো ভাই তোমরাই জানো! যে সব উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেছ বোন ওর কোনটারও যোগ্য আমি নই। তবে তোমাদের অর্থাৎ প্রত্যেক ভাই বোনের সঙ্গে আমার এই সর্ত্ত রইলো—তারা নিশ্চয় চিঠি লিখবে—কা'রু যদি নাম না করতে পারি তা'তে যেন অভিমান না আসে।

রাজিয়া খাতুন (ময়মনসিং) ১২২৫

মানু! বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হলো। তোমার বিদেশীবন্ধু চাই, কিরকম বিদেশী বলতো? তোমার যদি নাম জানা থাকে তা'হলে জানিও ঠিকানা পাঠাবো! তুমি 'বর্ণ বৈষম্য' সম্বন্ধে যা প্রশ্ন করেছ বা বিস্তারিত ভাবে তোমায় জানাতে বলেছ—তা যদি সম্ভব হয় আগামীবারের রংমশালে কিম্বা পৃথকভাবে পোষ্টে লিখে জানাবো। পাশের বাড়ীর জন্য চেষ্টা করছি।

শিবরাম বন্দোপাধ্যায় ৮৭৬

তোমাদের অভিযোগ জানিয়েছি। পরীক্ষা কেমন হলো? সন্দেশের আশায় থাকবো তো?

শিবানী সিংহ (কলিকাতা) ৪৮৪

না ভাই প্রতিদানের জন্য নয়—নাম সব সময় করতে পারিনা তাই বলে কি ভুলে যেতে পারি বোনটী? তোমরা সবাই আমার কত স্নেহের কত আদরের—তোমাদের ভুলে থাকা কি সম্ভব? আমার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দেবে—আর জোর করবে তবেই তো জানাবো তোমরা দিদিভাইএর সত্যিকারের বোন। পুরস্কার পাওয়া সম্ভবতঃ একটা উৎসবের সময়, নাহলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তোমার 'পাথেয়' পেয়েছি—যোগ্যস্থানে দেওয়া হয়েছে। তোমার হাতের লেখার জন্যও পুরস্কার পাওয়া উচিত। মুকুলরা ভাল আছে?

আজ আর জায়গা নেই। সুবোধকুমার গুপ্ত, সত্যানন্দ প্রামাণিক প্রভৃতির চিঠির উত্তর পরের বারে যথাযোগ্য সব যাবে।

শুভার্থিনী

তোমাদের

দিদিভাই

আমাদের লাইব্রেরী

তোমাদের কাছে পরিচয় দেবার জন্য ইস্টার্ণ ল' হাউস, কলিকাতা, কয়েকখানি বই আমাদের পাঠিয়েছেন। বইগুলি বিলম্বে পাওয়ায় পুরো সমালোচনা করা সম্ভব হল না। তাই কেবল আমরা বইগুলির নাম, দাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তোমাদের দিচ্ছি।

১। মানুষ পিশাচ ঃ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ঃ দাম বারো আনা। এটি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুর আর একটি বিভীষিকাময় এ্যাড্ভেঞ্চার কাহিনী। হেমেনবাবুর বইর অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বাঁধাই ও ছবিগুলি ভাল। মলাটের উপর মানুষ-পিশাচের ছবিটি দেখবার মত।

২। এক পেয়ালা চা ঃ শ্রীবুদ্ধদেব বসু ঃ দাম ছয় আনা। পাঁচটি ছোট ছোট সুন্দর হাসির গল্পের বই। প্রথম গল্পটি—'এক পেয়ালা চা' থেকে বইটির নামকরণ করা হয়েছে। চায়ের সঙ্গে গল্পগুলি জলখাবারের মত নিশ্চয় মুখরোচক হবে।

৩। রাজার ছেলে ঃ শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু ঃ দাম দশ আনা। ভাই-বোন পত্রিকার কাকাবাবু-সম্পাদক মহাশয়ের এটি ছেলে-মেয়েদের একটি সুবৃহৎ সামাজিক উপন্যাস। রঙিন পাতায় ছাপা, বাঁধাই ও ছবিগুলি ভাল। রাজার ছেলে তোমাদের ভাল লাগবে আশা করি।

৪। গুজবের জন্ম ঃ শ্রীসুনির্ম্মল বসু ঃ দাম ছয় আনা। নয়টি বাছাই-করা ছোট গল্পের সমষ্টি এই বইটিতে পাবে। অনেকগুলি ছবি আছে—শৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা।

৫। বুদ্ধির লড়াই ঃ শ্রীসুধাংশু দাসগুপ্ত ঃ দাম ছয় আনা। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা এ বইটি মন দিয়ে পড়বে। সবশুদ্ধ আটটি ছোট গল্প আছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ধাঁধার উত্তর, প্রতিযোগিতার উত্তর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন কাগজে চিঠি না লিখিলে এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর না থাকিলে তাহাদিগের নাম ছাপান বা প্রতিযোগিদের দলভুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। এবারে চৈত্রের ধাঁধার উত্তর ও প্রতিযোগিতার উত্তর অনেকেই একই কাগজের দুইদিকে লিখিয়াছে এবং বিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাদের নাম এবার ছাপান হইল। ভবিষ্যতে হইবে না।

নূতন ধাঁধা

খামখেয়ালীর চিঠি

লোকটি বেজায় খামখেয়ালী। সে বলে, "শুদ্ধভাষায় 'দই' যদি 'দধি' হয়, 'বই' হবে 'বধি', 'কড়া' যদি 'কটহ' হয়, 'পড়া' হবে 'পটহ'।" এই নিয়মে সে একখানা চিঠি লিখেছে, তা'তে চলিত কথাগুলির বদলে নিজের নিয়মমত শুদ্ধ কথা বানিয়ে কথা বসিয়েছে। চিঠির এক অংশ নীচে তুলে দিলাম; পড়্তে পার কি? (' ' চিহ্নের মধ্যের কথাগুলির বদলে ঠিক কথা বসাতে হবে)ঃ

'অর্ম্মকার' 'কক্র' ও 'মাত্র' 'কাল্য'। 'রৌজ্র' 'গদলী-ফর্ত্তন' চিৎকার 'নদ' করিলে 'কশ্চাৎ' 'বর্দ্দন' দায়। 'আর্য্য' 'বুগ্ধ-বাহার'; 'কক্র' 'জাম্র' 'মরল' পরিয়া, 'সন্থ' করিয়া 'কজ্র'-স্থলে যাইবেন 'শয়ন' যাইতেছে। 'কক্র'র 'মালুকা' 'রৌথ্র' চড়াইয়া 'কন্ধন' ধরিয়াছে, 'সজ্র' করিয়া, 'গদ', 'গর্দ্দন'এ 'শল্য' জড়াইয়া সেও 'কজ্র'-স্থলে যাইবে। 'কক্র'কে 'সর্দ্দভ' ও 'বর্দ্দন'ই 'মালুকা'র 'সাহার'! 'কক্র' কহিলেন: 'গ্রোড়' 'থাতুল'! 'কন্ধন' 'ধাতুল' 'ঢক্র' 'থক্র' 'ভূষঞ'।"

চিঠিটি চলিত কথায় লিখে ঠিক করে পাঠাও। পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে বৈশাখ।

চৈত্র মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১।	৪১৩	পৃষ্ঠা	—	"অকাণ্ডের কাহিনী"	হইতে
২।	৪০৩	,,	—	"সমুদ্রের জন্ম"	,,
৩।	৪১৪ ও ৪১৫	,,	—	"অকাণ্ডের কাহিনী"	,,
৪।	৩৮৭	,,	—	"ইয়েস্ স্যার"	,,
৫।	৩৮৩	,,	—	"নীলকণ্ঠ পাখী"	,,
৬।	৪০৯	,,	—	"বাদসাহী গল্প"	,,
৭।	৩৮৯	,,	—	"শ্বেত বামন আর লোহিত দানব"	
৮।	৩৭২	,,	—	"বীর স্যামশন্"	,,
৯।	৩৯১	,,	—	"চন্নু, মুন্নু, চ্যাঁ, ম্যাঁ	,,
১০।	৩[illegible]৮	,,	—	"চাঁদের দেশের মেয়ে"	,,
১১।	৪০৫	,,	—	"জঙ্গল"	,,

৫ নং প্রশ্নের উত্তর অনেকেই ভুল করে ৩৮০ পাতা লিখিয়াছেন। ৩৮০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "তিনি আদর দিয়েই ত তোমার মাথাটা খেলেন" কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে "তিনিই ত আদর দিয়ে তোমার মাথা খেয়েছেন" এবং উহা ৩৮৩ পৃষ্ঠা ৭ লাইনে আছে।

ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

যাদের উত্তর নির্ভুল হয়েছে ঃ—

গৌরাঙ্গ কুমার ভোস, কলিকাতা ; জগদিন্দ্র নাথ রায়, ভবানীপুর ; মন্মথ নাথ পাল, কিশোরগঞ্জ ; প্রভাত কুমার, প্রফুল্ল কুমার, প্রণব কুমার গাঙ্গুলী, ভবানীপুর ; ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ, হাওড়া ; মৃগাঙ্ক শেখর সামন্ত, তমলুক ; বিজু, ভুন্তুম ও সুচারু মিত্র, গিরিডি ; সুকুমার ও বলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর ; অশোক, অসিত, অশেষ, রঞ্জিৎ, যূথিকা, বুঁচকি, হাতী সিংহ, ছোট মাসীমা, দিলীপ ও অসীম কুমার সরকার, পুরুলিয়া ; দিলীপ রায় চৌধুরী, ভাগলপুর ; যশোধন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপুর ; যমুনা, বরুণ, কৃষ্ণা, সঞ্জয়, ধর ও পুস যশোহর ; অরুণ কুমার রায়, ভবানীপুর ; কল্পনা ও অঞ্জলি, নাগপুর ; প্রভাত কুমার, সুকুমার অমর নাথ মা ও অশ্রুময়ী, ভবানীপুর ; শ্রীলেখা বসু, ভবানীপুর : সন্দীপ রাও, আঙ্গুল ; সত্যেন্দ্র, সবিতা ও পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ; মসীদিদি, বোঁচা, জামাইবাবু, গুপ্‌থী, গীতি, রথী ও সতী মৈত্র, রাজসাহী ; সনৎ কুমার গাঙ্গুলী, কালীঘাট ; ধ্রুবেন্দ্র নাথ ঘোষ, পাটনা ; সুরথ, পিন্টুরাণী ও মিন্টুরাণী বসু, চুচুঁড়া ; ইরা বন্দোপাধ্যায়, বালীগঞ্জ ; নীলিমা নাগ, টালা ; স্মৃতি রায়, শিলচর ; বিমল রঞ্জন রায়, পাটনা ; নীলিমা চক্রবর্ত্তী, নিউদিল্লী ; হীরেন্দ্র নাথ রায়, রাঁচি ; শৈলেন্দ্র নাথ নন্দী শ্রীরামপুর ; অমিতাভ ও মনোজিত ঘোষাল, পুরুলিয়া ; সুধীন্দ্র নাথ গুহ, কলিকাতা ; রবি, বাণী ও সুধিন, মির্জ্জাপুর ; মীরেন ও মণি, তেওতা ; জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, বাবা মা ও মঞ্জু, আরা ; কল্যাণ কিশোর মুখার্জ্জি, গয়া ; বিমল ও হারু, পাটনা ; মাধুরী সেন, ঢাকা ; সুনীল কুমার দত্ত, দার্জ্জিলিং লীলা ও ইলা ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ; জগদীশ ও জ্যোতির্ম্ময় দাস, তেলিনীপাড়া ; শতদল দাস, শ্রীহট্ট , অজয়, তপন, আরতি ও বিমল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শিবপুর ; রবীন্দ্র, কল্যাণী, কালী, মায়া ছায়া ও নীরেন্দ্র নাথ রায়, আঠারবাড়ী ; প্রীতিময় ও জবাকুসুম সরকার, ভবানীপুর ; মা; বাবা, কালুদা, পানু সুশীল কুমার ও সুবোধ কুমার গুপ্ত কবিরাজ, আসানসোল ; অনিমা দাস কলিকাতা : নরেশ চন্দ্র রায় ও মনুজেন্দু ও পুর্ণেন্দু দত্ত মজুমদার, বাজিতপুর ; রাজিয়া, আনোয়ারা, [illegible]জাহান্ আরা, [illegible]রোকেয়া, রসিদ, রফিক, কল্যাণী ও দেবব্রত, ময়মনসিংহ ; কীর্ত্তিশ চন্দ্র [illegible]বর্ত্তী, ময়মনসিংহ ; সত্যরঞ্জন ঘোষাল, বিঝারী ; পঞ্চানন রুই, উল্‌টাডাঙ্গা ; তপু, মেনা, নিনা, কিরণ ও অরুণ শীল, শ্যামবাজার ; প্রণবকুমার গোস্বামী, কলিকাতা ; তারা মুখার্জি, আলমোড়া ; গোরাচাঁদ, লিপ্রা ও সুরেখা বসু, কলিকাতা ; মণিমালা মজুমদার, ভবানীপুর ; সত্যানন্দ প্রামাণিক, আসানসোল ; শিপ্রা সরকার, বালীগঞ্জ ; স্বদেশ, নীলু, মনীশ ও ধনদি — ; কমলা চ্যাটার্জ্জি, শ্যামবাজার। রেখা ও রেবা দাসগুপ্ত, কলিকাতা। রুণা মিত্র, রাওয়ালপিণ্ডি।

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

ফাল্গুন মাসের প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দিয়েছে তাদের কারুর রচনা আমাদের বিচারে মনোমত হয়নি—এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তা ছাড়া তোমরা অনেকেই যোগ দাওনি। সেজন্য **আমরা ফাল্গুনের এই প্রতিযোগিতাটি বৈশাখের অর্থাৎ এ মাসের প্রতিযোগিতা করে দিলাম ও পাঠাবার শেষ দিন করা হল ৩০শে বৈশাখ।**

চৈত্র মাসের বই নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার ফলাফল জ্যৈষ্ঠ মাসের রংমশালে প্রকাশিত হবে। এই প্রতিযোগিতার উত্তর এত বেশী এসেছে যে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পেরে উঠলাম না। সামনের মাসে যথাযোগ্য তার ফলাফল এবং ১ম ও ২য় স্থান যারা অধিকার করবে তাদের নাম প্রকাশিত হবে।

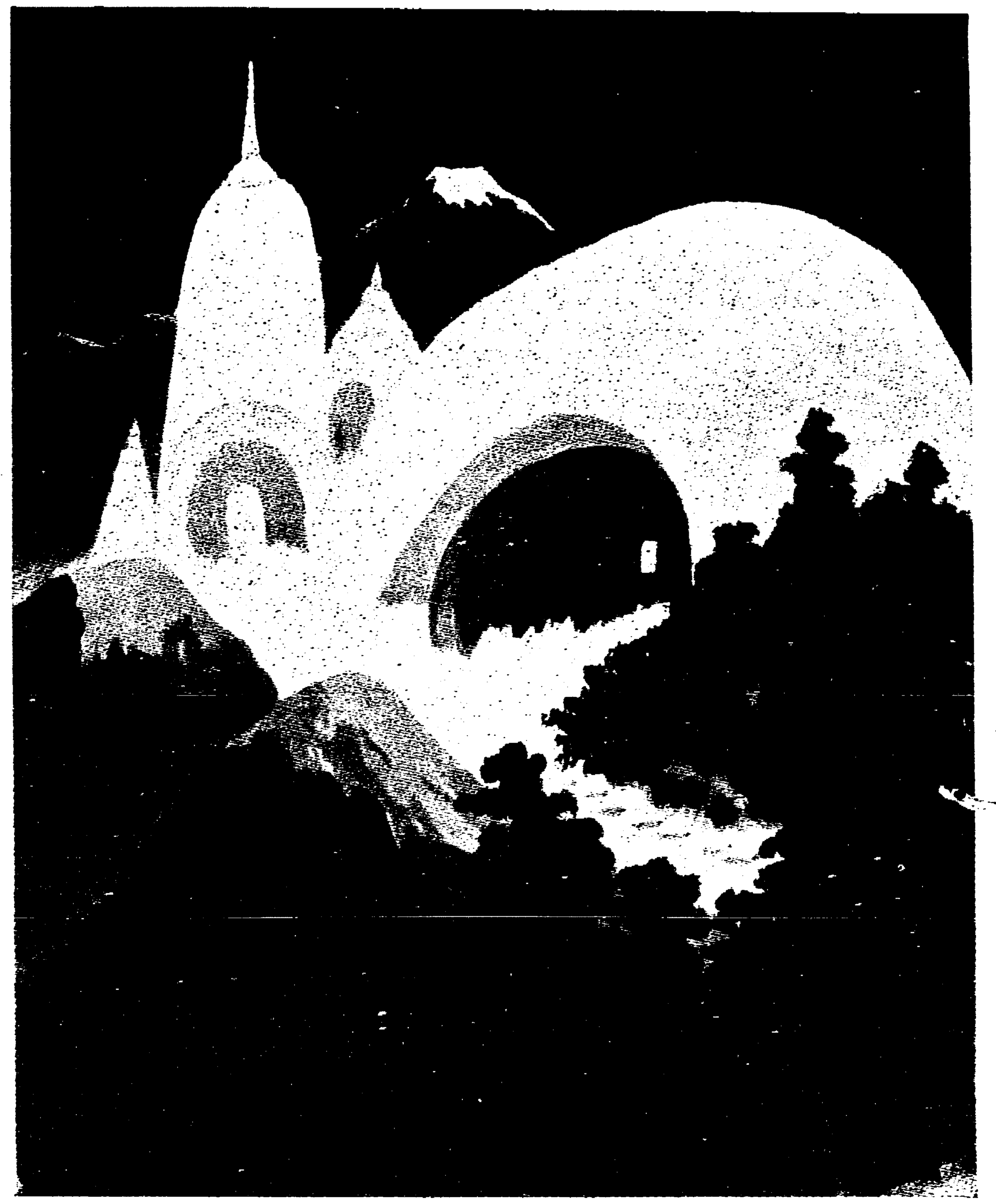

রাতকোটের কেল্লা

শিল্পী—৺গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

রংমশাল
চতুর্থ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

রাজপুত্তুর রাজকন্যা কার ?

'রাজপুত্তুর কার—
কওতো পাখী, গলায় দেব সাতনহরী হার'।
কোন্ দেশে কোন্ রাজার মেয়ে
কোন্ দেশে কোন্ পাখী !
রাজার মেয়ে বিহঙ্গীরে
শুধায় থাকি থাকি।
পাখী সে হায় খাঁচার পাখী
নাম জানে বা কার !
রাজার মেয়ে শুধায় হাতে
সাতনহরী হার।

আট প্রহরে আট ঝলকে
প্রশ্ন ফুটে ওঠে,
ঘুমোয় পাখী স্বপন দেখে
কথাটি নাই ঠোঁটে।
সেই স্বপনে চেঁচিয়ে ওঠে
হীরকমণি তোতা,

'রাজপুত্তুর ! রাজপুত্তুর !
পথটি চলে কোথা !
জান তুমি পথটি গেছে
কোন্ সে নদীর ধার ?
নদীর আগে পাশাবতীর
মাঠটি হবে পার।
নদীর শেষে হয়তো আছে,
নীল বকুলের বন,
বনের শেষে রাজার পুরী
অগম্য নির্জ্জন।
মন্তরেতে কাটান দেবে
গণ্ডী হবে পার,
সেইখানেতে রাজকন্যা—
রাজকন্যা কার ?'

স্বপন শেষে হীরকমণির কথাটি হয় বার—
রাজপুত্তুর রাজকন্যার, রাজকন্যা তার।

বাদশাহী
গল্প

ঠাকুরদাদা অবনীন্দ্রনাথ

দাদামশায়, সাহিত্য-রস কি ?

—সাহিত্য-রসের জন্য হঠাৎ তোমার ব্যাকুলতার কারণটা কি শুনি বাদশাবাবু!

সবাই বলছে—তোমার ছবিতে যেমন শিল্প-রস নেই, তেমনি তোমার গল্পেও সাহিত্য-রস নেই !

—তা হ'লে বাকি থাকে কি বাদশামশায় ?

—কিছুই নয় !

যাক্, তা হ'লে আমার দুঃখ নেই !

"আমি রসের ব্যাপারি,
চরস বেচি না কিনা না কিনা ইচ্ছা তোমারি !
গরুর মধ্যে ছিল গব্যরস, আকের ছোবড়াতে একো-গুড়
এ সব আগে জানতো না কেউ, জানিয়ে গেল এক—এক রসের ঠাকুর—
বিশ্বাস্ না কর যদি-খাও না নিজের ভাত বাড়ি।"

—ঠিক বলেছো দাদামশায়, আমি বুঝেছি, তুমি বলে যাও তোমার গল্প।

—শোনো তবে বাদশামশায় !—

জগু মুন্সি ছিলেন জেতে হিঁদু, কিন্তু উর্দ্দ ফারসী পড়ে মুন্সী হয়ে অবধি কাচা দিয়ে আর কাপড় পরতেন না। ইংরিজী পড়লে যেমন এখন সাহেব সাজে সবাই, আর রাগলেই মুখ দিয়ে ফর্‌ফর্ ইংলিস্ বুলির ফোয়ারা ছোটায়—সেই রকম ! জগু মুন্সীর ছেলেকে একটা ছেক্‌ড়া গাড়ীর ঘোড়া কান কামড়ে রক্তপাত করে দিয়েছিল, কেউ দিচ্ছে ছেলের মুখে জলের ঝাপ্‌টা, কেউ করছে পাখার বাতাস, স্ত্রী কাঁদছে 'কি হলো গো' বলে। জগু মুন্সীর খেয়াল নেই ; কেবলি ফার্সিতে ধমক ঝাড়ছেন—এ্যায়সা কমবক্ত বেতমীজ্ বেহুঁসিয়ার, বেহুদা ঘোড়েসে কান কাটায়া ! —ওগো ছেলেটা গেল যে চেয়ে দেখ !

—এ্যায়সা লড়কা কা মু দেখ্‌না না চাহিয়ে !

—ওগো নাকের দম হ'ল ছেলেটা !

—জেরা বেদমুস্ক শুঙাও—ব'লে কলাই-করা তামার বদনাটা থেকে খানিক জল ছেলেটার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যান।

ছেলের মা বলেন,—যাও কোথা ?

—পূজো বাড়ীতে নবমীর নাস্তা খেতে—ব'লেই প্রস্থান মুন্সী !

—ছেলেটার কি হ'ল দাদামশাই ?

—ছেলেও তেমনি, খানিক বাদে চেতন পেয়ে উঠে বল্‌লে,—মা ক্ষিদে পেয়েছে ! মা তার কানে পটি বেঁধে বল্‌লে যাও বাবা পূজো-বাড়ী. নবমীতে মায়ের ভোগ খেয়ে এসো গে ; দেখো তোমার বাপ নাস্তা-মাস্তা খেতে দেয় তো খেও না।

—নাস্তা কারে বলে দাদামশায় ?

—আমিও ঐ কথা মুন্সী মশায়কে শুধিয়েছিলেম।

—কি বল্লেন তিনি ?

—মনে নেই !

—কার মনে নেই—তোমার না সেই মুন্সীমশার।

—আমার গো, আমারি মনে নেই। নান খাতাই বলে একটা পার্সি বই থেকে একটা গজল আউড়েছিলেন তা মনে আছে।

—তা থেকেই মানেটা বোঝা যাবে—বল তো শুনি ?

—আচ্ছা শোনো—

"খাস্তা নাস্তা পেট কি ওয়াস্তা না কুছ্ মজুদ্
হুয়ে গোমস্তা নাস্তা-নাবুঁদ।"

—বুঝলে কিছু বাদশাবাবু ?

—না তবে ওটা শুনতে জাঁকালো, যেন কত্তাল বাজছে কাছে—"খাস্তা নাস্তা নাস্তা-নাবুদ"।

—দেখলে বাদশাবাবু ফারসী পড়ার মজা ! কানে শুনলেই কথার মানে আপনিই বোঝা যায়। বাড়ীতে পূজো-টুজো হলে নাস্তা খেতে হয়, বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে ধুমধাম করে।

—তারপর দাদামশায় !

—ত্যালে নিজের ছাওয়া দেখলেই তার সঙ্গে সোরাব রোস্তমের লড়াই বাধাতেন মুন্সী সাহানামা আউড়ে। আর ছেলেদের দেখলেই ফার্সি পড়বার ঝোঁক চাপতো তাঁর

ঘাড়ে,—বলে চল আ লে বে তালে-বেতালে বলেই তিনি নিজেও ছড়া আউড়ে চলতেন, আমাদের চলাতেন মার্চ্চ করিয়ে।

—কি ছড়াটা বল না শুনি ?

আ লে বে পেতে চল তালে বেতালে পা ফেলে
দেখো না উঠে জিস্তে—

—আর মনে নেই ভাই। মুন্সী একটা ছেলেদের নানখাতাই বই লিখেছিলেন, তাতেই ওটা বাংলা উর্দ্দু হরপে ছাপা হয়েছিল।

—সে বইটাতে আর কি ছিল ?

—তোতা আর জোতার গল্প, কবুতর আর বাজের লড়াই, হামাম্ বাগর্দ্দের কাহিনী, কাছেম দর্জ্জির কেচ্ছা—এমনি নানান্ জিনিষ।

—সেইখানা আবার ছাপাও না দাদামশায় !

—পেলে তো ছাপাই। বড় রসের জিনিষ সব ছিল তার মধ্যে। সব চেয়ে ভাল লাগতো বখরা-বখরীর কথা।

—তার পর !

—বলি শোনো—

জগু মুন্সীকে একদিন নিজের ছাওয়ার সঙ্গে সোরাব রোস্তমের লড়াই দিতে দেখে আমি বল্লেম—জী আপনি ঘোড়ায় চড়ে লড়েন না কেন ? সোরাব রোস্তোম তো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে লড়েছিল ! মুন্সী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তুম্ সচ্ বাত বোলা—অব শুনো ইস্‌কা হদিস্।—বলেই তিনি দাওয়ায় বসে সুরু করলেন,—দেখ, তোমার দাদামশায় আমাকে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন এক দিন। আমি তাতে জবাব করলেম—দেখেন, রোস্তমের উপযুক্ত ঘোড়া যদি পাই তো দেখাই লড়াই ! তখনি এক হাতিয়ার জামা জোড়া এক ইষ্টরব্রেড্ ঘোড়া বখ্‌শিশ। কথা রইলো কাল উঠোনে সোরাব রোস্তমের লড়াই দিতে হবে ! আমি কি করি—মনে মনে বল্লেম,—মুন্সী অব তো তেরা মৌত নজদীগ্, ইস্ আফ্‌তসে নিকলনেকা কৌন্ রাস্তা ! মুখে হাঁ হুজুর বলে তো ঘোড়া জামা জোড়া হাতিয়ার বগেরা নিয়ে তো বাসার মুখে চলি। গিন্নি ঘোড়া আর সাজ-সরঞ্জাম দেখে ডরিয়ে গেল—কি গো এ সব কি ! লড়ায়ে যাবে নাকি ? আমি কিছু না ভেঙে হাঁ হাঁ করে দুটো ভাত মুখে গুঁজে, গেলেম খেতু খোট্টার ওখানে। তার পর দিনই বার হবে পরেশনাথ, আমি ঘোড়া নিয়ে হাজির দেখে বল্লেন—আরে মুন্সীজী আইয়ে রাম রাম। —আর রাম রাম ভাই, একটু

গোপন কথা আছে—আড়ালে চল ঘোড়াটা একজনের হাতে জিম্মে করে দিয়ে। আড়ালে গিয়ে বল্লেম নিজের আসন্ন বিপদের কথা। তারপর আধাদরে ঘোড়া জামাজোড়া সব পরেশনাথের কৃপায় বেচে ঘরে এসে খালাস!—ইস্ত্রী বলে, ঘোড়া রেখে এলে কোথায়? তোমার সে খবরে কাজ কি?—ব'লে সে রাত্রি আরামে কাটালেম। তার পর দিন দেখি উঠানে আমাদের লোকারণ্য। আমি আসতেই ঘোড়া কোথায় ঘোড়া কোথায় রব উঠলো। খেতু খোট্টাও দেখি তোমার দাদামশার কাছে বসে!—দেখতে হি তোমেরা দিল্ সিফাইকে ঘোড়া যে সে তড়পনে লাগা! তোমার দাদামশার গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝলেম বিপ্তে ফাঁস হয়ে গেছে! তখন কি করি ফার্সি ছেড়ে বাংলা ধরলেম—মশায় ঘোড়া নিয়ে তো গেলেম বাসায়। ইস্ত্রী বলে ঘোড়া কি হবে গো? —আমি চাপবো, তোকে ছেলেকোলে চাপাবো' ঘরকন্নার জিনিষপত্র পোঁটলা বেঁধে না পিঠের 'পরে চাপিয়ে স্বশরীরে ভেস্তে যাবো। —ওমা আমি তা পারবো না! —কেন মা দুগ্‌গা ঘোড়ায় চাপতে পারে তুই নাম নিয়েছিস দুগ্‌গা-বতী তুই পারবি না চাপতে! তখন সে সিংহিনী মূর্ত্তি ধরে এমন এক গর্জ্জন ছাড়লে যে ঘোড়া ভড়কে জামা জোড়া হাতিয়ার শুদ্ধু দে দৌড় হাত ফস্কে—চক্ষের নিমেষে ঘোড়া গায়েব। সারাদিন খোঁজাখুঁজিতে গেল। এ সব জিনের কারখানা মশায় আমার তো মনে হচ্ছে! খেতু খোট্টা জৈন পরেশনাথের এক নাম জিন, দেখুন ওনাদের ঘরে যদি ঘোড়া গিয়ে থাকে। বস্ জিনের দোহাই দিয়ে খালাস।

বাবা মুস্তাফার দাড়ি

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

বিমল ও কুমার হচ্ছে নিছক 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র ভক্ত, সাধারণ গোয়েন্দাগিরি নিয়ে তারা কোনদিন মাথা ঘামাতো না। কিন্তু গোয়েন্দার প্রধান প্রধান গুণ, অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, চিন্তাশীলতা আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তাদের দুজনের যথেষ্টই ছিল। এই-সব কারণে তারা মাঝে মাঝে খুব সহজেই এমন সব শক্ত মামলারও কিনারা ক'রে ফেলতে পারত. বড় বড় পেশাদার গোয়েন্দারাও যাদের মধ্যে তল খুঁজে পায় নি। এই রকমেরই একটি ঘটনার কথা আজ তোমাদের কাছে বলতে চাই।

"ড্রাগনের দুঃস্বপ্নে"র গল্প যাঁরা শুনেছেন, বিমল ও কুমারের সঙ্গে কি ক'রে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুর প্রথম পরিচয় হয়, এরি-মধ্যে তাঁরা নিশ্চয়ই তা ভুলে যান নি।

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরের কথা। বিমল ও কুমার একদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে অকারণেই সুন্দরবাবুর থানায় গিয়ে হাজির হ'ল।

একটা টেবিলের ধারে সুন্দরবাবু চিন্তিত মুখে মাথার টাকে হাত দিয়ে ব'সে ছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখে বললেন, "এই যে, হুম্! একেবারে যুগলে উদয়, ব্যাপার কি?"

কুমার হেসে বললে, "কিছুই নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম আপনার সঙ্গে দুটো গল্প গুজব ক'রে যাই!"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "আর গল্প করব! পোড়া অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? একটা বিচ্ছিরি মামলা নিয়ে মহা-ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে! তবু এসে যখন পড়েছেন, দু-কাপ্ চা খেয়ে যান!"

বিমল চেয়ার টেনে ব'সে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মাম্‌লাটা কি, শুনতে পাই না?"

সুন্দরবাবু বললেন, "শুনে কোনই লাভ হবে না ভায়া, এ মাম্‌লার কিনারা করা অসম্ভব।"

—"তবু শুনতে দোষ কি?"

—"তাহ'লে শুনুন।......দিন-কয় আগে আমারই এলাকায় একরাত্রে হরেনবাবু নামে একটি ভদ্রলোক খুন হয়েছেন শুনে সকালে তদন্ত করতে গেলুম। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি, ঘরময় বইছে রক্তের ঢেউ, আর চারিদিকে ছড়ানো কতকগুলো জিনিষপত্তর। তারই

মাঝখানে হরেনবাবুর দেহ প'ড়ে রয়েছে, তাঁর মুখে, কাঁধে আর বুকে তিনটে গভীর ক্ষত, সেগুলো ছোরার আঘাত ব'লেই মনে হ'ল। ঘরের অবস্থা দেখে বুঝলুম, হত্যাকারীর সঙ্গে হরেনবাবু রীতিমত যোঝাযুঝি ক'রেছিলেন। মেঝেতে একটা মাঝারি আকারের ঘড়ী প'ড়ে রয়েছে, ঘড়ীটা রাত বারোটা বেজে বন্ধ হয়ে গেছে দেখে বোঝা গেল, ঠিক ঐ সময়েই ঘটনাটা ঘটেছে। রক্তের মধ্যে পাওয়া গেল কতগুলো নিখুঁত জুতোর ছাপ।

"হরেনবাবুর সঙ্গে ঐ বাড়ীতেই তাঁর ছোট ভাই সুরেন বাস করে। হরেনবাবু বিপত্নীক আর নিঃসন্তান। সুরেন এখনো বিবাহ করে নি। বাড়ীতে ওরা দুজন ছাড়া আর একজন প্রায়-কালা বুড়ো চাকর থাকে, ঘটনার সময়ে সে একতালার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার কাণে কোন গোলমালই ঢোকে নি। বাড়ীর সদর দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, হত্যাকারী কোন জিনিষই চুরি করে নি।

"বাড়ী খানাতল্লাস করতে করতে সুরেনের ঘরে পাওয়া গেল একজোড়া রক্তমাখা জুতো। সে জুতো তারই, আর সেই জুতোর সঙ্গে হত্যাকারীর পদচিহ্ন অবিকল মিলে গেল। খুব সহজেই মামলার কিনারা হ'ল ভেবে আমি তখনি সুরেনকে গ্রেপ্তার করলুম। কিন্তু সুরেনকে বোধহয় আবার ছেড়ে দিতে বাধ্য হব।"

বিমল বিস্মিত স্বরে বললে, "কেন ?"

—"সুরেন বলে ঘটনার রাত্রে সে তার এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্য্যন্ত খেটেখুটে সে সেইখানেই শুয়ে পড়ে। তার পরদিন সকালে বাড়ীতে ফিরে সেই প্রথমে এই হত্যাকাণ্ড আবিষ্কার করে। সুরেনের এই বন্ধুর বাপ হচ্ছেন কলিকাতা পুলিসেরই আর এক ইন্‌স্পেক্টার, তাঁর নাম অবনীবাবু। বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ীটা দেখে আমরা জেনেছি, হত্যাকাণ্ড হয়েছে রাত বারোটার সময়ে। শব-ব্যবচ্ছেদ ক'রে ডাক্তারও সেই মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার অবনীবাবু বলেন, সুরেন সে রাত্রে তাঁর বাড়ী ছেড়ে এক মিনিটের জন্যেও বাইরে যায় নি। কেবল অবনীবাবু নন, বিবাহ-সভায় যারা উপস্থিত ছিল, তারা সকলেই একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপরেও আর সুরেনকে ধ'রে রাখি কি ক'রে ? বিশেষ, তার স্বপক্ষে আর একটা মস্ত প্রমাণ রয়েছে।"

—"কি প্রমাণ ?"

—"মৃত হরেনবাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে গাছকয় পাকা চুল পাওয়া গিয়েছে। চুলগুলো নিশ্চয়ই হত্যাকারীর, ধ্বস্তাধ্বস্তি করবার সময়ে হরেনবাবু যে হত্যাকারীর চুল চেপে ধরেছিলেন, তাতে আর সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সুরেনের মাথায় একগাছাও পাকা চুল নেই।"

বিমল বললে, "চুলগুলো একবার আমাকে দেখাবেন ?"

—"কেন দেখাবনা ? এই নিন" ব'লে সুন্দরবাবু ছোট্ট একটি কাগজের মোড়ক এগিয়ে দিলেন।

মোড়কটা খুলে বিমল বললে, "একটা 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' দিতে পারেন ?"

—"তা যেন দিচ্ছি, কিন্তু অতটা খুঁটিয়ে দেখবার কিছুই নেই। ওগুলো পাকাচুল, আর সুরেনের মাথার চুল নয়, আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।"

বিমল 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসে'র সাহায্যে চুলগুলো পরীক্ষা ক'রে বললে, "এই চুলগুলো কি প্রমাণ দিচ্ছে জানেন ? হত্যাকারীকে মৃত হরেনবাবু চিনতেন, আর খালি তার মাথায় লম্বা পাকা-চুল নয়, মুখেও দাড়ী-গোঁফ ছিল।"

সুন্দরবাবু ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "কি ক'রে জানলেন আপনি ?"

—"পরে তা বলব। আপনি আর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি ?"

—"না। তবে হরেনবাবুর মৃত্যুর দিন দশেক পরে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর এক আত্মীয় মরবার সময়ে উইল ক'রে তাঁদের দুই ভাইকে একলক্ষ টাকা দান ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু এই উইলের খবর তাঁরা কেউ জানতেন না, কারণ হরেনবাবুর মৃত্যুর মোটে চারদিন আগে ঐ আত্মীয়টি মারা পড়েন। এখন অ্যাটর্ণী-বাড়ী থেকে এই খবর সবে প্রকাশ পেয়েছে।"

বিমল অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "হরেনবাবুর অবর্ত্তমানে এখন সুরেনই সব টাকার মালিক হবে তো ?"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সুরেনও যদি ফাঁশীকাঠে ঝোলে, তাহ'লে তাদের সব সম্পত্তি যাবে হরিহরের হাতে।"

—"হরিহর আবার কে ?"

—"হরেন আর সুরেনের খুড়তুতো ভাই। ঠিক পাশেই তার বাড়ী।"

—"সেখানে কিছু খোঁজ নিয়েছেন ?"

—"তা আবার নিই নি, আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে হে ? কিন্তু হরিহর সমস্ত সন্দেহের বাইরে। কারণ প্রথমত, খুনের সময়ে সে উইলের ব্যাপার জানত না, আর জানলেও সুরেন থাকতে তার সম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। দ্বিতীয়ত, তার পায়ের জুতো হত্যাকারীর জুতোর দাগের চেয়ে আধ ইঞ্চি ছোট। তৃতীয়ত, তারও মাথায় পাকাচুল নেই। চতুর্থত, সে পাবলিক থিয়েটারের অভিনেতা। ঘটনার দিনে থিয়েটারে এক বিশেষ অভিনয় ছিল, অর্থাৎ সারারাত্রব্যাপী অভিনয়। তিন-তিনখানা নাটকে তার

পার্ট ছিল। আমি থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, হরিহর ঘটনার পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় বাড়ীতে ফিরেছে। বিমলবাবু, আপনাদের সঙ্গে গল্প করব কি, আমি এখন অকূল-পাথারে ভাসছি—হুম্, গল্প করতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।"

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার দুরবস্থা দেখে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে! আচ্ছা, আজ আর বেশীক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না, কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিদায় হব।"

—"কি কথা ?"

—"ঘটনাস্থলের কাছে, মাঝরাতে সেদিন যে পাহারাওয়ালা রাস্তায় পাহারায় ছিল, তাকে একবার ডেকে দিন।"

পাহারাওয়ালা এল।

বিমল শুধালে, "তোমার নাম কি ?"

—"চন্দর সিং।"

—"আচ্ছা চন্দর সিং, যে বাড়ীতে খুন হয় তার কাছ থেকে কত তফাতে তুমি পাহারায় ছিলে ?"

—"পাঁচ-ছ খানা বাড়ীর পরেই।"

—"খুন হয়েছে রাত বারটার সময়ে। তখন তুমি ঘুমিয়ে পড়নি তো ?"

চন্দর সিং আহত কণ্ঠে বললে, "পাহারা দিতে দিতে কোনদিন আমি ঘুমোয়নি, হুজুর!"

—"বেশ, বেশ, তুমি দেখছি অসাধারণ পাহারাওয়ালা ? তাহ'লে রাত বারটার সময় তুমি কি কোন আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছিলে ?"

—"না হুজুর!"

—"এখন শীতকালের রাত। বারোটার সময়ে পথে খুব কম লোক চলে। ঘটনা-স্থলের কাছে রাত বারোটার সময়ে তুমি কি এমন কোন লোক দেখেছিলে, যাকে দেখলে সন্দেহ হয় ?"

—"তিন চারজন লোককে দেখেছিলুম, কিন্তু কারুর ওপরে আমার সন্দেহ হয় নি!"

"এমন কোন লোকই দেখনি, যার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল, আর মুখে ছিল পাকা গোঁফ দাড়ি ?"

চন্দর সিং অল্পক্ষণ ভেবেই ব'লে উঠল, "হ্যাঁ হুজুর, দেখেছিলুম! একটা বুড়ো বাঙালী

মুসলমান রাত বারোটার খানিক পরেই আমার সাম্‌নে দিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গিয়েছিল বটে।"

—"কি করে জানলে, সে বাঙালী মুসলমান ?"

—"তার পরোণে ছিল বাঙালীর মত আলোয়ান, ধুতি আর পিরাণ, কিন্তু পশ্চিমা মুসলমানদের মত তার মাথায় ছিল লম্বা পাকা চুল আর মুখে ছিল লম্বা পাকা গোঁফ-দাড়ি।"

—"তাকে দেখে তোমার কোন সন্দেহ হয় নি ?"

—"সন্দেহ হয় নি বটে, তবে একটা কথা মনে হয়েছিল। তার মাথার চুল আর মুখের গোঁফ-দাড়ি বেজায় বুড়োর মতন ধব্‌ধবে সাদা, কিন্তু সে হন্-হন্ ক'রে হাঁটছিল খুব জোয়ান লোকের মতই!"

—"সাবাস চন্দর সিং! এতটা তুমি লক্ষ্য করেছিলে ? সত্যিই তুমি অসাধারণ পাহারাওয়ালা! আচ্ছা আমার আর কিছু জানবার নেই।"

সুন্দরবাবু হতভম্বের মত বললেন, "কি আশ্চর্য্য বিমলবাবু, এই বুড়ো বাঙালী মুসল-মানটিকে আপনি আবার কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন ? আমরা পেয়েছি কেবল গাছ-কয়েক লম্বা পাকা চুল, কিন্তু দাড়ি-গোঁফই বা আপনি কেমন ক'রে দেখতে পেলেন ?"

বিমল সহাস্যে বললে, "মানস-চক্ষু আর কল্পনা-শক্তি ব্যবহার করলে অনেক কিছু দেখা যায় সুন্দরবাবু! আমার মত কি জানেন ? হত্যাকারীকে হরেনবাবু চিনতেন, তাই তাই সে ছদ্মবেশ পরে খুন করতে গিয়েছিল। খালি পাকা চুলে মুখ লুকানো যায় না, গোঁফ-দাড়িরও দরকার হয়।"

—"তাহ'লে আপনি বলতে চান, খুনীর মাথায় পাকা চুলের তলায় ছিল কাঁচা কালো চুল ? আমরা যে সুরেনকে ধরেছি, তার মাথাতেও কালো চুল আছে। তবে কি সুরেনই—"

বাধা দিয়ে বিমল বললে, "শীঘ্রই আবার দেখা হবে, তখন সব বলব।" এই বলে সে কুমারের হাত ধ'রে থানা থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়ে মুখ ভঙ্গি ক'রে বললেন, "হুম্! বিমলবাবু একটি আস্ত পাগল! খালি আস্ত নয়, মস্ত পাগল!"

পরদিন প্রভাতেও থানায় আবার বিমল ও কুমারের আবির্ভাব! তখন সুন্দরবাবুর সঙ্গে একটি যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে জোরে সিগারেটে দম মারতে মারতে হাত-মুখ নেড়ে কথা কইছিল। বিমল লক্ষ্য করলে, যুবকের মাথায় বাব্‌রি-কাটা চুল, মুখে পাউডারের চিহ্ন, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবী, পরোণে জরিপাড় দিশী কাপড়, পায়ে বাহারী লপেটা,—হ্যাঁ, লোকটি রীতিমত সৌখিন বটে!

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে, আসুন—আসুন, নমস্কার! আবার এক নতুন কাণ্ড দেখুন,—জাল-পুলিসের মাম্‌লা! এখনি আবার হন্তদন্ত হয়ে তদন্তে ছুট্‌তে হবে! যত বদ্‌মাইস্‌ জুটেছে কিনা আমারি এলাকায়!"

বিমল বললে, "জাল-পুলিসের মাম্‌লা!"

—"হ্যাঁ। এই ভদ্রলোকেরই নাম হরিহরবাবু, হরেনবাবুর খুড়তুতো ভাই। ইনি সক্কালবেলায় থানায় অভিযোগ করতে এসেছেন, কাল দুপুরে পুলিসের লোকরা নাকি ওঁদের থিয়েটারে গিয়ে গোলমাল ক'রে আর ওঁর সাজঘরে গিয়ে জিনিষপত্র তছ্‌নছ্‌ ক'রে এসেছে! অথচ সত্যিকথা বলছি বিমলবাবু, আমরা এর বিন্দুবিসর্গও জানি না!"

বিমল হাসিমুখে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "নমস্কার হরিহরবাবু! আপনি নিজেই থানায় এসেছেন দেখে সুখী হলুম, কারণ, নইলে আমাদেরই এখনি আপনার বাড়ীতে ছুটতে হ'ত!"

হরিহর বিস্মিত ভাবে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে বললে, "আপনাকে তো এ-জন্মে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।"

—"উঁহু, এজন্মেও দেখেন নি, গেল-জন্মেও দেখেন নি বোধ হয়। আপনি আর আমরা এক জগতে বাস করি না তো! কিন্তু আমাকে না চিনলেও আপনি এই চুল-গোঁফ-দাড়ীকে চেনেন কি?" বলে'ই বিমল একরাশ পরচুলা বার ক'রে তুলে দেখালে।

হরিহরের মুখ হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে গেল। তার পরেই সাম্‌লে নিয়ে সে বললে, "ওগুলো কার, আমি জানি না!"

—"জানেন না? বেশ বেশ, তাহ'লে ভালো ক'রে বসুন, ধীরে-সুস্থে একটা ছোট্ট গল্প শুনুন। এ গল্পেরও পাত্রদের নাম হরেন সুরেন দুই সহোদর, আর তাদের খুড়তুতো ভাই হরিহর। হরেন-সুরেনের নামে এক আত্মীয় এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা সে সৌভাগ্যের কথা টের পাবার আগেই, অ্যাটর্ণী-বাড়ীর কেরাণী সুবোধের মুখ থেকে হরিহর খবরটা জেনে ফেললে, কারণ তারা দুজনেই এক থিয়েটারে অভিনয় করত।

হরিহর দেখলে, রাতারাতি বড়লোক হবার এ একটা মস্ত সুযোগ! উইলের কথা এখনো কেউ জানে না, এই অবসরে হরেন আর সুরেনকে পথ থেকে সরাতে পারলেই লাখ টাকা তার হাতের মুঠোয়! হরিহর মূর্খ হলেও বোকা নয়, চট্‌ ক'রে একটা সয়তানী ফন্দি এঁটে ফেললে।

সে রাত্রে তাদের থিয়েটারে বিশেষ অভিনয়, তিন-তিনটে পালা শেষ হ'তে রাত কাবার হয়ে যাবে। প্রথম পালা "কণ্ঠহার" সুরু হ'ল সন্ধ্যার মুখে। তারপর আরম্ভ হ'ল "চন্দ্রগুপ্ত", রাত এগারোটার সময়ে। এ পালায় হরিহর সাজলে আলেকজাণ্ডার। মিনিট

পনেরোর মধ্যে তার পার্ট শেষ হয়ে গেল। তারপরে শেষ পালা "আলিবাবা"য় তার 'বাবা-মুস্তাফা' সাজবার কথা, অর্থাৎ মাঝে তার একটানা ঘণ্টা-পাঁচেক ছুটি। হরিহর সবাইকে জানালে, সে থিয়েটারের উপরের একটা ঘরে এই সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু সে ঘুমোতে গেল না। থিয়েটার থেকে তার বাড়ী মিনিট-পনেরোর পথ। হরিহর লুকিয়ে বাড়ীতে গিয়েই হাজির হ'ল, কারণ সে জানে থিয়েটারের সবাই নিজের নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকবে, তার পার্টের সময় না হ'লে কেউ তাকে খুঁজবে না।

হরিহর বাবা-মুস্তাফার পাকা চুল আর দাড়ী-গোঁফ সাজঘর থেকে লুকিয়ে সঙ্গে এনেছিল। নিজের বাড়ীতে এসে সেইগুলো সে প'রে নিলে, কারণ এবারে তাকে পাশের বাড়ীতে যেতে হবে, সেখানে সবাই তাকে চেনে।

হরিহর নিজের বাড়ীর ছাদ থেকে পাশের বাড়ীতে গেল। সে জানত, সুরেন আজ বিয়ে-বাড়ীতে থাকবে। প্রথমে সে সুরেনের শূন্য ঘরে ঢুকে জুতো চুরি করলে। তারপর অন্য ঘরে গিয়ে হরেনকে আক্রমণ করলে। হরেন তাকে বাধা দিতে গেল, পারলে না, কেবল হরিহরের মাথার একগোছা পরচুলা রইল তার হাতের মুঠোয়।

ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে ঘরের টেবিলের উপর থেকে ঘড়ীটা যে মাটিতে প'ড়ে ঠিক রাত বারোটায় বন্ধ হয়ে গেল, এটাও সে জানতে পারলে না। জানলে নিশ্চয়ই সাবধান হ'ত।

খুনের পর হরিহর সুরেনের জুতো প'রে রক্তের উপরে পায়ে হেঁটে চ'লে বেড়ালো। তারপর স'রে পড়বার আগে জুতোজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে গেল।

হরিহর বুঝলে, ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে ধরা প'ড়ে সুরেনের ফাঁশী হবেই। তখন লাখ-টাকা ভোগ করবে সে একলা। এক ঢিলে মরবে দুই পাখী।

ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই হরিহর থিয়েটারে ফিরে উপরের ঘরে ঢুকলে। কিন্তু থিয়েটারে পালিয়ে আসবার সময়ে সে যে তাড়াতাড়িতে নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে ভুলে গিয়েছিল, পাহারাওয়ালা চন্দর সিংয়ের মুখে আগেই আমরা সেটা জানতে পেরেছি। ....ওদিকে থিয়েটারে 'আলিবাবা'র সময়েও তাকে ষ্টেজে না দেখে 'ড্রেসার' উপরে এসে হরিহরের কপট নিদ্রাভঙ্গ করলে। সে যে থিয়েটারেই শুয়েছিল, তারও একজন সাক্ষী রইল।

হরিহর বাবা-মুস্তাফার পরচুলা প'রে সে রাত্রে যখন অভিনয় করতে নামল, তখনও দুটি সত্য জানতে পারেনি। প্রথমটি হচ্ছে, মৃত হরেনের মুঠোর চুলের সঙ্গে মুস্তাফার মাথার ছেঁড়া পরচুলা মেলানো সম্ভবপর হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বাবা-মুস্তাফার দাড়ীর এক অংশে হরেনের রক্ত লেগে আছে।

সে নির্ভাবনায় পরচুলা সাজঘরেই রেখে গেল। এই হচ্ছে সেই পরচুলা। হরিহর নিজেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুক।"

কিন্তু কে পরীক্ষা ক'রে দেখবে? হরিহর তখন চেয়ারের উপরে ব'সে-ব'সেই দারুণ আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

... ...

সুন্দরবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর বললেন, "হুম্! আপনি কি তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছেন বিমলবাবু? এত অসম্ভব কথা জানলেন কি ক'রে?"

বিমল বললে, "আপনিও যদি আমার মত যত্ন ক'রে হরেনের মুঠোর চুলগুলো পরীক্ষা করতেন তাহ'লেই বুঝতে পারতেন, ওগুলো রুক্ষ মরা চুল, অর্থাৎ পরচুলা। তাইতেই সব-প্রথমে আমার সন্দেহ হ'ল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই সকলকার পরিচিত লোক, তাই ছদ্মবেশ প'রে খুন ক'রতে যায়। তারপর যখন শুনলুম হরেন-সুরেনের অবর্ত্তমানে লাখটাকার মালিক হবে হরিহর, তখনি আমার কড়া নজর পড়ল তার উপরে। সে থিয়েটারের অভিনেতা শুনে আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হ'ল। কারণ কে না জানে, অভিনেতারাই পরচুলা নিয়ে নাড়াচাড়া করে? এই একটা ছোট্ট সূত্র আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ব'লেই আপনি গোলকধাঁধায় পথে বিপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।"

সুন্দরবাবু নিজের গালে ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "স্বীকার করছি, আমি হচ্ছি মস্ত হাঁদা-গঙ্গারাম! কিন্তু, তারপর?"

—"তারপর আর কি, পথ খুঁজে পেয়েই আমি থিয়েটারে ছুটলুম। জাল-পুলিস সেজে খোঁজখবর নিতে লাগলুম। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অ্যাটর্নী-বাড়ীতেও গিয়ে খবর পেয়েছি, ওখানকার কেরাণী সুবোধও হরিহরের সঙ্গে অভিনয় করে, আর লাখটাকার উইলের গুপ্তকথা তার কাছ থেকেই হরিহর সব-আগে জানতে পারে। থিয়েটারে গিয়ে প্রথমে আমি খোঁজ নিলুম, ঘটনার রাত্রে হরিহর কখন্ কোন্ নাটকে অভিনয় করেছিল। হিসাব ক'রে দেখলুম, রাত এগারোটার পর প্রায় পাঁচঘণ্টা তাকে সাজতে হয়নি, আর সেই সময়টার মধ্যে কেউ খোঁজও-নেয়নি যে, সত্যসত্যই সে থিয়েটারে আছে কিনা! তারপর আমার কাজ খুবই সোজা হয়ে গেল। এর ওপর সাজঘরে খানাতল্লাস ক'রে যখন বাবা-মুস্তাফার ছেঁড়া চুল আর রক্তাক্ত দাড়ী পাওয়া গেল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। বাকি গল্পটা আমি আন্দাজে

রচনা করেছি, কিন্তু তা যে মিথ্যা নয়, সেটা আপনারা সকলেই দেখছেন তো?......আচ্ছা সুন্দরবাবু, আমার কাজ ফুরুলো, এখন আমরা স'রে পড়ি, কি বলেন?"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মহা-উৎসাহে বিমলের হাত চেপে ধ'রে বললেন, "সে কি, বিলক্ষণ! আমার ঘাড় থেকে এত-বড় বোঝা নামিয়ে দিলেন, অন্তত কিছু মিষ্টিমুখ ক'রে যান...ওরে, কে আছিস্ রে! শীগ্‌গির একটাকার ভালো সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে আয়তো!"

চোর ধরা

চৌকিদারের পো
হঠাৎ ধরে গোঁ
রামশঙ্কর শ্যামশঙ্কর
ঘাপটি মেরে শো।
চোর ঢুকেছে খিঁড়কি দিয়ে
সামাল সামাল ভাই!
দুভাই আছিস্ ভয়কি আবার
ভয়ের কিছুই নাই!
একটু থেমে চোর ধরি যে
সময় যদি পাই!
চণ্ডীতলায় চোর আসে বা
সেখানেতেই যাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লঙ্গুরদের দলে

সমস্ত বন নিঝ্ঝুম। কিন্তু সেই ঘুমন্ত বনেরও একটা প্রাণ আছে। কি যেন অস্ফুট ক্ষীণ গম্‌গম্ একটা শব্দ বনের ভেতর থেকে ভেসে আসে। হঠাৎ এক এক সময় হুউস্ করে পাখার একটা শব্দ হয়, একটা ইঁদুরের মৃত্যুকাতর চীৎকারে নিস্তব্ধ বন ভরে ওঠে। নিশাচর পাখীরা শিকার ধরে নিয়ে উড়ে যায়। বন আবার নিস্তব্ধ নিঃশব্দ! দূরে একদল জোনাকী সার বেঁধে চমকায়। হঠাৎ মংলুর পাশে থেকে গুপী তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। মংলুরও ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—কি, কি হয়েছে গুপী?

—শোন।

—কি?

—কাণ পেতে শোন না।

আর সঙ্গে সঙ্গে ও দিকের একটা গাছ থেকে একজন প্রহরী লঙ্গুর তার দলকে সাবধান করে দেওয়া ডাক ডেকে উঠল—হুপ হুপ্ কিচ্‌চ্‌চ্!

গোদাবর ওপরের ডাল থেকে সাড়া দিল—হুপ্ হুপ্! বনের মধ্যে খস্ খস্ করে উঠল।

গোদাবর প্রহরীর উদ্দেশে প্রশ্ন করল কে যায়?

—কালো বাঘ। বাঘেরা নিপাত যাক্, নিপাত যাক্!

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার বানরের গলায় সেই ডাক উঠল—বাঘেরা নিপাত যাক্, নিপাত যাক্!

তলায় কালকেতু গর্জ্জন করে উঠল—হাঁ-উম্-ম্!

কালকেতু ভেবেছিল, নালুখ যখন চলে যাচ্ছে তখন মানুষের ছানাটাকে এবার সুবিধে করা যাবে। সে যে লঙ্গুরদের দলে যোগ দিয়েছে এখবরও চীলের ডাকে সে পেয়ে গিয়েছিল। তাই সে ঠিক করল মানুষের ছানাটাত আর গাছে চড়তে পারবেনা, নিশ্চয় কাছাকাছি কোন গাছতলায় সে ঘুমোবে। দেখা যাক্ চুপিচুপি যদি কাজ সেরে আসা যায়। কিন্তু এ আর এক বিপদ। লঙ্গুরগুলো বেজায় সজাগ।

সেই সময় মংলু উঠে এসে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসল। কালকেতু তাকে দেখেই গর্জ্জন করে মারল এক লাফ। গোদাবর বিদ্যুতের মত মংলুর পাশে নেমে এসে বলল—খবরদার কালকেতু!

মংলু খিলখিল করে হেসে উঠল।

কালকেতু থমকে দাঁড়িয়ে বলল—গোদাবর ওই মানুষের ছানাটা তোমাদেরও নয়, ভাল্লুকদেরও নয়। ওটাকে ফেলে দাও আমি মুখে করে চলে যাই। তোমাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই।

গোদাবর বলল—বটে? ভারী মিষ্টি কথা এখন! শত্রুতা নেই কিরকম? আমাদের ছানাদের একলা পেলে তুমি ছেড়ে দাও?

কালকেতু হাঁক দিল—দেবে না?

—না।

প্রচণ্ড গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে গাছের গা বেয়ে কালকেতু সব চেয়ে নীচু ডালটায় লাফিয়ে উঠল। মংলু তৈরী হয়ে দাঁড়াল।

ওদিকে গোদাবর অদ্ভুত একটা শব্দ করে কি যেন বলল। দেখতে দেখতে নিঃশব্দে ইয়া জোয়ান গোদা গোদা একদল লঙ্গুর এসে ডালটায় বসল।

কালকেতু দেখল সে একা দুএকটা লঙ্গুরকে সাবাড় করতে পারে বটে, কিন্তু এখানে লঙ্গুরদের দলে অজস্র বানর। শুধু আঁচড়ে কামড়ে তারা আধঘণ্টায় তার দফা শেষ করে দিতে পারে। কালকেতু নিঃশব্দে আবার মাটিতে লাফিয়ে পড়ে, যেন কিছু হয়নি এইরকম করে আবার হাঁটিতে সুরু করে দিল।

গুপী তার পেছনে চেঁচিয়ে উঠল—লেজটা সামাল, লেজটা সামাল ভাই।

বনের মহলে একটা হাসির হর্‌রা উঠল।

কালকেতুর কালো চেহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বানরদের সাথে মংলু আবার রাতের ভাঙ্গা ঘুমটুকু জোড়া দিতে চলে গেল।

সুসম্বদ্ধ চিন্তা করতে মংলু এখনও শেখেনি। নিজের পরিবর্ত্তনশীল জীবন সম্বন্ধে সে এখনও তাই ভাবতে পারেনা। বনের প্রকৃতি তাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে। তাই প্রকৃতির মতই তার মন নরম

৩

অথচ কঠিন, দৃঢ় সহনশীল। নালুখ কালাদের বিদায় দেবার সময় তার মন কেমন কেঁদে উঠেছিল আবার নবীন আবহাওয়ায় নবতর পরিপার্শ্বকেও তেমনি সে সহজভাবে মেনে নিল। এরই মধ্যে গুপীকে তার বেশ ভাল লাগতে সুরু করেছিল আর সে অনুভব করল গোদাবরের মধ্যে দলপতির উপযুক্ত একটা দৃঢ় বলশালী মন আছে। সে মন সহানুভূতিশীলও বটে। মংলু নিশ্চিন্তে গাছের শুকনো পাতার মধ্যে গা ঢেলে দিল। তখন আগামী ভোরের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করেছে। দূরে কোথায় রাত কাঁপিয়ে একটা রাতচরা পাখী রহস্যময় স্বরে ডেকে উঠল। তার পাশে গুপীর লেজটা মশার উদ্দেশে মাঝে মাঝে ছপাং ছপাং করে লাফিয়ে উঠছে।

পরদিন ভোরবেলা আগে ঘুম ভাঙ্গল গুপীর। প্রথমে সে মিটিমিটি করে এদিক ওদিক তাকাল তারপরে লেজের বাড়ী ছপাং করে মংলুকে এক ঘা। মংলু ধড়মড় করে উঠে বসল। গুপী তখন হাসছে—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

গুপী বলল—মংলু আমায় ধরতে পার? বলেই একলাফে নীচের ডালে। মংলু ভাল করে গুপীর নামবার কায়দাটা দেখে নিল। তারপরে সেও ঠিক তেমনি করে এক হাতে ডালটা ধরে ঝুলে পড়েই নীচের ডালে লাফিয়ে পড়ে আর একহাতে ডালটা চেপে ধরল। দুলতে দুলতে ভার সামলাবার কায়দাটা বুঝে নিয়ে মংলুর ভারী একটা আরাম লাগল। শরীরটা কেমন যেন হাল্কা লাগে। গুপী ততক্ষণে নামতে সুরু করেছে—ছুয়ো মংলু ছুয়ো! মংলুর ভারী স্ফূর্ত্তি লাগল, এত বেশ মজার খেলা! সেও যে গাছে চড়তে জানে না একথা ভুলে গিয়ে গুপীর দেখা দেখি ডাল ধরে শরীরটা দুলিয়ে দিল আর সেই গতির মুখে নীচের ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ডালটা ছেড়ে তার নীচের ডালে, তারপরে তার নীচের ডালে, তারপরে তার পাশের ডালে, আবার তার নীচের ডালে। মংলুর মনে হোল সে উড়ে চলেছে, শরীরটা তার অদ্ভুত হাল্কা। কিন্তু হাজার হোক গুপীকে সে ধরতে পারবে কেন? গুপী এক একবার পেছু ফিরে চায়, এক লাফে আর একটা ডালে এগিয়ে যায় আর বলে—ছুয়ো ছুয়ো! শেষ ডালটা ছেড়ে মংলু অস্ফুট একটা শব্দ করল, করে ঠপ ক'রে মাটিতে পড়ে আর নড়েও না চড়েও না।

গুপী ভাবল কি হোল? মংলু পড়ে গেল কেন? চোট খেয়েছে নাকি? একলাফে গুপী মংলুর কাছে এগিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে মংলু গুপীর লেজটা খপ করে চেপে ধরল।

—হোঃ হোঃ ধরে ফেলেছি হোঃ হোঃ

মংলুর চালাকী বুঝতে পেরে গুপী দাঁত বার করে কিচ্‌মিচ্ করে উঠল।

মংলু বলল—চলে এস কুস্তী।

গুপীও খেলা পেলে ছাড়ে না, বলল—চলে এস।

কুস্তী কিন্তু এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। ভাল্লুকদের হাতে গড়ে ওঠা মংলুর সঙ্গে গুপী পারবে কেন এক নিমেষে বলের মত পাকিয়ে ধরে মংলু তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাটিতে আছাড় খেয়ে গুপী বলে উঠল—ওরে বাবা আর কুস্তী নয়!

মংলু হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

গুপী একদৃষ্টে খানিক্ষণ তাকে দেখে বলল—তোমার লেজ নেই বটে কিন্তু গায়ে জোর আছে! গোদাবর বাবাও তোমার সঙ্গে পারবে কিনা সন্দেহ!

গাছের ডালে লঙ্গুরেরা তখন জেগে উঠেছে। এদিক ও দিক থেকে শোনা যাচ্ছে নানা গলার হুপ্ হাপ্ শব্দ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য লেজ দুলছে; গোদাবর গাছের মাথা থেকে হাঁক দিল—সবাই তৈরী হও, বনের ভেতর যেতে হবে। সবাই তৈরী……

চারদিক থেকে সাড়া এল— হুপ্ হুপ্ হুপ্!

গোদাবর মংলুকে ডেকে বলল—মংলু তুমি কি করে যাবে? তোমাকে কি বানররা ধরে তুলে নিয়ে যাবে?

গুপী জবাব দিল—না মংলুও গাছের ডালে ডালেই যেতে পারবে। ও ত' দুলতে শিখে গেছে।

মংলু বলল—আর না পারি আমি তলা দিয়ে ছুটব।

গুপী বলল—আমি মংলুর সঙ্গে থাকব খ'ন।

সেই রকম ব্যবস্থা হয়ে গেল। সুরু হোল লঙ্গুরদের যাত্রা। সে যাত্রা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। বন সেখানে শাল, তাল, হিজল, বট, অশ্বত্থ, নাগেশ্বর গাছে জড়াজড়ি করে আছে, যে গাছের ব্যূহ ভেদ করে সূর্য্যের আলোও সভয়ে প্রবেশ করে, সেই গোলকধাঁধা গাছের দলের মধ্যে দিয়েই লঙ্গুরদের সুবিন্যস্ত পথ তৈরী করা আছে। আর শুধু কি একটা পথ? সেই গাছের মাথায় আকাশের কোল বেয়ে কত পথ, এঁকে বেঁকে, কেটেকুটে চলে গেছে। তারই একটা পথে চলল গোদাবরের দল। আগে গোদাবর তার পিছনে লম্বা সারে বানরের দল: পেছনে তাদের লেজগুলো শূন্যে তুলে পাকান। এ ডাল থেকে ওডালে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা দুল্‌তি লতার ডগাটায় মুহূর্ত্তের জন্য ভার রেখে, পরমুহূর্ত্তে ভিন্ন ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অদ্ভুত একটা ক্ষিপ্র গতিতে বানরের দল এগিয়ে চলল। সব পেছনে গুপী আর মংলু। মংলু গুপীর দেখাদেখি গাছের ডালে ডালেই চলতে লাগল, তবে তার গতি খুব ধীর। বানরের দল ক্রমশঃই এগিয়ে যাচ্ছে। গুপী বলল—আরও জোরে চল মংলু, আরও জোরে। মংলুর হাত পা ক্রমেই আরও স্থির দৃঢ় হয়ে উঠছে। এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফিয়ে পড়বার সময় তাকে দাঁড়িয়ে আর ভেবে নিতে হচ্ছেনা! গাছের ডালের ওপর ছোটবার সময় ভারের সমতা রক্ষা করাও তার পক্ষে ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে এল।

(ক্রমশঃ)

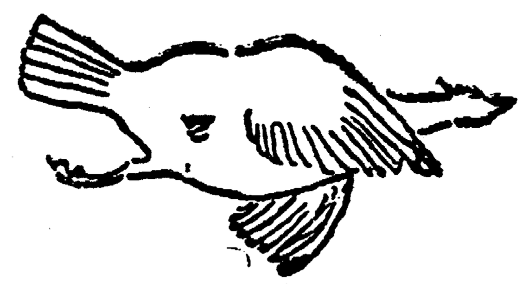

হিট্‌লার

শ্রীসমর সরকার এম, এ

খবরের কাগজে তোমরা হিট্‌লারের নাম রোজই পড়্‌ছো। প্রায় রোজই তিনি এমন একটা কাণ্ড করে বসেন যার জন্য ইউরোপ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আজ বলেন অষ্ট্রিয়া চাই, কাল চেকোশ্লোভেকিয়া, পরশু মেমেল—এমনি আবদারের আর সীমা নেই, আর সবই বিনা যুদ্ধে তাঁর কুক্ষিগত হচ্ছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স্ এতদিন দূর থেকে তাই দেখে এসেছে আর গোপনে সাহায্যও করেছে। এখন আবার হিট্‌লার বলছেন তাঁর ডান্‌জিগ চাই! ডানজিগ্ পোল্যাণ্ডের একটা বড় বন্দর। পোল্যাণ্ড্ ডানজিগ ছাড়বে কেন? তারা বলেছে যুদ্ধ কর্‌বে। ব্রিটেনের এখন যেন হুঁস্ হয়েছে। তাঁদের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ফ্রান্সকে নিয়ে এখন দল পাকাতে চেষ্টা কর্‌ছেন—তিনি হিট্‌লারের এমনি আবদার অনেক সহ্য করেছেন আর কর্‌বেন না। এর অবশ্য একটা কারণ আছে—সেটা হচ্ছে জার্মাণী গত মহাযুদ্ধের শেষে যে উপনিবেশগুলি হারিয়েছিল হিট্‌লার সেইগুলো ফিরে পাবার দাবী কর্‌ছেন। তাইতে যে ব্রিটেনের স্বার্থে ঘা পড়ে! হিট্‌লারের বন্ধু হচ্ছেন ইতালীর মুসোলিনী আর জাপান। রাশিয়া কিন্তু বেশ চুপ্‌চাপ্ চারিদিক শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য কর্‌ছে—সহজে কোন দলে ভিড়্‌তে চায় না। রাশিয়ার মাথা হচ্ছেন ষ্টালিন। তিনি ভাল করে না দেখে শুনে রাশিয়াকে যুদ্ধে জড়াতে চান না—অথচ শোনা যাচ্ছে রাশিয়ার শক্তির সঙ্গে অন্য কোন শক্তির তুলনাই হয় না। ইউরোপ এখন এক সঙ্কটময় অবস্থায় রয়েছে। বড় বড় সব শক্তিই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কখন কি হয় কে জানে? হঠাৎ একদিন শুন্‌বে যুদ্ধ বেধেছে। যুদ্ধ সত্যি না বাধ্‌লে কে কোন্ দলে ভিড়বে বলা কঠিন।

এই শক্তিশালী দেশের মাথাগুলিকে তোমাদের ভালোভাবে জান্‌তে ইচ্ছে করে না?—তাঁরা কোথায় জন্মেছেন, কি করে বড় হয়েছেন, তাঁদের অভ্যাস কী, ইত্যাদি। প্রথমেই আমি হিট্‌লারের কথা বল্‌বো!

হিট্‌লারের পুরা নাম অ্যাডল্‌ফ্ হিট্‌লার। তিনি জাতিতে জার্মান্ নন্, তিনি হচ্ছেন অষ্ট্রিয়ান্। ১৮৮৯ সালে অষ্ট্রিয়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া তিনি খুব বেশী করেন নি—সত্যিকারের শিক্ষা তাঁর হয় নি। এখনও তিনি প্রায় মোটেই পড়াশুনো করেন

না। তিনি খুব পণ্ডিত লোকদেরও পছন্দ করেন না। সামান্য ফরাসী ভাষা ছাড়া আর অন্য কোন বিদেশী ভাষাই তিনি জানেন না। হিট্‌লার প্রথম জীবনে একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন কিন্তু নিজের ক্ষমতার বলে আজ তিনি জার্মাণীর একচ্ছত্র নায়ক। তিনি আজ জার্মাণীর নেতা, জার্মাণ ফৌজ ও নৌসেনার প্রধান অধ্যক্ষ ও তৃতীয় রাইখের প্রেসিডেণ্ট।

ছবিতে হিট্‌লারের চেহারা তোমরা দেখেছো। চার্লি-চ্যাপলিনের মত ছোট্ট এতটুকু গোঁফ, মাথার চুলের সামনের দিকটা কপালের উপর ঝুলে পড়েছে, সৈনিকের পোষাক পরা, হাতে 'স্বস্তিকা'চিহ্ন। 'স্বস্তিকা' চিহ্ন নাৎসী (Nazi) দলের চিহ্ন। তিনি এই দলের দলপতি। 'নাৎসী' শব্দের অর্থ জাতীয় সমাজতন্ত্রী। হিট্‌লারের দৈহিক স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়। ছেলেবেলায় তাঁর ফুস্‌ফুসের দোষ ছিল। আবার সেদিনও তাঁর গলার শিরায় এ একটা অস্ত্রোপচার কর্‌তে হয়েছিল। তাঁর শত্রুরা বলে তাঁর দৈহিক সাহসও (physical courage) নেই। হিট্‌লার ব্যায়াম পর্য্যন্ত করেন না। হিট্‌লার গোটাকত বিষয়ে একটু উদাসীন প্রকৃতির—বিশেষ করে এই, পোষাক-পরিচ্ছদ, বন্ধু-বান্ধব বা পানাহার বিষয়ে! বই তাঁকে আকর্ষণ করে না! পোষাক-পরিচ্ছদে তাঁর বাহুল্য নেই—একটা সাধাসিধা খাকি সার্ট্ বা ডবল ব্রেষ্ট নীল সার্জের কোট, আর একটা নরম টোল-পড়া টুপি। তাঁর একটা 'রেন্-কোট' আছে, সেটা তার খুব প্রিয়। তিনি প্রায় শাকান্নভোজী—মাছ-মাংস পছন্দ করেন না, আর মদও কখন স্পর্শ করেন না। ধূমপানের প্রতি তিনি ভয়ানক চটা—নিজেও ধূমপান করেনই না, আবার তাঁর সামনে কাউকে ধূমপান কর্‌তেও দেন না। হিট্‌লারের বন্ধুবান্ধব নেই। তাঁর সঙ্গে থাকতে পান বেশীর ভাগ সময়ে তার প্রধান দেহ-রক্ষী লেফ্‌লাণ্ট ব্রাক্‌নার আর তাঁর সঙ্গে যে কোন সময়ে সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্যের অধিকারী তাঁর পররাষ্ট্র-সচিব (advisor in foreign affairs) রিবেন্‌ট্রপ্ ও অর্থসচিব (Economic dictator) Dr. Schact. তাও আবার Dr. Schact এই সম্প্রতি পদচ্যুত হয়েছেন। তাঁর প্রেস্ সেক্রেটারী Dietrich বা গুটিকতক উচ্চতন কর্ম্মচারী আর তাঁর নাৎসীদলের ডেপুটি লীডার হেস্ (Hess) প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পারেন। হেস্ তাঁর দলের ডেপুটি লীডার হলেও তাঁকে হিট্‌লারের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলা যায় না। সব থেকে আশ্চর্য্য হচ্ছে যে গোয়েরিং বা গোয়েবল্‌স্ পর্য্যন্ত আগে থেকে ব্যবস্থা না করে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারেন না। হিট্‌লার কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা পছন্দ করেন না। এমন কি হিট্‌লার অটোগ্রাফ্ সই করেন খুব কম—তাঁর অটোগ্রাফে সই আঙ্গুলে গণা যায়। হিট্‌লারের একটি নেশা আছে। তিনি অপেরা শুনতে খুব ভালবাসেন। বিশেষ

করে বিখ্যাত জার্মান্ গীতিকার ওয়াগ্‌নার এর তিনি খুব প্রিয়। যখনই সময় পান তখনই তিনি অপেরা শুন্‌তে যান। হিট্‌লার বার্লিনে থাকা পছন্দ করেন না—সুবিধা পেলেই মিউনিক বা দক্ষিণ ব্যাভোরিয়ার অন্তর্গত Berchtesgaden নামক গ্রামে চলে যান। তিনি বার্লিনে থাকার সময়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে বাস করেন খুব কম। কাছাকাছি Reichskanzler নামক এক প্রাসাদে তিনি থাকেন।

হিট্‌লার অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি ষ্টেট থেকে কোন মাহিনা নেন না। তাঁর নিজের কিছু টাকাকড়ি নেই, বিষয় সম্পত্তিও নেই। টাকাকড়ি তাঁর কিই বা হবে? ষ্টেট থেকে তাঁকে ভৃত্য দেওয়া হয়েছে, মোটরগাড়ী আর বাসস্থান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তিনি যদি জমাতে চাইতেন তবে তাঁর অনেক সম্পত্তি হতে পার্‌ত। অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও কম।

হিট্‌লার আজীবন অবিবাহিত। নারীর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। তিনি তা বলে নারীদের অসম্মান করেন না। তিনি তাঁদের মাতৃরূপে দেখ্‌তে চান—তিনি চান তাঁর দেশের নারীরা বীরপ্রসবিনী হোন্।

হিট্‌লার একজন রোম্যান ক্যাথলিক্ ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি ধর্ম্মে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন ও কোনওরকম ধর্ম্মানুষ্ঠানই তিনি এখন মানেন না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হিট্‌লারের একটা অভিযোগ হচ্ছে যে যীশু একজন ইহুদী ছিলেন। হিট্‌লার ইহুদীদের দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারেন না। ইহুদীদের কোনও রকম দেশাত্মবোধ নেই—ইহুদীরা নিজেদের এক বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে জার্মানদের থেকে নিজেদের তফাৎ রেখেছে। জার্মাণদের সঙ্গে তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চায় না বা কোনও রকমে মিশ্‌তে চায় না! জার্মাণদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র শুধু অর্থসম্পর্কীয়! আমাদের দেশে মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মত জার্মাণীতে ইহুদী সম্প্রদায়। হিট্‌লার ভাবেন গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীর পরাজয়ের একটা কারণ ইহুদীদের নিরপেক্ষতা আর। এও তিনি জানেন যে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে ইহুদীরা জার্মাণীকে সাহায্য কর্‌বে না। সেইজন্যই তিনি জার্মাণী থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন—এমন কি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আইনষ্টাইন্ পর্য্যন্ত ইহুদী বলে জন্মভূমি ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। হিট্‌লারের মতে জার্ম্মাণী শুধু জার্মাণদের জন্য—এর মধ্যে ইহুদীদের কোন স্থান নেই। হিট্‌লার বলেন ইহুদীরা নাকি জার্মাণীর অনেক কিছুই অধিকার করে নিচ্ছিল, চাকুরী, ছাপাখানা, আর্ট্ সবেতেই ইহুদীদের প্রাধান্য ছিল; অনেক ইহুদী আইন্‌জীবি, ডাক্তার, প্রোফেসরও ছিলেন। এ কারণে জার্মাণরা অনেক অসুবিধা ভোগ কর্‌ছিল। হিট্‌লারের ঈশ্বর না মানার আর একটা কারণ হচ্ছে গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীর পরাজয়। যে ঈশ্বর ফরাসী ও অন্যান্য অনেক নিকৃষ্ট

শক্তির জয়লাভ ঘটিয়েছিলেন সে-ঈশ্বরকে কিছুতেই জার্মাণরা সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করতে পার্‌বে না। হিট্‌লার বলেন—'আমরা এখন জার্মাণী ভিন্ন জার্মাণীর জন্য কোন ঈশ্বর চাইনা।' জার্মাণীকে সঙ্ঘবদ্ধ এক বৃহৎ জাতিতে পরিণত করাই জার্মাণীর ধর্ম্ম। হিটলার চান জার্মাণদের নতুন এক ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে—সে ধর্ম্ম হচ্ছে জাতীয়তা সংরক্ষণ।

হিট্‌লারের জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে জার্মাণীকে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রবল জাতিতে গড়ে তোলা। এর জন্য তিনি কোনওরকম উপায় অবলম্বন কর্‌তেই পশ্চাৎপদ নন। সুবিধামত তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি প্রায়ই বদলে যায়, কিন্তু লক্ষ্য তাঁর কখনও দূরে সরে যায় না। হিট্‌লারের একটা খুব কুখ্যাতি আছে যে তিনি মিথ্যাবাদী, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী। অভিযোগটা নিতান্ত অমূলক নয়, কারণ হিট্‌লার জার্মাণীর স্বার্থের জন্য আজ একটা প্রতিশ্রুতি দেন বা কোন জাতির সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন দেখেন তাতে জার্মাণীর কোন সুবিধা হবে না তখনই সেটা ভেঙ্গে দেন। হিট্‌লারের পথে যা কিছু বাধা পড়ে, সেগুলো হিট্‌লার নির্ম্মমভাবে পদদলিত করে নিজের পথে অগ্রসর হন। এঁর জন্য হত্যা করা প্রয়োজন হলে পর্য্যন্ত হিট্‌লার তাও কর্‌তে কুন্ঠিত হন না। তিনি হিংসা-নীতির পক্ষপাতী। হিট্‌লারের আত্মপ্রত্যয় ভয়ানক বেশী। তাঁর গর্ব্বও আছে খুব—কিন্তু তিনি নিজে বড় বলে কখনও গর্ব্ব করেন না—তাঁর গর্ব্ব জার্মাণীর শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। তিনি বলেন তিনি জার্মাণদের প্রতিনিধি, যখনই জার্মাণরা তাঁকে চাইবে না তখনই তাঁকে সরে যেতে হবে। অবশ্য তাঁর উপর কথা বলে এমন কেউ জার্মানীতে নেই—শুধু জার্মাণীতে কেন ইউরোপেই কজন আছেন সন্দেহ! হিট্‌লার নিজে ষ্টালিনের মত খুব পরিশ্রম করেন না—কিন্তু তিনি তাঁর নিম্নতম কর্ম্মচারীদের কাছ হতে যথেষ্ট কাজ আদায় করে নেন। বেশীর ভাগ সময় তাঁর কেটে যায় 'রিপোর্ট' পড়তে আর সংবাদ সংগ্রহ করতে। হিট্‌লার খুব বিচক্ষণভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন—তাঁর সমস্ত কর্ম্মচারীই খুব দক্ষ। সামান্য একটু অযোগ্যতা দেখ্‌লেই তিনি তাদের সরিয়ে দেন। কর্ম্মচারী নিয়োগের উপরই হিট্‌লারের সমস্ত কাজকর্ম্ম নির্ভর করে। পররাষ্ট্র বিষয়ে (foreign affairs) হিট্‌লারের জ্ঞান খুব প্রগাঢ় নয়—তিনি নিজের মত করে foreign affairs বিচার করে থাকেন, কিন্তু তাতেই তিনি খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

হিট্‌লারের বক্তৃতা করার ক্ষমতার কথা না বল্‌লে হিট্‌লারের আসল কথা বলা বাকী থেকে যায়। হিট্‌লারের সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁর বক্তৃতা। কিন্তু সাধারণ বক্তা হিসাবে হিট্‌লার মোটেই ভাল নন—তাঁর থেকেই অনেকেই ভাল বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝে তাঁর স্বর কর্কশ হয়ে ওঠে, শেষ দিকে তাঁর গলা কাঁপে, বক্তৃতা দেবার সময়ে কোথায়

থামতে হবে তিনি জানেন না। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করে যান আর মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গী করেন। কিন্তু এত সব দোষ থাকা সত্ত্বেও হিট্‌লার ডিমোস্থিনিসের মত একজন কৃতী বক্তা। অগণিত শ্রোতৃবৃন্দকে কেমন করে তাদের জাতীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করতে হয় সে কৌশল তাঁর ভালোভাবেই জানা আছে। তাঁর বক্তৃতা শুনে দেশবাসী নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যায় আর গর্ব্বে তাদের বক্ষ স্ফীত হয়। হিট্‌লার বক্তৃতা করার সময়ে শ্রোতৃবৃন্দকে সব সময়ে 'My German people' বলে সম্বোধন করেন! আর বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে 'We Germans, We Germans' কথাটা একটু বেশী বলেন। হিট্‌লারের পূর্ব্বে জার্ম্মানীতে 'We Germans' শব্দের কোন অর্থ ছিল না, কারণ তখন জার্ম্মান্ বলে কোন সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল না—দেশও ছিল বিচ্ছিন্ন। যারা একবার হিট্‌লারের কথা শুনেছে তারাই হিট্‌লারের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। হিট্‌লারকে তাঁর দেশের লোকে ভালবাসে, ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, আর বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে দেখে।

তবুও হিট্‌লারের শত্রু আছে দেশের মধ্যে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলে। হিট্‌লার যে এদের ভয় করেন না তা' নয়। চারিদিকে অনেক গুপ্তচর ছড়ানো আছে এদের সন্ধান রাখবার জন্য, আর পুলিশ আছে গ্রেপ্তার করার জন্য। হিট্‌লার ট্রেণে ভ্রমণ করেন খুব কম। তিনি মোটরগাড়ী আর এরোপ্লেনেই ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণের সময়ে তাঁকে খুব যত্নে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পাছে কেউ তাঁকে হত্যা করে। তিনি যখন বার্লিনে বেড়াতে বেরোন তখন একটা প্রকাণ্ড মার্সিডিস্ বেঞ্জ মোটর গাড়ী চড়েন—পাশে থাকেন তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ব্রাক্‌নার। মোটরের ফুট্‌বোর্ডের উপর রাইফেল নিয়ে থাকে রক্ষীরা (S S men with rifles)। কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার সময়ে যদি খুব জনতা হয়, তা' হলে তাঁর যাবার পথে ছ'পাশে কালো শার্ট পরা S S men সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হিট্‌লার একখানা আত্মজীবনী লিখেছেন—বইখানার নাম Mein kampf (My struggle)। প্রায় প্রত্যেক জার্ম্মান এই বইখানা পড়েছে।

হিট্‌লার গণতন্ত্র মানেন বটে কিন্তু তাঁর মত জাতির মাথার উপর একজন সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকা আবশ্যক—কারণ সবলোকে ত' একসঙ্গে কর্ত্তৃত্ব করতে পারে না। তাঁর আত্মজীবনীর মধ্যে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে। তিনি বলেন নেতা ভিন্ন জাতি বড় হতে পারে না। নেতাই জাতির ভালোমন্দ বুঝে জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম। হিট্‌লারকে সকলে জার্ম্মানীতে Fuhrer বা নেতা বলে।

হিট্‌লালের সম্বন্ধে আমেরিকায় সম্প্রতি একটা খুব মজার গুজব রটেছিল। মিউনিক চুক্তির পূর্ব্বদিন রাত্রে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮—হিট্‌লার একটি প্রীতিভোজে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে গোয়েরিং গোয়েব্‌ল্‌স্ বয়ার প্রমুখ নাৎসী নেতারাও ছিলেন। হিট্‌লারকে নাকী ওম্‌লেটের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওম্‌লেটটী খাওয়ার পনের মিনিটের মধ্যেই হিট্‌লার মারা যান। মুস্কিল—পরের দিন এত বড় একটা চুক্তি হবে যার ফলে ইউরোপের 'ম্যাপ' বদলে যাবে আর তার নায়ক হিট্‌লারই অনুপস্থিত। নাৎসী নেতারা মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। তারপর ঠিক হল ম্যাক্স্‌মিলিয়ান বয়ারকে হিট্‌লার সাজান হবে। বয়ার রূপসজ্জায় ও অভিনয়ে অদ্বিতীয় ও অনেকবার হিট্‌লার সেজে চমৎকার অভিনয়ও করেছেন। ব্যস, তাই করা হল। নকল হিট্‌লার চেম্বারলিন, দালাদিয়রের চোখে ধূলো দিয়ে মিউনিক চুক্তি সই করলেন তারপর থেকে আজ পর্য্যন্তও এই নকল হিট্‌লারই আসল হিট্‌লারের অভিনয় করে যাচ্ছেন। এটা যে কতখানি আজগুবি বুঝ্‌তেই পারছ। হিট্‌লারের কথা লোকে খুব বেশী জানেও না আবার জার্ম্মানীর বাইরে কেউ তাঁকে পছন্দও করে না—এইটাই হচ্ছে ঐ গুজবের প্রধান কারণ। বিশেষ করে আমেরিকা গুজবের একটা বড় আড্ডা—যত উদ্ভট গুজবের জন্ম আমেরিকায়। হিট্‌লারের ডিক্টেটারী মনোভাবের জন্য সকলেই হিট্‌লারের নিন্দাবাদ করছে—কিন্তু হিট্‌লার সে সব গ্রাহ্যও করেন না। তিনি নিজের কাজ ঠিক করে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে যা কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে সবারই মূলে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম! তিনি জার্ম্মাণীর জন্য যা কাজ করেছেন তা বিস্‌মার্কের থেকে কোনও অংশে ন্যূন নয়। তিনি বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করছেন। হিট্‌লারকে আশ্রয় করে জার্ম্মাণী আজ এক বিশাল রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে—এই সময়ে ঠিক হিট্‌লারের দাম্ভিকতার জন্য তাঁকে যতই নিন্দা করা হোক্, তাঁর স্বদেশপ্রেম অথবা নেতৃত্ব করার অসাধারণ ক্ষমতা অস্বীকার করবার ক্ষমতা কারো নেই। জার্ম্মাণীর জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে হিট্‌লারের নাম লেখা থাক্‌বে।

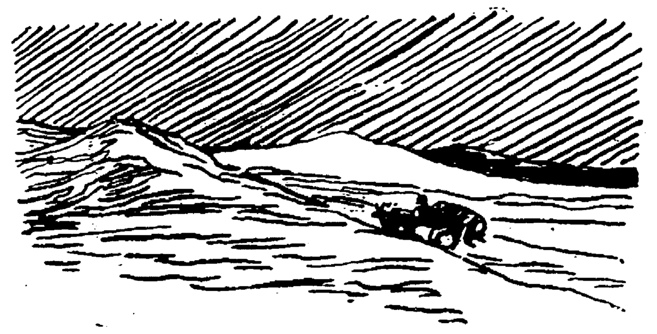

'হোপলেশ্ চোর'

বসুধা ঘোষজায়া

খুব বেশীদিনের ঘটনা নয়।

পাহাড়ে দেশ, বেশ শীত পড়েছে, সন্ধ্যার পর লেপ মুড়ি দিতে ইচ্ছে করে,লোকেরা সন্ধ্যার পরই বেড়াতে যান।

সে বাড়ীর গিন্নির খুব বেশী বয়স নয়, ছোট ছোট তিনটি ছেলে মেয়ে—সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা ক'রে খেতে বসেছে, পাশের বাড়ীর একটী হিন্দুস্থানীর ছেলে তারই বয়সী, তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে, "কাল রাতমে হামারা ঘর চোর আয়া থা, বড়া হল্লা হুয়া, চাচানে চোর পাকড় লিয়া, বেচারা চোরকো মার মার মারকে ক্যায়া হাল কর দিয়া।" সুজিত তার মাকে চেঁচিয়ে বল্লে "ঐ শোন মা কাল রাত্রে বুলাকি রামদের বাড়ী চোর এসেছিল ; বাবা ত মফস্বলে গেছেন, যদি আমাদের বাড়ী চোর আসে ?" মা তখন কাজে ব্যস্ত, গম্ভীর ভাবেই জবাব দিলেন, তার আর ভয় কিসের ?

পাগড়ী মাথায় বসে আছে তারি দিকে চেয়ে

তারপরে একসপ্তাহ কেটে গেছে সুজিতের বাবা ফেরেন নি ; সুজিতের মন থেকে চোর আসার ভয়টাও যায় নি ; মধ্যে মধ্যে মনে আসে ; কাকেইবা বলবে ! বাবাও এলেন না, মায়ের কাছে বেশী বল্লে সে যে কত ভীতু ধরা পড়ে যাবে, সুজিতের ছোট দুটী ভাইবোন আর তাদের ছোট একটা অদ্ভুত বুদ্ধির পাহাড়ি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই ; বাবা গ্রাম থেকে একটী গাই গরু এনেছিলেন, সেই গরুর দুধে সুজিতের মা ছানা কাটিয়ে প্রায়ই মিষ্টি তৈরী করতেন ;—সেদিন বুলা কি রামের চাচি বলে পাঠালেন "বাঙ্গালী মিঠাই বানাও বহেনজী, আজ জাড়া কুছ কম হায়।"

সুজিতের মা আগে থেকেই মনে মনে ঠিক ক'রে রেখে ছিলেন বাবু বাড়ী নেই, কদিন ধরেই ছানা কাটাচ্ছি, আজ গোটাকতক পানতুয়া কর্‌বোই। হিন্দুস্থানী দেশ, বাঙালী খুব কমই থাকেন, পাহাড়ি চাকরগুলো যেমন নোংরা তেম্‌নি বোকা, সুজিত পড়ছিলো, স্কুলে যাবার সময় হ'ল কিনা ভেবে ঘড়িতে দম দেবারউদ্দেশে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে চাকরটা জালদেরাজ খুলে ছানাটা হাতে করে শুঁক্‌ছে আর

খাচ্চে সে তাই দেখে অবাক হয়ে বল্লে "আরে, আরে বিষণ সিং কেয়া কর্‌তা ?" সে ভয়ে কেঁপে বল্লে, "ভাইজী বাঙ্গালী মিঠাই খানেকো বড়াজি করাথা, পর ইস্‌মেতো বিলকুল মিঠা নহি ভাইজি ?" সুজিত খুব রেগে বল্লে—"উল্লু কাঁহাকা সব জুঠা কর দিয়া, মিঠাই বনেগা কিস্‌মে ?" চাকর তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে বল্লে "আজকা চোরী নিকম্মি হো গয়া।" সুজিত আরও রেগে, বুলাকিরামদের চোর আসার কথা মনে ক'রে, বল্লে "তু যব আপহি চোর হ্যায় তো ঘরমে চোরী হোনেসে তুও উসকা সাহারা করেগা।" সে দাঁড়িয়ে হাত যোড় ক'রে বল্লে, "নেহি ভাইজী কভি নেহি, বাবুজি যানেকা বখত হামে বহুত কর্‌কে ঘর্‌কা খবরদারি করনা বোলা ; হাম ডরপোক্ থোড়াই ?" সুজিত মনে মনে ভাবলে তবে আর কি ? ওর সাহস আছে ; চোরের কথা শুনে পর্য্যন্ত তার মনে অনেকবার ভয়ের ভাব এসেছে, বাবা বাড়ী নেই, যদি চোর আসে কি হবে ? সুজিত ও ছোট বোন্ মন্দিরা নিশ্চয়ই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। আর মা কি করবেন ? যাক বিষণ সিংএর সাহস আছে ; ওর ছানা চুরীর কথা মায়ের কানে তোলা হবেনা। তাহ'লে ও রেগে থাকবে, বাবা এলে তখন বলা যাবে। সুজিত সেদিন বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়েই স্কুলে গেল।

সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে সুজিত বই নিয়ে বস্‌ল, তার মনে আবার ঐ চিন্তা—চোরের কি রকম মূর্ত্তি ; চোর পাজামা পরে কিনা, চোরের টুপীটা কি রকম, চুরি করবার সময় চোখটা কি রকম ঘোরায়—হাতের ছোরাখানা কত বড়, কী ঝক্ ঝক্ করে—উঃ কি ভয়ানক। মাথা গোলমাল হ'য়ে গেল, টেবিলে মাথা রেখে সুজিত প'ড়ে রইল—মা এসে বল্লেন "আজ দুদিন তোমার পড়ায় বেশ অমনোযোগ দেখছি সুজিত, তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝতে পারি না ?" সুজিত তার মাকে যেমন ভয় কর্‌ত, তার শ্রদ্ধাও ছিল খুব বেশী—সে মায়ের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বল্‌ত না তাই মায়ের দিকে চেয়ে সরলভাবেই বল্লে—"ঐ যে সেদিন থেকে চোরের ভাবনা হ'য়েছে মা, সে আর মন থেকে কিছুতেই যাচ্চেনা ; চোরটা এসে গেলেই বোধহয় এত ভাবনা থাক্‌বেনা।" মা গম্ভীরভাবে বল্লেন "সে তোমার ভাবতে হবে না আমি ত আছি।" মা পানতুয়া করবার উদ্দেশে ছানা বার করতে গেলেন—জালি দেরাজের দরজা খুলে দেখেন ছানা অদৃশ্য, ঠিক সেই সময় মন্দিরা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "ওমা ছোদ্দা কালী ফেলেছে।" মা খানিকটা থেমে মনে মনে বল্লেন, "যাঃ পানতুয়া করতে আজ এত বাধা পড়ছে ও আজ কর্‌বোই। ছানাটা সব খেয়েছে,—!" বলে সেদিনকার টাট্‌কা দোয়া দুধটার সবটাই ছানা কাটিয়ে ফেল্লেন—ছানার ন্যাকড়া উঁচুতে টাঙ্গিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেদের ডেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে পানতুয়া করবেন এই মনে ক'রে সন্ধ্যার পরই বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে উনান পাড়ে বস্‌লেন। শীতও বেশ আছে, উনান ধারে বেশ আরামই পাওয়া যায়। সুজিতের মা ঘি চড়িয়ে ছানার ব্যবস্থা করে সেগুলি পানতুয়ার আকারে গড়্‌তে লাগ্‌লেন, তখন তাঁর বুলাকিরামের চাচির কথা মনে পড়্‌ল। চাকরটাকে ডাক্‌তে গিয়ে দেখেন সে গভীর নিদ্রা দিচ্চে। ছেলেরাও সব ঘুমিয়ে পড়েছে, সুতরাং বুলাকিরামের চাচিকে আর পানতুয়া শেখান হ'লনা।

রান্নাঘরের সাম্‌নাসামনি একটা ছাত। সেই ছাত এবাড়ী ওবাড়ী করে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়েছে ; তার সিঁড়িটা ৭।৮ খানা বাড়ীর পর। এই ধরণের বেনে বাড়ী পশ্চিমে প্রায়ই দেখা যায়। উনান ধার থেকে

ছাতটা বেশ দেখা যেত। সুজিতের মা ঘর থেকে ফিরে এসে ঘিএর কড়াটা চড়িয়ে, আবার পানতুয়া গড়্‌তে লাগলেন, আনমনে ছাতটার দিকে নজর পড়্‌তেই মনে হ'ল কে যেন পাগ্‌ড়ী মাথায় বসে আছে তাঁর দিকেই চেয়ে। অত শীতের মধ্যে কোন ভদ্রলোক আর ছাতে বসে থাকে সুজিতের মা বেশ বুঝতে পার্‌লেন। কিন্তু তিনি পানতুয়া গড়া শেষ ক'রে ভাজা আরম্ভ করে দিলেন; চোরের সেই গন্ধ নাকে প্রবেশ ক'রে, চোখ দুটো যেন জলতে লাগ্‌ল। সুজিতের মা খুব সাবধানে এক একবার দেখ্‌তে লাগলেন। ভাজা শেষ করে তিনি রস চড়ালেন, আর এদিককার গোছ গোড়াও কর্‌তে সুরু করলেন। উঠান দিয়ে যেতে আস্‌তে কতবারই চোরকে দেখা গেল, সুজিতের মা বাইরের সব কাপড় চোপড় যা শুকুচ্ছিল তাল পাকিয়ে ঘরের ভিতর রেখে সব ঘরেই শেকল তুলে তালাচাবী দিলেন। তখন প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটা; চাবীগুলো সাবধানে নিয়ে এসে রান্নাঘরে রস নামিয়ে পানতুয়াগুলো প্রত্যেকটা কাঁটা দিয়ে ছ্যাঁদা করে তার ভেতর ফেলে ঢাকা দিয়ে গামলা তাকের উপর তুলে রাখলেন। বেশ মনে হ'ল চোরের খুব শীত লেগেছে, সে কালো কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বিড়ি খাচ্চে। সাম্‌নাসাম্‌নি রান্নাঘরের আলোয় বিঁড়ির ধোঁয়া বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগ্‌ল।

সুজিতের মা তখনও খাননি। তিনি এসব দেখেও নিজের খাবারের থালাটা নিয়ে উনান ধারে খেতে বস্‌লেন দেখে চোরের আর ধৈর্য্য থাকে না। সে বেশ একটু নড়ে উঠল তারপর মাথার পাগড়ীটাকে মাথা থেকে নামিয়ে, আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে ছাতে পায়চারি আরম্ভ কর্‌ল। তোমরা ভেবে দেখ সুজিতের মায়ের কি সাহস! প্রায় ১১টার কাছাকাছি তাঁর খাওয়া শেষ হ'ল। চোর ভাব্‌লে এইবার দুর্ভোগ কাট্‌লো, উনান গন্‌ গন্‌ করছে, হাত পা কষে সেঁকে নিয়ে গেরস্থর যা কিছু আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! সে আনমনে বেশ একটু জোরেই কাশ্‌লে! সুজিতের মা ততক্ষণে সদোরে তালা দিয়ে রাস্তায়। সদোর থেকে একটা ছোট গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তার ধারেই ওষুধের দোকান। হিমে সারা দেহ কন্‌ কন্‌ কর্‌ছে, দোকানের লোকেরা দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ কর্‌ছে, এমন সময় সুজিতের মা গিয়ে উপস্থিত। তাঁরা ভেবেছেন কারুর বুঝি অসুখ করেছে, আবার ভাবলে তা বোলে মেয়ে মানুষ কি এত রাত্রে দোকানে আস্‌বে? তারা ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কেয়া মাইজি দাওয়াই চাহি?" সুজিতের মা বল্লেন "নেহি বেটা বাবুজী দত্তরা গিয়া ঘরমে চোর আয়া; আপলোগ পর্‌লি সিঁড়ি সে ছাতপর যাইয়ে।" বলে সুজিতের মা দোকানের একটা চেয়ার টেনে বসে পড়্‌লেন। আর দোকানদার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গোটাচারেক লাঠি নিয়ে ছাতে উঠে দেখে কেউ নেই। এদিক ওদিক দেখে সুজিতদের রান্নাঘরে আলো জলছে দেখে সেই দিকে নজর পড়্‌ল, চোর তখন হাত পা সেঁকে সবে মাত্র পানতুয়ার গামলাটি পেড়েছে। দোকানের লোকেরা লাফিয়ে উঠানে পড়ল, চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—"সাবাস বাঙ্গালী কি লেড়কী।"

চ্যাঁচামেচি, হৈ হৈ, মার ধোর। বিষণ সিং উঠে দরজা খুল্‌তে পারে না, সে এক একবার দরজার ফাঁক দিয়ে হাঁকতে লাগল—"খবরদার চোরি মত করো, বাবুজী হামাড়া তন্‌খা নেহি দেগা।" সুজিত বিছানায় উঠে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাইতে লাগ্‌ল। মা নেই, ভাই বোনেরা উঠে পড়েছে। সে বল্লে "সব চুপ—মাকে চোর বুঝি আস্ত রাখেনি।" সুজিতের হাত পা সব ঝিম্‌ ঝিম্‌ কর্‌তে লাগল, দরজার দিকে চেয়ে দেখ্‌ল

দরজা বন্ধ। উঠে আর দেখ্‌তে সাহস হ'লনা, কান্না যেন ঠেলে আস্‌তে চাইল। বাইরের মার মার শব্দ যত কানে আস্‌ছে তত তার বুক গুর্‌ গুর্‌ করে উঠছে।

১২ টা বেজে গেছে, বুলাকিরামের চাচাজি দোকানে এসে অপ্রস্তুতের মত বল্লেন "আপ ধন্যহ্যায়। ঘরমে যাইয়ে, দরওয়াজা খোলিয়ে।" সুজিতের মা সদোরের সাম্‌নে পুলিশের ভীড় দেখে তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ভেতরে এলেন, চোর তখন মার খেয়ে আধমরা হ'য়ে উঠানে সটান্‌ পড়ে আছে, গিন্নিকে দেখে অতি কষ্টে হাত জোর করে বল্লে "মাইজী নমস্তে।"

বাইরের পুলিসের দল ভিতরে এসে চোরকে টান্‌তে টান্‌তে থানায় নিয়ে গেল। রাত আর বেশী ছিলনা; সুজিতের মা সদোর বন্ধ ক'রে ভাঁড়ার ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন। ভোরে উঠে সব ঘরের তালা খুলে দিতে গিয়ে দেখলেন, চাকরটা তখনও কাঁদ্‌ছে আর বল্‌ছে "হে রামজী, এ মেরা তক্‌দির, এ বাঙ্গালী মিঠাই রে......... ।"

নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

"এই যে, খোকা! বাবা কই তোমার? ড্রইংরুমে ঢুকে, খোকাকেই কেবল সামনে পেলেন অবিনাশবাবু।

" বাবা? বাবা তো বাড়ী নেই!"

সলিল ওরফে শান্তু, সম্প্রতি অবর্ত্তমান পিতৃদেবের বুকসেল্‌ফ থেকে মোটা একখানা বই বার করে' বিস্মিত দৃষ্টিতে কী দেখছিল, সংক্ষেপে জবাব দিল। "বাবা যে বাড়ী নেই সেকি বাবাই বলে' দিয়েছেন না কি? কুঞ্চিত ভ্রূ এবং কাষ্ঠ হাসির মিক্‌চার্ করে বলেন অবিনাশ, "দেখি বইটা! কী দেখছ দেখি!"

"দেখবেন? ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু—! আমি রোজই দেখছি, কিন্তু—কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য—!"

বই হাতে অবিনাশের সান্নিধ্যে এগিয়ে আস্‌ছিল সে, অকস্মাৎ অনতিদূরে গুরু গম্ভীর পদ শব্দের বার্ত্তা পেয়ে, বইটিকে যথাস্থানে গচ্ছিত রেখে নিঃশব্দ একছুটে নিজের ছোট্ট টেবিলটায় গিয়ে বসে' পড়ে।

বাবার আবির্ভাব হচ্ছে, বুঝতে দেরি হয় না কারো।

ভদ্রলোকও অকস্মাৎ অতিরিক্ত ভালমানুষ হয়ে পড়েন যেন।

"অঙ্ক কষ্‌ছিলে বুঝি?" কী আঁক দেখি।—" অবিনাশবাবু বল্‌তে স্থরু করেন এক্ষুনি।

"ওর অঙ্কের কথা আর বলোনা বন্ধু!" পরেশবাবু ঘরে এসেই প্রসঙ্গ তোলেন প্রথমে: "অঙ্ক না তো আতঙ্ক! ওর আঁক বুঝ্‌তে গেলে আমারই মাথা ঘুরে যায়!"

"বলো কি খোকা! আঁক কষ্‌তে পারো না তুমি?"

"পারি।' সব রকম আঁকই পারি—!"

"যোগ? যোগ দিতে শিখেচ?"

"হ্যাঁ!"—প্রকাণ্ড এক ঘাড় নেড়ে জানিয়ে ছিল খোকা "যোগ দেওয়া আর শক্ত কি? ওতো খুবই সোজা শূণ্যগুলো আমি খুব সহজেই যোগ দিতে পারি—মুখে মুখেই দিয়ে দিই—কিন্তু ঐ সংখ্যা গুলোই হয়েছে ভারি গোল্‌মেলে। ঐ গুলোই কেমন গুলিয়ে যায় আমার!"

সংখ্যার দিকে তার যা—কিছু আশঙ্কা, তা' কেবল কথায় না, ওর মুখে—চোখেও প্রকাশ পায়।

"মোটরেই এসেচো তো? আমিও তাহলে বেরুব তোমার সঙ্গে—" পরেশবাবু বল্লেন: "নিউ-মার্কেটের কাছ্‌টায় নামিয়ে দিয়ো আমায়।"

"মোটরের কথা আর বলোনা ভাই! কিছুতেই সারানো যাচ্ছে না ওটাকে! প্রাণ হাতে করে' রিক্সাতেই চলা-ফেরা কর্‌তে হচ্ছে এ কদিন কি আর করব।"

অবিনাশবাবুর বেদনাতুর মুখ থেকে এই দুঃসংবাদ দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হয়।

"কেন এই ত সেদিন কিন্‌লে হে! নিউ সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড! এর মধ্যে আবার কী ব্যায়রাম হলো?"

"ব্যায়রাম? তাই তো বোঝা যাচ্ছে না! চালাতে আরম্ভ কর্‌লে, গাড়ীটার আগা পাশ্‌তলা

ধার থেকেই আওয়াজ দিতে থাকে—সে কী দারুণ আওয়াজ, কি বল্‌ব! কেবল —"

অবিনাশবাবু থামেন, একটুক্ষণের জন্য ইতস্ততঃ করেন—"কেবল একটা জায়গা থেকে কোনো আওয়াজ বেরয় না। সেই—হ্যা—সেই যা কিছু সান্ত্বনা, বল্‌তে পারো!"

"তাহলে এখনো গাড়ীর একটা পার্ট্‌ ভালো আছে বলো!"

"হ্যাঁ, ঐ একটা পার্ট্‌! একটা পার্টই কেবল! সেখান থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছে না—কোনো সাড়াশব্দই না একদম্। অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত বেরয়নি। গাড়ীটার ঐ হর্ণ থেকে কেবল।"

অবিনাশবাবুর দ্বিতীয় দফা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে পড়ে।

"তা রিক্সাই বা মন্দ কি! একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স করিয়ে নাও। চাই কি, আমার মেজশালার মতো, তোমারও চট্‌পট্‌ বরাত খুলে যেতে পারে।—" বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই পরামর্শ দ্যান্ পরেশবাবু।

"কি রকম—কি রকম—?"

অবিনাশবাবুর নিজেকে অবিনশ্বর বলে কোনদিনই ধারণা ছিল না, ব্যগ্রভাবেই প্রশ্ন করেন তিনি।

"ছোঁড়াটা চিরদিনই লাকী! মুকুন্দ হে, আমার মেজশালা! ভারি জোর বরাত, বরাবরই দেখে আস্‌ছি! এই পরশুদিনই দুর্ঘটনার বীমা করেছে, আর পড়বি তো পড়, কাল্‌কেই তার মাথায় পড়েছে একখান্ থান্ ইট্! একখানা চৌকো চব্বিশ ইঞ্চি—আর কর্‌করে দশ হাজার টাকা নগদ্! আছ কোথায়!"

"কপাল বটে! সত্যি!" অবিনাশবাবুর হিংসাই হতে থাকে।

"একেই বলে লাক্!—" পরেশবাবু রহস্যটা ক্রমশই আরও ফাঁক্ করেন: "তবে বেচারা এখন হাসপাতালে, এই যা। বাঁচলে হয়!"

"তা মরুক্ গে, টাকাটা তো আর মারা যাবে না?" অবিনাশবাবু, ঘোরতর উৎসাহে বলেন "আরে, মারা তো আক্‌চারই যাচ্ছে, যাচ্ছেনা কে? মারা যেতে আর কি! কিন্তু, টাকাটা আসে কোত্থেকে?

"ভালো কথা! তুমি এই ড্রইং রুম পর্য্যন্ত পৌছিলে কি করে?—" অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ের সঙ্গে কী যেন একটা মারাত্মক কথা মনে পড়ে যায় পরেশবাবুর। হঠাৎ পড়ে যায়।

"কেন? রিক্সাকে ছেড়ে দিয়েছি, তোমার সদর গেটেই। এইটুকু আর পায়ে হেঁটে পদব্রজে আস্‌তে পারব না? কী যে বল!"

"বাঘার সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি? কি ভাগ্যি! দেখতে পেলে এতক্ষণ টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌তো তোমায়"

"য়্যাঁ? বাঘা? তোমার কুকুর?" চমকপ্রদ পিলের অভ্যন্তর থেকেই যেন তাঁর কম্পিত কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসে।

" ভারি বদ্‌রসিক। মোটরে এলে কিছু বলে না, কিন্তু পদাতিকদের রক্ষে নেই। তিনটে পিয়নকে প্রায় ফলার করে' ফেলেছে বল্‌তে গেলে, কষ্টের কথা আর বোলোনা ভাই, পোষ্টাফিসে গিয়ে চিঠি নিতে হচ্ছে তাঁর পর থেকে। বল্‌ব কি ? "

প্লীহার কম্প অবিনাশবাবুর আপদমস্তকে এসে দেখা দেয়, সত্যই হজম হয়ে যেতে তখনো বাকী আছেন কি না, তাঁর সন্দেহ হতে থাকে।

" এই সব জন্যই তো য়্যাক্‌সিডেন্ট ইন্‌সিওরেন্স করা দরকার হে ! নিতান্ত আকস্মিক একটা দুর্ঘটনা হতে কতক্ষণ ?—" পরেশবাবু, আরও একটা উদাহরণ, অধিকন্তু, দেবার প্রয়োজন বোধ করেন : " এই যেমন ধর না আমার নিজেরই একটা হয়ে গেছে সম্প্রতি।"

"আকস্মিক দুর্ঘটনা ?"

"নিতান্তই আকস্মিক। অবশ্যি এ সম্বন্ধে বীমা করার ব্যবস্থা কোনো কোম্পানির আছে কিনা জানিনে। কিন্তু দুর্ঘটনা যে, তাতে আর সন্দেহ নেই ; এবং একেবারেই আকস্মিক !—"

অবিনাশবাবু ততক্ষণে অনেকখানি সাম্‌লে উঠেছেন, এমন কি, ভয়ের ধাক্কা কাটিয়ে, কৌতুহলের উদ্রেক্ হতে আরম্ভ হয়েছে তাঁর।

"কি, শুনি ?" ক্ষীণস্বরে তিনি বলেন।

"সম্প্রতি—সম্প্রতি—" সলজ্জতাকে অতিক্রম করে' বলে ফ্যালেন কোনরকমে তিনি : সম্প্রতি তোমার বৌমার—বৌমা, না, বৌদি—কি বল্‌ব ? "

"বৌমা ? উঁহু ! বৌদিই বা কি করে' হয় ! তোমাকে পুত্রতুল্য কিম্বা দাদৃবৎ তো আমি ভাব্‌তেই পারিনে,—তবে 'হ্যাঁ, জ্যাঠা-মশাই বলে' ধর্‌লেও ধরা যায় বটে ! টেনেটুনে জ্যাঠা-মশাই বল্‌তে পারো।"

"তাই বলছিলাম্ ! তোমার জ্যাঠাইমার যমজ সন্তান হয়ে গেছে সম্প্রতি !" পরেশবাবু একটা য়্যাকসিডেন্ট দুর্ঘটনাকে নয়, একজোড়া একসঙ্গে এক নিমিষে অনতিদূরে এনে ফ্যালেন।

"যমজ ! বল কি !" এতখানি অধিকন্তুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না অবিনাশ। "ছেলে, না, মেয়ে ?"

"যদ্দূর খবর পেয়েছি, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তবে সঠিক বল্‌তে পারবনা ভাই ! এর উল্‌টোও হওয়া সম্ভব ; একটা মেয়ে, আর একটা ছেলেও হতে পারে।"

"কিন্তু যাই বলো, পেল্লায় রকমের এই কুকুরটা পোষা ভালো হয়নি তোমাদের।—"ঘুরে ফিরে পুনরায় কুকুরের কথায় এসে পড়েন অবিনাশ : "তার ওপরে, এই সব নতুন নতুন ছেলেমেয়ের আমদানী কর্‌ছ ! এরাও কিছু মোটরে চেপে আস্‌চেনা তোমার ? কি বলো ?"

"তা যা বলেছ ! কিন্তু কি করা যাবে, যত সব বেকার লোকের যাতায়াত কেবল এই রাস্তায় ! হয় কাজ চাইবে, নয় খেতে চাইবে। কুকুর না পুষে কি রক্ষা আছে ?"

"বটে ?" অবিনাশবাবু ঈষৎ যেন ভাবিত হয়ে পড়েন : "আসবার সময় একটা মুস্‌কো গোছের লোক দেখলাম বটে ! সদর গেটে কি একটা বিজ্ঞাপন লট্‌কেছ, তাই পড়ছিল মনোযোগ দিয়ে।"

"ওই ওদের জন্যই লাগাতে হয়েছে। আর কিছুনা, একটা বিবৃতি কেবল। ঘোষণা-বাণীও বল্‌তে পারো।"

"আমি পড়তে গেলাম, কিন্তু লোকটা আড়াল করে দাঁড়াল। বল্ল, "যান্ না মশাই ভয় নেই কিছু। বাড়ীতেই আছেন কর্ত্তা। ভাবলাম তোমার নতুন দারোয়ান বুঝি।"

"কুকুরটা ছাড়া আমার আর কোনো কর্ম্মচারী নেই। কিরকম দেখতে বল তো ? পাওনাদার টাওনাদার নয় তো ?"

"তাও হতে পারে। দেখতে ? দেখলে মনে হয়, ওর পাওনা টাওনা কিছু থাকলে পত্রপাঠ মিটিয়ে দেয়াই ভালো।"

পরেশবাবুর কপালে দুর্ভাবনার ছায়া পড়ে : "কোনো বেকারও হতে পারে।"

"তাও হতে পারে। কিন্তু ওটা কি লাগিয়েছ দরজায় ?"

"একটা বিজ্ঞাপন মাত্র। কেবল এইটুকু কথা, 'আমরা নিরামিষাশী বটে, কিন্তু আমাদের কুকুর তা নয়।

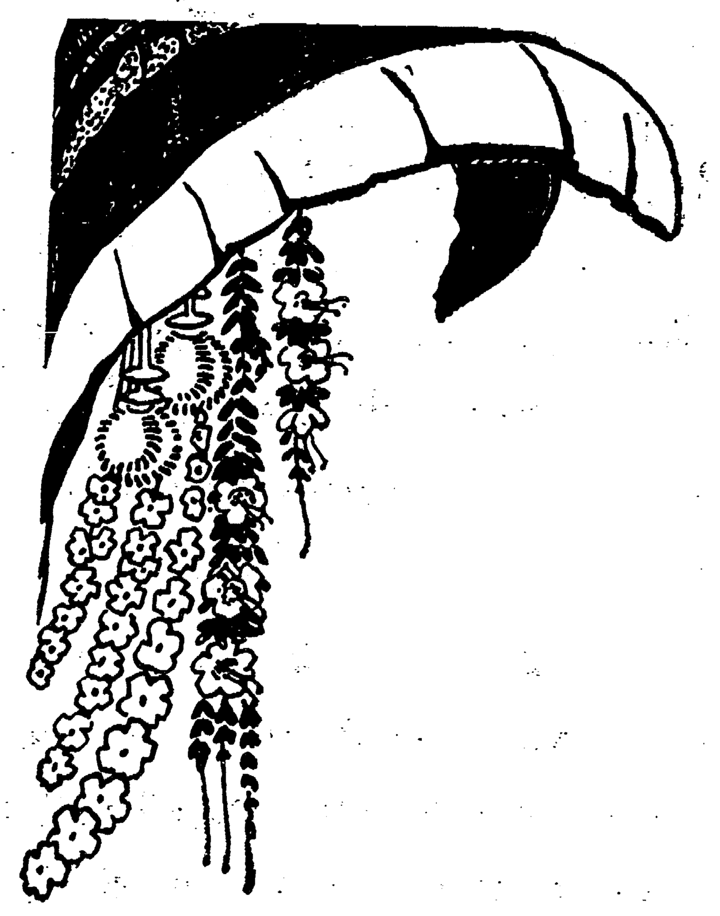

তীর্থ পরিক্রমা

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খাঁন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথমে টাঙ্গা চল্‌ল ইৎমৎদ্দোলায়। যমুনার ওপারে—পোল পার হয়ে। দূর থেকে তাজমহলের উঁচু চুড়া দেখ্‌তে পেয়ে সবাই বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক্‌লুম—সৌন্দর্য্যের পরম সৃষ্টির পানে। গাড়ী এসে দাঁড়াল—এখানে সম্রাজ্ঞী মমতাজের পিতা—আসফজা ও ভ্রাতার সমাধি। চমৎকার উদ্যান-পরিবেষ্টিত-সৌধ। নানারকমের দিশি ও বাহির থেকে আনা পাথরের তৈরী—এত অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য, যা দেখে অবাক হ'তে হয়। গাইডের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠ্‌লুম-সে বর্ণনা করে যেতে লাগ্‌ল অবান্তর কত কাহিনী। উপর থেকে নেবে আমরা বেরুলুম উদ্যান পরিক্রমনে। কিছু ফুলও সংগ্রহ করা গেল। গেটের দুপাশে ছবি ও হরেক রকমের পাথরের তৈরী জিনিস বেচ্‌ছে। কিছুতেই তারা ছাড়বেনা—কতকগুলি ছবি তাদের কাছ থেকে নিতেই হ'ল।

এরপরে চল্‌লুম বিশ্ববারা তাজমহল দেখ্‌তে! আবার যমুনা পেরিয়ে সহরের ভেতর দিয়ে Fort এর পেছনের পথে এসে পড়লুম—সেই সুপ্রসিদ্ধ বিরাট-দেহ দুর্গের পথ দিয়ে যেতে যেতে সেই বিস্মৃত কাহিনী মনে পড়ছিল। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি উদ্যান রচনা হচ্ছে—খুব সুন্দর দেখ্‌তে। তাজে যাবার পথটীও যেন কত কবিত্বপূর্ণ—মনোরম ছায়াশীতল বৃক্ষরাশির সমাবেশে পরম রমনীয় হয়ে উঠেচে—সেই গাছে ঢাকা শ্যাম অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে শুভ্র শ্বেত-মর্ম্মরে তৈরী তাজকে দেখে Wordsworth এর একটি লাইন মনে পড়ছিল্—"Sweet as the Primrose

pees beneath the thorn!"

বিরাট গেটের বাইরে এসে অবশেষে গাড়ী দাঁড়াল। ঠিক গেটের সুমুখে দাঁড়িয়ে যা চোখে পড়ল তার বর্ণনায় কবির অমর লেখনী হার মেনে যায়—আমি কোথায়? সেই মহাতীর্থের সোপানদ্বারে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হচ্ছিল—যা ছিল চির-জীবনের চির প্রার্থিত—সত্যই কি সশরীরে প্রত্যক্ষ তাকে দেখ্‌ছি—না কত রজনীর কত ব্যর্থ স্বপ্নের মত এও কেবল মায়ার ছলনা!

বিলিতি ঝাউ দেওয়া সরু পথ, মাঝখানে প্রবাহিনী—সেই জলের বুকে তাজমহলের মনোরম প্রতিচ্ছবি। সেই সরু পথ একটি বৃহদাকার সরোবরে গিয়ে থেমেছে—ঠিক তাজের সুমুখে—যেন আমাদের রূপকথার অপূর্ব রূপসী রাণী বিম্বাবতী সাম্‌নে মুকুর রেখে নিয়তই দেখ্‌ছেন সত্যই তাঁর চাইতে সুন্দরী এই ধরাতলে আছে কিনা! সেই শ্বেতস্বচ্ছ মর্ম্মরের বুকে সূর্য্য-রশ্মি এত প্রখর জ্যোতি বিকিরণ করছিল যে—চাইতেই কষ্ট হয়! পর্য্যাপ্ত সূর্য্যালোকের মধ্যে তাজকে দেখে মনে হচ্ছিল—যেন সে আমাদেরই একান্ত আপন হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতী—মহাদেবের প্রেম-প্রার্থিনী হয়ে পঞ্চতপ সাধনায় রত। জুতো খুলে উপরে উঠে গেলুম। পাশাপাশি দুটি সমাধি প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে পবিত্র প্রদীপ জ্বল্‌ছিল। সেই আলোকে দেখ্‌লুম—এই বসুন্ধরার দুটি ঘুমন্ত শিশু, সরল—সুন্দর—সুকোমল—বেদনাকাতর পুষ্পের মত পবিত্র তাদের জীবন তরণী বেয়ে অস্তাচলের শেষ সীমানায় এসে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যে বেলায় ঘুমিয়ে পড়েচে। জোরে সেখানে কথাও কইতে সাহস হয়না—পাছে বা তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়!

অনেক করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখা হ'ল—যেন তৃপ্তিই হয়না! তারপর গিয়ে কোনের মিনারের উপর উঠ্‌লুম—এ আমাদের কোলকাতার অক্‌টরলেনী মনুমেণ্টের কিম্বা বেনারসের বেণীমাধবের ধ্বজার ঠিক অনুরূপ। উপর থেকে গোটা আগ্রা সহর অতি চমৎকার দেখা যায়—পাশেই যমুনা—অবিশ্যি জল এখন প্রায় আর নেই বল্‌লেই চলে—তবু যেন মনে হয় সোজা সে অনায়াসেই যেতে পারত—কিন্তু সে না গিয়ে স্বেচ্ছায় তাজকে প্রদক্ষিণ করে গিয়েছে তার ভালবাসা জানিয়ে।

মিনার থেকে নেবে এসে উদ্যান পরিক্রমণ করা হোল—এত চমৎকার বাগান জীবনে কখনও দেখেচি বলে মনে হয় না। কত দিশি বিদেশী ফুল—যেন তারা একযোগে জাতিত্বের অহঙ্কার ভুলে, অন্তরের সকল সৌন্দর্য্য বিকশিত করে তাজকে তাদের প্রীতি জানাবার জন্য ব্যস্ত। ইরান থেকে আনা সবুজ কার্পেটে যেন সারা বাগানটি মোড়া—একটি গাছের ছায়ায় ঘন ঘাসের উপরে কেউ বা বসে—কেউ বা সোজা শুয়ে পড়লুম। নানা জায়গায় বন্ধুস্বজনের কাছে প্রীতি ও শুভ কামনা জানিয়ে চিঠি লেখা হ'ল। বেলা তখন দুটো—খাবার কথা এতক্ষণ যেন কারুরই মনে ছিল না। এখন সেটা প্রচণ্ড ভাবে তাড়না সুরু করলে—কিন্তু নিরুপায়—আমাদের সঙ্গে খাবার কিছুই নেই—সহরে না গেলে পাবার আশাও সেখানে কিছুমাত্র ছিল না। চা এর সরঞ্জাম কেবল মাত্র ছিল—সুতরাং গাড়ী থেকে ষ্টোভ নাবিয়ে এনে মেয়েরা সবাই চা ও কাফি তৈরী করতে লেগে গেলেন।

এরপর আমরা যাত্রা করলুম ফোর্টে। ফোর্ট কাছেই—অমরসিংহ গেটে গিয়ে গাড়ী

দাঁড়াল—আমরাও টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করলুম। অর্দ্ধেকটা ফোর্ট এখন পল্টনদের থাক্‌বার ব্যারাক হয়েছে—সদোর তাদেরই অধিকারে। তাই এই পেছনের গেট দিয়ে দর্শনপ্রার্থীদের ভেতরে যেতে দেবার ব্যবস্থা হয়েচে। সেই দেওয়ানী আম-দেওয়ানী খাস্ মতি মস্‌জিদ—সম্রাট শাহাজানের আবাস—রাজপুত্রী জাহানারার কক্ষ—বন্দী অবস্থায় সম্রাট দিনের পর দিন যে কক্ষের কারাগারে উন্মাদের মত আর্ত্তনাদ করে বেড়িয়েছেন—এই সব দেখে মনে হচ্ছিল—যেন সেই ইতিহাসের দিন—আমরাও কোন দূরাগত প্রজা—কত কান্তার প্রবাহিনী পার হয়ে এখানে এসেচি সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী হয়ে। একটি ছোট মিনারমত আছে—সেই বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে প্রেমিক—সম্রাট তাঁর স্বর্গগতা প্রেয়সীর শেষ স্মৃতির পানে তাকিয়ে থাক্‌তেন! আজ এখানে দাঁড়িয়ে সত্যই মনে হ'ল—হে প্রেমিক সম্রাট তোমার সাধনা সার্থক হয়েচে!

ফোর্টে বেশী দেরী করবার উপায় নেই—কারণ পাঁচটার পর গেট বন্ধ হয়ে যায়—সুতরাং অতৃপ্ত মন নিয়েই আমাদের ফিরে গিয়ে টাঙায় চাপ্‌তে হ'ল। এরপর আমরা চল্‌লাম য়ুনিভার্সিটি হয়ে ডঃ বাগচীর বাসায়। সহর হিসাবে আগ্রা যেমনি পুরোনো তেম্‌নি নোংরা। রাস্তাগুলিও অত্যন্ত ছোট ও কদর্য্য। তবে য়ুনিভার্সিটির ঐ দিকটা নতুন বলেই অত্যন্ত আধুনিক এবং আনন্দনীয়। রাস্তার পাশে বিলিতি মরশুমী ফুল-গুলি তাদের অপরূপ লাবণ্য সম্ভার নিয়ে ফুটেছিল—সবুজ ঘাসে ঢাকা লন, সুন্দর বাড়ী, সত্যিই এধারটা অত্যন্ত মনোরম! য়ুনিভার্সিটির বাড়ীগুলিও চমৎকার। ঐ পথেই ডাঃ বাগচীর বাসার সাম্‌নে এসে আমাদের রথ দাঁড়াল। অবতরণ করে ভেতরে খবর পাঠানো হ'ল—ডক্টর সায়েব বেরিয়ে এসে সানন্দে অভিবাদন করে আমাদের নিয়ে চল্‌লেন। সারাদিন আমাদের অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায় কেটেছে—সুতরাং তাঁর আতি-থেয়তার সদ্ব্যবহার আমরা করলুম—তা লেখাই বাহুল্য। এঁদের ব্যবহার অত্যন্ত চমৎ-কার—আমাদের আট্‌কে রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করছিলেন—কিন্তু তাঁর মেয়ে আগ্রা য়ুনিভার্সিটির মাট্রিক এগজামিনের জন্যে তৈরী হচ্ছেন—সুতরাং তাঁর অসুবিধে হবার সম্ভাবনায় আমরা ভবিষ্যতে আবার আস্‌বার সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলুম। ডক্টর সায়েব বাড়ীর গাড়ীতেই ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন—আবার ট্রেন—ফিরতি পথের গাড়ীগুলি জংশনের পর জংশন ছাড়িয়ে চল্‌ল। ...হঠাৎ আবার খেয়াল—এলাহাবাদে নামতে হবে! সুতরাং এলাহাবাদে নামা হ'ল। মালবীয় রোডে আমাদের এক আত্মীয় আছেন—তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে সহরের দর্শনীয় দেখতে বেরুলুম। এলাহাবাদ বেশ বড় সহর—বড় চমৎকার—নোংরার বালাই নেই। ফোর্ট—ত্রিবেণী সংঙ্গম—খসরু-

বাগ—য়ুনিভার্সিটি হয়ে আনন্দভবনে' যাত্রা করলুম—সেখানে জহরলাল ও স্বরূপরাণীর দর্শন পেলুম—তাঁদের প্রণাম করে অটোগ্রাফের খাতায় তাঁদের নাম উঠিয়ে বাসায় ফিরলুম। তারপর আবার ট্রেন—রাত্রি বারোটায় গয়া ষ্টেসনে নেবে তীর্থপরিক্রমায় সমাপ্তির রেখা টেনে ঘরে ফিরে এলুম।

* * *

দীর্ঘ দুবৎসর পরে এই ইতিহাস লিখ্‌তে গিয়ে আজ কত কথাই না মনে পড়চে! ফাল্গুনের সন্ধ্যার সেদিনের সেই আনন্দ পৌর্ণমাসী অবিছিন্ন কৃষ্ণাতিথির তিমির অবগুণ্ঠনে আজ অবলুপ্ত! ধরিত্রীর অঙ্গনে আনন্দ উৎসবের যে নতুন রাগিণী বেজে উঠেছিল—সে বীণার তার আজ আগমনীর প্রথম সকালেই ছিঁড়ে গেছে। চোখের জলে নেয়ে-উঠা করুণ ক্লান্ত সুরে দূরের মর্ম্মরায়মান চঞ্চল বেনুকুঞ্জ বিস্ময়ে সেদিন স্তব্ধ হয়ে গেল—পেছনের ঝিলের গহন কালো বুকে যেদিন একটি নীল উৎপল গভীর বেদনায় নত হয়ে পড়লো।

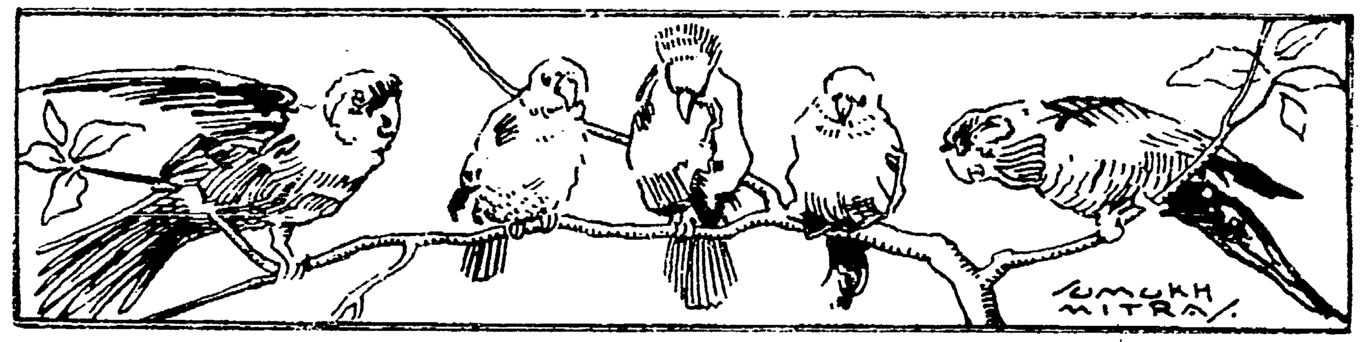

মাকড়সার জালে রহস্যভেদ।

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায়

কথিত আছে, মহম্মদ যখন শত্রুহস্তে নির্য্যাতনভয়ে মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন, সেই সময় শত্রুগণ তাঁহার অনুসরণ করিলে তিনি একটি গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার অল্পক্ষণ পরে একটা মাকড়সা সেই গুহাদ্বারে একখানি জাল বুনিয়া রাখিয়াছিল। মহম্মদের শত্রুরা তাঁহার সন্ধানে সেই গুহায় প্রবেশ করিল; কিন্তু গুহামুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছিল মহম্মদ সেই গুহায় নাই, তিনি গুহায় প্রবেশ করিলে জালখানি অক্ষুণ্ণ থাকিত না। এই ভাবে সেযাত্রা মহম্মদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ভগবান বিশ্বাসী ভক্তকে এইরূপ ভাবে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এ পূর্ব্বকালের কথা; আধুনিক যুগেও পুলিশের কর্ম্মচারীরা মাকড়সার জালের সাহায্যে অনেক গুপ্ত রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়া থাকে। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ইয়র্কসায়ারের কোন গ্রামের একজন লোক স্থানীয় থানায় উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল—

সে একটী ক্লাবের সম্পাদক, ক্লাবের কিছু টাকা তাহার ঘরে ছিল; কিন্তু সেই ঘরে চোর আসিয়া টাকাগুলি চুরী করিয়া চম্পট দিয়াছে।

তাহার অভিযোগ শুনিয়া থানার জমাদার তদন্ত করিতে আসিল। চোর কি উপায়ে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল জিজ্ঞাসা করায় গৃহস্থ একটি জানালা দেখাইয়া দিল। সেই জানালার শার্শি ভাঙ্গিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল মনে করিয়া জমাদার ভাঙ্গা শার্শি পরীক্ষা করিল। সে দেখিল, সেই ভাঙ্গা শার্শি একখানি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালে আবৃত আছে। জমাদার সেই জাল দেখিয়া বুঝিতে পারিল, চোর ভাঙ্গা শার্শির ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে জালখানি ছিঁড়িয়া যাইত; তাহার মনে হইল, চোর তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া টাকাগুলি চুরি করে নাই, গৃহস্থই টাকাগুলি সরাইয়া রাখিয়া থানায় অভিযোগ করিয়াছে: গৃহস্থ নিজেই চোর।

তখন জমাদার গৃহস্থকে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিল; তাহার জেরায় সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। গৃহস্থ স্বীকার করিল আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সে ক্লাবের টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল। তারপর আর কি? তদন্তফলে গৃহস্থই অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া ফৌজদারী সোপরর্দ্দ হইল।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কোন অট্টালিকা হইতে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা মূল্যের জহরত অপহৃত হইয়াছিল। পুলিস রহস্যসূত্র দেখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অবশেষে মাকড়সার জালের সাহায্যেই রহস্যভেদে সমর্থ হইয়াছিল।

কখন কখন মাকড়সার জাল হত্যাপরাধে অভিযুক্ত আসামীর নির্দ্দোষিতা প্রমাণেও সাহায্য করিয়া থাকে; একবার বিলাতের একটা লোক বিষপ্রয়োগে নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। পুলিশ সেই আসামীর ঘর খানাতল্লাস করিয়া সেঁকো (আর্শেনিক) বিষপূর্ণ একটা শিশি দেখিতে পাইল। মৃতব্যক্তির শবব্যবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তার তাহার পাকস্থলীতে সেঁকোবিষ পাইয়াছিলেন। সুতরাং আসামীর ঘরে সেঁকো বিষপূর্ণ শিশি আবিষ্কৃত হওয়া আসামীর বিরুদ্ধে কিরূপ অকাট্য প্রমাণ তাহা তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ।

আর্শেনিকের শিশিটা একটা কুলুঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আসামী তখন হাজতে। আসামীর আত্মীয়েরা পুলিশকে দেখাইল একখানি বৃহৎ মাকড়সার জাল কলুঙ্গী আবৃত করিয়া গৃহকোণ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। পুলিশ এ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, লোকটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার পর মাকড়সা সেখানে জাল বুনিয়াছে। আসামী প্রকৃত অপরাধী।

আদালতে আসামীর পক্ষ হইতে মাকড়সার জালের প্রমাণ অব্যর্থ বলিয়া সেই প্রমাণে নির্ভর করিবার জন্য জজ ও জুরিগণকে অনুরোধ করা হইল ফরিয়াদী পক্ষ হইতে আপত্তি হইল ঐ জাল হত্যাকারার পর নির্ম্মিত হইয়াছিল। আসামীই অপরাধী।

অবশেষে আদালত হইতে একজন প্রাণীতত্ত্ববিদকে সাক্ষী মানা হইল। এই প্রাণীতত্ত্ববিদ মহাশয় বহুকাল হইতে বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সার রীতি, প্রকৃতি, অভ্যাস প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই বিদ্যায় তিনি একজন ওস্তাদ। তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিলেন, সেই জাতীয় মাকড়সার ঐরূপ প্রকাণ্ড জাল বুনিতে দুই দিনের কিছু বেশী সময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণ হইল, পুলিস-তদন্তের একদিন মাত্র পূর্ব্বে সেঁকো বিষ প্রয়োগে লোকটিকে হত্যা করা হইয়াছিল সুতরাং কুলুঙ্গী হইতে বিষের শিশি লইয়া সেই বিষ ব্যবহৃত হয় নাই। আসামীর অনুকূলে অন্য যে সকল প্রমাণ ছিল, ইহাও তাহার আনুসঙ্গিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সেই বেচারা নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে আমরা কত সময় কত উপকার পাই; কিন্তু চক্ষু থাকিতেও আমরা দেখিতে পাই না। আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ।

চলন্তিকা

হিপোপোটেমাসের কাণ্ডঃ

কলিকাতার চিড়িয়াখানায় গোটা পাঁচ-ছয় জলহস্তী বা হিপোপোটেমাস্ আছে তোমরা অনেকেই দেখেছ। এই জলহস্তীগুলোর মধ্যে একটা জলহস্তী ভয়ানক পাজী ও হিংস্র। একদিন এক ভিখিরীর মেয়ে—চিড়িয়াখানায় গিয়ে তার কি খেয়াল হল, সে হাতে ছোলা নিয়ে জলহস্তীদের দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এখন ঐ পাজী জলহস্তীটা পাঁচিলের গায়ে পা তুলে দিয়ে হঠাৎ ঐ মেয়েটির হাত কামড়ে ধরে ফেল্লে—মেয়েটাও পাঁচিলের ওধারে নিজেকে সামলাতে না পেরে একেবারে জলহস্তীটার প্রকাণ্ড মুখের ভেতর গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে জলহস্তীটা তার আধখানা শরীর গিলে ফেলল। আর বাকী দেহটা নিয়ে চারিদিকে লাফা-লাফি করে যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল। হাঁকডাক চেঁচামেচিতে রক্ষীরা এসে পড়ে লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে জলহস্তীটাকে বেদম প্রহার দিতে সে তখন মেয়েটার আধখানা দেহ ফেলে দিলে। বলা বাহুল্য, মেয়েটা জলহস্তীটার মুখের ভেতর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়েছিল। অথচ এইসব জলহস্তীগুলো সাধারণত শাকসবজী প্রিয়; চিড়িয়াখানায় তাদের 'ভুষি' খেতে দেওয়া হয়। এই ধরণের জলহস্তীগুলো নদীতে থাকে, শোনা গিয়েছে মাঝে মাঝে মানুষ গরু পেলে তারা নাকি মুখের স্বাদ বদলাবার জন্য খেয়েও ফেলে। চিড়িয়াখানার এই জল-হস্তীটা একবার কয়েকবছর আগে তার রক্ষীকে মেরে ফেলেছিল। সেদিন আমরা চিড়িয়া-খানায় এই জলহস্তীটাকে দেখতে গিয়েছিলাম—দেখি অত্যন্ত ভালমানুষের মত জলে মুখ ভাসিয়ে পড়ে আছে। তারপর ফিরে আসবার সময় দেখি একটা লোক একটা ছোট ছেলেকে রেলিংএর ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দেখছে। এই রেলিংএর ৫।৬ হাত

নীচেই জলহস্তীর আস্তানা! গিয়ে লোকটাকে খুব বকুনি দিলাম—ছেলেটা যদি হঠাৎ নীচে পড়ে যেত! জলহস্তীদের আর দোষ কি?

বৈজ্ঞানিক সাধুঃ

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি ইউরোপ থেকে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা হিমালয় অভিযানে ভারতবর্ষে আসছেন, হিমালয় চড়াই করে অনেক উঁচুতে উঠে নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে পৃথিবীর বাহবা পাচ্ছেন। কিন্তু কত অজানা সাধু সন্ন্যাসী যোগতপস্যার জন্য হিমালয়ের কত অগম্য জায়গায় গিয়ে থাকেন—তার খোঁজ আমরা রাখিনা! যোগতপস্যা ছাড়া এমনি কত অনুসন্ধিৎসু সাধুসন্ন্যাসী—হিমালয়ের কতদূর চলে যান। এমনি একজন সাধু প্রায় একবছর কাল কৈলাস, মানসসরোবর ও হিমালয়ের আরও উপরে ও অভ্যন্তরে কাটিয়ে সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরেছেন। এই সাধুটির নাম—স্বামী প্রণবানন্দজী। প্রণবানন্দজী নিছক ভ্রমণ করেই আসেননি, তিনি গঙ্গোত্রি ছাড়িয়ে গঙ্গানদী ধরে তার উৎপত্তিস্থল গৌমুখীতে পৌঁছান। ১৯৩৬ সালে মানস সরোবরে তিনি একবৎসর কাটান এবং সরোবরটির চতুর্দ্দিকে নানা পর্য্যবেক্ষণ করেন। তারপর তিনি ব্রহ্মপুত্র, কর্ণালি ও শতদ্রু নদনদীগুলির উৎপত্তিস্থল পরীক্ষা করে আসেন। সুইডেনএর এক ভৌগলিক ডাঃ হেডিন্ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণালি ও শতদ্রুর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করে তার বর্ণনা করেছিলেন। প্রণবানন্দজী ডাঃ হেডিনের পর্য্যবেক্ষণ ভুল প্রমাণ করেছেন। আর্য্যঋষিরা গৌমুখীকেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থল বলে বর্ণনা করেছিলেন—স্বামীজি তা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই আশ্চর্য্য অভিযানগুলি সম্পর্কে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি পুস্তক লিখছেন—পুস্তকটির নাম—তিব্বতে অভিযান। স্বামী প্রণবানন্দজী অন্ধ্রদেশের লোক, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি একজন গ্রাজুয়েট। সার্ভে অব ইণ্ডিয়া তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ ও গবেষণার জন্য তাঁকে—"পবিত্র কৈলাস ও মানস-সরোবরের" স্বামী প্রণবানন্দজী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বিখ্যাত ভৌগলিক মিঃ লঙ্ষ্টাফ্ স্বামীজির গবেষণার ফলাফলে তাঁরও নিজের মতের সম্পূর্ণ মিল জানিয়েছেন।

বালক দালাই লামাঃ

তিব্বতের শাসনকর্ত্তা ও লামাদের ভাগ্য বিধাতা হলেন—বুদ্ধের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি পরম-গুরু দালাই লামা। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দালাই লামা দেহরক্ষা করেন। তখন থেকেই অর্থাৎ আজ পাঁচবছর যাবৎ নতুন দালাই লামার অনুসন্ধান চল্‌তে থাকে। তিব্বত, চীন ও ইংলণ্ড এ তিনটি দেশ নিজেদের মনের মত দালাই লামার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। তিব্বতের

৬

নিয়ম—যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান দালাইলামা দেহরক্ষা করবেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিব্বতে লামাদের
ঘরে যে সব সন্তান জন্ম নেন তাদের অনুসন্ধান করা হবে। দীর্ঘ পাঁচবছর অনুসন্ধানের ফলে
তিনটি পাঁচ বছরের লামা বালককে পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতের রাজধানী লামাতে এই
তিনটি বালককে নিয়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে। আর তার দ্বারা সমস্ত তিব্বতের ভাগ্য
গণনা হয়ে যাবে। লটারীর দ্বারা স্থির হবে—কে হবে নতুন চতুর্দ্দশ দালাই লামা, রহস্যময়
তিব্বতের ভবিষ্যৎ বিধাতা পুরুষ! একটি সোনার ঘড়াতে তিনটি কাগজে চীন ও তিব্বতী
অক্ষরে ঐ তিনটি লামা-বালকের নাম লিখে রাখা হবে—প্রথমে যে কাগজটি উঠবে—সেই
কাগজে যার নাম থাকবে সেই হবে দালাই লামা—তিব্বতের জীবন্ত বুদ্ধ এর চেয়ে আশ্চর্য্য
লটারী আর পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ! কিন্তু প্রাচীনকালে ঠিক এমনি লটারী করে দালাই
লামা নির্ব্বাচন হত না। তিব্বতীদের বিশ্বাস—পুরাকালে বালক লামাদের নাম লোহার
ফলকে খোদাই করে কোন সরোবরে নিক্ষেপ করা হত—তারপর তিব্বতী সাধুরা দেখতে
পেতেন ভগবানের আদেশে একটিমাত্র ফলক সরোবরের বুকে ভেসে উঠেছে। সেই ফলকে
যে ভাগ্যবান লামা বালকের নাম খোদাই আছে তিব্বতী সাধুরা তাকেই করতেন দালাই-
লামা। দেড়শ বছর আগে এক চীন সম্রাট সোনার ঘড়ায় কাগজে নাম লিখে লটারীর বিধি
আবিষ্কার করেন। আজ পর্য্যন্ত সেই নিয়মই চলে আসছে।

কলিকাতায় ফুটবল ঃ

মহাসমারোহে কলিকাতার চিরপরিচিত জনপ্রিয় লীগ ফুটবল খেলাগুলি আরম্ভ
হয়েছে। এবার লীগ খেলায় বাংলার বাইরের খেলোয়াড়রা আর যোগ দিতে পারবেন না।
প্রতিবার এই নিয়ে অনেক গণ্ডগোল অনেক বচসা হয়েছে—আর কলিকাতার ফুটবল দলগুলির
মধ্যে এত বেশী বিদেশী খেলোয়াড়ের আমদানি হয়েছে যে তাতে কলিকাতার ফুটবল লীগকে
অল্-ইণ্ডিয়া ফুটবল লীগ বলিলেও বেশ চলত। ফলে হতো কি বাংলার খেলোয়াড়রা তাদের
নিজেদের দলে জায়গা পেত না—প্রতিযোগিতা এত বেড়ে উঠেছিল। শুধু তা নয়—বিদেশী
খেলোয়ারদের রীতিমত টাকা দিয়ে আনতে হোত ও আনা হয়েছে। একদল ভেঙ্গে আর
একদলে টাকার লোভে খেলোয়াড়রা এসে ঢুকেছে। এবারের নতুন নিয়মে আর সেটি
হবার জো নেই। অন্যবারের মত এবার মহমেডান্ স্পোর্টিং তেমন বিজয়ীর মত আরম্ভ
করতে পারেনি। এখনও তেমন ভাল খেলা এদল দেখাতে পারছে না। এবার মোহন
বাগান কিন্তু নতুন ভাবে খেলা আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ প্রতিবার গোড়াতে মোহন বাগান
'ড্র' করতে সুরু করে, এবার তার গতানুগতিক আলস্যভাবটা যেন কেটেছে বলে মনে

হয়। এখন পর্য্যন্ত মোহন বাগান লীগের প্রথম হয়ে আছে। খেটে মন দিয়ে যদি
মোহনবাগান খেলে যেতে পারে তাহলে হয়ত মোহনবাগান তার নষ্ট গৌরব ফিরে
পেতে পারে। তবে এখনও অনেক বাকি। মহমেডান্ যাচ্ছে দ্বিতীয়, আর তৃতীয় ও
চতুর্থ যাচ্ছে রেঞ্জার্স ইষ্ট বেঙ্গল। এবারকার গোরার দলগুলি একেবারে সুবিধের নয়। ভাল
গোরার দল না থাক্লে কলকাতার লীগখেলা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না। এবারও ইণ্ডিয়ান
দলই লীগ নেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ডিক্টেটরদের ভাব ঃ

মধ্য ইউরোপে ডিক্টেটরদের আজ একচ্ছত্র রাজত্ব। হিটলার ও মুসোলিনী দুজনে
আন্তরিক (?) বন্ধুত্বে আজ সমস্ত ইউরোপ নিতে বুঝি ব্যস্ত। হিটলার আর মুসোলিনী—
অচ্ছেদ্য বন্ধনে এরা বন্ধু! এক একটি দেশ তারা জয় করছে আর দুজনার কোলাকুলি।
তাদের মতের মিল দেখে সমস্ত পৃথিবী ভীত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেশীদিন আগে নয়—
১৯১৫ সালে মুসোলিনী ইটালীর এক খবরের কাগজে (Popolod Italia) কি লিখেছিলেন
তা পড়ে আমরা হেসে বাঁচিনা। সেই খবরের কাগজে লেখা ছিল ঃ "ইটালীর কর্ত্তব্য
জার্ম্মাণীকে একটি মরণ-কামড় লাগান এবং ইউরোপকে প্রাসিয়ান গোঁয়ার্ত্তুমি থেকে মুক্ত
করা। এই মরণ-কামড়টির উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য ইটালীকে তার দেড়কোটি সৈন্যকে
শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা সঙীন্ উঁচিয়ে নির্দ্দয়ভাবে যুদ্ধ করতে পারে"—হিটলার ও
মুসোলিনীর আন্তরিক বন্ধুত্বের এটা ভূমিকামাত্র! আসল কথা ডিকটেটররা কখনও মিলতে
পারে না—তারা প্রত্যেকেই স্বপ্ন দেখে—একমাত্র সেই ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীর শাসক হবে।
বাকি সমস্ত পৃথিবী তার লৌহদণ্ডে শাসিত হবে। এই লৌহদণ্ডের সারমর্ম্ম আজ জার্ম্মাণী ও
ইটালী মিতালী করে তাদের দেশের ছেলেদের শেখাচ্ছে। এই সম্পর্কে নাৎসী স্কুলগুলিতে
কি ধরণের অঙ্ক দেওয়া হয় তা শোন। প্রশ্নটি এই ঃ ৪৫ টা বোমার এরোপ্লেন বোমা ফেলতে
সুরু করলে, প্রত্যেক বোমার ওজন ১॥ কিলোগ্রাম্; সমস্ত বোমাগুলির মোট ভার কত?
এবং যদি বোমাগুলির এক-তৃতীয়াংশ যথার্থ জায়গায় পড়ে ও তার শতকরা বিশটা অগ্নিসংযোগ
করে—তাহলে সবশুদ্ধ কতগুলি অগ্নিসংযোগ করা হল? শোনা গিয়েছে নাৎসী ছেলেরা
খুব উৎসাহের সঙ্গে অঙ্ক কষে তার উত্তর বার করেছে। কিন্তু কেউ কেউ নিশ্চয় কান্নাকাটি
করেছে—অঙ্কর বহর দেখে নয়, অন্য কারণে। এই দুইদল ছেলেদের কোন্ দল পৃথিবীতে
শান্তি আনতে পারবে!

———

শ্রীইন্দিরা দেবী

পরম স্নেহের ছোট্ট বোনেরা আমার !

তোমাদের অনেকের চিঠি আমি পেয়েছি ভাই, সকলের নাম করতে না পারার জন্য রাগ করোনা। গতবারের কথা এবারে দেখি সফল হলো, এমাসেও তোমাদের সঙ্গে মিলবার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দিত হচ্ছি।

রহিমা খাতুন বোনটী, দিদিভাইএর চিঠির মারফত ইন্দিরাদির জন্য যে একটী কীল পাঠিয়েছ তা আমি গ্রহণ করলাম কিন্তু ইন্দিরাদির জন্য এ ব্যবস্থা কেন বলোতো ভাই ? ব্যাঙের জ্বালা যতই হোক না কেন তোমাদের তাড়ায় সম্পাদক মশাই এ পাতাটা ছেড়ে দিয়েছেন। আর আড়ি করোনা ভাই তাহলে আবার ব্যাঙ এসে জায়গা জুড়বে।

আজ আমার সেলাই শেখাবার কথা—তাই সেলাইএর বাস্কর ঢাকা খুলেই মনে হচ্ছে কি ভুলটাই গত মাসে হয়ে গেছে, সেটা কি জানো ? তোমরা কি কি সেলাই জানো আর না জানো সেটা আমি তো ঠিক জানিনা ভাই, তাই আমার ইচ্ছা তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের অভিমত পাঠাও আমি তাই থেকে একটা একটা করে তোমাদের বলবো কিন্তু এখনই একটা কথা বলে রাখি—যেটা যখন সুবিধা হবে সেটা দেবো, তোমরা কেউ রাগ করতে পারবেনা যে আমার পরে হলো বলে—কেমন ? আমার লক্ষ্মী বোনেরা নিশ্চয় কথা শুনবে কি বল ?

আজ আমি তোমাদের যে সেলাইএর কথা বলছি—এ হয়তো তোমরা কেউ কেউ জানো আবার কেউ কেউ জানোনা—যখন তোমাদের মতামত পাবো তখন আমার আর এ ভাবনা থাকবে না।

যাক এখন এসো বসি সকলে, প্রথমে দেখো কতগুলি জিনিষ চাই তারপর কাজ আরম্ভ করা হবে।

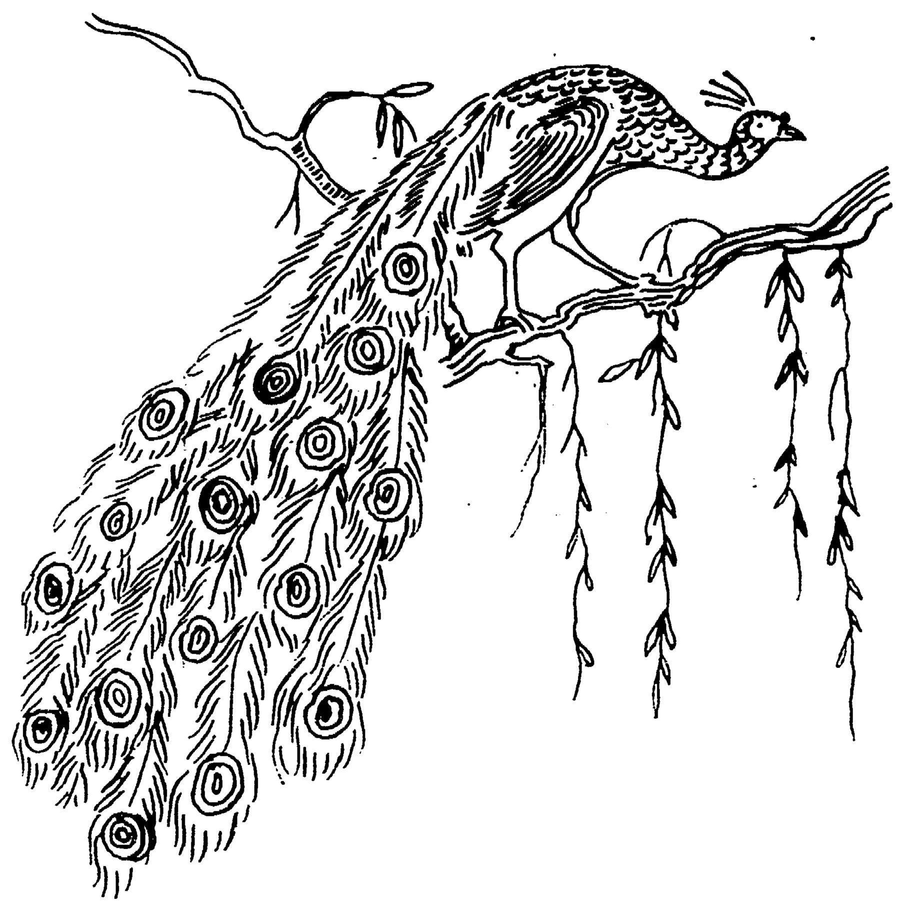

আজ একটা সল্মার ময়ুর তৈরী করা যাক, তাহলে কি কি জিনিষ চাই দেখে নাও— সল্মা (রূপালী), চুমকি (সাদা, লাল, নীল), পুঁথি (সাদা), খয়েরী রেশম, জরীর সুতো (রূপালী), ভেলভেট কালো বা আসমানী রংএর।

প্রথমে ভেলভেটএর উপর হলদে কার্ব্বন দিয়ে ময়ুর এঁকে নাও। ছোট ছোট করে সল্মা কেটে নিয়ে ওর সমস্ত শরীর (গলা মুখ থেকে লেজের গোড়া পর্য্যন্ত) ভরাট করে বসিয়ে নাও, ডানার ফাঁকগুলোয় একটু একটু করে খয়েরী রেশম দাও। ছোট ছোট সল্মা কেটে কোনাকুনী বসিয়ে লেজ করতে হবে, অর্থাৎ একটা সল্মা সোজা যাবে আর তার তু'দিক দিয়ে তু'টো ছোটো সল্মা ওপর জোড়া, নীচে ফাঁক—এই ভাবে বসাও তারপর ঐ লেজের উপর একটা করে সাদা চুমকি বসিয়ে তারপর মানানসই করে কোনটায় লাল ও কোনটায় নীল চুমকি বসিয়ে যাও। চুমকির মুখে পুঁথি দিতে হবে। পা তৈরী হবে খয়েরী সুতো, ঝুঁটি রূপালী জরীর সুতায় চেন সেলাই করে উপর দিকে একটা করে চুমকি বসাও। চোখে একটা লাল পুঁথি দিতে হবে।

তোমরা ঠিক মত করতে পারলে কিনা জানিও। ময়ূর যা আঁকা রইল ইচ্ছামত ছোট বড় করা চলবে। সকলে ভালবাসা নিও।

— —

তোমরা সকালে চা না খেলেও চা তৈরী ও খাওয়া নিশ্চয়ই দেখেছ। কিন্তু তিব্বতে গেলে চোখ কপালে উঠে যাবে; পাতা চা নয়, গুঁড়ো চা ও না, চায়ের তৈরী এক একখানি এয়া বড় বড় থান ইট। সত্যি বলছি

বাড়ীতে অতিথি এসেছে। গোল হয়ে বসলো। গৃহস্থ এক ডেক্‌চি গরমজলে চায়ের থান ইটের আধখানা ভেঙ্গে ফেলে দিল। অতিথিরা ঝোলা জামার বুকের থেকে বার করলো নিজের নিজের বাটি। গৃহস্থ হাতা করে প্রত্যেকের বাটিতে চা দিল, একটু করে নুন দিল, আর কি দিল জান ?—একএক ডেলা শুকনো চর্ব্বি ! তারপর আবার কি ? এক এক চুমুক, আর—আঃ !

*　　*　　*　　*　　*

জামাকাপড়ের দোকানের সামনে দেখা যায় ঠিক মানুষের মত বড় পুতুলকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সকল দেশেই আছে। বিশ্বাস করবে যদি বলি ইউরোপে অনেক দোকানে সত্যিকারের মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে অমনি সেজে ? একদল মানুষের ঐ চাকরী। চুপ্ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, বেশ কয়েক ঘণ্টা। নড়বে না চড়বে না, লোকের সামনে চোখের পাতা পড়বে না—নিঃশ্বাসের জন্য বুকের উঠা-নামা পর্য্যন্ত কেউ যেন না ধরতে পারে !

অনেক কষ্ট করে এরা শেখে, আর শেখবার সময় নানা রকমের ভীষণ পরীক্ষা চলে। যেমন ধর, দেশলাইয়ের কাটি জ্বেলে চোখের খুব কাছে ধরা হ'ল—চোখের পাতা পড়বে না কিন্তু ! পাতা ত ভাল কথা তোমাদের হু হু করে জলই পড়ে যাবে—না ?

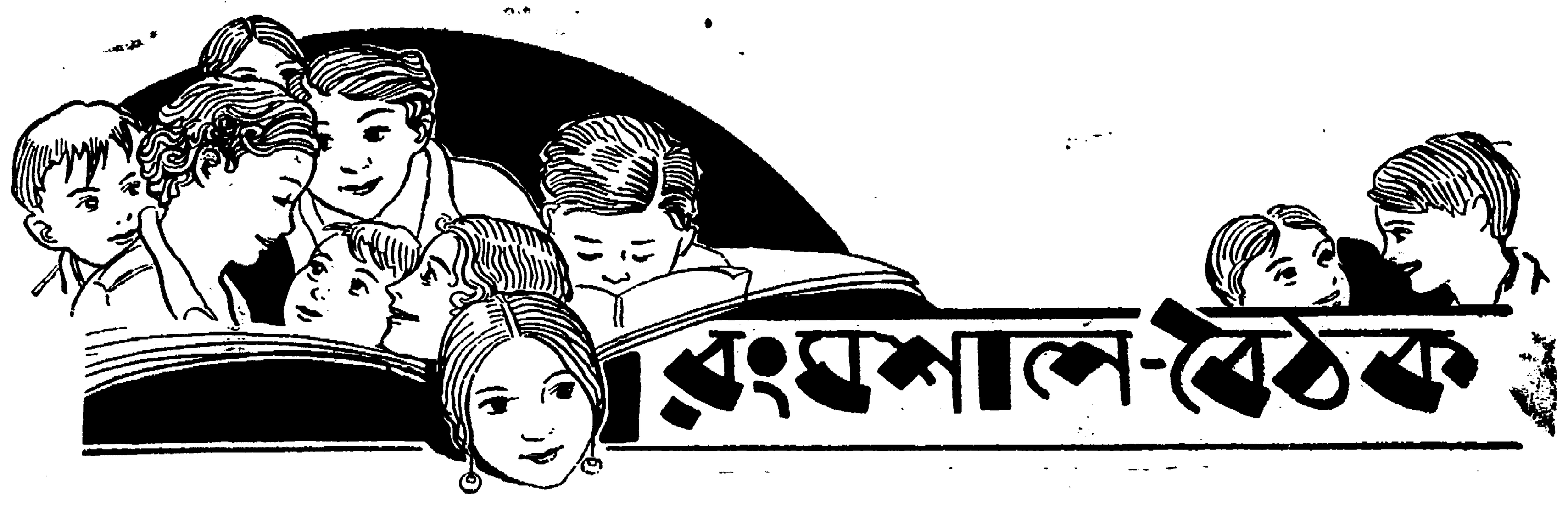

গ্রাহক নং ৪০৮

সাড়া

কুমারী শিবানী সরকার

বুঝি আসে ঐ বুঝি সে আসে,
মাতন জেগেছে তাই বাতাসে।
ছিল,　　তৃষার্ত্ত যত তরুলতা
জাগে,　　পাতায় পাতায় শ্যামলতা ;
ঐ আসে বুঝি ঝড় আসে,
সাড়া তার পেয়েছি আকাশে।

এল এল বৃষ্টি যে এলরে
সঙ্কোচ ফেল দূরে ফেলরে
খোল্ খোল্ খুলে ফেল্ দ্বার,
ওর কাছে মানিস্‌নে হার
হবে আজ প্রলয় সাধন,
ছিঁড়ে ফেল ঘরের বাঁধন।

আসুক আসুক জোরে বৃষ্টি,
লোপ পেয়ে যাক যত সৃষ্টি,
নিয়ে বিধাতার অভিশাপ
যুগ যুগ ধরি যত পাপ
জমে আছে আদিকাল হ'তে
ভেসে যাক বন্যার স্রোতে ।

বুঝি আসে, বুঝি আসে, সে আসে
পেয়েছি পায়ের ধ্বনি আকাশে ;
গুরু গুরু ধ্বনি বাজে বক্ষে
শ্যাম অঞ্জন লাগে চক্ষে
ঐ বুঝি আসে ঝড় আসে
সাড়া তার পেয়েছি বাতাসে ।

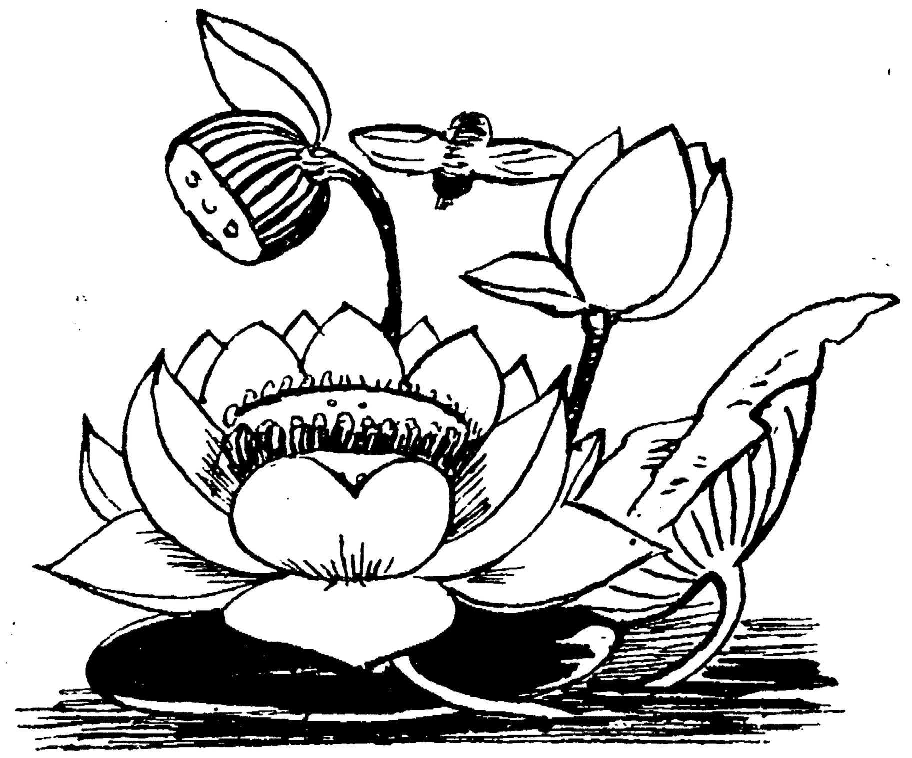

পরিচালিকা—দিদিভাই

সোনার ভাই বোনেরা !

কাল বৈশাখীর ঝড়ো পথ বেয়ে এলো আর একটা মাস ! প্রচণ্ড রোদে সমস্ত পৃথিবীর মাটি তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে উঠেছে—সকলের তৃষ্ণা যে দূর করবে তারই অগ্রদূত হয়ে এলো কি জ্যৈষ্ঠ ? পৃথিবীর মাটি কাতর হয়ে চাইছে ভিজে এলো মেলো বাতাস আর তৃষ্ণার জল !

আমি কিন্তু তোমাদের মিষ্টি চিঠিগুলোর ভেতর ভিজে বাতাসের আর্দ্রতা পাচ্ছি । তোমাদের চিঠিগুলোয় আছে মেঘ আর জলের আভাষ আর ভিজে বাতাসের সুন্দর মুখস্পর্শ ।

শিবানী সিংহ (কলিকাতা)

এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কেন বলতো বোনটী ? তোমাদের গ্রাহক নম্বর আর ঠিকানা ভাই প্রত্যেক চিঠিতে তোমরা লিখো—নাহলে এত ঠিকানা আর গ্রাহক নম্বর তো আমার সব ঠিক ঠিক মনে রাখা সম্ভব নয় । রংমশালের টাকা আমার নামে নয় ভাই—যে নামে বরাবর দিয়েছ ঐ নামেই পাঠিও । ...কুলরা সব অবসর কেড়ে নিয়েছে এরমত আনন্দের কথা আর কি আছে ভাই, ওরা যখন বড় হবে তোমার কত গৌরব বাড়বে বলতো বোন ? হাতের লেখার জন্য তোমার সম্বন্ধী-মশাই (?) তোমায় ... ঠাট্টা করেন সেটা কেন করেন জানো তো ? খুব বেশী ভাল বলে ।

মাণিক (ভবানীপুর) ৮৬৯

গ্রীষ্মের ছুটিতে কি করবে তার লিষ্টি তোমার বাড়ীতে পৌছবে ভাই ।

মাণিকের দাদা (ভবানীপুর) ৮৬৯

নাম নেই কেন ? প্রথম চিঠি এতদিন পরে বুঝি ? যা বলেছ তা আমি জানাবো ।

অরুণ বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা) ৮২৩

প্রীতি সম্মিলনী হলেই খবর পাবে ভাই। টিকিট ঘরের কি হলো জানতে চেয়েছ? টিকিট ঘরের লেখকের দেখা পাচ্ছিনা—তবে শীঘ্রই দেখা পাওয়া যাবে আশা আছে, সুতরাং নিরাশ হয়ো না।

রেবা গাঙ্গুলী (Lhaksar) ৪৭৮

তুমি যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাবো। তোমার লেখায় একটি ভুল হয়েছে ভাই, দেশের নামটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। বড় হাতের L হবে—জানো? চিঠির বাক্সর পাতা বাড়ান সম্বন্ধে বলবো। টুলুকেও চিঠি লিখতে বলো। রাগ করোনা যেন ভুলের কথা বলায়—দিদি ভাইকে বলতে হয় সব জানো?

কমলা দাস (শিলং) ৫৮১

বাণীসেন খালি চিঠি লিখেছে সন্দেশ দেয়নি—এ বড় অন্যায় কথা, তোমরা লেখনি কেন? এদিকে বাণী আমায় চিঠি লিখেছে সমস্ত ভাই বোন ও দিদিভাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে—কিন্তু করে কোথায় বা কেমন করে তা আমায় লেখেনি। ব্যাজের টাকা ও কুপন তাড়াতাড়ি পাঠিও নাহলে ফুরিয়ে গেলে আবার দেরী হয়ে যাবে। ওখানকার সম্বন্ধে যা লিখেছ ছোট্ট করে লিখে পাঠিও।

বাণীসেন (পাটনা)

রংমশালে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে লিখেছ—কিন্তু ষড়যন্ত্র কই বলোতো? বেশ লোকতো, নিমন্ত্রণ বুঝি অমনি কোরে করে? দিদিভাইকে সন্দেশ তো ডাকে ও পাঠান যায়! এই মন্তব্য কে করেছেন জানো? তোমাদের পরিচালক মশাই। তোমাদের 'নীল কণ্ঠ পাখী' সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে জেনে খুব সুখী হলাম—কিন্তু আমাদের তো যেতে বলনি—সুতরাং চোখে দেখা হলো না। সকলে ভাল আছ তো?

কামাখ্যা চন্দ্র বল (বেণারস) ৮০৩

তোমার রংমশাল এবার থেকে কাশীতেই যাবে ভাই! ঠিকানার বড় গণ্ডগোল হয়েছে—আবার পাঠাচ্ছি। কোন্ কোন্ ঠিকানা চেয়েছ!

সুনীলকুমার দত্ত (দার্জ্জিলিং)

এজেন্টের কাছে থেকে নিলে প্রতিযোগীতায় চিঠির বাক্সে যোগ দেওয়া যায়—কিন্তু তাঁদের অর্থাৎ এজেন্টের কাছে থেকে একটা চিঠি দিও যে তোমরা তাঁর কাছ থেকে বরাবর বই নাও, কিন্তু এসব অসুবিধা ভোগ করবার চেয়ে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা। 'অমরলতার' দ্বিতীয় খণ্ড তৈরী হচ্ছে। রাগের কথা কেন লেখ ভাই, রাগ তোমাদের ওপর করিনা।

রহিমাখাতুন (ষোলঘর) ৭৭৭

অভিমান কেন বোনটি? সকলের নাম করবার মত জায়গা পাইনা তো, তাই বলে তোমরা বলবে ভুলে গেছি! তোমার চিঠি ইন্দিরাদিকে দিয়েছি। কল্পনা অঞ্জলিকে নীরব ভালবাসা জানিয়েছ, সেটা জানলাম। তোমার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলাম ভাই। ২১শে বৈশাখ তোমার জন্মদিনে আমার আশীষ তোমায় জানিয়েছি ভাই।

বাণী (নাগপুর)

তুমি একটা আস্ত পাগল! তোমার যা করতে ইচ্ছা করে—আমারও তাই পেতে ইচ্ছা করে বুঝেছ! তোমার আশা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। যে ধাঁধাটী পাঠিয়েছ ভারী সুন্দর হয়েছে, ওটা আমি কিন্তু কি করে দিই ভাই বলো! যা পাঠাবে বলেছ শীঘ্র পাঠিও. খুকুর কি খবর?

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) ১০৬৬

তোমার নববর্ষের শুভেচ্ছা পেয়েছি ভাই। জামসেদপুরে কোনও গ্রাহক আছে কিনা মনে পড়ছেনা। মনে হচ্ছে আছে, ঠিক সংবাদ পরে জানাবো। অষ্টম শ্রেণীর ছেলের উপযোগী কতকগুলি বই এর নাম চেয়েছ—পাঠিয়ে দেবো। আর যা জানতে চেয়েছ তাও জানাবো।

শান্তিলতা বসু মল্লিক (সাঁত্রাগাছি) ৭৩৫

যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাচ্ছি। দু'পয়সার ডাক টিকিট রংমশাল আফিসে পাঠালে ঐ পাতা দু'খানি পাওয়া যাবে ভাই।

অমিয় (শ্রীরামপুর) ১১৮৬

অমু! তোমার আগের চিঠি তো পাইনি ভাই। উত্তর দেবার তো কিছু নিয়ম নেই ভাই, যতটা ধরবে যাবে। ফটো প্রতিযোগিতার কথা বলেছ, সে প্রতিযোগীতা বিভাগে ছাপানো হবে। চাঁদার টাকা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই পাঠাতে হবে না হলে ভিঃ পি যাবার নিয়ম নাই—সেদিকে একটু লক্ষ্য রেখো। চিঠির ওপরে ঠিকানা থাকে না কেন?

হৃষিকেশ দে (শ্রীহট্ট) ৭৫৩

তোমার কথাগুলো কিন্তু সব ঠিক নয় জানো! যা লিখেছ সেটা তোমার অন্য ভাইবোনদের মত কিনা আমি জেনে নেবো। ঔদাসীন্যের কথাই আসেনা, দিদিভাইকে সত্যি ভালবাসলে এ কথা বলতে না। তোমরা এতগুলি ভাইবোন—সবার নাম করা সম্ভব হয় কি সব সময়?

লেখার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কর্ত্তৃপক্ষ থেকে এই উত্তর পেয়েছি 'লেখা আরও ভাল হওয়া দরকার' এ বিষয়ে আমার হাত কিছু নেই—আর পক্ষপাতিত্ব তোমাদের দিদিভাই করে না।

তারারাণী মুখার্জ্জি (আলমোড়া) ৭৮৭

তবুও বোনটী তোমার ঠিকানা নেই। আমি প্রতিবার প্রত্যেক ভাই বোনকে বলেও আশানুরূপ ফল পাচ্ছিনা এ বড় দুঃখের কথা। তোমার গল্পের খবর যথাসময়ে পাবে। তোমার হাতের লেখা ভালই—বড় হলে আরও ভাল হবে। ভাই বোন নেই বলে দুঃখ করবার কিছু নেই তো ভাই. রংমশাল তোমায় কত ভাইবোন দিয়েছে দেখ। তোমার কি অসুখ হয়েছে ভাই? আর কতদিন পরে কোলকাতায় ফিরবে?

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) ৬৭০

ব্যাজ এর জন্য টাকা পাঠিয়ে ব্যাজ পাওনি একথা আমি সম্পাদক মহাশয়কে জানিয়েছি।

গৌরাঙ্গ রায়ের ঠিকানা একটু ভুল হয়ে গেছে, শীঘ্র যাচ্ছে।

মৃগাঙ্ক গ্রাঃ ১১৪১

ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়বার মত বইএর লিষ্টি চেয়েছ, পাঠালাম। ঠিকানাও পাঠাচ্ছি।

শেখর সেন ও আরতি সেন (ভবানীপুর) ৯৫১

শেখর! তোমার রচনা প্রতিযোগিতার কথা মনে থাকলো, যথাসময়ে জানিও।

আরতি বোনটী! অলকার ঠিকানা তোমায় পাঠাবো। শিবানী সিংহ তোমার দিদি হয়—সুতরাং চিঠি লিখলে সে নিশ্চয় চিঠি লিখবে জেনো।

দ্বিজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুন)

* রংমশাল সম্বন্ধে তোমাদের দুই একজনের অভিযোগ শুনলাম বা শুনেছি, আমি গতবারে বলেছি তোমরা নিশ্চয় পাতা গুণে বই এর বিচার করোনা,—পাতা গুণে বই এর বিচার করলে অভিধান সব চেয়ে বড় সাহিত্য হয়। আর বিদেশী গল্পর কথা বলেছ—কিন্তু এও মাঝে মাঝে দরকার। ক্রমশঃ প্রকাশিত বই এর নাম যা লিখেছ তা একটা শেষ হয়েছে ও একটা প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিকুণ্ডু (শান্তিনিকেতন)১১৮৯

তোমার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করে রেখেছি ভাই—সুবিধা হলেই হবে। শরীর এখন সুস্থ হয়েছে তোমার?

সুধীর (কালীঘাট) ১১৫৯

তোমার আগের চিঠি আমি তো পাইনি ভাই. তাহলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম ভাই, রাগ করোনা।

শিলা মিত্র (গৌহাটী) ৪৫৪

নতুন বছরে তোমার নতুন চিঠি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম। আমি তোমার লেখনী বন্ধু! বেশ মজা তো ভাই!

শ্রীলেখা বসু, দিলীপ ব্যানার্জ্জি, রথীশ চন্দ্র ঘোষ! তোমাদের তো উত্তর দেবার কিছু নেই—যা চেয়েছ যাবে।

সবিতা মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)

দলে ভর্ত্তি হবে বলেছ সে তো ভাল কথা—নিয়মগুলো জানো তো?

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা)

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগলো। নতুন কথা শুনতে চেয়েছ কিন্তু সবই পুরাণো, শুধু নতুনের রূপ নিয়ে আসে। ভাইবোন আমার বেশী হলেও আমি কাউকে পৃথক করিনা বা ভুলে যাই না। তবে সময় সময় রংমশালদলের নিয়মের ব্যতিক্রম হলে ক্ষুব্ধ হই ভাই। যে আদর্শ বুকে করে চলেছ, প্রিয়জনদের শুভস্পর্শে একদিন তা সার্থক হয়ে উঠবে—এই আমার নতুন কথা ভাই। অরুণের খবর কি? তার রাগ কি এখনও যায়নি? দিদিভাই ও তার ভাই বোনদের কথা বলো তাকে।

তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা নিও।

শুভার্থিনী
তোমাদের
দিদিভাই

* নানা কারণে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য রংমশালের কিছু পাতা কমানো হয়েছে। গ্রাহক গ্রাহিকাদের এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হবার কারণ দেখি না। কেননা চার আনার কোনো পত্রিকা রংমশালের মত এত পাতা ও এত বড় পাতা দেয় না। রংমশাল এখনও চার আনা দামের সব চেয়ে বড় পত্রিকা—প্রকাশক, রংমশাল।

পুস্তক নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার ফলাফল

নিম্নলিখিত পঁচিশখানি বই রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকাদের মতে ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে ভালো বই : (বর্ণানুক্রমিক)

আবোল তাবোল, আবার যখের ধন, আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ, আরব্য উপন্যাস, কলকাতার হালচাল, কুহকের দেশে, কে কি কেন কবে কোথায়, ঠাকুরমার ঝুলি, দুইখুনী, চিত্রগ্রীব, পৃথিবীর উপন্যাস, পৃথিবীর রূপকথা, পাতালে পাঁচবছর, পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ, বাড়ী থেকে পালিয়ে, মহাভারত, যখের ধন, রামায়ণ, রামের সুমতি, রাজকাহিনী, লালকুঠী, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর, সে, শনিবারের বিকেল।

ওপরের এই বইগুলি গ্রাহকগ্রাহিকাদের ভোট দিয়ে বাছাই-করা হয়েছে। বাছাই-করা এই লিষ্ট যা হয়েছে এর সঙ্গে সবচেয়ে মিল হয়েছে :

প্রথম। মণিমালা মজুমদার (গ্রাঃ নং ৫৭৭)

দ্বিতীয়। শতদল দাস (গ্রাঃ নং ৯৭৭)

পঞ্চানন রুই (গ্রাঃ ১১৬৩)

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাদের লিষ্ট ওপরের বইএর লিষ্টের কাছাকাছি হয়েছে :—

রেখাদাস গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার রক্ষিত, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেখা বসু, সুনন্দা দে, মাষ্টার মণ্টু, শক্তিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী, রেবাদাস গুপ্ত।

আমাদের লাইব্রেরী

ভালুকের দেশে : ছোটদের যুক্তাক্ষরবর্জিত বই : নরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত : বুক কোম্পানি লিমিটেড প্রকাশিত : মূল্য ছয় আনা মাত্র।

যুক্তাক্ষর বাদ দিয়ে ছোটদের জন্য আজকাল এরকম দু'চারখানা বই লেখা হচ্ছে। প্রায় লেখকই যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়াটাই একটা অসামান্য কৃতিত্ব বলে মনে করেন। যুক্তাক্ষর বাদ দিতে গিয়ে তাঁরা প্লটের দিকে ফিরে তাকান না। ফলে যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত বইয়ে প্লটও থাকে না, গল্পও থাকেনা। আলোচ্য বইখানা এ শ্রেণীর নয়। এ বইয়ে গল্প আছে এবং এ গল্প ছোটদের দরবারে নামঞ্জুর হবে না।

বইয়ের ছবি ছাপা ও বাঁধাই ভালো, তবে এ বিষয়ে প্রকাশক কোনো নূতনত্বের পরিচয় দিতে যাননি। আমাদের দেশে আজকাল যখন নূতন ভালো ভালো বই লেখা হচ্ছে, তখন ছবি ছাপার ব্যাপারটাতেও 'নতুন কিছু করো' ধুয়োটা ধরা মন্দ নয়।

ছন্দ-বেণু :—ছোটদের কবিতার বই : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীমৃণালকুমার বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ প্রকাশিত। দাম ছ'আনা মাত্র।

ছেলেদের লেখার প্রথম প্রচেষ্টায় তাঁদের উৎসাহ দিতেই হয়। এই কবিতার বইটি তিনটি কিশোর বন্ধুর প্রথম প্রচেষ্টা। ছেলেমেয়েদের সাহিত্যে আমাদের দেশে কবিতার বই খুব বেশী নয়। কবিতা লেখা কবিতা পড়া আমাদের দেশ থেকে আজকাল যেন উঠে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের উপযোগী খুব চমৎকার কবিতার বই আমাদের কোথায়? 'ছন্দ-বেণু' লেখকদের প্রথম বই হলেও তাঁরা শিশুমহলে আদর পাবেন। সবশুদ্ধ ৩০টি ছোটবড় কবিতা আছে। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা ভারী সুন্দর হয়েছে। ছাপা বাঁধাই দামের পক্ষে ভালই বলতে হয়।

গত মাসের

ধাঁধাঁর উত্তর

আমার কাকা ও মামা কালা। রোজ গলা ফাটা চীৎকার না করিলে কিছু বলা দায়। আজ বুধবার; কাকা জামা মোজা পরিয়া, সাজ করিয়া কাজ-স্থলে যাইবেন শোনা যাইতেছে। কাকার মালি রোখ্ চড়াইয়া কান্না ধরিয়াছে, সাজ করিয়া গা, গলাএ শাল জড়াইয়া সেও কাজ স্থলে যাইবে। কাকাকে সাধা ও বলাই মালির সার! কাকা কহিলেন: "গোল থামা! কান্না ধামা ঢাকা থাকা ভাল।"

উত্তর দাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম :—

মাষ্টার ধীরেন ও অরুণ, ভবানীপুর। কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, নাগপুর। শোভা, সন্ধ্যা, সবিতা, কিরণ ও অরুণ শীল, শ্যামবাজার। অশোক, ন'কাকা, রণজিৎ, অসিত, ছোট কাকীমা, অশেষ, যূথিকা, সতীশ ও অসীমকুমার সরকার, পুরুলিয়া। সুনীল কুমার দত্ত, দার্জ্জিলিং। পিণ্টুরাণী, মিণ্টুরাণী ও সুরথ কুমার বসু, চুঁচুড়া। ভিক্টর, রানু, যুঁই, শত, টগর ও নীরেন্দ্র নাথ রায়, আঠারবাড়ী। রণেন্দ্র কৃষ্ণ সরকার, ভবানীপুর। প্রতিমা ভট্টাচার্য্য, বরিশাল। সুকুমার, প্রভাত কুমার, অশ্রুময়ী, মা ও অমরনাথ, ভবানীপুর। শিবানী সরকার, শ্যামবাজার। প্রভাতকুমার, প্রফুল্লকুমার, প্রণবকুমার ও মায়া গাঙ্গুলী, ভবানীপুর। সুধীন্দ্র নাথ গুহ, কালীঘাট। গৌরী চ্যাটার্জ্জি, কলিকাতা। প্রসূন, অরুণ, শৈলেশ, ঝরণা ও মাসীমা, মীরাট। জগদিন্দ্র নাথ রায়, ভবানীপুর। কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি, শ্যামবাজার। মীরা, খোকা, অমিত, বুন্ত, কেয়া, মিঠু, গিনিপিগ, কড়ি, বরগা, ভবানীপুর।

ভুল-সংশোধন

গতমাসে রংমশালে শিল্পী নামক যে গল্পটি ছাপা হয়েছিল তার লেখকের নাম দীপ্তেন্দ্র সান্যাল ভুলক্রমে জীতেন্দ্র সান্যাল ছাপা হয়েছিল।

নূতন ধাঁধা

১। বল দেখি তিন অক্ষরের কথা,
প্রথম অক্ষরদ্বয়ে সব যায় বাঁধা
শেষ দু অক্ষরে আর সব যায় বেঁধা ;
সবটাতে দুই পারে—বেঁধা আর বাঁধা ;
মুর্খে কি বলিতে পারে পণ্ডিতের ধাঁধা।

২। ইংরাজিতে বলে যাহা প্রথম অক্ষর
বাঙলায় তাহা বলে দ্বিতীয়ে অক্ষর;
প্রথমে দ্বিতীয় তথা জানায় আপত্তি
সবতাতে ঘাড়নাড়ে, বিষম বিপত্তি।
দু অক্ষরে ফল একি বল দেখি ভাই,
কেহ বলে বড় মিষ্টি কেহ বলে ছাই !

—৺শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর

উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ

গল্প বলা

রংমশাল
তৃতীয় বর্ষ
নবম সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৪৬

রাতের পাখী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সাঁজের আলোর কোলে দোলে নিশার কালো কেশ,
রাতের পাখী, আজকে আমি যাব তোমার দেশ।
তোমার গাওনা শুনে শুনে
সুরের খেয়াল বুনে বুনে
শূন্যে তারা গুণে গুণে ঘুমিয়ে পড়ি শেষ—
রাতের পাখী, ঘুম নয় আজ—যাব তোমার দেশ।

কী আমোদে কোন্ রাগিনী ঘুরে বেড়ায় ফুলেল্ বনে,
মৌচাকেতে মৌমাছিরা অবাক হয়ে কেবল শোনে।
ঝিল্লী-ঝুমুর বাজিয়ে কে সে
গানের তানের টানে এসে
সব্‌জে পাতার ছন্দ জাগায় নদীর ধারে ক্ষণে ক্ষণে।
রাতের পাখী, আকাশ-বাতাস সবাই তোমার গাওনা শোনে !

'কুহু-কুহু,' 'পিউ কাঁহা' আর 'বৌ কথা কও' সুরে
তোমরা যতই গলা সাধো, মন ছুটে যায় দূরে।
ও-গান শুনে রূপকথিকার
চির-কিশোর রাজার কুমার
রূপসিনী কন্যে খোঁজে অচিন্ রক্ষঃ-পুরে—
জ্বলছে হাতে সোনার কাটি উজ্জল অরুণ সুরে!

কোথায় তোদের দেশ রে পাখী?—চাঁদের কাছে কি?
যেথায় হাজার হারা তারা লুকিয়ে আছে কি?
যেথায় রঙিন সুরের মোহ
ঘোরায় গ্রহ-উপগ্রহ,
ধূমকেতুরা পুচ্ছ তুলে সেথায় নাচে কি?
কোথায় এমন গান শিখেছ? চাঁদের কাছে কি?

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল,— এগিয়ে চল রে,
জোছ্‌নাতে আজ মিহিন্ মেঘের গল্প বল রে!
রূপসায়রের অথই জলে
ফুটিয়ে গানের শতদলে
দাও খেলিয়ে সুর-বিজুলী আঁধার-ঝালরে,
সন্ধ্যারাণীর অন্তপুরে এগিয়ে চল রে!

ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্ রাত এল গো, ঘুম-ঘুম-ঘুম ধরায়,
খোকা-খুকুর ঢুল্-ঢুল্ চোখ স্বপনে প্রাণভরায়।
নীল-বুলানো অসীমতায়
চাঁদের বুড়ীর কাজল-লতায়
যে-সুর তোমার চাঁদ্‌নী হয়ে হীরের ঝুরি ঝরায়—
রাতের পাখী, সেই সুরে আজ গাইব আমি ধরায়।

সিরাজের স্বপ্ন

শ্রীসতীকান্ত গুহ

উটসর্দ্দার বাঁশীতে ফুঁ দেয়।

উটদের চোখে নেশা ধরে, তাদের চোখ ছোট হয়ে আসে, শেষে তারা ঝিমোতে ঝিমোতে উটসর্দ্দারের বাঁশী শোনে। নিভন্ত দিনের আলোয় বাঁশীর করুণ সুরটা কখন মিশে যায়, গোধূলির আলোয় সেই একটা সুর যেন কেঁদে কেঁদে ফিরতে থাকে।

বছর বারোর একটি ছিপছিপে সুন্দর ছেলে পিছনে দাঁড়িয়ে উটসর্দ্দারের বাঁশী শোনে। তার নাম সিরাজ। আস্তে উটসর্দ্দারের কাঁধে সে হাত রাখে, ডাকে, "উটসর্দ্দার!"

উটসর্দ্দার বলে, "এই যে সিরাজ সাহেব! কী চাই ভাই?"

"তোমার পুঁথিটা বার করোনা সর্দ্দার!"

"পুঁথি? না ভাই, রাত হয়ে আসে যে। তা ছাড়া সারাদিন বড় হয়রাণ গেছে।"

সিরাজের চোখ ছলছল করে ওঠে। কোর্ত্তার পকেট থেকে ছুটো রঙীন নুড়ি বার করে উটসর্দ্দারের হাতে গুঁজে দিয়ে সে বলে, "এই নাও।"

উটসর্দ্দার রঙীন নুড়ি ছুটো একবার দুবার দেখে হলদে রোমালটায় বেঁধে নেয়। তার মুখ খুশিতে ভরে যায়। সারা জীবন ধরে, তার এই একটা নেশা, রঙীন নুড়ি জমানো। সে একদিন কা'র মুখে গল্প শুনেছিল, রঙীন নুড়ি ঘুষ দিয়ে কে স্বর্গের গুল্‌বাগিচায় ঢুকে হুরীদের নাচ দেখে এসেছিল। সেই থেকে সে রঙীন নুড়ি জমায়।

উটসর্দ্দার তার গায়ের চাদরটা বালুর উপর বিছিয়ে দিয়ে বলে, "বোসো সিরাজ সাহেব।" তারপর আস্তে লাল শালুমোড়া পুঁথি সে বার ক'রে আনে। সুতোবাঁধা চশমাজোড়া প'রে নিয়ে সে পুঁথির পাতা ও'টাতে থাকে। তারপর খুক করে একটু কেশে নিয়ে বলে, "খুব মন দিয়ে শোনো সিরাজ সাহেব। সেই গল্পটাই পড়ছি, বুঝেছ!"

সুলতান সমশেরের সেই অদ্ভুত গল্প, যে গল্প শুনে শুনে শুনে সিরাজের মুখস্ত হয়ে গেছে, যে গল্প হাজারবার শুনেও তার সাধ মেটেনি, যে গল্প তাকে বারবার উটসর্দ্দারের কাছে টেনে নিয়ে আসে।

সুলতান সমশেরকে নিয়ে এ গল্প কে লিখেছে কে জানে! হাতেলেখা পুঁথিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য্য গল্প!

সুলতান সমশের পাঁচশো বছর হল মারা গেছেন। কিন্তু এ গল্প তো সে কথা বলেনা। সুলতান একদিন পৃথিবী ছেড়ে আর একটা আশ্চর্য্য দেশে চলে গেলেন, সুলতানের সেনাপতি, উজির, নাজির, বেগম, শাজাদারা কেউ টের পেলেন না। সেখানে একে একে অবশ্য সুলতানের হারেম আর সভার সকলেই

BLEED THROUGH.

গেলেন। ইতিহাসে লেখা আছে তাঁরা সবাই মারা গেছেন। কিন্তু গল্পে তো স্পষ্টই বলা হচ্ছে, না, তাঁরা গেছেন স্থলতানের নূতন দেশটিতে।

সেই দেশ থেকে ঝড়ের রাতে স্থলতান সমশের এই পৃথিবীতে পাঁচলাখ ঘোরসওয়ার নিয়ে চলে আসেন। মরুভূমির উপর দিয়ে ঝড়ের সঙ্গে আর একটা ঝড়ের মত খানিক ধূলো উড়িয়ে সমশের আবার ফিরে চলে যান। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, ঝড়ের ধূলো আর অন্ধকারে তাঁকে, তাঁর পাঁচলাখ ঘোড়সওয়ারদের কাউকে দেখা যায় না। জ্যোৎস্নারাতে সমশের একটা ছুধের মত সাদা উটের পিঠে চেপে সারেঙী আর ওস্তাদদের নিয়ে আসেন। মরুভূমির যেখানে সমশেরের শ্বেতপাথরের বিশাল গোরস্থান জ্যোৎস্নায় মিশে এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে সমশের আসর বসিয়ে গান শোনেন। কিন্তু সমশেরকে দেখতে পায় কেউ? গান কেউ শোনে? না, কেউ দেখেনা, কেউ শোনেনা। মনে একটুও সন্দেহ থাকলে বুঝি তাঁকে দেখা যায় না। তাই, কে তাঁকে দেখে? কে তাঁর কথা শোনে? সন্দেহ যে সকলের মনেই আছে। শুধু, যিনি গল্প লিখেছিলেন, তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিলনা। তিনি সমশেরকে দেখেছেন, তাঁর ঘোড়সওয়ারদেরও দেখেছেন, নাহ'লে ক'লাখ ঘোড়সওয়ার জানেন কি করে? সমশেরের উটটার রং যে ছুধের মত সাদা, তাও তো তিনি বলছেন!

সিরাজ ভাবে, আহা, এ গল্পটা যদি সে নিজে লিখতো তাহলে কি স্থখেরই না হত! তাহলে তো আর সমশের তাকে ফাকি দিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারতেন না।

গল্প শেষ করে পুথিটা শালুতে মুড়ে রাখতে রাখতে উটসর্দ্দার বললে,—"এই গল্পটা তোমাকে পেয়ে বসেছে দেখছি সিরাজ সাহেব। জানোতো, এটা সত্যি কথা, গল্প নয়।" সিরাজের চোখ ছুটি উজ্জল হয়ে ওঠে। উটসর্দ্দারের কাছে ঘেঁসে বসে সে বলে, "উটসর্দ্দার, সমশেরকে তুমি দেখেছ? কখনও কি তাঁর সাদা উটটাকেও দেখনি?"

উটসর্দ্দার একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "না, কই মনে তো পড়ে না! রাতেই তো উট চেপে মরুভূমি পাড়ি দিই, সাদা উট চেপে স্থলতান সমশেরকে তো কখনো দেখিনি। তবে, শোনো সিরাজ সাহেব, আমার একটা সন্দেহ হয়। ঝড়ের সময় স্থলতান সমশেরের গলার আওয়াজটা যেন পেয়েছি। বাস্‌রে! যেন একটা বাজের ধমক! স্থলতান সমশেরের কথা তুমি এত ভাবো কেন বলোতো?"

সিরাজ কোনো উত্তর দিলে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বললে, "তোমার ঐ পুঁথির সবকথা আমার সত্যি বলে মনে হয় উটসর্দ্দার।"

উটসর্দ্দার গায়ের চাদরটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, "তা হবে।"

মরুভূমির ছেলে সিরাজ, সমশেরের এই কাহিনী সে আর ভোলেনা। সমশেরের কথা ভেবে সে দিনে ঝিমোয়, সমশেরের কথা ভেবে রাত সে জেগে থাকে। তার মনে হয়, দিনে এত আলো হয় কেন? এত আলো বলেই তো স্থলতান সমশের আসতে ভয় পাচ্ছেন, তিনি তো দেখা দিতে চান না! যদি কেউ দেখে ফেলে? আর রাতে—রাতে যে বড় চুপচাপ! কেইবা স্থলতানকে অভ্যর্থনা করে? স্থলতান হয়তো রাগ করেই ফিরে চলে যান।

সিরাজের ঘর থেকে উটসর্দ্দারদের ঘাঁটিটা বেশী দূরে নয়। মাঝে মাঝে সেখানে এসে সিরাজ চুপ করে বসে থাকে। কত যাত্রী আসে যায়, কত উটের দল গোধূলির আলোয় দীর্ঘ ছায়া ফেলে ফিরে আসে। সিরাজ এক একজনকে শুধোয়, "স্থলতান সমশেরকে তুমি দেখেছ?"

তারা মাথা নেড়ে বলে, "স্থলতান সমশের কবে স্বর্গে চলে গেছেন!"

সিরাজ বলে, "না না, উটসর্দ্দারের পুঁথি তো পড়োনি! তাতে লেখা আছে স্থলতান মরেন নি, বেঁচেই আছেন।"

"কি জানি বাপু, থাকেন তো আছেন। আমরা দেখিটেখিনি।" এই বলে তারা যে যার কাজে চলে যায়, কেউ কথাটাকে তেমন আমল দেয় না। সিরাজ ভাবে, এত বড় স্থলতান সমশের, আর আজ কিনা তাঁর কথা তুললে লোকে গা না করে চলে যায়! সে ভাবে, স্থলতান সমশের মানুষের এই ব্যবহারে চটে না যান, চটেমটে হয়তো পৃথিবীতে আসা যাওয়া বন্ধই করে দেবেন। তাহলে, তাহলে তো সমশেরকে আর সে দেখতে পাবেনা। সে যে এখন থেকেই ঠিক করে রেখেছে, বড় হলে সে জ্যোৎস্নারাত্রে একটা উট চেপে বার হবে, সাদা উট চেপে স্থলতান সমশের যখন যাবেন তখন তাঁকে ছুচোখ ভরে দেখে নেবে।

এমনি করে দিনের পর দিন এসে চলে যায়, উটসর্দ্দারের পুঁথি আরও পুরণো হয়, আর সিরাজ একা-ঘরে বসে সমশেরের কথা ভাবে, তাঁর সাদা উটচাপা মূর্ত্তিটা স্বপ্নে দেখে।

শেষে, দিনে আর রাতে তফাৎ থাকে না। স্বপ্ন আর সত্যি এক হয়ে যায়। কেউ নতুন দেশে যাচ্ছে শুনলেই সিরাজ তার হাতে এক চিরকুট কাগজ দিয়ে বলে, "স্থলতান সমশেরকে দিয়ে বোলো সিরাজ দিয়েছে।"

একদিন এক বুড়ো যাত্রী হেসে বলে, "সমশেরের নতুন দেশে উটে চেপে যাই সাধ্যি কি আমার! সে দেশে ডাক না এলে তো যাওয়া যায়না ভাই!"

ডাক না এলে যাওয়া যায়না! তবে, সমশের ডেকে পাঠান। সিরাজ জিগেস "করে, কবে ডাকবেন তোমায়? আমাকেও ডাকবেন, কি বলো?"

যাত্রী মুরুব্বী চালে ঘাড় নেড়ে বলে, "তা আর বলতে!"

সিরাজ বলে, "তোমার ডাক এলে জানিয়ো, আমার এই চিঠিটা দেব।"

যাত্রী এই কথা শুনে একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর ভারী গলায় বলে' "তা হয়না ভাই! সে তো আর যে সে ডাক নয়, স্বয়ং স্থলতান সমশেরের ডাক। ডাক একবার এসে গেলে একমুহূর্ত্ত তেষ্ঠাবার জো নেই। দাও তাহলে তোমার চিঠিখানা। পরে তো নেবার সময় হবে না।"

সিরাজের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে চিরকুটটা একেবারে যাত্রীর কোর্ত্তার পকেটে গুঁজে দেয়।

কিন্তু কই, সমশেরের কাছে এত চিঠি পাঠানো হল, একখানা চিঠিরও জবাব আসে না। সেই বুড়ো যাত্রী, সেও আর ফিরে আসে না।

সিরাজ তবু আশা ছাড়েনা। সে ভাবে এখন তো তার মনে আর সন্দেহ নেই, পুঁথির লেখকের মত

সেও একদিন সমশেরকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। তাছাড়া, সমশের হয়তো এখনও তার কথা জানেন না, তার নামও শোনেননি। যেদিন সমশের শুনবেন, এতদিন তাঁকে দেখার আশা নিয়ে সে বসে আছে, তিনি কি আর স্থির থাকতে পারবেন? তিনি সেদিন নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে সাদা উটটা চেপে একেবারে তার ঘরের দুয়ারে এসে তার নাম ধরে ডাকবেন, "সিরাজ! এই আমি স্থলতান সমশের এসেছি।" আর সে—সে চমকে উঠবে, স্থলতান সমশেরকে কুর্ণিশ করে ঘরে বসিয়ে একছুটে উটসর্দ্দারকে ডেকে আনবে। বেচারা উটসর্দ্দার! আহা, সেও দেখুক স্থলতান সমশেরকে! সে যদি পুঁথির গল্পটা পড়ে না শোনাতো তাহলে সে যে স্থলতান সমশেরের কথা জানতেই পেতনা!

মরুভূমির সবাই বলতে স্থরু করলে, আহা! ছোকরা পাগল হয়ে গেল। কেউ বললে ভূতে পেয়েছে। পণ্ডিতেরা মোল্লারা কেউ ঘাড় নেড়ে বললেন, এ বড় সাঙ্ঘাতিক রোগ, আল্লার দোয়া করলে যদি সারে। কেউ কেউ বললেন, ছোকরা মিছেকে সত্য ধরে নিচ্ছে, এর চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি পৃথিবীতে আর নেই। ইস্পাহানের এক কবি বললেন, তোমাদের মাথা আর মুণ্ডু! আসলকথা হচ্ছে, ছেলেটি অতিরিক্ত মাত্রায় কবি হয়ে পড়েছে। আমরা অনেক কথা লিখি, কিন্তু বিশ্বাস করিনা। এ ছোকরা সেইসব লেখা-কথা বিশ্বাস ক'রে বসে আছে।

সিরাজের কাণে এসব কথা ওঠেনা। পরের কথা শোনার সময় তার নয়। আট প্রহরের প্রতিটি মুহূর্ত্ত স্থলতান সমশেরের স্বপ্ন দেখার জন্য যে তার জমা করে রাখতে হয়। রাতে সে ঘরের কবাট খুলে রাখে, সমশের এসে যাতে ফিরে না যান। জ্যোৎস্নারাত্রে দূরে বেদুইন সওয়ার যখন আকাশের শেষে মিলিয়ে যায় সে ভাবে, ওকি সমশের ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হলেন! ঝড়ের রাতে যখন সোঁ সোঁ শব্দে চারিদিক ভরে' যায়, তখন তার মনে হয় হয়তো পাঁচলাখ সওয়ার নিয়ে সমশের ছুটে চলেছেন! রাতে জানালায় একটি আলো জেলে সে রেখে দেয়—এই আলো দেখে সমশের তার ঘর চিনে আসবেন, বুঝবেন এখানে তাঁর 'সিরাজ' আছে।

একদিন, মরুভূমি অন্ধকার করে' ঝড় এলো। সে সামান্য ঝড় নয়, যেন মহাপ্রলয়। সারা মরুভূমি কাঁপতে থাকল। পৃথিবী ভেঙে ফেলে নূতন করে স্থরু করার সে যেন এক আয়োজন! সিরাজ তার একাঘরে বসে ভাবছে এই দুর্য্যোগের রাতে স্থলতান সমশের কোথায়? এই মহাপ্রলয়েও কি তিনি তাঁর ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে বার হয়ে পড়েছেন!

হঠাৎ ঘরের কবাটে হুড়মুড় করে' কে আছাড় খেয়ে পড়ল!

সিরাজের গলা কেঁপে গেল। সে জিগেস করলে—"কে?"

"আমি। শিগ্গির কবাট খোলো!"

এ কে! এ কি স্থলতান সমশেরের কণ্ঠস্বর? সিরাজ কবাটটা খুলে ফেলে একপাশে সরে' দাঁড়াল। হুড়মুড় করে একটি মানুষ ভিতরে এসে পড়ল। বৃষ্টিতে সে একেবারে স্নান করে উঠেছে। হিহি করে' সে কাঁপছে। লণ্ঠনের আলোয় সিরাজ দেখলে, অদ্ভুত মানুষটির চেহারা, এত ভয়ঙ্কর চেহারা সে জীবনে দেখেনি। তার চোখে মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব, সেই সঙ্গে একটা ভীষণ ভয়ের ভাব। ঘরে ঢুকেই

সে কবাটটা নিজ হাতে বন্ধ করে' দিলে। হাতে তার একটা পিস্তল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাতে লাগল। সে কবাটটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, সেই দৃষ্টিতে যেন কত ভয় মেশানো! ভয়ে সে থরথর কাঁপছে!

সিরাজ কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। ওষ্ঠে আঙুল দিয়ে আগন্তুক ইসারা করলে, চুপ! ঘরের এ-কোণ সে-কোণ তাকিয়ে সে বললে, "মাত্র একটা ঘর দেখছি!"

সিরাজ কোনো জবাব দিলেনা।

হঠাৎ একসময় দুহাতে বুকটা চেপে ধরে' আগন্তুক মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সিরাজ দেখলে তার বুকের কাপড়টায় রক্তের ছোপ লেগেছে। ছুটে এসে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। এক নিশ্বাসে সে বললে, "এসো, আমি জলপটি বেঁধে দিচ্ছি।" ফরফর করে' সিরাজ তার চাদরটা ছিঁড়ে একটা ফালি বার করে' নিলে।

দুহাতে বুক চাপতে চাপতে ভাঙা গলায় আগন্তুক বললে, "তুমি পারবে না।"

সিরাজ বললে, "খুব পারবো।"

গম্ভীর একটা হাসি আগন্তুকের মুখে ফুটে উঠলো। তখন আর তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছেনা। তার দুটি চোখ যেন এই কথায় ছল ছল করে' এলো। সে বললে, "আহা থাক, রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি দ্যাখোতো আস্তে জানলাটা খুলে, ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পাও কিনা!"

ঘোড়সওয়ার! তবে, এ কে? এই ঘোড়সওয়ার কারা? সিরাজের গলা কেঁপে যায়, বুকটা টিপ্-টিপ্ করে। তার গলার আওয়াজ বার হতে চায়না। কোনরকমে সে বললে, "তোমার, তোমার নাম কি?"

"আমার নাম সমশের।"

সমশের! স্থলতান সমশের! ফিসফাস করে সিরাজ শুধোয়, "তুমি স্থলতান সমশের?"

কিন্তু কথার কোনো জবাব পায়না। মানুষটি তখন ব্যথায় অবসাদে অচেতন হয়ে পড়েছে।

সিরাজ জানালাটা খুলে দেখে, মরুভূমির অনেকদূরে ছায়ার মত একদল ঘোড়সওয়ার চলেছে। সিরাজের মনে হয়, ওই হয়তো সমশেরের ঘোড়সওয়ারদল।

ভোর না হতে মানুষটি জেগে পড়ে। তখন তার আর ব্যথা নেই। সে ফিস ফিস করে বললে, "জল।"

সিরাজ সারারাত ঘুমোয়নি। সে ঠায় মানুষটির শিয়রে বসে ছিল। সে এক পেয়ালা আমিল এনে বললে, "হা করো।" লোকটির মুখে একটু একটু করে' আমিল ঢেলে দিয়ে সে বললে, "বলো তো, তুমিই স্থলতান সমশের কি না!"

মানুষটি—সেও মরুভূমির মানুষ। স্থলতান সমশেরের প্রচলিত কাহিনী তার অজানা নয়। সে একটু ভেবে নেয়, তারপর কী একটা বুদ্ধি তার মাথায় আসে। সে সিরাজকে শুধোয়—"স্থলতান সমশেরের খোঁজে তোমার কি দরকার বলোতো?"

কি দরকার! সে যে কতদিন কতরাত তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে! সে যে ইস্পাহানের কিশোর সিরাজ! সমশের যে তার সবসুখ কেড়ে নিয়ে নূতন দেশে বসে আছেন! সিরাজ সেই উটসর্দ্দারের পুঁথির কথা আর তার এত দিনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার কথা একে একে খুলে বলে।

লোকটি হেসে বলে, "সুলতান সমশেরের নূতন দেশটা শুনেছি ভূমিকম্পে চুরমার হয়ে গেছে। সুলতান এখন রোদে বৃষ্টিতে পথে পথে ঘুরছেন। সুলতান তোমার এখানে এলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে তোমার ঘরে থাকতে দিতে!"

সিরাজ ভাবে লোকটা পাগল না কি! সমশের আসবেন তার ঘরে, আর সে তাকে দেবে ফিরিয়ে! সে বলে, "বাঃ, থাকতে দিতুম না! তাঁর জন্যেই তো আমি বসে আছি!"

লোকটি তখন চাপা গলায় বলে, "আমি—আমিই সুলতান সমশের!"

সিরাজের তখন আর কোনো দুঃখ থাকেনা। গভীর সুখে তার চোখে দুফোঁটা জল আকাশের তারার মত ফুটে ওঠে। দুঃখ, দুঃখ আর কেন? সুলতান সমশের তো তার ঘরে এসেছেন। দুঃখ শুধু এই, সুলতানের নূতন দেশটা চুরমার হয়ে গেছে আর তার ঘোড়সওয়াররা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কেন? কেন আর—সুলতান তো আর এখন তাদের আচকান চাপকান খানাপিনা জোগাতে পারেননা, তারা তাই চলে গেছে! তা, যাহোক, তবু সুলতানতো সুলতানই আছেন। তিনি সিরাজের ঘরে এতদিন পরে যে এসেছেন, এই যথেষ্ট। হয়তো তাঁর নূতন দেশটা চুরমার না হয়ে গেলে আসতেননা। সুলতান সমশেরের মুখে এইসব কথা শুনে সিরাজ খুশিই হয়ে ওঠে।

সিরাজ হঠাৎ একসময়ে উঠে পড়ে। সমশের ভীতকণ্ঠে বলে, "কোথায় যাচ্ছো?"

"উটসর্দ্দারকে ডেকে আনি, সেও তোমাকে দেখতে চেয়েছিল।"

এক মুহূর্ত্তে সুলতান সমশেরের মুখের ভাবটা বদলে যায়—একটা নিষ্ঠুর ভাব, একটা নিদারুণ ভয়ের ভাব তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে। বুকটা চাপতে চাপতে একলাফে উঠে পড়ে' সে সিরাজের হাতটা চেপে ধরে গর্জ্জন করে' ওঠে—"খবর্দ্দার! আমি এখানে আছি কেউ যেন না টের পায়!"

সিরাজ একটু ভয় পায়, পরে সে সামলে নেয়। সুলতান সমশের যে লুকিয়ে চলতে ভালোবাসেন, পৃথিবীর মানুষকে দেখা দিতে চাননা, একথা বুঝি সে ভুলেই গিয়েছিল! একটু হেসেই সে বলে, "আচ্ছা, আচ্ছা।" তারপর সে ভাবে, আহা, কী চমৎকার মানুষ এই সুলতান সমশের! কাউকে দেখা দেননা, তবু তাকে তো দেখা দিয়েছেন!

এমনি করে মরুভূমির তেপান্তরে, উটসর্দ্দারদের ঘাঁটির খানিকটা তফাতে, সকলের চোখের আড়ালে, ষোলবছরের কিশোর সিরাজের ঘরে সুলতান সমশের থাকেন। একদিন, দুদিন যায়। সুলতান সমশের খানদান ঘুমোন, সারাটা দিন অস্থির হয়ে ঘরে পায়চারী করেন। খাঁচায় একটা বাঘ যেন ছটফট করে বেড়ায়।

সিরাজ মাঝে মাঝে ভাবে, সারাটা দিন তো তাকে উটের ঘাঁটিতে কাজ করতে হয়। সুলতান একাঘরে থাকেন। তাঁর তো একটিও খেলার সঙ্গী নেই। একাঘরে তার কি আর সময় কাটতে চায়!

একদিন সে বললে "তোমাকে উটসর্দ্দারের পুঁথিটা এনে দিই বরং। বোসে বোসে পড়তে পারে তবু।"

সুলতান সমশের ভাঙা গলায় বলে, "আরে, আমিই যে সুলতান সমশের। আমায় আবার পড়তে হবে!"

সিরাজ ভাবে, তাইতো! সে তো বোকা কম নয়!

সুলতান সমশেরের অস্থির ভাবটা দিনের পর দিন বেড়েই চলে। একদিন সিরাজ সন্ধ্যার শেষে ঘরে ফিরে দেখে সুলতান সমশের তার কাপড় জামা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ভূতের মতন বসে আছে। দেয়ালে মাথা ঠোকার দরুণ দেয়ালের আস্তর খসে পড়েছে, সুলতানের কপালটাও ফেটে গেছে।

এ দৃশ্য দেখে সিরাজের বুক ভেঙ্গে যায়! সে সুলতানের দুঃখটা যে না বোঝে তা নয়। যিনি পৃথিবীতে বিশ পঁচিশটা যুদ্ধ জিতেছিলেন, নূতন দেশের সুলতান হবার পর যিনি পাঁচলাখ ঘোড়সওয়ার নিয়ে ঝড়ের মরুভূমি মাতিয়ে আসতেন, তাঁর কিনা আজ এই হাল—একাঘরে একটা খাঁচাবন্দী জানোয়ারের মত তাঁকে পচতে হচ্ছে! মরুভূমির আকাশ রাঙিয়ে তখন সূর্য্য অস্তে যায়। সেদিকে তাকিয়ে সিরাজের মনে হয়, আহা এমনি করে' এত রং এত উৎসবের মাঝে সুলতান সমশেরের জীবনটা ফুরোত তো সুখের হত। এতবড় সুলতান, অন্ধকার একটা ঘরে হাহাকার করে' মরা, একি আর সুলতান সমশেরকে শোভা পায়!

আর তখন—ঘরের দুর্দ্দান্ত মানুষটির চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে ওঠে—দলে দলে যাত্রী উটের পিঠে চেপে চলেছে। উঠের পিঠে কত ধন কত রত্ন কত মহার্ঘ্য উপঢৌকন! হঠাৎ যাত্রীদলে সাড়া পড়ে যায়, দূরদিগন্ত হতে ধূলোর একখানা মেঘ উড়িয়ে বুঝি বেদূইন দস্যুরা ছুটে আসে। তারপর, খুন, রাহাজানি, মশালের লাল টকটকে আলোয় মানুষের রক্ত স্রোতের মত বয়ে যায়। সেই বেদূইন দলের সর্দ্দার—সে কি এই সুলতান সমশের! মানুষের তাজা রক্তের স্বাদ পেয়ে সে ক্ষেপে গেছে, উন্মত্তের মত সে হত্যা করে চলেছে। তারপর কখন হঠাৎ সরকারী ঘোড়সওয়ারেরা এসে পড়ে, বুকে একটা গুলি এসে লাগে, বুকটা চেপে ধরে' ধরা পড়ার ভয়ে তাকে ছুটতে হয়। তারপর, তারপর—ঘরের দুর্দ্দান্ত মানুষটির মুখে হতাশা ফুটে ওঠে, হাতটা তার মুঠ হয়ে আসে, নখ বসে মাংস প্রায় উঠে আসে। হায়! বেদূইনের রক্ত তার—তার কি পোষায় সরকারী ঘোড়সওয়ারের ভয়ে অন্ধকার ঘরে ইঁদুরের মত দিন কাটানো!

হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার করে' সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে। সেই চীৎকারে সিরাজের স্বপ্ন-ভাবটা কেটে যায়।

সন্ধ্যার পর মানুষটি প্রলাপ বকতে থাকে। প্রলাপে অনেক কথা সে বলে, মানুষ খুনের কথা, লুটপাট রাহাজানির কথা, ভয়ঙ্কর এক একটা কাহিনী। সিরাজ আতঙ্কে শিউরে ওঠে, কী ভয়ঙ্কর এই সুলতান সমশের! সমশেরকে তবুও এতটুকু খারাপ তার লাগেনা। ভয়ঙ্কর বলেই তো অতবড় দিগ্বিজয়ী হতে পেরেছিলেন সমশের। নরম মন নিয়ে কি আর সমশের সুলতান হওয়া চলে!

মাঝরাতের কিছু আগে লোকটি ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সিরাজ ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। সে সোজা রাজধানীর পথ ধরে চলল। দুই ঘণ্টার পথ রাজধানী!

২

মাঝরাত্রে সিরাজ সহরের কোতোয়ালিতে পৌছল। খলিফার সঙ্গে তার দেখা না হলেই নয়। জরুরী দরকার!

কোটাল হেসে বললে, "তা সিরাজসাহেব, খলিফা কি আর এখন জেগে বসে আছেন! তিনি তে নাক ডাকাচ্ছেন। তাকে এখন জাগায় সাহস কার?"

সিরাজ বললে, "খলিফা জাগবেন, তাঁকে বুঝিয়ে বললেই জাগাবেন। আমি বড় ভীষণ জরুর খবর নিয়ে এসেছি। খলিফা নিশ্চয়ই আমায় পুরস্কার দেবেন। সেই সঙ্গে আপনারও কিছু জুটে যাবে।"

কোটাল বললে, "খবরটা আমাকে বলে দিলে চলেনা? তাহলে তো আর খলিফার ঘুম ভাঙাবার দরকার হয় না!"

সিরাজ মাথা নাড়ে।

কোটাল তখন খানিকটা কী এককথা ভেবে নিয়ে বলে, "তা হলে এসো।"

খলিফা চোখ কচলাতে কচলাতে এসে তাঁর বৈঠকঘরে ঢুকে বলেন, "কী কোটাল সাহেব! এত রাত্রে কী জরুরী খবর তোমার?"

ভয়ে কোটালের বুক টিপটিপ করতে থাকে। হাত জোড় করে সে বলে "জাহাপনা, কসুর মাফ করবেন। সিরাজসাহেবের মুখেই জরুরী খবরটা শুনুন।"

খলিফার মুখে একসঙ্গে বিরক্তি ও কৌতূহল ফুটে ওঠে। সিরাজ হাঁটু পেতে বসে কুর্ণিশ করে বলে, "জাহাপনা! সুলতান সমশের পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁর নূতন দেশটা চুরমার হয়ে গেছে। আমার ঘরে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে। একটা রাজ্য ছেড়ে দেন তো সুলতান সমশের সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন।"

খানিকক্ষণ খলিফার বৈঠকঘর একেবারে চুপ। খলিফা কোটালের দিকে তাকান। কোটাল তখন সিরাজকে শুধোয়—"আচ্ছা সিরাজ সাহেব, লোকটা খুব জোয়ান মতন, নয়? বুকে একটা গুলিয় চোট"—

সিরাজ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "হাঁ, বুকে একটা গুলির চোট লেগেছে।"

"তাহলেই হয়েছে জাহাপনা, এবার আর আলাদিন বেদূইন কি করে' চোখে ধূলো দেয় দেখে নেবো!" বলেই কোটাল উর্দ্ধশ্বাসে বৈঠকঘর হতে ছুটে বার হয়।

আলাদিন বেদূইনকে জ্যান্ত কয়েদখানায় পোরা গেলনা। সরকারী ঘোড়সওয়ারদের সাড়া পেয়েই সে নিজের বুকে পিস্তল ছুড়লে।

পাগলের মত তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিরাজ বললে, "সুলতান সমশের! একি! নিজহাতে তুমি খুন হলে!"

মরতে মরতে আলাদিন বেদূইন হেসে বললে, "নূতন দেশে যাবার এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা, বুঝলেনা ভাই। আমি একটা বড় অদ্ভুত নতুন দেশের খোজ পেয়েছি কিনা!"

"কিন্তু আমি, আমিও যেতে চাই যে নতুন দেশে" বলেই সিরাজ মেঝে থেকে গুলিভরা পিস্তলটা তুলে নিলে।

"করোকি, করোকি পাগল, ও সুলতান সমশের নয়, আলাদিন বেদূইন, দস্যুর সর্দ্দার, ওর কথা শুনোনা,"—বলে কোটাল হা হা করে এসে তার হাত ধরতে না ধরতে সিরাজ নিজের বুকে পিস্তল ছুড়ে দিলে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লঙ্গুরদের দলে

শিক্ষার পক্ষে অল্প বয়সের সাথী যেমন কার্য্যকরী এমন আর কেউ নয়। গোদাবর তা জানত বলেই মংলুকে গুপীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। মুখের কথার চেয়ে চোখের দেখার জ্ঞান অনেক স্থায়ী, অনেক দ্রুত! ক্রমে মংলু লঙ্গুরদের দলের ঠিক সমান ব্যবধানে পেছনে পেছনে যেতে আরম্ভ করল। এমন কি তার বিদ্যা এত দ্রুত মংলুকে আয়ত্ত করতে দেখে গুপীর প্রায় হিংসে হতে লাগল।

কত ঘন গাছের বন, কত ফাঁকা জমী লঙ্গুরেরা পার হয়ে এল। কোথাও অদ্ভুত বুনো লাল ফুলে বন ছেয়ে গাছে। বনের ভেতর জায়গায় জায়গায় আগুন ধরে গেছে তখন। ঝির ঝিরে বাতাসে ফুলেরা মাথা নেড়ে নেড়ে নিজেদের মধ্যে হাসা হাসি করছে। কোথাও একঝাঁক রঙিন প্রজাপতি রামধনু উড়িয়ে বাতাসে ভেসে চলেছে। কোথাও বন ভীরু সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোয় ঘন গুরুগম্ভীর। মংলু গুপীর সঙ্গে সমানে তাল রেখে, ছুটতে ছুটতে, দুলতে দুলতে, ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে।

গুপীর আর সহ্য হোল না। যে আগের দিন স্বীকার করেছে যে সে গাছে চড়তে পারে না সে কিনা পরের দিনই লঙ্গুরদের সাথে সমানে তুলকি চলেছে ?

গুপী তার লেজ দিয়ে একটা ডাল জড়িয়ে ধরে মুখ নীচু করে ঝুলে পড়ল।

—কুঁঃ কুঃ কিচ্ কিচ্ কিচ্

মংলু জিগেস করল—ও আবার কি হচ্ছে ?

—এই রকম করতে পার ?

মংলু থমকে দাঁড়িয়ে গুপীকে ভাল করে দেখে বলল—কি করে পারব ? আমার ত লেজ নেই !

গুপী খুসী হয়ে উঠল—হোঃ হোঃ পারে না ; মংলু পারে না।

চল চল দল এগিয়ে গেল !

গুপী লেজের পাকটা খুলে, শূন্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে সামনের ডালটা লাফিয়ে ধরে ফেলল। আবার সুরু হোল চলা। মংলু সমানে তার পাশে চলেছে।

নীচে সামনে একরাশ বুনো সাদা ফুল, তার পরে খানিকটা ফাঁকা জমী। জমীর উপর সবুজ ঘাস কে যেন, কোন মায়াবী ওখানে সবুজ একটা গালচে বিছিয়ে দিয়ে গেছে। তারপরে দূরে দেখা গেল সাদা বকের পাঁতি তির্য্যক গতিতে পত্ পত্ করে আকাশে উঠছে। বন সেখানে হঠাৎ ক্ষ্যাপার মত বাঁক নিয়েছে। নূতন নূতনতর পৃথিবী। পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে বিস্ময়। মংলুর চোখে নেশা। পৃথিবীটা এত বড়, এত বিশাল, এ যেন কি ! জানোয়ারদের ভাবনার বালাই নেই, প্রাকৃতিক সমস্ত ব্যাপারই তাদের কাছে সহজ। যা আছে তাতো আছেই, থাকবেই ! কিন্তু মংলু মানুষ। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যাবে কোথায় ? প্রতিটি নূতনতর রূপ, নূতনতর পরিপার্শ্ব তার মনে জাগায় বিস্ময়। সে অবাক হয়ে যায়, অভিভূত হয়ে যায়।

মংলু জিগেস করল—সামনে কি গুপী ?

—লঙ্গুরদের জলা. গুপী জবাব দিল।

জলা ? কত বড় ?

—প্রকাণ্ড ! তার ওপারে জলের ধোঁয়ায় বন কাঁপতে থাকে ?

—কত গভীর ?

—অনেক ! বুড়ো কাছিম যখন রোদ পোয়াতে ওঠে তার কাছে শুনি জলার শেষ নেই। বুড়ো কাছিমের গায়ে কালো সবুজ শ্যাওলা।

দেখতে দেখতে তারা গাছের মাথায় মাথায় জলার ওপর এসে পড়ল। লঙ্গুরেরা বাঁক নিয়ে বনের ভেতরপানে ঢুকছে। গাছের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে মংলু দেখল ঠিক নীচে থেকেই জলা দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়ে ঝিম ঝিম করছে। একদিক থেকে বকেরা উড়ছে। জলার জলে সূর্য্যের প্রতিচ্ছুরিত আলো ধারাল তরোয়ালের মত ঝলসাচ্ছে।

সেই স্বচ্ছ রূপোর মত জল দেখে মংলু আর থাকতে পারল না। হঠাৎ গাছের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে সে গলা ছাড়ল—হু-উ-ই-ই !

তার পরে ধনুক ছাড়া একটা তীরের মত সটান সে জলার জলে লাফ মারল। জলের মধ্যে বিদ্যুতের মত মংলু যেখানটায় মিলিয়ে গেল, সেখানটায় একটা গোল ঢেউ উঠে জল থির থির করে কাঁপতে লাগল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

গুপী সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কুঁই কুঁঃকুঁঃ কুঁই কুঁই !

মংলুর সেই চীৎকার আর গুপীর আর্ত্তনাদ গোদাবরের কানে পৌছুতেই গোদাবর চীৎকার করে ফিরল। লঙ্গুরের দল খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল।

—কি কি হয়েছে গুপী ?

গুপী তখন গাছের ডালে লাফাচ্ছে—কুঁঃ কুঁঃ কুঁইই !

গোদাবর গম্ভীর গলায় সভয়ে প্রশ্ন করল—কি কি হয়েছে গুপী ? মংলু কোথায় ?

—জলে পড়ে ডুবে গেছে।

অ্যাঁ ? গোদাবর আর্ত্তনাদ করে উঠল।

সমস্ত লঙ্গুরের দলে তখন মংলুর জলে ডুবে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে গেল। গাছের ডালে সার সার লঙ্গুরের দল তখন চেঁচাচ্ছে আর লেজ আছড়াচ্ছে।

হঠাৎ জলার মাঝখান থেকে একটা ডাক—

—হু-উ-উ-ই গুপী ?

গোদাবর শুদ্ধ সমস্ত লঙ্গুরের দল সে ডাকে লাফিয়ে উঠল—ওই যে ওই যে মংলু !

—হু-উ-উই !

মংলু মাছের মত সাঁতার কেটে তীরের দিকে আসছে। তার প্রতিটী বাহুতাড়নায় রূপোলি জল রোদে ঝলকাচ্ছে।

গোদারর হাঁক দিল—মংলু মংলু ?

কেন ?

—তুমি ডুবে যাও নি ?

—ডুবব কেন ? আমি সাঁতার কাটছি।

সমস্ত লঙ্গুরের দল বিস্ময়ে স্থির। তার পরে তারা কিচ্ কিচ করে বাঁদুরে কোলাহল তুলে আনন্দে লাফাতে লাগল।

—মংলু, মংলু, ডোবেনি।

—মংলু টিক্ টিকি, মাছ, মাছ।

—না না কাছিম।

আনন্দের আতিশয্যে গুপী তখন একটা ডাল লেজে পাকিয়ে দোল খাচ্ছে। গোদাবর তার মাথায় এক থাবড় বসিয়ে দিল—দূর বোকা মংলু ডোবেনি, মংলু সাতার কাটছে।

গুপী এবার আনন্দে কুঁই কঁই করে উঠল।

জলসিক্ত দেহে মংলু উঠে এসে, সবুজ ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল—হুস্!

সমস্ত লঙ্গুরের দল তখন তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। গুপী ত লাফাতে লাফাতে তার কাছে এসে হাজির। প্রথমে সে অস্ফুট একটা কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে মংলুকে শুঁকতে লাগল। তার পরে লেজের বাড়ি লাগাল মংলুর মুখে এক ঘা।

—আর গুপী কি হয়েছে?

গুপী বলল—দেখছি মরে গেছ না বেঁচে আছ!

—তবে রে?

গুপী একলাফে একেবারে গাছের মাথায়।

যাত্রায় একটা বাধা পড়াতে লঙ্গুরের দল সেই জলার ধারে গাছের মাথায় বিশ্রাম করতে বসল। এ ধারের পৃথিবী সকালের রোদে যৌবনভারে হাসছে। জলার ওপর সাদা বকের ডানায় তার প্রতিস্ফুরণ! কোথায় জলের ওপর নুয়ে পড়া একটা ডালে দোয়েল গান ধরেছে। গুপী বলল—কিছু ফল মূল যোগাড় করতে পারলে হত, বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

মংলু জবাব দিল—ফল কোথায়?

—ওদিকে আছে পেয়ারার বন কিন্তু সে ত দল না গেলে হবে না!

মংলু উঠে দাঁড়াল, বলল—আচ্ছা আমি কিছু খাবারের জোগাড় করছি।

আবার জলে ডুব মারল মংলু।

সে যখন উঠে এল তার কাঁধে একরাশ পানিফলের লতা। তাতে থোকা থোকা ফল ফলে আছে। বানরের দল তাই দেখে মহা আনন্দে লাফালাফি স্থরু করে দিল। পানিফল বানরদের কাছে একরকম দুষ্প্রাপ্য ফল। জল খেতে এসে দু একটা ভেসে আসা ফল, তারা চেখে দেখেছে কিন্তু তার বেশী আর জোটেনি কোন দিন। এখন সাঁতারু মংলুকে পেয়ে লঙ্গুরদের ও লাভ মন্দ নয়।

এমনি করেই লঙ্গুরদের সাথে স্থরু হোল মংলুর জীবনযাত্রা। আর দেখতে দেখতে দলে সে বেশ খাপ খেয়ে গেল। গাছে চড়তে আর গাছের ডালে ডালে যাতায়াত করতে ক্রমশঃ সে প্রায় লঙ্গুরদের মতই ওস্তাদ হয়ে উঠল। তার অনুসন্ধিৎসু মন তাকে বনে বনে ঘুরিয়ে ফেরে, তার এই সব সফরে প্রায় তার সমানই উৎসাহী গুপী সব সময়ে তার সঙ্গী! ভোরবেলা তখনও যখন লঙ্গুরেরা ঘুমোয়, মংলু আর গুপী উঠে বেরিয়ে পড়ে। এ বনে বুনো পেয়ারা, ও বনে কলার কাঁদি। মংলু আর গুপীর এ সবে মহা উৎসাহ। প্রাকৃতিক জগতে সময়ের হিসাব নেই। বনের অবিশ্রান্ত শান্ত দিন স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যেতে লাগল।

একদিন মংলু আর গুপী দল ছেড়ে দূরে এসে গাছের ডালে বসে গান শুনছে। তাদের সকালের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। সামনে বিশ্রামিত অবসর। গারো পাহাড়ের মাথায় ছোট একটুকরো কালো মেঘ জমছে। দিনটা অসম্ভব গুমোট গরম। হঠাৎ দূরে আকাশে একটা ক্ষীণ ডাক—চিঁ-ই-ই!

মংলু চমকে আকাশে চাইল। আকাশের বুকে কালো একটা ফোঁটা বড় হচ্ছে দ্রুতগতিতে। গুপী কি যেন একট অজানা ভয়ে হঠাৎ ডালধরে লাফাতে স্থরু করল।

—কিছ্ কিচ্ কিঃ কিচ্!

মংলু আকাশে চেয়ে আছে। চীলকে সে চিনতে পেরেছে। চীল এসে পড়ল মাথার ওপর।

—ভাল্লুকদের মংলুর ভালো হোক!

—চীলের শিকার টিকার ভালো জুটুক! মংলু বলল কি চীল কি খবর?

—নালুখের গিন্নীর দুটো বাচ্ছা হয়েছে

—সত্যি? মংলু লাফিয়ে উঠল—একদিন গিয়ে দেখে আসব।

গুপী অনবরত লাফাচ্ছে আর একটা করুণ শব্দ করছে।

মংলু বলল—কি হয়েছে গুপী?

গুপী চীলের দিকে তাকিয়ে গারো পাহাড়ের মাথার উপর কালো মেঘটা দেখিয়ে বলল—আকাশের গতিকটা দেখেছ?

ওটা কি রকম মনে হয় তোমার?

চীল মাথা হেলিয়ে দেখে চমকে বলল—তাইত স্থবিধে মনে হচ্ছে না!

—কি রকম ঠেকছে?

—বাতাস হবে। যাই মংলু আমায় অনেক দূর যেতে হবে। আকাশের গতিক ভাল নয়।

চীল চলে গেলে গুপী বলল—চল চল মংলু দলে ফিরে যাই। আমার কি রকম ভাল লাগছে না!

মংলু বলল—কিসের ভয়? আকাশেত একটা মেঘ উঠেছে দেখছি।

বনের জানোয়ারদের বিপদের অনুভূতি মানুষের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ। গুপীর মন কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে ভরে উঠছিল। সে মংলুর কথার জবাব দিল—জানিনা কিসের ভয় তবে দলে ফিরে চল।

মংলু বলল—চল।

সেইদিন যতই বেলা যেতে লাগল, গারো পাহাড়ের মাথার সেই ছোট্ট কালো মেঘটা ক্রমশই বড় হতে লাগল। লঙ্গুরদের দলে একটা নিস্তব্ধ থমথমে ভাব। সকলেই যেন কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় মুষড়ে গেছে। রুদ্র প্রকৃতির বিরাট বিশালত্ব যেন ধীরে ধীরে সমস্ত বন্য প্রাণীকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল। মংলু অত শত বোঝে না। গোদাবর অকারণে ব্যস্ত হয়ে এ ডালে ওডালে লাফালাফি করছে, লঙ্গুর গিন্নীরা ছানাদের বুকে আঁকড়ে ধরে কিসের জন্য তৈরী হয়ে আছে যেন।

মংলু গোদাবরকে জিগেস করল—আজ কি হয়েছে, কি? গোদাবর একবার আকাশের পানে চেয়ে দেখল. একবার নিজের অপেক্ষমান দলের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল—কি জানি আকাশের গতিক স্থবিধে নয়; কি যে হবে বুঝতে পারছি না!

আকাশে তখন বিরাট এক কৃষ্ণবর্ণ দৈত্য ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠছে যেন।

সেইদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই আকাশের আলো নিভে গেল। পশ্চিমে একটা অদ্ভুত পাণ্ডুর ক্রুদ্ধ লাল রঙ জেগে উঠল—যেন মৃত আকাশের শেষ তীক্ষ্ণ জীবনের লক্ষণ। তার পরে তাও মুছে গেল। সেই রঙের উজ্জ্বলতাটুকু মুছে গেলে, পৃথিবীর ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল আর সেই রুদ্র বন্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কয়েকটা ভীত পাখীর আর্ত্ত কলরব শোনা যেতে লাগল শুধু। কয়েক মুহূর্ত্ত ভয়ঙ্কর একটা নিস্তব্ধতা, তার পরে দূর বহুদূর হতে আসা তীক্ষ্ণ সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। দেখতে দেখতে ভীষণ গর্জ্জনে সেই শব্দ বেড়ে উঠতে লাগল, দেখা গেল দূরের গাছপালা পাগলের মত মাথা আছড়াচ্ছে। তার পরে ঝড় এসে পড়ল।

ত্রস্তে গোদাবর একটা হুকুম দিল। লঙ্গুরের দল প্রাণভয়ে লেজ তুলে অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গার অভিমুখে ছুটল! বনের উপর চলল ঝড়ের রুদ্র লীলা।

সে ঝড় আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেই ভয়ঙ্কর সীসে কালো অন্ধকারে ঝড়ের রুদ্র গর্জ্জন ভেদ করে গাছের দলের গোঙানি ভেসে উঠতে লাগল। কত বড় বড় ডাল মট মট করে ভেঙ্গে পড়তে লাগল আর হতে থাকল গাছে গাছে ঠোকাঠুকি হওয়ার একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রহস্যময় শব্দ!

লঙ্গুরের দল অল্প একটা ফাঁকা জায়গায় বসে কাঁপতে কাঁপতে ঝড়ের সেই ধ্বংসলীলা দেখতে লাগল। তাদের কত পরিচিত গাছ কত বাসা উপড়ে গেল, কত শাখাময় পথ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। মংলু সভয়ে সবিস্ময়ে গোদাবরের গা ঘেঁসে বসে প্রকৃতির এই নিরুদ্ধ শক্তির ব্যভিচার লক্ষ্য করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের ভীষণ বেগ। লঙ্গুরদের সাথে মংলু সবলে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। থেকে থেকে বন কাঁপিয়ে গাছ ওপড়ানর ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশের ক্রুদ্ধ আঁধার মিশে গেছে। সময়ের আর হিসাব নিকাশ নেই।

গোদাবর বলল—শুধু যদি এখন বৃষ্টি নামে তা হলেই রক্ষে!

ঝড়ের শব্দে গলার আওয়াজ ডুবে যায়। মংলু প্রাণপণে চেঁচিয়ে জিগেস করল—বৃষ্টি না হলে কি হবে?

গোদাবর বলল—খারাপ, ভয়ানক খারাপ।

কিন্তু বৃষ্টির কোনই লক্ষণ দেখা গেল না, না দেখা গেল ঝড়ের উপশমের কোন চিহ্ন। গাছের পাখীরা মরে ঝরে পড়তে লাগল। দুরন্ত ঝড়ের কোনই লক্ষ্যই নেই।

কত যে সময় কেটে গেল কেউ আর এ বিপদে ভাবতে পারে নি। হঠাৎ ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে লঙ্গুরেরা আর্ত্তনাদ করে উঠল—আগুন আগুন! বনের ভেতর তখন ঝড়ের ঘর্ষণে, গাছের দলের মাথায় লকলকে জিভ নিয়ে দাবানল লাফিয়ে উঠেছে।

বুনো জানোয়ারেরা আগুনকে যেমন ভয় পায় তেমন আর কিছুকে নয়। আগুন দেখলে আর তাদের জ্ঞান থাকে না। আর দাবানল বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। এক মুহূর্ত্তের এতটুকু আগুনের স্ফুলিঙ্গ, বাতাসের সাহায্য পেয়ে দেখতে দেখতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে সমস্ত বনের মাথায় আগুনের লেলিহান জিহ্বা বিস্তারিত হয়ে ভীষণ মূর্ত্তি ধরে এগিয়ে আসতে লাগল।

লঙ্গুরেরা চীৎকার করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কোথায় বা গেল গোদাবর আর কোথায় তার দল! যে যেদিক পারল প্রাণপণে ছুট মেরেছে তখন। অন্ধকারে আগুনে বনের চারপাশ তখন ভয়ঙ্কর। মংলু চেঁচিয়ে উঠল—গোদাবর, গোদাবর? গুপী?

কোথায় কে? প্রাণভয়ে সকলেই অন্তর্হিত! তখন দল ছাড়া হয়ে একটা ভয়ঙ্কর ভয় মংলুর মনে চেপে বসল। সেও তখন কোন কিছু লক্ষ্য না করে প্রাণপণে ছুটল একদিকে। তার পেছনে তখন ক্রুদ্ধ আগুনে কাঁচা গাছ ফাটছে—ফট্ ফট্

আগুনের হল্কা বয়ে ঝড় ছুটেছে—সোঁ···সোঁ...সোঁ···!

লক্ষ্যহারা হয়ে দলছাড়া হয়ে মংলু প্রথমটা আচমকা ভয়ানক ভয় পেয়েছিল। ছুটতে ছুটতে তার খেয়াল হল যে এ রকম দিক্‌বিদিক হারিয়ে ছোটা ঠিক হবে না। ওই সর্ব্বগ্রাসী আগুনের হাত থেকে আগে প্রাণ বাঁচাতে হবে। নীচের বনে আগুন লেগেছে, চড়াই-এর বনে এখন উঠতে পারলেই রক্ষে। মংলু ছুটতেই ছুটতেই দিক ঠিক করে ফেলল। একবার সে আকাশে মুখ তুলে লঙ্গুরদের হাঁক ছাড়ল—উঁ ই উঁ ই হুহুপ! গোদাবর! গুপী গুপী!

কে সাড়া দেবে? ঝড়ের দুরন্ত গর্জ্জনে আগুনের শিখার তীক্ষ্ণ শীষে তার ক্ষীণ স্বর কোথায় হারিয়ে গেল! মংলু গারো পাহাড়ের চড়াই লক্ষ্য করে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। দাবানল তখন নীচেয় সারা বনময় ছড়িয়ে গেছে।

ভাল্লুকদের দুলকি চালে ত্রস্ত চলায়, লঙ্গুরদের দুরন্ত গতিতে পথ পিছে রাখায় অভ্যস্ত মংলুর ক্লান্তি সহজে আসে না। তবু একভাবে এই দুরন্ত ছুটে চলায় সে হাঁফাতে লাগল। পেছনে আগুনের শিখারা লাফাচ্ছে, গর্জ্জাচ্ছে, তারই আলোয় সারা বনে একটা ভূতুড়ে ভাব। মংলু ছুটে চলেছে, হঠাৎ পেছনে দুরন্ত ক্ষুরের শব্দ, মাটি কাঁপছে। কারা যেন তীব্র গতিতে ছুটে আসছে, একটা প্রকাণ্ড দল। মংলু একটা গাছের পা ঘেঁসে সরে দাঁড়াল আর সেইখান থেকে দেখল, এক দল সম্বর ধুলোয় ধোয়াঁয় অগ্নিময় আকাশ সমাচ্ছন্ন করে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল। মংলু আবার পেছু নিল তাদের। তার পরে কত রকমের জানোয়ার তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। দাবানল সমস্ত বন্য জগতে একটা তাণ্ডব ওলট পালট এনে দিয়েছে। সবাই যে যার প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে ব্যস্ত। কে কার ঠিকানা রাখে ঠিক নেই। সম্বরদের দেখে মংলু বুঝল যে সে অনেকটা চড়াই উঠে এসেছে। সম্বরেরা উঁচুতে থাকে। তবু মংলু আরও আরও চড়াই লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। আগুনের এত কাছে এ বনেও যে কোন মুহূর্ত্তে আগুন ছড়িয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে শেষ রাত্রের দিকে ঝড়ের বেগ থেমে গেল। চড়াই-এর মাথায় একটা ঠাণ্ডা কন কনে বাতাস শুধু তখনও ঝড়ের অস্থিরতার শেষ রেশটুকু বয়ে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে নিভন্ত ক্রোধে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গা গাছপালায় বন লণ্ডভণ্ড। একটা পাহাড়ের কোণ ঘেঁসা একটা বড় গাছের ডালের ওপর বসে মংলু তাদের পুরোণ আড্ডা সুদূর নীচের বনের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। উঁচু সেখান থেকে তখন মনে হচ্ছে কে যেন নীচের বনে দেওয়ালীর আলো জ্বালিয়ে

দিয়ে গেছে। নীচের সারা পৃথিবীর বুকে দিগন্তে ছড়িয়ে গোল হয়ে লাল আগুন তখন জ্বলছে কাঁপছে
লাফাচ্ছে। আর ওপরের সেই নির্জ্জন নিরালা বনের গাছের ডালে বসে মংলুর বুক থেকে একটা চাপা
দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নালুখের দল চলে গেলে এক মুহূর্ত্ত তার নিজেকে বড় সঙ্গীহীন অসহায় বলে বোধ
হয়েছিল, কিন্তু সে ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। লঙ্গুরদের দলে সে আবার সাথী পেয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল।
তারপরে কি হতে কি হয়ে গেল। কোথায় গেল লঙ্গুরেরা তার ঠিকানা নেই। কে মারা গেল, কে বেঁচে
রইল তাও সে জানে না। অচেনা নিরালা বনে মংলু এবার সম্পূর্ণ একা!

বন্যজগতে দুঃখ বেদনার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয়, তা হলে চলেও না। সেখানে বেপরোয়া ভাবে সব মেনে
নিতে হয়। গাছের একটা মোটা ডাল দেখে মংলু শেষ রাতটুকুর বিশ্রামের আশায় তার দেহ এলিয়ে দিল।
মনের সব দুর্ভাবনা সে জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজল। যা হবার সব সকালে দেখা যাবে। জীবন
যতক্ষণ আছে জীবনের আশাও প্রবল। ক্ষীণায়মান তীক্ষ্ণ বাতাসে পাহাড়ের পাদমূলে বন প্রতিধ্বনি
হতে লাগল।

শেষ রাতের অন্ধকার তখন পূবের ধুসর মূর্ত্তির পানে চেয়ে শিউরে শিউরে উঠছে। একটা ক্লান্তি-
হরা তন্দ্রা মংলুর চোখে নেমে এসেছিল। হঠাৎ কি যেন একটা শব্দে চমকে সে লাফিয়ে উঠল। বন আবার
নিস্তব্ধ। মংলু বোকার মত চারদিকে চাইতে লাগল। সে কি স্বপ্ন দেখেছে? কিন্তু না ঠিক তার মনে
হোল সে শুনেছে। মংলু কান খাড়া করে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল। বাতাস তখনও অট্টহাসি হাসছে।
হতাশ মংলু অনেকক্ষণ পরে আবার শুয়ে পড়বার জোগাড় করছে আর ঠিক সেই সময় আবার তার কানে এল
ক্ষীণ অতি ক্ষীণ একটা কুঁইকুঁই শব্দ। এবার তার ভুল হয়নি, এবার সে ঠিক শুনেছে। মংলু গাছের ওপর
দাঁড়িয়ে উঠে ডাক ছাড়ল—উই উই—হু—উ-ই!

তখন বনের মধ্যে থেকে আরও কাতর একটা শব্দ উঠল—কুঁই কুঁই কুঁই!

তারপরে শব্দটা নিকটতর হতে লাগল। মংলুও উৎসাহে আবার চেঁচিয়ে উঠল।

বাতাসের শীষ, স্তব্ধতা, পাতার খস্ খস্, স্তব্ধতা, পাতার খস্ খস্।

—কুঁই কুঁই কুঁই!

এবার শব্দটা একেবারে কাছে। আর হঠাৎ দূরের একটা গাছের ডালে একটা ছায়ার মত মূর্ত্তি
নড়ে উঠল।

মংলু আর থাকতে পারছে না যেন, সে চিনতে পেরেছে—গুপী গুপী?

—কুঁই কুঁই কুঁই…

আর্ত্তনাদ করতে করতে দলহারা গুপী মংলুর দিকে ডালে ডালে ছুটে আসতে লাগল। সে আর্ত্তনাদ
দুঃখের বা আনন্দের তা আমরা জানি না।

(ক্রমশঃ)

ইস্‌কুল

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ইস্কুল ইস্কুল আমাদের ইস্কুল—
ছুটোছুটি লেখাপড়া হাসিখুসী মশগুল্!
স্বপ্নের পুরী যেন কোন বনপ্রান্তের,
স্বপ্নদেশের ছবি ঐ সে দূরান্তের!
ছুঁইয়ে পরশ-কাঠি যাদুকরা বিলকুল—
ইস্কুল ইস্কুল আমাদের ইস্কুল!

ঢং ঢং ঘড়ি বাজে ঘণ্টায় ঘণ্টায়,
ছুটির স্বপন জাগে চঞ্চল মন্‌টায়;
ছেলেদের হুটোপাটি, রাঙা-আঁখি মাষ্টার,
ব্ল্যাক্‌বোর্ডে আঁককষা মুছেফেলা বারবার,
বর্ষায় বল-খেলা জলকাদা তোলপার—
বনে-বনে চাকভাঙা মৌমাছি বোল্‌তার!

কাঁকরে রাঙানো পথ গেছে এঁকে বেঁকিয়ে।
নারকেল বন দেখি মেঘে মাথা ঠেকিয়ে।
দূরে জেলে জাল ফেলে শোনা যায় শব্দ;
দুপুরে ঘুঘুর ডাক—চারিদিক স্তব্ধ।
শরবন পার হয়ে নদী চলে কুলকুল—
রুণ্‌কী নদীর তীরে আমাদের ইস্কুল!

জানোয়ারের খেলাধূলা

মানুষের মত বুনো জন্তুজানোয়াররাও যে খেলাধূলো করে এবং সে খেলা দেখে' যে, রীতিমত আমোদ পাওয়া যায়, তা' অনেকেই মানতে রাজী হবেন না। অনেকের ধারণা, খেয়ে, ঘুমিয়ে আর বেশীরভাগ সময় খাবার খুঁজে হায়রাণ হয়েই জন্তুজানোয়ারদের সময় কাটে। তাঁরা ভুলে যান, জন্তুদেরও যথেষ্ট উপরি সময় থাকে—তখন তারা হাই তোলে, ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়, নয়তো রীতিমত খেলাধূলো করে। আমেরিকার এক লেখক এই রকমের একটি মজার খেলা দেখেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে কিছুটা আমরা তুলে দিচ্ছি।

"জলাটা পার হয়ে এলুম। পার হলুম কথাটার অর্থ এই যে জলার ধার দিয়ে বরাবর ঘোড়া হাঁকিয়ে ডাঙা দিয়েই জলার একধার থেকে আর একধারে এলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে. শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মত ছুটছে।

হঠাৎ বাতাসে তিন নম্বর একটা ফুটবলের মত জট পাকানো একগোছা শুকনো লতা চর্কি খেতে খেতে এলো। লতার বলটার পিছনে একটা মস্ত নেকড়ে হা হা ক'রে ছুটে এলো। তার পিছনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এলো বিশটা নেকড়ে। দলের আগে পালের গোদা নেকড়েটা বলটাকে তাড়া করে ছুটে এসেছে। হঠাৎ, হাওয়া একটু পড়তেই, নেকড়েটা বলটাকে প্রায় ধরে ফেললে। কিন্তু হাল্কা বল, নেকড়ের মাথায় একটা ধাক্কা খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে এক পাশে গিয়ে পড়ল। নেকড়ে একলাফে ধরতে যেতেই, হঠাৎ হাওয়া দিলে, বলটাও সাঁ করে' সামনে উড়ে চলল। সেই তেপান্তরের শুকনো ধূ ধূ মাঠ। কোথাও কেউ নেই। আকাশে একখানি চাঁদ উঠে এসেছে। সেই আবছা চাঁদের আলোয় সেই জনশূন্য মাঠে লতার বলটা বাতাসে চর্কি খেয়ে উড়ে চলেছে, আর তার পিছনে একুশটা নেকড়ে মহাউৎসাহে ধাওয়া করে চলেছে।

দুটো নেকড়ে বলটাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। বলটা বাতাসে তখন হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠল। নেকড়ে দুটো তড়াক করে শূন্যে লাফ মারলে। মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে দুটোই মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ল, বলটা হাওয়ার তাড়ায় অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল।

নেকড়েদের চোখের ভাব তখন দেখবার মত। তারা নিতান্ত অসহায়ের মত আকাশে তাকিয়ে আছে—বলটা হয়তো আর নীচেয় নামবে না!

হঠাৎ দেখা গেল বলটা আস্তে আস্তে নীচে নামছে। নেকড়ের দল গা ঝাড়া দিয়ে তৈরী হয়ে নিলে, তারপর তারা গোল হয়ে দাঁড়াল। বলটা অনেকটা নেমে এসেছে, নেকড়েদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ ব্যস্তবাগীশ এক নেকড়ে মারলে লাফ, শূন্যেই বলটাকে সে লুফে নেবে।

কিন্তু নেকড়ের মাথার ধাক্কায় হাল্কা বলটা আবার আকাশে উঠে গেল। অন্য নেকড়েরা তাদের সঙ্গীটির নির্ব্বুদ্ধিতায় হতাশ হয়ে পড়ল। একুশটি নেকড়ে তখন মাটিতে হাঁ করে বসে পড়ল।

কখন নিঃসাড়ে বলটি নেমে পড়েছে, নেকড়ের দলের হুঁশ নেই। হঠাৎ একটা নেকড়ে দেখল, বল, বলটা প্রায় এসে পড়েছে। তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার করে নেকড়েটা থাবা দিয়ে বলের মাথায় মারল একটা চাটি, বলটা এবার সোজাসুজি হাওয়ার অগে ছুটতে ছুটতে চলল। নেকড়ের দল বলটার পিছনে তাড়া করে চলল। তারপর, কোথায় বা সেই লতার বল, কোথায় বা নেকড়ের দল!

ভাবলুম খেলা এইখানেই শেষ। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিলুম—হট্ হট্। কিন্তু ঘোড়াটা নড়ে না। হঠাৎ একটা ধুলোর ঝড় যেন ছুটে আসছে। দেখি, না, খেলা ফুরোয়নি। বলটাকে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে নেকড়ের দল ছুটে আসছে।

নেকড়েরা দুটো দল হয়ে গেছে। একদল বল নিয়ে ছোটে, অন্য দল তাড়া করে' বলটা ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়। নেকড়েরা রীতিমত আমাদের ফুটবল খেলার মত প্রাণপণ খেলছে। সকলেরই চোখে মুখে একটা উত্তেজনার ভাব। দুটো করে নেকড়ে বলটা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে ওঠে, মাথা ঠুকে দুজন মাটিতে পড়তেই দুইদল এসে বলটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হঠাৎ এক সময় নেকড়ের দল একেবারে থেমে গেল। বিশটি নেকড়ে বসে হা হা করে হাঁপাতে লাগল, তখন কি মনে করে পালের গোদা নেকড়ে গিয়ে দুই থাবা দিয়ে সেই লতার বলটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে।

আমি বুঝলুম, এবার সত্যি সত্যিই খেলা শেষ।"

বাদশাহী গল্প

ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

দাদামশায়ের বুঝি যত চাকরবাকর সহিস কোচম্যানের সঙ্গে আলাপ !

—আরে ভাই তারা কি তোমার আজকালের পিলে-গোবিন্দ না যেদো মেথর—হেঁজি-পেঁজি লোক ছিলনা তারা, সব তারা কেতাদোরস্ত মানুষ ছিল। সভ্যভব্য ছুটো ভদ্রলোক এলে তাদের খাতির করে তুষ্ট করে দিতে পারতো, তাইতো তাদের ঘরখানার নাম ছিল তোষাখানা। এখনকার বাবুদের বৈঠকখানাও তেমন ফিট্‌ফাট নয় ! ছম্‌শের কোচম্যান যখন সেজেগুজে গোঁফ চুমড়ে, বৈকালে আস্তাবোলের ছাতে খাটিয়াতে বসে গড়গড়া টানতো, তখন যেন বোধ হতো টিপু সাহেব ছবি ছেড়ে বেরিয়েছে ! আরবী ঘোড়াতে আর গাধাতে যতটা তফাৎ তখনকার চাকরে এখনকার চাকরে ততটা তফাৎ। মোহনলালসিং জমাদার, কি চেহারা কি দাড়ি গোঁফই ছিল তার ! শ্বেতচামর রন্‌জিৎসিংহ মিলিয়ে একটা ব্যাপার ! দাড়ি মাজতো রোজ সে একপোয়া দই আর কেশর ফুলের গুঁড়ো মিলিয়ে, দেউড়ির রাজা বল্লেও হয় ! বুদ্ধু হরকরা, বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার, মজলিসী চেহারা সাজ-গোজ এমন যে দেখলে ইচ্ছে হত হরকরা হই নয় তামাক খাই গের্দ্দা ঠেসান দিয়ে !

বিশ্বেশ্বর কি তামাকই সাজাতো ! গন্ধে ভর হত বাড়ি। ভিস্তিখানার একটা লম্বা টেবিলে সকাল থেকে সারি সারি ধরা থাকতো সট্‌কা—ছহাত নল ছাড়া যা টানাই যেতোনা. গুড়গুড়ি—সান্ত্রী খাড়া যেন বন্দুকের নল উঁচিয়ে, গড়গড়া—যেন গদীয়ান মহাজন গড়ানে ভুঁড়ি, বাঁধাহুঁকো—পিলোরোগা লম্বা-গলা কালোকোলো পাড়াগেঁয়ে জমীদারটি ! তার পরে কল্কি ধুনুচি ! যে যেমন দরের মানুষ তার জন্যে তেমন দরের তামাক জোগাতো বিশ্বেশ্বর !

আমি এক একদিন তামাকের লোভে যেতেম ; বিশ্বেশ্বর অমনি সট্ করে সট্‌কার উপর থেকে কল্কিটা তুলে নিয়ে বলতো চট্ জল্‌দি টান দিয়ে সরো। মুখে খানিক গোলাপজল আর গুড়গুড় গন্ধ ভর্ত্তি ক'রে দে দৌড়, দোতলা থেকে বিশ্বেশ্বর বলে হাঁক কানে পৌঁছতে না পৌঁছতে !

—তারপর !

...তারপর শোনোনা এক মজার কথা।—চায়ের দোকানে যেমন সকাল থেকে লোক ঢোকে আর বার হয় তেমনি সস্তার তামাকখোররা বিশ্বেশ্বরের ভিস্তিখানায় আনাগোনা করত ! ওর মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের মুনিখুড়ো, তিনি এই গল্পটা করতেন : বাবা, প্রথমটা তামাক ধরালে বিশ্বেশ্বর। তখন পয়সার নাম গন্ধ করলেনা। হরদম তারা চালায় : যখন দেখলে নেশা বেশ জমেছে, তার দোরে ছুবেলা ছুছিলুমের জন্যে ধরণা দেওয়া ছাড়া আমি অনন্য গতি, তখন তুল্লে পয়সার কথা মহালয়ার ঠিক পূর্ব্বদিন—

দেখ বাবু উপরি পাওনা থেকে এতকাল তোমার তামাক জুগিয়েছি, এবার পার্ব্বনী থেকে তোমার কিছু জমা না দিলে তো চলবে না !

আমি বলি,—দেখ বিশ্বেশ্বর গরীব ব্রাহ্মণ আমাকে মেরে তোমার কি লাভালাভ !

—সেকি, আমি হলেম আপনাদের চাকর, হুকুম করেন আমি কালথেকে ভিস্তিখানার ফর্দ্দতে আপনার নাম তুলে দিই। যোগেশ মামা দেখি ছুছিলিম দশছিলিম যা বরাদ্দ করে দেন আমি দেবো, আমার কি ! তখন বেখরচায় যত পারো সরকারি পয়সা পোড়াও মনের সাধে !

আমার মাথায় তো বাবা বজ্রাঘাত হলো—যোগেশ মামার ফর্দ্দধরা মানে কর্ণমর্দ্দন, তত্থপরি তামাকের আশা বিসর্জ্জন ! কি করি—টাল্‌মাটাল্ করে সেদিনটা তো গেল। তার পরদিন হুঁকো টেনে কেশে মরি, নিছক দা'কাটা ঝেড়েছেন বিশ্বেশ্বর !

বল্লেম—ও বিশ্বেশ্বর কাশ রোগ ধরবে নাকি !

কড়া হয়েছে ? তা বেশ বৈকালে কিছু ভেল্‌সা দেওয়া যাবে !

বৈকালে বিশ্বেশ্বর এমম ভেল্‌সা চালালে যে খালি কুয়াশা খাচ্ছি !

—ওবিশ্বেশ্বর এ যে বিষম নরম !

কি করি বলেন, তামাকের বাজার বড় গরম হয়েছে, আবগারি টেক্সো চেপেছে, বিশ্বাস না হয় ছোটেলালকে শুধোতে পারো, সে কাল তামাকের পাতা কিনেছে।

মহালয়া কাটলো এইভাবে।

পূজোর বাজারে সেবার নতুন উঠেছে 'পম্পসু'। পার্ব্বনীর টাকা-কটা তাতেই আটকে ফেল্লেম।

একখানা চিরকুট কাগজে গোল করে একটা খোলামকুচি মুড়ে ষষ্টির দিনে বিশ্বেশ্বরের হাতে গুঁজে দিয়ে বল্লেম, চট্‌পট্ দাও একছিলুম ! খেয়ে পূজোবাড়ি ঘুরে আসি ! বাবা ! আঙুলের টিপে চিনতো বিশ্বেশ্বর কোন তামাকের কি টিকের কত দর ! কোনো কথা না বলে বাঁধা-হুঁকোয় কল্কি চাপিয়ে হাতে তুলে দিলে ; টান দিই খালি হাওয়া আর একটু কাগজ-

পোড়া গন্ধ! বৈঠকের পরে হুঁকোটি নামিয়ে রেখে নতুন পম্পজোড়া কোঁচায় বেশ করে মুছে উঠে পড়লেম, বিশ্বেশ্বর একবার আড় চক্ষে দেখে নিলে জুতোটার দিকে।

এই পর্য্যন্ত হয়ে রইলো ষষ্টির দিনে।

কদিন এবাড়ি ওবাড়ি পান তামাক খেয়ে কাটালেম। বিজয়ার সন্ধ্যেবেলা—বিশ্বেশ্বর তেগে আছে কখন যোগেশ মামাকে প্রণাম করতে যাই। ফাঁকতালে আমিও সট্ করে ঢুকেছি দেওয়ানখানায়। বুড়োকে প্রণাম করে কোলাকুলি সেরে মিষ্টিমুখ করে ঢুকেছি, কোথা ছিল বিশ্বেশ্বর, হুঁকো কল্কি আর ফর্দ্দ হাতে হাজির। ফর্দ্দখানা যোগেশ মামার দিকে আর হুঁকোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দাঁড়ালো! আমিতো অধোবদন! মামা ফর্দ্দ দেখে বল্লেন, কি বাবাজী—ধরা হয়েছে দেখছি! ফর্দ্দে কছিলুমের বরাদ্দ ধরবো বলে ফেল, লজ্জা কি!

—যাই! দাদা ডাকছেন বলেই তো আমি চম্পট! হো হো হাসির মধ্যে সেদিনটাও চুকলো—

পাঁচ দশ বাড়ি বিজয়ার কোলাকুলি ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখে ফিরতে রাত প্রায় কাবার! তাড়াতাড়িতে পম্পসুজোড়া ভিস্তিখানার আলমারির তলায় লুকিয়ে, সোজা চলে গেলেম চান ঘরে। বিশ্বেশ্বর দেখলেম বেঞ্চেতে পড়ে বেহুঁস নাক ডাকাচ্ছে! হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি, হুঁকো-কল্কি হাতে বিশ্বেশ্বর।

ফর্দ্দে নাম উঠে গেছে খুড়োমশায়, নেন দেখেন ভাল তামাক সেজেছি কিনা!

কি বলবো বাবা—ঢের ঢের বাড়িতে তামাক খেয়েছি, সে তামাকের সোয়াদ কোথাও পাইনি। পেটভরে টান দিয়ে কল্কিটাকে ফাটিয়ে তবে ছাড়লেম! জুতোজোড়া হাতড়াতে গিয়ে দেখি নেই! রগটা ঝনাৎ করে উঠলো, গুম্‌খেয়ে গেলেম।

বিশ্বেশ্বর বল্লে, কি ভাল হয়নি তামাক? আর একছিলুম সাজবো!

না:, বলে একবার তোষাখানার বারাণ্ডা ঘুরে জুতো খুঁজে এসে বল্লেম, জুতোজোড়া ছিল, দেখেচো বিশ্বেশ্বর!

আজ্ঞে না কোথায় রেখেছিলেন? উপরে বাবুকে তামাক দিয়ে আসতে দেখলেম এক-পাটি জুতো চিৎহয়ে সিঁড়ির তলায়, আর এক পাটি উপুড় হয়ে দেউড়িতে পড়ে, দেখেন যদি কুকুরে টেনে ফেলে থাকে।

গিয়ে দেখলেম আমারি ছেঁড়া চটীপাটি অনেকদিনের হারানো।

তখন উপরে নন্দ ফরাশ ঘর ঝাঁটাচ্ছে তারি শপ্‌শপ্ শব্দ ক্রমে সিঁড়ি বহে বারাণ্ডার দিকে চলে গেল। আমি সারা বাড়ি খুঁজে হায়রাণ, বুঝলেম, এ বিশ্বেশ্বরেই কাজ। ভালমানুষি

করে বল্লেম দেখ যা হবার হয়েছে বচ্ছরের দিনটা আর দুঃখু দিওনা, জুতোজোড়া নিয়ে থাকোতো দাও।

মশায় আগুন খেয়েছে যে কয়লা ওগরাবেই সে! আমরা গরীব, ফ্যেন্সী জুতো নিয়ে কি করবো,—দিতেন পয়সা তো একটা নাগরা কিনে পরে বাঁচতুম; যাই বাবুর সটকায় জল ফিরিয়ে আনি বলেই বিশ্বেশ্বর নেপথ্যে গমন করলে।

আমিও সট্ করে সেই ফাঁকে সট্কার মুখনলটা ঘরের আর এক কোণে গুঁজে রেখে যেখানকার সেখানে গট হয়ে বসে ডাকলেম, ও বিশ্বেশ্বর আর একছিলুম দেবে না?

আরে মশায় বসেন, বাবুর সট্কাটা দিয়ে আসি। এক মিনিট দেরী হলে কি হবে বোঝেন তো!

—তা আর বুঝিনে বিশ্বেশ্বর! যাও আমি বসে আছি!

—জল ফেরানো হ'ল, নলগাঁটা কল্কি সরপোষ আরখদান সব ফিটফাট, মুখনল আর পায়না?

কি বিশ্বেশ্বর খুঁজ্‌চো কি?

—আরে মশায় মুখনলটা!

দেখ তো বাবুর কাকাতুয়া পাখিটা এইখানে ঘুরছিল, নিয়ে যদি পালিয়ে থাকে!

—এই যে টেবিলে রেখে গেলেম এর মধ্যে কে গাপ্পাই করলে।

—কে জানে বাপু যে প্যাঁজ খেয়েছে তার মুখ গন্ধ করবে, আমারো জুতোটা গেল এ ভাল কথা নয়। তুমি একবার দেখ দেখি খুঁজে জুতোজোড়াটা আমি দেখি, মুখনলটা গেল কোথায়।

—তাই দেখা যাক্ বলে বিশ্বেশ্বর এখানে ওখানে হাতড়ে এই যে আপনার জুতোজোড়া দেখেন দেখি!

আমি দেখলেম সত্যিই পম্প আমার। ফিরে বল্লেম ঐ যে তোমার মুখনল চক্‌চক্ করছে ঐ কোণে দেখতো—

বস্ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়ে চুকলো—

বিশ্বেশ্বর গেল সট্কা দিতে, আমিও দশটার গাড়ি ধরে দেশে যেতে রওনা হলুম। আমি বুঝলুম বিশ্বেশ্বর সদাশিব নয়, বিশ্বেশ্বরও বুঝলেন মুনিখুড়ো তোমাদের মুনীশ্বর নন।

দূরের আলো

লিওনার্দ্দো দা ভিঞ্চি

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিনিসে তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে।

গোলাপী রঙের জামা পরা একটি সুদর্শন বালক সেই সকালেই ভিনিসের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে সে যেখানে পাখীওয়ালারা পাখী বিক্রী করে সেখানে এসে দাঁড়ালো—তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে পয়সাগুলো নিয়ে সে এলো ছুটো পাখী কিনতে। খাঁচাশুদ্ধ পাখীছুটোকে নিয়ে সে কিছুদূর এগিয়ে এলো, তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা খুলে সে ছুটি পাখীকেই উড়িয়ে দিলে। পাখী ছুটো প্রথম ছাড়া পেয়ে একটু বিহ্বল হোয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ছাড়া পেয়েছে তাদের বুঝতে দেরী হোল না—ডানা ঝাপটে তারা উড়ে চলে গেলো। যতক্ষণ তাদের দেখা যায়, বালকটি ততক্ষণ তাদের দেখতে থাকলো—মুখে তার মৃদু হাসি। ৫০০ বছর আগে ভিনিসের ওই বালকের জীবনে এ ছিল রোজকার ঘটনা। বন্দী পাখী তার ভাল লাগতো না; তাকে মুক্তি দিতেই তার ভাল লাগতো।

সেই ৫০০ বছর আগে ইউরোপের সভ্যতা ও চিন্তার ধারা ছিল ওই পাখীর মতই বন্দী। যে বালক ছেলেবয়সে পাখীকে মুক্তি দিত, বড় হোয়ে সেই দিয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যতাকে মুক্তি। কিন্তু সে যুগের লোক তাঁকে চেনেনি—চিনেছিলো পরের যুগের লোক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, একটি লেখক লিখেছেন যে, কোন লোক যখন আপন যুগের চেয়ে কয়েক পা এগিয়ে চলে, তখনও সবাই তাকে মানে। কিন্তু যখন সে কয়েক গজ এগিয়ে যায় তখনই বাধে গোলমাল—সে যুগের লোক আর তাকে চিনতে পারে না—লিওনার্দ্দোর বেলাতেও তাই হয়েছিলো। ফ্লোরেন্স থেকে কিছু দূরে ভিঞ্চি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সে বোধ হয় আজ থেকে ৫০০ বছরের কিছু আগে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত

উকিল এবং মা ছিলেন কৃষককন্যা। ছেলে বয়েস থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়েছিলো। সেই সুন্দর বালক কারো কাছে শিক্ষা না পেয়েই নানারকম মূর্ত্তি গড়তো আর ছবি আঁকতো। এর পর যখনই সময় পেতো, সে ছুটে চলে যেতো নদীর ধারে—নিজের সুরে বাঁধা গান গাইতে। তাঁর বাবা বেশ সৌখীন লোক ছিলেন, আর লোককে বোঝার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজের ছেলের আঁকা এই সব সুন্দর মূর্ত্তি আর ছবি দেখে বিস্মিত হোয়ে গেলেন এবং সেই সব মূর্ত্তি আর ছবি নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর শিল্পি-বন্ধু আন্দ্রিয়া ভেরোকিওর কাছে। ভেরোকিও অতটুকু বালকের গড়া সেই সব মোহন মূর্ত্তি দেখে স্তম্ভিত হোয়ে গেলেন আর তখনই লিওনার্দ্দোকে তাঁর শিষ্য করে নিলেন। লিওনার্দ্দোর বয়স তখন মোটে ষোল বছর। ভেরোকিওর শিল্পাগারেই অনেক বছর কাটালেন। অনেক জিনিস তখন তিনি লিখেছেন। হঠাৎ এমন সময় একটা ঘটনা

লিওনার্দ্দোর অমরচিত্র 'দি লাষ্ট সাপার'

ঘটলো। ভ্যালেমব্রোসা গীর্জ্জায় পাদ্রীরা ভেরোকিওকে দিলেন ক্রাইষ্টের জীবনের একটা ঘটনা আঁকতে। ভেরোকিও সেই ছবির প্রায় সমস্তটা এঁকে লিওনার্দ্দোকে দিলেন এক কোণে একটি দেবদূতের ছবি আঁকতে। লিওনার্দ্দোর ছবি আঁকা যখন শেষ হোলো তখন ভেরোকিও সে ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলেন! সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর সেদিন মনে হোল যে, তিনি এতদিন বৃথাই সময় নষ্ট করেছেন। একটি অখ্যাত বালক তার ছবির একটি কোণে শিল্পের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছে—তাঁর সমস্ত ছবির একটিতেও তিনি তা পারেননি। গুরু সেদিন বুঝলেন যে, শিষ্য তাঁকে দেউলে করে দিয়েছে—তাকে দেবার কিছুই রাখেনি। গুরুকে জয় করে লিওনার্দ্দো চললেন বিশ্ব জয় করতে। অন্য শিল্পিরা প্রাচীন গ্রীস্ বা রোমের শিল্প দেখে শিল্পি হতে চায়। তিনি কিন্তু তা করেননি। তিনি জানতেন যে,

এই বিরাট প্রকৃতির মধ্যেই লুকোনো রয়েছে এই শিল্পের প্রাণ—প্রকৃতির মধ্যে তাকে খোঁজা উচিত, পাথরের মূর্ত্তিতে নয়। তাই তাঁর কাছে একটা প্রস্তরখণ্ড এবং সূর্য্যাস্ত দুই-ই সমান। দুই-এর মধ্যেই তিনি সেই শিল্পের প্রাণকে খুঁজে পেতেন। মানুষ এবং নানা রকম জন্তুর দেহকে নিজের পরীক্ষাগারে ব্যবচ্ছেদ করে তিনি শরীরতত্ত্ব জেনে নিতেন—এবং ঠিক তেমনি করেই তাঁর ছবিগুলি আঁকতেন।

এ ছাড়া তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য তিনি জানতেন এবং তা কাজেও লাগাতেন। আকাশের কথা আর কলকব্জার কথা নিয়ে আলোচনা করতে করতেই তাঁর মাথায় সর্ব্বপ্রথম এয়ারোপ্লেনের কথা আসে। যে গাড়ী বা সাইক্লের চাকা আজ আমরা ব্যবহার করি তাও তাঁর মাথা থেকেই এসেছিলো। তাঁরই হাতের তৈরী করাতের সাহায্যে সে যুগের ইয়োরোপের সমস্ত পাথর কেটে মূর্ত্তি তৈরী করা হোত। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করার বিজ্ঞানও তিনি জানতেন। চাষ-বাসের নানারকম যন্ত্রপাতিও তিনি তৈয়ারী করেছিলেন। শরীরবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দর্শন শাস্ত্রেরও বহু কূট প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করেছিলেন।

এমনি ভাবেই তাঁর মধ্যে শিল্প আর বিজ্ঞানের মিলন ঘটেছিলো—পৃথিবীর অতি অল্প লোকের মধ্যেই যা ঘটে। এতগুলি কাজ তিনিই একাই করতেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তিনি কাজ করতেন। ষ্টুডিয়োই ছিল তাঁর ঘর-বাড়ী—সেখানেই তিনি থাকতেন। তবে তাঁর এই প্রতিভার একটা দোষ ছিল—সব বিষয়েই প্রতিভা থাকার দরুণ, তিনি একসঙ্গে নানা কাজে হাত দিতে যেতেন, তিনি কখনও কোন কাজ ভালো শেষ করতে পারতেন না। যেদিন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন দেখা গেল যে, অন্য অন্য অনেক অল্পবয়স্ক শিল্পির চেয়ে তাঁর আঁকা ছবির সংখ্যা অনেক কম—কিন্তু যে কটি এঁকেছেন তার তুলনা হয় না!

লিওনার্দ্দো আজ আর নেই কিন্তু আজও বেঁচে আছে Mona Lisa আর তাঁর বিখ্যাত 'Note Book'—তার মধ্যেই আমরা আজও লিওনার্দ্দোকে খুঁজে পাই।

দ্রষ্টব্য

যীশুখ্রীষ্টের যে বন্ধু তাঁকে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, আগের দিন সন্ধ্যায়ও তিনি ক্রাইষ্টের সঙ্গে একটেবিলে বসে খেয়েছিলেন। সেই ছবি খুবই ছোট করে আমরা ছেপেছি, নাহলে তোমরা দেখতে সেই বন্ধুর মুখভাব কী নিপুণহাতে লিওনার্দ্দো এঁকেছিলেন। যীশুর শেষ সান্ধ্যভোজ, সেইজন্যই ছবির নাম লাষ্ট সাপার।

ঘুতুম দেশের রাণী

ঘুতুম দেশের রাণী
রাতদুপুরে জেগেই হাঁকেন, ধা তের্ কেট্ ধা নি।
চমকে রাজা ভিরমি খেয়ে বলেন, জানি জানি।
ঘুতুম দেশের ঘুতুম রাজার ছিলেন ঘুতুম রাণী।

ঘুতুম রাণীর টাকশালে নেই একটা কাণাকড়া,
গানের দেশের টাকশালাটা তব্লা দিয়ে ভরা,
টাকশালেতে তব্লা বাজে ধা কিট্ কিট্ হাঁক,
রাজামশাই সভায় বসে বাজান যে জয়ঢাক।
ঘুতুম দেশের হাটবাজারে সওদা আটি আটি—
টাকাকড়ির কোন্ প্রয়োজন? তব্লাতে দাও চাটি।
এক চাটিতে মিলবে কলা, দুই চাটিতে আম,
তিন চাটিতে দইয়ের হাঁড়ি, হাফ-চাটিতে জাম।

ঘুতুম দেশের রাণী,
গলায় পরেন ভিক্টোরিয়ার পুরণো দুই আনি।
টাকা দিয়ে গুল্‌তি ছোড়েন, উননে দেন নোট,
ধাঙ্গরেরা ধাপার মাঠে বয় মোহরের মোট।
গানের দেশের আজব বিধান, যেই ছুঁয়েছ টাকা,
শাস্তি হবে সাত রাত্তির বালি খেয়ে থাকা।

ঘুতুম দেশের রাণী,
খোপার মাঝে রাখেন বেঁধে মস্ত বাঁশীখানি।
দুই হাঁটুতে রাখেন বেঁধে ঝন্‌-ঝন্‌ করতাল,
চলতে গেলে চলার যেন ঠিক থাকে লয় তাল।
গানের নেশায় আছেন রাণী, সারাটি রাত ভরে
গানের আসর জাগেন, দিনে ঘুমটি চোখে ধরে,
ঘুমিয়ে দিন কাটান রাণী, যেই বাজে করতাল,
হাঁক দিয়ে কন ধা কিট্‌ কিট্‌, রাখ্‌ মান রাখ্‌ তাল!

কালিফোর্ণিয়ার গোল্‌ড্‌ রাশ্‌ (Gold Rush) ইতিহাসের চিরস্মরণীয় ঘটনা। সোনার ডাকে মানুষ একদিন ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

ছবিতে এইরকম একটা দল দেখা যাচ্ছে, এরা সোনার হাতছানিতে ছুটে চলেছে। বিচিত্রদল—কেউ চাষা, কশাই; কেউ বা দিব্যি সভ্যভব্য কেতাদুরস্ত মানুষ।

নিতান্ত আকস্মিক দুর্ঘটনা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"একটা বিজ্ঞাপনমাত্র।" বলেন পরেশবাবু। "কেবল এইটুকু কথা, 'আমরা নিরামিষাশী বটে, কিন্তু আমাদের কুকুর তা নয়।' এই সংবাদটা কেবল। ঐ ভিকিরি আর ভবঘুরেদের বেজায় উৎপাতের জন্যেই ঐ ঘোষণাটা দিতে হয়েছে।"

"তাহলে তোমার বাঘা বোধহয় এতক্ষণ সেই পাওনাদারকেই পিকনিক করছে! আমার দিকে দৃক্‌পাত করবার ফুরসৎ পায়নি সেইজন্যেই!—"এতক্ষণ বাদে স্বস্তিবোধ করেন অবিনাশ: "একেই বলে রাখে হরি তো মারে কে!" এবং তাঁর অভিযোগের সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস যোগ করে দ্যান্: "হরি পরম দয়ালু! সত্যিই!"

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁর চোখ কপালে উঠে যায়: "আরে,—য়্যা? সেই লোকটাই যে হে! সেই মুশ্‌কো লোকটাই! অক্ষত শরীরেই রয়েছে তো! তোমার বাঘা তো বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি দেখ্‌ছি।"

তাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি—সেই সঙ্গে সমস্ত স্ফূর্ত্তি লোপ পায়। ভগবানের সম্বন্ধে সমস্ত উৎসাহও।

"কী চাও তুমি?" পরেশবাবু জিগ্যেস করেন লোকটাকে।

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—" মুশকো লোকটির মুশ্‌কিল বাধে। ব্যক্ত করতে সে সঙ্কোচ বোধ করে।

"কাজ চাও? না, খেতে চাও খালি?" পরেশবাবুর সরাসরি প্রস্তাব। বাজে ভণিতায় সময় নষ্ট করার তিনি অপক্ষপাতী।

"আজ্ঞে, দুইই। দুই হলেই ভালো। তবে নিতান্তই যদি প্রথমটা আমাকে দিতে আপনার পছন্দ না হয়, দ্বিতীয়টা পেলেও আমার চলে যাবে আপাততঃ। তাতেও আমি নারাজ নই।"

"বেশ। এই শান্তু! যা তো তোর মাসীমার কাছে। উনি যা পিঠে-পুলি বানিয়েছিলেন কাল, তার যা বাদ্ বাকী আছে; নিয়ে আয় সব। কি হে, তুমি পিঠে খেতে ভালোবাসো তো?"

"পিঠে নামক খাদ্য—না, পৃষ্ঠদেশের অখাদ্য?" সসঙ্কোচে এবং খানিকটা সভয়েই, মুশকো লোকটি পাল্‌টা প্রশ্ন করে।

"ও বাবা! এযে সাধু ভাষা বলে দেখছি! বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেরতা বোধ হয়! বুঝ্‌লে অবিনাশ, পেটে খেলে পিঠে সয়, সবাই জানে, কিন্তু পিঠে খেলে পেটে কদাচই সয়! রবীন্দ্রনাথই না বলেছিলেন কথাটা? তা,—তোমার জ্যাঠাইমার বোন্—সহোদর বোন অর্থাৎ কিনা তোমার কাকীমা,—কিম্বা পিসীমা যাই বলো—কাল যা পিঠে বানিয়েছেন তা হজম করা সহজ না ভায়া।"

ততক্ষণে শান্তু এক রাশ পিঠে এনে হাজির করেছে।

"তুমি কাজও চাও, এবং খাদ্যও চাও—কি বলোহে? তাইতো? এই নাও, খাও। তুই এতে হবে তোমার। পিঠে খাওয়া কম দুঃসাধ্য কাজ নয়, বাপু!"

বেকারের উপকার সাধনের পর, পরেশবাবু অতিথি-সংকার-সম্বন্ধে বিবেচনা করেন: "দেখবে নাকি একটা চেখে?"

পিঠের নামে অবিনাশের একটু লালসাই হয়েছিল, একখানা হাতে নিয়ে টিপে-টাপে দ্যাখেন, ভালো করেই দ্যাখেন, কিন্তু নোখ বসাতে পারেন না। দাঁত বসাতে পারবেন কিনা তাঁর সংশয় হয়। লোভ সম্বরণ করে, তিনি নিঃসঙ্কোচেই বলেন: "এ যা পিঠে পরেশ! আমার মনে হয়, তোমার মেজশালার মাথায় এর একখান্ পড়লেও কাজ দিত। থান্ ইঁটের নেহাৎ কম যায় না।"

"তাহলে ও পেটে পড়লে কি রক্ষে আছে? কাজ নেই তবে খেয়ে। ওকেই দাও। সাবধানের বিনাশ নেই, বুঝলে অবিনাশ?"

"বিশেষ, আমার আবার য়্যাক্সিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স করা নেই যখন—" না-খাবার প্রধান কারণ তিনি প্রকাশ করেন অবশেষে।

"একটা করে ফ্যালো না চট্‌পট্। ক্ষতি কি? তারপর পেটে—পিঠে—মাথায় কোথাও কিছু খেতে ভয় খাবে না কখনো। মেজ শালার বরাত খুলে যাবার পর থেকে, ভাবছি, ওই নতুন দুর্ঘটনত্বাটিকে বাদ্ দিয়ে, সপুত্র-পরিবারে সবাই আমরা একটা করে করব।"

"হ্যাঁ, আমাকেও একটা করাতে হবে—"দ্বিতীয় কারণটাও তিনি অপ্রকাশ রাখেন না: "পারৎপক্ষে তোমার কুকুরটার সুবিধা নেবার জন্যেও, অন্ততঃ।"

"এই দানু! এই দানু!—" পরেশবাবুর হাঁকাহাকি সুরু হয় হঠাৎ: "কখন থেকে বল্‌ছি ওকে নিউমার্কেটে যেতে, তা, গ্রাহ্যই হচ্ছে না ছেলের! শানু, ডাক্ তো তোর দাদাকে।—"

দানু ওরকম দলিল, (দুগ্ধপোষ্য-অবস্থায় হাজার টাকার একটা দলিল গিলে ফেলার জন্যেই ওর ওরকম নাম-ডাক। বলা বাহুল্য ওহেন দামী ছেলে আর দুটি নেই বাংলা দেশে।) ওপর থেকে আওয়াজ ছাড়ে: "তোমাকে এক ঘণ্টা থেকে বল্‌ছি না বাবা, যে, এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি আমি? কিন্তু তোমার আর তর্ সইছে না!"

"দাঁড়াও, তর্ সওয়াচ্ছি। কুঁড়ের বাদ্‌শা কোথাকার!" দলিলকে বাজারের দিকে তাড়িত করার মৎলবে, নেপথ্যের দিকে পাড়ি দ্যান্ পরেশবাবু।

"কুকুরটা কি কর্ত্তার খুব আদরের ছিল?" পিঠের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ স্থগিত রেখে মুশ্‌কো লোকটা জিগ্যেস করে হঠাৎ।

"আদরের বইকি!" অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দ্যান্ অবিনাশ: "অনাদর করবার যো কি ওকে! ছিঁড়ে খাবে তাহলে!

খোকা সেই মোটা বইটা বার করে' আনে: "দেখ্‌বেন্? ভারি আশ্চর্য্য কিন্তু! কদ্দিন ধরে আমি যে দেখছি—"

তার অন্তর্গত একটা ছবি এনে উন্মুক্ত করে অবিনাশের সাম্‌নে: "দেখুন্ তো! এই ষাঁড়টা তাড়া করেছে এই লোকটাকে—"

অবিনাশবাবু ভ্রূক্ষেপ করেন: "তাই তো দেখছি! তা কি হয়েছে তাতে?"

"হ্যাঁ রোজই আমি দেখি একবার করে'! অবাক কাণ্ড কিন্তু! এখনও এতদিনেও ষাঁড়টা তবু ধরতে পারেনি লোকটাকে। আশ্চর্য্য নয় কি মশাই?"

এবার অবিনাশবাবু অবাক্ হন্, ষাঁড়কে দেখে নয়, তার বহুদিনব্যাপী অকৃতকার্য্যতাতেও ততটা না—শুদ্ধমাত্র শানুকে দেখেই অবাক্ হয়ে যান্ তিনি। এও নেহাৎ কম যাবে না, দলিলখোর দানুর মতই, তার দাদার মতই, কালেক্কে দামী ছেলেই হবে একখান্।

"আঁকের শূন্যগুলোই তুমি শুধু যোগ দিতে পারো, না, খোকা?"

"হ্যাঁ, কেবল শূন্য-ওলা আঁক্ই আমার ভালো লাগে খুব। আর কিছু থাকেনা, কেবল শূন্য থাকে, এমন আঁক্। কিন্তু এই ষাঁড়টাকে দেখুন্। কি রকম শিং বাগিয়ে তেড়ে চলেছে! কিন্তু—"

'কিন্তু' একটা থেকেই যায়। মুশ্‌কো লোকটাও বলে: "কিন্তু খবরটা তাহলে একেবার বেফাঁস্ করা ঠিক হবেনা, কি বলেন মশাই? কর্ত্তার আদরের জিনিষ বল্‌ছেন যখন আপনি।"

"বল্‌ছিই তো!" অত কিন্তুমিন্তুর ধার ধারেন না অবিনাশ। স্পষ্টাস্পষ্টির তিনি পক্ষপাতী।

"দুর্ঘটনাটা সইয়ে সইয়েই বল্‌ব তাহলে। এই যে এসে পড়েছেন কর্ত্তা! একটা বাঘের মতো তেড়িয়া বুল্‌ডগ্ মশাই, শুনুন্ বলি,—" শানুকে সেল্‌ফের বইয়ে হাত দেবার জন্য ধম্‌কাবার কথা ভুলেই যান্ পরেশ, (শানুর সেল্‌ফ-হেল্‌পের তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধে) "আমার কুকুরের কথা? কি বল্‌ছিলে বলো?"

"হ্যাঁ, আপনারই কুকুর। একটু আগে, আমাকে তাড়া করতে গিয়ে, রাস্তা পেরুবার মুখে, প্রকাণ্ড একটা বাসের তলায়—" লোকটা পুনরায় থামে। পরেশবাবুর সহনশীলতা পরীক্ষা করে। "আমার কোনো দোষ নেই মশাই! আমি তাকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাইনি কিন্তু—"

"কী হয়েছে আমার কুকুরের?" চেঁচিয়ে ওঠেন পরেশবাবু।

"না বিশেষ কিছু হয়নি, কেবল—কেবল ওর অংশবিশেষ চাপা পড়েছে।" মুশকো লোকটা ব্যক্ত করে ধীরে ধীরে: "মাথাটাই চেপ্‌টে গেছে, আর কিছুনা।"

পরেশবাবু স্তম্ভিত হয়ে যান্। বজ্রাহত লোক যেমন হয়। অভাবপক্ষে, মাথায় থান্ ইঁট পড়লেও সচরাচর যেমন হয়ে থাকে।

বহুক্ষণবাদে একটিমাত্র কথা বেরয়, তাও অবিনাশ বাবুর শ্রীমুখ দিয়ে: "নিতান্তই আকস্মিক দুর্ঘটনা! তাছাড়া আর কি বলা যাবে? কিন্তু—কিন্তু একটা কথা! কুকুরটার ইন্সিওরেন্স করা ছিল কি? বেচারা কিছু টাকা পেত তাহলে!"

কেঁচোর কেরামতি

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

এই দুনিয়ায় ভয়েরই জয়-জয়কার! বেশীর-ভাগ লোকেই ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি দেখায়, পাছে তাঁরা মুখ ভার করেন, সেই ভয়ে! আমাদের কাছে বাঘ, ভাল্লুক সিংহ প্রভৃতি জন্তুর খ্যাতি খুব বেশী কারণ তাদের শক্তিকে আমরা ভয় করি। কিন্তু কেঁচোর মত জীব আমাদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ, অপদার্থ! কেননা তারা-হচ্ছে দুর্ব্বল, আমাদের পায়ের তলায় পড়লে থেঁৎলে ম'রে যায়।

কেঁচো যে আবার কোন কাজে লাগে, এটা আমরা ভুলেও ভাবিনা। বড় জোর মাছ ধরবার সময়ে আমরা তাদের বঁড়সীতে গেঁথে বোকা মাছদের লোভ দেখাই। কেঁচোদের আমরা ঘেন্না করি, যেখানে তারা কিল্‌বিল করে সেখানে গেলে আমাদের অনেকের গা হিল্‌বিল্ ক'রে ওঠে!

কিন্তু কেঁচোর গুণ কত জানো? বুড়ি পৃথিবীর গর্ভে যখন মানুষের জন্মই হয় নি, কেঁচো তখনই তার কোলে ঠাঁই পেয়েছে! সুতরাং পৃথিবীর মাটির উপরে আমাদের আগেই তাদের দাবি!

এই মাটির মধ্যে কতটা জীবন লুকিয়ে আছে, আমরা সবাই কি তার সঠিক খবর রাখি? সমুদ্রতীরের প্রত্যেক বালুকণা হচ্ছে পাহাড়ের ক্ষুদ্রাংশ; তার মধ্যে কোন জীবন নেই। কিন্তু মাটি সে-রকম নয়, সে হচ্ছে অফুরন্ত জীবনে পরিপূর্ণ! দৃষ্টির অগোচর কত-রকম ব্যাঙের ছাতা, জীবাণু এবং কতরকম পতঙ্গ ও কেঁচো এই মাটির সঙ্গে মিলিয়ে বাস করে। হিসাবে সকলকার কথা ধরা পড়েনি। কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানা গিয়েছে যে, মাত্র কিছু-বেশী তিন বিঘে জমির মাত্র নয় ইঞ্চি পুরু মাটির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বড়-জাতের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ প্রাণী বাস করে। আর জীবাণু প্রভৃতির মত দৃষ্টির অগোচরে যারা থাকে, তাদের সংখ্যা শুনলে অবাক হবে। নুনের চামচ দিয়ে যদি বাগানের মাটি তুলে নাও তাহ'লে এক

চাম্‌চে মাটির মধ্যে অন্তত পাঁচশো কোটি জীবাণু প্রভৃতি মিশিয়ে থাকে এবং ঐ-রকম অনেক জীব আকারে এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার অংশের এক অংশ মাত্র!

বাগানের কিছু-বেশী তিন বিঘে জমির ভিতরে প্রায় দশ লক্ষ কেঁচো বাস করে। মনুষ্য-সৃষ্টির বহু যুগ আগে যখন হলেরও সৃষ্টি হয়নি, কেঁচোরা তখন থেকেই ভূমি কর্ষণের কাজ ক'রে আসছে। তারা মাটি খোঁড়ে, নিচের মাটি উপরে উঠিয়ে সূর্য্যের আলোয় ও খোলা হাওয়ায় এনে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে তোলে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জমি সমতল হয়, পাথুরে জমি মাটিতে ঢেকে যায় এবং উদ্ভিজ্জ সারের স্তর প'ড়ে বীজের সাহায্যে কচি শ্যাম-শ্রী আর গাছপালার জন্ম দেয়। পৃথিবী যে আজ ফুল-ফল ও নানান রকম ফসল দান ক'রতে পারে, তার মূলে আছে ঐ কেঁচোরাই। এই জন্যেই বিখ্যাত ডারউইন সাহেব বলেছেন: "এই নিম্ন শ্রেণীর জীবরা—অর্থাৎ কেঁচোরা—পৃথিবীর ইতিহাসে এমন প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করেছে যে, তাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় খুব কম জীবেরই।" তোমরা যখন ভাত ডাল তরকারি রুটি খাবে, পাকা আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি দেখে তোমাদের জিভে যখন জল আসবে, নানান ফুলের সৌরভে আর গন্ধে তোমাদের মন যখন মিষ্টি হয়ে উঠবে, তখন কেঁচোর নাম মনে হ'লে আর যেন কেউ ঘেন্নায় নাক বেঁকিও না, বেচারাদের উদ্দেশে দু-চারবার ধন্যবাদ দিও।

ভয় পেলে কচ্ছপরা যেমন চট্ ক'রে খোলার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, কেঁচোরাও তেমনি তাড়াতাড়ি গর্ত্তের ভিতরে সেঁধিয়ে যায়, এটা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ। কেঁচোরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায় বটে, কিন্তু সাধারণত তারা গর্ত্তের ভিতরে ল্যাজটি ঢুকিয়ে মুখ বার ক'রে থাকে, আর ভয় পেলেই হয় অদৃশ্য। গর্ত্তের আশে পাশে যে সব মরা ফুল, মরা পাতা, বীজ ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ জিনিষ পাওয়া যায়, সেইগুলিই হচ্ছে কেঁচোদের মনের মতন খাবার। তারা কতক খায় আর কতক গর্ত্তের ভিতরে ফেলে রাখে—পরে সেই পরিত্যক্ত জিনিষগুলো প'চে সারে পরিণত হয়ে মাটির ফসল ফলাবার শক্তি বাড়িয়ে তোলে। উপরন্তু দশ লাখ কেঁচো তিন বিঘে জমির ভিতরে যে কত লক্ষ সুরঙ্গ কাটে তার আর হিসাব নেই। এই সুড়ঙ্গ দিয়ে মাটির বুকের তলায় হাওয়া আর রস—অর্থাৎ জল ঢুকতে পারে। রস আর হাওয়ার পথ না খুলে দিলে ছিদ্রহীন মাটি তাল পাকিয়ে শক্ত ও নিরেট হয়ে পড়ত এবং সে-রকম মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হ'তে ও শস্য ফলতে পারত না।

কেঁচোদের Pharynax বা গলকোষ অনেকটা Suction Pump বা শোষণ-যন্ত্রের মত কাজ করে। ধরতে গেলে বলতে হয়, কেঁচোদের গর্ত্ত খোঁড়ার মানেই হচ্ছে মাটি খাওয়া। তারা আমাদের মত গর্ত্ত খুঁড়ে মাটি ফেলে দেয় না, মাটি খাবার জন্যে গর্ত্ত খোঁড়ে।

তাদের দাঁতও নেই, চোয়ালও নেই, তাই গল-কোষের মাংশপেশী চালনা ক'রে জিভ দিয়ে মাটি শুষে নেয়। পাখীদের মত কেঁচোদেরও পাকস্থলী হচ্ছে পেশীময় এবং পাখীদের মত তারাও পেটের মধ্যে খুব ছোট ছোট পাথরের কুচি জমিয়ে রাখে। কেঁচোরা মাটি বা অন্য কোন খাবার খেলে পরে সেই পাথরের কুচিগুলো জাঁতাকলের কাজ করে। খাবারগুলো পেষবার পর তার সারাংশ হজম ক'রে কেঁচোরা বাকি অংশ দেহ থেকে বার ক'রে দেয়। সেই বার-ক'রে দেওয়া খাবার তাদের গর্ত্তের মুখে জ'মে থাকে, আমরা তাকে কেঁচো-মাটি ব'লে ডাকি। ঐ কেঁচোমাটিও জমির পক্ষে ভারি উপকারী। বৃষ্টির জলে তা ধুয়ে সমস্ত জমির উপরে প্রলেপ দিয়ে দেয়। ডারউইনের হিসাবে প্রকাশ, প্রতি তিন-বিঘা জমির ভিতরে একবছরে ২৭০ মণেরও বেশী কেঁচো-মাটি জমা হয়! সুতরাং বললে দোষ হয় না যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জমির উপরটা প্রায় কেঁচো-মাটি দিয়েই ঢাকা থাকে।

কেঁচোদের সৎগুণের একটি মস্ত প্রমাণ হালে পাওয়া গেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে য়ুরোপে বেলজিয়ামের অনেক অংশ কামানের গোলায় এবং বন্যার প্রবাহে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সে-সব স্থান আর কৃষিকাজে লাগবে ব'লে আশা ছিল না। কিন্তু যেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হ'ল, কেঁচোরা অমনি আবার মাটির কোলে ফিরে এল, গর্ত্ত খুঁড়ে ও সুড়ঙ্গ বানিয়ে এবং সার মাটি তৈরি ক'রে জমির উৎপাদিকা শক্তি এত শীঘ্র আবার বাড়িয়ে তুলে ল'য়ে শ্মশানের মতন পোড়ো-জমি কিছুদিন পরেই ফলে-ফুলে-ফসলে ও শ্যামলতায় মনোরম হয়ে উঠেছে।

আফ্রিকার কোন কোন দেশের বাসিন্দারা নতুন কোন জায়গায় বসবাস করবার আগে খুঁজে দেখে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে কেঁচো-মাটি আছে কিনা! কেঁচো-মাটি যেখানে কম সেখানে তারা গ্রাম বসাতে নারাজ। কারণ তারা জানে, কেঁচো-মাটির অল্পতা হচ্ছে পোড়োজমির লক্ষণ, ভালো ফসল সেখানে কিছুতেই ফলবে না।

সেকালের অনেক বড় বড় মরা সভ্যতাকে বুকের ভিতরে যুগ-যুগান্তর ধ'রে রক্ষা করেছে ঐ কেঁচো-মাটি, প্রথম দৃষ্টিতে যাকে আমরা নগণ্য ব'লে মনে করি। সুদূর অতীতে নানা কারণে মানুষ যে-সব সহর ছেড়ে চলে গেছে শত শত বা হাজার হাজার বৎসর ধ'রে চেষ্টা ক'রে কেঁচোরা মাটি ছড়িয়ে তাদের কবর দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। তারপর আধুনিক যুগের সন্ধানী পণ্ডিতরা কেঁচো-মাটির কবর খুঁড়ে সেই-সব সহরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার ক'রে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক নতুন খবর জানতে পেরেছেন। সুতরাং এটাও বলা চলে যে কেঁচোরা কেবল আধুনিক সভ্যতাকে শস্য-ক্ষেত আর ফুলের বাগানই দান করে না, উপরন্তু বিগত গুপ্ত সভ্যতার ইতিহাস রচনা করবার ও মালমশলা সাজিয়ে রাখে।

পৃথিবীতে এমন দেশ নেই, কেঁচো যে দেশে বেড়ায় না। তবে নাতিশীতোষ্ণ স্যাঁৎ-সেতে দেশকেই তারা ভালবাসে। রৌদ্রে যে-সব দেশে কাঠ ফাটে, সেখানে তারা কেবল বর্ষার সময়েই দেখা দেয়।

কেঁচোদের চোখ নেই, কিন্তু তারা আলো ও ছায়ার তফাৎ ধরতে পারে। আলো দেখলে তারা ভয় পায়, তাই কেঁচোদের আসল বেড়াবার সময় হচ্ছে রাত্রিকাল। সেই সময়ে যদি কেউ কেঁচোদের গায়ের উপরে 'ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চের' আলো ফেলে, তারা অমনি তাড়াতাড়ি আলোকের সীমার বাইরে স'রে পড়তে চায়। অর্থাৎ তারা আলো না পেলেও অনুভব করতে পারে—আমরা যেমন চোখ বুজেও অনুভব করি চোখের পাতায় রোদের আভা এবং গায়ে উনুনের আগুনের আঁচ।

কেঁচোদের নাক নেই, কিন্তু তাদের গন্ধ শোঁক্‌বার শক্তি আছে। কেঁচোদের কাণ নেই, কিন্তু Vibration বা স্পন্দন অনুভব করতে পারে ব'লে তাদের কাণের কাজ চ'লে যায়। তাদের নাক নেই, কিন্তু তারা গায়ের ত্বকের ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে। ঠাণ্ডা বা গরম তারা বুঝতে পারে। খাদ্য সম্বন্ধেও কেঁচোদের রীতিমত পছন্দ-অপছন্দ আছে। কোন কোন উদ্ভিদ তারা খেতে রাজি নয়। পচা জিনিষের চেয়ে তাজা জিনিষই তারা ভালবাসে। কিন্তু গর্ত্তের ভিতরে তাদের কোন সঙ্গী ম'রে গেলে পাছে তার দেহ প'চে অনিষ্ট হয়, সেই ভয়ে তারা সেই মৃতদেহকেও খেয়ে ফেলতে কসুর করে না।

তোমরা অনেকেই বোধ হয় জানোনা যে, শামুকদের মধ্যে স্ত্রীও নেই, পুরুষও নেই। দরকার হ'লে একটি শামুকই কখনো মা হয়, আবার কখনো পুরুষ হয়। মেরুদণ্ডহীন আরো কোন কোন জীবের এই বিশেষত্ব আছে। প্রথম বয়সে তারা পুরুষই থাকে, কিন্তু পরে তারা স্ত্রী হয়ে দাঁড়ায়। কেঁচোরাও মেরুদণ্ডহীন এবং একদেহেই স্ত্রী ও পুরুষ। তাদের প্রত্যেকের মাথার কাছে একটি জায়গা আছে, সেইখানে গুটিকা কৃমিকোষের ভাণ্ডার থাকে। ঐ গুটি থেকে যথাসময়ে শিশু কেঁচো বেরিয়ে আসে।

কেঁচোদের আর এক বিশেষত্বের কথা শুনলে তোমরা চম্‌কে যাবে। একটি কেঁচোকে তোমরা যদি কেটে দুখণ্ড ক'রে ফেল, তাহ'লে সে ম'রে যাবে না। কারণ ল্যাজের অংশে জন্মাবে নতুন একটি মুণ্ড এবং মুণ্ডের অংশে দেখা দেবে একটি নতুন ল্যাজ। তখন এক কেঁচোই দুই কেঁচো রূপে লীলাখেলা করবে।

কেঁচোরা আরামে থাকতে ভালবাসে এবং তাদের গর্ত্তের ভিতরটা দেখলে সেটা বেশ ভালো ক'রেই বোঝা যায়। যতক্ষণ তাদের গর্ত্তের মেঝে ও দেওয়াল এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো থাকে, ততক্ষণ তারা স্বস্তি পায় না। কাজেই মানুষরা যেমন সিমেণ্ট ও চুণ-বালি ব্যবহার

করে, তারাও তেমনি তরল কাদার সঙ্গে তেলা পাথরের ও কাচের কুচি এবং নানারকম উদ্ভিদের টুকরো টাক্‌রা মিশিয়ে গর্ত্তের দেওয়ালে ও মেঝের উপরে রীতিমত প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। সেই প্রলেপ শুকিয়ে আসে এবং কেঁচোদের ক্রমাগত আনাগোনার ফলে মসৃণ হয়ে ওঠে। তখন গর্ত্তটা যে বেশ আরামপ্রদ হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সাধারণত আমাদের দেশে এক বিঘতের চেয়ে লম্বা কেঁচো দেখা যায় না। কিন্তু কোন কোন দেশের কেঁচো দেখলে তোমরা দস্তুরমত ভয় পাবে, কারণ আকারে তারা প্রায় মানুষের মত দীর্ঘ হয় এবং চওড়াতেও সেই অনুপাতেই বড়! কিন্তু আকারে মস্ত হ'লে কি হয়, স্বভাবে তারাও ছোট কেঁচোর মতই নিরীহ। কেঁচোরা দেখতে দুরকম—সাদা ও কালো। বাংলাদেশে সাদা কেঁচোকে 'দুধে' কেঁচো ব'লে ডাকা হয়। সংস্কৃতভাষায় কেঁচোর নাম কিঞ্চুলুক। তার আরো একটি মিষ্ট নাম হচ্ছে, মহীলতা।

কেঁচোর উপরে ছোট ছোট জীবরাও অত্যাচার করে—বড়দের তো কথাই নেই। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর ধ'রে এত অবিচার, অত্যাচার ও অবহেলা ভোগ ক'রে ও কেঁচোদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায় নি—চিরকালই যাতনার বিনিময়ে তারা নীরবে আমাদের নানান উপকার ক'রেও পেটের খাবার যুগিয়ে এসেছে। সুতরাং কেচোদেরই আমরা আদর্শ বৈষ্ণব ব'লে ডাকতে পারি। ভবিষ্যতে কেঁচো দেখলে তোমরা মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কোরো।

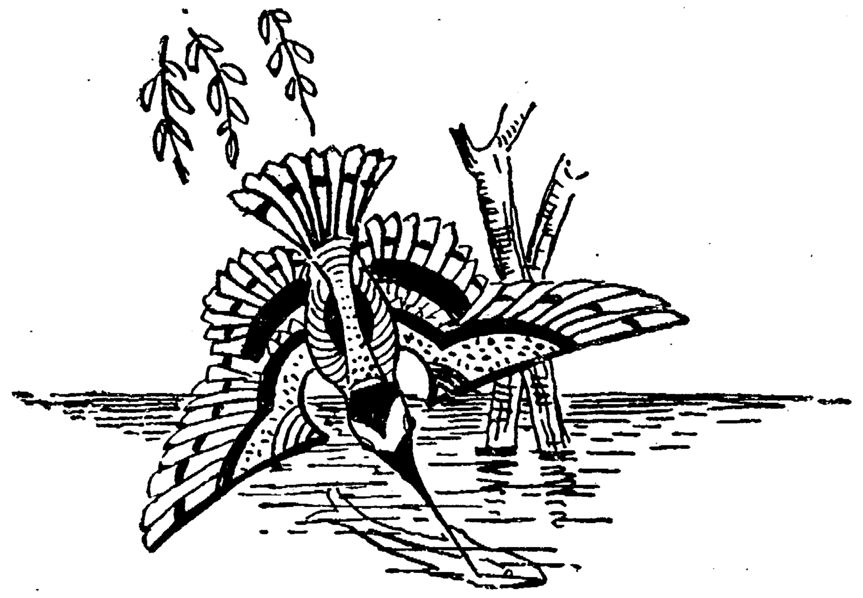

সুলতানের মুক্তো

সুলতান আব্‌দুল আজিজের সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী ছিল, একটি মুক্তো। ঢলঢলে কী অপরূপ লাবণ্য এই মুক্তোর! অসীম আকাশের প্রতিটি বর্ণচ্ছটা এই মুক্তোয় ফুটে ফুটে উঠত। এই মুক্তো সুলতানের ভাণ্ডারে আসার পর, কিছুকাল না যেতে, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। দলে দলে লোক অনাহারে মরতে লাগল। রাজকোষ শূন্য, মাথায় হাত দিয়ে সুলতান বহুক্ষণ গভীর চিন্তা করলেন। তারপর উজিরকে ডেকে হুকুম দিলেন, "নাও, এই মুক্তো বেচে প্রজাদের টাকা বিলিয়ে দাও।"

সুলতানের এক বন্ধু বলে উঠলেন, "সুলতান ভেবে দেখুন। এহেন মুক্তো ত্রিভুবনে আর দুটি নেই। আর এ মুক্তো কিনা আপনি হাতছাড়া করতে যাচ্ছেন!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সুলতান বললেন, "বন্ধু! প্রজারা অনাহারে মরছে, সেই সঙ্গে আমার আংটির এই অপরূপ মুক্তোও কুৎসিত হয়ে পড়েছে। মুক্তাহীন আংটি পরায় অগৌরবের কিছু নেই, কিন্তু রাজ্যের রাজার পক্ষে অন্নহীন প্রজার মত কলঙ্ক আর আছে?"

মহাকবি সাদির 'বুস্তান' কবিতার বই হতে সংগৃহীত

আমরা রেগে গেলে কি করি ?

শ্রীশামুক

এ অদ্ভুত প্রশ্ন কোনদিন তোমাদের মনে এসেছে ? আমরা রেগে গেলে—কি করি ? নিজের রাগ অবশ্য দেখা যায় না কিন্তু অন্যরা যখন রেগে যায় তখন যদি একটু ঠাণ্ডা মাথায় মন দিয়ে দেখ ত' দেখবে কত মজার ব্যাপার। রাগলে কত রকমের মুখের চেহারা হয় আর কত অসম্ভব অসম্ভব কাণ্ড যে করে বসি, পরে চুপ করে বসে ভেবে দেখলে সত্যই হাসি পায়।

রাগ হয় কেন ? আমরা যা করতে চাই বা পেতে চাই সেটা না করতে পারলে বা না পেলে রেগে উঠি। একটু ভাবলে দেখবে রাগের সঙ্গে দুঃখের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেন ওরা যমজ ভাই। ওদের ভাব প্রকাশও অনেক সময় অবিকল এক রকমের কিছু তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না।

খুব ছোট্ট ছেলেমেয়েদের দেখ। রাগলেই কেঁদে ফেলে। কিন্তু এই কান্না অন্য সুরের, সাধারণ কান্নার সঙ্গে মেলে না। একটু আদুরে আদুরে, অনুযোগ মেশানো যা পাচ্ছেনা সেটা পেলেই যে কান্না এক মিনিটে থেমে যাবে, আওয়াজ থেকেই এটুকু বোঝা যায়।

আরেকটু বড়রা ? রাগার সঙ্গে নানারকম ভাবতে শিখেছে। "চাইলাম দিলে না, আচ্ছা এবারে দিলেও নোবোনা। না, না নেবোনা বলছি, কিচ্ছুতে নেবোনা। দেখ না মা !" এদের ভোলানো সহজ নয়, বেশ দেরী লাগে। যদি কাঁদতে একবার এরা সুরু করে ত' ওরে বাবা—থামায় কার সাধ্যি ? ফুলে-ফুলে সে কি কান্না, কি চোখের জলের স্রোত! শুকনো মুখের চুপ্‌সো গাল আদরে, হাসিতে ফুলে উঠতেই চায়না।

সব চেয়ে মজার কিন্তু বড়দের রাগ। আগুন চোখে কট্‌মট্‌ করে চাওয়া, থরথর করে কাঁপা, টেবিলে চটাপট্‌ থাপ্পড়, আর গলার শির ফুলিয়ে বিকট চীৎকার এসব হামেসাই করছি সকলে। কিন্তু এই সঙ্গে কতকগুলি কাজ করে বসি যা সত্যই বড় হাস্যকর। এ দেখে লোকেরা ভয় না পেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে না কেন—ভেবে পাইনা। সুমুখে একটা কাগজ আছে ফ্যাঁস্ করে ছিঁড়ে ফেললাম, হাতের পেনসিল টেবিলে ঠুকে ভোঁতা করে দিলাম—এ সবের মানে কি ? আর বেশী রাগলে কথাগুলো মুখের ভিতর জড়িয়ে গিয়ে তোৎলামী আরম্ভ করে দেয়—"দেখ বি-বি-বি-বিনু ম-ম-মজা পেয়েছ না-নাকি ?"

এবারে কয়েকটা মজার ঘটনা বলি। আমাদের স্কুলে একজন মাষ্টারমশাই ছিলেন। তিনি রাগলে নিজের কান মোলতেন, গালে চড় মারতেন, প্ল্যাটফরমের উপর সোজা হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ওঁকে ঐসব শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করতো। মনে হ'ত উনি যেন এক লাফে কড়িকাটে ঢুঁ মেরে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতেও পারেন।

এক আফিসের একজন সাহেবের কথা শোন। সাহেব ছিলেন ভারী রাগী। কি করতেন জান ? যাঁর মুখে শুনেছি তাঁর ভাষাতেই বলি। ইনি চাকরীতে ঢুকবার কিছুদিন বাদে একটা কাজের ভুল করেন। তলব পড়লো। সাহেবের ঘরে গিয়ে হাজির। এক হুঙ্কার দিয়ে সাহেব বললেন,—"তোমার ভুলে আফিসের বদনাম হয়েছে জান ?" একথা বলেই টেবিল থেকে পেনসিল তুলে নিয়ে চিবুতে লাগলেন—আস্ত আখের মত। শেষ হলে চোখ কটমট্‌ করে এঁর দিকে হাত বাড়ালেন। ভদ্রলোকটি ভাবলেন হাতের কাগজের মোটা তাড়াটি চাইছেন বুঝি। কিন্তু সেটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে ফিরে এল মাথার উপরে আর পিছনে সে কি বিপদজনক তাড়া "গেট্‌ আউট্‌, গেট্‌ আউট্‌ !" এর পরে ভদ্রলোক খোঁজখবর নিয়ে চালাক হয়ে গিয়েছিলেন। সাহেবের সামনে যেতে হলে, গোটা চারেক পেন-সিল সঙ্গে থাকতো। সাহেব একটি শেষ করে হাত বাড়ালেই চটাপট্‌ আরেকটি যোগান দেওয়া চাই। গোটা তিনেক চিবুলেই রাগ একেবারে জল হয়ে যেত।

শেষে একজন মায়ের কথা বলি। ইনি রাগলে এমন মুখ হয় কেঁদে ফেললেন বুঝি। যখন ছোট্ট খুকুকে ধমক দিয়ে সামনাসামনি দাঁড়ান, তখন মনে হয় মা ও মেয়ের মধ্যে ঠোঁট ফুলিয়ে কমপিটিশন্ চলেছে কে আগে কাঁদতে পারে। উঃ একথা পড়লে কি রাগটাই না তিনি রাগবেন।

এইসব শোনার পর তোমাদের কি করা উচিৎ জানো ? রাগ হলে অমনি দৌড়ে গিয়ে আয়নাতে নিজের নিজের মুখ দেখা ! ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে এমনি হাসি আসবে যে রাগ একটা ভারী লোহার মত টুপ্‌ করে ডুবে যাবে—আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

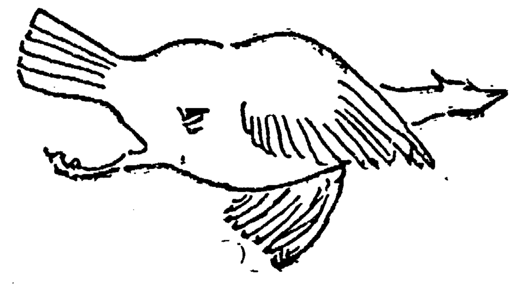

সত্যি নাকি ?

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাড়ী কোনটা ? প্যারী-সহরের রী দ স্যাংতো ত্ম রাস্তার ৩৯ নম্বর বাড়ীই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটা বাড়ী। এ বাড়ীর সদর আড়াআড়ি মাত্র সাড়ে তিন ফিট। বাড়ীর প্রত্যেক তলায় একটিমাত্র কোঠা। এই বাড়ীতে এক মুচির দোকান ছিল। দোকানে একসঙ্গে মাত্র এক-জন ক্রেতার স্থান হত। এত ছোট বাড়ী যে দোতা-লায় ওঠার সিঁড়ি নেই। সিঁড়ির জায়গা কোথায় ? দোকানপাট বন্ধ করে' মুচি পিছনদিকের খানিক উঁচু রাস্তা থেকে লাফ মেরে দোতালার ঘরে উঠত। সম্প্রতি মুচি বাড়ীটা ছেড়ে দিয়েছে এবং বাড়ীর সামনে এখন বাড়ীখালি বিজ্ঞাপন ঝুলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাড়ী কে ভাড়া নেয়, প্যারীসহরের লোকদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই।

হল্যাণ্ডের এক ভদ্রলোক সুখের সন্ধানে পৃথিবী সফরে বেরিয়েছেন। তিনি গত ১৭ বছরে মোটরে করে' সত্তরটা দেশ—সবশুদ্ধ দুইলক্ষ সত্তর হাজার মাইল ঘুরেছেন। ভদ্রলোকের মতে গ্রীস ও অ্যালবানিয়াই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী দেশ। কিন্তু মুসোলিনী তো সেদিন অ্যালবানিয়ার দফা রফা করে' ছাড়লেন ! আর গ্রীস—গ্রীসই বা আর কদিন তার সুখশান্তি নিয়ে থাকতে পারে কে জানে ! পৃথিবীতে যা ওলট পালট চলছে !

উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যজাতরা জাল ফেলে কিম্বা বঁড়শী গেঁথে মাছ ধরেনা ! জলে তাঁরা একরকম লতার নির্য্যাস মিশিয়ে দেয়। মাছ তাতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। বেহুঁশ অবস্থায় মাছ জলের উপর ভেসে ওঠে। তখন মাছধরা আর বিশেষ কঠিন হয় না।

আমাদের দেশেরই একটা খবর শোনো। পাঞ্জাবের অন্তর্গত কালাত ষ্টেটের লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ। বার্ষিক আয় ১৬ লক্ষ টাকা। কালাত ষ্টেটে একটিমাত্র হাইস্কুল। এবার মাত্র দুটি ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছে। কালাত ষ্টেটের শিক্ষা-সচিব—তিনি এবার বি,এ পরীক্ষা দিয়েছেন

রাজা সেদিন গেলেন চটে

রাজা সেদিন গেলেন চটে, চটবেন তা কে জান্‌তো।
রাণীর বুঝি হয়নি খাওয়া একুশ-বাসি পান্ত।
হয়নি খাওয়া পান্ত,
এই কথা কে জানতো।
জান্‌লে কি আর দেশের রাণীর জুটতো না ছিঃ পান্ত ?
সেদিন যে নেই পান্ত,
এই কথাটা বলতে পারো রাজবাড়ী কেউ জান্‌তো ?
জান্‌লে আমার ঠিক ধারণা জুট্‌তো নেহাৎ পান্ত।
হয়নি খাওয়া পান্ত
সবাই খবর জান্‌তো—
হলপ্ করে বলুন রাজা চটতে যদি চান্‌তো।
রাজা তো নন্ নেহাৎ খোকা ঢের বাড়ীতেই যান্‌তো,
কোথায় বা রোজ সবার জোটে একুশ-বাসি পান্ত ?
এই কথাটা করুন প্রমাণ চটতে যদি চান্‌তো।
মেজাজটা তাঁর, চটেন কাজেই, এই কথা কে জান্‌তো ?
জান্‌লে কি আর আনতো না কেউ একুশ-বাসি পান্ত ?

কালিফোর্ণিয়ার গোল্‌ড্ রাশ-য়ের (Gld Rush) একটি ছবি।

সোনার ডাকে মানুষ ঘরছেড়ে বনবাদাড়ে এসে হাজির হয়েছে। খালের ধারে দেখতে দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত সহর গজিয়েছে। টিন, কাঠ, তেরপল দিয়ে হাল্কা ঘর করা হয়েছে। ঘরের বালাই প্রায় নেই। বেশীরভাগ মানুষ তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছে।

অহঙ্কারী

এর রকম-সকম দেখে হাসি পায়।

বড় অহঙ্কার এর, একে ছাড়া বুঝি পৃথিবী চলেনা।

এর ধারণা, এর কোঁকোঁর কোঁ ডাক শুনে না রাত পোহায়, সূর্য্য ওঠে, কাজের মানুষ ঘুম ভেঙে কাজে লাগে। বোঝেনা, সূর্য্য আপনি ওঠে, রাত আপনি পোহায়, কাজের মানুষ আপনি কাজে লাগে। বুঝতে চায়না, কোনোদিন এর ডাকতে ভুল হলেও পৃথিবী থেমে থাকবেনা, পৃথিবী চলবেই, সূর্য্যের আলো এসে পৃথিবীতে পৌঁছবেই, কাজের মানুষের ঘুম ভাঙবেই।

একদল মানুষ—তাদের হাঁকেডাকে আস্ফালনে পৃথিবী অস্থির!

তারা না থাকলে পৃথিবী বুঝি চলেনা, বড় কাজ বুঝি পড়ে থাকে!

বড় কাজ হয়তো আপনি হয়, হয়তো হঠাৎ হয়, কোটি কোটি নগণ্য নিরীহ মানুষের চেষ্টায় হয়, হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়।

অহঙ্কারী মানুষ একথা বোঝেনা।

সে ফাঁকা, ফাঁপা, তাই এত ফাঁকা আওয়াজ, এত কথা, এত আস্ফালন তার! হয়তো ছবির বুদ্ধিহীন প্রাণীর সঙ্গে তার কোনো তফাৎই নেই।

আমাদের লাইব্রেরী

দুর্গম পথে : শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত : আরতি এজেন্সী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, প্রকাশিত : প্রাপ্তিস্থান ইষ্টার্ণ ল হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার : মূল্য দশ আনা।

দুর্গমপথে যাঁরা একদিন পৃথিবী আবিষ্কারে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের কাহিনী নিয়েই এ বই লেখা। মৌলিক গল্প উপন্যাস লেখক তেমন একটা লিখেছেন বলে জানা নেই, কিন্তু কাহিনী ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি সরস করে লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই বইয়েও আমরা সেই ঝরঝরে ভাষা পাচ্ছি, লেখায় ছন্দ পাচ্ছি, চমৎকার এক একটা বর্ণনা পাচ্ছি। আমাদের চোখের সামনে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুর বরফ ঢাকা আবছা দৃশ্য স্বপ্নের মত ফুটে উঠছে। কিন্তু মনে হয়, লেখক যেন কেন কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর লেখায় কোথায় অস্পষ্ট একটা একঘেয়ে সুর বাজছে। একই কথা একই সুর যেন বড় তাড়াতাড়ি ফিরে ফিরে আসছে। তবু লেখকের লেখার রং যাবে কোথায়! তাঁর এই বই পড়েও সেজন্য আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারছি না।

ছাপা ও বাঁধাই ভালো। আবিষ্কারকদের ছবি ও মেরুদেশের ছবি ইত্যাদি অসংখ্য ছবি-ভরা ১২০ পৃষ্ঠার উপর রীতিমত মোটা বই। এ বই দশ আনায় পাওয়া লাভের ব্যাপার সন্দেহ নেই।

দুরন্ত কাহিনী : একসঙ্গে তিনটি উপন্যাস : শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত : শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী, উদয়তীর্থ-১০ ইন্দ্ররায় রোড প্রকাশিত : প্রাপ্তিস্থান রংমশাল কার্য্যালয়, ১০ ইন্দ্ররায় রোড; এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১-১-১ সি কলেজ-স্কোয়ার ও সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকান : মূল্য ছয় আনা।

বহুপূর্ব্বে লেখক বেণুপত্রিকার ও চিত্রাপত্রিকার সম্পাদকরূপে শিশুসাহিত্যের আসরে এসেছিলেন। তারপর তিনি ডুব মারলেন। প্রায় দু'বছর আগে তিনি রংমশালে আবার দেখা দিলেন। রংমশালে তাঁর প্রথম রচনা 'খোকা ঘুমো ঘুমো' কবিতা, 'খেয়ার মাঝি লক্ষীনাথ' গল্প ও 'অমরলতা' উপন্যাস আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এঁর লেখা পড়ার পর থেকে আমরা অনেকেই ভাবতে থাকি, সতীকান্ত শিশুসাহিত্যে কী সুন্দর সৃষ্টিই না করে যান! বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক আমাদের কাছে এঁর লেখা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে গেছেন। এঁর লেখার ভঙ্গি যে অপরূপ স্বীকার করেছেন। শিশুসাহিত্যের যে ক'টি সত্যিকারের ভালো লেখক আছেন, সতীকান্ত তাঁদের একজন, বিশেষ একজন। সতীকান্তের লেখায় কল্পনা ও রংয়ের ছড়াছড়ি! তার অনেক লেখা পড়তে পড়তে মধুর একটা নেশায় যেন চোখের পাতা ভরে আসে। পৃথিবীকে একটা বিচিত্র স্বপ্নঘেরা রঙীন রহস্যপুরী বলে মনে হয়।

সতীকান্ত এ বইয়ে কয়েকটি দুরন্ত বীরের কাহিনী লিখেছেন। এক একটা কাহিনী নিয়ে মাঝারি একটা উপন্যাস। মহারাজ পুরন্দর আর তাঁর দ্বাদশসঙ্গী বারোজন বীর—এদের সম্ভব অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে গল্পের আখ্যানভাগ। এই কাহিনী লিখতে গিয়ে লেখক যে অদ্ভুত রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। কখনও বীরেরা মরুভূমিতে ছুটে চলেছেন, কখনও রাত্রের অন্ধকারে পাষাণ কেল্লার গা বেয়ে সাপের মত উঠছেন, কখনও আগুনের ভিতর দিয়েই উন্মত্তবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছেন, কখনও এঁদের কেউ অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন, কখনও হয়তো ভোজসভায় গানে গল্পে আসর জমিয়ে সকলে খেতে বসেছেন—সতীকান্ত এমন আশ্চর্য্য কৌশলে লিখেছেন যে পড়ে মনে হয় এসব ঘটনা নিশ্চয়ই লেখক দেখেছেন, তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর উপন্যাসের বীর মহারাজ পুরন্দরের সমসাময়িক ছিলেন।

তিনটি উপন্যাসই পড়ে দেখার মতন। শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ছবিও নিপুণহাতে আঁকা হয়েছে। মাত্র ছ আনায় এইরকম একখানা বই যে দেওয়া যেতে পারে তা আমরা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিনা। সাদা ধবধবে পুরু কাগজে ঝরঝরে ছাপা, দামী আর্ট পেপারে ছবিগুলি যত্ন করে ছাপা। মনে হয় যেন চমৎকার বিদেশী একখানা বই—এত সুন্দর দেখতে। এ বই ঘরে ঘরে থাকা উচিত, প্রতি ছেলেমেয়ের হাতে একখানা করে থাকা উচিত।

'উদয়তীর্থ' ছ'আনার এই রকম অসংখ্য বই প্রতিমাসেই একখানা করে প্রকাশ করবেন এবং সুলেখকরাও নিয়মিতরূপে লিখে চলবেন এই সংবাদ পেয়ে আমরা বিশেষ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। জানিনা দুরন্ত কাহিনীর পর কোন কাহিনী দিয়ে উদয়তীর্থ এদেশের শিশুসাহিত্যের বাজার মাত করবেন!

সবচেয়ে রঙীন লেখা:

প্রতি মাসে শিশুসাহিত্যের উপর এরকম একটি প্রবন্ধ ছাপা হবে

শিশুসাহিত্যে ভালো লেখা, নানারকম ভালো লেখা অনেকে লিখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে রঙীনলেখা কার?

সবচেয়ে রঙীন লেখা কে লিখেছেন এই যদি মাত্র প্রশ্ন হয় তো আমি বলব সবচেয়ে রঙীন লেখা লিখেছেন চার্লস কিংস্‌লি। কল্পনা ও চিন্তার দিক দিয়ে কিংস্‌লির চেয়ে কিছু ভালো লিখে গেছেন অ্যান্‌স্‌ অ্যাণ্ডারসেন্। রূপকথায় ছিল তাঁর অসম্ভব হাত। রচনাভঙ্গির নানারকম কৌশল ও কারচুপির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানতে হবে আমাদের অবনীন্দ্রনাথ কিংস্‌লির উপর টেক্কা দিয়ে গেছেন। যদি আটপৌরে কথা সাজিয়ে অদ্ভুত কায়দায় লেখার কথা ওঠে, যদি কবিতার মত হাল্কা মধুর করে গদ্য লেখার কথা ওঠে তো ন্যাথানিয়েল হথর্ণকেই সেরা ওস্তাদ বলে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু যদি রঙীন লেখার কথা ওঠে, কথার পর কথা সাজিয়ে পাঠকের মন গোধূলির আকাশের মত রাঙিয়ে দেওয়ার কথা ওঠে, তাহলে বলতেই হবে কিংস্‌লির জুড়ি এ পৃথিবীতে নেই।

ছোটখাট এক একটা ঘটনা, যেমন সন্ধ্যার পর ছেলেরা বাড়ী ফিরে এসেছে। এই ঘটনাটা কিংস্‌লির হাতে পড়লে হয়ে উঠবে অপরূপ। পাঠকের মনে হবে, সন্ধ্যায় ছেলেদের বাড়ী ফেরা ব্যাপারটা এত আশ্চর্য্য, এত বিচিত্র, একথা এতকাল তো জানতুমনা! কিন্তু আসল কথা এই, ব্যাপারটা তো আর বিশেষ আশ্চর্য্যের নয়, নতুন কিইবা তাতে আর আছে! কিংস্‌লি নিজের মনের রঙ দিয়ে ঘটনাটাকে ক'রে তুলেছেন রঙীন! ভালো লেখক মাত্রেই অবশ্য সাধারণকে অসাধারণ করে তোলেন, পুরাতনকে করেন নূতন। সে ক্ষমতা যদি তাঁদের না থাকতো তো তাঁদের বই আর কেউ আগ্রহ করে পড়ত? নাটক উপন্যাস গল্প—এ সবে নূতন ঘটনা কিইবা থাকে! সব গল্পই তো জীবনে ঘটেছে। অন্যের জীবনে, নিজের জীবনে গল্প কি আর কম! কিন্তু সেই গল্পটা যখন ভালো লেখকের হাতে পড়ে তখন মনে হয়, কি আশ্চর্য্য! আমার জীবনের গল্পটা এত নতুন কথা দিয়ে সাজিয়ে এমন করে বলা যায়!

এইখানেই ভালো লেখকের বাহাদুরি। যা পুরণো তাকে তিনি নূতন করেন, যা একঘেয়ে একরঙা তাতে রঙের পুঁজি উজাড় করে দিয়ে বিচিত্র রঙীন করেন। কিন্তু কিংস্‌লির রঙ হচ্ছে রঙের মত রঙ। যেখানে অন্যলেখক রঙের আঁচড় কাটেন, সেখানে তিনি বসে বসে রঙের আলপনা এঁকে দেন। রঙ তিনি ঢেলে দেন। রঙের সমুদ্রে তাঁর গল্পটা ভাসতে থাকে। কখনো কখনো রঙের সমুদ্রে আসল গল্পটা ডুবেই যায়। পাঠকের আর গল্পের কথা মনে থাকে না, মনে থাকে শুধু অসম্ভব রঙীন সব কথা আর কল্পনা। পাঠকের মনের আকাশে রঙীন কথাগুলি রংবেরংয়ের প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায়।

রঙীনলেখার একটা দোষ অল্প কথায় গল্প বলা চলেনা। একটার জায়গায় দশটা শব্দ সাজিয়ে, উপমার মুকুট মাথায় দিয়ে, এক একটা ভাবের টুকরো যেন পাত্রমিত্র অমাত্য নিয়ে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু কিংস্‌লির লেখা পড়তে বসে এই দোষের কথা মনে আসেনা। তাঁর লেখায় রঙীন শব্দের ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ—সেই অপরূপ শব্দের সমুদ্র দেখে পাঠকের মন মুগ্ধ হয়ে যায়। সে ভুলে যায় লেখাপড়া খেলাধুলোর কথা, অঙ্কের মাষ্টার আর বি, এ ফেল কাকাবাবুর রুদ্র শাসনের কথা, আমপাড়ার ষড়যন্ত্রের কথা। তার মনেই থাকেনা, ইস্কুলের ঘণ্টা হয়তো তার অজান্তে বেজেই যায়। সে তখন শব্দ-সমুদ্রের তীরে বসে রঙীন লহরী গুণছে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরো একটি মানুষ হাঁক দিয়ে একটা কথা বললে, চারিদিক যেন কেঁপে উঠল। অন্যলেখকরা হয়তো দুটো কথায় এই ব্যাপারটা চুকিয়ে দেবেন। কিংস্‌লি কিন্তু অতসহজে ছাড়বেন না—তাঁর শব্দসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠবে আর তাতে তাঁর বিচিত্র মনের আকাশ থেকে সূর্য্যচন্দ্র আর অগণিত নক্ষত্রের আলো এসে শব্দঢেউয়ের চূড়ায় রঙীন ছটা ফেলতে থাকবে। তিনি লিখবেন: মানুষটি কথা বললে, যেন গভীর গুহায় বন্দী প্রতিধ্বনি হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাহিরে এলো। চারিদিক সেই অদ্ভুত গম্ভীর ধ্বনিতে থর থর কেঁপে উঠল। মনে হল, মাটি যেন ভূমিকম্পে আর আকাশ যেন আকাশকম্পে কেঁপে উঠল। মনে হল, হাজার বছর পরে, যখন এই মানুষটি ইহলোকে থাকবেনা, যখন এই ধ্বনি অসীম আকাশে আপনাকে ফুরিয়ে ফেলবে, তখনও ঠিক্ এই সময় আকাশ ও পৃথিবী কেঁপে উঠবে।

ঘড়ি ধরে যারা পড়ে, এতকথা তারা পছন্দ করবে না। যারা শুধু হাসি আর ভূতের গল্প পড়ে রীতিমত

বুদ্ধিমান পাঠক হয়ে পড়েছে, তারাও নাক সিটকে বলবে, এ আবার কী আজগবি লেখারে বাবা! যারা কল্পনাহীন ফ্যাকাশে কায়দার লেখা পড়তে পড়তে কায়দাবাজ হয়ে পড়েছে তারা বলবে, যতসব গাঁজাখুরী কথা! মানুষও নেই, তার গলার আওয়াজটাও নেই, হাজার বছর বাদে পৃথিবী আর আকাশ কাঁপবে কোন্ দুঃখে!

অনেক কিছুই কাঁপেনা, কিন্তু মানুষের মন কাঁপে। মানুষের মন কাঁপলেই কিন্তু আর সব কাঁপে—না কাঁপলেও মনে হবে কাঁপছে। তবে তাকে কাঁপতে শেখানো চাই, কাঁপতে দেওয়া চাই। ধূলোমাটি লোহা আর পাথরের বিজ্ঞান দিয়ে মনকে যারা মেরে রেখেছে, তাদের মন কাঁপবে কি করে? মনকে জীবনের খুটিনাটি সত্যের খাঁচায়, বিজ্ঞানের খাঁচায় বন্দী করে রাখলে সে কাঁপবে কি করে? কী করে সে উড়বে? কি করে মেঘলোকে পৌছবে? কি করে আকাশের রঙীন আলোয় সে পাখা মেলবে? কি করে সে কল্পনার আকাশে রঙের রঙীন আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠবে? একবার কাঁপন এলেই হল—তখন তার চারিদিকে কাঁপন সুরু হয়ে যাবে। মন নিজে কাঁপছে বলেই হয়তো মনে হবে হাজার বছর পরেও কোনো এক ফুরিয়ে যাওয়া শব্দের রেশে পৃথিবী ও আকাশ কাঁপছে। একথা কি খুবই সুন্দর, খুবই আশ্চর্য্য নয়?

চলন্তিকা

কলকাতায় ক'দিন যে রকম অসহ্য গরম পড়েছিল তাতে অস্থির হয়ে আমরা একটু ঝড় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিলাম। অবশ্য খেলার মাঠে অনেককে বলতে শোনা গিয়েছিল বাপু গরম, গরমই সই, বৃষ্টিতে আর কাজ নেই, মোহনবাগান হেরে যাবে! (মোহনবাগান যেন শুকনো মাঠে হারে না)! কিন্তু আমাদের প্রার্থনা এমন মারাত্মক ভাবে সফল হবে কে জানত? আকাশ ফুটো হয়ে যে বৃষ্টিবন্যা হল সমস্ত বাংলায় তা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বর্ষার সময় বৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু এমন অসম্ভব বন্যা? কালবৈশাখী ঝড়ের জন্য বৈশাখে আমরা তৈরী থাকি কিন্তু কালজ্যৈষ্ঠী ঝড়ের জন্য? গত ১২ই জুন সন্ধ্যায় এই রকম একটা ভীষণ ঝড়জল হয়ে গেল। সে দিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওয়েলিংডন্ ব্রীজের তলায় হুগলী নদীতে পশ্চিমগামী একটি উড়ো-জাহাজ বা ফ্লাইং-বোট পৌছবার কথা। সময়মত ফ্লাইং-বোটকে নামবার ঘাটের উপর দেখাও গেল কিন্তু কিছুতেই সে নাবতে পারে না, ঘুরে ঘুরে চেষ্টা করছে আবার উঠে যাচ্ছে তারপর দেখা গেল সে যেন জোর করে নামছে আর জলে নামবার এক মুহূর্ত্ত আগে সে হঠাৎ সবেগে জলে আছড়ে পড়লো। মনে হল যেন একটা ঝোড়ো হাওয়া তাকে সজোরে আঘাত করলো! ফ্লাইং-বোটটা জলে আছাড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগলী নদীতে আর সমস্ত কলকাতায় ঝড় জল একসঙ্গে যেন ভেঙ্গে পড়ল। তারপরই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! ফ্লাইং-বোটটি তারপর আস্তে

আস্তে ডুবতে আরম্ভ করলো, কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্রুত মোটর-লঞ্চ যদি যাত্রীদের তখনই না উদ্ধার করতে পারত তাহলে সমস্ত যাত্রীদের সলিল-সমাধি লাভ করতে হত। সৌভাগ্য বশতঃ কারো প্রাণহানি হয়নি কেবল যারা অল্পবিস্তর আঘাত পেয়েছে তাদের হাঁসপাতালে পাঠান হয়েছে। সে দিন হুগলি নদীর মাঝিরা সব ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে তাদের নৌকো আগে থেকেই বেঁধে ফেলেছিল। 'বেতার রেডিয়ো' ফ্লাইং-বোটকে যদি আগে ভাগে সাবধান করে দিত পারত তাহলে বোধহয় এ কাণ্ড ঘটত না। এই ফ্লাইং-বোটটির নাম—'সেঞ্চুরিয়ন্' (Centurion), এটি একটি আধুনিক ধরণের 'এম্পায়ার' শ্রেণীর ফ্লাইং-বোট। বোটে যে সমস্ত ডাক চিঠিপত্র ছিল সে গুলি জল থেকে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইউরোপে যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কায় কত না নাটকীয় কাণ্ড ঘটছে তার ঠিক নেই। একদেশ তার পাশের দেশকে বিশ্বাস করছে না। বন্ধুত্বের ঢাকনায় ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র ও স্পাইং চলছে। সম্প্রতি প্যারিসে একটি গোপনীয় টানেল আবিষ্কৃত হয়েছে! প্যারিসের কাছে একটি হোটেলে বা চটিতে ফরাসীদের সীমান্ত রক্ষার কয়েকটি দরকারী গোপনীয় দলিল ও কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছে। এই হোটেলটির অধিকারিণী হচ্ছে একটি কুড়ি বছরের স্পেন দেশীয় সুন্দরী মেয়ে। এই হোটেল থেকে ফ্র্যাঙ্কো-বেলজিয়ান্ সীমান্ত পর্য্যন্ত একটি ষাট ফুট টানেল দেখা গিয়েছে! প্রকাশ যে এই স্প্যানিশ মেয়েটি আর একটি ইতালীয়ান মেয়ে এবং একজন ফরাসী লোক এই সম্পর্কে ধৃত হয়েছে। এই গোপনীয় টানেলটির মধ্যে বৈদ্যুতিক রেলওয়ে লাইন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। ফরাসী ও বেল্‌জিয়ান পুলিশ অনুসন্ধান করছে এই টানেলটির সঙ্গে কূটরাজ নৈতিক ব্যাপার জড়িত আছে কি না। শোনা যাচ্ছে কোন 'সিক্রেট্ সার্ভিস' এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে।

পশ্চিম ইংলণ্ডে বার্কেনহেডের কাছে আইরিশ সমুদ্রে একটি অতি-শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটছে। একটি নূতন বৃটিশ সাবমেরিণ—"থেটিস" সমুদ্র-জলে ডুবে আর ওপরে উঠতে পারেনি। ৪ ঠো জুনের খবর ৯৭ জন লোক মারা গিয়েছে! লণ্ডন ২রা জুন তারিখের 'রয়টার' খবর দিয়েছে—'আনন্দ বাজার পত্রিকা' মারফৎ আমরা তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। জলের তলায় বৃটিশ সাবমেরিণ থেটিসের যন্ত্র বিকল; নৌ-দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয় যে লাণ্ডাড্‌নোর কাছে গ্রেট্ আর্ম্‌স্ হেড থেকে ১৪ মাইল দূরে "থেটিস"এর খোঁজ পাওয়া যায়; থেটিসের পেছনদিকের ১৮ ফুট জলের উপর ভেসে আছে। প্রকাশ থেটিস এ

৭৬ জন নাবিক আছে! থেটিসের মধ্যে যে বায়ু সঞ্চিত আছে তার দ্বারা ২রা জুন রাত্রি ১২ টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত জলের তলার থাকা চলে। ৩রা জুন 'রয়টারের' খবর মর্ম্মান্তিক—প্রকাশ, সামমেরিণটিতে সবশুদ্ধ ১০১ জন লোক ছিল তার মধ্যে মাত্র চারজন কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছে। বাকি ৯৭ জন ক্লোরিণ গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে জলের ভেতরই মারা পড়েছে! থেটিস-এর এই দুর্ঘটনার কারণ কি তা এখনও নির্ণয় করা যায়নি। বৃটিশ সাবমেরিণ ইতিহাসে এই দুর্ঘটনা অবশ্য নতুন নয় এবং আগেও কয়েকটি সাবমেরিণের সলিল-সমাধি হয়েছিল। ১৯১৯ সালে L-55 একটি সোভিয়েট টর্পেডো বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে জলমগ্ন হয়। ১৯২১ সালে K. S. সাবমেরিণ জল থেকে আর ওপরে উঠতে পারেনি। ১৯২২ সালে H-25 একটি Destroyer-এর ধাক্কায় জলমগ্ন হয়। ১৯২৪ সালে L-24 একটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে জলে ডুবে যায়। ১৯২৯ সালে H-47 উত্তর সমুদ্রে মগ্ন হয়। ১৯৩২ সালে ইংলিশ চ্যানেলে M-2 জলমগ্ন হয়। ১৯৩১ সালে "Poseidon" নামে একটি সাবমেরিণ চীন উপকূলের কাছে জলমগ্ন হয়। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর এত বড় দুর্ঘটনা আর হয়নি—এবং এতও মৃত্যু ঘটেনি। 'থেটিসে' সে দিন যা হল। এখনও সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণ ও সঠিক প্রকাশ হয়নি। এবং কি কারণে 'থেটিস' জলমগ্ন হল, আর উঠতে পারল না তা এখনও জানা যায়নি। এই নিদারুণ দুর্ঘটনায় সমস্ত ইংলণ্ড অভিভূত হয়ে পড়েছে।

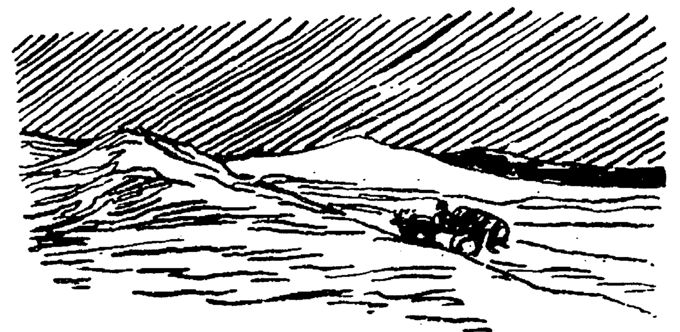

ছুটির ঘণ্টা

জলকাদা আর তুফান নিয়ে আষাঢ় হৈ হৈ করে এসে উপস্থিত। দোরে খিল দিয়ে বসে তাসপাশা খেলার, ভূতের গল্প শোনার আর খিচুড়ি খাবার সময় এটা। কিন্তু কলকাতায় নিশ্চিন্ত হবার জো নেই! এদিকে যে হুলস্থূল কাণ্ড!

মোহন বাগান কটা বছর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবার পর হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। মোহন বাগানের বিক্রমে এবার খেলার মাঠ তটস্থ! ম্যাচের পর ম্যাচ জিতে মোহন বাগান এক অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। 'মোহন বাগানকে বুঝি আর রাখা যায়না—কি বলুন মশাই? মোহন বাগান এবার মেরে দিয়েছে!'—এক গাল হেসে পান-দোক্তা মুখে অফিসবাবু তাঁর সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন। এরকম দৃশ্য বাসে ট্রামে সর্ব্বত্র চোখে পড়ছে। কেউ মোহন বাগানের লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখেছেন—এই পরম গোপনীয় সত্যটি তাঁর অফিসবন্ধুদের কানে কানে বলছেন। কেউ মোহন বাগানের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরা ফেরা করে চায়ের মজলিসে বেশ একটু ভারিক্কি চালেই বলছেন—"ওহে, মোহন বাগানের তাঁবুতে গিয়েছিলুম। এক ঘরোয়া খবর শুনে এলুম!" সকলেই কি কি করে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরকে ঘিরে ধরছেন। সত্যবাদী বন্ধুর পয়সায় তিন কাপ মেরে বলছেন, "গত সিজ্‌নে শুনলুম বেণীপ্রসাদের পা টা বেঁকে গিয়েছিল। পাসগুলো তাই যেত একটু ত্যাড়া। এবার পা টা সোজা হয়ে গিয়েছে।" বেণীপ্রসাদের খেলার উন্নতির গূঢ় কারণটা শুনে সকলেই চমকে যাচ্ছেন। গালে-গল্পে-গুজবে, সত্য আর মিথ্যা অজস্র রটনায় ইস্কুল অফিস হাঠ বাজার সরগরম। সর্ব্বত্রই একটা প্রত্যাশার ভাব—মোহন বাগান এতকাল পরে সত্যই বুঝি লিগ-চ্যাম্পিয়ান হয়। মহমেডান প্রথম ডিভিসনে উঠেই পর পর পাঁচ বছর লিগ জিতেছে, মোহন বাগান একবার ও লিগ ছুঁতে পারে নি। শীঘ্র একবার লিগ-চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলে বুঝি তাদের কলঙ্কস্খালন হয় না। আর লিগ চ্যাম্পিয়ন এবার হতে না পারলে আর কখনো ও বুঝি এরকম সুযোগ আর আসবেনা। মোহন বাগান লিগ কোঠার মাথায় উঠে বসে আসে। পরের দলটি রেঞ্জার্স—তারা তিন পয়েন্ট পিছনে। একটা বেশী খেলেও দুর্দ্ধর্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ঠিক তিন পয়েন্টই পিছনে। আর দুরন্ত কৌশলী ইষ্টবেঙ্গল দল—সমান খেলে তারা চার পয়েন্ট তফাতে। কালিঘাট দল একটা কম খেলে পাঁচ পয়েন্ট তফাতে।

মোহন বাগানের এবার অসম্ভব সুযোগ এসে গেছে। ভালো কোনো গোরা দল কয়েক বছর ধরেই লিগ খেলায় নেই। পাঁচ বছরের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং এবার যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। সেই রসিদ, রহমৎ, রহিম, সেই ওসমান, জুম্মাখাঁ, নুর মহম্মদ,—ভারত বিখ্যাত সব কটি দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় এখন ও দলের হয়ে খেলছেন কিন্তু তবু দলটি ক্রমাগত হেরে আর ড্র করে লিগ কোঠায় নেমে যাচ্ছে। এর পর মনে পড়ে ইষ্টবেঙ্গল দলের কথা। বহুবার জিততে জিততে এক আধ পয়েন্টের জন্য লিগ এদের হাতছাড়া হয়েছে। বিখ্যাত ডারহাম্‌স্ লাইট ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি গোরাদল আর মহমেডান দল বার বার এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে এরা ভালো খেলে হেরেছে, বিপক্ষকে কোণঠাসা করে রেখে শেষ পর্য্যন্ত একটা গোলে হেরে গেছে। এতবড় দুর্ভাগা টিম বুঝি লিগে আর নেই। এই ইষ্টবেঙ্গল দল, যে দলের দুর্দ্ধর্ষ ফরোয়ার্ডরা ১৯৩৭ সনের লিগ খেলায় পর পর আটটা খেলায় মোট ৩২টা গোল স্কোর করেছিলেন, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পূর্ণ পরাক্রমের সময় যারা গুণে গেঁথে চার চারটা গোল ঠুকেছিলেন, সেই দলে ভাঙন ধরেছে। ইষ্টবেঙ্গলের দুটি প্রসিদ্ধ ব্যাক পি, দাস ও আর মজুমদার—একজন না একজন অনুপস্থিত হচ্ছেনই। প্রসিদ্ধ ফরোয়ার্ড মুর্গেশ পা ভেঙে পড়ে আছেন। ফরোয়ার্ড লাইনের মাথা লক্ষ্মীনারায়ণ আসল খেলার সময়ে বাঙ্গালোরে জরুরী কাজে চলে গেছেন। কাজেই ইষ্টবেঙ্গল দল আর সে দল নেই।

আর মোহনবাগান—মোহনবাগান দলের খেলা কোন্ এক মন্ত্রে যেন খুলে গিয়েছে! পূর্ব্বে দেশী টিম বলতে ছিল মোহনবাগান। মোহনবাগান হঠাৎ হেরে বসত, কিন্তু তাদের নামে গোরাসৈন্যদল আর সাহেবী দল থরথর কাঁপত। প্রথম ডিভিসনে ছিল মাত্র আর একটি ভারতীয় দল, এরিয়ান্‌স্। কিন্তু এরিয়ান্‌সের কোনো কালেই মোহনবাগানের সঙ্গে তুলনা চলতনা। তারপর মোহনবাগানের দুর্দ্দিন এলো, ইষ্টবেঙ্গল দল মাথা নাড়া দিয়ে উঠল, দুবছর বাদেই মহমেডান দল দেশ ছেঁকে খেলোয়াড় নিয়ে এসে কলকাতার খেলার মাঠে ভেল্‌কি দেখাতে সুরু করলে। এই ক'বছর মোহনবাগানের খেলা দেখে আমরা হতাশ হয়েছি। দুটি একটি ছাড়া মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের খেলায় বুদ্ধি বা কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়নি। নামের জোরেই যেন মোহনবাগান টিকে ছিল। আর এবার? এবছরে মোহনবাগানের খেলা দেখে প্রাণ খুলে আমরা চেঁচাতে পেরেছি, হাততালি দিতে পেরেছি। এখনও অবশ্য এক একদিন খেলা যেন ঝিমিয়ে যায়, কিন্তু একটা খারাপ খেলার পর তিনটি খেলা ভালো গেলে তারা সব ত্রুটি শুধরে নেয়। মোহনবাগান দলে যে এবার অনেক নামজাদা খেলোড়ার এসে জুটেছেন, তা মোটেই নয়। দুটি তিনটি খেলোয়াড় ছাড়া বিখ্যাত খেলোয়াড় কেউ নেই, এমন খেলোয়াড় বেশী নেই যাদের সত্যিকারের ওস্তাদশ্রেণীর খেলোয়াড় বলা চলে। কিন্তু টিমের খেলা শুধু খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কৌশল আর শক্তির উপর নির্ভর করেনা—খেলোয়াড়দের পরস্পর মিলে মিশে খেলার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এই ক্ষমতা এবার মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা আয়ত্ত করে ফেলেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা কলের মত তাদের খেলা চলছে। খেলোয়াড়রা প্রত্যেকে প্রত্যেকের খেলা বুঝে নিয়েছেন। কখন বল ছাড়তে হবে, কখন কে এগিয়ে যাবেন, কে আড়ালে থেকে এগোবেন, কে পিছু হঠবেন এ যেন নক্সা এঁকে আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। তারপর, গোলে কে, দত্ত ফিরে এসেছেন। বলের সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত মিতালি—বল এসে তাঁর হাত ছোঁবেই। কে দত্তর পর বেণীপ্রসাদের নাম করতে হয়। বেণীপ্রসাদকে আমরা তো কোনোকালেই বুদ্ধিমান খেলোয়াড় বলে

জানতুমনা—তার খেলায় না ছিল ছন্দ, না ছিল ফন্দিফিকির। এবছর বেণীপ্রসাদ কিন্তু বল নিয়ে যাদু খেলছেন। বিপক্ষদলের ফরোয়ার্ডদের এসে তাঁর কাছে বাধা পেতে হচ্ছেই। শুধু তাই নয়, তাঁর পা থেকেই দলের ফরোয়ার্ডরা বলের জোগান পাচ্ছেন, ফরোয়ার্ডদের পায় বল দিয়ে তিনি তাদের একেবারে বিপক্ষগোলের অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, ৪০ গজ দূর থেকে সট করে নেট-য়ে বল ঢুকিয়ে গোলকিপারকে বেকুব করে দিচ্ছেন। আর প্রেমলাল, বি, মুখার্জ্জি—বিদ্যুতের মত মাঠের সর্ব্বত্র এই দুটি হাফব্যাক ছুটোছুটি করছেন, বিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পায়ের বল কেড়ে নিয়ে পাই পাই শত্রুর গোল লক্ষ্য করে ছুটছেন। সবচেয়ে অদ্ভুত খেলোয়াড় হয়তো মোহিনী ব্যানার্জ্জী। মোহিনী ব্যানার্জ্জি যে নিখুঁত ভঙ্গিতে বল ধরতে পারেন, ছাড়তে পারেন, একথা বলা চলেনা। কিন্তু বল নিয়ে একফাঁকে কখন তিনি গোলের সামনে এসে হাজির হন, আড়ালে আড়ালে থেকে কখন হঠাৎ গোলের সামনে পাসকরা বলটি ধরে ফেলেন, চক্ষের পলকে ধাঁ করে তীব্র একটা সট করে দেন, তা সত্যিই দেখবার মত জিনিষ।

এবছর মোহনবাগানদলের খেলায় জয়ের একটা দুর্দ্দ আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে। বড় বড় দলগুলির খেলা পড়ে গিয়েছে। এক রামালু, আপ্পারাও আর জোসেফ—এই তিনটি অদ্ভূত খেলোড়ার নিয়ে এক দুর্দ্দান্ত ফরোয়ার্ড লাইন গঠন করেছে কালিঘাট। কিন্তু কালিঘাট কয়েক পয়েন্ট তফাতে পড়ে আছে। তাছাড়া কালিঘাটের দুটি একটি ভালো খেলোয়াড় প্রায়ই গরহাজির হন। এ বৎসর মোহনবাগানের লিগ জিতবার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এই সুযোগ ছাড়া চলেনা। মোহনবাগানকে ভালো খেলতেই হবে। লক্ষ লক্ষ দর্শকের আশা আকাঙ্ক্ষা না হলে আর তারা কবে সফল করবে!

আগামীবারে এ বছরের লিগের বিখ্যাত খেলাগুলোর বিবরণ ছাপা হবে।
বিশেষকরে, মোহনবাগানের খেলাগুলোর বিবরণ দেওয়া হবে।

পরিচালিকা---দিদিভাই

আমার প্রিয় ও আদরের ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোনেরা!

কোথায় তোমরা আর কোথায় আমি? তোমরা গ্রামে, নগরে, পল্লীতে পল্লীতে। অদেখা অচেনা দিদিভাই অথচ এত গভীর ভাবে তোমরা আমায় স্নেহ ভালবাসায় জড়িয়েছ! দমকা বাতাসে টেবিল থেকে তোমাদের চিঠিগুলো ঘরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো! চিঠিগুলো কুড়োনো শেষ করে যখন দাঁড়ালাম তখন বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নেমেছে। আষাঢ় এসেছে বুঝি!

বড় ভাল লাগছে! ভাল লাগছে এই বর্ষার প্রথম দিন আর তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি চিঠিগুলি!

শিবানী সিংহ (কলিকাতা) ৪৮৪

তোমার চিঠি ও লেখাটা পেয়েছি ভাই। পরিচালক মশাই বলেছেন গ্রাহক গ্রাহিকাদের ক্রমশঃ লেখা ছাপতে বড় অসুবিধা, ছোট গল্প আমরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবো। এসম্বন্ধে আমি তোমায় পরে জানাচ্ছি ভাই। তোমার বন্ধু কাকে চাই জানিও ভাই।

মোহাম্মদ গুলজার আলী (হাওড়া) ১১৮৫

তোমার অভিমান ভরা চিঠি পড়লাম। এবার থেকে রংমশাল নিয়মিত পাবে ভাই, সবটাই তো আমাদের হাতে নয়, কারণ আমাদের প্রেসে বড্ড ভূতের দৌরাত্ম্য আছে, সেইজন্য মাঝে মাঝে বড় দেরী হয়ে যায়। 'সোনার ডাক'এর শেষাংশ শ্রাবণ বা ভাদ্রে প্রকাশিত হবে। আচ্ছা 'শ্রীঅনুবীক্ষণ' মশাইকে তোমার কথা জানাবো।

নীরেন্দ্ররায় (আঠারো বাড়ী) ১১০৮

ছোট ছেলেমেয়েদের শিশু মাসিক আরো অনেক আছে, তুমি জানতে চেয়েছ বলে জানাচ্ছি। আমার মনে হয় মৌচাক, পাঠশালা, কৈশোরিকা, এগুলো বেশ ভাল। তবে যদি তুমি তালিকা চাও আমায় জানিও আমি সব নাম পাঠিয়ে দেবো। তুমি বয়সের চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছ বলে অনুযোগ জানিয়েছ, তবে ভাই মাথায় মুগুর মেরে ছোট হওয়া ছাড়া আমি তো আর উপায় দেখছি না।

সুনন্দা দে গ্রাঃ ৯২৮

চিঠি না দিয়ে বা লিখে পাঠাতে ভুলে গিয়ে যারা অনুযোগ করে 'চিঠির উত্তর পেলাম না কেন'? তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিৎ বলতে পারো বোনটী? তোমার কথা সত্যিই বটে "Voice without a form দিদিভাই" কিন্তু তা বলে ভূত বলে ভেবোনা যেন ভাই। শিবাণী সরকার, আনোয়ারা বেগমের ঠিকানা পাঠাচ্ছি, রমা দত্ত বলে গ্রাহিকা নেই, যে আছে সে রমা সেনগুপ্তা। সাধনা আমাদের তিনজন আছে, কোন্ সাধনার ঠিকানা চাও ভাল করে জানিও ভাই।

পিণ্টুরানী বসু (চুঁচড়া)

বাড়ী প্রতিযোগিতায় যে নক্সা পাঠিয়েছিলে তা ফেরৎ চেয়েছ কিন্তু অনেকদিন রাখার পর সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মাসখানেক রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে যারা ফেরৎ চেয়েছিল তাদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তো আর নেই।

মিণ্টু ও স্বরথের চিঠি পেয়েছি বলো তাদের।

নীলিমা চক্রবর্ত্তী (সিমলা)

তোমার পুরস্কার ও ব্যাজ নিশ্চয় পাবে ভাই, দেরী হচ্ছে বলে দুঃখ করোনা।

কমলা দাস (শিলং) ৫৮১

শিলং সম্বন্ধে যা লিখেছিলে সেটাই ছোট করে লিখে পাঠাতে বলেছিলাম। বাণীসেন কেন যে চুপ করে আছে তা সেই জানে ভাই, তাকে সন্দেশের জন্য যা ব্যস্ত সবাই করেছিলো! লেখনীবন্ধুর নাম জানালে পাঠিয়ে দেবো।

অজয়কুমার দত্ত (১১০৬)

তোমার পুরস্কার শীঘ্রই পাবে। নতুন সম্পাদক মহাশয়ের ফটো প্রকাশ করতে বলছ, তার বদলে তোমার একখানা পাঠিয়ে দিও। নতুন সম্পাদক মহাশয়ের ছবি অনেক জায়গায় বেরিয়েছে।

জ্যোৎস্নাকুমার সেনগুপ্ত (রায়গঞ্জ) ১১৬৯

তোমার ছোট বোনটী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে তো? তুমি ব্যাজের জন্য টাকা ও ফর্ম্ম যা পাঠিয়েছ তা আমরা পেয়েছি, শীঘ্রই যাবে। কোন্ মাসের রংমশাল সেটা জানিও তাহলে পাঠান হবে। 'অমরলতা'র দ্বিতীয় খণ্ড শ্রাবণে প্রকাশিত হবে।

হৃষীকেশ দে (শ্রীহট্ট) ৭০৩

তোমার সব কথার উত্তর আগের চিঠিগুলোর ভিতরে আছে বলে আর লিখলাম না। তোমার কোন কথায় আমি রাগ করিনি তবে ও সব বিষয় পরিচালক মশাইকে জানালে সঠিক উত্তর পেতে পারো। কবিতাটির সম্বন্ধে এখন ও কিছু জানতে পারিনি, জানতে পারলে তোমায় জানাবো।

জগদীশ দাস (তেলেনীপাড়া) ১১১৭

তোমার চিঠি পরিচালক মহাশয়কে পাঠাবো ভাই। যে ঠিকানা চেয়েছ তা তো আমি জানিনা, রংমশাল অফিসে লিখলে হয়তো পেতে পারো। আর 'হাসি' যা পাঠিয়েছ—ওঁরা বলেন আরো ভাল হিউমার চাই।

মণিমালা মজুমদার (৫৭৭)

পুরী থেকে এবং কোলকাতা থেকে তোমার দুইখানা চিঠি এবং তোমার দাদার চিঠি আমি পেয়েছি ভাই। পুরী তোমার ভাল লাগছে জেনে খুব আনন্দ হলো। বৃষ্টি নেমে গেলে পুরীতে থেকোনা, ও সময় বড্ড ডায়রিয়া হয়, বিশেষ তোমার তো শরীর এখন সবে সেরেছে। তোমার কবিতার কথা পরিচালক মহাশয়কে বলবো।

সুধীরকুমার নন্দী (হুগলী) ১২৪৪

তোমার আগের চিঠি আমি পাইনি ভাই, পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। তোমার কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি, যা হবে জানতেই পারবে। আমায় আমার ভাইবোনরা কথার বা ছন্দর মালা গেঁথে যা দেয় তা তো ভাই ছাপান যায় না, সেটা খালি আমার নিজস্ব হয়েই থাকে। তুমি কিছু মনো করো না।

সুবোধ গুপ্তা

তোমার চিঠির উত্তর গতবারে প্রেসের ভূতের দৌরাত্ম্যে কোথায় চলে গেছে! তাই ভাবছি একেই তুমি রাগ করো তার উপর এ আবার কি বিপদ বলোতো! যাহোক রাগ করো না. কারণ ক্ষতি তোমার একলারই হয়নি আর দুটী ভাই বোনেরও চিঠি ছিল—নাম আমার মনে নেই। চিঠি লিখো।

প্রণব নাগ (কালীঘাট) ১২৪৯

তোমার চিঠি পরিচালক মশাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিনয় বসু রোড থেকে তোমরা কে একজন আমায় চিঠি লিখেছ, তা সে ২।৩ পাতা হয়তো লিখেছ, কিন্তু পাঠিয়েছ মাত্র আমায় প্রথম পাতাখানা। শেষ নেই, নাম ও তাই লিখতে পারলামনা। তবে যেই লিখে থাক—তার প্রশ্নের জবাবটা শুনে নাও—ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের (Duke of Windsor) কোনও stamp বেরিয়েছিল কি না জানতে চেয়েছ, হ্যাঁ সত্যিই বেরিয়েছিল খুব অল্প দিনের জন্য। ছবিটি কি রকম ছিল জানতে চেয়েছ সেটা তোমায় পরে জানাবো।

তোমরা যারা নিয়মিত লেখো তাদের অনেকের লেখা এবার আমার কাছে আসেনি তোমাদের মত আমিও তাহলে এবার রাগ করি, কি বল ?

আমার ভালবাসা সকলে নিও।

শুভার্থিনী

তোমাদের

দিদিভাই

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সম্পাদক মহাশয়ের লেখার তলায় তাঁর নাম থাকবে। যে লেখার তলায় কোনো নাম দেওয়া হবেনা, ধরে নিতে হবে সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ একজন সেই লেখার লেখক।

নূতন ধাঁধা

১

উপরওয়ালার কড়া হুকুম, সারারাত জেগে ছোট্টুসিং ব্যাঙ্ক পাহারা দেয়। কখন চোরডাকাত আসে, ঝিমোবার জোটি পর্য্যন্ত নেই। দশবছর ধরে ছোট্টুসিং কাজ ভালোই করছে, উপরওয়ালারা খুবই খুশি।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হীরালাল বাবু একমাসের ছুটি নিয়েছেন। রওনা হবার আগে ছোট্টুসিং এসে সেলাম করে বললে, "হুজুর ! একটা কথা বলি। আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি, ১০ই শ্রাবণ আপনাদের লাইনে রেল-দুর্ঘটনা হবে। হুজুর সেই দিনটা বাদ দিয়ে যেন রওনা হন।"

হীরালালবাবু হিসাব করে দেখলেন তাঁর ছুটি ফুরোবে ১০ই শ্রাবণ; ১১ তারিখ রওনা হলেও চলে। তিনি দারোয়ানকে "আচ্ছা, আচ্ছা" বলে বিদায় করলেন।

ছোট্টুসিংয়ের কথা ঠিক হল। ১০ই শ্রাবণ হীরালালবাবুর লাইনে ট্রেইন কলিশন হয়ে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটল। হীরালালবাবু ১১ই শ্রাবণ রওনা হয়ে ১২ই শ্রাবণ নিরাপদে কলকাতায় ব্যাঙ্কে এসে যোগ দিলেন। হীরালালবাবু ছোট্টুসিংকে বকশিশ দিলেন। তারপর উপরওয়ালাদের মত নিয়ে ছোট্টুসিংকে বরখাস্ত করলেন।

প্রশ্ন

ছোট্টুসিংকে বকশিশ দিয়ে হীরালালবাবু তাকে বরখাস্ত করলেন কেন ? ছোট্টুসিংয়ের সঙ্গে শেষ দেখার পর একটা মাস হীরালালবাবু বাইরে ছিলেন। ছোট্টুসিংয়ের কাজকর্ম্ম দেখার কোনো সুযোগ তাঁর হয়নি। এসেই কী কারণে তিনি তাকে বরখাস্ত করলেন ? ছুটিতে যাবার সময়েই বা কেন তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে গেলেন না ?

২

দুটি লোক চিমনি সাফ করছিল। চিমনি সাফ করতে করতে একজনের মুখে কালিঝুল ভরল, আর একজনের মুখ কিন্তু দিব্যি পরিচ্ছন্ন থাকল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার ! যার মুখে কালিঝুল ভরল সে নিশ্চিন্তমনে কাজ করে' যেতে থাকল আর যার মুখ পরিচ্ছন্ন ছিল সে হন্তদন্ত হয়ে গোসলখানায় ঢুকে মুখ আচ্ছাসে সাবান দিয়ে ধুয়ে এল।

প্রশ্ন

যার মুখে কালিঝুল লেগেছিল সে কেন মুখ ধুলনা ? যার মুখে কিছুই লাগেনি, সে কেন মুখ ধুয়ে এল ?

ধাঁধার উত্তর

১। রসিক

২। নোনা

স্থানাভাবে উত্তরদাতাদের নাম এবার ছাপা সম্ভব হল না।

বিবৃতি

রংমশাল কার্য্যালয় আষাঢ় মাস হইতে ১০ ইন্দ্ররায় রোডে স্থানান্তরিত হইবে। সকলপ্রকার চিঠিপত্র অনুসন্ধান প্রভৃতি উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ইতিমধ্যে যাঁহারা সডাক চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নিকট যথোচিত উত্তর পাঠাইবার সুব্যবস্থা করা হইবে। এখন হইতে নিয়মিতরূপে সকলপ্রকার চিঠিপত্র অনুসন্ধান অনুযোগ ইত্যাদির সত্বর উত্তর ও প্রতিবিধানের বন্দোবস্ত করা হইল। পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যাঁহারা সফল হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই মাসে পুরস্কার পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। যাঁহারা রংমশাল-দলের ব্যাজ এখনও পান নাই, তাঁহাদের নিকট ব্যাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাঁহারা ব্যাজ ও পুরস্কার পাইবেন, অবিলম্বে তাঁহারা গ্রাহকনম্বর ও ঠিকানা দিয়া চিঠি লিখিবেন। এখন হইতে যাহাতে গ্রাহকগ্রাহিকারা মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত কাগজ পান সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইল।

নূতন ঠিকানা

১০ ইন্দ্ররায় রোড, (বিজলী থিয়েটারের সম্মুখস্থ রাস্তা) ভবানীপুর, কলিকাতা। ফোন: সাউথ ৪৭৯। বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্য্যন্ত রংমশাল কার্য্যালয় খোলা থাকিবে।

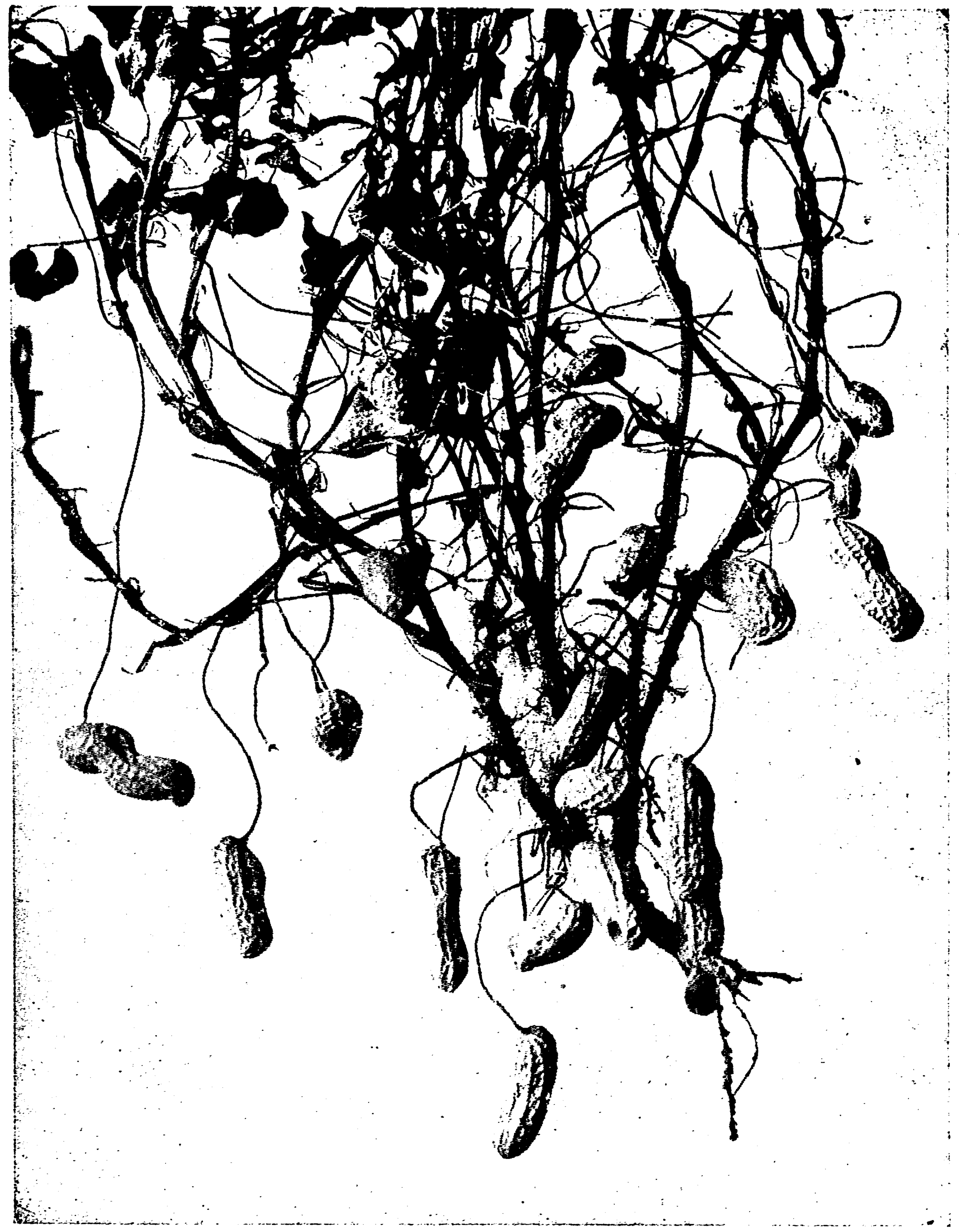

চিনে বাদাম

ভুলের ফসল ফিল্মের একটি ছবি

রংমশাল
তৃতীয় বর্ষ দশম সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৪৬

ছবি আঁকা

গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কি করে ছবি আঁকতে হয়, সে-কথা আমি তোমাদের বল্‌তে পারবো না। আমি নিজেই বুঝিনা, যেটুকু আঁকি কি করে আঁকি। তা ছাড়া দেশে ধুরন্ধর শিল্পিরা আছেন। ছবি আঁকার বিদ্যেটা তাঁরাই শেখাতে পারেন।

ছবি আঁকার শুধু একটা কথা তোমাদের বল্‌ব। এই কথাটাও আবার নতুন নয়। তব্‌ তোমাদের নতুন ঠেকতে পারে।

ছবি আঁকতে বসে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই কতদিন আগের ছবি আঁকছি, কোন্‌ দেশের ছবি আঁকছি, কাদের জন্য ছবি আঁকছি, কার ছবি আঁকছি। যেমন, গল্পে হয়তো আছে দেড়হাজার বছর আগে এক সেনাপতি ছিলেন। দেড়হাজার বছর আগে কোন্‌ দেশে কোন্‌ পোষাক পরতেন সেনাপতিরা, খেয়াল থাকেনা শিল্পিদের। দেড়হাজার বছর আগের সেনাপতির গায়ে আমরা শিল্পিরা তুলে দিই হয়তো পাঁচশো সাতশো বছর আগের সেনাপতির পোষাক। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গায়ে যে পোষাক চাপাই তাতে হয়তো পাঠান সম্রাট আলাদিন খিলিজিকেই মানায় ভালো। তারপর চীনদেশের গল্পের ছবি আঁকতে আমরা হিন্দুরাজ্যের হিন্দু আমোলের পোষাক আর অলঙ্কার এঁকে বসি। ছেলেদের গল্পে রাজামশাইয়ের যে ছবিটা আঁকি সেটা হয়ে যায় ভারিক্কি, বুড়োটে—যে রাজামশাই ছেলেদের মনে তাদের কল্পনার তুলিতে আঁকা হয়ে আছেন, সেই রাজামশাই নন। তারপর আমরা ভুলে যাই কার ছবি আঁকছি—যে দুর্দ্দান্ত রাজপুত্র দিগ্বিজয়ে বার হয়ে পড়েছেন তাঁর সঙ্গে যে

হাওয়ার আগে ছুটেছেন রাজপুত্র

রাজপুত্র বাগানে বসে পোষা পাখীর গান শুন্‌ছেন তার কোনো তফাৎই রাখি না। এইখানেই করি মস্ত ভুল।

বিশেষ করে মনে রাখতে হবে কোন্ দেশের কোন্ গল্পের ছবি আঁকছি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বিখ্যাত বই পৃথিবীর রূপকথায় একটা জাপানী গল্পের ছবি আমাকে আঁকতে হয়। গল্পটা জাপানী এবং গল্পটা হচ্ছে রূপকথা। জাপানীরা হাল্কা তুলিতে আঁকা জলছবির মত ছবি পছন্দ করে, সেইরকম ছবি আঁকেন সে দেশের শিল্পিরা। আমাকে আঁকতে হল তাই হাল্কা ছবি। তারপর ছবিটা হচ্ছে রূপকথার রাজপুত্রের। তাঁকে দেখে কেউ যেন সত্যিকারের রাজপুত্র না ভেবে নেয়। কাজেই আলগোছে ছবিটা আঁকলাম, যেন স্বপ্নদেশের একটি রাজপুত্র। পোষাকটা দিলুম জাপানী, ফিনফিনে, হাওয়ার মত। ছবির বিষয়টা হচ্ছে, হাওয়ার আগে ছুটেছেন রাজপুত্র—এমন করে আঁকতে হল যেন রাজপুত্র হাওয়ায় ভেসে একটা ঝলমল মেঘের মত যাচ্ছেন!

ভুলের ফসল

তোমরা যারা ইস্কুল-পাঠশালায় পড়ছ, কিম্বা পড়া ফাঁকি দিচ্ছ, তারা নিশ্চয়ই বড় হয়ে কে কি হবে এখনথেকেই ঠিক করে' রেখেছ। বড় হবার, বড় হয়ে বড়লোক হবার স্বপ্ন কোন্ ছেলে কখন না দেখে! তোমাদের ভিতর যারা দুরন্ত তারা কেউ হতে চাও জাহাজের কাপ্তেন, সৈন্যদলের জেনারেল, মস্তবড় আবিষ্কারক, কিম্বা উড়ো জাহাজের দুঃসাহসী চালক। ক্যাপটেন স্কটের মত কেউ মেরু দেশের ধূ ধূ তুষার কুহেলী ভেদ করে দিগন্তে যেতে চাও, হারিয়ে যেতে চাও ম্যালোরির মত হিমালয়ের অগম্য চূড়ায়, লিণ্ডবার্গের মত কেউ উড়োজাহাজে পাড়ি দিতে চাও দুস্তর আটলান্টিক মহাসাগর। যারা বুদ্ধিমান তারা হতে চাও কোটিপতি সদাগর, দেশের মন্ত্রী হয়ে চালাতে চাও রাজ্য, আশ্চর্য্য বুদ্ধির এক একটা কথা বলে চমকে দিতে চাও দেশ। যারা বিদ্বান তারা হতে চাও মস্তবড় উকিল, জজ কিম্বা প্রফেসর। যারা নতুন কথা শিখেছ, নতুন কথা ভাবতে পারছ, তারা হতে চাও বড় ভাবুক, দার্শনিক, মস্তবড় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার। আর যারা ভালবাসো রূপকথা, জীবনকে যারা ঠাকুরমার ঝুলির একটা কাহিনী বলে মেনে নিতে পারো, তারা হওে চাও রূপকথার রাজপুত্র, যেতে চাও কলাবতী, কঙ্কাবতী, পাশাবতীর দেশে, ঘুম ভাঙ্গাতে চাও ঘুমন্ত-পুরীর কন্যার।

কিন্তু, কখনো কেউ হতে চেয়েছ মাঠের চাষা—ঐ যে চাষা মাথায় টোপর দিয়ে বীজ বুনে দেয় ক্ষেতে, অঘ্রাণে সোনার ফসল তোলে ঘরে! তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় আমি—আজ আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই ভাবছি, মাঠের চাষা হতে পারলে কেমন হয়! বাউল সুরে গান গেয়ে মাটির বুক থেকে সোনার ফসল কেড়ে আনা, কুড়িয়ে আনা, সেকি খুবই মজার ব্যাপার নয়?

তোমরা হয়ত হাসছ, ভাবছ এ কি সৃষ্টিছাড়া খেয়াল! কিন্তু আমি ভাবছি, হাসবার কি আছে এতে! তোমরা কাপ্তেন, মন্ত্রী, রাজপুত্র হতে চাও—কেননা এদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনেছ তোমরা। শুনে তোমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা হয়েছে কাপ্তেন হতে, মন্ত্রী হতে, রাজপুত্র হতে। আর আমি—আমি শুনেছি চাষার জীবনের একটা বড় সুন্দর গল্প। সেই গল্প শুনে আমি ভেবে মরছি, হায়, যদি মাটির চাষা আমি হতে পারতুম।

এই গল্প আমি শুনেছি রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে।

গল্পটা একদিন আমি দেখলুম ছবির পর্দ্দায়।

য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে একদিন কৃষি-সভা হল। ছেলেরা যারা কেরানীগিরি খুঁজে মরছে, কিম্বা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার স্বপ্ন দেখছে, তাদের মন মাটির দিকে টেনে নেওয়া দরকার। মাটি হচ্ছেন মা: জল, বীজ, রোদ বাতাস আর সার দিয়ে তাঁকে পূজো করি তো তিনি দেন সোনার ফসল, জীবন দেন তিনি। সহরের ইট, কাঠ, পাথর নিঙড়ে মেলেনা খাবার। যারা চাকরী পেয়ে সহরে থেকে গেল তাদের খাবারটাও জোগান দেয় চাষী, আর যারা চাকরী না পেয়ে সহরের রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য খাবার নেই, আছে ইটকাঠ পাথরের তপ্ত হাওয়া, রাস্তার ধূলো আর ধনী মানুষের অবহেলা উপেক্ষা।

সভায় যেমন চিরটাকাল হয়, বক্তৃতা হল। তারপর এলো 'ভুলের ফসল' সিনেমার পালা। ছবি শুরু হল, অন্ধকার ঘরে রূপোলী পর্দ্দায় একটার পর একটা দৃশ্য প্রতিফলিত হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকল, মন আমার অপরূপ গল্পের দোলায় দুলে উঠল। এমনকরে গল্প বলে মানুষকে যে শিক্ষা দেওয়া যায়, নীতিকে গল্প করে যে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া যায়, তা আমি সেদিন প্রথম জানলুম। একদিন অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট ছবি দেখে যুদ্ধ জিনিষটাকে ঘৃণা করতে শিখেছিলুম, আর সেদিন ভুলের ফসল ছবি দেখে দেশের মাটি, আর মাটির ফসলকে শিখলুম পূজো করতে।

গল্পটা বলি শোনো।

বাজিতপুরের ডাকসাইটে জমিদার রামলোচন ছেলের পাত্রী দেখতে মুকুন্দপুর চলেছেন। ঘটক শিরোমণি সঙ্গে চলেছেন। পাত্রীপক্ষ মোটা টাকা দেবেন তাঁকে। গড়গড়া আর নেয়াপাতি ভাব নিয়ে পিছু পিছু চলেছে গোবরা।

জমিদার কেটেছিলেন সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট। শিরোমণি গোলেমালে তাঁকে তুললেন থার্ডক্লাশে। জমিদার মহাখাপ্পা। শিরোমণি সভয়ে আশ্বাস দিলেন, পরের ষ্টেশনে জমিদারবাবুকে সেকেণ্ডক্লাশে না তুলতে পারেন তো তার নাম শিরোমণি নয়।

ইতিমধ্যে একটি ফুটফুটে ছেলে হুড়মুড় করে কয়েকটা বস্তা নিয়ে থার্ডক্লাসের সেই কামরায় এসে উঠল। আলাপে সালাপে জমিদার জানলেন ছেলেটির নাম রামদাস। জয়দেবপুরে কৃষকদের একটা সমিতি আছে, তার সহকারী সম্পাদক। সবচেয়ে বড় কথা, জমিদারের ছেলে অরুণের সহপাঠী সে ছিল ইস্কুলে। জয়দেবপুরে গাড়ী থামতে রামদাস বস্তা সমেত নেমে পড়ল, শিরোমণিও জমিদারকে নিয়ে নেমে পড়লেন, তাঁকে সেকেণ্ডক্লাশে না তুলে তিনি ছাড়বেন না। শিরোমণি সেকেণ্ড ক্লাশ খুঁজে বার করলেন, কিন্তু গোবরা চাকর গড়গড়া আর নেয়াপাতি ডাব নিয়ে থার্ড ক্লাশে ঠায় বসে আছে। গড়গড়া আর

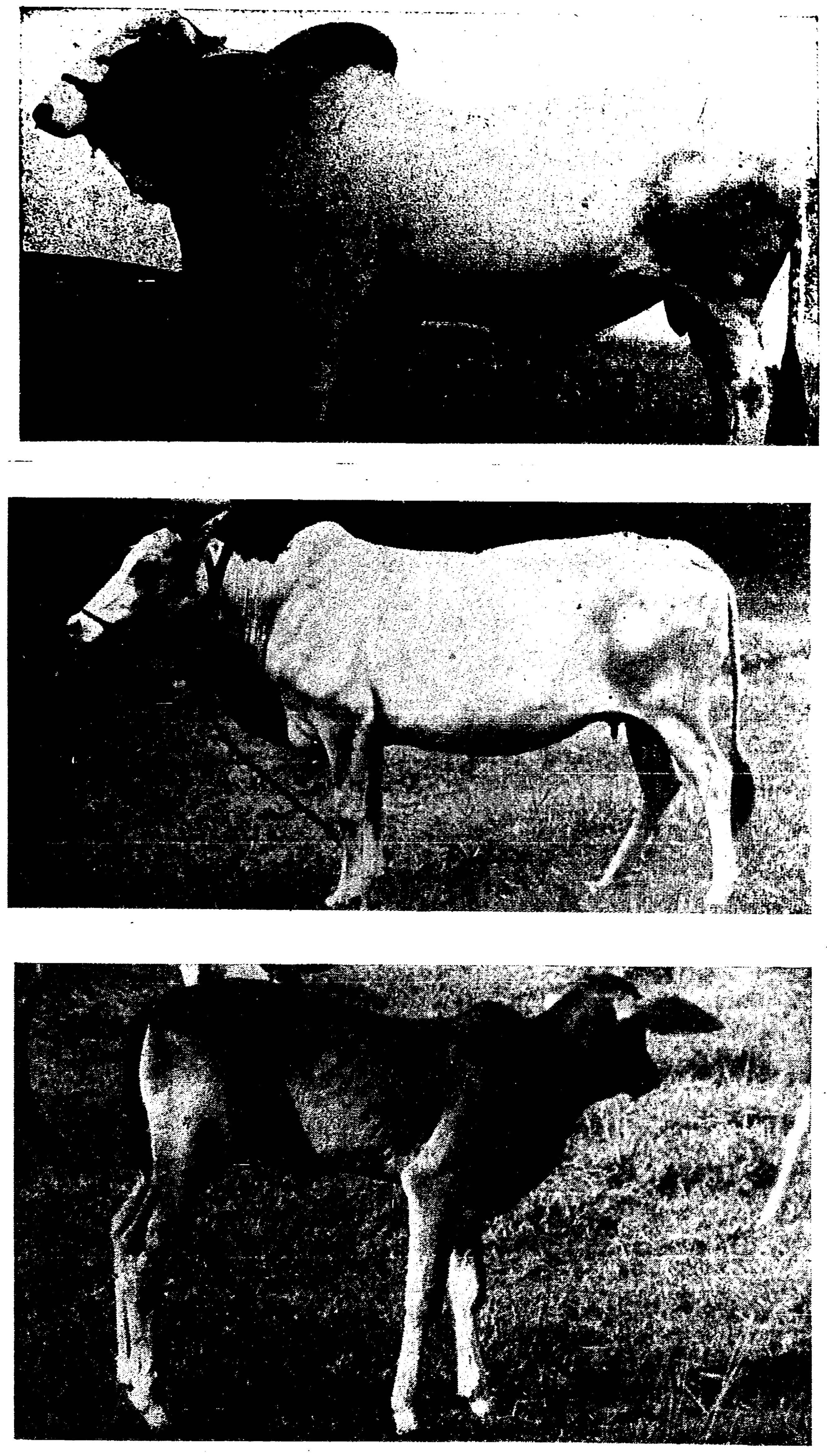

বিশাল সুস্থ ষাঁড়, স্বাস্থ্যবতী গাভী ও নধর বাছুর

নেয়াপাতি ডাব ছাড়া জমিদার এক মুহূর্ত্ত তেষ্টাতে পারেন না। গোলমালে ট্রেন দিল ছেড়ে।

রামদাস তখন অনুরোধ জানাল, জমিদার তাদের গাঁয়ে এসে বিশ্রাম করুন পরের ট্রেইনে জমিদারকে সে তুলে দিয়ে যাবে। ব্যবস্থাটা জমিদারের বিশেষ মনোঃপুত হল না, তবু শিরোমণিও বিশেষ আপত্তি তুললেন না। জমিদার অগত্যা চললেন।

রামদাসদের গাঁয়ে পা দিয়ে জমিদার মুগ্ধ হলেন। যেদিকে চোখ যায় ফসল; মাঠ ভরা সোনার ফসল, সবুজ সোনালীর একখানা চাদর যেন বিছানো। জমিদার দেখলেন, কী চমৎকার ঢলঢলে ফসল, স্নিগ্ধ লাবণ্য ফসলের। এর কাছে তাঁর বাজিতপুরের ক্ষেত যেন শ্মশান। জমিদার জয়দেবপুরের ক্ষেতে দেখলেন, আখ, তামাক, চীনেবাদাম ইত্যাদি নানা ফসল। জয়দেবপুরের মাঠে দেখলেন নধর গাভীর দল, বিশাল হৃষ্ট

ষাঁড়, স্বাস্থ্য-ভরপুর চঞ্চল বাছুরের দল। জমিদার দেখলেন, জয়দেবপুরে সবই সুন্দর। কৃষক সমিতির সম্পাদক ইব্রাহিম বললেন, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। জমিতে ভালো করে সার দিয়ে চাষ করলে ভালো ফসল ফলবেই। গরুর সেবা করলে, তাকে ভালো খেতে দিলে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকবেই। তা ছাড়া তাঁরা সেখানে সমিতি করে দশে মিলে কাজ করেন। কে কত পাট বুনবেন, কোথা থেকে বীজ আসবে, কোন্ শস্যের কতটা চাষ হবে—আগে ভাগে তাঁদের সমিতিতে তাঁরা ঠিক করে নেন।

মুগ্ধ জমিদার রামদাসের সঙ্গে গাঁয়ের পথ ধরে হেঁটে চললেন। রামদাসদের বাড়ী এসে দেখলেন গোয়ালে গাই নয়, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী দাঁড়িয়ে। আর একটি ফুটফুটে মেয়ে, নিটোল তার স্বাস্থ্য, আপন মনে গুণ গুণ গান গাইতে গাইতে সে দুধ দুইছে। এই বালিকা রামদাসের ভগ্নি সুলেখা। জমিদার দেখলেন গোয়াল-ঘর ঠাকুর-ঘরের মত তক্ তক্ করছে, আর সেই ঠাকুর-ঘরের মত পবিত্র গোয়ালে

গরুর সেবা করছে কল্যাণী বালিকা, রামদাসের ভগ্নি সুলেখা। জমিদার বুঝলেন, যে সংসারে কল্যাণীরা সেবার ভার নিজ হাতে তুলে নেয় সেই সংসারে এমনি কল্যাণ হয়, আর যেখানে ভাড়াটে চাকরের হাতে পড়ে সেবার ভার, সেখানে থাকে না সৌন্দর্য্য, সংসার শ্মশান হয়ে যায়।

জমিদার রামলোচন সুলেখাকে ছেলের বৌ করে সংসারে নিয়ে এলেন।

তারপর দুঃখের দিন এলো জমিদারের। মামলায় তিনি গেলেন হেরে। জমিদারীর ভিৎ নড়ে উঠল। আপিলের পয়সা নেই। তখন, জমিদার শুনলেন, আসর জমিয়ে ঘটক শিরোমণি তাঁরই বৈঠক ঘরে বসে বলছেন, এতো জানা কথা! জমিদার পয় অপয় না দেখে কোথা থেকে একটা মেয়েকে এনে সংসারে ঢোকালেন—সর্ব্বনাশ তাতেই ডেকে এনেছে। জমিদারের সর্ব্বনাশ হচ্ছে তার ভুলের ফসল। জমিদার আড়াল থেকে কথাটা শুনলেন।

সুলেখা সংসারের এই বিপদে নিয়ে এলো অভয়। সে বললে, শেষ পয়সা সংসার থেকে বার করে নিয়ে আপিল করো। সংসারের ভার আমি নিলুম।

জমিদারের দুখানা খাস পতিত জমি ছিল। সুলেখা সেই জমিতে ফসল ফলাতে লেগে গেল। সঙ্গে রইল লক্ষ্মণের মত তার ছোট দেবর। একদিন সেই দুখানা জমি ভরে সোনার ফসল হেসে দিলে। সেদিন সারা গাঁখানা সুলেখার হাতে কৃষি-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে। তারপর একদিন সুলেখা জমিদারের পায়ের

গোড়ায় তিন হাজার টাকার নোট রেখে প্রণাম করলে, সোনার ফসলে সংসার চলেছে, অতিথি সৎকার হয়েছে, উপরি ফসলের দাম উঠেছে তিন হাজার টাকা। ঠিক সেই সময় তার এলো অরুণের কাছ থেকে, রামলোচন প্রিভিকাউন্সিলে আপিল জিতেছেন। জমিদার আনন্দে নাচতে সুরু করলেন, গোবরা চাকরকে ডেকে বললেন, যা শিরোমণিকে ডেকে নিয়ে আয়। সে দেখে যাক আমার ভুলের ফসল কেমন ফলেছে।

তারপর একদিন অরুণ ওকালতি ছেড়ে ফিরে এলো জমিদারিতে, সুলেখা তার হাতে তুলে দিলে লাঙল।

একটা গল্প বলা হল, অথচ এত কথা বলা হল।

কি করে ফসল বাড়ানো যায়, কি করে দশে মিলে চাষ করতে হয়, কি করে কল্যাণী মেয়েরা সংসারকে স্বর্গ করে' তোলে, কোন্ মেয়েরা আদর্শ বধূ হতে পারে—যারা ফ্যাসন-দুরস্ত, সায়েবী ইস্কুলে টম টম চেপে যায়, না যারা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর দেবতা তুলসী গাই আর সংসারের সেবা করতে শেখে, আমরা অজান্তে শিখে গেলাম, ছবি দেখতে দেখতে, গল্পটা উপভোগ করতে করতে। যতক্ষণ ছবি হল, একবারও মনে হল না কেউ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি তুলেছেন, উপদেশ দিচ্ছেন কিম্বা কয়েকটা নীতি মনে গেঁথে দিতে ছবির সভায় ডেকে এনেছেন। গল্পের নেশায় মন ঢুলে গেল, আর অলক্ষ্যে নীতি এসে বাসা বাঁধলো মনে।

সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ দেশের মন চাষের দিকে ফেরাতে চেষ্টার ক্রটী করছেন না। তাঁরা যে শুধু বিজ্ঞাপনের ছবি মেরে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে চাষের গান বাজিয়ে ক্ষান্ত হননি, সিনেমা তুলতে পর্য্যন্ত কসুর করেন নি, এ আশার কথা। পাটচাষ বিভাগের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়!

এমনি করে আসর জমিয়ে গল্প বলে মানুষকে যাঁরা পথ দেখান, সত্যিকারের শিক্ষক হচ্ছেন তাঁরা। আমাদের পণ্ডিত মশাই বেত সপ্‌সপিয়ে এসে যখন বলেন, সদা সকলকে ভালবাসিবে, তখন আমরা আর যাকে ভালবাসি না কেন, পণ্ডিত মশাইকে ভালবাসতে পারি না। কিন্তু কবি যখন ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, 'মানুষকে ভালোবেসো' তখন সকলকে ভালো না বেসে পারি না। আর প্রথম ভালোবাসাটা পড়ে গিয়ে কবির উপর।

মানুষকে শেখাতে হলে আগে তার মনের খবর নিতে হয়। তার মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গল্প বানাতে হয়। সেই গল্পের মারফৎ যা কিছু বলার বলতে হয় মানুষকে। কেউ যদি দশ ঘণ্টা গলাবাজী করে বলতেন, যাও তোমরা, দেশে গিয়ে চাষ করো, না হলে আমার মাথার দিব্যি বাপু, আমি গলায় রক্ত উঠে মরব, তা'হলেও আমাদের মন চাষের দিকে ঝুঁকত কি না সন্দেহ। কিন্তু ছবির পর্দ্দায় যখন দেখলুম পল্লীর রূপ, দেখলুম মাঠ ভরা ফসল, গোয়ালে নধর গাভী, আর সংসারে কল্যাণী সুলেখা, তখন মনে মনে জানলুম এই আমাদের স্বর্গ। এই স্বর্গে যদি স্থান করে নিতে পারি তো চাই না থিয়েটার সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ আর কার্ণিভালের আজব সহর কলিকাতা।

অক্ষর ও ভাষা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এড্‌ওয়ার্ড ক্লডের নাম বোধ হয় তোমরা অনেকে শোননি। তিনি একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁকে একবার একদল ছেলে জিজ্ঞাসা করে, জগতের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার কি?

তিনি বলেছিলেন, জগতের মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে, অক্ষর-সৃষ্টি! যে-সব অক্ষরের সাহায্যে মানুষ কথা বলে, বই লেখে, যা ব্যবহার করতে পারে বলে সে বনের পশুর ওপরে উঠতে পেরেছে।

একদিন যে পৃথিবীতে মানুষ কথা বলতে পারতো না, বই পড়তে পারতো না, এ সব কথা আজ আমাদের মনেই পড়ে না। অবশ্য লেখবার আগে, মানুষ কথা বলতে শিখেছিল। যখন মানুষ অক্ষর তৈরী করতে শিখলো, তখন সেই সব অক্ষরের সাহায্যে সে তার মনের কথা লিখতে শিখলো। তখন বনে বনে বনের পশুর মত ঘুরে বেড়ানো ছেড়ে, সে ঘর বেঁধে পড়তে বসলো। কি ভাবে এই মুখের কথা ধীরে ধীরে অক্ষরে রূপ নিল, তা কেউ বলতে পারে না।

যারা বোবা, তারাও তো দেখেছ, তাদের মনের কথা, তারা প্রকাশ করে,—তবে ভাষা দিয়ে নয়, ভঙ্গী দিয়ে, ইঙ্গিত দিয়ে। যখন মানুষ কথা দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে শেখেনি, তখন সে নানা রকম ভঙ্গী, বা হাত-পায়ের ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতো। এখনও নানা অসভ্য জাতিদের মধ্যে এই ইঙ্গিতের ভাষা চলিত আছে। এমন কি আমরা আজ নানা রকম ভাষা সৃষ্টি করেও, আমাদের সেই আদিম অভ্যাস ভুলতে পারিনি—কথা বলতে আমরা অনেক সময় অনেক মনের ভাব হাত-পা নেড়ে ইঙ্গিতেই সেরে দিই। এই ইঙ্গিতের ভাষা বড় কম নয়। এই থেকেই বয়-স্কাউটরা সিগ্‌ন্যালের সাহায্যে সব কথা বলতে পারে—ভাষার দরকার হয় না।

এখনও পর্য্যন্ত সিসিলী এবং নেপল্‌স্‌এর কোন কোন জায়গায় লোকে ইঙ্গিতে রীতিমত কথাবার্ত্তা বলে। একটাও কথা তাঁরা উচ্চারণ করে না। কোন্ ভঙ্গীর কি

মানে, তা তাদের দেখে দেখে জানা হয়ে গিয়েছে। সিসিলীতে ব্যবসায়ীরা এখনও পর্য্যন্ত অনেক সময় ভাবে ইঙ্গিতে তাঁদের গোপন কথাবার্ত্তা চালান।

আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ানরা এই ইঙ্গিত ভাষার রাজা। তারা এই ইঙ্গিতের সাহায্যে, কখনও কখনও শব্দের সাহায্যে, সারা দেশময় কথা চালাচালি করে। তাদের টেলিগ্রাম নেই, বেতার-যন্ত্র নেই কিন্তু টেলিগ্রাম বা বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারের বহু আগে থাকতে তারা এক নিমেষের মধ্যে একটা দরকারী কথা দশখানা গাঁয়ে ছড়িয়ে দিতে পারতো। হাতের ইঙ্গিত ছাড়া এই রেড-ইণ্ডিয়ানরা এবং আফ্রিকার অধিকাংশ জাতি আগুনের ধোঁয়া এবং ঢাকের আওয়াজ এই সব কাজের জন্য ব্যবহার করতো। ঢাকের নানা রকম বোল থেকে তারা বুঝতে পারতো কি সংবাদ পাঠানো হচ্ছে। গ্রামের শেষে একটা উঁচু জায়গায় ঢোল বাজান হতো, তার প্রতিধ্বনি পাশের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলে, তারা আবার তেমনি ঢোল বাজিয়ে পাশের গাঁকে জানাতো—এইভাবে দেখতে দেখতে দশখানা গাঁয়ে কথাটা ছড়িয়ে পড়তো।

শুধু মুখ-ভঙ্গীর সাহায্যে কত কি যে বলা এবং বোঝান যায়, তার তিনটী ঐতিহাসিক ঘটনা তোমাদের বলছি।

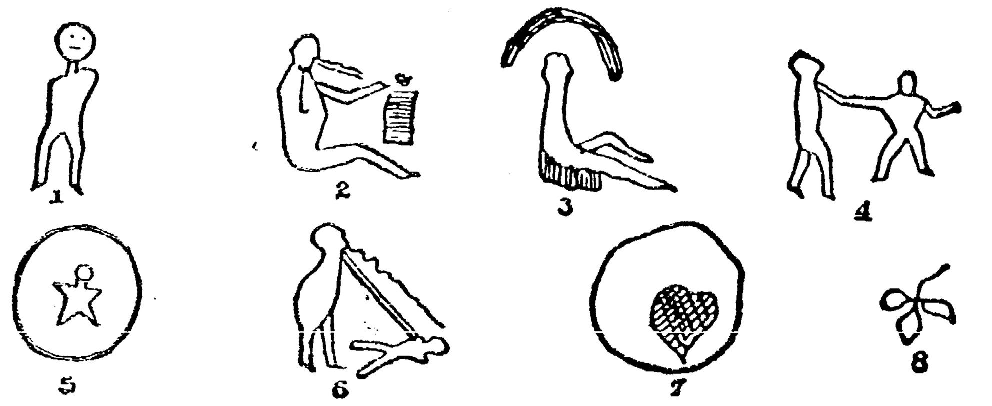

ভালবাসার গান

ফরাসী দেশে গালোদে বলে খুব নাম-করা একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি মূক ও বধিরদের শিক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। একদিন তাঁর স্কুলে একজন বিখ্যাত শিল্পী এসে দেখতে চাইলেন যে তিনি কিভাবে ছেলেদের মুখের ইঙ্গিতে পড়ান। গালোদে বল্লেন, আপনি য়ুরোপের ইতিহাস থেকে যে কোনও ঘটনা বলুন, আমি আমার নির্ব্বাচিত ছেলেকে শুধু মুখের ইঙ্গিতে তা জানিয়ে দেব। তখন তিনি বল্লেন, আচ্ছা ছেলেটীকে লিখতে বলুন, ব্রুটাস্ কি কারণে তাঁর দুই ছেলের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন।

গালোদে সকলের সামনে নিজের দুই হাত পিঠের দিকে রেখে, শুধু মুখের ভঙ্গীতে ছেলেটীর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটী লিখতে আরম্ভ করলো, কেন ব্রুটাস্ তাঁর দুই ছেলের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপল্‌স্ শহরে একবার গণ-বিপ্লব হয়। সেই বিপ্লবীদের থামাবার জন্যে রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড স্বয়ং তাদের এক সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু সভায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, লোকে এত গোলমাল আর চেঁচামেচি করছে যে, যদি তিনি কথা বলেন, তাহলে তাঁর একটী কথাও কেউ শুনতে পাবে না এবং তারা শুনবে না বলেই ঐ রকম গোলমাল করছে। নেপল্‌স্‌এর লোকেরা ইঙ্গিত-ভাষায় কথা বলতে খুব অভ্যস্ত। রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড তখন কথা ছেড়ে দিয়ে ইঙ্গিতের ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণ পরে জনতা তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে গেল।

সিসিলীতে একবার খুব বিপ্লব হয়। ফরাসীরা তখন সিসিলী দখল করবার জন্যে আসে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে সিসিলীর লোকেরা গোপনে এই বিপ্লবের আয়োজন করে এবং ইতিহাসে বলে যে, এই এত বড় বিপ্লবের আয়োজন করতে তারা একটীও মুখের কথা ব্যবহার করেনি। এমন কি যেদিন সে-সময় বিদেশীদের ওপর আক্রমণ করা হবে, তাও ইঙ্গিতের ভাষায় দেশময় সকলকে জানান হয়েছিল।

তারপর এলো ছবির ভাষা। এই ছবির ভাষা থেকে অনেকে মনে করেন, ক্রমশঃ ক্রমশঃ অক্ষরের সৃষ্টি হলো। এই ছবির ভাষা এখনও পর্য্যন্ত অনেক আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশ্‌ম্যানেরা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কোন কোন আদিম জাতি এখনও এই ছবির ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এই সব ছবির এক একটা সঙ্কেত থেকে ক্রমশঃ এক একটা অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে। হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর হলো এ্যালেফ্, তার মানে ছিল ষাঁড়, এবং পুরাকালের লোকে একটা ষাঁড়ের মাথার লাইন দিয়ে সেই অক্ষরটী বোঝাত।

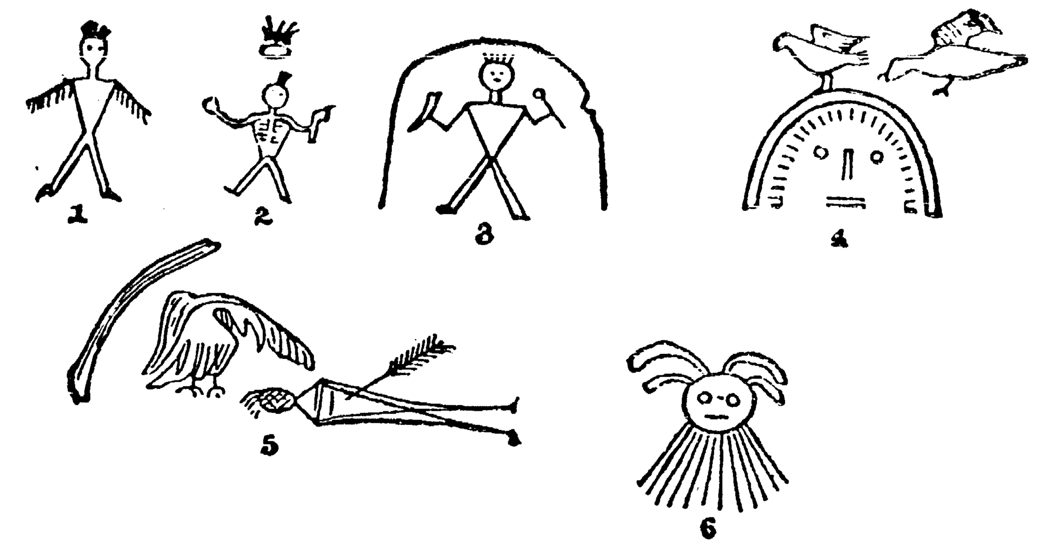

ছবির ভাষায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা কিভাবে গান বা কবিতা লিখতো, তার দুটো উদাহরণ এখানে দেখাচ্ছি। প্রথমটা আগের পৃষ্ঠার ছবিটা হলো একটা ভালবাসার গান, দ্বিতীয়টা হলো একটা যুদ্ধের গান।

দ্বিতীয় গানের ছবিগুলো থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম ছবি হলো যোদ্ধার, তার হাতে ডানা, অর্থাৎ তার কামনা সে পাখীর মত দ্রুত যেন হয়। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে সে প্রভাত তারার নীচে দাঁড়িয়ে এবং তৃতীয় ছবিতে সে দাঁড়িয়ে আছে

আকাশের মাঝখানে। চতুর্থ ছবিতে, রণক্ষেত্রের ওপর আকাশে শকুনিরা উড়ছে—পঞ্চম ছবিতে বাণবিদ্ধ হয়ে সে রণক্ষেত্রে শায়িত ; শেষ ছবিতে দেখান হচ্ছে যে, সে মানুষের মূর্ত্তি ছেড়ে দেবযোনির মূর্ত্তি পেয়েছে—তার বীরত্বের পুরস্কার !

আজকের দিনের ভাষায় এই গানটীর মানে দাঁড়ায়,

আমার গতি যেন বিহঙ্গমের মত হয়,
মাথায় ঝড়ে পড়ুক, প্রভাত-তারকার
আশীর্ব্বাদ !
আমি বিস্ময়ের বিস্ময় !
রণক্ষেত্রে যারা প্রাণ দেয়,
আমি তাদেরই একজন,
বীরের মরণ মরে আমি চাই অমরত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সম্বরদের দলে

সম্বর হরিণেরা বনের শান্ত প্রাণী। চেহারায় লম্বা চওড়া, মাথায় ডালে পালায় শিঙের বাহার আর ক্ষিপ্র পায়ে হাওয়ার মত দ্রুত গতি। তবু তাদের মত শান্ত প্রাণী দেখা যায় না। কারও সাতে পাঁচে তারা নেই, কোন জানোয়ারের সঙ্গে তারা লাগে না, নিজেদের দলে নিজেদের দল নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। পাহাড়ের টিলায় টিলায় দল বেঁধে যখন তারা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে, তাদের পেশী সমুদ্রে ঢেউ খেলে যায় আর তাদের ঝাঁক ঝাঁক ডাল পালা মেলা শিঙ নেড়ে যখন তারা ছোটে তখন দূর থেকে মনে হয় ছোট খাট একটা বনই বুঝিবা হঠাৎ চলমান হয়ে উঠেছে।

টিলায় টিলায় ধাপে ধাপে মহাশূন্যের সিড়ি ভাঙ্গতে বন নীচের দিকে মিলিয়ে গেছে। ওই বনে তিন দিন তিন রাত ধরে অদ্ভুত এক আগুন জ্বলেছিল, কত জানোয়ার মারা গেল, কত জানোয়ার দল ছাড়া হয়ে দিকে দিকে ছটকে পড়ল। বিপদ যখন আসে এমনি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েই আসে। দলের দলপতি হিসেবে শৃঙ্গধর সে কথা ভাল করেই জানে। তার অভিজ্ঞ চালনায় হরিণেরা বহুবার বহু শত্রুকে ফাঁকি দিয়েছে বটে

কিন্তু বিপদ যখন একবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে দলে তখন আর কোন উপায় হয়নি, মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা ছারখার হয়ে গেছে। তার ওপর নিরীহ সম্বরদের বন্ধুর অপেক্ষা শত্রুর সংখ্যাই সমধিক। নীচের বনে ত নামবার জোই নেই, কখন কোন্ দিক দিয়ে যে শয়তান কালো বাঘটা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বলা যায় না। তবু সম্বরদের মাঝে মাঝে নীচে নামতে হয়। নীচের পাহাড়ে যে পাহাড়ে নুণের খনি আছে, সেই নুণ মাঝে মাঝে না খেয়ে এলে চলেনা। শৃঙ্গধর বহু কৌশলে তার দলকে নিয়ে নীচে নেমেছে কয়েকবার, বহু কৌশলে সে কত-বার কালকেতুকে ফাঁকি দিয়েছে কিন্তু বাঘের সঙ্গে শৃগালের ধূর্ত্ততা যখন মেশে তখন মাঝে মাঝে তাকেও হার মানতে হয়েছে। আবার সে যখন দল নিয়ে ওপরে উঠে এসেছে তখন হয়ত দলের কয়েকজন নীচেই রয়ে গেছে। তারা আর কখনও তার দলে ঘুরে বেড়াবে না।

বনের মাথায় পড়ন্ত সূর্য্যের রঙিন আভা, নীচের বনে দাবানলের শেষ ধোঁয়া, তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আকাশে উঠছে, হরিণের দল বিশ্রামে গা ঢেলে দিয়েছে। নীচের মরা দাবানলের সেই শেষ ধোঁয়া কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে শৃঙ্গধরের মনে হোল ওই দাবানলে কত জানোয়ার ত মারা পড়েছে, তাদের সঙ্গে চিরশত্রু কালো বাঘের যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে ত চমৎকার হয়। সে নিশ্চিন্ত হতে পারে তা হলে। কালকেতুর হাতে তার দলের হরিণীদের সেই মৃত্যু-কাতর চীৎকার তা হলে আর তাকে শুনতে হয় না; সম্বরেরা নির্ভয়ে বনে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

—একটা দমকা হাওয়া, ওপরের এই বনে কেমন যেন অপরিচিত অথচ একটা বিশ্রী বিপজ্জনক গন্ধ—দূরে খস খস একটা শব্দ। শৃঙ্গধর লাফিয়ে উঠল, এক মুহূর্ত্ত কান খাড়া করে কি যেন শুনল সে তারপরে নীচু একটা সাঙ্কেতিক ডাক ডেকে উঠল। বিশ্রামিত হরিণের দল সে ডাক শুনে বিদ্যুতের মত লাফিয়ে উঠল। আর দূর বনে হঠাৎ একটা মেঘের মত গর্জ্জন। কালকেতুর সেই অতর্কিত ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে আচমকা হরিণের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আর কালকেতুর শিকারের সুবিধা হয়, কিন্তু দলপতির ডাকে সম্বরেরা আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল; শৃঙ্গধরের তীক্ষ্ণ ডাক অনুসরণ করে তারা বিদ্যুতের মত ছুটল পাহাড়ের টিলায় টিলায়। কালকেতু তখন হরিণের দলের পেছু নিয়েছে ভীষণ গর্জ্জনে।

নীচের বনে দাবানল লাগা মাত্র সুচতুর কালকেতু আর কাল বিলম্ব না করে সোজা ওপরের বনে উঠে এসেছিল। তারপরে গত তিন দিন ধরে সে নীচের সেই ভয়ঙ্কর দাবানল দেখে শুধু কেঁপেছে। যতই সাহসী হোক বনের জানোয়ার ত, আগুনকে কি ভয় না করে পারে? দাবানল নিভে যেতেই প্রথমে সে ঠিক করল আবার নীচের বনে সে ফিরে যাবে। আবাল্য পরিচিত জন্মস্থানের মমতা বড় দৃঢ়। তাই যদি সে ফিরে যেত তা হলে তার জীবনের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হতে পারত কিন্তু প্রথম চিন্তার পর সে ভাবল যে নীচের বনে এখন নিশ্চয় শিকারের অভাব হবে তা ছাড়া ওপরের এই বনেই সম্বরদের দল থাকে। সে ঠিক করল উপযুক্ত একটা খাবার জলের সন্ধান পেলে সে এই বনেই থেকে যাবে। অনেক ঘুরে, পাহাড়ের মাথায়, গাছের ডালে অনেক জায়গায় ঘুরে একটা পাহাড়ে ঝরণাও সে আবিষ্কার করে ফেলল। আর কি আবিষ্কার করল জান? ঝরণার ধারে বহু ক্ষুরের দাগ। কালকেতু খুসী হয়ে উঠল। কাছাকাছিই

তা হলে একটা হরিণের দল থাকে। তিন দিন তার কোন শিকার জোটেনি, হরিণের দলের পায়ের দাগ অনুসরণ করে সে এগিয়ে চলল। তারপরে কি হোল তোমরা জান।

পাহাড়ের পথে এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎ গতিতে শৃঙ্গধর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আগে পুরুষ সম্বরেরা, তাদের পেছনে একদল ছোট বড় বাচ্ছা, তাদের পেছনে তাদের মায়েরা তাদের ঠেলা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কালকেতুর গর্জ্জন ক্রমশই পেছনে পড়ছে। কালকেতু যদিও মরিয়া হয়ে শিকারের পেছনে ছুটেছিল কিন্তু হরিণের দল একটা ছুট পেয়ে গেছে আর তাদের ধরা শক্ত। ক্রমশই সে পেছিয়ে পড়ছে, কালকেতু রাগে তীব্র এক হুঙ্কার ছাড়ল। আর ঠিক সেই সময়ে হরিণের একটা বাচ্ছা একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জখম হয়ে পড়ে গেল। তার মা করুণ একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। ঠিক এক মুহূর্ত্ত শৃঙ্গধর থমকে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখে নিল। পেছনে কালকেতুর গর্জ্জন তীব্র হয়ে উঠল। পর মূহূর্ত্তেই আবার ছোটবার হুকুম দিল শৃঙ্গধর—একজনের জন্য দলের স্বার্থ বলি দেওয়া যায় না। বাঘ যদি দলের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারে তা হলে তার বিশাল থাবায় কত হরিণ যে লুটিয়ে পড়বে তার ঠিকানা নেই। হরিণের দল তীব্র গতিতে বাঁক নিল ওপর পাহাড়ে, আর বাচ্ছাকে আগলে সেই হরিণ মা আর্ত্তনাদ করতে করতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল।

দূরে বহুদূরে গাছের মাথায় কোথায় যেন একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে—উ-উ-উই!

সে শব্দ ঝাউয়ের পাতার মধ্যে দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের আর্ত্তনাদ ও হতে পারে। হরিণী চমকে ওপরে তাকায়, দূরে ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি যেন গাছের ডালে ডালে দুলতে দুলতে উড়তে উড়তে বড় হচ্ছে। সন্ধ্যায় স্বচ্ছ আকাশে গাছের ডালে ডালে বিদ্যুতের চমক।—হু-উ-উ-উই।

বন দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। হরিণ ছানা যন্ত্রণায় ছটফট করে, একবার সভয়ে উঠে দাঁড়াতে যায় আবার লুটিয়ে পড়ে, হরিণী করুণ আর্ত্তনাদ করতে থাকে। কালকেতু দূর থেকে হরিণের বিপদ উপলব্ধি করে আনন্দ গর্জ্জনে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসে। হরিণী আর তার বাচ্ছাকে দূর থেকে সে দেখতে পেয়েছে, কালকেতু তীব্র এক হুঙ্কার ছাড়ে। হরিণীর মরণের আগের চীৎকার।

হঠাৎ গাছের মাথা থেকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল হরিণ ছানার পাশে। হরিণী এক লাফে পেছিয়ে গেল। কালকেতু চিনতে পেরেছে মংলু, মংলু!

রাগে কালকেতু বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল। গাছের মাথায় গুপী চীৎকার করে উঠল—বাঘ বাঘ মংলু সাবধান!

মংলু ততক্ষণে হরিণ ছানাকে কাঁধে ফেলে ছুটেছে। হরিণী আর্ত্তনাদে আকাশ ভরিয়ে তার পেছু নিল! কালকেতু সলাফে, সগর্জ্জনে ধেয়ে এল। এক হাতে হরিণ ছানাকে কাঁধে চেপে সামনের একটা নীচু ডাল এক হাতে ধরে মংলু ঝুলে পড়ল। ক্ষিপ্র পায়ে সে গাছে উঠে গেল। তারপরে আবার সে চীৎকার করে উঠল—হু-উ-উই!

তারপরে তার সেই অদ্ভুত দ্রুত চলা! এ ডাল থেকে ও ডালে, দুলতে দুলতে, লাফাতে লাফাতে উড়তে উড়তে গাছের ডালে মংলু এগিয়ে গেল। মাটিতে যে পথ অনেক ঘুরে যেতে হয় সেই

পথ গাছের ডালে, লতার দোলায় চড়ে নিমেষে পার হয়ে গেল মংলু। গুপী মুখে কিচ্ কিচ্ কিচ্ কিচ্ শব্দ করতে করতে তার পেছু নিল—কালো বাঘ নিপাত যাক, নিপাত যাক !

কোথায় কোন্ পেছনে পড়ে নিস্ফল আক্রোশে কালকেতু গর্জ্জাতে লাগল। তার সামনে দিয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বিদ্যুতের মত মানুষের ছানাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

হরিণ ছানাকে কাঁধে করে মংলু আর গুপী বনের এক প্রান্তে নামল। আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে বন নিথর। কাঁধে থেকে হরিণ ছানাকে নামিয়ে দিল মংলু, বলল—হুঁঃ এতটুকু বাচ্ছা সেও নাকি শিকার !

হরিণ ছানা একবার ডেকে দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। মংলু বলে উঠল—আরে পায়ে চোট খেয়েছে তাই ! এইত এই যে হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ছে, কি করা যায় ?

গুপী লাফাতে লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একরাশ লতাপাতা নিয়ে এসে হাজির।

—ও গুলো কি হবে ?

—চিবিয়ে চিবিয়ে ওই রস ওর চোট খাওয়া জায়গায় লাগিয়ে দাও।

মংলু আর গুপী হরিণ ছানার চিকিৎসা স্নুরু করে দিল।

আকাশের প্রথম তারা ক্ষীণ মিট মিট করে উঠেছে, স্তব্ধ বন রহস্যময়। দু একটা পাতা ঝরছে টুপ টুপ, কালো বনের উষ্ণ অভ্যন্তরে কোথায় কোন্ প্রাণের স্পন্দন ! হরিণ ছানা সেবা আর আদর পেয়ে স্তব্ধ। বনের ভেতরে সজারুরা ঘুমোতে যাচ্ছে তাদের গর্ত্তে। পেঁচার জাগবার সময় হোল। পাখীদের সন্ধ্যা বন্দনা সমাপ্ত। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে মংলু লাফিয়ে উঠল। একটু দূরে জ্বল জ্বল করে এক জোড়া চোখ তাদের দিকে চেয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে আশা নিরাশা, ভয় দ্বিধা সবই মেশান।

হরিণ মা তার ছানার আশা ছাড়েনি প্রাণপণে। মংলুদের অনুসরণ করছে !

—"ওঃ হরিণ" মংলু বলে উঠল "আমি বলি কে না কে ?"

—আঃ আঃ ! হাত বাড়িয়ে মংলু ডাকল।

হরিণীর সন্দেহ তবু যায় না, সে জানেনা এরা শত্রু না বন্ধু। সেই সময়ে মাকে দেখতে পেয়ে হরিণ ছানা করুণ স্বরে ডেকে উঠল। ব্যস হরিণ মা আর থাকতে পারল না। সন্তানের মায়া বড় মায়া।

হরিণ মা দ্বিধা জড়িত পায়ে তার বাচ্ছার কাছে এসে দাঁড়াল। মংলু বাচ্ছাকে তার মায়ের কাছে সরিয়ে দিয়ে হরিণীর শিঙে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বাচ্ছা তখন চুক চুক করে মায়ের দুধ খাচ্ছে। হরিণীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল মংলু আর গুপীর।

সেই রাতটা তারা কাটিয়ে দিল সেখানে—অদ্ভুত তিনটি প্রাণী। সেই রাতটা একজন মানুষ, একজন বানর আর দুটি হরিণ একত্রে।

ভোর বেলা সূর্য্যের প্রথম রশ্মির সাথে সাথে মংলুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। নীচে হরিণ মা তখন জেগে উঠেছে। মংলু গুপীর লেজ ধরে টান লাগাল—এই ওঠ !

গুপীর লেজটা আলস্যে নড়তে লাগল।

—এই ওঠ ওঠ।

গুপী ঘুম জড়ান স্বরে বলল—কেন ?

—কেন কি ? বেলা হোল যে !

—উঁ

—ওঠ ওঠ

—উঁ

মংলু বলল—কালকেতু........

গুপীর লেজটা আগে ছপাং করে লাফিয়ে উঠল তারপরে সে নিজে।

—কৈ কৈ কোথায় ?

—কেন কালকেতু ?

—তোমার মাথায়

গুপী কিচ্ কিচ্ করে লাফিয়ে উঠে মাথায় হাত দিয়ে খুঁজে নিয়ে বলল—কৈ ?

—নাঃ তোমার বোকামীর জ্বালায় আর পারা যায় না। সত্যি সত্যি কি আর কালকেতু তোমার মাথায় চড়ে বসে আছে নাকি ?

—তবে ?

—কালকেতুর হাত থেকে হরিণ ছানাকে বাঁচাতে হবে। —ওদের ত আর আমাদের সঙ্গে থাকলে চলবে না ; ওদের দলে পৌঁছে দিতে হবে।

গুপী মাথা চুলকে বলল—তাইত !

হরিণী গাছতলায় শিং নেড়ে সায় দিল।

মংলু বলল—চল বেরিয়ে পড়া যাক।

হরিণ ছানার পা তখনও ছোটবার মত সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, মংলু তাকে কাঁধে তুলে নিল তারপরে স্নুরু হল তাদের পথ চলা।

সবুজ পত্রব্যুহ ভেদ করা সূর্য্যকর-রশ্মিতে বন প্রদীপ্ত। প্রভাতী পাখীরা গান ধরেছে, দূরে গারো পাহাড়ের একটা উঁচু চুড়া ধ্যানময় গম্ভীর। একটা তীক্ষ্ণ সরল নাগেশ্বর গাছের গায়ে বসে একটা কাঠবেড়ালী জ্বল জ্বল করে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, হঠাৎ গুপীর কি খেয়াল হোল 'ধর ধর' করে সে কাঠবেড়ালীকে তাড়া করল। নিমেষে বিদ্যুতের মত কাঠবেড়ালী তার কোটরে অদৃশ্য। গুপীর লাফান দেখে কে ?

—দুয়ো দুয়ো পালিয়ে গেল ; দুয়ো !

মংলু বলল—বাপ্‌রে কি বীর !

গুপীর ততক্ষণে অন্য খেয়াল। সে তখন রাশি রাশি বুনো ফুল ছিঁড়ে চারটি নিজের মাথায় দিল ; চারটি কানে গুজল : চারটি লেজে জড়িয়ে ছিটকে দিয়ে কিচ্ মিচ্ করে বাঁদুরে হাসি হেসে উঠল—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

কিরণবালার কাণ্ড

শ্রীধরণী সেন

বয়েস বছর দশ হলে হবে কি, কিরণবালা পাকা গিন্নী। হ্যাঁ, সে ভারী চালাক মেয়ে, কথাবার্ত্তায় চালচলনে সে পাড়ার গিন্নীবান্নীদের আদর্শ; গল্প বানিয়ে বলতে ওর মত সে তল্লাটে কেউ নেই! পাড়াপড়শী মেয়েরা ওর চেয়ে বয়সে বড় হলেও সব এসে জড়ো হয়ে বলে,—কিরণদি, ভাই সে গল্পটা— —কিরণবালা বলে,—কোন্‌টারে মিনু, সেই চোরের ওপর বাটপাড়ি—?

এহেন কিরণবালা কিন্তু ঢাকার মেয়ে নয়, কলকাতার মেয়েও নয়। সে থাকে এক অজ পাড়াগাঁয়ে তার পিসির কাছে। কিরণবালার গ্রামটি কিন্তু ভারী সুন্দর ও স্বাস্থ্যের জায়গা। তাই বোধ হয় কিরণের মামা'ত ভাই অনিল কলকাতা থেকে পূজোর ছুটিতে এসেছে সেখানে বেড়াতে। এই অনিল ছেলেটি কিরণবালাকে বা কিরণবালার পিসিকে আগে কখনও দেখেনি। তার মা'র কাছ থেকে এক চিঠিতে তার পরিচয় নিয়ে অনিল এসেছে তার মাসির কাছে।

একটা ছোট সুটকেশ হাতে করে ক্লান্ত অনিল বাবু এইমাত্র কিরণবালার বাড়ীর কড়া নাড়ল। কিরণবালাই বাড়ীর কর্ত্রীর মত দরজা খুলে দেয়,—

কাকে চাই আপনার? রীতিমত স্পষ্ট প্রশ্ন।

আ আমার মাসি। ঢোঁক গিলে অনিল বলে।

ওঃ শ্রীমতী হেমনলিনীকে আপনার দরকার? তা বাইরে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—ভেতরে আসুন না? — — আপনার নাম জানতে পারি?

অনিল তার কথাবার্ত্তার রকম দেখে হতভম্ব হয়।

আমার নাম খোকা, না শ্রী অনিলকুমার বসু—আম্‌তা আম্‌তা করে সে বলে।

কিরণগিন্নীর মুখে একটু মৃদু হাসি খেলে গেল। বললে, বসুন খোকাবাবু এই ঘরে, না না, আঃ এই যে এই ঘরটায়—

মিনিট দুয়েক পর দুম দুম করে আওয়াজ করতে করতে কিরণবালা আবার এসে উপস্থিত।—তিনি আসছেন তা আপনাকে একটু বসতে হবে।—বলেই কিরণবালা নিজেই বসে পড়ল।

বড় খোলা জানালাটা দিয়ে ঘন সবুজ বন দেখা যায়, সেদিকে চেয়ে অনিল ভাবে—এই মেয়েটা কে বাপু—এর কথা তো মা কিছু বলে দেয়নি!

কিরণবালা চুপ করে বসে থাকবার পাত্রী নয়। —আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি? —গলাটা তার বেশ মিষ্টি শোনায়।

অনিল বললে, না আমি কলকাতায় বরাবর থাকি কিনা—কখনও কোথাও যাইনি।

কিরণবালার গিন্নীপানা এবার সুরু হয়। বলে—আপনার মাসি, জানেন, আমার পিসি হয়। আমার নাম কিরণবালা। আপনি পিসিকে কখনও দেখেন নি না?

অনিল বললে, না তিনি এই গ্রামে থাকেন এই পর্য্যন্ত জানতাম। বেশ গ্রামটি—

ওঃ তাহলে আপনি কিছু জানেন না দেখছি—বলে পাকা গিন্নীর সহানুভূতির চোখে কিরণ অনিলের দিকে তাকাল। —জানেন সে খুব দুঃখের কথা। এই আজ ঠিক তিন বছর হল পিসি অর্থাৎ আপনার মাসি একটা ভারী শোক পান, সেই থেকে—

সেই থেকে কি—? কিসের শোক? —অনিলের দম বন্ধ হয়ে আসে।

বড় খোলা জানালাটা দেখিয়ে গম্ভীরভাবে কিরণবালা বলে,—ঘোর সন্ধ্যে বেলা শীতের সময় ঐ জানালাটা খোলা দেখে আপনি বোধহয় আশ্চর্য্য হচ্ছেন, না?

কলকাতার ছেলে অনিলের চোখের সামনে ঘন সবুজ বন হঠাৎ ঘন কালো হয়ে গেল। তার কপালে ঘাম দেখা দিল, গলার স্বর তার কেঁপে উঠল,—হাঁ—না বেশ তো গরম এখন। মাসির কিসের শোক হয়েছিল?

কিরণবালা এবার সোজা হয়ে বসল। অনিল দেখলে তার মুখখানা ভারী থমথমে হয়ে উঠল। কিরণবালা গম্ভীর ভাবে সুরু করল—ঠিক আজ তিন বছর আগে পিসেমশায় ও পিসিমার দুটি ছোট ভাই একদিন শিকারে গিয়েছিলেন। প্রায়ই তাঁরা শিকারে যেতেন—ঐ শুনুন শেয়াল ডাকছে—এখানে বাঘ বেরোয় কিনা (অনিলের চোখ গোলাকার হয়ে আসে), প্রায়ই তাঁরা শিকারে যেতেন আর শিকার থেকে ফিরে তাঁরা ঐ জানালা দিয়েই বাড়ীতে আসেন—একটু সর্ট্‌-কাট্‌ হয় কিনা। একদিন কিন্তু তাঁরা আর এলেন না। একদিন দুদিন, তিন দিন গেল।—কিন্তু আর তাঁরা ফিরে এলেন না!

কিরণবালার স্বর যেন বুজে এল। একটু পরে সে বলে চলল—এই গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা জলাভূমি আছে—গ্রামের লোকেরা সেটাকে ডাইনী জলা বলে। অন্ধকারে চারিদিকে বিরাট কুয়াসা পড়াতে পথ দেখতে না পেয়ে তারা সেই ডাইনীজলার মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর মুহূর্ত্তে তার কালো জলের মধ্যে তারা কোথায় তলিয়ে যায়! দিনের বেলা পুলিশে

ডাইনীজলায় জাল ফেললে কিন্তু তাদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। কি করে পাওয়া যাবে! — — —বেচারী পিসি! রোজই হায় পিসি ভাবে তারা একদিন নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু পিসিতো জানে না যে ডাইনীজলায় তারা প্রাণ হারিয়েছে। রোজই ভাবে পিসি—ঐ জানালা দিয়ে তারা এই এল বুঝি—যেমন তারা রোজ ফিরত। সেইজন্যই তো রোজ সন্ধ্যে বেলা ঐ জানালাটা পিসি খুলে রাখে –যদি তারা আসে!

ঘর বেশ অন্ধকার হয়ে আসে—কিরণবালাকেও ভাল করে দেখা যায় না। ভয়ে অনিলের বুক চিপ্ চিপ্ করতে থাকে।

কিরণবালার গলার আওয়াজ অনিলের কানে আসে—জানেন আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভারী ভয় করে— –মনে হয়, ঐ বুঝি জানালা দিয়ে তারা এলো—!

হঠাৎ কিরণবালা একেবারে চুপ করে যায়।

অনিল দেখে একটা লণ্ঠন হাতে করে একটি বর্ষিয়সী মহিলা ঘরে আসেন। অনিল হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। লণ্ঠনের আলোটাকে সে মনে মনে ধন্যবাদ দেয়। ইনিই তার মাসি নিশ্চয়।

তুমিই অনিল না? তা আমি বুঝেছি। কিরণের সঙ্গে গল্প করছিলে বুঝি?—তার মাসি বললেন।

মাসিকে কোন রকমে প্রণাম করে অনিল ঢোঁক গিলে বললে, হাঁ।

হঠাৎ অনিলের মাসি বলে উঠলেন, বাবা অনিল, এই ঠাণ্ডায় ঐ জানালাটা খোলা রয়েছে বলে মনে কিছু কোরো না। কারণ এখনই তোমার মেসোমশায় ও তোমারই বয়সী আমার ছুটি ছোট ভাই শিকার থেকে ফিরবে। তাদের কি খেয়াল, রোজ ঐ জানালা দিয়েই তারা ঘরে এসে ঢুকবে!

লণ্ঠনের আলোও অনিলকে আর ভরসা দেয় না। কি রকম মিট্ মিট্ করছে আলোটা। অনিলের বুকের ভেতর আরও জোরে জোরে চিপ্ চিপ্ করতে থাকে। আশ্চর্য্য! মাসি তার কথা তো একবারও জিগেস করছে না–একবার তার মার কথাও না।

মাকে মনে পড়ে হঠাৎ তার একটু সাহস আসে।

ক্ষীণ গলায় অনিল মাসিকে বলে,—আমার শরীর খারাপ বলে হাওয়া বদলাতে মা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। কোন রকম উত্তেজনা আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, ডাক্তার বলেছে।

ভীত অনিল ভাবলে, এই কথা বলে তার ভূতগ্রস্ত মাসির মন যদি ঘোরান যায়।

অনিলের মাসি একটা হাই তুলে বলেন—কি হয়েছে তোমার বাবা? তা এখানে দুদিন থাকলেই তোমার শরীর সেরে যাবে দেখো। তোমার মেসোর সঙ্গে শিকারে যেয়ো —দুদিনেই তুমি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শিকার করার এটা ভারী সুন্দর জায়গা—চারিদিকে বেশ বন জঙ্গল—তোমার মেসোমশায় এই এলেন বলে—

উঃ আবার ঐ কথা!

হঠাৎ অনিল দেখে—খোলা জানালাটার দিকে তার মাসি চোখ বড় করে একদৃষ্টে কি দেখছেন। চেয়ারে খাড়া হয়ে তিনি বসছেন। অনিলের মনে হল তিনি বেশ উত্তেজিতই হয়ে উঠেছেন! ভয়ে তার শরীর হিম হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনিলের মাসি বলে উঠলেন —এই, এই যে বাবুরা সব আসছে দেখছি! যাক্ বাঁচা গেল, চা খাবার সময়েই ঠিক সব এসেছে। ওঃ সমস্ত শরীরে কি বিশ্রী রকম কাদা মেখে বাবুরা আসছেন দেখনা—! হুঁঃ কুকুরটাও কাদায় কালো ভূত হয়ে গেছে—

অনিলের শরীর অসাড় হয়ে আসছে। কিরণবালার দিকে চেয়ে দেখলে —কিরণবালা একেবারে সোজা কাঠ হয়ে বসে আছে। তার দুচোখেও আতঙ্কের চিহ্ন ভরা! ভয়ে ভয়ে অনিল খোলা জানালাটার দিকে তাকাল –অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে তিনটি মূর্ত্তি তাদের খোলা জানালাটার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে সে দেখতে পেলে! সঙ্গে একটা কুচ কুচে কালো কুকুর ও। সমস্ত শরীর তাদের যেন কাদায় মাখামাখি—জামা কাপড় ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

ক্রমশঃ তিনটি মূর্ত্তির চেহারা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু তার মাসি অমন চুপ করে আছে কেন! ...এই ঢুকলো বুঝি ঘরে সবকটা—অনিল দেখলে—কিরণবালা উঠে দাঁড়িয়েছে—সে বুঝি পালাবে।

আর কথাবার্ত্তা নয়! অনিল তার স্যুটকেশটা কোন রকমে হাতে উঠিয়ে নিয়ে এক লাফ মেরে দরজা দিয়ে দৌড়ে রাস্তায় একেবারে অদৃশ্য—!

অনিলের মেসো তাঁর দুই শালার সঙ্গে ঘরে ঢুকে বললেন—উঃ কি কাদাটাই আজ মাখা গিয়েছে বাপ্! আচ্ছা—কে একটা ছেলে এখনই আমাদের একেবারে ঘাড়ের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাল—যেন ভূত দেখেছে! কে গো, তোমরা জানো? চোরটোর নয়ত? একটা স্যুটকেশ হাতে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে দেখলাম।

অনিলের মাসি বললেন—হায়রে কপাল! না, না, ও অনিল, অদ্ভুত পাগল ছেলে বাপু! এসে অবধি কেবল তার অসুখের কথা বলছিল। তারপর হঠাৎ কিছু না বলে যেন হন্ত দন্ত হয়ে লাফিয়ে একরকম দৌড়ে পালাল—বাবা যেন ভূত দেখেছে!

পাকা গিন্নী কিরণবালা এবার খিল খিল করে হেসে যেন ভেঙ্গে পড়ল। গা মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বাবাঃ কলকাতার ছেলে হয়েও অনিলটা কচি খোকা যেন! আমার মনে হয়, জানো পিসেমশায়, তোমার ঐ হাউণ্ড কুকুরটা দেখে ও ভয় পেয়েছিল। আমার কাছে বলছিল যে, একবার নাকি কলকাতায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলো নেড়ি কুত্তা ওকে তাড়া করেছিল—আর ও বেচারা ভয়ে একটা গর্ত্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল। সেই থেকে কুকুরের ওর ভারী ভয়—

নিছক মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলতে কিরণবালার জুড়ী আর কেউ নেই!

(বিদেশী গল্পের Plot নিয়ে লেখা)

কৈশোরক

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

হাতে কোন কায নেই, চুপ্‌চাপ্‌ ব'সে আছি দুপুরে,
বাইরেতে চোখ রেখে ব'সে আছি নির্জন জানালায় ঃ
সাম্‌নের মাঠ্‌খানা ঝিমোয় নদীর ধারে রোদেতে,
নদী-পারে বন দূরে মেশে গিয়ে আকাশের নীলিমায়।

এখানে পাখীর দল কী যে বলে কিচ্‌কিচ্‌ বুঝিনা,
ওখানেতে বাঁশবনে ঘুঘু কেন কাঁদে একা সারাখন ;
অলস বনের হাওয়া এলোমেলো কেঁপে চলে সির্‌সির্‌ ঃ
কী আবেশ লাগে চোখে, কী আবেগে ভরে ওঠে সারা মন।

আজকের নদী-মাঠ বন আর ঝির্‌ঝিরে বাতাসে.
মায়াময় দুপুরের নীলিমা ও মৃদু কলগুঞ্জন
এনে দিলে কবেকার ভুলে-যাওয়া হারাণো কিশোর ;—
কত দূরে ফেলে-আসা, মুছে যাওয়া কত স্মৃতি ভুঞ্জন।

অস্ফুট কত সুর, কত খেলা মনে পড়ে আব্‌ছা ঃ
সেই সব বিকালের সে-রঙীন, অপরূপ আকাশে
লাগ্‌তো কত-না রঙ্‌, মুছে যেতো কত রঙ্‌ সন্ধ্যায়,
অচিন্‌ কে শিল্পীর সুনিপুণ তুলিকার প্রকাশে।

* *
*

সেদিন কোথায় গেল, সে-মন হারালো কোথা কবে যে,
আজকে একলা ব'সে ভাব্ছি সে কথা নিরালায়—
রঙীন্ চশ্মা ছিলো নবীন্ চোখেতে, সেই চশ্মা
ভেঙ্গে গেছে, মুছে গেছে অকরুণ পথের ধূলায় ।

অনেক দিনের পরে, অনেক পুরাণো কথা জাগ্ছে,
আকুল হয়েছে তাই নীলাকাশে দুপুরের রাগিণী ঃ
সে-পৃথিবী মরে গেছে, নিবে গেছে সেই-আলো ঝড়েতে—
এখন লিখ্ছি ব'সে, লিখ্ছি সে পুরাতন কাহিনী ।

দূর বনতল হতে আজকে দিলো কে ডাক পাঠায়ে,
ডাক্লো কিশোর মোর ঘুমানো সে সেকালের আমারে ;
স্বপন-বুলানো চোখে আধ্ফোটা উদ্গ্রীব মনেতে
আপনা হারাতে সেই ছায়ায় ছায়ায় নদী কিনারে ।

গ্রীক কিংবদন্তীর এ্যাসক্লীপিয়ুস ঃ এক হাতে সাপ আর ওষধি-লতা

সাপ !

সাপ !!

রজত সেন

সাপ তোমরা দেখেছো । নানা রঙের, নানা আকারের সাপ কত জায়গাতেই দেখা যায় । সাপুড়েদের প নাচানোর ব্যাপার ত পথে ঘাটে লেগেই আছে । এর চাইতে সাঙ্ঘাতিক জীব পৃথিবীতে আর আছে কনা সন্দেহ ! কুকুরে যদি তাড়া করে ত সাহসে ভর করে জুতো শুদ্ধ এক ঘা লাথি কষাতে পারলেই কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখা যায়, আর নেহাতই যদি কামড়ায় তা হলেও ভাবনার কিছু নেই, পেটে বাইশটা জেকসন নিতে পারলেই আর জীবনের ভয় নেই । অবশ্য ভালো কুকুরে কামড়ালে বা আঁচড়ালে কিছু নেই, খানিকটা টিনচার আইয়োডিন বা বেন্জইন্ লাগিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত ! কিন্তু সব সময়ে ত

৪

জানবার উপায় থাকে না—ভালো কি পাগলা কুকুর। ধর রাস্তায় বেড়াতে বেড়িয়েছো, কুকুরে কামড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল, তখন তুমি জানছো কি করে ভালো না মন্দ। তাই সব সময়েই হাঁসপাতালে গিয়ে ইন্‌জেকসান নেয়া উচিত। যদি পাগলা কুকুরে কামড়ায় আর তুমি গাফিলি করে দিব্যি ঘুরে বেড়াও স্বয়ং ঈশ্বর এলেও তোমাকে বাঁচানো যাবে না। কুকুরের মত চেঁচাতে চেঁচাতেই তোমার প্রাণ বেড়িয়ে যাবে।

একটা সত্যি ঘটনা শোনো : এক ভদ্রলোকের চমৎকার একটা স্পানিয়েল কুকুর ছিলো, জোয়ান আর তেজি, বিশ্বাসী আর বলিষ্ঠ। কুকুরটা যখন প্রকাণ্ড হাঁ করে উঁচু হয়ে বসতো মনে হত রাজা। আর ভদ্রলোকের যদি কোন দিন অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটার জায়গায় পাঁচটা পঁয়ত্রিশ হত কুকুরটা রাস্তায় গিয়ে অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতো।

ইতিমধ্যে স্পানিয়েলটা লুকিয়ে লুকিয়ে রাস্তার একটা কুকুরের সঙ্গে খুব ভাব করে ফেললে। যখন তখন পালিয়ে সেই কুকুরটার সঙ্গে ছুটোছুটি করতো। হঠাৎ এক ভোর বেলা স্পানিয়েলটা দেখতে পেলে কয়েকজন লোক লোহার প্রকাণ্ড সাঁড়াসি দিয়ে নিতান্ত অসহায়ভাবে তার বন্ধুকে লোহার খাঁচায় পুরে ফেলছে। বেচারার গলায় তখন শিকল, তু-একবার চেষ্টা করে দেখলো শিকল ছেঁড়া যায় কিনা—তা হলে সে একাই ঐ চারটি লোককে ঘায়েল করে দিতে পারতো। পাড়ার লোক করপোরেশনে খবর দিয়েছিলো—রাস্তার কুকুরটার নাকি পাগলামির ছিট দেখা দিয়েছে। স্পানিয়েলটা কাল সন্ধ্যার সময়ও তার বন্ধুর সঙ্গে খেলা করেছে।

এখন স্পানিয়েলটা যে ভদ্রলোকের তিনি অফিস থেকে এসে কুকুরটার সঙ্গে খেলা করতে করতে দেখলেন—তার মুখে একটা ছোট্ট আঁচড়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি করে চোট লাগলো। কুকুর শুধু হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। কুকুরের কি অত বোঝাবার ক্ষমতা আছে? খেলা করতে করতে স্পানিয়েল তাঁর কপালে হঠাৎ একটা আঁচড় দিয়ে দিলে। তিনি তেমন লক্ষ্য করলেন না!

পরদিন অফিস থেকে এসেই শুনতে পেলেন তাঁর কুকুরটা অসম্ভব চীৎকার করছে; অদ্ভুত গলায় অস্বাভাবিক এক চীৎকার, সে ডাক কখনও তিনি শুনেছেন মনে হল না। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে দেখেন কুকুরটা শিকলে শক্ত করে বাঁধা, আর চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর সমস্ত লোক। তখুনি ডাক্তারের কাছে লোক ছুটলো। পাড়ার পশু-চিকিৎসক, তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন (Hydrophobia) জলাতঙ্ক রোগ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। ভদ্রলোক ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন; হৈ চৈ, ছুটোছুটি পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু সর্ব্বনাশের ব্যাপার হল কাল যে তাঁকে কুকুরটা কপালে আঁচড়ে দিয়েছিলো—আর দেখা দিয়েছিলো রক্তের একটা সুক্ষ্ম দাগ সে কথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ পাগল হয়ে যাবার কারণ কি? ডাক্তার বললেন নিশ্চয় রাস্তার কোন পাগলা কুকুরের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে করতে কামড়ে দিয়েছে।

যা হোক কুকুরটা মাঝরাতে মারা গেল।

সকাল থেকে ভদ্রলোকেরও পাগলামির লক্ষণ দেখা দিল। রাস্তার সেই পাগলা কুকুরটা স্পানিয়েলের

শরীরে যে জলাতঙ্কের বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলো—স্পানিয়েলটা খেলার ছলে সে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মুনিবের রক্তে।

ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বাড়ীর লোক ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, সমস্ত শরীরে তখন বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।

ভদ্রলোক মারা গেলেন তেমনি অসহায়ভাবে চীৎকার করতে করতে!

কিন্তু বলছিলাম তোমাদের সাপের কথা, সে কাহিনী থেকে জলাতঙ্কে চলে এলাম।

বলছি।

কুকুরে কামড়ালে তবু ওষুধ আছে, হাসপাতাল আছে। যথাসময়ে ইনজেকসন দিলে মরবার ভয় নেই মোটে। (যে ভদ্রলোকের গল্প তোমাদের বললাম সে রকম তুর্ভাগ্য ক'জনের আর হয়।)

সাপের জীবনী-শক্তি যেমন অসাধারণ তেমনি সাঙ্ঘাতিক তার বিষ। যদি কোন বিষাক্ত সাপ—যেমন ধর কেউটে বা গোখরায় যদি কামড়ায় তা হলে নির্ঘাত মৃত্যু। শুনেছি ওঝারা মন্ত্র পড়ে গা থেকে বিষ নামিয়ে নেয়; এবং অনেক ক্ষেত্রে সাপের কামড় ভাল করে দেয়। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি তা জানিনে। হয় তো সত্যিও হতে পারে—নিজে চোখে যা দেখিনি সংসারে এমন অনেক জিনিষ আমাদের সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। তা ছাড়া তন্ত্র মন্ত্রের এখনও নাকি অনেক জোর। অর্থাৎ কোন তুষ্প্রাপ্য জিনিষ আমরা মন্ত্রের জোরে পেতে পারি বা তান্ত্রিক মতে জপতপ করে আমাদের পরম শত্রুর অমঙ্গল ঘটাতে পারি। বিশ্বাস হয়? পারা যায়? তা হলে স্বচ্ছন্দেই ত হিটলার বা মুসোলিনিকে সাবার করে দেওয়া যায়। নাকি যারা হিন্দু নয় তাদের গায়ে মন্ত্র লাগে না।

ওঝারা বিষ নামাতে পারুক বা না পারুক এবং যথাসময়ে তাদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিলো কিনা সেটাও অবশ্য জানা যায়নি তবে সাপের বিষের নমুনা শোনো।

রাণীগঞ্জে (যেখান থেকে কয়লা আমদানী হয়) সেখানে এক বাড়ীর ধারে কয়েকজন টেনিস খেলা শেষ করে কূয়োর জলে পা ধুচ্ছিলো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। কূয়োর আশে পাশে ইটের স্তূপ, ভাঙ্গা কাট, তু'একটা ঝোপঝাড়। ছেলেদের একজনের নাম অমিয়। হঠাৎ সে আর্ত্তনাদ করে উঠলো, 'কি যে কামড়ালো!'

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চ জ্বেলে একজন দেখলো একটা মাঝারি আকারের কালো সাপ অন্ধকারে ইট-পাটকেলের মধ্যে মিশে যাচ্ছে, ভালো করে বোঝা গেল না কি সাপ। তবে, সাধারণতঃ কালো সাপ বিষাক্ত হয়।

অমিয় তখন বসে পড়েছে মাটিতে। একজন কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে হাঁটুর নিচে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেললে, তখুনি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার ছুরি দিয়ে ক্ষতস্থানটা ভালো করে চিরে অনেকখানি রক্ত বার করে দিলে! তারপর তামা আগুনে সেঁকে দিলে সেখানটা পুড়িয়ে। বললে, যা করবার সবই ত করা হল, আশা করি আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাপের কামড় সম্বন্ধে অত সহজে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। তখুনি তাকে নিয়ে আসা হল কলকাতার হাসপাতালে। হাটুর বাঁধন খুলে দেওয়া হল। খুব জ্বর, মাথাধরা, অস্বস্তিতে কাটলো রাত্রিটা। হাসপাতালের লোহার

খাটে শুয়ে নানা রকম ভয়ের স্বপ্ন দেখে রাত্রিটা কোন রকমে কেটে গেল। ডাক্তাররা যথারীতি চিকিৎসা করলো, বন্ধুরাও রাত জেগে পাহারা দিলে অবিশ্রাম।

সকাল থেকে ছেলেটার আর কোন জ্ঞান নেই। বাপ মা থাকতো কোন এক মফস্বল সহরে। তাঁদের টেলিগ্রাম করে আনানো হল।

সাপ যেখানে কামড়েছিলো সে জায়গাটা দেখতে দেখতে পেকে গেল, তারপর সমস্ত পা। ডাক্তাররা সব পুঁজ বার করে দিলে। আবার পাকলো, কাটা হল। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্যাংগ্রিন (Gangrene) দেখা দিল। পা পচতে আরম্ভ করলো। ক্রমশঃ সেই দারুণ ঘা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত শরীরে তারপর— কয়েকদিনের মধ্যেই অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হল।

আধুনিক বিজ্ঞান অনেক চেষ্টা করছে সাপের কামড়ের ওষুধ বার করতে। কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক কৃতকার্য্যও হয়েছে। কিন্তু তেমন কোন অব্যর্থ ওষুধ আজ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি যাতে লোক চটপট বেঁচে উঠতে পারে।

সাপের অদ্ভুত জীবনী শক্তি সম্বন্ধেও কিছু জানবার আছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সাপ মেরেছো। পাড়াগাঁয়ে লোকের বিশ্বাস সাপ মেরে পুড়িয়ে ফেলতে হয় নতুবা আবার বেঁচে উঠতে পারে। একেবারে যদি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তা হলে কোন প্রাণী বেঁচে উঠ্‌তে পারে এটা অবশ্য হাস্যকর সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক মার-ধোরের পর শরীরের সমস্ত জায়গা ক্ষত করে মাথাটা গুঁড়িয়ে একেবারে মাংস পিণ্ড করে ফেলে দিলেও সাপের মৃত্যু সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না! ছেলেবেলায় আমরা অনেক সাপ মেরেছি। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে থ্যাঁৎলা করে দিয়েও দেখা গেছে ল্যাজটা ঠিক নাড়ছে। মনে হয় সম্পূর্ণরূপে সাপের প্রাণ কখনও বেরিয়ে যায় না। একেবারে মেরে ফেলে (যখন দেখা গেল প্রাণের আর কিছু মাত্র চিহ্ন নেই) কয়েকদিন পরে গিয়ে দেখা গেছে বেশ স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস নিচ্ছে। পৃথিবীতে আর কোন প্রাণীর এমন অদ্ভূত শক্তি আছে শোনা যায় না। এবং ঠিক এজন্যেই সাপ মেরে পুড়িয়ে ফেলতে বলা হয়।

একটা প্রায় ছ'হাত লম্বা কেউটে সাপকে একবার অনেক কষ্টে ত মারা হল। ব্যাটা মরতে কি চায়? চারটি লোক একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম! তারপর ধারালো ছুরি দিয়ে মাথা থেকে ল্যাজ পর্য্যন্ত চিরে শরীরের অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে তার চামড়াখানা নিয়ে তক্তার ওপর পেরেক মেরে টান করে সাত দিন শুকানো হল। নুণ দিয়ে মেজে ঘসে আরসেনিক সাবান দিয়ে সেটাকে পরিস্কার করতে লাগলো একটা পুরো দিন। তারপর হালকা এক পোঁচ রং লাগিয়ে বসবার ঘরে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হল।

কিন্তু এখানেই ব্যাপার শেষ নয়।

প্রথম কয়েকদিন আলোচনা করে সাপের গল্প করতে করতে কেটে গেল। তারপর ক্রমে একদিন চামড়ার কথা সবাই ভুলে গেল। কিন্তু ঠিক এক বছর পরে এক সকাল বেলা সবাই ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কখন কোন সময়ে সেই এক বছর আগেকার শুকনো চামড়ার গা থেকে একখানা খুব পাতলা, মসৃণ, চকচকে খোলস বেরিয়েছে। ভয়ানক আশ্চর্য্য, না?

আর শুধু সে বছর নয় প্রত্যেক বছর তেমনি খুব পাতলা একখানা খোলস বেরুতো! ব্রাস দিয়ে সে খোলসটাকে পরিস্কার করে ঝেড়ে না ফেললে চামড়াখানা ভালো দেখাতো না।

মৃত্যুর পর কোন প্রাণীর জীবনের স্পন্দন কি অতদিন পরেও পাওয়া যায়? তা হলে সাপ কি সম্পূর্ণরূপে মরে না? তার জীবনের কোন অংশ কি অনেক দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে? তা কেমন করে সম্ভব? প্রাণ কি?

জানলার বাইরে

পূর্ণেন্দু লাহিড়ী

এলো বর্ষা মেঘের বেণী দুলিয়ে
কাল্ বৈশাখী নিয়ে সঙ্গে,
দিল বিশ্বের অলসতা ভুলিয়ে
ক্ষ্যাপা ঝাপটার শিশু-রঙ্গে।

বিরাট শিশুর এই নৃত্য—
তৈ তাথা থৈ তাতা থৈ তা
ভরে দিল পৃথিবীর চিত্ত;
মূর্চ্ছিত পৃথিবী যে, কৈ তা?

পশ্চিমে নিঃশ্বাস পতনে—
বিশ্বাস নেমে এল মাটীতে।
কিষাণেরা বেঁধে নিল যতনে
কাস্তেটা সোনা ধান কাটিতে।

হোল খাল, বিল টাইটম্বুর,
সারা দেশ বুজে গেল সবুজে,
কোণে কোণে বেজে উঠে' ডম্বুর
সান্ত্বনা দিল যত অবুঝে।

সাড়া পড়ে গেল যত কুটীরে ঃ
গুটি গুটি যায় প্রাণে ভরসা,
দুই হাতে নেব ধান লুটিরে—
এল যে রে ভরা জল বরষা।

এল বলাকারা ঢেউবিলাসী—
চকচক করে জল পালোকে,
নদীজলে আঁকে ছায়া চিল আসি'
সকালের নিঃঝিম আলোকে।

ভোরের এই আলোটা কি মিষ্টি,
চুপ করে দেখি অনবরত ঃ
নেমে এল ফোঁটা ফোঁটা বিষ্টি
এক দুই তিন করে কত তো।

টুংটাং সার্সিতে বাজে জল—
সুর নেই, খালি খামখেয়ালী,
মন তবু তা'তে হোল ছলছল
ভেজা কচি ভোর হোল হেয়ালী।

জানলার ওপারেতে সরসা—
চুপ করে শুয়ে তাই শুনছি ;
গেয়ে গান নেমে এল বরষা
তাই দিয়ে স্বপ্ন কি বুনছি।

রোমিও জুলিয়েট

শ্রী[illegible]কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

শেক্‌স্‌পীয়ারের এই বিখ্যাত নাটকটী প্রথম ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ছাপান হয়। অনেকে মনে করেন তো বছর আগে লেখা হয়। যে গল্পটী নিয়ে এই নাটকখানি তৈরী হয়েছে, সে ইতালী দেশের প্রাচীন গল্প ও নভেলের বইতে পাওয়া যায়। গল্পটীর সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক। স্থান হচ্ছে ইতালীর ভেরোনা এবং মান্টুয়া। শেক্‌স্‌পীয়ারের আগে আর্থার্‌ ব্রুক বলে আর একজন সাহিত্যিক আর গল্পটের উপাখ্যান নিয়ে একখানি নাটক লেখেন কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের অমর সে তো [illegible] তা আজ হারিয়ে গিয়েছে।

ক[illegible]

প্রস্তাবনা

রয়ে[illegible] দুটী বড় বংশ, সম্মানে মর্য্যাদায় দু'জনেই সমান—
গি[illegible] সুন্দরী ভেরোনা শহরে, যেখানে আমাদের গল্প হয়েছে সুরু,
কা[illegible] অতি পুরাতন এক ঝগড়ার ফলে আজও কথায় কথায় তারা লাঠালাঠি করে,—
মানুষের রক্তে মলিন হয়ে ওঠে মানুষের হাত।
এই দুই শত্রুর রক্ত-লাঞ্ছিত দুই দুর্গ থেকে,
জন্ম নিয়েছিল একটী ছেলে আর একটী মেয়ে—
তাদের জন্ম-লগ্নে আকাশের তারারা ছিল বিরোধী—
কিন্তু দুঃখ-কণ্টকিত তাদের জীবন
মৃত্যু-মূল্যে মিলন আনলো এই অতি পুরাতন শত্রুতার।

তারি গল্প বলি শোন।
দুটী বড় বংশ—মর্য্যাদায় দু'ই সমান।
একটীর নাম মণ্টেগু আর একটীর নাম ক্যাপুলেট।

TORN PAGE(S).

কিন্তু হলে কি হ... সে পুরাকালে এই দু' বংশে ছিল ঝগড়া, আজও তারা তো ভোলে নি, ভুলতে পারে নি বাড়ীর লোক, ও-বাড়ীর লোকের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতো না...বেশীক্ষণ কথা বল্লেই না একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যেতো। আর সে ঝগড়া কি শুধু কথাতেই শেষ হতো...থে, ঘাটে, মাঠে, উৎসব-স্থল যেখানেই হোক, রক্তারক্তি না হলে সে ঝগড়ার বিরাম হতো

চাকরবাকররাও তাই করতো। গায়ে পড়ে ...ধিয়ে তারা তলোয়ার খুলে বসতো। কি রকম হতো শুনবে? ক্যাপুলেট বাড়ীর দু ...রের সঙ্গে মণ্টেগু বাড়ীর দু'জন চাকরের দেখা হয়েছে.........

মণ্টেগুর চাকর—বলি, আমাদের লক্ষ্য করে বুড়ো আঙুল দে...

ক্যাপুলেটের চাকর—আমার আঙুল আমি কামাড়াচ্ছি—তোর ...কি

—আমাদের দিকে লক্ষ্য করে কেন কামড়াচ্ছিস্?

—ঝগড়া করতে চাস্?

—মুখ সামলে কথা বলবি!

—কথার দরকার কি, খোল্ তলোয়ার।

এই রকম তাদের সম্পর্ক।

একদিন ক্যাপুলেটদের কর্তা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করলেন। ... লোকের নিমন্ত্রণ হলো। বাদ পড়লো শুধু মণ্টেগুদের বাড়ীর লোকেরা। লোকজ... বলে দেওয়া হলো, সাবধান, মণ্টেগু বাড়ীর কোন লোক যেন না আসতে পায়।

রোমিও হলো মণ্টেগু বাড়ীর ছেলে। সুন্দর সুপুরুষ যুবা। রোজালিন ব... মেয়েকে রোমিও বড় ভালবাসতো। কিন্তু রোজালিন রোমিওকে গ্রাহ্য করতো... শেষকালে তাদের দু'জনের দেখা শোনাও আর হতো না। তাকে দেখবার জন্যে রোমি... মন কাঁদতো। কিন্তু যে দেখা দেবে না, তাকে কি করে দেখা যায়! রোমিও শুনলো ক্যাপুলেটদের উৎসবে রোজালিনের নিমন্ত্রণ হয়েছে। সেখানে গেলে নৃত্য-উৎসবে তার স... দেখা হতে পারে। কিন্তু সে বাড়ীতে যে তার প্রবেশ নিষেধ! আর নিষেধ শুধু ... জানাজানি হয়ে গেলে, তলোয়ার নিয়ে আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর গতি থাকবে না।

কিন্তু পাগল রোমিও ঠিক করলে, সে যাবে। তবে ছদ্মবেশে। দু'জন বন্ধুকে ... নিয়ে রোমিও ছদ্মবেশে ক্যাপুলেটদের ভোজ সভায় গিয়ে উপস্থিত হল।

বৃদ্ধ ক্যাপুলেট পরম সমাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। রোমিও-র চোখ শুধু খুঁজছিল, কোথায় রোজালিন! কিন্তু রোজালিনকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ রোমিও-র দৃষ্টি একটী মেয়ের উপর গিয়ে পড়লো—এমন অপরূপ রূপ সে আর দেখে নি!

রোমিও বিস্ময়ে আপনা থেকেই বলে উঠলো, জানি না কে ঐ মেয়েটী! ও-র রূপের আলোতে ঘরের সব আলো ম্লান হয়ে এসেছে.........কাকের বাসর সভায় শ্বেত-বরণী কে ও মরাল?

হঠাৎ টাইবল্ট্ নামে একজন ক্যাপুলেটের কাণে সেই কণ্ঠস্বর যেতে, সে চমকে উঠলো। সে রোমিওকে চিনতে। হঠাৎ তার ছদ্মবেশ দেখে, আর তার কণ্ঠস্বর শুনে, সে রোমিও-কে চেপে ধরলো।

বৃদ্ধ ক্যাপুলেট না এসে পড়লে হয়ত রক্তারক্তি হয়ে যেতো। তিনি বল্লেন, এই নিয়ে আর গণ্ডগোল করে কাজ নেই! হোক মণ্টেগু, শুনেছি ছেলেটি বড় ভাল! আর এখানে সে তো কোন অভদ্রাচরণ করেনি!

কাজেই ব্যাপারটা আর বেশী দূরে গড়াতে পারলো না।

...ও রোমিও-র সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। তখন তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রয়েছে ...ম-না-জানা সেই মেয়েটী, যার রূপের আলোয় সেই উৎসব সভার সব আলো হয়ে গিয়েছে ম্লান। মনে হলো জগতে সেই প্রথম, সেই রাত্রিতে সে জানলো, সে দেখলো রূপ কা...কে বলে!

যেখানে সেই মেয়েটী দাঁড়িয়ে ছিল রোমিও সেখানে গিয়ে তার পাশে গিয়ে ...লো....... ....

রোমিও—ক্ষমা করো, যদি আমার এই মলিন হাতে তোমার ঐ হাত স্পর্শ ...রি...আমার স্পর্শে যদি মলিন হয় এই মন্দিরের সূচিতা.........

রোমিও তার মনের আবেগে জুলিয়েটকে অনেক কথা বলতে যাচ্ছিলো, এমম সময় দাসী এসে জানালো যে মেয়েটীর মা মেয়েটীকে ডাকছে!

মেয়েটী চলে গেল। রোমিও-র মনে হলো, উৎসবের সব আলো যেন নিভে গেল!

মেয়েটী চলে গেলে রোমিও দাসীকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি বলতে পার কে ওঁ-র মা!

—তুমি কে গা বাছা! জান না, ও হলো জুলিয়েট.......ও-র মা-ই তো এই বাড়ীর গৃহিণী!

TORN PAGE(S).

রোমিও-র মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! কি সর্ব্বনাশ! যে বাড়ীতে তার প্রবেশ নিষেধ, যাদের সঙ্গে তাদের চিরশত্রুতা, এ যে সেই চিরশত্রু ক্যাপুলেটদের নয়ন-পুতুলী জুলিয়েট! হায় ভগবান্, কেন আমাকে মণ্টেগু করে জন্ম দিলে!

ওধারে জুলিয়েটের মনে শান্তি ছিল না। এমন সুন্দর কথা তো সে জীবনে আর শোনে নি। কিন্তু কার সঙ্গে কথা হলো, তাতো জানা গেল না। দাসী ফিরে এলে সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করে জানলে, যুবকটীর নাম রোমি-ও, তাদের চিরশত্রু মণ্টেগুদের বংশধর। জুলিয়েটের মন কেঁদে বলে উঠলো, হায় ভগবান্, কেন আমাকে ক্যাপুলেট্ করে জন্ম দিলে!

সেদিন উৎসবের শেষে রোমিও আর বাড়ী ফিরলো না। ক্যাপুলেটদের বাড়ীর পিছনে ছিল উদ্যান। রাত্রি বেলা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সেই উদ্যানে গিয়ে ঢুকলো। যদি কোন রকমে জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা হয়।

জুলিয়েটেরও চোখে ঘুম নেই।

বাগানের ধারে জানালা খুলে সে দাঁড়িয়ে আছে। আপনার মনের কথা সে কাকেই বা বলে! তাই আপনার মনে সে বলে উঠলো, রোমিও, ও, রোমিও, বল, বল কেন তুমি রোমিও হলে? ভুলে যাও তোমার নাম, ভুলে যাও তোমার বংশ, আমি ভুলে যাব যে আমি ক্যাপুলেটের মেয়ে!

"তোমার নাম হলো আমার শত্রু......
হলেই বা মণ্টেগু, তুমি তো সেই তুমি!
মণ্টেগু নামে কি আসে যায়? ও তো শুধু নাম!
ও নাম বল্লে তো কিছু বোঝায় না, যা কিছু তোমার দেহ ও মনের!
দোহাই তোমার তুমি অন্য নাম নাও!
নামে কি যায় আসে?
গোলাপের যদি অন্য নাম হয়,
তবে কি তার সুবাস যাবে বদলে?
অন্য নামে যদি গোলাপকে ডাকি,
তেমনি সুবাস সে-ও দেবে!"

সেই কথা রোমি-ওর কাণে গিয়ে পৌঁছতে, রোমি-ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সে আর থাকতে পারলে না! জুলিয়েটের কথায় সে সাড়া দিয়ে উঠলো!

—তুমি ডেকো না আমাকে রোমিও বলে! তোমার ভালবাসায় নতুন করে হবে আমার নামকরণ!

রোমিও-র কণ্ঠস্বর শুনে জুলিয়েট হঠাৎ চমকে উঠলো। একি এই নির্জ্জন রাত্রে, এখানে কে কথা বলে? যখন জানতে পারলো যে, রোমিও নিজে তার সঙ্গে কথা বলছে, তখন আনন্দে তার মন ভরে গেল। সেই নির্জ্জন রাতে তারা দুজনে কত কথা বল্লে, মধু-র মত মধুর কথা, রূপকথার রাজকুমারী যুগ-যুগান্তের ঘুম ভেঙ্গে যে-সব কথা তার রাজকুমারকে বলেছিল, তোমরা যখন বড় হবে, তখন তা শুনবে, আজকে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু তোমাদের কাণে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে, তারা দুজনে সেদিন শপথ করলে, আমরা দুজনে বর-বধূ......কেউ পারবে না আমাদের দু'জনকে আলাদা করতে.........

জুলিয়েট জানালা বন্ধ করে চলে গেল ঘরে। রাত্রি শেষ হয়ে তখন উষার আলো-আঁধার দেখা দিয়েছে। রোমিও ফিরে এল ঘরে, শিশিরে ভেজা বন-পথ দিয়ে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

প্রাণধন পোদ্দার

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

আমাদের প্রাণধনে চেনোনাকি তুমি হে ?
একরাতে বিছানাতে ছিল সে যে ঘুমিয়ে—
নাক ডাকে ঘর্ঘর,
ডাকে সারা রাতভর,
কাঁপে সারা ঘর দোর, কাঁপে সারা 'রুম্'-ই হে !

গৃহিণীর ঘুম নেই সারারাত চক্ষে—
প্রাণধন জাগলেই তবে তার রক্ষে—
বহু দেরী হতে ভোর
হেনকালে এক চোর
ঢুকে পরে গৃহে ওর দুরু দুরু বক্ষে !

গৃহিণীর ঘুম নেই তারপর কান সাফ্—
টের পেল সব সেই—সিঁদকাঠি ধুপ্‌ধাপ্ !
গৃহিণী সে ভয়ে হাঁকে—
ডেকে বলে কর্ত্তাকে,
"ধরে ফেল চোরটাকে, করে ফেল ওরে গাপ্ !"

জেগে ওঠে প্রাণধন গৃহিণীর গলাতে—
রেগে ওঠে ভয়ানক সব কথা বলাতে !
চুরি হবে তার বাড়ী—
এযে বড় বাড়াবাড়ি—
তার ঘরে বাট্‌পাড়ি কানখানি মলাতে !

গৃহিণীরে বলে ফেলে, ডাকো দেখি চাকরে—
উনুন ধরাতে বল—তারপর চা করে
আন দেখি এক কাপ্
হবে বহু লাফ্ ঝাঁপ
এর মাঝে—"ছেড়ে হাঁফ"—ঘুম দেই ধা-করে !

জীবন

যষ্টীধন সেনগুপ্ত

হিমবর্ষী আকাশের নীচে স্বপ্নালু নিঝুম রাত্রি।…

সোলেমন কড্‌নিক বাক্স হইতে একটি ভর্ত্তি রিভলবার বাহির করিল। তারপর ব্যাগের ভিতরে কতগুলি লোহার জিনিষ ভরিয়া দেওয়াল সংলগ্ন ঘড়ির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া কটা বাজিয়াছে দেখিবার চেষ্টা করিল।

"হ্যাঁ বারটা,—এখনও পুরো একঘণ্টা বাকী," অস্ফুটস্বরে সে বারেবার এই কথাগুলিরই আবৃত্তি করিয়া চলিল। তাহার পর পায়ের কাছের বিবর্ণ ভগ্নপ্রায় ল্যাম্পটির আলো কমাইয়া দিয়া ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিল।

ঘরের দরজা অর্গল-বদ্ধ। বাইরের কোন এক উগ্র মিষ্ট ফুলের সুগন্ধভারে ছোট ঘরটি ঈষৎ ভারাক্রান্ত, ভিতরে কম্প্রমান ল্যাম্পের স্তিমিত মৃদু দীপশিখা। এই স্তিমিতালোকে সোলেমনের বয়স ঠিক করা যায় না; কিন্তু বয়স তাহার যতই হউক, মুখে তাহার নামিয়া আসিয়াছে বার্দ্ধক্যের ছায়া, রক্তহীন মুখে, পাণ্ডুর চোখে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। আধ ময়লা সার্টের সেলাইগুলো বাতির ক্ষীণ আলোতেও দেখা যায়।

সোলেমনের স্ত্রী "টারসা" ঘরের এককোণে একটি ছোট দড়ির খাটিয়ার উপর ঘুমাইতেছে। তাহার নাক ডাকার শব্দ ঘরের ও বাইরের অনেকখানি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে। সোলেমন হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া ঘৃণাপূর্ণ স্বরে কি যে বিড় বিড় করিয়া বকিয়া গেল বুঝিতে পারা গেল না। তারপর আবার সে পায়চারী সুরু করিয়া দিল।

"টারসা"র পাশের খাটিয়ায় সোলেমনের মেয়ে "সারা" ঘুমাইতেছে। বয়স তার আন্দাজ তেইশ! তাহার দিকে ফিরিয়া সোলেমন বলিয়া উঠিল, "এই কঠোর দারিদ্র্য" অক্টোপাসের মত আমার কণ্ঠ চেপে ধরেছে যেন। এ দারিদ্র্যের নাগপাশ এড়িয়ে একদিনও হাসতে পেলাম না। পয়সার অভাবে মেয়েটার আজও বিয়ে দিয়ে উঠতে পার্‌লাম না।"

টপটপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু কপোল বহিয়া মাটীতে ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আবার সে পায়চারী সুরু করিল।

পকেট হইতে একটী অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট লইয়া ল্যাম্পের আলোয় ধরাইল। বারকতক জোরে টান মারিয়া জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইল।

ঘরের ভিতর অপেক্ষা বাইরের অন্ধকার যেন বেশী। অনন্ত-বিস্তৃত কালো আকাশে মাত্র তিনটী তারা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলে। বাইরের দুরন্ত হাওয়া হুহু করিয়া বাইরের বনভূমি কাঁপাইয়া চলিয়া যায়।

জানালার ভিতর দিয়াও হাওয়া আসে, শিরশিরে হাওয়া। পায়চারী বন্ধ করিয়া একটী টুল লইয়া তাহার উপর ছিন্নপ্রায় ওভারকোটখানি বেশ করিয়া গায়ে জড়াইয়া বসিয়া রহিল।

"এতক্ষণ নিশ্চয় 'জানভিল' তার বাড়ী ছেড়ে বনের পথ ধরেছে। আর আমিও একটু পরে বেরিয়ে ওর সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট জায়গায় মিলবো। তারপর আস্তাবল থেকে ঘোড়া দুটোকে আস্তে আস্তে না বার করে, একেবারে পৌঁছবো ঘোড়ার খদ্দের সাইমনের কাছে—তারপর ১০০ রুবল্ মারে কে?" ভবিষ্য অর্থ প্রাপ্তির আশায় তাহার কোটরাগত বুভুক্ষু চোখদুটি জ্বলিয়া উঠিল।

"কিন্তু যদি ধরিয়া ফেলে?" নিজের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তাহার অনাহারক্লিষ্ট পাতলা দেহটিকে পলকের জন্য কাঁপাইয়া তুলিল। বেশী দিন নয়। বছরখানেক আগেই সে "ডন মেয়ারে"র সঙ্গে ধরা পড়িয়াছিল। তার মনে পড়ে সেই ধরা পড়ার সময়কার ছবি, তাহার চাবুক-লাঞ্ছিত মুখ, রক্তে ঝোঁঝা শরীর,—সর্ব্বশেষে প্রধান ও ন্যায়পরায়ণ বিচারপতির আদেশে, সুদীর্ঘ একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। এসবই তাহার মনে পড়ে।

"আমাদের জীবন হচ্ছে কুকুরের জীবন। পঞ্চাশ ত প্রায় বেরিয়ে গেল, এখন আর আমাদের জীবনের মূল্য কি? কিন্তু তবুও নিজেকে বাঁচিয়ে পরদের বাঁচাতে হবে,—অন্ততঃ চুরি করেও।" "সে হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিশ্রী বীভৎস তাহার হাসির আওয়াজ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহত হইয়া ঘুরিতে লাগিল।

সোলেমন মানুষের বিচিত্র অবস্থা বিবর্ত্তনের কথা ভাবে। সে যে একথা মাঝে মাঝেই ভাবেনা এমন নয়। প্রায়ই সে ভাবে, বিশেষ করিয়া ভাবে তাহারই ধনী খদ্দের সাইমনের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা।

বিশবৎসর পূর্ব্বে দুজনেরই পেশা ছিল আস্তাবলে আস্তাবলে ঘোড়া চুরী করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজেদের ভরণপোষণ চালানো। সোলেমন আজও সেই পেশা অবলম্বন করিয়া আছে। কিন্তু সাইমন? কাল স্রোতের কত ঘূর্ণী, কত আবর্ত্ত, কত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বিশ বৎসরের মধ্যে সাইমন হইয়া গেল সহরের শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ধনী, ঘোড়ার সেরা ব্যবসায়ী! পূর্ব্বে সেই একই পেশা, অথচ দুইজনেই রহিয়া গেল অদৃষ্ট নদীর দুই তটে। সোলেমনেরও কি কামনা ছিল না— সাইমনের মত ঐশ্বর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুখে উচ্ছলিত সুন্দর ঝলমল করা জীবন, তাহার মত বাড়ীভরা সদাহাস্য মুখরিত ছেলেমেয়ের দল, তাহার মত প্রথম জীবনের বিস্মৃতি? কিন্তু তাহার জীবনে সেইরকম সুদিন আসিল কই? আজও সাইমনের কাছে ঘোড়া বিক্রয় করিয়া উদর পূরণের জন্য সোলেমন যে কত বিনিদ্র রজনী বনে বনে অজানা আস্তাবলে আস্তাবলে ঘুড়িয়া বেড়ায়, তাহা হয়তঃ আপাত সুখী সাইমন এখন জানিতে পারিবে না।

সোলেমনের বুক হইতে একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে, পাতার কম্পনে, কুয়াসা ঝরিত আকাশের বুকে মিলাইয়া গেল।

ঘড়িতে একটা বাজে। আস্তে আস্তে টুল হইতে সে উঠিয়া আসিল। ঘড়িতে টক টক্ শব্দ, ঘরের কোণে তখনও ল্যাম্পের স্তিমিত দীপশিখা। এইবার তাহাকে বাহির হইতে হইবে। সে চারিদিকে কোন শব্দের জন্য কান পাতিয়া রহিল। নিস্তব্ধ প্রকৃতি, মাথার উপর কেবলমাত্র অনন্ত বিস্তৃত রুক্ষ

আকাশ। গাছের পাতাগুলি যেন শির শির করিয়া কাঁপে। ল্যাম্পটির আলো সম্পূর্ণ নিভাইয়া দিয়া, সোলেমন বাহিরে আসিয়া তাহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিল।

অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-নূপুরের মত চঞ্চল জোনাকীর দল তাহার চারিপাশে কাঁপিতে লাগিল।

একপাশে রুক্ষ পাহাড় আর একপাশে ঘন নিবিড় সুবিন্যস্ত পাইন বন। মাঝখানে বন্ধুর প্রশস্ত পথ। দুর্গম রাত্রি। শীতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস হুহু করিয়া পাইন বনের দিক হইতে বহিয়া আসিয়া পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া আবার ফিরিয়া যায়। শীতার্ত্ত ঘন নিবিড় রাত্রি।

সাধ্যমত দ্রুত পদে একটি পথিক সহরতলীর দিকে অগ্রসর হয়। প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈহিক বলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পথিকটির মাথায় তৈলসিক্ত বিবর্ণ অতি পুরাতন লোমের টুপি। সর্ব্বাঙ্গে ছিন্ন একটি ওভারকোট, পায়ে পূর্ব্বোক্ত দুটি জিনিষ অপেক্ষা কিছু ভাল একজোড়া মোটা চামড়ার জুতা।

পূর্ব্বেই সোলেমনের মুখে এই পথিকটির নাম বলিয়াছি। নাম জান্‌ভিল। সোলেমনেরই সমব্যবসায়ী বন্ধু।

হাত দুটি গরম ওভারকোটের পকেটের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। চারিপাশে তাহার ঘন নিবিড় কুয়াশা। নিস্তব্ধ নিথর শব্দ-হীনতায় প্রকৃতি যেন মরিয়া গিয়াছে। কুয়াসার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইলে পৃথিবী যেন স্পর্শ করা যায়। কুয়াসার সাহায্যে প্রকৃতির সহিত এত নিবিড় করিয়া পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবার সৌভাগ্য জান্‌ভিলের মত নিশাচর লোকের জীবনেও অতি অল্পই ঘটিয়াছে।

"সোলেমন নিশ্চয়ই এতক্ষণ পৌঁছে গিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।" জানভিল চলিতে চলিতে ভাবে,—এই যে ঘোড়া চুরী করা, এটা আমার মনে হয়, সব কিছু চুরী করার চেয়ে সহজ অথচ বেজায় লাভ। বিশেষ কোনো কৌশলের প্রয়োজন নেই, অন্ধকার রাত্রে আস্তাবলের দরজা খোলো আর ঘোড়াকে বার করে নিয়ে এসো।"

জানভিলের গতি ক্রমে দ্রুত হইতে দ্রুততর হয়।

সহর-প্রান্ত পার হইয়া জানভিল একটি বড় পাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল তারপর মুখের ভিতর তিনটি আঙ্গুল পুরিয়া বিশ্রী একটি শব্দ করিল। শব্দটি কুয়াসা ভারে ক্লান্ত প্রকৃতির চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত পরে ২।৩ গজ দূর হইতেও অনুরূপ একটি শব্দ মিলিল।

সাঙ্কেতিক ধ্বনির উত্তর।

জানভিল ও সোলেমন দু'জনে আসিয়া মিলিত হইল।

"সোলেমন তুমি তা'হলে এসেছো?" অনুচ্চ স্বরে জানভিল বলে।

"হ্যাঁ' অনেকক্ষণ জানভিল! আজ কিন্তু তোমার বড় দেরী হল।" বলিবার সময় ভিতর পকেটের রিভলবারটি একবার টিপিয়া দেখিল।

"দেখছো ত রাত্রি কেমন, তারপর আস্তাবলের খবর কি?"

"সব ঠিক আছে আর ঘোড়া ছটাই ঘুমোচ্ছে।"

কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা, মাঝে মাঝে ক্ষীণ অস্পষ্ট পায়ে চলার শব্দ। দু'জনে আস্তাবলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

মাঝে মাঝে সোলেমন অস্ফুটস্বরে আপন মনে কি বলে। হঠাৎ এক জায়গায় সে জানভিলের জামার একপ্রান্ত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া বলিল,—"জানভিল, শুনতে পাচ্ছনা? আমি যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

জানভিল থামিল, খানিকক্ষণ কান পাতিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কোথাও কিছু নয় সমস্ত দিক ঘুমন্ত শিশুর মত স্তব্ধ। নিজের বুকের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ পর্য্যন্ত জানভিল শুনিতে পাইল।

জানভিল সঙ্গীর এই বিচলিত ভাব দেখিয়া মনে মনে হাসিল।

সোলেমনের হাড়ের ভিতর দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া যায়।

দু'জনে আসিয়া আস্তাবলের দরজার কাছে দাঁড়াইল; কিন্তু দাঁড়ান মাত্রই, কোণ হইতে কুকুরের মিলিত গলার আওয়াজ শোনা গেল।

জানভিলের সবল বাহুর ভারে আস্তাবলের দরজায় তালাটি সামান্য খুট করিয়া শব্দ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু ঐটুকু শব্দই জাগ্রত কুকুর প্রহরীর পক্ষে যথেষ্ট, কারণ ঐটুকু শব্দ হওয়া মাত্রই দুটি ভীষণাকার গ্রে হাউণ্ড কুকুর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের উভয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বলিষ্ঠ জানভিল সবল বাহুর দ্বারা নিজেকে মুক্ত করিয়া, ছুটিয়া দূরের পাইন বনের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। আসিবার সময় সোলেমনের বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর জানভিলের কর্ণে পৌঁছিল না।

পুনরায় দীর্ঘকালের জন্য নিস্তব্ধতা। পলের পর পল করিয়া অনেক সময় কালের অসীমতায় হারাইয়া গেল।

কুয়াসাও অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল। সোলেমনের কোনো সন্ধান না পাইয়া সন্তর্পণে জানভিল পাইন বনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া আস্তাবল অভিমুখে চলিল।

কিন্তু আশ্চর্য্য! দরজার গোড়ায় সোলেমন উপুর হইয়া শুইয়া আছে।

আস্তাবলের দরজার গোড়ায় সোলেমনকে শায়িত দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার গায়ে হাত দিয়া সে আস্তে আস্তে ডাকিল,—"ওঠ সোলেমন, এখানে শুয়ে কেন? রাত্রি শেষ হয়ে ভোর হয়ে এল প্রায়, শুনছ সোলেমন?"

সোলেমন কিন্তু কোন সাঁড়া দিল না, যেমন নিশ্চল হইয়া শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

জানভিল বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজের নিঃশ্বাস পতনের মৃদু শব্দ ছাড়া, আর কোথাও কোন কিছু শব্দ নাই।

ঘনতর কুয়াসা ভেদ করিয়া অস্পষ্ট ক্ষীণ চাঁদের আলো মৃতের দৃষ্টির ন্যায় দীপ্তিহীন হইয়া দেখা দিল। সে সোলেমনের শিয়রে বসিয়া পড়িল, তারপর তাহার মাথাটি কোলের কাছে টানিতেই সর্ব্বাঙ্গ তাহার ভিজিয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিল। রক্ত! সোলেমনের রক্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হইয়া গেল!

গলার নলিটি অর্দ্ধছিন্ন, তাহার বুভুক্ষু রোগ কাতর পাণ্ডুর মুখের অবশিষ্ট কটি দাঁত অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় বীভৎস দেখাইল। চোখ দুটি তাহার জ্যোতিঃ-হীন উন্মুক্ত।

সোলেমন মরিয়া গিয়াছে।

বাহির হইতে আবার সেই দুটি গ্রে হাউণ্ড কুকুরের মিলিত স্বর শুনিতে পাওয়া গেল। সোলেমনের মাথাটি আস্তে আস্তে মাটির ওপর রাখিয়া জানভিল বাহিরের কুয়াসার ভিতর মিশিয়া পড়িল।

কুকুর দুটির স্বর অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। ঘনাইয়া আসিয়াছে আবার সেই নিথর নিস্তব্ধতা, বাহিরে পূর্ব্বের মতই শীতল রাত্রি ও হিমবর্ষী উদার আকাশ।

Joseph Opatoshuর 'The Winter Wolves' গল্পের সামান্য ছায়া নিয়ে লেখা

বিজ্ঞপ্তি ও কৈফিয়ৎ

এবার 'সোনার ডাক' রচনার শেষাংশ দেওয়া হল। এই সংখ্যা থেকে অমরলতার দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হবার কথা ছিল। আরম্ভ হবে ভাদ্র থেকে।

এই সংখ্যা থেকে আমরা শব্দ-চৌকি প্রতিযোগিতা আরম্ভ করব ভেবেছিলাম। যথাকালে ব্লক হাতে না আসার দরুণ ভাদ্র থেকে শব্দ-চৌকি সুরু হবে।

সম্পাদক আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত লিখবেন। তাঁর নানারকম চমৎকার লেখা ছাপবার আয়োজন আমরা করছি।

'জানলার বাইরে'র লেখক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু সেন, পূর্ণেন্দু লাহিড়ি ন'ন। ছাপাখানার ভূত একফাঁকে অকাণ্ড করে বসেছে।

লীগ-বিজয়ী মোহনবাগান দলের একটি সুন্দর ফটো আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

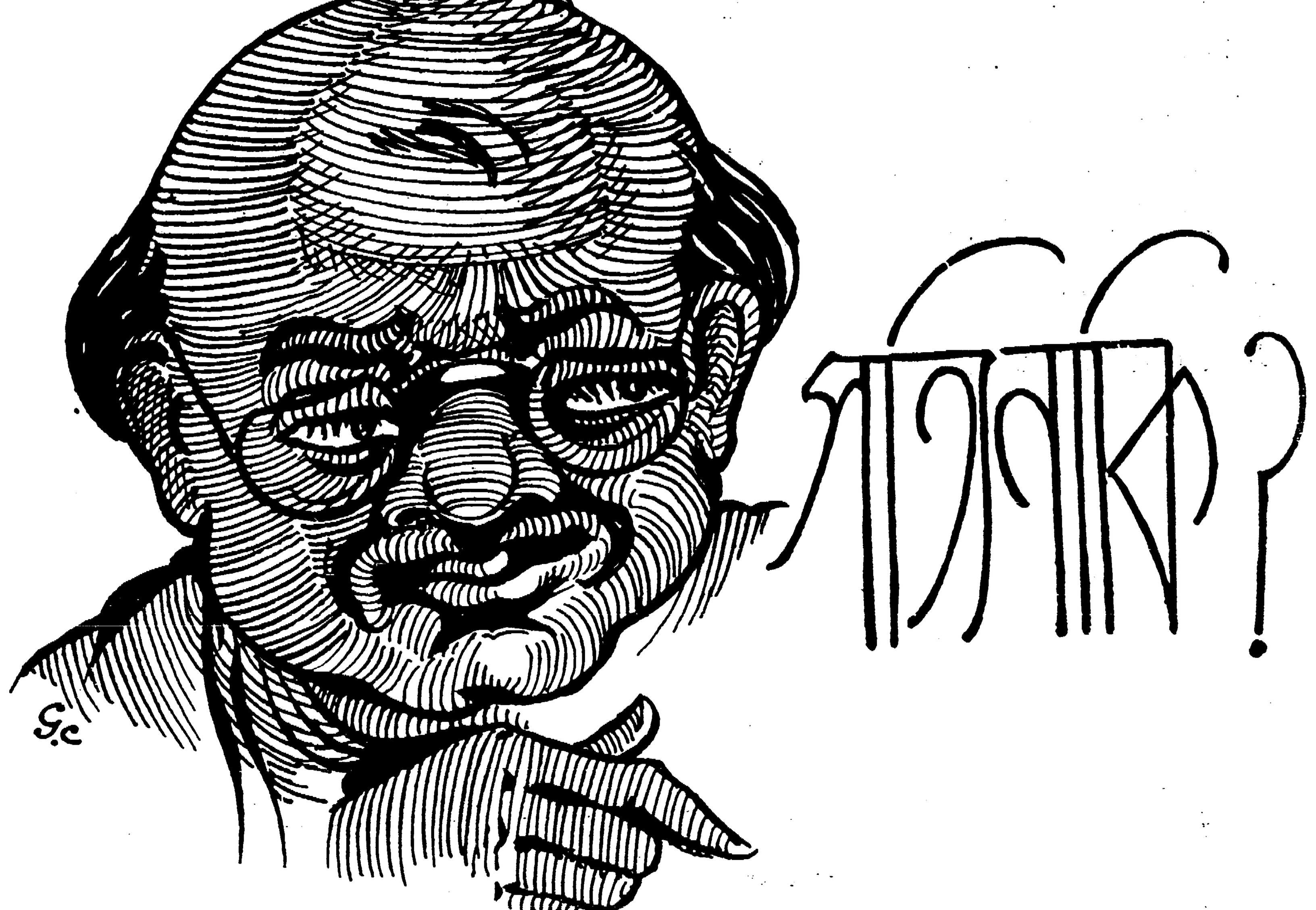

আমেরিকার আজব-তত্ত্ব শোনো। মিষ্টার মোরাণ নামে এক ভদ্রলোকের অসম্ভব কৌতূহল হল—খড়ের গাদায় কতক্ষণে একটা সূঁচ খুঁজে বার করা যায়। দুই টন খড়ের গাদায় একটা সূঁচ ফেলে দিয়ে এই উদ্ভট গবেষণা সুরু হল। বিরাশী ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট খোঁজার পর সূঁচটা পাওয়া গেল !

পৃথিবীর সব চেয়ে দুর্ভাগা ব্যক্তি হচ্ছেন মিষ্টার হ্যাঙ্ক স্যাফার। ছেলেবেলায় মজুরদের ভুলে তিনি কয়লা-খনিতে কয়েকটা দিন আটক হয়ে ছিলেন। কয়েক বছর বাদে এক বিস্ফোরণে তাঁর একটা চোখ আর পা উড়ে যায়। তারপরেই তিনি ৪৫ ফিট উঁচু থেকে পড়ে যান। কিছুকাল পরে তিনি ঘোড়ার লাথি খেয়ে শয্যাশায়ী হন। তারপর চলন্ত শ্লেজ থেকে ছটকে একটা তারের বেড়ার উপর পড়ে তিনি জখম হন। আশিবছর বয়সে তাঁর ডবল নিউমোনিয়া হয়। বিরাশি বছরে তাঁর উপর দিয়ে একটা ঘোড়া চলে যায়, চুরাশি বছরে তিনি গাড়ি চাপা পড়েন। জীবনে তিনবার তাঁর মাথায় বাজ পড়ে। সম্প্রতি তিনি তাঁর অবশিষ্ট পা খুইয়ে বসেছেন।

আমরা যেমন শীতে হি হি করে কাঁপি, আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে একটা দ্বীপ সকল সময়েই সেরকম থরথর কাঁপছে। দ্বীপটা ফাঁপা, আগা গোড়া সুড়ঙ্গে ভরা। সমুদ্রের জল সেই সব সুড়ঙ্গে হু হু করে ছুটে আসে, ধাক্কা দেয়। সেইজন্যেই চব্বিশ ঘণ্টা দ্বীপটার থর থর কম্পন !

আলো আর উত্তাপ—উত্তাপ ছাড়া আলো নেই, এই আমাদের ধারণা। কিন্তু ঠাণ্ডা আলো, উত্তাপ-বিহীন আলো আছে। গভীর সমুদ্রের অনেক মাছের গা থেকে যে আলো বার হয় তাতে উত্তাপ নেই, অনেক উদ্ভিদের গা থেকে যে আলো বার হয় তাতে উত্তাপ নেই, জোনাকির আলোয় উত্তাপ নেই।

ছুটির ঘণ্টা

লীগ ফুটবল খেলা

শ্রীধর

কলকাতায় এ বছর লীগ ফুটবল খেলা নানা বৈচিত্রের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবার লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান প্রথম হয়ে খেলাধূলায় বাঙ্গালীর নিজ গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৯১৫ সাল থেকে অর্থাৎ ২৫ বছর মোহনবাগান লীগ খেলছে। বহুবার লীগ পেতে পেতে মোহনবাগানের হাত থেকে লীগ ফস্কে গিয়েছে। কিন্তু ভাল খেলে ও চেষ্টার একাগ্রতায় মোহনবাগান এবার জয়ী হয়েছে। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে কিছু একটা করবে বলেই মোহনবাগান যেন এবার লীগ খেলতে নেবেছিল। প্রতিযোগিতার গোড়া থেকে খেলার শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান লীগ টেব্‌ল্‌এর প্রথম স্থান অধিকার করে ছিল—কোন টিম তাকে একবারের মত ও হটাতে পারেনি। অথচ অন্যান্য টিমগুলি সকলেই লীগ টেব্‌ল্‌এ ওঠানামা করছিল আর মোহনবাগান ছিল অটল। ১৯১১ সালের শীল্ডবিজয়ী মোহনবাগান আর ১৯৩৯ সালের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান ! মোহনবাগান ! তুমি বাঙ্গালীদের নাম রেখেছ, বাঙ্গালীদের মান রেখেছ। মহামেডান্‌স্ শীল্ড ও লীগ পেয়েছে, তাতে আমরা খুব খুসী হয়েছিলাম। কারণ, মহামেডান্‌স্ আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়ে লীগ ও শীল্ড পেয়েছে, মহামেডান্‌সই প্রথম ভারতীয় দল যারা ইউরোপীয় ও বিদেশী ফুটবল দলের হাত থেকে প্রথম লীগ ছিনিয়ে নিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলে। কিন্তু মোহনবাগান লীগ পাওয়াতে আমরা আরো অনেক বেশী যেন খুসী হয়েছি। কেন ? কারণ মোহনবাগান হচ্ছে পুরো বাঙ্গালীর টিম, বেণীপ্রসাদ ও প্রেমলালকে যে বাঙ্গালীই বলা চলে। মোহনবাগান বাঙ্গলার একান্ত আপনার ! আর মোহনবাগানকে বলা যেতে পারে বাঙ্গলা ও ভারতীয় ফুটবলের জন্মদাতা। মোহনবাগান যখন ১৯১১ সালে শীল্ড নিয়েছিল তখন কটা বাঙ্গালী ও ভারতীয় টিম গোরাদের সঙ্গে খেলতে পারত ? কটা বাঙ্গালী বা ভারতীয় ফুটবল টিম তখন ছিল ? তখন শীল্ড খেলাও ছিল কি ভয়ানক প্রতিযোগিতামূলক ! নাম-করা গোরার দল খেলতে আসত। তাই মোহনবাগান আজও হয়ে আছে অমর। আজ ফুটবলে যে এত উৎসাহ এত আনন্দ এ সমস্তের ইতিহাসের মূলে মোহনবাগানের খেলা। মোহনবাগান টিম সত্যিকারের স্পোর্টস্‌ম্যান টিম, সভ্য ও ভদ্র টিম। তাদের সাধনা, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে clean game খেলে সুন্দর খেলা দেখিয়ে জনসাধারণের ও স্পোর্টিং দর্শকদের আনন্দ বর্দ্ধন করা। মোহনবাগান আজও শত শত বাঙ্গালী ফুটবলদলের আদর্শ হয়ে আছে। তরুণ খেলোয়াড়ের ambition হচ্ছে একদিন মোহনবাগান দলে যেন সে যোগ দিতে পারে, তার সাধনা যেন সিদ্ধ হয়। ছোটরাও স্বপ্ন দেখে একটু বড় হয়ে তারা মোহনবাগান দলে খেলবে ! এসব কারণের জন্য

আজও মোহনবাগানদল বাঙ্গালীদের Idol হয়ে আছে। একথা সত্যি মোহনবাগান অনেকবার তার লক্ষ লক্ষ ভক্তদের আশা চূর্ণ করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহনবাগান সকলের আদরের হয়ে আছে।

মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। মোহনবাগানের ২৫ বছরের সাধনা এ বৎসর জয়যুক্ত হয়েছে। এবারকার লীগখেলায় মোহনবাগান মাত্র একবার হেরেছে ভবানীপুরের কাছে। আর কারুর কাছেই সে হারেনি। আর সমস্ত দলগুলির মধ্যে মোহনবাগানই গোল খেয়েছে সব চেয়ে কম। এগুলি তার কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। যদিও এবার প্রতিযোগিতার শেষার্দ্ধে তিনটি ভাল ফুটবল দল, কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান, লীগ প্রতিযোগিতা থেকে নাম কাটিয়ে নিলে, তাদের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলাগুলি হলেও মোহনবাগানকে তার চ্যাম্পিয়ানসিপ থেকে কেউ হটাতে পারত না তাদের পয়েণ্টস অনেক বেশী ছিল। খেলাগুলি হলেও মোহনবাগান প্রথমই হত। লীগে এবার রেঞ্জার্স দ্বিতীয় হয়েছে কিন্তু মোহনবাগানের চেয়ে তাদের পয়েণ্টস্ অনেক কম। রেঞ্জার্সদের ২৮ আর মোহনবাগানের ৩৫। তবে ইষ্টবেঙ্গল, কালিঘাট ও মহামেডান্স্ যদি শেষ পর্য্যন্ত খেলত রেঞ্জার্স দল ২য় স্থানে থাকত না, ঐ দলগুলির কেউ দ্বিতীয় হতে পারত!

একথা অবশ্য ঠিক, যে মোহনবাগানের Defence যদি অত ভাল না হত, তাহলে হয়ত তারা লীগ পেত না। মোহনবাগানের Attacking line এবার তেমন সুবিধের ছিল না। ভাল Scorers যদি মোহনবাগানের থাকত তাহলে মোহনবাগান কি কাণ্ড বাঁধাত বলা যায় না। এইখানেই মোহনবাগানের দুর্ব্বলতা। ভবিষ্যতে মোহনবাগানকে এবিষয়ে মনোযোগ দিতেই হবে। এবার মোহনবাগান দলে সব চেয়ে ভাল খেলেছেন—কে দত্ত, সন্মথ দত্ত, পি চক্রবর্ত্তী, বেনী প্রসাদ, এস্ গুঁই ও এস ব্যানার্জ্জী। শেষ খেলায় (এরিয়ান্স—মোহনবাগান) এরিয়ান্সকে তিন গোলে হারায় মোহনবাগান, সেণ্টার ফরোয়ার্ড রায় চৌধুরী একাই তিনটি গোল দিয়ে নিজের মান রেখেছে। "একাই" মানে অবশ্য এ নয় যে সেণ্টার থেকে বল নিয়ে সে বরাবর নিজের চেষ্টাতে গোল করিতে পেরেছিল। সেদিনের খেলায় ফরওয়ার্ডরা সবাই ফরওয়ার্ড হয়ে মিলে মিশে খেলেছিল বলেই অতগুলি গোল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। নীচে আমরা লীগ টেবল্ দিলাম—

	খেলা	জিৎ	ড্র	হার	স্বপক্ষে গোল	বিপক্ষে গোল	পয়েণ্টস
মোহনবাগান	২২	২৪	৭	১	৩১	৭	৩৫
রেঞ্জার্স	২১	১৩	২	৬	২৬	১৯	২৮
কাষ্টমস্	২৪	১০	৮	৬	২৭	২১	২৮
মহামেডান্স্	১৯	১০	৫	৪	৩১	১৫	২৫
ইষ্ট বেঙ্গল	১৯	৮	৮	৩	২৩	১০	২৪
ই, বি, আর	২৩	১০	৬	৪	৩৪	৩০	২৪
কালিঘাট	১৮	৯	৫	৪	৩১	১৯	২৩
কেমেরোনিয়ান্স	২২	৬	৮	৯	২০	২৪	২০
পুলিশ	২৩	৭	৫	১১	২০	৩৬	১৯
এরিয়ান্স	২৩	৬	৪	১৩	২১	৩৫	১৬
ভবানীপুর	২৩	৬	৪	১৩	২২	৩৯	১৬
বর্ডার	২৪	৫	৪	১:	১৯	৩৯	১৪
ক্যালকাটা	২৪	১	৮	১৩	২৪	২৫	১০

ফাইন্যাল্ লীগ টেব্‌ল্ এখনও তৈরী হয়নি।

এই লীগ টেবল্ থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে প্রতিযোগিতায় কোন্ দল কেমন খেলেছে। সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছে—ই, বি, আর, সবশুদ্ধ তারা গোল দিয়েছে ৩৪টা। তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে মোহনবাগান, মহামেডান্স্ ও কালীঘাট—৩১টা করে। মোহনবাগান গোল খেয়েছে সবচেয়ে কম মোটে ৭টি—সবচেয়ে বেশী গোল খেয়েছে ভবানীপুর ও বর্ডার—৩১টা করে। সবচেয়ে হেরেছেও বেশী বর্ডার দল, ২৪টা খেলার মধ্যে ১৫টা সে হেরেছে। জিতেছে খেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ক্যালকাটা কম, ২২টা খেলে ১টা মাত্র সে জিতেছে আর সবচেয়ে কম পয়েণ্টও হয়েছে ক্যালকাটার—মাত্র ১০। টেব্‌ল্ এ লাষ্ট হয়েছে বলে ক্যালকাটাকে বোধহয় পরের বছর সেকেণ্ড ডিভিসনে খেলতে হবে। এটা অবশ্য খুব দুঃখের বিষয় হবে কারণ ক্যালকাটার মত ভাল রেকর্ড কোন সিভিল টিমের নেই।

ওদিক থেকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন সেকেণ্ড ডিভিসন লীগে প্রথম হয়েছে বলে তারা পরের বছর থেকে ফার্ষ্ট ডিভিসনে খেলবে। ১৯৩৩ সালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন সেকেণ্ড ডিভিসনে নেমে যায়। সেবছরই শীল্ড প্রতিযোগিতায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন সেমি-ফাইনালে উঠে ডি, সি, এল, আ'ইর কাছে হেরে যায়। এবার লীগে তাদের কৃতিত্বে আমরা স্পোর্টিং ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করা যায় পরের বছর প্রথম ডিভিসন লীগে তারা আরও নিজেদের গৌরব বর্দ্ধন করবে।

এবার কলিকাতায় ফুটবল খেলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেমন মোহনবাগানের লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া তেমনি বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডানস এ তিনটি ভাল দলকে আই, এফ এর suspend করা। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই: মহামেডান স্পোর্টিং এর কয়েকটি খেলায় 'রেফারিং' নাকি তাদের সন্তোষজনক হয়নি, তাদের অভিযোগে কান দেওয়া হয়নি তাই তারা রেফারিংএ উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা বন্ধ করবে এ রকম গুজব লীগের প্রথমার্দ্ধে শোনা গিয়েছিল। অনেক খেলাতেই রেফারিংএর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শোনা গিয়েছে। তারপর কালিঘাট দল তাদের কয়েকটা খেলা পোস্‌পন্‌ড্ হওয়ায় ও পরে সে খেলাগুলি উপরউপরি পড়াতে তারা আই, এফ, এ'র কাছে অভিযোগ জানায়। ইষ্টবেঙ্গল তাদের একটা খেলা মহামেডানস এর মাঠে খেলতে চায়—কিন্তু এ সমস্ত অনুরোধ অনুযোগ আই, এফ, এ'র কর্ত্তৃপক্ষরা শোনেন নি—সে সব ব্যবস্থা করা তাঁদের পক্ষে নাকি সম্ভব নয়। তারপর দলগুলি আই, এফ, এ কে কিছু না জানিয়ে খবরের কাগজে লেখালিখি করেন। এতে আই, এফ, এ বেশ অসন্তুষ্ট হ'ন। তারপর এই দলগুলি তাদের অভিযোগ অনুযোগের কোনরূপ সুব্যবস্থা না হওয়ায় তারা লীগে আর খেলবে না বলে জানায়। আই এফ এর কর্ত্তৃপক্ষরা মিঃ নিক্‌ল্‌স্ এর সভাপতিত্বে কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান্ স্পোর্টিংকে এ বছরের জন্য সাস্‌পেণ্ড্ করেন। এই কঠোর শাস্তি বিশেষ বিস্ময়কর এবং আমাদের মনঃপূত হয়নি। কলিকাতায় লীগ ও শীল্ড খেলাগুলি আই, এফ, এ'র অধীনে। তাঁদের আদেশ অমান্য হতে পারে না। তাই এই তিনটি দলকে বাদ দিয়ে লীগ খেলাগুলি হতে থাকে। অনেক চেষ্টা চরিত্র হয়, অনেকে মধ্যস্থ হয়ে মিটমাট করতে বিশেষ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলেন না। আসল কথা, এই তিনটি দল ও আই, এফ, এ কোন পক্ষরাই মিটমাটের মনোভাব দেখালেন না বরঞ্চ নিজেদের জিদ্ রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ফলে হোল কি—এই তিনটি ভাল ফুটবল দলের খেলা শীল্ডেও আমরা আর হয়ত দেখতে পাব না। "হয়ত" বললাম এই জন্যে যে

শেষমুহূর্ত্তে যদি হঠাৎ মিটমাট হয়ে যায়। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে তা বোধহয় হবার নয়। আমাদের কিন্তু এসব ভাল লাগেনি। খেলা হচ্ছে খেলা, clean ও fair game, খেলার নিয়ম কানুন রক্ষা করে হারজিত মেনে সত্যিকারের স্পোর্টস্ম্যান এর মত খেলা হওয়া চাই। তা নয়—মারামারি, দলাদলি ও তর্কাতর্কি! লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলাগুলি আনন্দ ও উপভোগ করে দেখতে পাইনি। দর্শক, জনসাধারণ, স্পোর্টিং পাব্লিক, সত্যিকারের খেলোয়াড় খেলার মাঠে এ রকম অসভ্য হৈ চৈ পছন্দ করে না, তারা ভাল খেলা দেখতে চায়, ভাল খেলা খেলতে চায়। কিন্তু এবার খেলার মাঠে এ দুয়ের এত বেশী ব্যতিক্রম হয়েছে যে এর আগে সে রকম কখনও আমরা দেখিনি। অনেক দর্শক অসভ্যের মত চেঁচামেচি গোলমাল করেছে, খেলায় নানা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছে, কোন কোন খেলোয়াড়ও খেলা ছেড়ে মারধোর করার চেষ্টা করেছে; রেফারী মার খেয়েছে, দর্শকরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, গালাগালি করেছে। মাঠে খেলা দেখা কয়েকদিন দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল! ঐসব কাণ্ড দেখতে কি কেউ খেলা দেখতে যায়? আমরা কোন টিমের সমর্থকদের ছেড়ে বলছিনা। যা হোক আমরা আশা করি, শীঘ্রই একটা সুবন্দোবস্ত হবে এবং কলিকাতার সমস্ত ফুটবল দলগুলি ও আই এফ এ মিলেমিশে মাঠের শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। তারপর দর্শকরা যেন উত্তেজিত না হয়ে ভালভাবে শান্ত হয়ে খেলা দেখেন। ভালখেলা অনেকটা ভাল দর্শকের উপর নির্ভর করে। আমরা চাই কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডানস এর খেলা দেখতে। তারা আবার ফিরে আসুক। মোহনবাগান এবার লীগ পেয়েছে; এই আনন্দ সারা বাংলায় ছড়িয়ে গিয়েছে। মহামেডান্স এর আগেই উপর উপর কয়েকবার লীগ পেয়ে ফুটবল খেলায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এবার কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স প্রভৃতি এদের পালা। কলিকাতার লীগ ও শীল্ড খেলাগুলি যেন ভারতবর্ষের সমস্ত খেলার আদর্শ হয়ে থাকে।

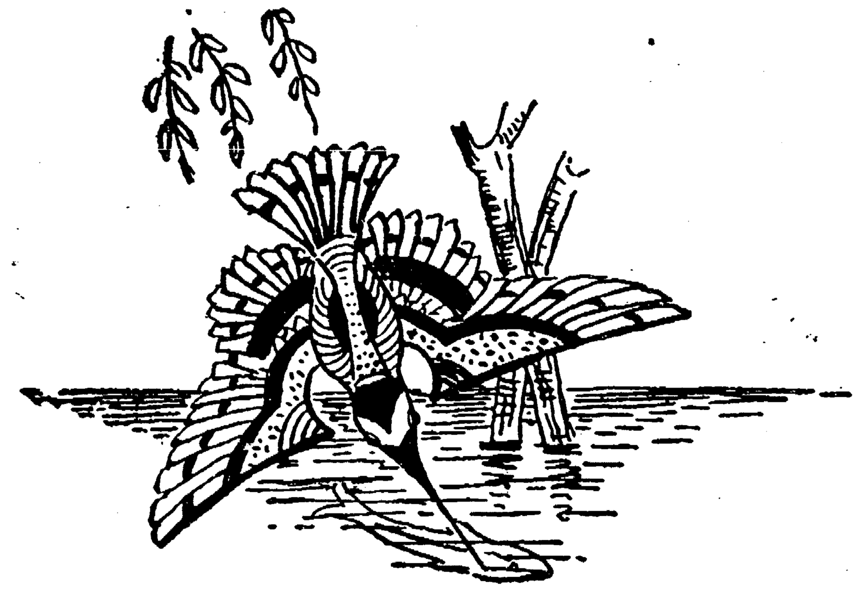

চলন্তিকা

ইয়োরোপে জার্ম্মেণী ও ইটালী, আর এশিয়ায় জাপান—এদের চক্রান্তে পৃথিবীর ভিৎ নড়ে উঠেছে। ইংরেজরা কেন চীনের উপর খড়্গহস্ত নয়, জাপানের আক্রোশের অন্ত নেই। জাপান আজকাল তাই প্রতিপদে ইংরেজকে নাকমলা, কাণমলা দিচ্ছে। ইংরেজ সৈন্যদের পোষাক কেড়ে নেওয়া কিম্বা ইংরেজ ধরে প্রকাশ্যে রাস্তায় পিটনো, কিছুকাল ধরে জাপানীরা বেশ উৎসাহের সঙ্গে করে চলেছে। সম্প্রতি বিষম চটে গিয়ে জাপান টিন্সিন্ বন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। টিন্সিন্ বন্দরে কোনো জাহাজ ঢুকতে গেলে জাপানীদের কামানের গোলা পথ আটক করবে। টিনসিন বন্ধ হবার ফলে ইংরেজ মহাফাঁপরে পড়েছে, খাবার নিয়ে চুরী করে জাহাজ দুটি একটি আসছে বটে, কিন্তু জাপানীদের চোখ এড়িয়ে বন্দরে পৌছনো সহজ কাজ নয়। ইংরেজ ও হুম্‌কি ছেড়েছে। দেখা যাক, শেষটা এই ব্যাপার কতদূর গড়ায়!

* * * *

ডানজিগের বেশীর ভাগ লোক হচ্ছে জার্ম্মাণ। হিট্‌লার স্বাধীন ডানজিগ সহর জার্ম্মেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু পোল্যাণ্ড ডানজিগ সহর অত সহজে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। পোল্যাণ্ড অস্ত্র শানিয়ে তৈরী, হিটলারের চোখ রাঙানীতে পোল্‌রা ভয়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছে না। ফলে জার্ম্মাণরা হঠাৎ একটা কিছু করে উঠতে পারছে না।

* * * *

এদিকে এদেশে কংগ্রেসী দলাদলির কোনো মীমাংসা হয়নি! যে-দল ক্ষমতা হাতে নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে একটু আধটু রফা করে চলছেন, এই হচ্ছে অন্য দলের নালিশ। সত্যি সত্যিই ইংরেজদের সঙ্গে একটু আধটু রফা হয়েছে কিনা, বলা কঠিন, বোঝা কঠিন। এই ঘরোয়া ঝগড়ায় অনেক রহস্য আছে। যাঁরা রাজনীতিতে চুল পাকিয়েছেন তাঁরাও এই রহস্যের সবটা বুঝেছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

* * * *

এ যেন দুর্ঘটনার বছর! থেটিস্ ডুবির পর ফ্রান্সের একটি সাবমেরিণের সলিল সমাধি হয়। এদিকে অসংখ্য দুর্ঘটনার স্মৃতি-জড়িত ই, আই, আর লাইনে আবার রেল দুর্ঘটনা হয়ে রেল যাত্রীদের মনে মহাতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

* * * *

হিমালয়ের ডাকে অ্যাডাম্ কার্‌পিন্‌স্‌কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডের যে পাহাড়ু দল হিন্দুস্থানে আসেন, তাঁদের যাত্রা সুরু হয়ে গেছে। এই দলের আকাঙ্ক্ষিত চুড়ো হচ্ছে নন্দদেবী, ২৫,৬৬১ ফিট উঁচু। দুর্গম পথ দিয়ে পাহাড়ুরা এগিয়ে চলেছেন, ভারী বোঝা কাঁধে কুলির দল আশ্চর্য্য কৌশলে বন্ধুর পিচ্ছিল সঙ্কীর্ণ পথ পেরিয়ে চলেছে।

* * *

জো লুই বনাম গ্যালেন্টো যে মুষ্টিযুদ্ধ হয়ে গেল, তা মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্যালেন্টো লুইকে যে পরিমাণ বেগ দিয়েছে, তা স্মেলিং প্রমুখ দুটি একটী মুষ্টিযোদ্ধা ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন নি। ৪ রাউণ্ডেই অবশ্য যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, গ্যালেন্টো চতুর্থ রাউণ্ডে নক্ আউট হয়ে যান। কিন্তু তাহলেও এটা মনে রাখতে হবে, গ্যালেন্টো রীতিমত ভালো লড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় রাউণ্ড জিতেছিলেন এবং একবার প্রচণ্ড এক ঘুঁষি দিয়ে লুইকে ভুমিশায়ী করেছিলেন। লুই অবশ্য চক্ষের পলকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

* * * *

এবার উইম্বল্‌ডনে খেলা মোটেই জমেনি। দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়রা পেশাদার দলে যোগ দিয়েছেন। ফলে, আমেরিকার তরুণ টেনিশ খেলোয়াড় রিগ্‌স্ এবার চ্যাম্পিয়ন হলেন। রিগস এই প্রথম উইম্‌বল্‌ডনে খেলতে এলেন। প্রথম এসেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। সমালোচকদের মতে রিগস্ সুকৌশলী খেলোয়াড় হলেও তাঁর খেলায় বাজ্, ভাইন্‌স্, পেরি কিম্বা টিল্‌ডেন্‌য়ের প্রতিভার ছাপ নেই। যাহোক ভারতবর্ষের টেনিশ খেলোয়াড়দের দিক থেকে এবার উইন্‌বল্‌ডনের খেলা স্মরণীয় ঘটনা, ভারতবর্ষের গউস মহম্মদ ভালো খেলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন।

* * * *

আমাদের সকলেরই পরম-প্রিয় টিম মোহনবাগান এবার লীগ জিতে বাঙালী দর্শকের বহুকালের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। যদিও কালিঘাট, ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান দল প্রতিযোগিতা হতে বাদ পড়ে যায়, তবুও সব খেলা হলেও মোহনবাগান লীগ পেতেই মহমেডান দল সব খেলা জিতলে এবং মোহনবাগান সব খেলা হারলে সমান সমান হত। সেটা নিতান্ত অসম্ভব না হলেও সম্ভব হত না।

* * * *

এ বছরের সত্যিকারের ভালো দল ছিল মোহনবাগান, মহমেডান, ইষ্ট বেঙ্গল, কালিঘাট। মহমেডান, ইষ্ট বেঙ্গল ও কালিঘাট সরে দাঁড়ানোর ফলে শেষের দিকে লীগ খেলা মোটেই জমেনি এবং আই, এফ, এর খেলাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। এসেছে কয়েকটা অপদার্থ মিলিটারী টিম ও কয়েকটা ছাপোষা টিম। টিমও এসেছে কম। কিন্তু খেলা যদি জমে তো জমবে মোহনবাগানের খেলায়। মোহনবাগান, নাহলে ইষ্ট ইয়র্ক্‌স্ শিল্ড নেবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

* * * *

মহমেডান্ ইষ্টবেঙ্গল ও কালিঘাটের বহিষ্কারের ইতিহাসটা রীতিমত একটা প্রহসন। মহমেডানের অভিযোগ তাঁদের খেলাগুলিতে রেফ্‌রিং সুবিধের হচ্ছে না; ইষ্টবেঙ্গলের অভিযোগ বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও কোনো মাঠে তাদের খেলা দেওয়া হয় নি। কালিঘাটের অভিযোগ তাঁরা আই, এফ, এর অনুরোধে বহুবার খেলা স্থগিত রাখতে রাজী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের উপরি উপরি কয়েকটা

কঠিন খেলা খেলতে বলা হয়েছে। সভাপতি নিকল্‌স্ এই সব অভিযোগের কোনো পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নি। তাঁর কোনো কথায় সঙ্গতি প্রকাশ পাচ্ছে না।

* * * *

আই, এফ, এ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি বলে টিম তিনটি খবরের কাগজে প্রতিবাদ ছাপান। আই, এফ, এ বলছেন এটা নিয়ম বিরুদ্ধ। আই, এফ, এ-র আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই অপরাধে টিম তিনটিকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়। কিন্তু বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে এই, যে যেটাকে আইন বলা হচ্ছে, সেটা এখনও পূরোপূরি আইন হয়নি। সভ্যেরা নীতিটায় সায় দিয়েছেন মাত্র। যা এখনও আইন হয়নি, তা অমান্য করার ফলে সাস্‌পেণ্ড হল তিনটি বিখ্যাত টিম, এ সুবিচার নয়। যদি সত্যিকারের কোনো আইন-লঙ্ঘন হত তাহলেও এই রকম একটা শাস্তি খুবই কঠোর হয়ে পড়ত। এই তিনটি টিম্ আই,এফ্, এর সভ্যদের কাছে আবেদন জানালে পারতেন। কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা সভাপতি একটা 'না' বলতেই রাগে চৌচির হয়ে যাওয়া, বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আইন অমান্য না করলেও তাঁরা একটা নীতি অমান্য করেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁদের অবশ্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে, দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। সেই সঙ্গে আই, এফ, এর কর্ত্তৃপক্ষেরও একটু নরম সুরে কথা বলতে হবে।

* * * *

এই তিনটি টিম কড়া মেজাজে কথা বলেছেন, এটা রীতিমত অপরাধ। কিন্তু সভাপতি নিকল্‌স্ যে মুহূর্ত্তে বললেন, যে মোহনবাগান এবার লিগ জিতবে এই জন্যই এই টিম তিনটি এই হৈ চৈ বাঁধিয়েছেন, তখন আমরা বিস্মিত হলাম। টিম-য়ে টিম-য়ে রেষারেষি থাকে চিরটাকাল, না থাকাই অস্বাভাবিক। কিন্তু সেই রেষারেষিতে কোনো টিম হীনতা এনে ফেলেছে, একথা বিনা প্রমাণে বলা ঘোর অন্যায়। মোহনবাগানের লিগ জয়ের শুভ-মুহূর্ত্তে যে দলাদলি সুরু হল, তার মূলে আছে এক পক্ষের অধৈর্য্য, অপর পক্ষের অবিচার, এবং আই, এফ, এ-র সভাপতির বিবেচনার অভাব।

এক মোহনবাগানের লিগ জয় এবারের আই, এফ, এ ফুটবলের ইতিহাসের একমাত্র উজ্জ্বল কাহিনী। তাছাড়া আই, এফ, এর ফুটবলের ইতিহাস এবার কলঙ্কমণ্ডিত। প্রায় প্রতি খেলাতেই রেফারী মার খাচ্ছে। যে দর্শক ও খেলোয়াড় রেফারীর গায়ে হাত তুলছে, সে ভদ্র নামের যোগ্য নয়। কিন্তু যাকে তাকে খেলা তদারক করতে দিয়ে আই, এর, কর্ত্তৃপক্ষেরা বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন না।

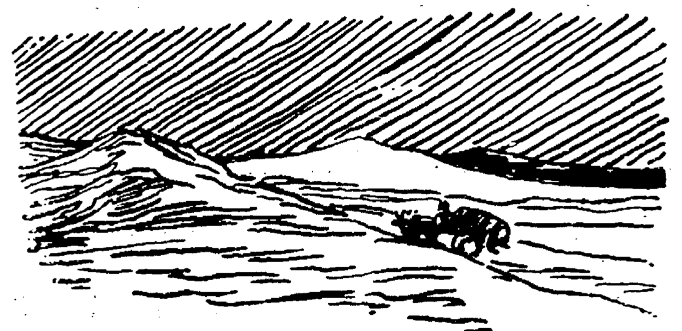

দূরের আলো

সোনার ডাক

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

মার্শালের করাতকলের মজুররা কাকের মুখে খবর পেলে।
কিন্তু সোনার কথা আর চাপা থাকে! মার্শালের করাতকলের মজুররা কাকের মুখে খবর পেলে।
দলেবলে তারা মজুরগিরি ছেড়ে সোনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। খবর গেল স্যাটারের কেল্লায়—স্যাটারের কেল্লা খাঁ খাঁ করতে থাকল, সারাটা কেল্লা গিয়ে জড় হল সোনা নদীর পারে। শুধুই-কি স্যাটারের কেল্লা গোটা পৃথিবীটাই যেন একদিন এসে বাসা বাঁধলে কালিফোর্ণিয়ায়।

আর তাতে আশ্চর্য্যই বা কী! স্যাটারের কেল্লা ও মার্শালের করাত-কল, এই দুই সীমার ভিতর নদীর জল থেকে পাহাড়ের বুক থেকে মুঠো মুঠো সোনা পাওয়া যেতে থাকল। দেশে একটা তুমুল ওলট পালট হয়ে গেল। একদিন যারা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে ও সাহস পায় নি, তারা সেদিন সোনার মালিক হয়ে এক একটা নবাবের মত গোঁফে তা দিয়ে বেড়াতে থাকল।

চারিদিকে রব উঠল—সোনা, সোনা, সোনা! লোভী মানুষের দল দেশ শ্মশান করে দিয়ে চলে এলো। এলো ক্ষেত থেকে চাষী, কারখানা হতে মজুর, মহাজনী গদি ছেড়ে মহাজন, কলেজ ছেড়ে প্রফেসর, আদালত ছেড়ে উকিল ও হাকিম, এলো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, এলো ভাবুক, কবি ভবঘুরে আর খবর-কাগজের ঘুঘু-লোক। জাহাজ থেকে পালিয়ে এলো নাবিকেরা, কেল্লা থেকে সৈন্যেরা! দেশে ব্যবসা উঠে গেল, ক্ষেত খামারে আর কারখানায় মেয়ে ও ছেলেপুলেরা মজুর খাটতে লাগল।

দেশবিদেশ থেকে জাহাজ এসে বে অব্ স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো-তে নোঙর ফেললে। তখন একদল চালাক লোক ভাবলে, সোনার খোঁজে বিভুঁয়ে গিয়ে কি কাজ! পৃথিবী ভেঙে লোক এসেছে, এদের খাওয়া পরাটা তো দরকার হবেই। সোনার দরে যদি রুটি আর গামছা বিকোয় তো ঘরে বসে তোফা আরামে রুটি গামছার ব্যবসাটা চালানোই তো বুদ্ধির কাজ!

১৮৪৯ সালের বসন্তে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ক্ষুদে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সহরটা ভরে তাঁবু আর ছাউনী পড়ল। ১৮৪৯ সালের বসন্তে স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো ছিল ঘুমন্ত সহর, বাসিন্দা ছিল শ কয়েক। গ্রীষ্ম আধখানা না কাটতে সহরের লোকসংখ্যা হল পাঁচ হাজার

অক্টোবরে পাঁচ হাজার গিয়ে দাঁড়ালো বিশ হাজারে। এত দেশ থেকে, সমুদ্র পাহাড় মরুভূমি পেরিয়ে লোক এলো। জীবনে যারা ভাবেনি আর দেখা হবে, একদিন এই স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো সহরে তাদের দেখা হয়ে গেল।

এই আগন্তুকদের ভিতর একদল লোক এলো, যারা বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল। তারা বসালে মদের আর জুয়ার আড্ডা। ক্রমে শয়তানিতে ভালোমানুষদেরও হাতেখড়ি হতে থাকল, সহরটা রাতারাতি একটা নরককুণ্ড হয়ে গেল। সারাদিন নদীর ঢেউ ছেঁকে সোনা কুড়িয়ে সোনার খনিতে শাবল চালিয়ে সোনা তুলে এনে যে বোকারা জুয়ার টেবিলে ঢেলে দিত, তাদের হাহাকারে সহর রী রী করে উঠল।

মহাতঙ্ক নিয়ে এলো একদল খুনে ডাকাত। সোনা কুড়োবার ধৈর্য্য তাদের নেই। তারা ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে অসহায়দের ঐশ্বর্য্য আদায় করত। তখন সহরের বাসিন্দারা জোট বাধলে, ডাকাতদের যে করেই হোক ঠেকাতে হবে।

সহরে ছিলনা ম্যুনিসিপালিটি। সহর ভরে আবর্জ্জনার স্তূপ জমতে থাকল। বরাত জোরে অল্পকালের ভিতর সহরে পাঁচ পাঁচটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। এই আগুনে আবর্জ্জনা ভস্ম হয়ে গেল—সহরটা মহামারীর হাত হতে রক্ষা পেলে। তারপর, ক্রমশঃ সহরে ম্যুনিসিপালিটির পত্তন হল, নিয়ম কানুন আইন আদালত হল। শৃঙ্খলা এলো।

তারপর, সোনার ডাক এসে চলে গেল। লোভী মানুষেরা ছাউনী তুলে ঘরে ফিরতে থাকল। কালিফোর্ণিয়ার সোনার অধ্যায় শেষ হয়ে সুরু হল তেলের অধ্যায়। খনিতে তেলের মহাজন আর মজুরদের ভিড় জমল! লোভ, আতঙ্ক, অত্যাচার, আশা, নিরাশা, সুখ ও দুঃখের স্মৃতি নিয়ে রইল পড়ে স্যান্‌ফ্রান্‌সিসকো সহর। যে লোভীরা পৃথিবীর প্রান্ত হতে ছুটে এসেছিল, তাদের সোনা হয়ত আর রইল না, কিন্তু রইল স্যান্‌ফান্‌সিস্‌কো সহর, যে সহরকে তারাই বড় করে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু মার্শাল স্যাটার—তাদের কি খবর? মার্শাল অনাহারে শুকিয়ে মরল। সোনার ডাকে সাড়া না দিয়ে তার করাত-কল আঁকড়ে পড়ে রইল। তারপর কোথায় খনির ব্যবসা ফাঁদতে গেল। ব্যবসায়ে লোকসান হল। প্রথম সেই সোনা আবিষ্কার করেছিল, সেজন্য ষ্টেটের কাছ থেকে সে একটা পেন্‌সন্ পেলে। কিছুকাল পরে ষ্টেট পেন্‌সন্ তুলে নিলে। তখন একদিন সোনা কুড়োবার অধ্যায় যখন শেষ হয়ে গেছে, সে তখন সোনার সন্ধানে গিয়ে সেই নদীর তীরে উপস্থিত হল। কিন্তু তখন আর সোনা নেই। লোভীর দল সোনার পাহাড় আর নদীকে ভিক্ষুক করে দিয়ে গেছে। মনের দুঃখে মার্শাল একটা কাঠের ছোটঘর তৈরী করে জীবনের শেষ কটা দিন অনাহারে অবহেলায় কাটিয়ে দিলে। তার মৃত্যুর পর হঠাৎ ষ্টেট-য়ের খেয়াল হল। তার সমাধির উপর বিরাট একটা ব্রঞ্জ ষ্ট্যাচু তোলা হল।

বিচিত্র কাহিনী কিন্তু স্যাটারের। কেল্লা ভেঙে মজুররা চলে গেল বটে সোনার সন্ধানে কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করলে না। লক্ষ লক্ষ বিঘা তার সম্পত্তি—এষ্টেট ভরা তার দামী কাঠের বিশাল অরণ্য। তার কেল্লায় তার নিজের সৈন্যদল ছিল, নিজ জমিদারিতে তার নিজ-হাতে তৈরী আইন চলত। মহারাজের মত জমিদারির সিংহাসনে সে গাঁট হয়ে রইল। পরে দুটো মিল পত্তন করে সে দেদার মুনফা লুটলে। তারপর তার ঘাড়ে

সয়তান চাপল। স্যাটার দেখলে দলে দলে লোক সোনার ডাকে আসছে। স্যান্‌ফান্‌সিস্‌কো সহরে আর তিল ধারণের স্থান নেই। এই আগন্তুকদের জন্য যদি একটা সহর পত্তন করা যায় তো ঢের লাভ ঘরে আসবে। তখন সে সহর পত্তনের ফন্দি আটলে। স্যান্‌ফান্‌সিস্‌কোর চেয়ে এই নতুন স্যাক্রামেণ্টো সহরটা সোনার খনির অনেকটা কাছে হবে! সহর পত্তন হল, সহরে দেখতে দেখতে মানুষের ভিড় এলো। কিন্তু যারা এলো, তারা নিরীহ স্বর্ণ-লোভী শুধু নয়, তুর্দ্দান্ত একদল কূটবুদ্ধি লোক। স্যাটার খাজনা আদায় করতে এলে তারা বললে, তুমি জমির দখল পেয়েছ মেক্সিকো সরকারের কাছ থেকে। আসলে স্যাক্রামেণ্টা সহরের জমিটা হচ্ছে আমেরিকা সরকারের।

পুরো বিশ বছর স্যাটার আদালতে যুঝলে। তখন সে ভেঙে পড়েছে, ছেঁড়া কাঁথা তার সম্বল একদিন সে জরাজীর্ণ স্যাটার ওয়াশিংটনে তার দাবী প্রমাণ করতে গেল।

মেক্সিকো যুদ্ধে হেরে আমেরিকার হাতে কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু সেই সঙ্গে স্যাটারের দাবী তো ফুরিয়ে যায় নি। আমেরিকার সরকার তার কাছ থেকে খাজনা চাইতে পারত, কিন্তু তাকে উৎখাত করতে পারত না।

আমেরিকার কোর্ট কিন্তু উল্টো কথা বললে। একদিন যখন স্যাটারের দাবীটা বহাল হল, তখন স্যাটার আর নেই।

নূতন ধাঁধা

নীচের লম্বা আজগুবি লাইনটি নেহাৎ বাজে কথার লাইন নয়। লাইনটিতে ইউরোপ ও এসিয়ার বারোটি বিখ্যাত দেশ বিদেশ বা সহরের নাম লুকোনো আছে! এই সহর বা দেশগুলির নাম আজকাল লোকের মুখে মুখে, খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকার পাতায় পাতায়। বার করো দেখি কেমন পারো ঐ লুকোনো বারোটি নাম—?

জিন্‌স্কোলমবাওশরয়ারোপ্যানট্টোলিকাদ্রাহারওয়াবাধাকদতান্‌টিওকিমলিস্তসিরীয়সনডানগ

পত্রিকা পাবার ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

আমাদের লাইব্রেরী

সমালোচনা

রংমশালের কোনো এক সংখ্যায় আমরা হাতে-লেখা 'ডালি' পত্রিকার সুখ্যাতি করেছিলাম! হাতে-লেখা আর একখানা পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে।

এটা 'শ্রী' পত্রিকার বসন্ত সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; সম্পাদক তিনজন—উপেন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী ঘোষ ও দীনেন্দুসুন্দর দাশ; চিত্রকর তুইজন—মনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও অমল চৌধুরী। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মনোজ বসু প্রভৃতি সুলেখকদের রচনা আছে।

যাঁরা ছাপা পত্রিকায় লিখে জাত খুইয়েছেন, হাতে-লেখা পত্রিকায় তাঁদের প্রবেশ নিষেধ হওয়া উচিত। যাঁরা এখনও শুধু কালি কলমে লেখা ছাপছেন হাতের লেখা পত্রিকা হবে তাঁদের একচেটিয়া। কিছু বুদ্ধি কিছু টাকা আর কিছু ফাঁকি এই দিয়ে আমরা ছাপা পত্রিকার ব্যবসা চালাই। কিন্তু হাতে লিখে যাঁরা পত্রিকা বার করছেন, কঠোর সাধনা তাঁদের। দিনের পর দিন ধরে ধরে কলম চালিয়ে একখানা বড় পত্রিকা লিখে ফেলা মস্ত একটা কীর্ত্তি। শুধু এই কীর্ত্তির জন্যই আমরা 'শ্রী' পত্রিকার কর্ম্মিদের প্রশংসা করতে পারি। এই সঙ্গে তাঁদের পক্ষ থেকে সুরুচির দাবী উপস্থিত করা হলে আমরা আপত্তি তুলবো না।

প্রবন্ধ

বর্ষার ছড়া

ঝর্‌ঝর্, ঝম্‌ঝম্, টাপুর টুপুর সুরু হল। ছেলেমেয়েরা এখন ঘরের কোণে বসে ভাবছে, এখন কী পড়ি! পড়া সবরকমই চল্‌তে পারে। তবে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করো, কী কবিতা পড়ি বলুন তো মশাই, আমি বল্‌ব—পড়ো বর্ষার কবিতা। আর তোমাদের পক্ষে বর্ষার কবিতার অর্থই হচ্ছে বর্ষার ছড়া।

বর্ষার ছড়া চমৎকার লিখেছেন রবি ঠাকুর। আকাশে মেঘ জমে টাপুর টুপুর সুরু হতেই মনে পড়ে যায়. 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।' সেই সঙ্গে মন একখানা নৌকো চেপে চলে যায় শিবঠাকুরের দেশে। আমাদের দেশে মা-ঠাকুরমা দিদিমাদের মুখে আমরা অরিস্মি আন্তিকালের অনেক ছড়া শুনেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' ইত্যাদি। সেই সব ছড়ার সুর রবিঠাকুর তাঁর বর্ষার ছড়ায় ধরে রাখতে পেরেছেন। তারপর ছোকরা কবিরা যেই লিখেছেন 'ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, ভেসে যায় সৃষ্টি' কিম্বা 'ঝর্‌ঝর্ টুপ টুপ' মেঘ ডাকে খোকা চুপ' তখনই হাই তুলেছি, চেষ্টা করে লেখা কবিতা মনে নেশা ধরাতে পারেনি! তবে সত্যেন দত্তের বর্ষার কবিতা একবার পড়ে দেখতে পারো, চমৎকার ছন্দ পাবে—'ইলশে গুড়ি ইলশে গুড়ি ইলিশ মাছের ডিম। মন তুলে উঠবে। কিন্তু আদিকালের ছড়া কিম্বা আমাদের ঠাকুর কবির ছড়ায় যে একটা মেঘ মেঘ ভার নাই, সেই নরম ছোঁয়া, মন ভোলানো নেশা কই?

গ্রাহক নং ৯৪১

খোলা জানলা

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

সামনা সামনি ছু'টো বাড়ী। মাঝে ছোট্ট একটা গলি। এ বাড়ীর খোলা জানলা চেয়ে থাকে ও বাড়ীর খোলা জানলার দিকে মিতালী ভরা চোখে।

এ বাড়ীর খোলা জানলার-পাশেই আমার পড়ার টেবিল। হরেক রকমের মোটা পাতলা ছেঁড়া নতুন বইয়ে সেটা ভরা। জীবনের উনিশটা বছরের অনেক দিনই এর পাশে বসে কেটেছে। নির্ব্বান্ধব একলা আমার জীবনে এতদিন ওর চেয়ে বড় বন্ধু বোধহয় আর কেউ ছিল না, কিন্তু আজকাল আমার নতুন একটি সঙ্গী জুটেছে—তার সঙ্গে গল্প করেই দিনের বেশীর ভাগ সময়টা কেটে যায়।

সকালে টেবিলের সামনে পড়তে বসি কিন্তু মন বসে না। ছু চারখানা বই এদিক ওদিক খুলে বন্ধ ক'রে খানিকটা সময় কেটে যায়। তারপর জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, চাপা গলায় ডাকি : টুকু ! টুকু !

ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট একটি মেয়ে তার এক মাথা কোঁকড়া চুল ছুলিয়ে জানলার উপর উঠে দাঁড়ায়। ওই টুকু। তারপর সুরু হয় ছুই অসমবয়সীর আলাপ।

মন্টুদা তুমি ভারী ছুষ্টু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

কেন টুকু, কি হল ?

বারে—কাল বললে ছবির বই দেবে ! কখন দিলে শুনি ?

তাই ত' বড় ভুল হয়ে গিয়েছে, আজ নিশ্চয়ই পাবে।

বেশ, কিন্তু আজ যদি না দাও ত' আড়ি আড়ি আড়ি এই তিন সত্যি করলাম।

না, না নিশ্চয়ই পাবে। আচ্ছা টুকু সোনা লক্ষ্মী মেয়ে এবার আমায় একটু পড়তে দাও কেমন ?

বারে—পড়বে ত ডাকলে কেন ? অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে টুকু জানলা থেকে নেমে যায়।

ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসি। সামনে যে বইখানা পাই টেনে মন দেবার চেষ্টা করি।

খানিকটা সময় কেটে যায়। হঠাৎ শুনি টুকু ডাকছে, মন্টুদা—

চেয়ারে বসে বসেই বলি ; কী টুকু

শোনোই না বাপু। পাকা গিন্নীর গলায় টুকু বলে ; সময় নষ্ট হবে না।

হেসে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

আমসত্ত্ব খাবে মন্টুদা ? ভাঁড়ার থেকে এনেছি।

মাকে ব'লে আনো নি ত ?

মা দিত নাকি বললে ? মা পাজি—

ছিঃ টুকু—মাকে ও কথা বলতে নেই।

হ্যাঁ বলতে নেই—মা আমসত্ত্ব দেয় না, আচার দেয় না, খালি বকে, মারে। মা ছুষ্টু, মার সঙ্গে আড়ি। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে টুকু বলে।

ওর রাগ দেখে হেসে ফেলি, টুকু আরও রেগে জানলা ছেড়ে চলে যায়।

বিকালে কলেজ ফেরৎ ওর ছবির বই কিনে আনি। পেয়ে আনন্দে ও মাতামাতি সুরু করে দেয় : মন্টুদা সোনা মন্টুদা লক্ষ্মী। আমার বড় ডল পুতুলটা তোমায় দিয়ে দোব মন্টুদা। এটা কার ছবি মন্টুদা ? উঃ কী বড় বাড়ী। এটা বুঝি এরোপ্লেন—আমায় একটা এরোপ্লেন কিনে দিও মন্টদা।

চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে আনন্দের উচ্ছাস শুনি। কথার শেষে একছুটে চুল ছুলিয়ে টুকু চলে যায়।

এমনি হাসিকান্না ভাব আড়ির মাঝে দিন কেটে যায়। টুকু আর আমি, আমি আর টুকু।

হঠাৎ একদিন আমার জ্বর হোল। সোজা সহজ জ্বর বেঁকে দাড়াল টাইফয়েডে। দীর্ঘ ৪২ দিন যুদ্ধ করে জীর্ণ ক্লান্ত শরীরে বেঁচে উঠলাম। তারপর গেলাম পাহাড়ে হাওয়া বদলাতে। পুরো ছমাস এদিক ওদিক ঘুরে হারানো শক্তি ফিরে পেয়ে যেদিন বাড়ী ফিরলাম সেদিন বিকালে পড়ার ঘরের জানলা খুলে ডাকলাম : টুকু—

ও বাড়ীর বন্ধ জানলা খুলে গেল। জানলায় এসে দাঁড়ালেন টুকুর মা। জিজ্ঞাসা করলাম : টুকু কোথায় মাসীমা ?

মুহূর্ত্তে মাসীমার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম কিছু হয়েছে। তাঁর চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগলো। ভাঙ্গা ধরা গলায় তিনি কেবল বল্লেন : টুকু নেই।

টুকু নেই। প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলাম না কিন্তু মাসীমার চোখের জল এক নিমেষে সমস্ত পরিষ্কার করে দিলে। টুকু নেই, সে চলে গেছে। যত জোরেই ডাকি না কেন সে আর ফিরবে না, আর রাগ করবে না—মন্টুদা বলে ডেকে ভাব করবে না।

মূর্চ্ছাহতের মত ধূলোয় ঢাকা চেয়ারে বসে পড়লাম। চোখের সামনে দেখতে দেখতে দিনের আলো চলে গিয়ে সন্ধ্যার আঁধারে ঘর ভরে উঠলো। টুকুর মা কখন জানলা ছেড়ে চলে গিয়েছেন জানি না, চমক ভাঙ্গতে চেয়ে দেখি খোলা জানলা খালি পড়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মনে

হ'ল ও বাড়ীর ঐ অন্ধকার জানলার পেছনে দাঁড়িয়ে টুকু হাসছে, ডাকলেই সামনে এসে দাঁড়াবে, কথার উত্তর দেবে।

গরাদে মাথা চেপে চাপা গলায় ডাকলাম ঃ টুকু টুকু।

আমার সে ক্ষীণ ডাক পৃথিবীর বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে অজানার রাজ্যে টুকুর কানে পৌঁছুল কি না কে জানে?

টুকু নেই কিন্তু এ বাড়ীর খোলা জানলা চেয়ে রয়েছে ও বাড়ীর জানলার দিকে, তেমনি মিতালীর চোখে।

আহরিকা

হৃষিকেশ দে

গ্রাহক নং ৭৫৩

বিভিন্ন দেশে যেসব বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, তার কয়েকটি বাছাই করে আমার রংমশালের ভাই-বোনদের দিলাম।—

	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	তারিখ
১।	বেতার	মার্কণী, ইটালী,	১৮৯৬
২।	টেলিগ্রাফ	মোর্স, আমেরিকা,	১৮৩৫
৩।	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল, আমেরিকা,	১৮৭৬
৪।	ফটোগ্রাফ	ড্যাগার ও ন্যাপ, ফ্রান্স,	১৮৩৯
৫।	দূরবীক্ষণ	গ্যালিলিও,	১৬০৯
৬।	উড়ো জাহাজ	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, আমেরিকা,	১৯০৩
৭।	দেশলাই	জন্ ওয়াকার,	১৮২৭
৮।	ষ্টিম ইঞ্জিন্	জেম্স্ ওয়াট্, ইংলণ্ড,	১৫৬৫
৯।	এক্স্ রে	রঞ্জেন, জার্ম্মেণী	১৮৯৫
১০।	ডাইনমো	ফেরাডে, ইংলণ্ড,	১৭৩১
১১।	চলচ্চিত্র	এডিসন্, আমেরিকা	১৮৯৩
১২।	ফাউন্টেন পেন	ওয়াটার ম্যান, আমেরিকা	১৮৬৪
১৩।	কাগজের কল	লাইরো ফেয়ার,	১৮৯৯
১৪।	টাইপ রাইটার	পোলস্	১৮৭৩
১৫।	রিভলভার	কোল্ট্, আমেরিকা,	১৮৩৫
১৬।	সেলাই কল	সিমিনিয়ার,	১৮১০
১৭।	ছাপা (ধাতু প্রস্তুত)	গুটেনবার্গ, জার্ম্মেণী,	১৮৯৫
১৮।	লিনো টাইপ	মার্জ্জেন থালার,	১৮৮৫
১৯।	থার্ম্মোমিটার	ফার্ম্ হিট্,	১৭২১
২০।	গ্রামোফোন	এডিসন্, আমেরিকা,	১৮৭৭

পরিচালিকা—দিদিভাই।

আমার চির আদরের ভাই বোনেরা!

জীবনটা আমরা দেখি অনেকটা বাতায়নে বসে পৃথিবী দেখার মত করে। সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ দৃষ্টি আমাদের, আমাদের জগৎ হলো অল্প পরিসর ক্ষুদ্র। সত্যিই কি তাই? পৃথিবী হলো উদার অনন্ত কিন্তু আমাদের গতি পথ হলো ক্ষীণ। তার পথে আছে অজস্র বাধা বিপত্তি। তাই মানুষ যখন সামনের দিকে এগোতে চায় তাকে সে বাধা বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, আর সংগ্রামই হচ্ছে জীবন। কিন্তু সে জীবন কি আমরা পেয়েছি? তোমরা পেয়েছ? সে কথা আর একদিন বলবো। আজ এসো তোমাদের চিঠির বাক্সর ঢাকা খুলি ঃ—

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর) ১১০৯

অনেকদিন পরে চিঠি পেয়ে খুসী হলাম খুব। তোমার পরীক্ষার খবরে আর সবাই ৬মাস পড়ে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছ বলে ঠাট্টা করলে ও আমি করবোনা ভাই। তুমি অল্প সময়ের ভিতর যা করেছ এতে তোমার কৃতিত্বই প্রকাশ পায়— ছাপ থাকার বিদ্যাই সব নয়।

শীলা মিত্র (ঢাকা) ৪৫৪

তুমি যা ভাবতে পারোনি বোনটী তা পেয়ে খুব খুসী হয়েছ, কিন্তু সেটা তো দুরূহ ব্যাপার ছিল না! তোমার ঠিকানা বদল করা হয়েছে ভাই।

কল্পনা আচার্য্য (নাগপুর) ৮৩৩

খুকু! ভারী চমৎকার ফটোটা তোমার, খুব খুসী হয়েছি, ইচ্ছা করছে তোমার ভাই বোনদের দেখাতে যদি সুবিধা হয় তাদের দেখবো। বাণীটা এত দুষ্ট হয়েছে কেন? চিঠি নেই যে? নাগপুরের অমলি (গত মাঘ মাসের রংমশালে) নয় ওটা 'অঞ্জলি' হবে।

ইলারাণী বসু (কলিকাতা) ১২৫৪

আমার ভাই বোনদের সম্বন্ধে ওকথা আমি ভাবতেই পারিনা ভাই, তোমাদের নিজেদের স্থান তোমরা পূর্ণ করে নেবে। ব্যজ-এর কথা বলবো বোন।

নীরেন্দ্র নাথ রায় (আঠারবাড়ী) ১১৮৮

গত মাসের চিঠিতে তুমি আমায় কি প্রশ্ন করেছিলে তার উত্তর একটার দিয়েছি আর একটা প্রশ্ন মনে নেই জানিও। শক্তি প্রসাদের ঠিকানা পাঠাচ্ছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) ৬৭০

তোমাদের ভাই অনেকদিন বলেছি—এক কাগজে চিঠি ও ধাঁধা দিওনা। কারণ তাতে বড় অসুবিধা হয়। এই অসুবিধার জন্য অনেক সময় কার্য্যকরী হয় না। লেখনী বন্ধুর ঠিকানা পাঠাচ্ছি। 'মনসামঙ্গল' সম্বন্ধে যা লিখেছ তার উত্তরে অনেক লিখতে হবে—রংমশালের পাতায় স্থান হবে না, তাহলে চিঠি বাদ যায়। আমি পৃথক ভাবে তোমায় লিখছি। ব্যজ যথাসময়ে পাবে।

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

তুমি ভাল আছ ও পুরী থেকে ফিরে এসেছ জেনে অত্যন্ত সুখী হলাম।

রেবা গাঙ্গুলী (লাকসার) ৪৭৮

ইন্দিরাদি'র চিঠি দিয়ে দিয়েছি, সেলাইএর কথা ভাই উনিই বলবেন, সেলাইএর্ বইএর নাম ইত্যাদি সব বলতে বলে দিয়েছি। তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম ভাই যাবো একদিন। টুলু ব্যজ নিতে পাবে কিন্তু তার দরুণ ১৲ লাগবে—আর গ্রাঃ নম্বর দুজনের নামে করিয়ে নিও।

পঞ্চানন রুই (উল্টাডাঙ্গা) ১১৬৩

অ্যাডভেঞ্চার গল্পএর কথা বলবো। পুরস্কার যথাসময়ে পাবে। শিশু মাসিকের তালিকা পাঠাবো।

খুকু (সিমলা হিল)

তোমার ঠিকানা গুলি পাঠাচ্ছি ভাই। তোমার সে কাথর উত্তর আমি অঞ্জলিকে দিয়েছি।

প্রভাত দে (মজিদপুর) ১১৫৮

শ্রীনগরে কোন গ্রাহক নেই। দিল্লীতে আছে ঠিকানা পাঠাচ্ছি। দার্জ্জিলিংএর সুনীল গ্রাহক নয়।

অরুণ বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা) ৮২৩

তোমার প্রশ্নের উত্তর একটু ভেবে দেবো ভাই, পরের মাসে কিম্বা ডাক যোগে। নিঃসন্দেহে 'দিদিভাই' বলতে পারো।

মাহনুর বেগম (বেগমপুর) ১১৬৬

মাসনু বোনটী! আমার উপর কি তোমার একটা (ভয়ানক) ধারণা আছে ভাই? তবে চিঠি লিখতে অত ইতঃস্তত করছিলে কেন? ছোট ভাই বোনদের অত্যাচার আবদার সবই দিদিভাইকে মেনে নিতে হয় সুতরাং নির্ব্বিবাদে চিঠি লিখবে—বৈঠকে যোগ দেবে। তোমার বোনেরা ও দিদিভাই খুই সুখী হলো নতুন আর একটি বোন পেয়ে।

নিয়তি গুহ (রেঙ্গুন)

তোমার নতুন চিঠি পেলাম ভাই। গ্রাহিকা নাহলে আমার পছন্দ অপছন্দতে কিছু এসে যায় না বোন, আমায় যে নিয়ম মেনে চলতেই হবে। সুতরাং আমি কি করবো বোনটী সে বিচার তুমিই করো। যদি এজেন্টএর কাছে কাগজ নাও তাদের একটা চিঠি পাঠালেও গ্রাহিকার কাজ হবে। না, তোমায় আমি বার্ম্মিজ ভাবিনি—আর তা ভাবলেও এ বৈঠকে স্থান হতো ভাই। লেখা ভাল হলে নিশ্চয় ছাপা হবে।

রেখা দাশ গুপ্তা (কলিকাতা) ১০৩৬

হাঁ ভাই একজনের বেশী লেখনী বন্ধু পাবে। তোমার শরীর এখন বেশ সুস্থ হয়েছে তো? তোমার জন্মদিনের পর চিঠি পেলেও আমার আন্তরিক আশীষ জানিয়েছি। রমা সেনগুপ্তা এখন আর গ্রাহিকা নয় তার স্থানে পারুল সেনগুপ্তা গ্রাহিকা। রমার অপর নাম পারুল কিম্বা পারুল অপর কেউ সে কথা সে নিজে না লিখলে আমি জানিনা। ব্যাজএর টাকা সবাইয়ের পাওয়া গেছে, একটু দেরী হচ্ছে বলে রাগ করো না।

রহিমা খাতুন (ষোলঘর) ৭৭৭

রমু! আমাকে আবিষ্কার করেছ এবং লিখেছ আমার নামের অর্থ 'ভালবাসার লতা'। কিন্তু আবিষ্কার কি রকম হলো? বুঝতে পাচ্ছিনা একটুও। না, না মনে কিছু করিনি—আমার নাম যে 'দিদিভাই' ছাড়া কিছু আছে তা ামি নিজেই জানিনা—চকোলেট ভাই তুমিই দিও নাহলে কি করে হবে বলো? ব্যাজটা দেরী হলেও পা ই।

কমলাদাস (শিলং) ৫৮১

আমিতো ভাই স্থান পেলেই তোমাদের সবাইকে উত্তর দেবার চেষ্টা করি। লেখনী বন্ধুর নাম তুমিই ভাই বলো আমি ঠিকানা দেবো।

যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য (ভবানীপুর) ৭৪৭

তোমার এ ভুল (গতবারের মত) যেন আর না হয়। Stampএর কথা পূর্ব্বেই বলেছি সেটা ছিল সাধারণ— অর্থাৎ যেমন ভূতপূর্ব্ব সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের সেই রকমই। 'বিশ্বকর্ম্মা' মশাইকে তোমার কথা বলবো।

অবনী ১০৮১

ছবির জন্য আমি কিছুই মনে করিনি ভাই। দূরদেশএর বন্ধু চাও? নাম জানিও।

তোমরা সকলে আমার আশীষ নিও।

ইতি—শুভার্থিনী—

তোমাদের

দিদিভাই

জ্যৈষ্ঠ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। রসিক ২। নোনা

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল হয়েছে যাদের ঃ—

অশোক, অশেষ, অসীম, অসিত, রণজিৎ, মামাবাবু, ন'মামা ও যুথিকা, (পুরুলিয়া)। প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর। জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর)। ঘণ্টা, ভূতি, ফক্কা, হরেকৃষ্ণ ও যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবনীপুর)। সাধনা, অর্চ্চনা, গোপাল ও রাখাল, (গৌহাটি)। রবীন্দ্রমোহন বসু, (কলিকাতা)। কুমারী গৌরী চট্টোপাধ্যায়, (বাদুড়বাগান)। রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, (ভবানীপুর)। সুকু, রথু, বেলা, এলা, ধীরু, গোরা, নানাভাই, অরু, দাদাভাই, হাসি ও দিদিভাই (ভবানীপুর)। শুভেন্দু গাঙ্গুলী, (পূর্ণিয়া)। যশোধন ভট্টাচার্য্য, (বিষ্ণুপুর)। সুনন্দা ও দীপ্তি দে, (কলিকাতা)। কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি, (শ্যামবাজার)। অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)। মীরা, প্রদীপ, অমিত, বুনু, কেয়া, মিঠু, গোবিন্দ গদাই, গিনিপিগ, (ভবানীপুর)।

একটি ভুল হয়েছে যাদের ঃ—

মাহনুর বেগম (বেগমপুর)। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা)। সোনাকামা, সোনাখুড়িমা সুন্দরদ মেজদা, ঠাকুরদা, ছোড়্দা ও নীরেন্দ্রনাথ রায়, (আঠারবাড়ী)। রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, (পাণ্ডুয়া)।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ছট্টু সিংকে পুরস্কার দেবার কারণ—তারই কথা শুনে হীরালাল বাবুর প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। ছোট্টু সিংকে কর্ম্মচ্যুত করার কারণ—সে বলছিল, যে স্বপ্নে দেখেছিল ট্রেণ দুর্ঘটনার ব্যাপার, প্রমাণ হয়ে গেল যে সে রাত্রে ঘুমোয়। অথচ রাত্রে জেগে পাহারা দেওয়াই তার কাজ।

২। উভয়েই অপরের মুখ দেখে নিজের মুখের অবস্থা তদনুরূপ মনে করেছিল।

উত্তরদাতাদের নাম

যাদের দুটি ঠিক হয়েছে ঃ—

জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর)। প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)। পঞ্চানন রুই, (উল্টাডাঙ্গা)। অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)। সন্দীপ রাও, (বালীগঞ্জ)। রবীন্দ্র, রণেন্দ্র, রঞ্জন, নারু, ঝরণা, গীতা ও নীরেন্দ্রনাথ রায়, (আঠার বাড়ী)। মীরা, খোকা, অমিত, বুনু, কেয়া, মিঠু, গোবিন্দ, গদাই, গিনিপিগ, (ভবানীপুর)। সনৎকুমার গাঙ্গুলী, (কালীঘাট)। ইলারাণী বসু, (তালতলা)। গৌরাঙ্গ চৌধুরী, (পাটনা)। কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি (শ্যামবাজার)।

যাদের একটি ঠিক হয়েছে ঃ—

রেখা ও রেবা দাসগুপ্ত, (কলিকাতা)। তরুণ ঘোষ, (বালীগঞ্জ)। বৌদি, মা, কাকি মা, গৌরী, ঝুণ্টু, দেশরঞ্জন ও সত্যরঞ্জন ঘোষাল, (ভড্ডা)। সতীশ, রাণু, রঞ্জন, আরতি, (বন গাঁ)। ঘণ্টা, ভূণি, ফক্কা, হরেকৃষ্ণ ও যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর)। কণিকা দেবী, (নৈহাটী)। দিলীপকুমার সেন; (দুমকা)। জ্যোতির্ম্ময় ও জগদীশ দাস, (তেলেনীপাড়া)।

অন্ধ রাজপুত্র

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সৌজন্যে

রংমশাল

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪৬ | একাদশ সংখ্যা

—চট্‌জলদী কবিতা—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— 'চট্‌জলদী খাওয়ালে না রইলো আড়ি !'
— 'আরে খাওয়াবো ভাই খাওয়াবো এত কি তাড়াতাড়ি !'
'আড়ি আড়ি আড়ি এক্ষুনি খাওয়াও চটজলদী
' নয় তো কাল যাবো বাড়ী।'
'বাদশা বাবু ফেল্লে তো মুস্কিলে ভারি—
সে যে দুই মাসে খাওয়ার উপযুক্ত হয়,
সাত আট পাউণ্ড ওজোনের কম নয় ;
দিলে সময় চট্‌জলদী চেপ্টা মাথা চট্‌জলদী গোল মাথা
দুইই খাওয়াতে পারি
দিওনা ভাই আড়ি।
দাও ভাব, মাস দুই যাক্
বড় দিনে ছোট দিনে পড়বে ফাঁক

চটজলদী শাক শবজী বিবি কুমড়ার তরকারী
ডিস্ ডিস্ ম্যাংগো ফিস্ তাও খাওয়াতে পারি।
আড়ি দাও তো গরীব নাচার
গরীব পরোয়ার বাদশা বাবু দাও ক্ষমা।'
'চটজলদী খাওয়ালে না ?'
'দেখ এতটা তাড়াহুড়ো ভালো না।
চট্‌জলদী বল্লেই আসে না,
এ তোমার দিল্লীর লাড্ডু ও নয়, অবাক জলপানও নয়,
অর্ডার দিলে পাঠাবো কালই,
বাদশা, হর রোজ ঈদ্ হয়না কারো বাড়ী
চট্‌জলদী ও আসেনা যতই কর তাড়াতাড়ি
সময়ে ধরবে ছোট ছোট ডাঁটা ছোট ছোট পাতা এক হাত অন্তর
ষোল টাকায় এক পাউণ্ড বাজার দর
জলদী জাতীয় সব জিনিষের এই হালই।
আস্থক তলবালি, বাদশা বাবু কর সবুর
নয়তো আমি নাচার।'

সত্য আর মিথ্যা

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি আঁকা শেষ হল। খানিক তফাতে পটুয়া ছবির মুখোমুখি একখানা আর্শি টাঙিয়ে দিলেন। আসলের কড়া ভাবটা মরে গিয়ে আর্শির বুকে ছবির অপরূপ প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল। নকলের কাছে আসলের হার হল।

জজ-বাড়ীর বেড়াল। এহেন কেতাদুরস্ত সুসভ্য প্রাণী বুঝি জানোয়ার মহলে নেই। বড়ঘরের বড় খবর তার কাছে। জানোয়াররা তার আশে পাশে ফ্যা ফ্যা করে' ঘুরে মরে।

এই খবরটা জজবাড়ীর বেড়ালের মুখে জানোয়াররা পেলে।

জজবাড়ীর বেড়াল বললে, "অদ্ভুত, কিম্ভুত, আশ্চর্য্য, পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার!"

ভল্লুকের মোটা বুদ্ধি। সে পিট্‌পিট্ করে তাকিয়ে বললে, "কেন, অত আশ্চর্য্য কেন?"

"দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়, সেইজন্যই এত আশ্চর্য্য!"

ভল্লুক বললে, "বটে!"

বেড়াল বললে, "তাছাড়া আর কি!"

গরু এতক্ষণ মাথা হেঁট করে জাবর কাটছিল। সে এবার বললে, "আর্শি বস্তুটা কি?"

বেড়াল মুরুব্বি চালে বললে, "আর্শি? আর্শি জিনিষটা হ'চ্ছে দেয়ালের একটা ফুটো বিশেষ। আর্শিতে একবার তাকালেই চোখের সামনে কী অদ্ভুত সব দৃশ্য ফুটে ওঠে! আঃ, আর্শির ছবিটা যদি একবার দেখে আসতে, তোমরা নির্ঘাত মূর্চ্ছা যেতে।"

জানোয়াররা এবার সমস্বরে বলে উঠল, "আর্শির অদ্ভুত কাণ্ডটা তো না দেখলে চলছে না!"

গাধা বোবার মত বসে ছিল। মুখ খুলতেই ভয়, কি জানি লাঠি নিয়ে কে তেড়ে আসে! তাকে মুচকি হাসতে দেখে জজবাড়ীর বেড়াল বললে, "এ ভারী অন্যায়!" জানোয়াররা মিলে গাধাকে চেপে ধরলে। গাধা বললে, "আমার বাপু যেন কেমন কেমন ঠেকছে। সত্যিকারের আজবকাণ্ড হলে জজ-বাড়ীর বেড়ালকে আর এত ফুলিয়ে বলতে হয়! দেখছ না, জজ-বাড়ীর বেড়াল আশ্চর্য্য পরমাশ্চর্য্য করে মারা যায় আর কি!"

জজ-বাড়ীর বেড়াল রেগে চলে গেল। জজ-বাড়ীর বেড়াল সম্বন্ধে এরকম অসম্মানকর উক্তিতে জানোয়াররা গাধার উপর খাপ্পা হয়ে উঠল। কিন্তু গাধার সেই এক কথা!

তুমুল তর্কের পর স্থির হল বিষয়টার চরম নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। গাধা বললে, "ভালো কথা! আমি স্বচক্ষে দেখে আসছি।"

পিঠে লাঠি পড়ার গুরুতর আশঙ্কা সত্ত্বেও গাধা যে স্বয়ং যেতে রাজী হল, এইজন্য জানোয়াররা বিশেষ কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল।

গাধা চিরকালই গাধা। সে আসল ছবিটা আড়াল করে আর্শির সামনে দাঁড়াল। আর্শিতে গাধা দেখলে নিজের প্রতিবিম্ব—ঢ্যাঙা দুটো কান আর কুৎসিৎ একটা মুখ।

ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসতে হাসতে গাধা এসে বললে, "কি হে, বলেছিলুম না! দেখে এসো সত্যবাদী বেড়ালের কাণ্ড! আরে! আর্শিতে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সেটা চমৎকার, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত তো বটেই—কিন্তু ছবিটা কোনো দৃশ্য টৃশ্য নয় বাপু! ছবিটা হচ্ছে—আমার!" বলে গাধা হঠাৎ লাঠির আশঙ্কা ভুলে গিয়ে হৈ চৈ করে ডেকে উঠল।

হাতীর কিন্তু বিশ্বাস হয় না। জজ-বাড়ীর বেড়াল খামোকা একটা মিছে কথা বলে যাবে! হাতী বলল, "বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!"

ভল্লুক বসে বসে থাবা চাটছিল। সে এবার মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বললে, "হুজুর! আমি বরং একবার দেখে আসি!"

হাতী বললে, "বহুৎ আচ্ছা।"

খানিক বাদে ভল্লুক ফিরে এসে বললে, "বেড়াল গাধা দুটোই মিথ্যেবাদীর চূড়ান্ত! হুজুর বিশ্বাস করেন তো একটা কথা বলি—আর্শিতে ভারী সুন্দর একটা ভালুক ছাড়া তো আমি কিছু দেখলুম না।"

জানোয়াররা মহাসমস্যায় পড়ে গেল। সকলেরই মনে হল, যাই আমি একবার স্বচক্ষে দেখে এসে সন্দেহভঞ্জন করে দিই।

পশুরাজ হাতীর হুকুমে পরপর বাঘ, সিংহ, চিতেবাঘ, উট আর্শিটায় উঁকি দিয়ে এলো। বাঘ বাঘ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলে না; সিংহ, চিতেবাঘ, উট—নিজেদের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর্শিতে আর কিছু দেখলে না।

হাতী রেগে টং। উঠতে বসতে বারোমাস—তবু হাতী বললে, "আমাকেই যেতে হবে! দেখা যাচ্ছে তোমরা সকলেই পরম সত্যবাদী।"

হাতী ফিরে এসে প্রজাদের ডেকে মিথ্যে কথা বলার অপকারিতা সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বললে, "তোমরা সকলেই মিছে কথা বলেছ। জজ-বাড়ীর বেড়ালকে অবশ্য মিথ্যেবাদী বলে আমি লজ্জা দিতে চাই না। কিন্তু এখন থেকে তাকে এক জোড়া চশমা পরতে হবে। আর্শির একোণ ওকোণ জুড়ে বিশাল একটা হাতীর ছবি ছাড়া কিছু নেই।"

জজ-বাড়ীর বেড়ালের কাণে খবরটা যেতে সে বললে, পর্‌র্‌র্‌। এর মানে হচ্ছে, আহাম্মকরা কখনও নিজেকে ছাড়া যদি আর কিছু দেখতে পায়!

মার্কটোয়েনের A Fable গল্পের ভাবানুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসতীকান্ত গুহ

প্রথম খণ্ডের সারমর্ম

[তিনশো বছর আগে বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠেছিল। দুটি বাঙালী ছেলে কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ সে ঝড়ে জাহাজডুবি হয়ে লঙ্কারাজ্যে ভেসে আসে। সেখানে ক্ষুধাজর্জ্জর মুহূর্ত্তে মানুষের হাতে খাদ্যের বদলে নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা পেয়ে তারা ক্ষেপে ওঠে, বোম্বেটেকুলতিলক দিব্যবর্ণের বোম্বেটেদলে তারা নাম লেখায়। দিব্যবর্ণ উধাও হবার পর কালিভূষণ হয় বোম্বেটেদলের সর্দ্দার। কালিভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের নিষ্ঠুর বীরত্বে সমুদ্রতল্লাট আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। শেষে লঙ্কার সম্রাট তাদের সঙ্গে সখ্য করে নেন, লঙ্কার পতাকার আড়ালে থেকে দুভাই সমুদ্র পৃথিবীর ভিৎ কাঁপিয়ে তোলে, বিদেশী সদাগরী জাহাজের ভাণ্ডার এসে সুগোপনে লঙ্কার রাজ-কোষে জমা হতে থাকে।

কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ এক চাঁদনী রাতে আরবসাগর পাড়ি দিচ্ছে। তখন এক যাত্রী-জাহাজের উপর তারা চড়াও হয়। যাত্রীজাহাজের এক কামরায় খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঢুকে রক্তের নেশায় মাতাল কালী-ভূষণ দেখে, একটি অপরূপ সুন্দরী বালিকা, যেন আরব্যউপন্যাসের একটি ছবি। কালীভূষণের মুখের উপর আলগোছে একটি রোমাল ফেলে দিলে মেয়েটি, কালীভূষণের চেতনা লোপ পেল। মেয়েটির ইঙ্গিতে বারোজন সাঁজোয়াপরা মানুষ এসে কালীভূষণের অসাড় দেহ ছোট একটি নৌকায় তুলে দিলে, সেই সঙ্গে একটি নক্সাকাটা বিচিত্র বাক্স তারা নৌকায় কালীভূষণের পাশে রেখে দিলে। নৌকার বাঁধন কেটে দিতে মহাসমুদ্রের দিগন্তে নৌকা অদৃশ্য হল।

বোম্বেটেদের হাতে মেয়েটি ধরা পড়ে। মেয়েটি ক্ষিতিভূষণকে বলে, কালীভূষণকে সে-ই ভাসিয়ে দিয়েছে। ক্ষিতিভূষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জাহাজের বৈঠকঘরে বন্দিনী বালিকা তার কাহিনী সুরু করে:

মিসর দেশ থেকে মহর্ষি পিঙ্গল তাকে নিয়ে আসেন হিন্দুস্থানে। মহর্ষি পিঙ্গল অমরলতার তপস্বী। মহর্ষি ধ্যানে জেনেছিলেন মহাসমুদ্রের শেষে মানুষের অগম্য এক প্রাণহীন সমুদ্রে আছে সবুজদ্বীপ। সেই দ্বীপে আছে অমরলতা। এই লতার রসে পাঁচশো বছর পরমায়ু হবে মানুষের। কি করে এই রহস্যদ্বীপের নিশানা পাওয়া যাবে, কোন্ মহাবীর প্রাণহীন সমুদ্রের মৃত্যু-প্রান্তর পার হয়ে সবুজদ্বীপের অমরলতা পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন, এই ছিল কঠোর সমস্যা! মহর্ষি ধ্যানে জেনেছিলেন, এক পুরুষ ও এক বালিকা হবে এই অভিযানের নায়ক নায়িকা। সেই বালিকাই হচ্ছে এই মিসর কন্যা। মহর্ষি এই মিসরকন্যার নাম রাখলেন রঙিলা। অমরলতার ইতিহাসে সে রঙীন আশা নিয়ে এসেছে, তাই তার নাম হল রঙিলা। তারপর একদিন মহর্ষি ধ্যানে দেখলেন, এক বিরাট কালো মূর্ত্তি হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে অমরলতার অভিযানে যাচ্ছে। মহর্ষি চিনলেন, সে দুরন্ত নিষ্ঠুর বোম্বেটে কালীভূষণ, সেই হবে অভিযানের নায়ক মহর্ষি তখন রঙিলাকে একদিন বললেন, যাও, অমরলতার এই পুঁথির বাক্স কালীভূষণকে দাও। এতে অমরলতার নিশানা আছে।

একথা মহর্ষির প্রধান শিষ্য বীর বজ্রনাথ শুনতে পেলেন। তিনি রোষে ক্ষোভে হতাশায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। তাঁর শিষ্য কিশোর সুকণ্ঠ ছিল রঙিলার খেলার সঙ্গী, ফুল তুলে মালা গেঁথে দিত, কবিতা লিখে শোনাত। সুকণ্ঠ গিয়ে রঙিলাকে বললে, বজ্রনাথ একটা অনুরোধ করেছেন, না রাখোতো আমি আত্মঘাতী হব। কিছুই না জেনে না বুঝে রঙিলা কথা দিলে। বজ্রনাথ তখন এসে বললেন, ঐ পুঁথির বাক্স আমাকে দাও। রঙিলা বললে, মহর্ষির হুকুম নেই। কিন্তু সুকণ্ঠ তখন বললে, আমি মৃত্যুপণ করেছি রঙিলা দেবী। বীর বজ্রনাথ থাকতে বোম্বেটে কালীভূষণ হবে সবুজদ্বীপের অভিযানের নায়ক! তাহলে আমাকে আর তুমি রাখতে পারলে না। কেঁদে আকুল হয়ে রঙিলা বললে, কালীভূষণকে পুঁথির বাক্স না দিয়ে উপায় নেই। মহর্ষির হুকুম। তবে সেই সঙ্গে কালীভূষণকে বেহুস করে হাত পা বেঁধে আমি ভাসিয়ে দেবো মহাসমুদ্রে। এ পুঁথির নকল আছে মহর্ষির গুপ্ত কোঠায়। বজ্রনাথ অনায়াসে সেটা হাত করে অভিযানে বার হতে পারবেন।

বজ্রনাথ একদিন মাঝরাতে মহর্ষির গুপ্তকোঠা আক্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। মহর্ষির আদেশে পঞ্চাশ হাজার অনুচর নিয়ে তিনি মহর্ষির পাহাড়ী রাজ্য ছেড়ে বিদায় হলেন। আর রঙিলা, জাহাজ নিয়ে বার হল কালীভূষণকে মহর্ষির পুঁথি দিতে, কালীভূষণকে মহাসমুদ্রের তরঙ্গে সঁপে দিতে।

রঙিলার এই রহস্য কাহিনী শেষ হতে বোম্বেটেরা হাহাকার করে উঠল। নিষ্ঠুর আক্রোশে গর্জ্জন করে তারা বললে, এই মেয়েটাকে ফেলে দাও মহাসমুদ্রে। ক্ষিতিভূষণ তন্ময় হয়ে রঙিলার কাহিনী শুনছিল। সে মাথা তুলে বললে, তাই হবে, মহাসমুদ্রেই একে ফেলে দেওয়া হবে। তবে শাস্তির ভার আমার উপর। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমি।

গভীর রাত্রে বন্দিনীর কোঠায় গিয়ে ক্ষিতিভূষণ শুধোলে, রঙিলা, কালীভূষণকে শেষ করে দিলে তুমি। সেই সঙ্গে মহর্ষির বড় আশার তপস্যায় বাদ সাধলে তুমি!

রঙিলা হঠাৎ মাথা তুলে বললে, মহর্ষির তপস্যা বিফল হবার নয়। কি সাধ্য আমার মহর্ষির তপস্যা বিফল করি! কালীভূষণ একদিন সবুজদ্বীপ থেকে অমরলতা নিয়ে আসবে, মহর্ষির এ ধ্যান যদি সত্য হয়, তাহলে মহাসমুদ্র ফিরিয়ে দেবে কালীভূষণকে। মহর্ষির তপস্যা সার্থক হবে। একদিন কালীভূষণ গিয়ে আনবে অমরলতা।

ক্ষিতিভূষণের দুচোখ জ্বলে উঠল। সে বললে, মহাসমুদ্র ফিরিয়ে দেবে কালীভূষণকে? রঙিলা, তাই হোক, সত্য হোক মহর্ষির ধ্যান।

তারপর, গভীর রাত্রে জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে ক্ষিতিভূষণ ও রঙিলা মহাসমুদ্রে উধাও হল কালীভূষণের খোঁজে।]

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

ইয়াকুব আহম্মদ লাথি দিয়ে মখমলের তাকিয়াটা ফেলে দিলেন। লণ্ডভণ্ড বিছানায় উঠে বসে ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন, "কৌন্ হ্যায়?"

"হুজৌর" বলে বান্দা কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসে। কুর্ণিশ করে বলে, "নয়া ছিলিম হোগা হুজৌর?"

"নেহি, নেহি, ফর্‌সি নিকালো! আভি নিকালো!" ইয়াকুব আহম্মদ গর্জ্জন করে ওঠেন।

ফর্‌সি নিয়ে বান্দা থর থর কাঁপতে কাঁপতে তামাকখানায় গিয়ে ঢোকে। সেখান থেকেই শোনে, ইয়াকুব আহম্মদ আবার দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠছেন, "কৌন্ হ্যায়?"

বাইরে মহাসমুদ্র হা হা করে গর্জ্জন করে ওঠে। অতল পাতালে যেন লক্ষ লক্ষ নাম না জানা প্রেতের দল হোঃ হোঃ হেসে ওঠে। আর, অসংখ্য তারকাখচিত অনন্ত আকাশের যে-ছায়া মহাসমুদ্রের বুকে এসে পড়ে তা শিউরে উঠে কেঁপে কেঁপে মহাতঙ্কে যেন চারিদিকে পালাতে চায়, মহাসমুদ্রে দিকে দিকে যেন আকাশের কালো ছায়া ছুটে ছুটে যায়।

ডালিয়া বিবির চোখে ঘুম নেই। একদিকে মহাসমুদ্রের প্রলয় চীৎকার, আর একদিকে ব্যর্থ পাঠান রাজপুত্র ইয়াকুব আহম্মদের মৃত্যু হাহাকার!

মৃত্যু? মৃত্যু ছাড়া আর কি? মানুষ মরে যায়, তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু যখন একটা বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে যায়, ইতিহাসের একটা বিদ্যুৎ-দীপ্ত সম্ভাবনা জীবনপথে গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যায়, মানুষের মনের উজ্জল আশার প্রদীপ্ত শিখা অদৃষ্টের ফুৎকারে নিভে যায়, মৃত্যু নেমে আসে তখন। পাঠান-রাজপুত্র সুদূর সমরকন্দ থেকে এসেছিলেন মহাসাম্রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ভেবেছিলেন, দিল্লীর ভাঙা তক্ত মজবুত করে সম্রাটী ছিলিম ফুকবেন। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নি। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত আশ্বাস, কত প্রতিশ্রুতি, কত শপথ, অঙ্গীকার, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা—তারপর ব্যর্থ হবার গভীর দুঃখ, কঠিন লজ্জা! রাজপুত্র দেখেছিলেন, তার অদৃষ্টতারকা কি করে ধীরে ধীরে মহাসাম্রাজ্যের আকাশে উঠল, একদিন তাঁর মনে হ'ল, আর কি, পাঠান গিয়ে এসেছিল মোগল, এবার মোগল মসনদ ফের পাঠানের হাতে এলো। তারপর মন্ত্রণাসভার যবনিকার আড়ালে চক্রান্ত ফণা তুলে উঠল, রাজপুত্রের সম্রাট হবার স্বপ্ন

একদিন হিন্দুস্থানের প্রখর রৌদে মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল। তারপর, তারপর চোরের মত অন্ধকার রাতে পালিয়ে আসা, জাহাজে চেপে মহাসমুদ্রে বেরিয়ে পড়া। ইয়াকুব আহম্মদ বেঁচে আছেন, তুচ্ছ মানুষটা বেঁচে আছে, মৃত্যু এসে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য-স্বপ্নকে অনন্ত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

"কৌন্ হায়!"

আবার ইয়াকুব আহম্মদের দুঃস্বপ্নের হাহাকার। যেন একটা মস্ত জানোয়ারকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মেরে ফেলা হচ্ছে, আর তার কাতর-চীৎকারে নিশীথের পৃথিবী হায় হায় করে উঠছে।

রেশমী ওড়ণাটা সামলাতে সামলাতে এলোচুলে ডালিয়া বিবি দৌড়ে আসেন। রাজপুত্রের কামরার কবাটের সামনে বান্দা একটা পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে।

ডালিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন, "হুজৌর কো দেখতা নেই!"

"হুজুরাইণ" বলে অসহায় বান্দা জবাব দেওয়ার আগে ডালিয়া বিবি রাজপুত্রের কামরায় ঢুকে পড়েন।

"ইয়াকুব!"

"কৌন্ হায়!"

"আমি ডালিয়া।"

"ডালিয়া! আমি বেঁচে আছি?"

"না রাজপুত্র! তুমি মরে গেছ। বেঁচে আছে তোমার প্রেত! রাজপুত্র! এই কি তুমি?"

মাথার চুল মুঠো করে ধরে রাজপুত্র ইয়াকুব ভীষণস্বরে বলে উঠলেন, "বেঁচে আছে আমার প্রেত! এই প্রেতটার মৃত্যু হয় না কেন ডালিয়া? শোনো ডালিয়া, বাইরে কারা আমায় ডাকছে!"

"মহাসমুদ্র ক্ষেপে উঠেছে। তুমি শান্ত হও রাজপুত্র, দেখবে মহাসমুদ্রও চুপ মেরে যাবে। আজ তোমার অস্থির মনটাই যেন রাতের সমুদ্রকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।"

"বটে!" ইয়াকুব আহম্মদ হেসে দিলেন। তিনি তো থেমেছেনই, থামবেনই। দিল্লীর বাদশাহী স্বপ্ন জীবনের এক চাঁদনী রাতে ফুটে উঠে ব্যর্থতার অমাবস্যায় মিশে গেছে। আজ থেমে যাওয়ার মুহূর্ত্ত, কিন্তু এ যে বড় লজ্জার থেমে যাওয়া! রাজপুত্র হেরে গেছেন। দিল্লীর তক্ত ঘিরে বেইমান দুশমনেরা এখনও হয়তো ছুয়ো দিচ্ছে।

রাজপুত্র ভাবলেন, থেমে গেছেন। কিন্তু একেবারে থেমে যান না কেন? একেবারে থেমে যাওয়া, এই যে হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক করছে—এও থেমে যাওয়া, তাই কি ভালো নয়? এই যে অদৃষ্টের হাতে চাবুক খেয়ে কুকুরের মত চেঁচিয়ে উঠছেন, এ কি থামিয়ে দেওয়া চলে না? গম্ভীর হেসে রাজপুত্র কোমর থেকে বাঁকা কিরীচটা বার করে আনতে থাকলেন।

সেদিকে তাকিয়ে ডালিয়া বিবির মুখ ম্লান হয়ে গেল। ধরাগলায় তিনি বললেন, "রাজপুত্র! কর কি!" উদ্‌ভ্রান্তের মত ডালিয়া বিবি সামনে ছুটে গেলেন। রাজপুত্র ততক্ষণে কিন্তু কিরীচ বার করে এনেছেন। বিবর্ণমুখে ডালিয়া বিবি এক মুহূর্ত্ত যেন থমকে গেলেন। নিজেকে শেষ করে দিতে পারতেন ইয়াকুব। কিন্তু না, বিদ্যুৎ বেগে তাঁর কিরীচ জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মহাসমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। একটা ছায়া যেন জানালার এক পাশে অন্ধকারে সরে গেল। রাজপুত্র যেন কাকে লক্ষ্য করে কিরীচ ছুঁড়েছেন।

ডালিয়া বিবি রাজপুত্রকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় বসে পড়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "কৌন হায়?"

সেই জানালা দিয়েই এক টুকরো কাগজ বিছানায় রাজপুত্রের কোলে এসে পড়ল।

ক্রমশঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সম্বরদের দলে

এমনি করে হরিণীকে অনুসরণ করে ছুটে চলল তারা। অনেক চড়াই, অনেক আঁকা-বাঁকা ঝিরঝিরে পাহাড়ে নদী পার হয়ে এল। কোথাও বাসা থেকে বেরিয়ে সজারু তার কাঁটা ঝাড়া দিচ্ছে, কোথাও বন-তিতির ক্যাঁ ক্যাঁ করে তার বৌদের নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। কোথাও বা পাহাড়ে ছাগল লাফাতে লাফাতে টিলায় টিলায় কোথায় কোন্ সুদূর ভয়ঙ্কর উচ্চে মিলিয়ে গেল।

এক সময় সরসর করে একটা প্রকাণ্ড সাপ তাদের সামনে দিয়ে নীচের খাদের দিকে অদৃশ্য হোল। গুপী হুপ্ করে এক লাফে এসে একেবারে সোজা হরিণীর পিঠে।

—ওরে বাবা এখুনি হয়েছিল আর কি!

তারপরে গুপী আর নামে না—হরিণীর পিঠে চড়ে যেতে ভারী আরাম। হরিণী প্রথমটা সয়েছিল, তারপরে সে হঠাৎ অদ্ভুত একরকম করে পিঠের পেশীগুলোতে এক ঝাঁকুনী দিল। গুপী তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে চিৎপাৎ!

মংলু হেসে উঠল।

গুপী দাঁত বার করে হরিণীকে খুব একচোট ভেংচি কেটে দিল।

চলতে চলতে বেলা বেড়ে চলেছে। একটা পাহাড়ে নদীর ধারে হরিণছানাকে নামিয়ে রেখে মংলু আর গুপী একরাশ ফল পেড়ে নিয়ে এসে তাদের খাওয়া সেরে নিল। তারপরে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে আবার যাত্রা স্থরু।

কালকেতুর তাড়া খেয়ে শৃঙ্গধর যে ওপরের পাহাড়ে উঠবে এ কথা হরিণী জানত কিন্তু ঠিক কোন্ বনে যে দল গেছে বোঝা শক্ত। তাই বিকেলের দিকে এক দিকের ঘাসের পানে তাকিয়ে হরিণী আনন্দে ডেকে উঠল। মংলু তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে এক দিকের ঘাসের ডগাগুলো সব খা-য়া। একটা দল যে শিগ্গিরই এখান দিয়ে চলে গেছে বোঝা যায়। হরিণী অদ্ভুত একটা ডাক ডাকতে ডাকতে ছুটে চলেছে!

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল তারপরে আকাশে মুখ তুলে উচ্চস্বরে একবার ডাকল, কাণ দুটো তার খাড়া হয়ে উঠেছে। আর বনের ভেতর থেকে প্রথমে একটা তারপরে একসঙ্গে অনেক নীচু অদ্ভুত একরকমের ডাক ভেসে এল। হরিণী ধীর পায়ে এগিয়ে চলল বনের ভেতর। তারপরে দেখা গেল হরিণের দলকে।

শৃঙ্গধরের পেছনে হরিণেরা সবিস্ময়ে হরিণীর পেছনে মংলুদের দিকে চেয়ে আছে। হরিণী এবার আনন্দে ডেকে উঠল, কিন্তু শৃঙ্গধর তবু এগিয়ে এল না। মংলু ব্যাপারটা বুঝল। সে কাঁধ থেকে হরিণ-ছানাকে মায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে হরিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। গুপী তখন কিচ্‌কিচ্ কিচ্‌কিচ্ করে লাফাচ্ছে। শৃঙ্গধর বুঝল এরা শত্রু নয়, বন্ধু। বিশেষতঃ হরিণী যখন অমন করে মানুষের ছানার গায়ে মুখ ঘষছে! শৃঙ্গধর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। হরিণী তার মুখে মুখ ঘষে কি যেন বলল। শৃঙ্গধর আকাশে মুখ তুলে হাঁক দিল। মংলু তখন তার কাছে এসে তার নাকে হাত বুলিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সম্বরের দল এসে তাদের ঘিরে ফেলল। মংলুকে তাদের বন্ধু বলে মেনে নিল সম্বরেরা। বনের মাথায় আর একটা দিন তখন অস্তমান। সেই থেকে মংলু আর গুপী রয়ে গেল সেই পাহাড়েই।

নীচে থাকে সম্বরের দল, ওপরে গাছের ডালে মংলু আর গুপী ঘুমোয়। বেশ একটা স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কেটে যায়। সম্বরদের সাথে ছুটে মংলুর পায়ে এখন অদ্ভুত দ্রুত গতি। সে যখন সম্বরদের দলের আগে ছুটে চলে তখন মনে হয় কোন বনদেবতা বুঝি সম্বরদের চালিয়ে নিয়ে ছুটেছে। এ বনে সবুজ ঘাস, ও বনে কলার কাঁদি, ঝরণার স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জল, শত্রুর ওপর সজাগ দৃষ্টি—চমৎকার কয়েকটা দিন কেটে গেল। এরই মধ্যে সম্বরেরা মংলুদের তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির কাছে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত।

সম্বরদের দলের নিয়ম, শুধু সম্বরদের কেন সব বন্য দলেরই নিয়ম, যে দলে সব চেয়ে বলশালী সেই হবে দলপতি। এতদিন শৃঙ্গধরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। তার ঘাড়ের সোণালী লোমগুলোর দিকে সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত কিন্তু দিনের গতির সাথে বয়সের আধিক্যে শৃঙ্গধরের সেই সোণালী লোম কটা হয়ে আসছে। বহু দিন সে সম্বরদের পরিচালনা করেছে। ইতিমধ্যে দলের তরুণ কয়েকজন সম্বর জোয়ান হয়ে উঠেছে। শৃঙ্গধর বোঝে শিগ্গিরই তার দিন ফুরিয়ে আসছে। তাকে এবার দল ছাড়তে হবে। একবার দলপতিত্ব করে সেই দলেই আর ছোট হয়ে থাকা যায় না। ইতিমধ্যেই তরুণ সম্বরদের

মধ্যে মাঝে মাঝে বল পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে উচ্চরবের কাঁধে ক্ষমতা বিশাল। দিন দিন তরুণ সম্বরেরা তার ক্ষমতা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। হরিণীরা এখন সবিস্ময়ে তাকেই লক্ষ্য করে।

তারপরে একদিন শৃঙ্গধর যা ভয় করেছিল তাই হোল। সেদিন সকালে শৃঙ্গধর উঠে হুকুম দিল—আজ বনের পশ্চিম ঝরণার দিকে যেতে হবে।

দল যাবার জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়াল। সবাই উঠল কিন্তু উচ্চরব আর ওঠে না।

শৃঙ্গধর ক্রুদ্ধ এক হাঁক দিল। উচ্চরব লাফিয়ে উঠে শিঙ বেঁকিয়ে শৃঙ্গধরের পানে এগিয়ে এল।

শৃঙ্গধর বলল—বটে?

উচ্চরব জবাব দিল—দল এখন আমার!

শৃঙ্গধর শিং বেঁকিয়ে তেড়ে গেল। তারপরে লাগল দুই সম্বরের অদ্ভুত লড়াই। গাছের ওপর থেকে মংলু আর গুপী সবিস্ময়ে তাই দেখতে লাগল। দু'জনের কাঁধেই বিশাল ক্ষমতা, তবে শৃঙ্গধর অধিকতর অভিজ্ঞ, অধিক কৌশলী আর উচ্চরব দৃঢ় বলশালী। শিঙে শিঙ আটকে দু'জনেই কিছুক্ষণ পাথরের মত স্থির। তারপরে কাঁধের পেশীগুলো তাদের ফুলে উঠল, যেন ফেটে পড়বে। দু' জনেই তখন থরথর করে কাঁপছে। তারপরে শৃঙ্গধর বুঝল তার দম ফুরিয়ে আসছে।—উঃ উচ্চরবের কাঁধে কি বিশাল ক্ষমতা! শৃঙ্গধর বুঝল তার দিন শেষ হয়ে এসেছে, দলপতিত্ব তার এখন থেকেই শেষ। উপযুক্ততর সম্বরের হাতে এবার দলকে ছেড়ে দিতে হবে। শৃঙ্গধর শেষ একটা প্রাণপণ বলে মারল কাঁধে চাড়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ল। যুদ্ধের নিষ্পত্তি হোল না। দু' জনেই লাফিয়ে উঠল আবার। আবার তাল ঠুকে তারা তৈরী হোল। শৃঙ্গধর মনে মনে অনুভব করল এবার তার শেষ।

ঠিক সেই সময় দূরে একদল বন-তিতির ক্যাঁ ক্যাঁ করে আকাশে ঝাঁপিয়ে উঠল। মংলু চমকে এক লাফে একটা গাছের মাথায় উঠে দেখে দূরে একদল বড় বড় ঘাস নড়ছে। সে চীৎকার করে উঠল—হু-উ-উই! বাঘ! বাঘ!

হরিণের দল এক মুহূর্ত্তে তাদের যুদ্ধ ভুলে ছুটল ফাঁকা বনে। শৃঙ্গধরই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, সেই তখনও দলপতি। পেছনে কালকেতুর গর্জ্জনে বন কেঁপে উঠল।

সম্বরদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতেই মংলু মনস্থির করে ফেলল। এ রকম ভাবে শত্রুর সঙ্গে বরাবর এক বনে থাকা যায় না। কালকেতু তার বা সম্বরদের আশা ছাড়বে না। বরাবর দিনের পর দিন ধরে সে ওৎ পেতে চলেছে। হরিণদের পায়ের দাগ ধরে ধরে সে ওপরের বনে উঠে এসেছে। কালকেতু যতদিন এ বনে থাকবে ততদিন তাদের কারুরই মঙ্গল নেই। হরিণের দল ছুটেছে টিলার পর টিলা ডিঙ্গিয়ে। সামনের পাহাড়ে মস্ত এক ফাটল। লাফে লাফে হরিণেরা তা পার হয়ে গেল। হঠাৎ মংলু একটা চীৎকার করে উঠল, দলের পুরুষ সম্বরেরা থমকে দাঁড়াল। হরিণীরা বাচ্চা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখনও।

মংলু বলল—শৃঙ্গধর তোমরা দলে ভারী আছ, তোমাদের কাঁধে অসীম ক্ষমতা। কালকেতুর থাবাতে যদিও বিশাল বল কিন্তু আজ তাকে শেষ করতেই হবে। না হলে কতদিন এমন পালিয়ে বাঁচবে? তোমরা দল বেঁধে যদি একবার তাকে শিঙের নীচে ফেলতে পার তা হলেই তার শেষ। দেখ কে দলের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত?

শৃঙ্গধরের মেজাজ আজ আগে থেকেই গরম ছিল। সে একটা সাঙ্কেতিক হাঁক দিল—

কয়েকজন সম্বর তৈরী হয়ে গোল হয়ে দাঁড়াল, কয়েকজন পেছিয়ে গেল। যারা চলে যাচ্ছিল তাদের দলে উচ্চরবকে দেখে শৃঙ্গধর একটা তাচ্ছিল্যের ডাক ডেকে উঠল।

কালকেতু তখন ঠিক পাহাড়ের ওপার থেকে একদল হরিণ দেখে আনন্দে গর্জ্জন করে মারল লাফ। তার সেই লাফ রুখল শৃঙ্গধর নিজের কাঁধে। কালকেতু তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তেই সে সজোরে কাঁধে ঝাঁকুনী দিল। কালকেতুর প্রচণ্ড থাবায় তখন কাঁধ বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। শৃঙ্গধরের বিশাল ঝাঁকুনীতে কালকেতু মাটিতে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ভয়ঙ্কর শিঙের গুঁতোয় তাকে মাটিতে গেঁথে ফেলল। শৃঙ্গধর চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণস্বরে। উচ্চরব যায় নি। দল সম্বন্ধে একটা কি যেন বলেই সে শৃঙ্গধরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। কালকেতু মাটিতে পড়তেই তাকে সে গেঁথে ফেলল তার ধারাল শিঙ দিয়ে। কালকেতু মৃত্যুগর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে তুলল। হরিণেরা যে এমন পাল্টা আক্রমণ করবে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এ বুদ্ধি সম্বরদের নয়, ওই মানুষের ছানাটার সে বুঝতে পারল। একবার শেষ গর্জ্জন করে সে লাফিয়ে উঠল। সেই বিশাল ঝাঁকুনী-লাফ উচ্চরবও সইতে পারল না—তার শিঙ থেকে ফস্‌কে গেল কালকেতু। কালকেতু দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল, সেই উঁচুতেই শিঙ দিয়ে রুখে নিল তাকে শৃঙ্গধর। কালকেতুর ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড থাবাটা আবার শৃঙ্গধরের কাঁধে পড়ল। সে এবারে মরিয়া হয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলল তাকে, তারপরে পাগলের মত শিঙ দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফেলতে লাগল। ততক্ষণে অন্যান্য সম্বরেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালকেতুর উপর। একটা আকাশ-ফাটা চীৎকার, একটা সজোরে দম নেওয়া, তারপরে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। কালকেতু আর এ জীবনে শিকার করবে না। তার দেহটা একবার সটান হয়ে থরথর করে কেঁপে উঠে জন্মের মত নিথর হয়ে গেল!

শৃঙ্গধরের কাঁধ বেয়ে, দু' চোখ ফেটে রক্ত পড়ছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে। তার মনে হোল শরীরটা তার ভয়ানক হাল্কা, তুলোর মত হাল্কা—কাঁধটা যেন তার নেই। সে চীৎকার করে একটা হুকুম দিল। সম্বরের দল এক লাফে সরে দাঁড়াল। চিরশত্রুকে শিঙে গেঁথে শৃঙ্গধর উঠতে গিয়ে প্রথমটা হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তারপরে প্রাণপণে মাথায় কালকেতুকে তুলে খদের দিকে সে তার মাথা ঝাঁকি দিয়ে বিজয়-চীৎকার করে উঠল। তার মাথা থেকে ছিটকে কালকেতুর মৃতদেহ খদের অতল তলে মিলিয়ে গেল। তারপরে দেখা গেল সেই খদের ধারে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত শৃঙ্গধর টলছে; সম্বরেরা সকরুণ চীৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের মত শৃঙ্গধরের মৃতদেহ টলতে টলতে সেই খদের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল। দলপতি শৃঙ্গধর দলপতির মতই দলের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নিল।

বন যথারীতি রহস্যময়; স্তব্ধ, শান্ত, ধ্যানমগ্ন।—আকাশে শান্ত সাদা মেঘের ভেলা।

উজ্জ্বল সকাল সোণালী স্বপ্নময়।

তারপরে বহু দিন কেটে গেল, বহু শান্ত, স্বচ্ছন্দ, নিস্পন্দ দিন। আবার বসন্ত এসে গেল, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল বন। চৈতী ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে এল কত পাখীর দল দেশ দেশান্তর থেকে, কত পাখী অজানা দেশে ভেসে পড়ল। উচ্চরব তার দল নিয়ে বনান্তরে যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল। সম্বরদের

এইটাই জোড় বাঁধবার সময়। ভিন্ন দল থেকে এদিক ওদিক করে নতুন করে তাদের দল বাঁধতে হয়। উর্ব্বর জমি আর বীজের আধিক্যে নীচের দাবানলে পোড়া বন আবার শ্যামল হয়ে উঠল। আবার শুষ্ক তরুতে শ্যামল মঞ্জরী দেখা দিল। বন উঠল ঝলমলিয়ে।

উচ্চরব যেদিন তার দল নিয়ে সোণালী কেশর দুলিয়ে টিলায় টিলায় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বনান্তরের উদ্দেশে যাত্রা করল সেই দিন মংলু গুপীকে বলল—চল গুপী আমরা নীচে নেমে যাই। ওই দেখ, নীচের বন আবার বেঁচে উঠেছে, আবার গাছের দলে সবুজ পাতা দেখা দিল। হয়ত—হয়ত আবার আমাদের পুরোণ দলের ওখানে দেখা পাব। হয়ত নালুখ আবার কালাদের নিয়ে ওখানে ফিরে এসেছে, হয়ত গোদাবর সদলে আমাদের খুঁজে ফিরছে ওই বনে।

গাছের মাথায় প্রথম সূর্য্যালোকের প্রদীপ্ত রূপ। সপেশী দীর্ঘদেহ মংলুর স্বাস্থ্যবান রূপ বনের মাথায় কোন বনদেবতার মত ঝকমক করছে। গুপী লাফাতে লাফাতে কিচ্ কিচ্ করে উঠল। ময়ূরেরা গাছের ডালে পেখম ধরেছে তখন। মংলু বলল—চল গুপী আর দেরী নয়। এই পাহাড়ে আমাদের চিরশত্রু কালকেতুর মরা হাড় পড়ে থাক, চল আমরা যাই।

গুপী বলল—চল।

সেই গাছের মাথা থেকে মংলু হাঁক দিল—হু-উ-উই!

তারপরে গাছে গাছে লতায় লতায় দুলতে দুলতে উড়তে উড়তে বিদ্যুতের মত ঝলসাতে ঝলসাতে তারা নেমে চলল।

মহুয়া কুর্চ্চি মাথা বন তখন তাদের পেছনে গন্ধ মাতাল।

শেষ

চিনতে পারেন?

হা হা হা শোনেন মশাই
ভয় কেন পান্ মিছে, ছাই!
আমাদের জম্বু পিসে,
আফ্রিকাতে দেখেন নি সে?
লিভিংষ্টোনের চাপরাশী
ছিলেন বুঝি পাঁচ মাস-ই।
সায়েব স্নুবোর সঙ্গেতে
ছিলেন বুনো কঙ্গেতে।

রঙটা না হয় ফর্সা নয়,
ফর্সা রঙে কি-ই বা হয়!
নাকটা চাপা, হোক না ছাই,
ঠোঁটটা পুরু, যাক বালাই!

চুলটা খাড়া? কি মুস্কিল?
মশাই বুঝি রাম উকিল?
চোখটা কুচো? রাক্কুসে?
ভালোর হিসেব নিন বুঝে।

চিনতে পারেন আমরা কে?
সাহেব অবাক ষ্টাইল দেখে!
কোট, পেটিকোট, ইষ্টকিন,
শার্ট পা-জামা সম্‌ঝে নিন।
জ্যাকেট, টুপি, সায়বী ধাত,
বলতে পারেন আমরা কি জাত?
খোকন সোনায় স্কুলে দিয়ে
মেমের সঙ্গে দেবই বিয়ে।

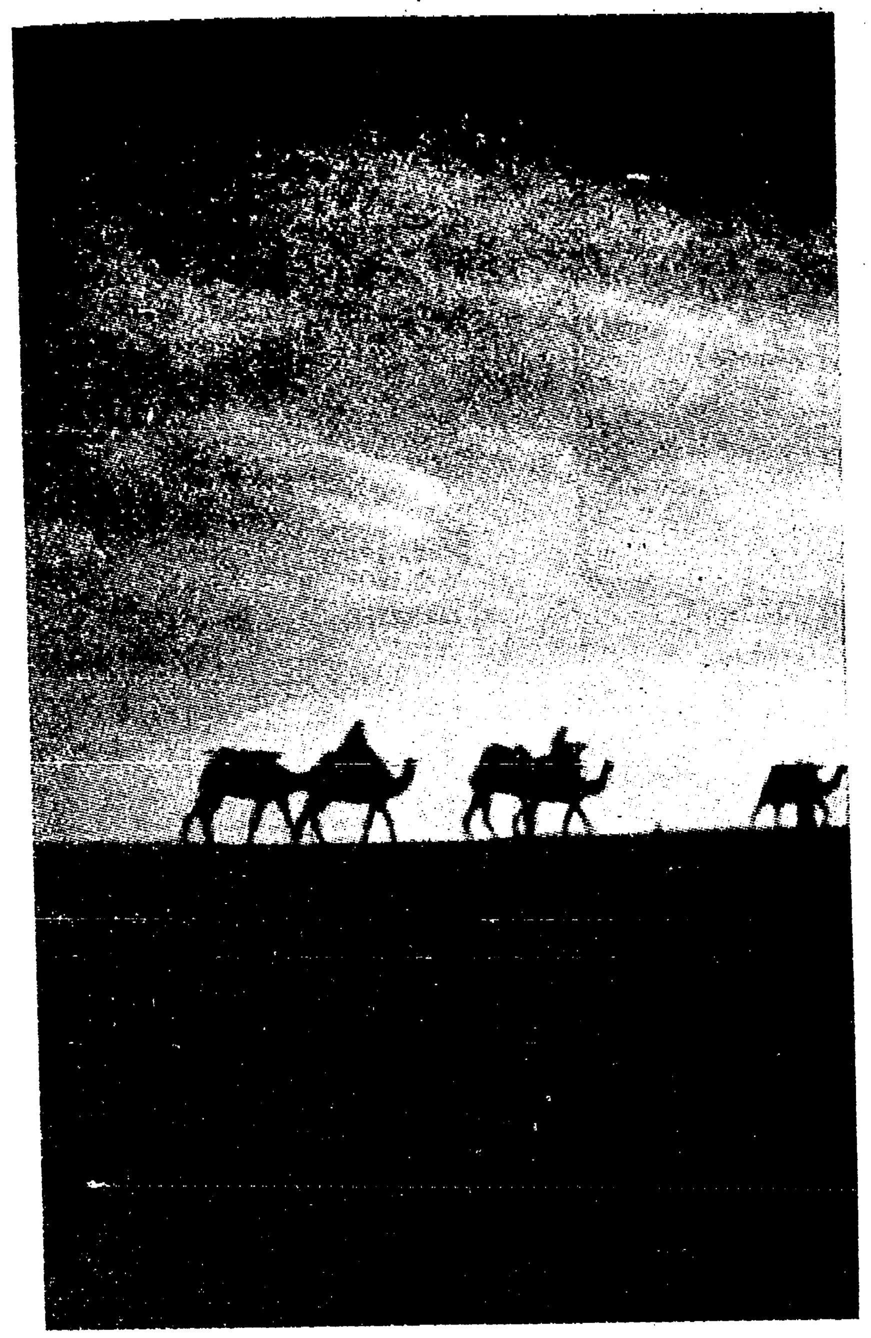

ঊষা ও গোধূলি

শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী

কবিতা পড়তে পড়তে এক-আধ ছত্রে দেখি লেখা রয়েছে, 'ঊষার প্রথম আলো' কিম্বা 'গোধূলির শেষ আলো।' তোমরা কখনও ভেবে দেখেছ, এই ঊষা আর গোধূলি-র আধো-আলো আধো-অন্ধকার-এর অর্থ কী? দিনের শেষে হঠাৎ একেবারে পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আসে না কেন? কেন, খানিকক্ষণ, আকাশ আর পৃথিবী জুড়ে একটা ঈষৎ আলো ছড়িয়ে থাকে? রাতের শেষে সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রই বা কেন প্রথমটা পাই না? কিছু সময়ের জন্য ঊষার নরম আলো, অন্ধকার মেশানো আলো কেন আসে আকাশে আর পৃথিবীতে?

কবিতা থেকে একেবারে বিজ্ঞানে এসে পড়া গেল। যাহোক, এই ঊষা ও গোধূলির কেন-র জবাবটা খুঁজে পেতে হবে।

বৈজ্ঞানিকের কাছে এই প্রশ্ন তুললে তিনি কি জবাব দেবেন জানো? তিনি জবাব দেবেন, ঊষা আর গোধূলির আসল কারণ হচ্ছে মেঘ ও ধূলো ভরা বায়ুমণ্ডল। মেঘ ও ধূলো

ভরা বায়ুমণ্ডলের পর্দ্দাটা আছে বলেই হঠাৎ মিশমিশে অন্ধকার কিম্বা চনচনে রোদ পাই না।

গোধূলির কথাটাই প্রথম ধরা যাক। সূর্য্য তো অস্ত গেলেন, কিন্তু তখনও তাঁর শেষ রশ্মি আকাশের মেঘ ও অসংখ্য ধূলিকণায় রঙীন ছটা ফেলছে। বড় একটা মজার কাণ্ড কিন্তু তখন ঘটছে। সূর্য্যের শেষ রঙীন রশ্মিকে মেঘ ও ধূলি ভেঙে ভেঙে ফেলছে, চূর্ণ করে দিচ্ছে। মেঘ ও ধূলিকণা এই ভাঙা আলো পৃথিবীর মুখে ফেলছে। পৃথিবীর যেখান থেকে সূর্য্যের আলো সরে গেছে, গোধূলিতে সেখানে এই ভাঙা আলো, মেঘ ও ধুলো ছোঁয়া, মেঘ ও ধুলো-চোঁয়ানো নরম আব্ছা রঙীন আলো এসে পড়ছে। ধুলোকণায় আলো ভেঙে যায়। নানা রঙের ফিতের মত একটানা আলো ফালি ফালি হয়ে যায়। এই খণ্ড আলো, রঙীন আলোই হচ্ছে গোধূলি।

আকাশ থেকে পাতালের মই বেয়ে সূর্য্য তো নামতে থাকলেন। সূর্য্য যত নামছেন, বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলের মেঘ ও ধুলো তত কম আলো পাচ্ছে। শেষে সূর্য্য একেবারে যখন নেমে পড়েন, আকাশ থেকে আলো একেবারে সরে যায়। পৃথিবীতেও তখন গোধূলির ভাঙা রঙীন আলো মুছে যায়। আলো মুছে গেলে থাকে অন্ধকার, নেমে আসে পৃথিবীতে গভীর অন্ধকার।

ঊষার রহস্যও ঠিক এই রকম। পাতালের মই বেয়ে সূর্য্য উপরে উঠছেন। প্রথম আলো এসে পড়ছে আকাশের মেঘে ও ধুলোয়। পৃথিবীও পাচ্ছে নরম সোণালী আলো। সূর্য্য যেই একেবারে উঠে এলেন, প্রখর রোদ আকাশ ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল, মেঘ ও ধুলোর নরম আলো মরে গেল।

এই ঊষার আলো ও গোধূলির আলোর মেয়াদ কতটা সময়? বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, সূর্য্য যতটা সময় দিগন্ত-রেখায় ১৮ ডিগ্রি নীচেয় থাকেন, ঠিক ততটা সময় হচ্ছে ঊষা ও গোধূলির মেয়াদ। বিষুব-রেখা পৃথিবীর যেখান দিয়ে গেছে সেখানে গোধূলির মেয়াদ একঘণ্টা বারো মিনিট! উত্তর মেরুতে ২৯শে জানুয়ারী হতে সুরু করে মার্চ্চের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত একটানা গোধূলি! গ্রীন্‌উইচে ২২শে মে হতে সুরু করে ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত ঠিক অন্ধকার রাত পাওয়া যায় না—এতটা সময় ধরে চলে গোধূলির রঙীন মহলা।

গোধূলির পরম শত্রু হচ্ছে কিন্তু মেঘ। পাৎলা মেঘের পর্দ্দায় রোদ পড়ে সৃষ্টি হয় গোধূলির গেরুয়া আলো, কিন্তু মেঘের পর্দ্দাটা যদি হয় বিষম পুরু, তাতে সূর্য্যের আলো একেবারেই ঢাকা পড়ে যায়।

রোমিও জুলিয়েট

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন রোমিও লরেন্স বলে এক ধর্ম্মযাজকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে সব কথা খুলে বল্লেন এবং জানালেন যে তাঁদের বিয়ে তাঁকে দিতেই হবে। ধর্ম্মযাজক রোমিও-র আগ্রহ দেখে রাজী হলেন।

সন্ধ্যা বেলায় জুলিয়েট খবর জানবার জন্য তার দাসীকে রোমিওর কাছে পাঠালো। দাসী এসে খবর দিল যে ধর্ম্মযাজক লরেন্সের ওখানে বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত রোমিও করে এসেছে। কাল সকালেই বিয়ে হবে।

বাড়ীতে আর কেউ জানলো না। কারণ, তাদের ভয় হলো যে, দু' বাড়ীতে যে রকম শত্রুতা তখন এই বিয়েতে নিশ্চয়ই কারুর বাপ মা রাজী হবেন না। সেই অকারণ ঝগড়াই তাদের কাছে বড় হবে।

তোমরা হয়ত বলবে, ধর্ম্মযাজক লরেন্স তাদের বাপ মায়ের বিনা অনুমতিতে এই বিয়ে দিতে রাজী হলেন কেন? তিনি ভাবলেন যে, এই বিয়ের ফলে বহুদিনের পুরাণো ঝগড়ার মিটমাট হয়ে যেতে পারে......আর বিয়ে হয়ে গেলে, এমন ছেলে, এমন মেয়েকে কোন বাপ মা তাড়িয়ে দিতে পারে? রোমিওর মত পাত্রও হয় না, জুলিয়েটের মত মেয়েও হয় না।

পরের দিন সকালবেলা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জুলিয়েট তার দাসীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ম্মযাজকের কাছে এলো। সেইখানে ধর্ম্মসাক্ষী করে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর, তারা দুজনে যে যার ঘরে ফিরে গেল। চোখের জলে জুলিয়েট ফিরে গেল তার বাপের বাড়ী, রোমিও ফিরে এলো তার ঘরে। ঠিক হলো, রাত্তিরে গোপনে সে দেখা করবে জুলিয়েটের সঙ্গে।

কিন্তু সেদিন সকাল বেলা এক বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। ভোজের দিন ক্যাপুলেটদের বাড়ীর যে ছেলেটী রোমিওকে চিনেছিল, সেদিন সে রোমিও কে জব্দ করতে পারেনি বলে তার আক্ষেপের অন্ত ছিল না। সে সর্ব্বদাই খুঁজছিল কি সুযোগে রোমিওর সঙ্গে ঝগড়া বাধান যায়।

সে দিন সকাল বেলা রোমিও তার তুই বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এহেন সময় টাইবল্‌ট্ সেখানে এসে উপস্থিত হলো এবং সুযোগ বুঝে রোমিওকে উত্তেজিত করবার জন্যে গালাগাল দিতে লাগলো। টাইবল্‌ট্ হলো জুলিয়েটের সম্পর্কে ভাই—তাই তার সঙ্গে ঝগড়া করবার বা যুদ্ধ করবার কোন ইচ্ছাই রোমিও-র ছিল না। কিন্তু রোমিও-র সঙ্গে যে তুজন বন্ধু ছিল, তারা সে কথা শুনবে কেন? রোমিওর এক বন্ধুর সঙ্গে টাইবল্‌টের তলোয়ার যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে রোমিও-র বন্ধু হত হলো। তার পাশে বন্ধু এই ভাবে আহত হয়ে মারা গেল দেখে, রোমিও রাগে সমস্ত ভুলে গেলো, তখন সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না। তলোয়ার নিয়ে রোমিও টাইবল্‌ট্‌কে আক্রমণ করলো।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর রোমিওর তলোয়ারের আঘাতে টাইবল্‌ট্ ধরাশায়ী হলো এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করলো।

রোমিও ধরা পড়লো এবং বিচারে তার চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হলো। সেই দিনই সহর ছেড়ে, জুলিয়েটকে ছেড়ে চিরকালের মত যেতে হবে! বিয়ের পর সেই প্রথম রাত্রি! রাত্রি বেলা গোপনে রোমিও পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করলো। জুলিয়েট যখন শুনলো যে এই মুহূর্ত্তে রোমিওকে সব ছেড়ে চির-নির্ব্বাসনে যেতে হবে তখন কান্নায় আর শোকে তার বুক ভেঙ্গে পড়লো। হায় এ কি মিলন!

বিদায় নিয়ে রোমিও কে চলে আসতে হলো।

এধারে জুলিয়েটের বাবা প্যারিস বলে একজনের সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন, কারণ, তিনি তো আর জানতেন না, যে জুলিয়েটের সঙ্গে রোমিওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে!

জুলিয়েটের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে, জুলিয়েট অমত করলো.....কারণ, তার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে! মেয়েকে কোনমতে বিয়েতে রাজী করতে না পেরে বুড়ো ক্যাপুলেট ভীষণ রেগে গেলেন। কি করতে হবে ঠিক না করতে পেরে জুলিয়েট ধর্ম্ম-যাজক লরেন্সের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরামর্শ নিতে গেলো।

তখন লরেন্স বল্লেন, দেখ তোমার মত নেই একথা জানিও না......আমি তোমাকে একটা জিনিষ দিচ্ছি......সেই জিনিসটা খেলে তুমি তু'দিন ঠিক মরার মত থাকবে...... তখন তোমাকে তোমার আত্মীয় স্বজনেরা গির্জ্জেতে নিয়ে আসবে, অবশ্য বিয়ে দেবার জন্যে নয়, কবর দেবার জন্যে। এধারে আমি রোমিওকে খবর দিয়ে নিয়ে আসবো, তু'দিন পরে জ্ঞান হলেই আমি আর রোমিও তোমাকে কবর থেকে তুলবো!

লরেন্সের কথায় রাজী হয়ে জুলিয়েট বাড়ী ফিরে এসে তার বাবাকে বল্লে যে, সে বিয়ে করতে রাজী। বুড়ো ক্যাপুলেট খুব খুসী হলো......তখন থেকেই বিয়ের আয়োজন চলতে লাগলো।

বিয়ের দিন সকালবেলা দাসীরা সব এলো জুলিয়েটকে সাজাবার জন্য। কিন্তু দেখে তখনও জুলিয়েট ঘুমুচ্ছে। কত ডাকাডাকি, কিন্তু জুলিয়েটের কোন সাড়া নেই......তার সর্ব্বাঙ্গ হিম......কি সর্ব্বনাশ......

দাসীদের চেঁচামেচিতে বাড়ীশুদ্ধ লোক ছুটে এসে দেখে জুলিয়েট ঘুমুচ্ছে, যে ঘুম আর আর ভাঙ্গে না। বিয়ের বাজনার বদলে বিসর্জ্জনের বাজনা বেজে উঠলো। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সবাই ফুলের মত মেয়েকে বিয়ের দিন কবরে শুইয়ে এলো।

রোমিও তখন মান্‌টুয়া শহরে ছিলেন। এ ধারে লরেন্স চিঠি দিয়ে এক দূতকে রোমিও-র কাছে পাঠালেন। সবই নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যেতো, কিন্তু দূত করলো দেরী।

এ ধারে রোমিও-র এক প্রিয় ভৃত্য জুলিয়েটের মৃত্যুর খবর পেয়ে রোমিওকে জানাবার জন্যে তাড়াতাড়ি মান্‌টুয়া গিয়ে উপস্থিত হলো। সে তো আর ভিতরের কথা কিছু জানতো না! নিজের চাকরের মুখে জুলিয়েটের সেই অকাল-মৃত্যুর কথা শুনে রোমিও শোকে উন্মাদ হয়ে গেলো...আমিও যাবো, আমিও তার পাশে থাকবো...সে যদি চলে গেল, আমি আর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবো কেন?

এ দিকে লরেন্সের পাঠানো দূত তখনও এসে পৌঁছয় নি। শোকে উন্মাদ হয়ে রোমিও বিষ সংগ্রহ করে ভেরোনার দিকে যাত্রা করলো—যে ভেরোনায় তার জুলিয়েট মৃত্যু-ঘুমে ঘুমিয়ে আছে!

কাউকে কিছু না জানিয়ে রোমিও সোজা একেবারে কবরস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলো! মাটীর নীচে এক ঘরে জুলিয়েটকে সমাহিত করা হয়েছিল। কবর-ঘরের দরজা খুলতে চেষ্টা করতেই পেছন থেকে হঠাৎ পুরুষ-কণ্ঠে একজন বলে উঠলো—

—সাবধান, রোমিও, কবরে ঢুকো না! তোমার মত একজন নীচ মণ্টেগু যদি ক্যাপুলেটদের কবরে ঢুকে কবর অপবিত্র করে......

রোমিও ফিরে দেখে, প্যারিস...যার সঙ্গে জুলিয়েটের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল।

রোমিও-র তখন মনে নেই, কে মণ্টেগু, কে ক্যাপুলেট্!

—কি সাহসে তুমি ভেরোনায় ফিরে এসেছ? জান এর শাস্তি কি? এর শাস্তি হলো মৃত্যু!

এই বলে প্যারিস তলোয়ার খুলে রোমিও-কে আক্রমণ করলো। যুদ্ধে প্যারিস হত হয়ে পড়ে গেল। মৃত্যুর লগ্ন এগিয়ে আসছে দেখে প্যারিস রোমিওকে ডেকে বল্‌লে...এখন আর কোন শত্রুতা নেই...আমার একটী অনুরোধ রাখবে?

...বল কি তোমার অনুরোধ...জেনে যাও, সে অনুরোধ আমি রাখবোই!

...জুলিয়েট যেখানে ঘুমিয়ে আছে, তার পাশে আমার মৃতদেহকে রেখে দিও!

এই বলে প্যারিস দেহত্যাগ করলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোমিও প্যারিসের মৃতদেহ নিয়ে জুলিয়েটের এক পাশে শুইয়ে দিল এবং আর এক পাশে নিজে শুলো...শেষবার জুলিয়েটকে আহ্বান করে, মনের সব কথা জানালো...সে কথা শুনলো শুধু কবরের মৃত্যু-হিম অন্ধকার! তারপর বিষটী বার করে খেয়ে ফেল্‌লে.....

এধারে ধর্ম্মযাজক লরেন্স বুঝতে পেরেছিলেন যে দূতের দেরীতে যাওয়াতে সব গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে...তিনি কবরে এসে দেখেন, তখন জুলিয়েট সবে মাত্র জাগছে...একি জাগরণ!

..বলুন, আমার স্বামী কোথায়? কোথায় আমার রোমিও? বলুন?

—কি বলবো! তুমি উঠে এস, এই মৃত্যু আর মিথ্যা-ঘুমের নীড় থেকে! আমার চেয়ে এক বড় শক্তি আমার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়েছে...এসো, তুমি চলে এস... বাইরে লোকজনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি...আমি আর থাকতে পারছি না......

এই বলে ধর্ম্ম-যাজক পালিয়ে গেল। জুলিয়েট চেয়ে দেখে, তার পাশে তার রোমিও ঘুমিয়ে আছে......হাতে তার তখনও বিষের পাত্র! যেটুকু বিষ পড়ে ছিল, তাই খেয়ে জুলিয়েট আবার ঘুমিয়ে পড়লো!

রোমিও-জুলিয়েট রয়ে গেল চির-অবিচ্ছেদ!

তাদের সেই মৃত্যুতে দূর হয়ে গেল সেই দুই চিরশত্রুর পরিবারের শত্রুতা!

ঘুম্-এ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ঘুম্ কি এম্‌নি থাকে সারাটি বছর?
এম্‌নি ঘুমিয়ে-পড়া,
এম্‌নি বৃষ্টি-ঝরা,
এম্‌নি কুয়াশা-ভরা,
চলে না নজর;
ঘুম্ কি ঝিমোয় বসে' সারা-টি বছর?

এখানে কি রাজ্যের মেঘের বাসা?
ওপরে মেঘের মেলা,
নীচেতে মেঘের খেলা,
দূরেতে মেঘের ভেলা,
আকাশে-ভাসা।
ঘুমেতে মেঘের দল বেঁধেছে বাসা।

এদিকে পাহাড় কেন দেয় পাহারা?
দাঁড়িয়ে পাহাড়-গায়,
নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
ঘুম্ শুধু ঘুম যায়
পাগল-পারা;
পাহাড়ের সারি তাই দেয় পাহারা!

ওদিকে আব্‌ছা রেখা কোথা নেমেছে ?
কোল্‌কাতা ক-ত নীচে,
পড়ে' আছে ক-ত পিছে,
ভাব্‌ছি সে যেন মিছে,
হারিয়ে গেছে ঃ
ঘুম্‌ থেকে কী গভীর খাদ্‌ নেমেছে !

এসেছি অচিন্‌ কোন্‌ হিমের দেশে ।
লাগ্‌ছে কী অদ্ভুৎ,
আমি যেন মেঘদূত
সাত-টি হাজার ফুট
উঁচুতে বসে'—
নাম্‌বো ইচ্ছে হোলে নীচের দেশে ॥

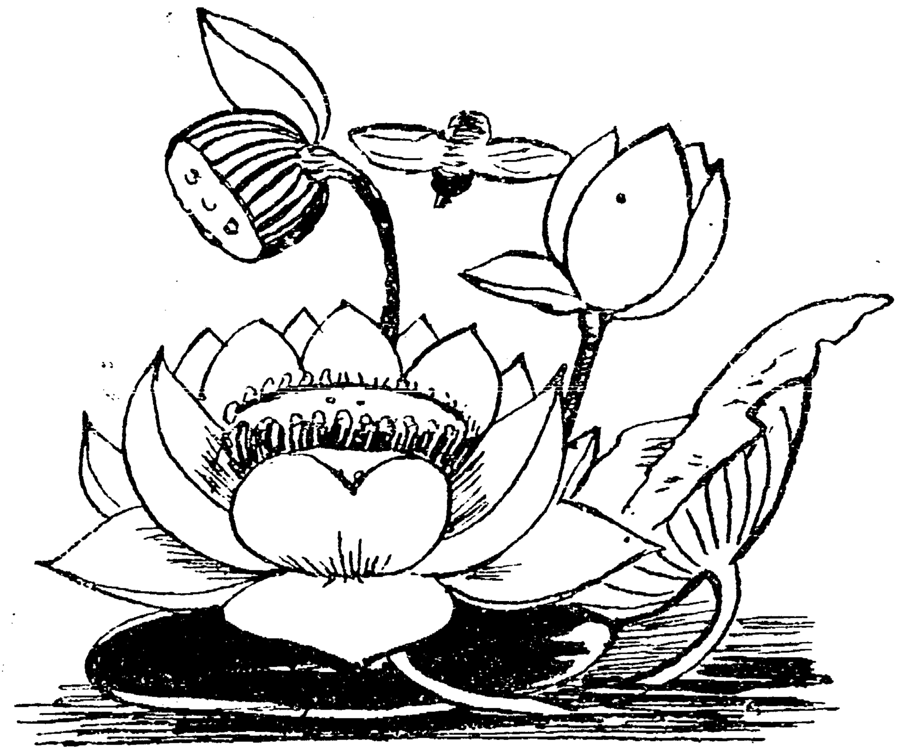

লেখক—?

অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে, মামার গলগ্রহ হয়ে উঠতে হয়েছিল। মামাদের অবস্থা এককালে ভালই ছিল ! কিন্তু সে কাল আর নেই কাজে কাজেই সে অবস্থাও অন্তর্হিত ; রয়ে গেছে শুধু সেই অবস্থার অভিমান আর সেই চাল।

বিশাল জমিদারীর মালিকানা থেকে সামান্য একজন প্রজায় পরিণত হতে খুব বেশী পুরুষ লাগেনি মামাদের। আমার মা ছিলেন দাদামশায়ের ছোট মেয়ে। দাদামশায়ের দুই সন্তান আমার মামা এবং আমার মা। মামার জন্মের পঁচিশ বছর পরে মাকে জন্ম দিয়ে দিদিমা ইহধাম ত্যাগ করেন। আমার মা যে সকলের বিশেষ প্রিয় পাত্রী হতে পারেন নি কেন কারণটা বোঝা যায়।

তোমরা কেউ কেউ হয়ত ভাবছ যে হঠাৎ আমার বংশ পরিচয় সুরু করলাম কেন ? তার কারণ আছে। বাবার মৃত্যুর পর জীবনের খানিকটা অংশ আমার মামার বাড়ীতে কেটেছিল এবং সেই অংশে যে উত্তেজনা এবং যে বিপদজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, সেই কাহিনীর জন্য বংশ পরিচয় খানিকটা প্রয়োজন বৈকি !

আমার মামা ছিলেন এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বিশাল দীর্ঘ দেহ, চোখে মুখে অদ্ভুত সব কুঞ্চন, জীবন যেন সেখানে নানা ভাবে নানা জটিল ভাষায় তার রহস্য লেখা লিখে গেছে। মামাকে কখনও হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এ ছাড়া মামার আর একটা বিশেষত্ব ছিল। মামাকে দেখতাম সব সময়ে একটা চাদর জড়িয়ে থাকতেন। মামার বাড়ী আসার পর সে রহস্য আবিষ্কার করে-ছিলাম একদিন। আমার মামা চিরজীবন অবিবাহিত, তাই সমস্ত দেহে মুখে তাঁর একটা কঠোরতা। মানুষের মনের স্বাভাবিক স্নেহ ফল্গুধারা যেন এই একটা মানুষের জীবনে কঠিন পাষাণ হয়ে জমে গিয়েছিল।

আমার মায়ের জন্য তাঁর নিজের মাকে হারিয়ে, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক মাকে মামা কখনও ভাল চোখে দেখেন নি—অন্ততঃ আমাদের তাই মনে হোত। এবং বাবার মৃত্যুর পর নিরুপায় হয়ে মায়ের হাত ধরে যখন মামার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে হোল, তখন আশ্রয় পাওয়া গেল বটে কিন্তু শান্তি পাওয়া গেল না।

আমার অবশ্য অতটা তলিয়ে বোঝবার বয়স তখন নয়। আমার বয়স তখন দুদিকে টানছে আমায়। একদিকে খেয়াল খোলা কল্পনাময় স্বাচ্ছন্দ্য জীবন আর একদিকে জীবনের কঠোরতা, যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি, মায়ের দুঃখ লাঘব করার ইচ্ছা। যৌবন আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে দোদুল্যমান আমার জীবন।

অভিরামপুরে অতীত গৌরবের জীর্ণ স্মৃতি চিহ্ন বয়ে মামাদের কত বিক্ষত বিশাল বাড়ীটা যমের মত তখনও দাঁড়িয়েছিল। সেই বাড়ীটায় আমরা যখন উঠলাম সেবার মামা তখন একা

থাকতেন সেখানে। অবশ্য একা, পরিবারবর্গের দিক দিয়ে। তা ছাড়া একজন পুরোণ চাকর ছিল মামার, আর একটা ঠিকে ঝি এসে কিছু কিছু কাজ করে দিয়ে যেত। আমরা আসার পর থেকে বাড়ীর অধিবাসী হলাম আমরা চারজন। বিশাল বাড়ীখানার আর একটা ধূলি ধূসরিত ঘর খোলা হোল আমাদের জন্যে। আজও মনে আছে সেই প্রথম রাতের একটা দমকা হাওয়ায় জীর্ণ বাড়ীটার বন্ধ জানালা দরজাগুলো তাদের বন্ধ দশাতেও যখন ভয়ঙ্কর খট্ খট্ করে উঠেছিল মনে হয়েছিল অতীতের কোন অতৃপ্ত আত্মা যেন ভয়ঙ্কর ঠাট্টার ছলে শুষ্ক কাষ্ঠ হাসি হাসছে।

পনেরো বছর বয়েস কলকাতায় কাটিয়ে গ্রামে এসে কি রকম ভয়ানক একটা ফাঁকা লাগত আমার। অন্ততঃ প্রথম প্রথম। কলকাতার কোলাহলে অভ্যস্ত কাণে গ্রামের সেই প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা বাজত বোঁ বোঁ করে, আর দিগন্ত-বিস্তৃত সেই ঢেউ খেলান মাঠ, উদাস আকাশ মনে জাগিয়ে তুলত নিঃসঙ্গতা। মামার বাড়ীতে থাকতাম বটে, কিন্তু দিনান্তে একবারও মামার দেখা পেতাম না। আর চাকর হরিদাস—এমন অল্পভাষী গম্ভীর লোক জীবনে আমি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম—গাঁয়ের লোক কোনদিন মামার বাড়ীর ছায়াও মাড়াত না। একেই মামার বাড়ীটা অপেক্ষাকৃত লোকালয় ছাড়িয়ে নির্জ্জন জায়গায় অবস্থিত তার ওপর মানুষের সাথে সংযোগের অভাবে মনে হোত আমরা যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন এক ভিন্ন গ্রহে বাস করছি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা মাঠে মাঠে একা ঘুরে বাড়ী ফিরেছি। যে বয়সে সঙ্গীর সব চেয়ে প্রয়োজন, যে বয়সে যে কোন কাজে ব্যপৃতির অভাবে মানুষ অমানুষ হয়ে যেতে পারে, সেই বয়সের নিঃসঙ্গতা আমাকে নিশ্চয় পীড়া দিচ্ছিল।

মা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন "তোর এখানে ভাল লাগছে না, নারে খোকা?"

চুপ করে রইলাম।

মায়ের চোখ দুটো জলে ভরে এল—"আর যে আমাদের কোন উপায় নেই বাবা!"

বললাম "তুমি ভেবোনা মা, বেশ ভাল লাগছে আমার। তবে কিছু করবার নেই এই যা! তা মা আমি ত এখানে ইস্কুলে ভর্ত্তি হলেই পারি।"

নিরাভরণ হাতটার পানে তাকিয়ে কি ভেবে মা বললেন "হুঁ! দাদাকে বলে দেখব।"

"হ্যাঁ মা, মামাকে দেখতে পাইনা কেন? মামা কি রকম লোক?"

মা বললেন "চুপ চুপ খোকা! মামার সম্বন্ধে কোন কথা বলিস নি। তোর মামা ভীষণ রাগী লোক।"

"মামা কি করে মা, সারাদিন ? সারাদিন মামার ঘর বন্ধ থাকে কেন ?"

"নানা লোক নানা রকমের হয়। তোর মামা ওই রকম।"

কথা হচ্ছিল আমাদের ঘরে। ঘরের দরজা পার হয়েই মস্ত দালান। দালানের গায়ে গায়ে অসংখ্য বন্ধ ঘরের সার। এককালে দালানের থামগুলোর সব পঙ্খের কাজ করা ছিল

হরিদাস এগিয়ে এল

আজকাল সেগুলো দাঁত বার করে আছে। থামের মাথায় মাথায় পায়রা আর চামচিকের দল আপোষে মিটমাট করে বাসা বেঁধেছে। সমস্ত দালানটায় দুপুরেও একটা থমথমে অন্ধকার জটলা বেঁধে থাকে।

মায়ের কথা শেষ হতেই দালানে একটা থামের আড়ালে যেন একটা ছায়া নড়ে উঠল। মা চমকে উঠলেন।

"কে ? কে ওখানে ?"

গম্ভীর গলায় উত্তর এল—"কেন ?"

"ও: হরিদাস ? কি করছ ওখানে ?"

"কি করছি ? হরিদাস এগিয়ে এল আমাদের দিকে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কালো অসুরের মত শরীরটা যেন তার আরও বীভৎস দেখাচ্ছিল।"

"এতদিন কি করছি এ প্রশ্ন কেউ করেনি আমায়।"

হরিদাস চলে গেল।

মা বিড় বিড় করে বললেন "চাকর মনিব সব অদ্ভুত এ বাড়ীর !"

সন্ধ্যার পর তুলসীতলায় বাতী দিয়ে মা আমাকে সঙ্গে করে মামার ঘরের সামনে এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। মা দরজায় টোকা দিলেন।

"কে ?" সাড়া এল ভেতর থেকে। সাড়া ত নয় যেন একটা ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জ্জন।

"আমি দাদা।"

"কি চাই ?"

"খুব ব্যস্ত আছ কি দাদা ?"

"দরজা খোলা আছে এস।"

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম মায়ের সঙ্গে। দরজা ঠেলবার সময় লক্ষ্য করলাম মায়ের হাতটা কাঁপছে।

অগ্রগামী

সাব্‌মেরিণ

সাব্‌মেরিণ ! সাব্‌মেরিণ নামটার সঙ্গে কী মহা ভয় ও বিভীষিকার স্মৃতি জড়িত ! মহাযুদ্ধের সময় মহাসমুদ্রের কাহিনী মৃত্যু ও হাহাকারে ভরে দিয়েছে সাব্‌মেরিণ। মহাসমুদ্র দিয়ে জাহাজ চলেছে, গভীর রাত্রি। হঠাৎ জাহাজ দুলে উঠল, ঘুমন্ত যাত্রীরা জেগে পড়ল, তারপর যাত্রীদের আর্ত্ত চীৎকার, জাহাজ ডুবির মহাভয়ঙ্কর পালা ! কখন সাব্‌মেরিণ জলের তলায় নিঃসাড়ে এসে জাহাজের খোল ফুটো করে দিয়েছে ! হয়তো জাহাজ চলেছে, দিনের প্রখর আলোয় চারিদিক পরিস্কার, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ভুস করে জলের তলা থেকে উঠে এলো সাব্‌মেরিণ ! জাহাজ সরাতে না সরাতে সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে ছুটে এলো টর্পেডোর পর টর্পেডো, প্রকাণ্ড জাহাজখানা চক্ষের পলকে ফেটে ছিটিয়ে পড়ল আকাশে।

মহাসমুদ্রের জাহাজদের মূর্ত্তিমান ভয় এই সাব্‌মেরিণ। কিন্তু ভয় সাব্‌মেরিণেরও একটু আধটু আছে। সাব্‌মেরিণ বড় ঠুনকো। বড় জাহাজ টের পেলে আর রক্ষা থাকতো না। একটা কামানের গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হত সাব্‌মেরিণ। আর একটা ভয় সাব্‌মেরিণের, যদি জলের তলায় হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ে। যদি জলে ডুবে উঠতে না পারে। নিঃশ্বাস নেবার যেটুকু ব্যবস্থা আছে, তাতে কতদিন আর অতলে থাকা চলে ! তারপর সাব্‌মেরিণ জল থেকে টেনে তোলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। অল্প দিনের ভিতর আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পর পর তিনটি সাবমেরিণ দুর্ঘটনা হয়ে গেল। তিনটি সাবমেরিণই জলের তলায় ডুবে আর উঠে আসতে পারেনি। জলের তলায় সাবমেরিণ যে কত অসহায়, তা বুঝতে আর কারো বাকী নেই। সাবমেরিণ মহলে তো মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

তবু তো আজকাল সাবমেরিণ নির্ম্মাণে কত কৌশল কত বুদ্ধি খরচ করা হচ্ছে। আজকালের সাবমেরিণের সঙ্গে প্রথম যুগের সাবমেরিণের আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রথম সাবমেরিণ তৈরী করেন একজন ডাচম্যান, নাম কর্ণেলিয়াস্ ড্রেব্‌বেল্। টেম্‌স্ নদীর তলায় বারোটি নাবিক নিয়ে তিনি সাবমেরিণ চালিয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেন। তারপর ডে নামে একজন, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জলের তলায় সাবমেরিণে বারো ঘণ্টা থাকবেন সংকল্প করে ডুব দেন। সাবমেরিণ শুদ্ধ তাঁর সলিল সমাধি হয়। আমেরিকার বুশ্‌নেল্ সাহেব লড়াইয়ের সাবমেরিণ নির্ম্মাণ করেন। তাঁর তৈরী সাবমেরিণের তলা থেকে গুলি গোলা ছোঁড়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফুল্‌টন্ সাহেব যে সাবমেরিণ তৈরী করেন তার আকৃতি অবিকল একটা ডিমের মত

ছিল। তিনি ২৫ ফুট জলের তলায় গিয়ে পূরো চার ঘণ্টা কাটিয়ে আসেন। আর আজকালের সাবমেরিণ ? জলের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারে, বায়ুবেগে অতলপথে চলতে পারে।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান—এই চারিটি দেশেরই বড় বড় সাবমেরিণ আছে। কিন্তু ইটালীরই হয়তো সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সাবমেরিণ। ইটালীর সম্ভবতঃ ১০০র বেশ কিছু বেশী সাবমেরিণই আছে। মহাযুদ্ধের পর প্রাণপণ চেষ্টা করেও জার্ম্মানী তার সাবমেরিণ সংখ্যায় কিম্বা আকারে বেশী বাড়াতে পারে নি। সোভিয়েট রাশিয়ার সাবমেরিণের সংখ্যা ও আকার সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া গেছে কিনা বলা কঠিন। অনেকের বিশ্বাস সোভিয়েটের ১০০র বেশ কিছু বেশী সাবমেরিণ এবং বিশাল সাবমেরিণ আছে।

এতকাল সাবমেরিণ যুদ্ধের একটা অস্ত্র হিসেবেই চলে এসেছে। সম্প্রতি আবিষ্কারের ইতিহাসে, জ্ঞানের ইতিহাসে সাবমেরিণের নাম উঠেছে। বিখ্যাত অষ্ট্রেলিয়ান আবিষ্কারক সার হিউবার্ট সাবমেরিণে মরুদেশ যাবার উদ্যোগ করছেন। সাবমেরিণ এই রকমে তৈরী হচ্ছে যে অনায়াসে বরফের চাকের তলা দিয়ে মেরুদেশে পৌছতে পারবে। শুধু তাই নয়, মরুদেশে যাতে দীর্ঘকাল এই সাবমেরিণে নিরাপদে থাকা যায়, সেই রকম মজবুত হবে এই সাবমেরিণ, উত্তাপের চমৎকার ব্যবস্থা থাকবে। হিউবার্টের সঙ্গে এই অভিযানে যাচ্ছেন এল্‌স্‌ওয়ার্থ। এই এল্‌স্‌ওয়ার্থই বিখ্যাত আবিষ্কারক অ্যামুণ্ডসেন ও নোবাইলের সঙ্গে মেরুঅভিযানে গিয়ে কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। সার হিউবার্ট ও এল্‌স্‌ওয়ার্থের আকাঙ্ক্ষা দীর্ঘকাল মেরুদেশে থেকে মেরুজীবন সম্বন্ধে গবেষণা করবেন।

এদিকে ক্যাপটেইন্ উইল্‌কিন্‌স্ সাবমেরিণে এ্যান্‌ট্‌আর্ক্‌টিক্ প্রদেশে রওণা হবার আয়োজন করছেন। বরফের পঞ্চাশ ফুট তলা দিয়ে উইল্‌কিন্‌স্ সাবমেরিণ চালিয়ে নেবেন। উইল্‌কিন্‌সের সাবমেরিণ ১০৫ ফুট লম্বা। তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার ধারাবাহিক অনাবৃষ্টির কারণ আবিষ্কার করা। তাঁর ধারণা, এ্যান্‌ট্‌আর্ক্‌টিক্ প্রদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার এই নিয়মিত অনাবৃষ্টির একটা নিকট-সম্পর্ক আছে।

সাবমেরিণ অভিযানের ইঙ্গিত উইল্‌কিন্‌স্ পান তাঁর আবিষ্কারক গুরু ষ্টিফ্যান্‌সন্‌এর কাছ থেকে।

গাছের কথা

বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়ে অতিকায় বটগাছ দেখে অবাক হয় নি, তোমাদের ভিতর এরকম কজন আছে ! যারা কলকাতায় থাকো, তাদের কথাই অবশ্য বলছি। কিন্তু যারা সেই অতিকায় গাছ দেখে অবাক হয়েছ, আর একটা কথা ভেবে কি তারা আরো অবাক হয়ে যাও নি ? একটা ছোট বীজ, সেই বীজ হচ্ছে আজকালের অতিকায় এই গাছ, এ কথা তোমাদের কজন বিশ্বাস করতে পেরেছো !

কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো ? এই এত ছোট থেকে এত বড় হওয়ার চেয়ে ঢের বিস্ময়কর হচ্ছে শুধু বীজ থেকে গাছ হবার কাহিনী, তা সে গাছ বিশাল কিম্বা ক্ষুদ্র যাই হোক।

গাছের বীজ—অদ্ভুত এর কার্য্যকলাপ। ধূলোয় ফেলে দাও একটা বীজ, মাটিতে পুঁতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই বীজ চলে যাবে স্তর ভেদ করে মাটির বুকে। আর এই বীজের সোজা উল্টো নেই, যে ভাবেই

তাকে ফেলে দেওনা কেন, শিকড় চালাবে সে মাটির বুকে। মাটির উপর কখনো উঠবেনা শিকড়, তার লক্ষ্য চিরটাকাল পাতাল-মুখো।

তার পরের আশ্চর্য্য ব্যাপার, যদি ফাঁকা জমিতে পড়ে বীজ, গাছের শাখা প্রশাখা চারিদিকে সমান ছড়িয়ে যাবে। মনে হবে ডালপালা পাতার মস্ত একটা ছাতা, গাছের কাণ্ডটা হচ্ছে ছাতার বাঁট। কিন্তু যদি দেওয়াল কিম্বা বাড়ীঘর কিম্বা কোনো কিছুর ধারে পুঁতে দাও বীজ, শাখা প্রশাখা ছড়াবে একদিকে। যেদিকে বাধা, সেদিকে শাখা প্রশাখা ছড়ানোর কোনো চিহ্নই দেখা যাবে না।

গাছ যেন বুদ্ধি খরচ করে বেড়ে ওঠে

এই যে বীজ পথ খুঁজে মাটির বুকে চিরকালটা পৌছচ্ছে, শিকড় চিরকাল নীচেয় রওণা হচ্ছে, শাখা প্রশাখা চিরকাল বাধার সঙ্গে কোনো লড়াই না করে ফাঁকা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এই সবের ভিতর যেন বুদ্ধির পরিচয় পাই।

গাছ যেন বুদ্ধি খরচ করে বেড়ে ওঠে। গাছের প্রাণ আছে, এতে যেন সবটা বলা হল না। মনে হয় গাছের বুদ্ধিও আছে।

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

কবীর

কবীর কবে জন্মালেন, তাঁর জাত কি, এ বিষয়ে সঠিক খবর আজও পাওয়া যায়নি। হিন্দুরা বলে তিনি হিন্দু, মুসলমানরা বলে তিনি মুসলমান, কবীর শুধু বলেন, তিনি জোলার ঘরে জন্মেছিলেন। হয়তো তিনি ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কিম্বা তার কিছু আগেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

জোলার ঘরের ছেলে, বড় হয়ে কবীর প্রথমটা পেলেন উঁচু জাতের লোকদের ঘৃণা। এতবড় জ্ঞানী তপস্বী রামানন্দ, তিনি বললেন, বাপু তুমি অস্পৃশ্য। তোমাকে দীক্ষা দিই কি করে? কিন্তু ঈশ্বর যে রামানন্দের হাতেই কবীরের দীক্ষার আয়োজন আগে হতেই করে রেখেছেন! একদিন কাশীতে গঙ্গার ঘাটে চলতে চলতে রামানন্দ এক অস্পৃশ্যের গায়ে মনের ভুলে পা দিলেন, অশুচির ভয়ে বলে উঠলেন, রাম, রাম, রাম! সেই অস্পৃশ্য আর কেউ নয়, কবীর। রামানন্দের তিনবার রামনাম উচ্চারণে তাঁর দীক্ষা হয়ে গেল।

সরল মনে পরকে যা দিই, ঈশ্বর তা পরের হাত দিয়েই আমাদের ফিরে দেন, কবীরের জীবনে নানা ঘটনায় এর প্রমাণ হয়ে গেছে। একদিন তাঁতে একখানা কাপড় বুনে কবীর হাটে বেচতে যাচ্ছিলেন, ঘরে খাবার কিনে আনবেন। পথে এক ভিক্ষুককে দেখে কবীরের দয়া হল, কাপড়খানা দিয়ে দিলেন। মাথা হেঁট করে কবীর বাড়ী ফিরলেন। এসে দেখেন মা খাবার সাজিয়ে বসে আছেন। কবীর বললেন, মা, এত খাবার কোথায় পেলে? মা বললেন, কি আশ্চর্য্য! তুই না লোকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দিলি? সেদিন কবীর বুঝলেন, ভক্ত যেমন ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকেন, ঈশ্বরও তেমনি ভক্তের কুটীরে দাস হয়ে তার সেবা করেন। সকল বিপদে রক্ষা করেন তিনি। দুষ্ট লোকের কথায় সেকেন্দার লোদি হাত-পা বেঁধে কবীরকে যমুনার জলে ফেলে দিলেন, কবীর জলে ডুবে গেলেন, কিন্তু তারপরে দেখা গেল কবীর হাসি মুখে যমুনার অপর পারে দাঁড়িয়ে

আছেন। হাতীর পায়ের তলায়, আগুনে তার মৃত্যু হয়নি। এগুলি হয়তো গল্প, কিন্তু গল্প হলেও এই কল্পিত ঘটনাগুলির মূল কথাটি বড় সত্য। ঈশ্বর যাকে রাখেন, তার মৃত্যু নেই। সকলের উপরে ঈশ্বর!

খারাপের সংসর্গ এড়িয়ে যাঁরা ভালো থাকতে চান, কবীর তাঁদের দলে নন! তিনি খারাপকে ভালো করতেন, লোহাকে করতেন সোনা। কত অপবিত্র মানুষ তাঁর সংস্পর্শে এসে পবিত্র হয়ে গেছে।

মানুষে মানুষে ভেদ নেই, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ভেদ নেই, এই হচ্ছে কবীরের বাণী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শব সমাধি দেওয়া হবে কিম্বা চিতায় দেওয়া হবে, হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের ভিতর এই নিয়ে যখন মহা তর্ক চলছে তখন চাদর তুলে দেখা গেল, শব নেই, আছে শবের বদলে রাশি রাশি ফুল। সেই ফুল খানিকটা মুসলমানেরা গোর দিলে, খানিক হিন্দুরা চিতায় দিলে।

আর কিছুই কিছু নয়, জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত হচ্ছে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে ভালোবাসো। মানুষকে, পশুপক্ষী সকলকে ভালোবাসো, তাদের ভালোবাসতে পারলেই তবে ঈশ্বরকে যথার্থ ভালবাসতে পারা যায়। আর এই ভালোবাসার আর এক নামই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বাস অবিশ্বাস নেই, কোনো প্রশ্ন নেই, এক মনে অকপটে ঈশ্বরকে জীবনকে ভালবাসতে পারলে, ভক্তি করতে পারলে পাওয়া যায় ঈশ্বরকে। তাই কবীরের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে 'ভক্ত কবীর'।

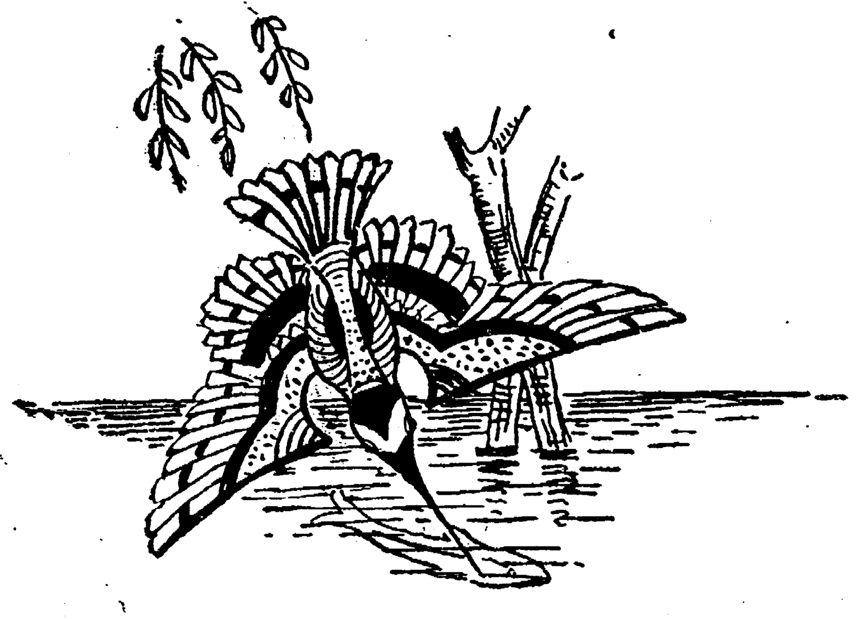

কে কার গুরু ?

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

শঙ্করটা বন্ধু হ'লেও ওর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা হয়—এই মানুষ ক্ষেপানো দারুণ গরমের দুপুর-গুলো কোথা দিয়ে যে কেটে যাচ্ছে তা বুঝতেই পার্চ্ছি না! ওর বাইরের ঘরটায় স্রেফ দারজিলিং এর আবহাওয়া এনে ফেলেছে। ঘরের বাইরে চতুর্দ্দিকে 'খস্ খস্' টাঙ্গানো মধ্যে একখানি "ডেটন" ফ্যান বন্ বন্ করে ঘুরে চলে—এ ছাড়া সরবতের গেলাসের দেখা মেলে মাঝে মাঝেই। আমরা কয়টী বন্ধু রোজকার মত সেদিনও জমায়েত হয়েছি শঙ্করদের বাইরে ঘরে। কলকাতায় থেকে দারজিলিংএর আরাম কে আর না পেতে চায়! ফ্যানের তলায় শুয়ে শুয়ে চলেছে আমাদের খোস গল্প, এমন সময় কোথা থেকে ধূমকেতুর মত নিরঞ্জন এসে উপস্থিত। আমরা এতক্ষণ স্বর্গে বিচরণ করছিলাম—নিরঞ্জনের এই আকস্মিক আবির্ভাবে এক মুহূর্ত্তে আমাদের স্বর্গ থেকে হোলো মর্ত্ত্যে পতন। নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম সকলে—"ওকি ও এখনি ভূত দেখে এল নাকি?"

সকলেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম, "ব্যাপার কি হে নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন শুধু বল্লে "উঃ, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড রে বাবা!"—চোখের মণিদুটো তার কপালে ঠেকবার যোগাড়।

নরেশ বিরক্ত হয়ে বল্লে—"তা ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা কি—সেটাই দয়া করে বল্ না।" নিরঞ্জন এবার প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বল্লে—উঃ, মার্ল্লে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি,—সোজা নাক বরাবর—নাক দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান!"

বিশু বল্লে "কে মার্ল্লে—কার নাক বরাবর, অজ্ঞানই বা হোলো কে?"

নিরঞ্জনটার ঐ এক অদ্ভুত অভ্যাস—ওর কথার মধ্যে প্রথমটায়—'কর্ত্তা, কর্ম্ম' খুঁজে পাওয়া ভার।

নিরঞ্জন বল্লে"—আসছিলাম বাসে—দারুণ ভীড়! কণ্ডাকৃটরটা পাঞ্জাবী ইয়া জোয়ান। একটী ছোকরা বছর বাইশ তেইশ বয়স হবে—খুব যে গায় জোর আছে বলে মনে হয় না—কণ্ডাক্টরকে বল্লে—"আউর আদমী মাৎ উঠাও" কণ্ডাক্টর তার উত্তর কি একটা বল্‌তেই ছেলেটী বল্লে—। মু সামালকে বাত্ বোলো।" কণ্ডাক্টরটা উঠ্‌লো রুখে—একটা গালাগালিও দিল যেন মনে হোলো; ছেলেটী আর কোন কথা না বলে—ঐ ভীমকায় কণ্ডাক্টরটীর নাকে লাগাল সজোরে একটী ঘুঁষি—কণ্ডাক্টরটী সঙ্গে সঙ্গে কাৎ এবং একেবারে অজ্ঞান—নাক দিয়ে তখন তার ভয়ানক রক্ত বার হচ্ছে। বাস গেল থেমে—লোকে লোকারণ্য, পুলিশ এল—ছেলেটী নির্ব্বিবাদে থানায় গেল পুলিশের সঙ্গে; কণ্ডাক্টরটীকে দেখলাম হাস-পাতালে নিয়ে গেল।"

ব্যাপারটা শুনে আমরা সকলেই বেশ একটু অবাক হলাম, ছেলেটীর সাহসের তারিফও করতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুঁষির বহরেরও। একটী ঘুঁষিতে ভীমকায় পাঞ্জাবী কাৎ এবং অচৈতন্য—ঠাট্টা নয়!

নির্ম্মল হঠাৎ বলে উঠ্‌ল''—এ আর এমন কি—ছেলেটার ঘুঁষিটা হয়ত পাঞ্জাবীটার নাকে বেটক্করে লেগে গিয়েছিল—হঠাৎ ওরকম আচমকা আক্রমণ কর্ল্লে সবাই পারে পাঞ্জাবী কাৎ কর্ত্তে। হোতো খানিকক্ষণ ধরে মারামারি, তবেই বোঝা যেত কার কত বাহাদুরী।—হ্যাঁ, সে দেখেছিলাম, সেবার জয়পুরে, আমার মামাবাড়ীতে।

প্রিয়তোষ বল্লে, "কি রকম ?"

নির্ম্মল সুরু কর্ল্লে। আমরা জানি, নির্ম্মল কাকেও কোনও গল্প বলে কখনও বাহাদুরী নিতে দেবে না, ও তার উপরও রং চড়িয়ে আর একটা গল্প বলবেই—ছুটানো ওর একটা অভ্যাস, কিম্বা পেশাও বলা যেতে পারে। কখন যে কি "স্পীডে" ছুটোবে তা বলা শক্ত—কখনও বা 'এক্সপ্রেসের' স্পীড আবার কখনও বা স্রেফ পাঞ্জাব মেলের।

যাই হোক, নির্ম্মল বল্লে, "সেবার জয়পুরে, আমার মামার বাড়ীতে গেছি। একদিন বৈকালে গেলাম ওখানে একটা ফুটবল 'ম্যাচ' দেখতে, সঙ্গে ছিল আমার মামাত ভাই। বেশ ম্যাচ চলেছে, হঠাৎ দেখি একটু দূরে মাঠের এককোণে দর্শকদের মাঝে মহা গোলমাল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি, এক বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে এক গোরার। গোরাটা নাকি ছেলেটীর পায়ের উপর তার বুট তুলে দিয়েছিল এবং সে কথা তাকে বলাতে সে ছেলেটীকে দেয় গালাগালি। আমি গিয়ে দেখলাম, ঝগড়া চলেছে—ছেলেটীর চোখমুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। সাহেবটা হঠাৎ ছেলেটীকে মার্ল্লে একটা ধাক্কা; ছেলেটাও ধাক্কাটা সামলে নিয়েই সাহেবের ঘাড়ে লাগাল প্রচণ্ড এক ঘুঁষি। সাহেবটা প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেল; তার হাতে একটা মোটা 'ষ্টিক' ছিল পরের মুহূর্ত্তেই সেইটা দিয়ে ছেলেটীর মাথায় মারল প্রচণ্ড জোরে—উঃ ছেলেটার মাথাটা ফেটে দুফাঁক হয়ে গেল, দরদর করে রক্ত ছুট্‌তে লাগল। ছেলেটী প্রথমটায় পড়ে গেল মাটীতে; একটু পরেই মাথাটা চেপে ধরে কোনও রকমে উঠে দাঁড়াল; তারপর বল্‌লে বিশ্বাস কর্ব্বে না, সর্ব্বাঙ্গ তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে—সেই অবস্থায়, পাশে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হাতে ছিল একটা লাঠি, সেইটা না টেনে নিয়ে সাহেবটার মাথায় বিদ্যুৎবেগে লাগাল সজোরে দুটী কি তিনটী ঘা—সাহেবটা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান, ছেলেটীও তক্ষণি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এর পর পুলিশ এল, এ্যাম্বুলেন্স এল—দুজনকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। "ছেলেটী শুনেছিলাম মাস তিনেক শয্যাশায়ী ছিল আর সাহেবটাও নাকি ছ'মাস পড়ে ছিল হাসপাতালে।

আমরা দেখলাম যে আজ নির্ম্মল একেবারে 'মেলগাড়ীর' স্পীড ছেড়েছে। নির্ম্মল থামতেই সমীর বল্‌লে," হ্যাঁ এ একটা গল্প করবার মত ব্যাপার বটে ! আমিও একবার একটা মারামারি দেখেছিলাম —এখনও সে কথা ভাবলে গায় কাঁটা দিয়ে ওঠে। "নির্ম্মল ভদ্রতার খাতিরে বল্লে "ব্যাপারটা কি ?"

সমীর সুরু কর্ল্লে, সমীরটার জন্য দুঃখ হোলো—ভাবলাম সমীটা ত এ সব বিষয়ে নেহাৎ অপদার্থই জানি। বেচারা হয়ত কোনও একটা সত্যি ঘটনাই বল্‌বে, নির্ম্মলের এ 'পাঞ্জাব-মেলী' স্পীডের ছোটান গল্পের পাশে সে গল্পের একেবারে—গরুর গাড়ীর স্পীড হয়ে যাবে নিশ্চয়।

সমীর সুরু কর্ল্লে—"মারামারি বল্‌লে ভুল বলা হয়—খুনোখুনিই বলা চলে সে ব্যাপারটাকে।" আমরা সব চমকে উঠলাম; সমীরটা গ্র্যাণ্ড আরম্ভ কর্ল্লে ত ! উৎসাহিত হয়ে উঠলাম সব শুনবার জন্যসত্যিই।

সমীর বল্লে, "সে বার গেছি আফগানিস্থানে, আমার এক পিশেমশায়ের সঙ্গে—"

বিশুটা আমার গায়ে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়া বল্লে "আফগানিস্থান একেবারে ?—আজ নির্ম্মলটাকে মার্ব্বে নাকি সমীর ? কার মধ্যে কি থাকে বোঝা ভার।"

সমীর বলতে লাগল, "একদিন বিকাল বেলা চলেছি একটা রাস্তা দিয়ে, দেখি দুটো আফগান আসছে আমার দিকে। বেশ আসছিল তা'রা গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে। হঠাৎ একজন আর একজনকে কি একটা কথা বলতেই তার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ওঃ—" বলে সমীর একটু থামল।

আমরা এবার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি বেশ একটু।

একটু থেমেই সমীর আবার বল্লে,—'সঙ্গে সঙ্গে সে কর্ল্লে কি—তার কোমরে ঝুল্‌ছিল প্রকাণ্ড একটা ছোরা সেইটা খাপ থেকে খুলে নিয়ে সটাং বসিয়ে দিল অন্য আফগানটার বুকে; ছোরাটা প্রায় তার পিঠ পর্য্যন্ত বিঁধে গেল। সে আফগানটা সঙ্গে সঙ্গে মাটীতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগল। আগেকার আফগানটা যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে চলতে লাগল আবার। ঐ আফগানটা ঐ রকম ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে সেই ছোরাটাকে অতি কষ্টে তার নিজের বুক থেকে টেনে বার কর্ল্লে; তারপর কোনও রকমে টলতে টল্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে ঐ আফগানটার পিছন দিক থেকে তার ঘাড়টা ধরে সেই ছোরাটা তা'র পিঠে দিল বসিয়ে—ছোরাটা ওর বুক পর্য্যন্ত গেল বিঁধে। ওটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল মাটীতে—তারপর এটাও। আমিও এই দৃশ্য দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়—অত শীতেও আমার তখন ঘাম ঝরছে। ঐ আফগান দুটোর তার-পর কি হোলো, মরল কি বাঁচল, তা অবশ্য আমি বলতে পারিনে।" সমীর চুপ কর্ল্লে'—আমার মনে হোলো ওর ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি খেলে গেল।

নরেশটা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল, "নির্ম্মল আজ ফ্ল্যাট্‌—উঃ, সমীরটার পেটে পেটে এত শয়তানী ! নির্ম্মলটা ছুটোয় মেলের স্পীডে, সমীরটা আজ একেবারে উড়িয়ে ছাড়ল। আচ্ছা সমীর, ছোরা বসে গেল বুক থেকে পিঠ পর্য্যন্ত, সেই ছোরা নিজের বুক থেকে উঠিয়ে তারপর লোকটা ছুট্‌লে পিছু পিছু, এবং শেষ পর্য্যন্ত ঘায়েলও কর্ল্ল অন্যটাকে সেই ছুরির ঘায়ে—বলিহারী সমীর, জিতা রহো ভাই।"

সমীর একটু মৃদু প্রতিবাদ করে বল্লে,—"না, না, সত্যি ঘটনা, সত্যি ঘটনা।"

বিশুটা গম্ভীর ভাবে বল্লে, "নিশ্চয়ই—তারপর একটু হেসে বল্লে—সমীর আজ থেকে তুই নির্ম্মলের গুরু।"

নির্ম্মলের মুখটা কাল হয়ে উঠেছে।

শঙ্কর এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল—সে খুব উপভোগ করা সত্ত্বেও নির্ম্মলের এই অবস্থায় যেন একটু দুঃখই অনুভব কর্চ্ছে মনে হোলো; মুখ তুলে তাকাল তার আদিদার দিকে। এই আদিত্য বাবু ভদ্রলোকটী আজ সকালে এসেছেন শঙ্করদের বাড়ী। ইনি শঙ্করের কি রকম দাদা হ'ন—আমাদের চেয়ে বয়সে সামান্যই বড়। সামান্য পরিচয় হয়েছিল মাত্র ওঁর সঙ্গে একটু আগে। একটা চেয়ারে বসে এতক্ষণ একটা বই পড়ছিলেন—আর এক একবার মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হেসে আবার পড়তে সুরু কর্চ্ছিলেন।

শঙ্কর একটু হেসে বল্লে, "আদিদা, জান নাকি তুমি কোনও গল্প মারামারির বা খুনোখুনির? জানত' বল না একটা?"

আদিদা মুখের সামনে থেকে বইটা নামিয়ে বল্লে, "আমি আর কি জানি যে বলব! না গিয়েছি জয়পুরে, না গিয়েছি আফগানিস্থান। এই বাঙ্গালাদেশের দু একটা সামান্য মারামারি—সে আর এমন কি।"

শঙ্কর ধরল চেপে, "তাই বল, বলতেই হ'বে একটা তোমাকে"।

রাগ হোলো ভীষণ আমার শঙ্করের এই দাদূ-প্রীতি দেখে। আমাদের এমন আসর জমে উঠেছে—এই সময় কে ওর আদিত্য দা, তাঁর কাছে বাঙ্গালা দেশের কোথায় কে কবে কাকে একটা চাটী, কি খুব জোরে একটা লাথি বা কিল মেরেছে তাই এখন বসে বসে শুন্তে হবে!···যাই-হোক শঙ্করেরই যখন বাড়ী—আর রোজ যখন সে আমাদের আরামের জন্য এত কষ্ট কর্চ্ছে তখন আমরাও নয় একটু কষ্ট কর্ল্লাম ওর এই দাদূ-প্রীতির জন্য।

আদিদা সুরু কল্লে, "অনেকদিনের কথা। আমাদের গ্রামের পাশে আর একটি বড় গ্রাম। দুই গাঁয়ের দুই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার; এরও হাজার লাঠিয়াল, ওরও হাজার লাঠিয়াল, অস্ত্রশস্ত্রের কোন পক্ষেরই অভাব নেই। এ ছাড়াও আর একটা ব্যাপার ছিল যা নিয়ে দু পক্ষেরই গর্ব্বের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক জমিদারেরই একটী করে লাঠিয়াল সর্দ্দার থাকত—সে একা একসঙ্গে একশ লাঠিয়ালের সঙ্গে পারত লড়তে।—কোন পক্ষের সর্দ্দার বড় এই নিয়েই চল্‌ত যা কিছু আস্ফালন। কিছুদিন থেকে আমাদের গ্রামে জমিদারের এক সর্দ্দার এসেছিল—তার সঙ্গে ও গ্রামের সর্দ্দারটা কিছুতেই পেরে উঠত না—এর একটা লাঠির চোটেই ও পড়ত বসে। এই জন্য ও গাঁয়ের জমিদার এবং লোকজন মহা লজ্জিত হয়েই দিন কাটাচ্ছিল।

দিন যায়—হঠাৎ একদিন ও গাঁ থেকে এক লাঠিয়াল এসে অমাদের জমিদারকে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল—হাতে তার একখানা চিঠি। ও গাঁয়ের জমিদার লিখেছে যে কোন বীরনগর থেকে নাকি ওদের নতুন এক লাঠিয়াল সর্দ্দার আনা হয়েছে। আমাদের জমিদারের সর্দ্দার লড়তে রাজি আছে কি না তার সঙ্গে—পত্রপাঠ জানাবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'লেন আমাদের জমিদার—

সে কি দৃশ্য—প্রকাণ্ড একটা মাঠে লড়াই হবে ঠিক হোলো। দুই গাঁয়ের লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সে মাঠ। মাঝখানে দুই সর্দ্দার দাঁড়িয়ে।

অবিনাশ আস্তে আস্তে বল্লে, "আরে, এ যে রূপকথা হয়ে দাঁড়াল প্রায়—বড় জমেছে ত।"

আদিদা বলতে লাগল, "প্রথম দুই সর্দ্দারে খানিকক্ষণ চল্‌ল বাক্‌যুদ্ধ—।

এ গাঁয়ের সর্দ্দার তার দাড়ি নেড়ে একটু হেসে বল্‌লে—ঐ সর্দ্দার লড়বে আমার সঙ্গে—একটী লাঠির চোটে ওকে তক্তা বানিয়ে দেব—

ও সর্দ্দার তার লম্বা গোঁফটায় একবার ভাল করে চাড়া দিয়ে বল্‌লে—আমি তোমাকে স্রেফ শালপাতা করে ছেড়ে দেব।

এ বল্‌লে—স্রেফ সুড়কি করে ফেলব

ও বল্‌লে—আরে, ধূলো, ধূলো বানিয়ে ছেড়ে দেব

এ বল্‌লে—তুলো ধুনে ছেড়ে দেব—

ও বল্‌লে—একেবারে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেব—

প্রথমটায় ভাবলাম এ কি রকম লড়াই রে বাবা! এত খবরের কাগজের সম্পাদকরাই করে।

কিন্তু না, শেষ পর্য্যন্ত ওরা ধরল লাঠি! বুঝলাম ও ওদের রক্ত গরম করে নেওয়ার জন্য প্রথমটায় একটু বাগযুদ্ধ হোলো। এবার চলল লাঠী—উঃ সে কি লড়াই। এ গাঁয়ের সর্দ্দার দুটো পাক মেরেই বসালে একটা লাঠি সজোরে ও গাঁয়ের সর্দ্দারের মাথায়—ও গাঁয়ের সর্দ্দার বিদ্যুৎ-বেগে সরে গেল; এবার ও লাগাল এর পাঁজরা লক্ষ্য করে দারুণ এক লাঠির ঘা—এ সর্দ্দার বোঁ করে তার লাঠি দিয়ে দিল আটকে। ভোর থেকে সুরু হয়েছিল—বেলা বারোটা বেজে গেল তবুও কেউ কাকেও ছুঁতে পার্চ্ছেনা এমনি সমানে সমানে চলেছে লড়াই! আমরা সব বসে আছি একটু দূরে—তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে— তবু নড়ছি না। সমানে চলেছে—খটাখট শব্দ, দুজনেই রাগে গর্জ্জন কর্চ্ছে যেন দুই ক্ষেপা ষাঁড়—তাকালে ভয় হয়। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে এল—দর্শকদের মধ্য থেকে দু' একজন করে আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল—বেশ ক্ষুণ্ণ মনেই।

বহু লোক রৈল তবুও।

লড়াই কিন্তু সমানে চলেছে—মাঠের যে জায়গাটায় তারা লড়ছিল সে জায়গাটার সব ঘাস উঠে সেখানটা সাদা হয়ে গেছে—ধূলোয় চারিপাশের আকাশ ছেয়ে গেছে।

আরও কয়েকঘণ্টা গেল কেটে—আরও অনেক লোক গেল চলে। লড়াই চলেছে তখনও ঠিক সমান ভাবে।

দুই গাঁয়ের জমিদারই বললেন, "আজ থাক আবার কাল ভোর থেকে সুরু করলেই হবে—"

আর সুরু হ'বে—এ লড়াইএর শেষ না করে ওরা থামবে না মনে হোলো। লাঠিতে যখন কিছুতেই কিছু হোলো না—তখন দুজনে নিল প্রকাণ্ড দুটো বরশা। ভয়ে আমাদের গায় কাঁটা দিয়ে উঠল—

এ গাঁয়ের সর্দ্দার বল্‌লে—এইবার আয়, তোকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিই—

ও গাঁয়ের সর্দ্দার বল্‌লে আয়, বরশা দিয়ে তোকে আজ এই মাঠের মাঝে গেঁথে রেখে যাই—

আবার চল্‌ল লড়াই, কেউ কাকেও ঘায়েল কর্ত্তে পারে না—

অবশেষে রাত যখন বারোটা তখন আমরা সকলে চলে এলাম—ওরা দুজন ছাড়া মাঠে আর জন মানব রৈল না। লড়াই তখন চরমে উঠেছে; বরশার ফলা দুটী খুলে নিয়ে তাই দিয়ে পরস্পরকে মারবার চেষ্টা চলেছে। দুজন দুজনকে ধরেছে জড়িয়ে আর দুজনেই চেষ্টা কর্চ্ছে ঐ বরশার ফলা অন্যের বুকে বসিয়ে দিতে।

আমরা যে যার বাড়ী এসে শুয়ে পড়লাম; কিন্তু শুয়ে পড়ে কি হ'বে, ঘুমাব কার সাধ্য, দুই সর্দ্দারের হুঙ্কারে সারা গ্রাম কাঁপছে---আর তাদের পায়ের দাপটে, লাফানিতে মনে হচ্ছে যে ভূমিকম্প হচ্ছে না কি!

সারা রাত প্রায় চল্‌ল সেই গর্জ্জন---হঠাৎ ভোরেরদিকে সব চুপ হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম, নিশ্চয়ই একজন আর একজনকে দিয়েছে শেষ করে। ছুটলাম সব মাটের দিকে; মনে কল্লাম গিয়ে দেখব একজন গেছে মারা আর একজন হয়ত বিজয় গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু মাঠে গিয়ে, আশ্চর্য্য, কাকেও ত দেখ্‌তে পেলাম না। গেল কোথায় তা'রা দুজন? সরে পড়ল নাকি? তাওত হ'তে পারে না। সকলে চারিদিক খুঁজতে লাগল---হঠাৎ একজন চীৎকার করে উঠল পেয়েছি পেয়েছি।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠল-- "কৈ, কোথায়?"

সে লোকটা বল্লে, "এই যে, এইখানে"

কিছুই দেখতে পেলাম না একটু দূর থেকে তবুও ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম, কি দেখলাম জান? সেই যে জায়গাটায় সর্দ্দার দুটো লড়ছিল সেখানে পড়ে আছে শুধু এ গাঁয়ের সর্দ্দারের দাড়িটুকু, ও গাঁয়ের সর্দ্দারের গোঁফ জোড়াটা, আর তা ছাড়া দু জোড়া চোখ, চারটে কাণ, আর বরশার ফলা দুটো---

আদিদা থামতেই ঘরময় হাসির হুল্লোর উঠল। নির্ম্মলটা খুব খুসী, সমীরটাও হাস্‌ছে খুব।

সমীরটা উঠে গিয়ে হঠাৎ আদিদার পায়ের ধূলো নিয়ে বললে---"আদিদা, একটু আগে এরা আমাকে নির্ম্মলের গুরুর পদ দিয়েছে, আর আমি আপনাকে বরণ করলাম আমার গুরুর পদে---"

নির্ম্মল হেসে বল্‌লে—"তাহলে আপনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু; অতএব—" বলে উঠে গিয়ে ভক্তিভরে আদিদাকে সাষ্টাঙ্গে করল প্রণাম।

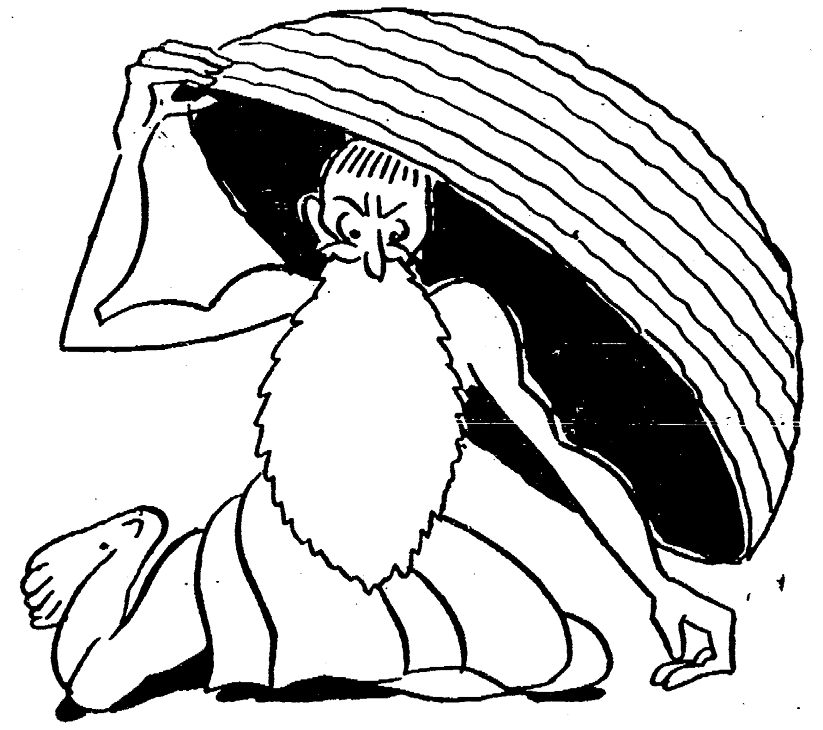

দূরের আলো

পৃথিবী-পূজা

অনেক দেশেই প্রাচীন যুগে পৃথিবীকে পূজো করা হত। বহু যুগ ধরে যে সব ধর্ম্ম চলে আসছে, তাতে এই পৃথিবী-পূজোর ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবী হচ্ছেন জননী, ফল ফুল শস্য দেন তিনি। আমেরিকার আদিম-বাসিন্দারা পৃথিবীকে সত্যিকারের মা বলে জানতো। সভ্যদেশেও এই বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। তিন শ' বছর আগের এক নামজাদা জ্যোতির্ব্বিদ বলে গেছেন, পৃথিবী যে সত্যিই জীবন্ত প্রাণী তাতে আর সন্দেহ নেই। তাঁর ধারণা ছিল, মহাসমুদ্রের তলায় পৃথিবীর ফুসফুস ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যাবে।

আদি-নর শিকার করে দিন গুজরাণ করত। শিকার ছেড়ে সে ধরল চাষ। তখন এলো কৃষি-সভ্যতা। তখন দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীকে প্রতি দেশেই জীবন্ত মাতা বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। পৃথিবী পাতালে চলে গেলেন, তাই শীতের সময় গাছপালা গেল শুকিয়ে, বসন্তে ফিরে এলেন তিনি, ফুল ফুটল, গাছের ডালে কচি পাতা গজালো। এই রকম কত কাহিনী যে গদ্যে-পদ্যে লেখা হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবী যদি সত্যই জীবন্ত হন, যদি আপন-খুশিতে তাঁর শক্তি থাকে বেশী ফসল দেওয়ার, তা হলে তো তাঁকে পূজো করে সন্তুষ্ট করা দরকার! সুরু হ'ল তখন পৃথিবী-পূজার পালা। কতগুলো পূজো ছিল নির্দ্দোষ, ফুল-ফল, মধু-মিষ্টি ছিল পূজার উপকরণ। কিন্তু কতগুলো পূজোয় ঘটা করে নিষ্ঠুর ভাবে পশু ও মানুষ হত্যা করা হত। পৃথিবী সর্ব্বদা চটেই আছেন, মহানিষ্ঠুর প্রাণী তিনি, নিষ্ঠুর পূজা না পেলে তিনি প্রসন্ন হবেন না, এই ছিল অদ্ভুত ধারণা। আর একটা ধারণা ছিল যে জমিতে লাঙল দেওয়ার ফলে এবং বলদের ক্ষুরের আঘাতে পৃথিবী নিদারুণ ক্লেশ পান। এত চটে যান তিনি যে নর-বলি না হলে আর সন্তুষ্ট হন না। প্রাচীন মেক্সিকো দেশে একটি মেয়েকে বলি দেওয়া হত, তার হৃৎপিণ্ড অর্ঘ্য দেওয়া হত পৃথিবী-দেবতাকে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে শস্যের বীজ

বুননের আগে ক্রীতদাস বলি দেওয়া হত। আজও অনেক দেশে পৃথিবীর কুপিত-আত্মা প্রসন্ন করার জন্য পশুবলির প্রথা আছে।

পৃথিবীমাতা ও তাঁর সন্তান ফল ফুল লতা গরু মেষ ইত্যাদি

অবশ্য প্রায় দেশেই এই সব নিষ্ঠুর পূজা উঠে গেছে। প্রাচীন যুগের শেষ দিকে সভ্যদেশে পৃথিবী-পূজো ছিল একটি অপূর্ব্ব সুন্দর অনুষ্ঠান। পূজারীরা আগে আগে, পিছনে মিছিল বেঁধে চাষারা ক্ষেতের চারিধার পাক দিতেন, এই সময়টা পূজারীরা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, চাষার দল ফসলকে আহ্বান জানিয়ে গান গাইতো। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে যে বসন্ত-উৎসব হয়, মে-ডে (Mayday Dance) নাচের যে মহলা দেখতে পাওয়া যায়, তার মূলে দেখতে পাই পৃথিবী-পূজোর কোনো একটা অনুষ্ঠান।

হাস্যকৌতুক

'রামগরুড়ের ছানা
হাসতে তাদের মানা।

এই বিভাগে আমরা হাসির ছোট গল্প, টুকরো গল্প, নাটক ইত্যাদি ছাপাব।

যাদুকরের যাদুগিরি

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

কয়েক বছর ধরে এক জাপানী ম্যাজিসিয়ানের সাকরেদী করে প্রফুল্লর নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা হল।

—সেই বা কম কি? প্রফুল্ল এতদিনে তার নিজের মূল্য বুঝতে পারে,—তার মত ম্যাজিসিয়ান-ই বা কটা আছে? প্রফুল্ল স্বাধীন ব্যবসায় নেবে পড়বে ঠিক করে ফেললে।

সঙ্গী সাথী ও ম্যাজিক দেখাবার আনুসঙ্গিক জিনিষ-পত্তর জুটতে বিশেষ দেরী হল না। সোজাসুজি 'যাদু সম্রাট' উপাধি নিয়ে চলে এল চন্দননগরে।

অন্যান্য বারের মত সেবারও চন্দননগরে মকর-সংক্রান্তির মেলা বসেছে। এই মেলা উপলক্ষে চন্দননগরের লোক-সংখ্যা কয়েকদিনের জন্য কয়েক গুণ বেড়ে যায়। মাইল খানেক জায়গা জুড়ে মেলা বসে। যাদু সম্রাট তার তাঁবু ফেলেছে ঠিক মেলার মাঝখানে। যাদু সম্রাটের এই প্রথম ম্যাজিক দেখানো!

মেলার মাঝখানে যাদু-সম্রাটের তাঁবু—তাঁবুর গায়ে কাগজ সাঁটানো—যাদু সম্রাট মিঃ দফাদারের ম্যাজিক দেখুন—প্রবেশ মুল্য দুই আনা। অসম্ভব ভীড় মেলায়। যাদু-সম্রাটের তাঁবুর সামনেও বেশ ভীড়। তাঁবুর সামনে একটা টুল—টুলে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লের সঙ্গী এক ছোকরা প্রফুল্লর প্রশংসায় পঞ্চমুখ,—"যাদু সম্রাট মিঃ দফাদারের ম্যাজিক দেখুন—অপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব যাদুবিদ্যা দেখুন—ইন্দ্র-জাল-সম্রাট দফাদার—প্রাচ্য প্রতীচ্যে যিনি যাদুবিদ্যা দেখাইয়া অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই বঙ্গ-গৌরব ইন্দ্র-জাল-সম্রাট বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্র-জাল দর্শন করিয়া ধন্য হউন। প্রবেশ মূল্য কিছুই না—মাত্র দুই আনা—।"

চন্দননগর হাই-স্কুলের এক পড়ুয়া—এসেছে মেলা দেখতে। মেলা দেখতে দেখতে মেলার মাঝখানে এসে পড়ল সে—ঠিক যাদু সম্রাটের তাঁবুর সামনে। ছোক্‌রার কথাবার্ত্তা শুনে সে দু'আনা খরচ করে ঢুকলো তাঁবুর ভিতর। তাকে নিয়ে সবসুদ্ধ পনেরোজন লোক হল। ভিতরে গিয়ে মাটিতে পাতা সতরঞ্চির উপর গিয়ে তারা বসল। সতরঞ্চি থেকে হাত চারেক দূরে দু'তিনটে চৌকির সাহায্যে এক হাত উঁচু করা প্ল্যাটফরম্। ম্যাজিক ওর উপরেই হবে। কিছুক্ষণ পরে যাদুসম্রাট ঢোলা কোট্-প্যান্ট্ পরে চৌকির উপর এসে দাঁড়াল। তারপর সুরু হল ম্যাজিক—তাস, টাকা পয়সা ও অন্যান্য জিনিষের হরেক-রকম ম্যাজিক। ছেলেটি আশ্চর্য্য হয়ে সেই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য খেলা দেখতে থাকল।

কিছুক্ষণ অন্যান্য ম্যাজিক দেখাবার পর যাদু-সম্রাট বললে, "আপনাদের এবার ঘড়ীর ম্যাজিক দেখাব—আস্ত ঘড়ী নিয়ে আপনাদের চোখের সামনে সেটাকে আমি এই হাতুড়ী দিয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ভেঙে সেটা জোড়া দিয়ে দেব।"

তারপর একটু মাপা-হাসি হেসে যাদু সম্রাট বললে, "আপনারা ভাবছেন আমার ঘড়ী বিশেষভাবে তৈরী যাতে হাতুড়ীর ঘা-খেয়েও না ভাঙ্গে—বেশ—আমার ঘড়ী নয় বিশেষভাবে তৈরী—আপনাদের ত আর নয়—আমি আপনাদের ঘড়ী নিয়েই ম্যাজিক করব—দিন কে কে ঘড়ী দেবেন।" যাদু সম্রাট বুকনিতে একেবারে কেতা-দুরস্ত!

অনেকেই ঘড়ী দিলে—সেই পড়ুয়া ছেলেটির হাতেও একটা ঘড়ী বাঁধা ছিল। সেও দিলে সেটা। সবসুদ্ধ সাতটা ঘড়ী পাওয়া গেল। যাদু সম্রাটের সাকরেদ এসে ঘড়ীগুলি নিয়ে গেল।

যাদু সম্রাট প্রথমেই সেই পড়ুয়া ছেলেটির ঘড়ী তুলে নিয়ে বললে,—"এটা যার ঘড়ী উঠে দাঁড়ান?" ছেলেটি উঠে দাঁড়াল।

"এই দেখুন আপনার ঘড়ী"—বলতে বলতেই যাদু সম্রাট হাত-সাফায়ে ছেলেটির ঘড়ী ঢোলা কোটের পকেটে ফেলে কোটের হাত থেকে এক বাজে ঘড়ী—যা রাস্তায় দু'চার পয়সায় পাওয়া যায়—বার করে ভাঙ্গতে সুরু করে দিলে, "কেমন ভাঙ্গলাম ত?"

ছেলেটি উত্তর দ্যায়, "হু"—।

সমবেত দর্শকরা মাথা নাড়ে।

"আচ্ছা বেশ—দেখুন আমি আবার আপনার ঘড়ী ঠিক করে দিচ্ছি"—বলেই যাদু সম্রাট ফের হাত সাফায়ে পকেট থেকে আসল ঘড়ী পুনরুদ্ধার করে বললে, "এই নিন আপনার ঘড়ী—নিয়ে যান।"

পড়ুয়া ছেলেটি গিয়ে ঘড়ী নিলে।

"কেমন, ঘড়ী ঠিক আছে ত', চলছে ত'?" যাদু সম্রাট জিজ্ঞাসা করে।

ছেলেটি ঘড়ীটি কানের কাছে নিয়ে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল।

"টিক, টিক্ করছে ত'—চলছে ত' ঘড়ী?" যাদু সম্রাট হাসতে হাসতে—ঠাট্টাচ্ছলেই যেন কথা কটা বলে।

"কই, টিক্, টিক্ আওয়াজ হচ্ছে কই? ঘড়ী চলছে কই?"—ছেলেটি কেমন একটু উষ্ণ হয়ে ওঠে।

"সেকি?"—যাদু সম্রাটের পিলে পর্য্যন্ত চমকে যায়; মুখের রঙ্ বদলে যায়, "দেখি?"

ছেলেটি ঘড়ীটা এগিয়ে দিলে। যাদু সম্রাট ভেবে পেলে না, ঘড়ীর কি হল,—ঘড়ী ত সে একবার ছুঁয়েছে মাত্র—আর কিছুই করেনি—ঘড়ী এরকম হল কি করে!—তবে কি"—যাদু সম্রাট ভাবতে থাকে, "তবে কি ঘড়ীটাই অঘামরা!"

এদিকে অন্য যাদের ঘড়ী গিয়েছিল তথাকথিত হাতুড়ীর-ঘা খেতে, তারাও চেঁচামেচি সুরু করে দিল, "দেখি—আমাদের ঘড়ী দেখি—দরকার নেই বাবা আর ম্যাজিক দেখে!"

যাদু সম্রাট ভাবলে ছেলেটিকে বলে যে সে ঘড়ী মেরামত করতে জানে না—যাদু বিদ্যায় সচল ঘড়ী ভেঙ্গে সচল করতে পারে আর অচল ঘড়ী ভেঙ্গে অচল-ই করতে পারে, সচল করতে পারে না। কিন্তু বলতে যাবার সময় যখন সে দেখলে যে কয়েকজন দর্শক হাত গুটাচ্ছে তখন আর তা বলা হল না বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, "এমন ঘড়ী নষ্ট করা যাদুবিদ্যা কোথায় শিখলে যাদু? জোচ্চর, বদমায়েস কোথাকার!"

যাদু সম্রাটের তখন তার সাকরেদকে প্রহার করবার বাসনা হতে লাগল। হায়, হায়, যদি সে ঘড়ীটা প্রথমেই দেখে নিত তাহলে আর এই দুর্ঘটনা ঘট্‌ত না। যা হোক যাদু সম্রাট সামলে নিলে। একটু শুষ্ক হেসে বললে, "আপনারা ঘাবড়াবেন না—এটাও ম্যাজিকের একটা অঙ্গ বৈ কিছুই নয়।"

"অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝি না—ঘড়ী ঠিক না পেলে বিকলাঙ্গ করে বাড়ী যাব—তা বলে দিচ্ছি!" জোয়ান হাত গুটানোদের একজন বললে।

"বেশ, বেশ,"—যাদু সম্রাট মুখেই একটু হাসলে।

"হঠাৎ যাদু সম্রাট তার সাকরেদকে ডেকে তার কানে কানে অনেকক্ষণ ফিস্‌ফাস্ করলে, "হতভাগা, শিগগীর ছোট্ ঘড়ীর দোকানে, এই ঘড়ী মাফিক এক সচল ঘড়ী চাই এক্ষুনি—কিনে আনবি!"

সাকরেদ মাথা নেড়ে চলে গেল। যাদু সম্রাট ছেলেটির সেই অচল ঘড়ীটি হাতে করে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে, "এই যে ঘড়ী আমার পকেটে রইল—আধ ঘণ্টার মধ্যে ঠিক হয়ে আমার পকেট থেকে বেরোবে—পকেটে ঘড়ীর কারখানা আছে—সেখানেই ঘড়ী মেরামত হবে।"

অন্যান্য ঘড়ীগুলি ভাঙ্গবার আর সাহস হল না যাদু সম্রাটের। অন্য ম্যাজিক দেখাতে সুরু করল—কিন্তু কটাই বা তার ষ্টকে আছে আর—ফুরিয়ে এল। দেখানোগুলিই ফের দেখানো সুরু হল—কিন্তু এত মেধাবী দর্শক যাদু-সম্রাট জীবনে দেখেনি। দর্শকেরা চেঁচাতে সুরু করলে—দু' একটা যাদুবিদ্যা তার প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি! যাক, সাকরেদ এসে কি একটা দিয়ে গেল যাদু-সম্রাটকে। তখন একটু হেসে পকেট থেকে যাদু সম্রাট সচল ঘড়ীই বার করে দিলে। ম্যাজিক শেষ হল, লোকজন চলে গেল, গোলমাল মিটলো।

যাদু সম্রাট মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। ছোকরা দু'আনার একটা অচল ঘড়ীর বদলে একটা ভাল 'সাইমা' ঘড়ী নিয়ে গেছে। দাম পঞ্চাশ টাকা! পঞ্চাশ টাকার কমে ওই রকম ঘড়ী নাকি পাওয়া গেল না—সাকরেদ বলছে।

পরের দিন আবার ম্যাজিক! আজ সম্রাট তার সাকরেদকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে। "প্রত্যেকটি ঘড়ী দেখে নিবি"—সাকরেদকে উপদেশ দেওয়া হয়।

আজ ভারী ভীড়! পাঁচশ' লোক ঢুকেছে ম্যাজিক দেখতে—তাদের মধ্যে চারশ' নিরানব্বইজন-ই অল্প বয়সী ছোকরা। সম্রাট ভারী খুসী—গতকল্যকার লোকসানের কথা আর তার মনে নেই। ক্রমে ক্রমে ম্যাজিক সুরু হল। এ ম্যাজিক সে ম্যাজিকের পর এল ঘড়ীর ম্যাজিক—!

ম্যাজিকের আগে যেমন হয়ে থাকে—তেমনি ভনিতা সুরু হল। যাদু সম্রাট তার পেটেণ্ট্ বুলি আউড়ে যায়। দর্শকদেরও ভারী উৎসাহ দেখা যায়।

সাকরেদ পূর্ব্বদিনকার উপদেশ মত ঘড়ী নিতে এসে চমকে উঠল। পাঁচশ' লোকের মধ্যে চারশ' নিরানব্বইজন—সেই ছেলেগুলি—ঘড়ী এনেছে—আর চারশ' নিরানব্বইটি ঘড়ীই অচল!

"এ ঘড়ী অচল—এতে ম্যাজিক চলবেনা। এ ঘড়ী ভাঙ্গার পর ঠিক হলে অচলই থাকবে!"—সাকরেদ বললে।

"কেন চলবে না শুনি?"—সেই চারশ' নিরানব্বই দলের একজন কথা বলে।

"ভাল ঘড়ী ভাঙ্গলে তার অবস্থা কি এর চেয়েও ভাল থাকে—চালাকী! সে ঘড়ী যখন পেরেছ, তখন এ ঘড়ীও ঠিক করতে পারবে—"

"তা না হলে ম্যাজিসিয়ান কি? যাদু সম্রাট উপাধি তোমাকে কে দিয়েছিল হে?"

"সারানো যাবে না কেন শুনি? মুকুলেরটা কি সোনার তৈরী ছিল নাকি?"—চারশ' নিরানব্বইরা ক্ষেপে যায়।

"মুকুল কে?"—যাদু সম্রাট এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে।—

"মুকুলকে আর চেননা? ন্যাকা সাজা হচ্ছে, মুকুল আমাদের সব বলেছে।"

"ঢেকে আর লাভ নেই—"

"মুকুল আমাদের স্কুলেই পড়ে—"

"সব বলেছে সে—"

চারশ' নিরানব্বইর দল একের পর একে বলে যায়।

যাদু-সম্রাট হাঁ—হয়ে গেল। সব ব্যাপার-ই তার বোধগম্য হয়। সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায়ও তার মাথায় এলো। সাকরেদকে ডেকে উপদেশ দেওয়া হয় কানে কানে।

হঠাৎ তাঁবুর বাতি নিভে যায়। তারপর আর জ্বলে না—এমন কি লালবাতিও না! যাদুসম্রাট তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে অন্ধকারে চন্দননগর ছাড়া হল। নিস্ফল আক্রোশে চারশ' নিরানব্বইর দল তাঁবুর জিনিষ পত্তর লুট করে বাড়ী ফেরে।

এই প্রফুল্ল বা যাদু-সম্রাটের প্রথম বা শেষ ম্যাজিক দেখানো।

ধারাবাহিক উপন্যাস

রজত সেন

আমাদের ছেলেরা ইস্কুল-ছুটির পর বাড়ী ফিরে এলে, তারা মোটর চাপা পড়েনি দেখে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে এই নিরীহ ছেলেদের মন যে কত অসংখ্যবার মোটর চাপা পড়ছে, কত ছদ্মবেশী পিশাচের কাছে সয়তানিতে তাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, তা আমরা ভেবেও দেখি না। ছেলেদের হাতে রঙচঙা লোভনীয় উপহার তুলে দিয়ে একদল সয়তান তাদের সম্মুখে পাপের পৃথিবীর যবনিকা তুলে ধরেছে, লেখক সেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী বলছেন। এই উপন্যাস পড়ে ছেলেরা সাবধান হতে শিখবে, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা তাঁদের কর্ত্তব্য স্থির করতে পারবেন।—সম্পাদক

বেনেটোলা লেনটা যেখানে একেবারে সরু হয়ে গেছে—তারই শেষপ্রান্তে একটা ছোটখাটো বস্তি। আশেপাশে অবশ্য বড় বড় কোঠা বাড়ী; বস্তির বাসিন্দারা সে-সব বাড়ী থেকে রেডিওর শব্দ শোনে, আনন্দের হৈচৈ তাদের কানে এসে পৌছয়। দোতলার কোন ঘর থেকে উজ্জ্বল বিজলী-বাতির আলো বস্তির কাঁচা রাস্তার অন্ধকার খানিকটা দূর করে।

গণেশ সরকার বস্তির শেষপ্রান্তের ঘরটায় থাকে। বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে ঘরের দেয়াল তৈরী; খোলার চাল—মাঝে মাঝে দু' এক জায়গায় ভেঙেও গেছে; সে-সব ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে, ঘর কাদা হয়ে যায়; কাপড়জামা, বিছানাপত্র ভিজে একাকার! তা থেকে বেরোয় সোঁদা গন্ধ!

কিন্তু গণেশ সরকারের তাতে কিছু এসে যায় না। ঘরে তার কাপড়জামা বা আসবাবপত্রের বালাই নেই। একা মানুষ ; কোথায় কখন থাকে তার ঠিক নেই। হয়তো দরজায় একটা তালা মারা রইলো, সাত দিন গণেশের পাত্তা নেই। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পাড়ার যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'মশাই ছিলেন কোথায় এত দিন ? দেশে গিয়েছিলেন নাকি ?'

গণেশের প্রকাণ্ড গোঁফ; তার আড়াল দিয়ে মিটমিট করে হেসে বলে, 'দেশ আবার কোথায় ? যেখানে থাকি সেখানেই দেশ !'

'আপনার স্ত্রী নেই ? ছেলেমেয়ে ?' আবার প্রশ্ন হয়।

'বিয়ে করবার সময় পেলাম কোথায় ?'

'কেন, এখন ?'

'সে কি খড়ের বালিশে শুতে পারবে ? পারবে কাদায় পড়ে থাকতে ?'

কিন্তু কাদায় গণেশ সরকার পড়ে থাকে না। তার কাপড়জামা দেখলে মনেও হয় না তার অবস্থা খুব খারাপ। জুতোটাও বেশ পরিষ্কার। পেছন দিক থেকে তার প্রকাণ্ড শরীরের দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে জাঁদরেল লোক। বেশ মিশুক গণেশ, সব সময়েই মুখে একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে। পাড়ার সবাইর সঙ্গেই তার আলাপ, কারুর সঙ্গে দেখা হলেই দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে গল্প করা চাই; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবে বাড়ীর সব খবর। সব চাইতে বেশী ঘনিষ্ঠতা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। এ অঞ্চলে এসেছে মাত্র চার পাঁচ মাস, কিন্তু এর মধ্যেই প্রায় সমস্ত ছেলে-ছোকরা তাকে 'গণেশ দা' বলে ডাকে। ছেলেদের ঘুঁড়ির সূতোয় সে মাঞ্জা দিয়ে দেয়। মারপিট করে তাদের জন্যে বায়োস্কোপের টিকিট কাটে। যখন তখন পয়সা ধার দেয়, ঘুগ্নি আর পাঙ্কা-বরফ খাওয়ায়। আর জাঁকিয়ে বসে গল্প করবে যত রাজ্যির ! যত চোরডাকাতের গল্প। বিলেতে ডাকাতগুলো কেমন করে সিন্দুক ভাঙ্গে, ব্যাঙ্ক লুট করে, হাত থেকে জিনিষপত্র বেমালুম ছিনিয়ে নেয়। পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কেমন করে ঝাঁপ দেয় সমুদ্রে ! বিশাল জলরাশি সাঁতরে কেমন করে আশ্চর্য্য উপায়ে প্রাণ বাঁচায়।

যেখানে থাকি সেখানেই দেশ

ছেলেরা রুদ্ধ নিশ্বাসে তার গল্প শোনে। খাওয়া পড়া, ইস্কুল, ঘুম কিছুই আর তাদের মনে থাকে না।

'ভালো একজন ডাকাত হতে পারা বিলেতে কি রকম সম্মান জানো ? সবাই তাকে ভয় পায়, সাহস করে কথা বলে না তার সঙ্গে। সে যখন কোন হোটেলে খেতে ওঠে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না ! হোটেলের বয়গুলো—ওঃ কি সম্মানটাই তাকে করে !' গণেশ বলে চলে।

'পুলিশে ধরে না কেন ?' শিবু হঠাৎ প্রশ্ন করে।

'পুলিশ ?' গণেশ ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে বলে, 'ঐ ত মজা ! পুলিশের সাহস কি তার একখানা চুল স্পর্শ করে ! পুলিশ কি দেখেছে কোন দিন তাকে চুরি করতে ? কোন প্রমাণ আছে তার বিরুদ্ধে ? বলছি না, তা হলে আর ডাকাতি কি ? পুলিশ ধরে কাকে জানো ? পকেটমার, ছিঁচকে চোর—এদের ! বড় বড় ডাকাতকে কি ভয় করে তারা জানো ? কোটের পকেটে সব সময়ই রিভল্‌বার। পুলিশ কিছু গণ্ডগোল করবার আগেই সে তার মাথার খুলি উড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে।'

শিবুর বয়েস বারো। বয়সের তুলনায় তাকে একটু বড়ই দেখায়, সার্টের ওপর হাফ প্যান্ট পরা। মুখের রং ফর্সা, চোখ উজ্জ্বল আর চঞ্চল। কৌতূহলের তার আর অন্ত নেই। কথার মাঝখানে সে প্রশ্ন করে, 'রিভল্‌বার কি ওখানে কিনতে পাওয়া যায় ?'

গণেশকে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ভাবতে হয় না, 'যারা বুদ্ধিমান্' সে বলে, 'তাদের কি কোন জিনিষের অভাব হয় ? তারা সব যোগাড় করে নেয়। এই যে আমাদের দেশে এত চুরি-ডাকাতি হয়, অস্ত্রের জন্যে কি কাজ পড়ে থাকে ? পেছিয়ে আসে তারা ? আসল হচ্ছে সাহস—মনের জোর—'

'মামার বাড়ীতে একবার ডাকাতি হয়—' বঙ্কিম পাশ থেকে হঠাৎ বলে ওঠে। গণেশ এবং অন্যান্য ছেলেরা বঙ্কিমের দিকে তাকায়। বঙ্কিম বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়েছে। এর মধ্যেই তার মুখে কিছু অভিজ্ঞতার ছাপ, কালো রং, ছোট ছোট চোখ। তার বাপ মা খুব গরীব, অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে সে মানুষ হচ্ছে। স্কুলে পড়ে ফ্রি। ডাল-ভাত চারটি বেশী করেই খেয়ে তাকে স্কুলে যেতে হয়। না হয় দুপুরে ক্ষিধের চোটে চোখে অন্ধকার দেখে। সে জানে তার বাবা তাকে জলখাবারের পয়সা দিতে পারবেন না। সে চায়ও নি কোন দিন। বরং পয়সার পরিবর্ত্তে কারণে অকারণে সে মার খায়। বাবা ছাপাখানায় কাজ করেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, ভীষণ বদরাগি লোক। এই ত সেদিন কালি কেনবার জন্যে বাবার কাছে একটা পয়সা চাইতে গিয়ে কি মারটাই সে খেলো। 'তুইও কি ছাপাখানা খুলছিস্ নাকি ?' তার বাবা তাকে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে বললেন, 'না কি রোজ একটু একটু কালি খেয়ে শরীর ভালো করিস্ ?'

চড় খেয়ে বঙ্কিমের কাণ দুটো জ্বলছিলো, একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিস্তেজ গলায় সে বললে, 'কালি খাবো কেন ?'

'রং ফরসা করবার জন্যে ?' কানাই বাবু ক্ষেপে আসেন তার দিকে, 'হারামজাদা ছেলে ! তবে কালি করিস্ কি ? আমরা কি আর দোয়াতকলম বেভার করেছি ?'

'মা ত কালির দোয়াত ঢেলে ফেললে, আমাকে বকছো কেন ?' বঙ্কিম প্রায় দরজার কাছে গিয়ে বললে।

কানাই বাবুর তখন ছাপাখানা যাবার সময় হয়ে এসেছে, তাঁর আর হাঙ্গামা করবার সময় ছিলো না।

বঙ্কিমের সাংসারিক অভাবের কথা গণেশ জানতো। বোধ হয় সেজন্যেই সে বঙ্কিমকে স্নেহ দেখাতো খুব বেশী, পয়সাকড়ি দিতো। কালী, পেন্‌সিল এবং আরও খুঁটিনাটি নানা জিনিষ সে বঙ্কিমকে কিনে দিতো। সে-ই তাকে প্রথম বঙ্কু বলে ডাকতে আরম্ভ করে।

'মামার বাড়ীতে কি হয়েছিলো ?' গণেশ তাকে জিজ্ঞেস করে।

'একবার ডাকাতি হয়' বঙ্কিম বলে, 'অর্দ্ধেক রাত্রে সমস্ত বাড়ী ঘেরাও করে বড় মামার ঘরে গিয়ে ঢোকে; মামার সাহস খুব, কিন্তু একটা লোক মামার ঠিক বুকের ওপর বন্দুকের নলটা তুলে বললে—হয় সিন্দুকের চাবি না হয়—। মামা চাবি দিয়ে দিলেন। অনেক টাকা, মামিমার আর মামাতো বোন রাণু এবং হাস্থর গয়না নিয়ে তারা দিলে চম্পট। সকাল বেলা পুলিশ এলো, দারোগা এলো, অনেক হৈচৈ; কিন্তু কোথায় কে ?'

'তোর মামারা বড়লোক বুঝি ?' জহর এতক্ষণ চুপ করে ছিলো, এবার সে জিজ্ঞেস করলে।

তার গলার স্বর শুনে অন্যান্য সবাই মনে করলে জহর ঠাট্টা করছে। কিন্তু ওর কথার ধরণই ঐ রকম। মনে হয় একটু ঠাট্টা করছে, একটু অবিশ্বাস করছে। গণেশ সরকারকে সে প্রথমে একেবারেই পছন্দ করতো না। বরং গণেশ যে দিন গায়ে পড়ে তার সঙ্গে প্রথম আলাপ করতে চেয়েছিল—সেদিন সে গণেশের সঙ্গে কথাই বলে নি। ক্রমে আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতেই জহর লোকটার দিকে কখন ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে গেছে। শিবু, বঙ্কিম আর সে এই তিন জনের মধ্যে জহরের অবস্থা খুব ভালো, তার বাবা কোন এক সরকারী অফিসে বড় চাকরী করেন। কলকাতায় তাদের নিজেদের বাড়ী, পেছনের অংশ ভাড়া দিয়েছে সে অংশে শিবুরা থাকে; শিবুর বাবা সোনারূপোর কাজ করে, দিনরাত হাতুড়ি ঠকাঠক, রেড়ির তেল আর কাঠকয়লার গন্ধ।

জহর ওদের মধ্যে একটু বয়স্ক। তার বয়েস তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে এই সেদিন। কিন্তু তার শরীরের গড়ন খুব সবল বলে তার বয়েস মনে হয় আরও বেশী। রং বেশ ফর্সা, চওড়া কপাল; নিয়মমত খেলাধূলা করে—সেজন্য তার গায়ে শক্তিও খুব, হাতের কব্জিগুলো মোটা। বঙ্কু, শিবু, জহর তিনজনেই বাড়ীর কাছে এক স্কুলে পড়ে, বঙ্কিম এবং শিবু পঞ্চম ও জহর চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র।

তিনজনই দেখতে দেখতে গণেশ সরকারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সকাল বেলা স্কুলে যাবার আগে গণেশের এই ছোট ঘরটায় তিনজনেই এসে জোটে। দেখতে দেখতে গল্প জমাট হয়ে যায়। কোন কোন দিন স্কুলেরও দেরী হয়ে যায়, কিন্তু সেদিকে খেয়াল থাকে না কারুর। জহরের প্রথম প্রথম গণেশের এই অপরিসর মাটির ঘরে চাটাইয়ে বসে গল্প করতে সঙ্কোচ বোধ হত। কিন্তু ওর অমায়িক ব্যবহার আর মিষ্ট কথাবার্ত্তায় কয়েক দিনের মধ্যেই জহরের সে সঙ্কোচ কেটে গেল।

আজও আড্ডা বেশ ঘন হয়ে উঠেছিলো। বিশেষ করে চুরি-ডাকাতির গল্পগুলো গণেশ এমন রস দিয়ে বলে যে একবার আরম্ভ করলে শেষ পর্য্যন্ত না শুনে উঠে যাবার ইচ্ছে হয় না। গণেশের মুখে গল্প শোনবার

জন্যে সবাই উদগ্রীব, মাঝখান থেকে বঙ্কুর মামার বাড়ীর ডাকাতির কাহিনী শুনে সবাই ওঠবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। গণেশ বার করলো পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট; নিজে একটা ধরালো, বঙ্কুকে একটা দিয়ে বললে, 'নাও বঙ্কু, এখন তো আর তোমার কাশি আসে না, আসে ?'

বঙ্কু একটু লজ্জিত হলো। গণেশ তাকে একটু একটু করে সিগারেট টানতে শিখিয়েছে। শিবু প্রথমে সাহস করতো না, আজকাল সেও লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খায়। কেমন যেন ভালো লাগে, টানবার আগে থেকেই একটা অদ্ভুত উত্তেজনায় মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, হৃদপিণ্ডের গতি যায় বেড়ে। তারপরে একটু একটু করে মুখ বন্ধ করে ধোঁয়াটা নাক দিয়ে ছাড়তে মন্দ লাগে না, হঠাৎ নিজের অজানাতেই একটু ধোঁয়া কখনও গিলে ফেললে, মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যায়, কানের মধ্যে ঝিম ঝিম করে, হাতপাগুলো যায় অবশ হয়ে, কেমন যেন ঘুম পায়। মোটমাট সবশুদ্ধ মিলিয়ে ভালো লাগে। সেদিন স্কুল পালিয়ে ইডেন গার্ডেনের বাগানের গাছের ছায়ায় সিগারেট টানতে টানতে বঙ্কু ত ঘুমিয়েই পড়েছিলো। সে ঠোঁট একটু ফাঁক করে ঘুমোয়, গণেশ তার মুখের মধ্যে খানিকটা আইসক্রীম ঢুকিয়ে দিতে তবে তার ঘুম ভাঙ্গে। তাদের স্কুল পালানো শিখিয়েছে গণেশ। সে কিন্তু জহরকে কোন দিন সিগারেট খাওয়াতে পারে নি। অনেক দিন সে তাকে অনুরোধ করেছে, কিন্তু প্রতিবারেই সে অস্বীকার করেছে। একদিন স্কুল পালিয়ে তুপুরবেলা শিবু আর বঙ্কিমের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে সে আর লোভ সামলাতে পারলে না। পাশে বসেই বঙ্কু বেমালুম সিগারেট পোড়াচ্ছিল, সার্লক-হোম্‌স্‌-এর বই। ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ শুঁকে শুঁকে তারও নেশা লাগছিলো, সে আর সাম্‌লাতে পারলে না, বললে, 'এই একটা সিগারেট দে !' সেই তার প্রথম আরম্ভ। তারপরে—কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল সে! গণেশ ঠাট্টা করে বলেছিলো, 'কি হে ভালো ছেলে—কেমন লাগে সিগারেট ?'

জহর হেসে বলেছিলো—'বেশ !'

ক্রমশঃ

ছুটির ঘণ্টা

আই এফ্ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

এবৎসর শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলাগুলি সম্বন্ধে তেমন কিছুই বলবার নেই। অন্য বৎসরগুলির মত এবার শিল্ডের সে পূর্ব্বপরিচিত হৈ চৈ, উৎসাহ উত্তেজনা খেলার মাঠে কিছুই দেখা যায় নি! তার কারণ একটি নয়, অনেকগুলি। প্রথমতঃ, আগেকার খেলোয়াড়ে জমকালো সে গোরার দল কেউ যোগ দেয়নি—বলবার মত কেবলমাত্র ইষ্ট ইয়র্কস্, ডি, সি, এল্, আই ও রয়েল ফুসিলাস'দের গোরাদলগুলির মধ্যে নাম করা যেতে পারে। তাই খেলাগুলি কোনটাই তেমন প্রতিযোগিতামূলক হয়নি বা জমতে পারেনি। দ্বিতীয় কারণ, কলকাতার তিনটি ভাল ফুটবল দল—কালিঘাট, ইষ্ট বেঙ্গল ও মহামেডান্স্ এরা কেউ নামেনি! তৃতীয় এবং বোধহয় সব চেয়ে বড় কারণ, খেলার মাঠে যার জন্য হৈ চৈ উৎসাহ উত্তেজনা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল—প্রথম খেলাতেই এরিয়ানের কাছে মোহনবাগানের অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যাওয়া। মোহনবাগান যেদিন সমস্ত কলকাতাকে লজ্জা দিয়ে হঠাৎ হেরে বসল—সেদিনই ফুটবল মাঠে সব উত্তেজনা আনন্দ যেন দপ্ করে নিভে গেল। এই সব কারণগুলির জন্য শীল্ড খেলা প্রথম থেকেই যেন 'যার তার' খেলা হয়ে উঠল। 'যে পায় তার' ব্যাপার হয়ে পড়ল! ভারতবর্ষে খেলাধূলার এতবড় আকর্ষণ—এই আই এফ্ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা তার যেন আপন গৌরব হারাল। কোথায় সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী গর্ডন্ হাইল্যাণ্ডারস্, সেরউড্ ফরেষ্টার্স্! আর কোথায় সে ভারতবর্ষের গৌরব মহামেডানস্ ও মোহনবাগান!

মোহনবাগানের হেরে যাওয়া যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি লজ্জাকর; লীগের খেলা দেখে সকলেই ভেবেছিল মোহনবাগান ফাইন্যাল্ পর্য্যন্ত যাবে, এমন কি অনেকে বলেছিল—ওহে, আর কি, মোহনবাগান এবার শীল্ড নিল! হায়রে—মোহনবাগান! গত মাসের রংমশালে তোমাদের আমরা অভিনন্দন জানালাম, তোমাদের লীগ জয় লাভে আমরা তোমাদের বাহবা দিলাম—আর এবার! এবার তোমরা আমাদের সকলকে লজ্জা দিলে! যাহোক তবু, মোহনবাগান, আমাদের অভিনন্দন তোমাদের উপর রইল। তোমরা ভালই খেলেছ,

তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ, তোমাদের সত্যিকারের লজ্জিত হবার কিছু নেই। তবে আমরা বড় আশা করেছিলাম। তা হোক, আমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের ওপর রইল—আশা করি, পরের বৎসর, না হয় কোনদিন নিকট ভবিষ্যতে, তোমরা জয়যুক্ত হবেই। হার জিত নিয়েই খেলা, খেলাধূলায় হারলে মান অপমান নেই।

মোহনবাগান যেদিন হেরে গেল—সেদিন সকলেরই আর তিনটি দলকে খুব মনে পড়েছিল। তারা কালিঘাট, ইষ্ট বেঙ্গল ও মহামেডানস্! শীল্ডএ খেললে এদের কেউ না কেউ শীল্ড প্রতিযোগিতায় অনেকদূর যেতে পারত! হয়ত কে জানে—এদের মধ্যেই কোন দল শীল্ড জয়ী হতে পারত! কিন্তু সে কথা আজ এখন আর বলে লাভ কী?

কিন্তু কেউ কি ভুলেও বাপু ভেবেছিল যে পুলিশ শীল্ড নেবে? লক্ষ টাকার বাজী রাখলেও অনেকেই বাজী রেখে বলত—কখনই না। অসম্ভব! কিন্তু শীল্ডে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছে! লীগে পুলিশ মোটেই ভাল খেলেনি কিন্তু শীল্ডে তারা হঠাৎ যেন কি বুঝে ভাল খেলতে আরম্ভ করল। এবং ভাল খেলে পরপর প্রতিপক্ষদের হারিয়ে তারা ধাপে ধাপে ওঠে গেল। পুলিশ শীল্ড নিল!

প্রথমে পুলিশ হারাল মহারানা ক্লাবকে	১—০
তারপর হারাল রয়েল ফুসিলার্স'কে	৪—১
তারপর হারাল বি এন আর কে	২—০
তারপর হারাল ক্যাল্ক্যাটাকে	৩—১
সেমিফাইন্যালে হারাল ই, বি, আর কে	১—০
ফাইন্যালে হারাল কাষ্টাম্স্কে	২—১

এদিকে, যখন কাষ্টামস্ চতুর্থ রাউণ্ডে ওয়ারীকে (১—০) হারিয়ে সেমিফাইন্যালে উঠল এবং সেমিফাইনালে উঠে কেমেরোনিয়ান্সকে হারিয়ে (২—১) ফাইন্যালে গেল, তখন আমরা সবাই মনে করেছিলাম কাষ্টামস্ই এবার তাহলে শীল্ড নিলে! কাষ্টামস্ পুলিসের চেয়ে এবার ভাল দল ছিল, সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া কাষ্টামস্ আগেও অনেক বড় বড় দলকে হারিয়ে এক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করেছে! এর আগেও কাষ্টামস্ তিন তিনবার ফাইন্যালে উঠেছিল! তাই সকলে আমরা ভেবেছিলাম, এবার এই চতুর্থবারে কাষ্টামস্ শীল্ড ছাড়বে না—পুলিশকে হারাবেই! এমন কি, ফাইন্যাল খেলার দিনও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কার যে হার-জিত তার কিছুর ঠিক ছিল না! যে কোন মুহূর্ত্তে কাষ্টামস্ গোল শোধ দিয়ে আর একখানা গোল চাপাতে পারত! তারপর দিন কাগজে লিখেছিল,—It was anybody's

game until the final whistle! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুলিশই জিতল! শেষ পর্য্যন্ত সকলের অপ্রত্যাশিতভাবে সকলকে বিস্মিত করে পুলিশই আই, এফ, এ শীল্ড জয়লাভ করল! সেদিনকার খেলায়, যদি তোমাদের শুনতে ভাল লাগে, কাষ্টামস্‌এর ফরোয়ার্ডরা ভাল খেলতে পারেনি, বুদ্ধি খরচ করে ভাল খেলেছিলেন কেবলমাত্র কাষ্টামস্‌এর ক্যাপ্টেন কে ভট্টাচার্য্য। সেদিন গোলেতে জার্ডিন্‌ও খেলা জমাতে পারেনি। জার্ডিন্ পাকা গোলকীপার কিন্তু সেদিন তার খেলা কি করে পড়ে গেল! অন্যদিকে পুলিশ খুব চমৎকার না খেললেও—মিলেমিশে সকলেই খুব খেটে ভাল খেলে ছিল বলেই তারা জয়ী হয়েছে।

নীচে আমরা ১৮৯৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত শীল্ড ফাইন্যালিষ্টদের তালিকা দিলাম। একমাত্র দুটি ভারতীয় দল এই বিখ্যাত তালিকায় স্থান পেয়েছে, ১৯১১ সালে মোহনবাগান ও ১৯৩৬ সালে মহামেডান্‌স্।

[১৮৯৩ সাল থেকে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত শীল্ড চ্যাম্পীয়ানদের তালিকা]

১৮৯৩	রয়েল আইরিশ	১৯১৭	টেন্‌থ্ মিডেক্স
১৮৯৪	,,	১৯১৮	ট্রেনিং রিসার্ভ
১৮৯৫	রয়েল ওয়েলস্ ফুসিলার্স	১৯১৯	ব্রেকনকস্থায়ার
১৮৯৬	ক্যালক্যাটা	১৯২০	ব্ল্যাক ওয়াচ্
১৮৯৭	ড্যালহাউসী	১৯২১	উর্‌ষ্টার শায়ার
১৮৯৮	গ্লাউসেষ্টারস্থায়ার	১৯২২	ক্যালক্যাটা
১৮৯৯	সাউথ ল্যাঙ্ক্যাস্থায়ার	১৯২৩	,,
১৯০০	ক্যালক্যাটা	১৯২৪	,,
১৯০১	রয়েল আইরিশ ফুসিলার্স	১৯২৫	রয়েল স্কট্ ফুসিলার্স
১৯০২	এ ও এম্ হাইল্যাণ্ডারার্স	১৯২৬	সেরউড্ ফরেষ্টার্স
১৯০৩	ক্যালক্যাটা	১৯২৭	,,
১৯০৪	,,	১৯২৮	,,
১৯০৫	ড্যালহাউসী	১৯২৯	রয়েল আলষ্টার রাইফ্‌ল্‌স্
১৯০৬	ক্যালক্যাটা	১৯৩০	সী ফোর্থ
১৯০৮	গর্ডন হাইল্যাণ্ডারস্	১৯৩১	হাইল্যাণ্ড এল্ আই
১৯০৯	,,	১৯৩২	এসেক্সস্
১৯১০	,,	১৯৩৩	ডি সি এল আই
১৯১১	**মোহনবাগান**	১৯৩৪	ডারহাম্‌স্—কে আর আর (খেলা স্থগিত)
১৯১২	রয়েল আইরিশ রাইফ্‌ল্‌স্	১৯৩৫	ইষ্ট ইয়র্ক
১৯১৩	,,	১৯৩৬	**মহামেডান স্পোর্টিং**
১৯১৪	কিংস্ ওন্ রেজিমেণ্ট	১৯৩৭	সিক্সথ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯১৫	ক্যালক্যাটা	১৯৩৮	ইষ্ট ইয়র্ক
১৯১৬	নর্থ ষ্টাফর্ড্‌স্	১৯৩৯	পুলিশ

চলন্তিকা

কয়েক দিন আগে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে যে জলঝড় হয়ে গেল তাতে যা ক্ষতি করেছে, যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে তা বর্ণনার অতীত। সহরগুলির চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয়েছে গ্রামে; বন্যায় দুর্ভিক্ষে গ্রামে গ্রামে লোকজন চাষীদের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে। সহরে ধনী লোকেরা থাকে, গ্রামে থাকে গরীবেরা—শস্য যাদের প্রাণ। শস্য জলে গেল ডুবে, ক্ষেত গেল ভেসে, তাদের ঘর গেল, প্রাণ গেল! ক'দিন ধরে আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ল, সহরে বসেও আমরা বিপন্ন হয়েছিলাম। রাস্তায় জল, ট্রাম্-বাস্ বন্ধ, লোক চলাচল বন্ধ। এমন কি, অনেকের বাড়ীর ভেতর জল ঢুকে রান্না বন্ধ! বাড়ীতে জামাকাপড় শুকোয় না, জিনিষপত্র জোলো-হাওয়ায় ছাতা ধরে যায়, বাজারে তরী-তরকারীর দাম বেড়ে গেল। সহরের হোল এই ক্ষতি। সহরের ক্ষতি—যে ক'দিন জল, সে ক'দিন। কিন্তু গ্রামের ক্ষতি সারা বছরের, অনেকের সারা জীবনের। বর্দ্ধমান জেলা, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও বগুড়া—বাংলার এ কয়েকটি জায়গা সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

* * * * *

এদিকে বাংলায় যেমন জল আর জল, নদী ফুলে ফুলে উঠেছে, বন্যায় মাঠ-ক্ষেত ভেসে যাচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি বম্বেতে, গুজরাটে, কাথিওয়াড়ে জলাভাবে আকাশ, বাতাস, মাটি সব শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানে নদীতে জল নেই, মাঠে ঘাস নেই, দুর্ভিক্ষ সেখানে জীবন বিপন্ন করেছে। ঘাসের অভাবে হাজার হাজার গরু-বাছুর মারা পড়ছে। খবর পাওয়া গিয়েছে যে কাথিয়াড়ে, গুজরাট ও কচে খাদ্যাভাবে চল্লিশ হাজারের বেশী গরুবাছুর মারা পড়েছে। আমেদাবাদ থেকে আমাদের এক বন্ধু লিখেছেন যে জলাভাবে সেখানে চারিদিক ধূ ধূ করছে, জিনিষপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, সরকার থেকে গরু-বাছুরের জন্য দেশান্তর থেকে ঘাস কিনে আনা হচ্ছে! আশ্চর্য্য এ ভারতবর্ষের আবহাওয়া! বৈজ্ঞানিকদের কাছে ভারতের আবহাওয়া আজও গবেষণার বিষয় হয়ে আছে। কোন্ দিন কোথায় এর আবহাওয়া কি রূপ নেবে কেউ বলতে পারে না।

* * * * *

শিকারীরা নানা রকম লোভ দেখিয়ে বড় বড় বন্য জন্তু শিকার করে থাকেন। কিন্তু অনেক জন্তু-জানোয়ার শিকারের এই চাল ধরে ফেলে আজকাল চালাক হয়ে পড়েছে। লোভটা অতিরিক্ত হলেই মুস্কিল। সুমাত্রাতে একটা কুমীর বহু দিন ধরে ভয়ঙ্কর উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল কিন্তু যখন একদিন কুমীরটা একটা মেছুনীকে ধরে গভীর জলে মিলিয়ে গেল তখন ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। নানা রকম

কল-কৌশল করে নরখাদক কুমীরটাকে ধরবার চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু পাজি কুমীরটা বুঝতে পেরে এমন জায়গায় লুকিয়ে পড়ল যে তাকে সেখান থেকে নড়ান দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। কিন্তু বুড়োদের বড়দের সব বিস্মিত করে একটি ছোট ছেলের একটা দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। বুদ্ধিটা যেমন দুষ্টু তেমনি বিপদজনক। ছেলেটির নাম ওয়েভারলিঙ্। ওয়েভারলিঙ্ তার বাবাকে বললে, সে জানে কোথায় কুমীরটা লুকিয়ে আছে। সে নিজে সাঁতার কেটে কুমীরটার খুব কাছাকাছি যাবে এবং কুমীরটা যেই তাকে ধরতে আসবে সে জোরে সাঁতরে কম জলে তাকে নিয়ে আসবে তখন তাকে ধরে ফেলা সুবিধা হবে। প্রস্তাবটা বুদ্ধির হলেও, বিপদসঙ্কুল। ছেলের এই প্রস্তাবে ওয়েভারলিঙ-এর বাবা শিউরে উঠে নিষেধ করলেন। ওয়েভারলিঙ্ কিছু না বলে তার বাবাকে সে জায়গায় নিয়ে গেল এবং কিছু বলবার আগেই সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে একটা ধারে সাঁতরে গেল! মুহূর্ত্তের মধ্যে ওয়েভারলিঙ-এর কয়েক হাতের মধ্যে সে বিরাট কুমীরটার মস্ত মাথা দেখা গেল! কিন্তু ওয়েভারলিঙ্ যেমন সাহসী তেমনি ওস্তাদ সাঁতারু। কুমীরটা পেছনে নিয়ে সে যেই কম জলে এসে পড়েছে, তার বাবা তখনই গুলি করে কুমীরটার ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। এমনি করে একটি ছোট ছেলের বুদ্ধি ও সাহসে একটা নরখাদক কুমীর জব্দ হ'ল। অতি লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু!

*   *   *   *   *

রংমশালে আমরা মঙ্গলগ্রহে প্রাণী আছে কি না এ বিষয় আলোচনা করেছিলাম। বর্ত্তমানে মঙ্গল গ্রহটিকে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি দেখা গিয়েছে। ১৯২৪ সালের পর এত কাছে মঙ্গলগ্রহকে নাকি কখনও দেখা যায়নি। তাই বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই বড় বড় শক্তিমান টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দিনরাত পর্য্যবেক্ষণ করছেন। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর আরো কাছে আসবে নাকি ১৯৪১ সালে অক্টোবর মাসে! তখন মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব হবে মাত্র ৩৯,০০০,০০০ মাইল! অবশ্য নতুন কিছু আবিষ্কার হয়নি। আশ্চর্য্য যা কিছু হয়েছে তা আগেই আবিষ্কার হয়েছে। তবে ১৯৪১ সাল অক্টোবরে বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন, তারা নতুন বিস্ময়কর কিছু দেখতে পাবেন। আগের সব আবিষ্কারে আমরা শুনেছি মঙ্গলগ্রহে ঋতু পরিবর্ত্তন আছে, সেখানকার মেরুদেশে বরফ গলে পড়ে। গ্রীষ্মে যে সবজে-কালো রঙ দেখা যায় তা হয়ত গাছপালা উদ্ভিদের। কিন্তু বেশীর ভাগ সেখানে মরুভূমির মত জায়গা। সমুদ্র নেই, সম্ভবতঃ অন্য জলেরও অভাব। মঙ্গলগ্রহের যে জায়গাগুলি মরুভূমি সেগুলি টেলিস্কোপে নেবু রঙের দেখায়। মঙ্গলগ্রহের সাদা কালো, নেবু, সবুজ প্রভৃতি রঙ বদলাতে দেখা যায়—তাথেকে এবং আরো অন্যান্য পর্য্যবেক্ষণ থেকেই আন্দাজ করা হয়েছে মঙ্গলগ্রহে নিশ্চয় ঋতু-পরিবর্ত্তন আছে। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, মঙ্গলগ্রহে হাওয়ার অভাব কিন্তু কতটা পরিমাণ অক্সিজেন ও কতটা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড আছে তা বলা যায় না। এই পরিমাণটা জানতে পারলেই মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার পর্য্যবেক্ষণে যদি নতুন তথ্য পাওয়া যায়—তাহলেই বলা যাবে মঙ্গলগ্রহে প্রণী আছে কি না। তবে উদ্ভিদের প্রাণ যদি থাকে তাহলে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয় বরং সম্ভাবনার ভেতরে। কারণ মঙ্গলগ্রহে তা হলে প্রাণ তো রয়েছে—উদ্ভিদ সেখানে বেঁচে রয়েছে। অন্যান্য প্রাণী জীবজন্তু আসতে বিলম্ব কি। আমরা ১৯৪১ সাল অক্টোবর মাসের প্রতীক্ষায় রইলাম। দেখা যাক, পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়ে মঙ্গলগ্রহ কি রহস্য উদঘাটিত করে!

*   *   *   *   *

হিমালয়ের ডাকে আডাম্ কারপিন্‌সিকের নেতৃত্বে "পোল্যাণ্ডের যে পাহাড় বৈজ্ঞানিক[illegible]সেন তাঁরা হিমালয়ের একটি চূড়া নন্দ দেবীর (২৫,৬৬১ ফিট উচ্চ) প্রায় কাছাকাছি উঠতে পেরেছিলেন। নন্দদেবী চূড়াটি জয় করাই তাদের আকঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু হিমালয়ের কোথায় যে কি আছে কোথায় কি যে ঘটছে তা কেউ আগে থেকে টের পায় না। এই দলের দু'জন একজায়গায় কুড়ি হাজার ফিটের উপরে তাঁবু ফেলেছিলেন; এক ভীষণ মুহূর্ত্তে উপরের কোত্থেকে এক বিরাট তুষার স্রোত অকস্মাৎ এসে সে তাঁবুর অস্তিত্ব মুছে ফেলে। দলের কয়েকজন অনুসন্ধান করতে করতে সে জায়গায় এসে দেখে কেবল চাপ চাপ বরফ আর বরফ। প্রকাশ, কুলিরা নাকি তাঁবুতে ঠিক সময়মত পৌছতে পারেনি, তাঁবু নাকি ঐ জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার কথা ছিল। কুলিরা জিনিষপত্র নিয়ে ঠিক সময়ে পৌছতে না পারায় তাঁবুতে দলের দুজন যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সেখানে থাকতে হয়। তারপর তাঁবু শুদ্ধ হিমালয়ের তুষার-রাশির মধ্যে বিজ্ঞানের জন্য তাঁরা জীবন বলি দিলেন। হিমালয়-অভিযানের ইতিহাসে এর আগেও কয়েকটি এরূপ শোচনীয় ও নির্ম্মম দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু যারা বিজ্ঞান সাধনায় তপস্বী, যারা সাহসী এডভেঞ্চার-প্রিয়, যারা অজানার উজানে নতুন আবিষ্কারের আশায় প্রদীপ্ত, মৃত্যুকে তারা ভয় পান না।

*   *   *   *   *

সেদিন পুণাতে নিখিল-ভারত ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হল। এতে যাঁরা চ্যাম্পিয়ন হলেন আগামী অক্টোবরে গ্রীসে যে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হবে তাতে দৌড়বার জন্য তাঁদের নির্ব্বাচিত করা হবে। সেদিন পুণাতে ভারতীয় ম্যারাথন রেসে পাটিয়ালার ছোটা সিং ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ —মাত্র দুঘণ্টা ৪৩ মিনিট ৪৩.৮ সেকেণ্ডে দৌড়ে অল্-ইণ্ডিয়া রেকর্ড করলেন? পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল বম্বের এম্ ভর্ম্মার, তাঁর লেগেছিল তিনঘণ্টা পাঁচ মিনিট। ছোটা সিং যে নতুন রেকর্ড করলেন তা খুব চমৎকার ও আশাপ্রদ। তিনি গ্রীসে (এথেন্সে) তাঁর দৌড়ের পরীক্ষা দিতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। আমরা আশা করি অক্টোবারের ঐ আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে ছোটা সিং ভারতবর্ষের গৌরব রাখতে পারবেন। সেদিন পুণাতে ছোটা সিং যে বাহাদুরী দেখিয়েছেন তা চারিদিকে প্রশংসা পেয়েছে। সেদিন পাতিয়ালার জয় জয়কার, কারণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, তিনটি স্থানই পরপর অধিকার করলেন পাতিয়ালার রাণারগণ। নীচে ফলাফল দেওয়া হল

প্রথম—ছোটা সিং, ২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ৪৩.৮ সেঃ
দ্বিতীয়—ছাজ্জু সিং, ৩ ঘণ্টা
তৃতীয়—অমর সিং, ৩ ঘণ্টা ৯ মিঃ ১০ সেঃ

এই নিখিল-ভারত ম্যারাথন রেসে বাঙ্গালী রানারস সব কোথায়? খেলাধূলা মহলে বাঙ্গালীর ছেলেরা কি আবার পিছিয়ে পড়ল?

কবিতা

রংমশাল

শ্রীমিহির কুমার গোস্বামী (গ্রাহক নং ১২৫৭)

কালি পূজোর দিনে,—
পট্‌কা বাজি কিনে—
রাতের বেলা জ্বালবো মোরা সবে,
ভাইটি মোরে বলে,—
"সবই যখন জ্বলে—
রংমশালও আন্‌তে হ'বেই হ'বে।"
অমনি ছুটে গিয়ে,
দামটী হাতে দিয়ে
দলে দলে রংমশালে ভরিয়ে নিলাম সাজি।
তবুও শুধায় খোকা—
"তুমি একটী বোকা,—
'রংমশালে'র রঙিন্ ছবি খুলতে হবে আজি।"

গল্প

ছাতা-বিভ্রাট

(রূপক)

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়

জ্যাঠামশাই হাঁকলেন : বিন্দে, একটা ছাতা আন্‌তে পারবি ?

'না' বলবার যো নেই। বল্লুম, কেন পারবোনা ?

একখানা নোট নিয়ে জ্যাঠামশাই আমাকে প্রায় চমকে দিয়ে বল্‌লেন, খবর্দ্দার! আজকালকার ওই সব চক্‌চকে ফ্যাসান দেখে ভুলবিনা। ওসব বাহার হুদিনেই নষ্ট হোয়ে যায়—চেকনাই কাপড় হুদিনেই ছিঁড়ে উড়ে যায়। কাপড়টা বেশ পুরু দেখে নিবি। বুঝলি ?

—আচ্ছা।

—আর দেখিস্, ছাতার বাঁটটা যেন পল্‌কা না হয়। মেম্‌দের নকল করে' এখন যে-সব সস্তা ফ্যাসান হয়েছে, সেদিকে একেবারে তাকাবিনা। ওই সব ন্যাড়া মাথা হু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনা। ঝক্‌ঝকে বেতের বাঁট দেখেই যেন আবার কিনে ফেলিস্‌নি,—বেশ শক্ত মজবুত বাঁশের নিয়ে আস্‌বি।

যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, তবু নিস্তার নেই!

—আর শোন্, ছাতাটা খুলে শিক্‌গুলো নিজে বেশ করে দেখে নিবি। দোকানদারের কথায় কখনো বিশ্বাস করিস্‌নি, ওরা বলেনা এমন মিথ্যে কথা নেই। খুব সাবধান!

একটা বড়ো দোকানে এসে, বেশী দিন টেঁকবে এম্‌নি ভালো ছাতা চাইলুম।

দোকানদার একেবারে নিখুঁত হাল-আমলের গোটাকতক চমৎকার ছাতা এনে হাজির কোর্‌লে। সর্বনাশ! এ' জিনিষ নিয়ে গেলে যে নির্ঘাৎ আমার পিঠেই ভাঙ্গা হবে!

তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, দেখুন আমার হাতল-ওলা চাই।

এবার এলো একটা চক্‌চকে পালিশ-করা আর সিল্ক-মেশানো কাপড়ের ছাতা।

শিউরে উঠে বল্‌লুম, না, না, না, এ রকম চাইনা। এই কাপড়টা হবে খস্‌খসে পুরু, আর এইটে হবে বেশ শক্ত মজবুত বাঁশের—এ' ধরণের জিনিষ কি আছে, দেখান্।

লোকটা আমার চশমা ইত্যাদির দিকে কেমন অবাক চোখে খানিক চেয়ে, গুদোমে গেল। এলো প্রায় মিনিট পনেরো পরে গলদ্‌ঘর্ম অবস্থায়; হাতের ছাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে (আইন বাঁচিয়ে, যা বল্‌বার নয় তা-ও বল্‌লে)—এই নিন, আপনার মনের মত মাল। রোদ-বিষ্টি থেকে এ' তো বাঁচাবেই, উপরন্তু এতে চোর শায়েস্তা হবে, রেডিও-র এরিয়েল খাটানো যাবে, এমন কি খোলা নৌকায় এ' খোঁটা আর পালের কাজ দেবে। হু'টাকা চার আনা দাম।

বিনা বাক্যে দাম দিয়ে ছাতাটি নিয়ে কানের মধ্যে ঝিম্‌ঝিমে আওয়াজ শুন্‌তে শুন্‌তে বাড়ি ফিরলুম।

ছাতা জ্যাঠামশায়ের ভারী পছন্দ হোলো ; সবাইকে দেখাতে লাগলেন আর আমাকে একটা আস্ত টাকা-ই দিয়ে ফেল্‌লেন ঃ খাসা ছাতাটি এনেছিস্ রে । যা' আজ মোহনবাগানের খেলা দেখে আয় ।

ঠিক পরের দিনই জ্যাঠামশাই কার সামনে ছাতাটার মোটা বাঁট ধরে' বোধ হয় শক্তি-পরীক্ষা কোরছিলেন । সজোরে ওটাকে যেই মেঝেতে ঠুকেছেন, ওঁর সঙ্গে যেন ঠাট্টা করে' ওটা ধনুকের মতন বেঁকে গেল ।……

সাবেকি জিনিষ হোলে তাতে ঘুণ ধরতেও পারে জ্যাঠামশাই এই সত্যটা ভুলে গিয়েছিলেন ।

কবিতা

বিদায়

শ্রীরতন কুমার রায়

পূব গগনে চলছে তখন আলোর হুলুস্থুল,
এমন সময় পাপড়ি মেলে চাইল গোলাপ ফুল ।
পূবের আকাশ লাল হয়েছে পশ্চিমেতে নীল,
অনেক দূরে ঘুরে ঘুরে উড়ছে কটা চিল ।
সোনার বরণ প্রজাপতি হাওয়ায় ভেসে ভেসে
মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে পাখা চলেছে কোন্ দেশে !
ডেকে তারে বল্লে গোলাপ, "প্রজাপতি ভাই,
একা আমার দিন কাটে না, খেলার সাথী নাই ;
বন্ধু তুমি হবে আমার ?"—মধুর হাসি হেসে
প্রজাপতি ফুলের বুকে বসলো উড়ে এসে ।
ফুলের সাথে প্রজাপতির চলত শুধু খেলা,
কাঁপিয়ে পাখা যেত যখন আসতো পড়ে বেলা ।
ফুলকে ঘিরে উড়ত কভু, কেনই কেবা জানে !
কখনো বা কইত কথা ফুলের কানে কানে ।

* * * *

ভোরের আলো ঠিক ফোটেনি বাতাস পাগল পারা,
নীল আকাশে জ্বলছে কেবল একটি ছুটি তারা ।

শুকতারাকে ডেকে গোলাপ বল্ল, "শোন ভাই.
বিদায় নেবার সময় হ'ল বলি তোমায় তাই,
প্রজাপতি বন্ধু আমার, আসবে সকাল বেলা,
আমার কথা বলতে তা'রে করবে নাকো হেলা ।

* * * *

সোনার বরণ প্রজাপতি রঙীন পাখা তার
গোলাপকে তার খুঁজে খুঁজে বেড়ায় চারিধার ।

ফটো

গাছে চড়া ইলা সেন

চিঠি

সম্পাদক মশাই,

শুনছি নতুন বছরে রংমশাল আরও ভালো হয়ে বেরোবে। কিন্তু কার্ত্তিক তো প্রায় এসে গেল। 'আরো ভাল'র নমুনা আমরা এখন থেকেই দেখতে চাই। আশ্বিন মাসে যদি 'আরো ভাল'র পরিচয়টা পাওয়া যায়, তাহলে আমরা যারা পুরণো গ্রাহক আছি, তারা তো খুসি হবই, আমাদের বন্ধুরাও আমাদের দলে ভিড়ে পড়ে রংমশালের গ্রাহক হবে।

রংমশাল এই বছরেই ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হতে পেরেছে, এ বিশেষ আনন্দের কথা। আমরা গ্রাহক, এও যেন আমাদের অহঙ্কার করার জিনিষ। রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা বললেই মনে হয় সত্যিকারের সমঝদার ছেলেমেয়ে। তবু, রংমশালকে আরও ভালো করুন, এতো ভালো করুন যেন কোনো পত্রিকা একে ধরতে ছুঁতে না পারে।

ইতি—

পরিমল বসু, গ্রাহক নং ১০৫

রংমশাল ভাদ্রেই কিছু 'আরও ভালো' আশ্বিনে অনেকটা 'আরও ভালো' এবং কার্ত্তিকে বিশেষ 'আরও ভালো' হবে। এখন থেকে রংমশালের 'আরও ভালো' হবার যুগ সুরু হল, এই 'আরও ভালো' হবার আর অন্ত থাকবে না।— সম্পাদক

রংমশালের নিয়মাবলী

১। "রংমশাল" মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে। মাসের ১৫ তারিখের পর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ২০ তারিখের পর, অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য পত্র লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠানো হয় না।

২। রংমশালের বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুল সহ) ২।৵০, ছয় মাসের মূল্য ১৷৹ এবং প্রতি সংখ্যা ।৵০। যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন সংখ্যার মূল্য—প্রতি সংখ্যা ।৵০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

৩। রংমশালের জন্য লেখা পাঠাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া কাগজের একদিকে লিখিবেন ও কপি রাখিবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

৪। যাঁহারা গ্রাহক বা গ্রাহিকা তাঁহারা তাঁহাদের চিঠিপত্রের সহিত অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নং লিখিবেন।

কার্য্যালয়—

১০, ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

ফোন, সাউথ ৪৭৯

শব্দ-চৌকি প্রতিযোগিতা

প্রথম পুরস্কার ৫৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ৩৲

তৃতীয় পুরস্কার ২৲

উত্তর পাঠাবার শেষ দিন ২৫শে ভাদ্র।

এই প্রতিযোগিতায় শুধু রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকারা যোগ দিতে পারবেন। এখন হতে প্রতি মাসে শব্দ-চৌকি প্রতিযোগিতা থাকবে।

সূত্র—পাশাপাশি

১। "আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হ'তেম দশম-রত্ন
নব-রত্নের মালে"

৩। লোকে এ হ'লেই নীতি বিরুদ্ধ অনেক কাজ করতে বাধ্য হয়

৪। নব-রত্নের রত্ন বিশেষ

৬। যোড় হাত (ওলট পালট)

৮। এ খেতে মোটেই ভাল লাগে না, তবুও মানুষে খায়

১০। এ না থাকলে বিদ্যালয় সময় মত চলাই ভার হ'য়ে উঠত, কিন্তু মজা এই যে বায়সের চিৎকারের সঙ্গে মিশিয়েও একে সোজায় খুঁজে পাবে না

১১। এরা চিরকাল পদ দিয়েই আহার গ্রহণ ক'রে এসেছে

১৩। 'পানিতুয়া'র জলটুকু খেয়ে বাকিটা খুড়ো মহাশয়কে দিলেই এর দেখা পাবে

১৪। (ওলট পালট) লোকে এ হ'লেই নিমন্ত্রণে সামর্থ্যের অতিরিক্ত খায়

১৫। সূর্য্য

১৬। যুদ্ধের সময় রক্ত-পাত কেউই নিবারণ করতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র উল্‌টে দিয়ে যদি তার শেষটা ঢেকে দাও তা'হলে দেবীকালিকা তুষ্ট হ'য়েই বরদান করবেন

১৯। "——" ভাল না হ'লে খেয়ে তৃপ্তি পাওয় যায় না

২১। এ হস্তীরও আছে, মানুষেরও আছে; কিন্তু হস্তীর যদি এ না থাকত তাহলে তাকে আমরা অন্য নামে ডাকতে বাধ্য হতুম

২২। শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা

২৩। যাদের আমরা চিরকাল অনুভবশক্তিহীন জড় বলে জানতাম তাদের সম্বন্ধে আমাদের চির-কালের সেই ধারণাকে ইনিই উল্‌টে দিয়েছেন।

সূত্র—উপর হইতে নীচে

১। হস্তি শাবক (ওলট পালট)

২। ধনাধিপতি

৫। স্ত্রীলোকের ভূষণ বিশেষ

৭। নারিকেল বৃক্ষ

৯। পুত্র

১১। "——" পেলে সকলেই সব সময়ে সব কাজ খুব মন দিয়ে করে

১২। যদিও এ ধূলা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও লোক মাহাত্ম্যে লোকের মাথায় ওঠে

১৭। শেওলা (ওলট পালট)

১৮। মহাদেব

২০। সমগ্র জগৎ যাহার করুণা ভিক্ষা করে তাঁহারও আশ্রয় ইনিই।

আমাদের লাইব্রেরী

আমাদের লাইব্রেরী

সমালোচনা

হলুদকুঠি : ছেলেমেয়েদের ডিটেকটিভ উপন্যাস : ছবি ১৬ পৃষ্ঠা, লেখা ১০০ পৃষ্ঠা : রঙীন শক্ত মলাট : মূল্য দশ আনা : শ্রীমতী প্রীতিলতা দেবী বি, এ প্রকাশিত : উদয়তীর্থ, ১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

লেখক স্বকুমার দে সরকার আজকাল কিশোর পাঠকপাঠিকাদের পরমপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। স্বকুমার বাবুও কিছু বাকী রাখছেন না, তাঁর কলম থেকে দ্রুত রূপকথা, ইতিকথা, অ্যাডভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ উপন্যাস, ভৌতিক কাহিনী রহস্য কাহিনী বেরিয়ে আসছে। আর সে সব বাজে লেখা নয়, পাঠকপাঠিকাকে মুগ্ধ করার মত লেখা। এই হলুদকুঠি উপন্যাসে লেখক কি কম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন! ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখতে বসে আমরা প্রায়ই ঠিক সন্তাদরের অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস লিখে বসি—কিন্তু ডিটেকটিভ উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস একজিনিষ নয়। কোনো একটি বিশেষ সূত্র ধরে রহস্যের মীমাংসা আবিষ্কার করা হচ্ছে ডিটেকটিভ ও গোয়েন্দার কাজ। ওদিকে খানিকটা হুটোপাটী, হাতাহাতি হলেই অ্যাড্ভেঞ্চার হয়ে যায়। তা ছাড়া, ডিটেক্টিভ উপন্যাস লিখতে বসে আমরা প্রায়ই বাজে কথা লিখে ছেলে বখাটে, সত্যিকারের বুদ্ধির কৌশল দেখিয়ে ছেলেদের বুদ্ধি উস্কে দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাই। এই সব বিষয় বিবেচনা করে দেখলে বলতে হবে, এদেশের শিশুসাহিত্যে হলুদকুঠির জুড়ি নেই।

এ বই হাতে করে আমরা বিস্মিত হয়েছি। ছবি ছাপা বাঁধাই ইত্যাদিতে এত বুদ্ধি ও রুচির পরিচয় আজ পর্য্যন্ত কোনো প্রকাশক দিয়েছেন কি না সন্দেহ। অথচ নির্ব্বোধের মত প্রকাশিকা অযথা অতিব্যয় করেন নি। শিল্পী গোপেশবাবু মলাটের ছবিতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ভিতরের ছবি ও মুখপত্রের ছবিগুলিও অতুলনীয়। বইখানা হাতে নিয়ে একবার বলতে ইচ্ছে করে, "চমৎকার!"

প্রবন্ধ

কি নিয়ে লিখি

কি নিয়ে প্রবন্ধ লিখি! প্রায়ই ছেলেমেয়েদের চিঠি পাই, কি লিখি বলুন তো! আমিও এই প্রশ্নের হঠাৎ একটা জবাব খুঁজে পাই না। যাঁরা পাকা লেখক, পুরাণো বিষয় নিয়েই তাঁরা নূতন লেখা লিখেছেন।

বিষয় পুরণো হতে পারে, কিন্তু পাকা লেখকের মন যে নূতন। চিরযুগের আকাশকে কোন লেখক বলছেন, স্বর্গের সমুদ্র! কোন লেখক বলছেন, তারার আলো দোলানো নীল চাঁদোয়া। কিন্তু ছেলেমেয়েরা তো আর পাকা লেখক নয়। তারা প্রায়ই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবে, কি লিখি। কাগজ, কলম, কালি আর বিশুদ্ধ ঝরঝরে ভাষা সবই তৈরী, শুধু কি নিয়ে লিখি এই হচ্ছে সমস্যা।

আমি বলি, বোসো জানালায়। হঠাৎ যা দেখে, যাকে দেখে ভালো লেগে যাবে তা নিয়ে, তাকে নিয়েই লিখে ফেলো গদ্য পদ্য খানিকটা। চানাচুরওয়ালা হেঁকে চলে যাচ্ছে কিম্বা ঘুগ্‌নিওয়ালা পথে বেশাতি খুলে বসেছে, একটী রোগা ছেলে হ্যাংলার মত মুখে বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়ে সেখানে ঘুর ঘুর করছে, এ নিয়েও সত্যিকারের ভালো লেখা লেখা চলে। যা দেখে হঠাৎ ভালো লাগে, হঠাৎ মন খানিকটা দুলে ওঠে, ছেলেমেয়েরা শুধু তাই নিয়েই লিখবে। তারা কেন লিখতে বসে ভাববে? লেখা তো অঙ্ক নয়।

ছুটীর চিঠি

কুমারী মলি মিত্র

কল্যাণীয়াসু

সেজদি, তোমার পত্রখানা পেয়েই সদ্য সদ্য
ইচ্ছে হ'লো লিখে ফেলি একটা চিঠি পদ্য।
কবি হওয়া যায় না কিন্তু করলে খালি চেষ্টা,
কষ্টে লেখা কবিতাতে হাসির খোরাক শেষটা!
কবির কলম—স্বচ্ছ গতি, নাইকো কোনো কষ্ট,
গোঁজামিলের হ্যাপায় তাঁরা হন্‌না ভাব-ভ্রষ্ট।
কবির কাছে কবিতাটা আদৌ তো নয় শক্ত;
ভাব আর ভাষা তাঁদের প্রতি নিতান্ত আসক্ত;
কবিতা তো আর কিছু নয়, রুদ্ধ ভাবের ঝর্ণা;
শান্ত চিত্ত দেখলে কবির কলমে ছায় ধর্না।
মিল জোটালেই কবি হবেন এ কথা ঠিক নয়তো,
তা যদি হয় মিলওলারা মস্ত কবি হয় তো!
অনেক সময় নিজেই দেখি—শ্রম হয়েছে পণ্ড;
মিলের তরে ভাব্‌টা বেজায় হ'য়ে গেল ভণ্ড।

অর্থাৎ, কি লিখতে গিয়ে লিখে ফেল্‌লুম অন্য,
তাতেই হয়তো অরসিকে ক'রলে ধন্য ধন্য।
আজ্‌কে আছি খুবই ভালো তাই ক'রছি চেষ্টা,
খামে মুড়ে হাসির খোরাক—সুস্থ মনের রেশটা।
একটু যদি হাসায়, আমার এই ছোট্ট পত্তর,
শপথ ক'রেই ব'ল্‌বো তবে উঠ্‌ছি সেরে সত্বর।
হেসে যে লোক ছায় উড়িয়ে আপন যত কষ্ট ;
সেইতো রসিক, আমি বলি—আমার কথা স্পষ্ট।
পরকে যে জন হাসায় নিয়ে আপন দুরবস্থা,
তারই কাছে বিকোচ্ছে সুখ—দরেতে খুব সস্তা।
হাসি নিয়ে দৈন্য মোদের ক'রবো খানিক খর্ব্ব,
অভাব চাপেও মরতে নারাজ থাক্‌বেত সেই গর্ব্ব।
একটা কথা ব'লে নিয়ে—লিখছি আসল পত্র,
ইচ্ছে আছে খুল্‌বো আমি বিরাট হাসির সত্র।
রচনাটা হয়নি কিছুই, লিখছো তুমি পত্রে,
ওটার তরে লজ্জা তোমার দেখছি প্রতি ছত্রে,
একেবারেই পাকা লেখক কেউ কখনো হয় কি ?
লিখে লিখে তবেই তো হয়, সত্যি কথা নয় কি ?
রবীন্দ্রনাথ প্রথম লিখেই হন্‌নি মহা কবি যে,
অনেক দিনের সাধনাতে আজকে তিনি রবি যে।
চেষ্টা করে পারবে তুমি, জানবে এটা নিশ্চয়,
ক্রমে ক্রমে খুল্‌বে লেখা—লিখতে শেখো নির্ভয়।
একটা ভাষা ক'রলে দখল—যাকে বলে চোস্তো,
অপর ভাষা খুব সহজে হয়ে যায় দোরোস্তো।
হয়তো তোমায় বলেছিলুম—মহা কবি দত্ত,
গোড়া থেকেই ইংরাজীটার চুষেছিলেন সত্ব।
ইংরাজীটার বরাবরই ছিলেন গোঁড়া ভক্ত,
ভেবেছিলেন ইংরিজিতে দখল করেন তক্ত।
কিন্তু যখন বিফল হ'লো দত্ত মশা'র চেষ্টা,

মনের দুখে মাতৃভাষার শরণ নিলেন শেষটা।
বয়স তখন গড়িয়ে গেছে ধরছে চুলে পাকটা,
তাতে কি হয়, সুরু করেন মাতৃভাষার পাঠটা।
সংস্কৃতও নিলেন শিখে, তারপরে অভাব্য,
লিখে দিলেন এক আঁচড়ে মেঘনাদবধ কাব্য।
তুমি যদি প্রবেশ করো বাংলা ভাষার মর্ম্মে,
আটকাবে না ইংরাজীটা তোমার লিখন কর্ম্মে।
কিন্তু জেনো, শিখতে হলেই প'ড়তে হবে গ্রন্থ,
পুঁথির পাতায় থাকে অনেক লেখার গুপ্ত মন্ত্র।
লেখা তোমার দেখবো আমি ধীরে এবং সুস্থে,
ব'লে রাখি—আমাকে আর পারবে নাকো দুষ্‌তে।
মহাভারতীর প্রশ্ন ক'টা কাল্‌কে দেবার ইচ্ছে,
শুন্‌লুম ছোটদিদি নাকি অঙ্কেতে মন দিচ্ছে ?
নোটন, ঝোটন, ফোটন—এরা সবাই কিছু প'ড়ছে তো ?
রথিন, সুধীন, দ্বীপক—এরা খেলাধূলা ক'রছে তো ?
আর বেশী নয় এই বারেতে পেন্সিল হোক্ বন্ধ।
অনেকখানি লিখে ফেল্‌লুম খটমট ছন্দ।
হয়তো তোমার প'ড়তে গিয়ে লাগতে পারে তিক্ত !
হ'তেই পারে ! আমি তো নই কাব্য রস-সিক্ত !
আমোদ দিতে চেষ্টা পেলুম যতটা মোর শক্তি,
স্নেহাশীষে ভ'রে দিলুম শেষের কয়েক পঙ্‌ক্তি।

ইতি—

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

* রোগ শয্যা হইতে ছাত্রীকে লিখিত

পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার অতি প্রিয় ও পরম স্নেহের ভাই বোনেরা,

প্রশ্ন কণ্টকিত স্নেহ ভালবাসা আর অভিমান ভরা চিঠিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি—কি উত্তর দেবো ? কালো কালো অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে তার ভিতর জেগে ওঠে কাদের সোনামুখ আর অভিমান ম্লান আঁখি।

তোমাদের মনের ছায়া তোমাদের চিঠির ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমি তোমাদের চিঠির ভিতর দেখছি তোমাদের ছবি ! এমনি ছবি কি আমি আঁকতে পারি ?

অরুণ ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৬৬

লক্ষ্মীটী ভাই আর রাগ করো না,—ভুলটা আমারই, কারণ কোন ক্লাসের উপযোগী বই-এর লিষ্ট চেয়েছ সেইটা ভুলে গিয়েছিলাম। এবার যখন লিখেছ তখন দু'চার দিনের ভিতরই পাঠিয়ে দিচ্ছি। কৃষ্ণার কোন চিঠি আমি তো পাইনি ভাই, পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। তাকে রাগ করতে বারণ করো এবং এবার চিঠি দিতে বলো বুঝেছ ? তোমার হাতের লেখা খুব ভাল হচ্ছে, আরও ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস। প্রভাত দে কে জিজ্ঞাসা করতে বলেছ সে তোমার উপর রাগ করেছে কিনা ?

শতদল দাস (সিলেট) গ্রাঃ ৯৭৭

তোমার প্রথম চিঠি। আমি ও তোমার ভাই বোনরা খুব আনন্দ পেলাম, বোনের সংখ্যা একটি বেড়ে গেল দেখে। তুমি যদি নাম লেখো তবেই ভাই লেখনী বন্ধু পাঠাবার সুবিধা হয়।

শীলা মিত্র (ঢাকা) গ্রাঃ ৪৫৪

আমার ছবির কথা পূর্ব্বেই লিখেছি ভাই, সুতরাং ছবির কথা আর কেন বলছ ? রাগ করিনি শিলু, বুঝেছ ? খবর সব ভালো তো ?

অবনী গ্রাঃ ১০৮১

তোমরা যখন চিঠি লিখবে পুরো নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর সব না লিখলে ভয়ানক অসুবিধায় আমায় পড়তে হয়—একথা আমি বহুবার বলেছি কিন্তু ফল বিশেষ হয়নি ভাই। এ বিষয়ে তোমরা সচেতন না হলে

চিঠির উত্তর কি করে পাবে বল ? লেখনীবন্ধু নিজেরা পছন্দ করে নিলে সব দিক দিয়েই ভাল হয়—তুমি তাই করো। শক্তিপ্রসাদ মিত্রস্কুলে পড়ে কিনা আমি জানি না। সে নিশ্চয় রংমশাল দেখবে, সেই জানাবে। তুমি যে ষ্ট্যাম্পটি পাঠিয়েছ পেয়েছি, সম্ভব হলে তোমাদের যে ভাই চেয়েছে পাঠিয়ে দেবো।

পারুল সেনগুপ্তা (লাহোর) গ্রাঃ ৩৬৬

তুমি লিখেছ 'তুমি রমার দিদি, রমা এখন ওখানে থাকে না, রেখা দাশগুপ্তা তোমার বয়সী হলে তুমি আলাপ করবে'—একথা রেখা শুনছে সেই জবাব দেবে ভাই।

লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (আগড়পাড়া)

রংমশালের নিয়মাবলী রংমশালের পাতাতেই পাবে। বাড়ীর ঠিকানায় তো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না ভাই, আর রংমশালের গ্রাহক না হলেও চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না।

হিমানী রায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ১২৬৪

দিদিভাই-এর কাছে চিঠি লেখার সাহস বা ভরসা না পাওয়ার কি আছে ভাই ? তাছাড়া বিরক্ত হবো কেন ? হিমানী, বেশ নামটী তোমার। লেখনী বন্ধু আমার পছন্দ করার চেয়ে তুমিই নাম জানিও। ব্যাজ পেতে একটু দেরী হলেও ভাবনার কিছু নেই দিদু।

সুরেখা বসু (কলিকাতা) ১০৪৬

তোমাদের চিঠি না যদি পাই তাহলে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা কোন্ পক্ষের ভাই ? রংমশালের গ্রাহক হলেই লেখনীবন্ধু ও চিঠি পাওয়া যায়। লেখা তোমার খারাপ খুব না হলেও ভাল করতে চেষ্টা করো। আমরা সব জিনিসই সুন্দর ও সুচারু করতে পারি যদি একটু ধৈর্য্য থাকে। চাঁদের দেশের মেয়ের সম্বন্ধে পরে জানাবো। ছোট মাসিক পত্রিকার মধ্যে কোনটা ভাল সেটা বলা একটু শক্ত কারণ রুচি সকলের সমান নয়।

জগদীশ দাস (তেলিনীপাড়া) ১১৭'

তোমার চিঠিটা কাব্যের নাক ঘেষা হয়েছে,—রুদ্রদেবের মূর্ত্তি তারপর বর্ষণের পালা ক্রমাগত দশদিন—এতে কত ক্ষতি হয়ে গেল জানো ভাই ? খিচুড়ীটা শেষ পর্য্যন্ত হলো কিনা জানিও।

কুমারী অন্নপূর্ণা খাতুন (মাইহর) ১২৯০

রান্না বান্না শেখার বই আছে তা ছাড়া ভাবীগৃহিনীর বৈঠকে' কি রান্না জানতে বা শিখতে চাও জানালে ইন্দিরা দেবীও জানাবেন। নামটা তোমার বেশ নতুন লাগছে।

সুনন্দা দে

তোমার চিঠি ইন্দিরাদি'কে দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেন যে মাসে ভাবীগৃহিণীর বৈঠক বোসবে সেই মাসে তোমাদের কথামত কাজ তিনি করবার চেষ্টা করবেন।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) ৬৭০

তোমার দু'খানা চিঠিই আমি পেয়েছি। আচ্ছা সন্ধানী বিভাগে জানাবো। হ্যাঁ রেঙ্গুন ছাড়া বহু বহু দূর দূরান্তরে রংমশাল যায়—চিঠির বাক্স দেখেই তো তা বুঝতে পারো!

অজয় কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ) ৪৫৭

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগলো। আমি তো সংবাদ চাই, তোমরা না দিলে চুপ করে থাকা ভিন্ন আমার কি উপায় বল? এখন সকলেই বেশ ভাল আছে তো? হ্যাঁ নিশ্চয় কলিয়ারীর কথা লিখবে। আচ্ছা, বইএর লিষ্ট পাঠিয়ে দেবো।

বাণী সেন (পাটনা) ১০১২

তুমি যে সব বই নিয়ে যাবার কথা বলেছ, সেটা ওভাবে সম্ভব হবে কিনা পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে শীঘ্র জানাচ্ছি।

অমলা চক্রবর্ত্তী (রাওলপিণ্ডি) ১২০৫

তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় আমি খবর নিয়ে পৃথক ভাবে জানাবো ভাই। না, ভাই ওসব গণ্ডোগোল প্রেসের ভূতের জন্য। আমার নাম তুমি এতদিনেও জানতে পারোনি? কিন্তু অনেকে বলে আবিষ্কার করেছে। আচ্ছা দেখ চেষ্টা করে। আমার ঐ একটাই নাম যা তোমরা ডাকো।

মৃগাঙ্ক (১২৪১)

তোমার বইএর লিষ্ট পাঠাবো তার আগে সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা দিয়ে আমায় চিঠি লিখো, তা যদি না করো অনেক দেরী হয়ে যাবে পাঠাতে। তোমার রচনার খবর যথাসময়ে পাবে।

নীরেন্দ্র নাথ রায় (আঠারোবাড়ী) ১১৮৮

তোমার আগের চিঠি পেয়ে একটী বইএর লিষ্ট তোমায় পাঠিয়েচি পেয়েছ কিনা কিছুই জানাওনি। পাওয়ার আগে যেমন আগ্রহ থাকে পেয়ে একটা খবর দিতে হয় একথা ভুলে যাও কেন ভাই? শক্তি প্রসাদের ঠিকানা তোমায় পাঠিয়েছি। রংমশালের বিষয় যা জানিয়েছ কর্ত্তৃপক্ষকে বলবো।

জ্যোতির্ম্ময় মুখার্জ্জি (পাটনা)

তোমার চিঠি পড়ে আশ্চর্য্য হলাম। যাহোক তুমি নিশ্চিন্ত থাক—যত শীঘ্র সম্ভব খবরগুলি জানাচ্ছি।

সাধনা সরকার (গৌহাটী) ৭৬৫

অনেকদিন পরে মনে পড়লো বুঝি? এবারে আমি রাগ করবো না! পাতা ভর্ত্তি অনুযোগ, আচ্ছা এসব আমি পরিচালকদের জানিয়ে ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি।

আরতি চক্রবর্ত্তী

ভুলে যাওয়া নয় বোন, নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করবার উপায় নেই। আমি সব দিয়েছি সময়ে জানতে পারবে।

সুনীলকুমার ঘোষ (কলিকাতা) ১০৭৮

কাকে লেখনীবন্ধু চেয়েছিলে বলোতো, আমার ভাই মনে নেই নাম জানিও। ব্যাজ এর জন্য তাগাদা দিচ্ছি।

মায়াকমল গুহ (রেঙ্গুন)

যে কারণে তুমি নিজে বন্ধু বেছে নিচ্ছনা সে ভুল তো আমারও হতে পারে, সুতরাং ওটা তুমিই করো। ছ মাস ভি, পি করার সুবিধে হবে কিনা জানি না—বলে দেখবো। হিটলার সম্বন্ধে যা লিখেছ পড়েছি।

একটা ভাল খবর শুনেছি। তোমাদের বোন সুজাতা রক্ষিত সুস্থ হয়ে নৈনীতাল থেকে ফিরে এসেছে। তোমরা শুনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে, আমি হয়েছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে তোমাদের ভুলে গেছে কোনও খবরই রাখে না বা দেয় না। যেখানেই থাকুক তোমাদের সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও আমার স্নেহাশীষ তার জন্য রইল।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা ও আশীষ নিও।

ইতি—তোমাদের

দিদিভাই

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। কলিকাতা	৫। ডানজিগ্	৯। প্যারিস
২। হায়দ্রাবাদ	৬। ওয়ারশ	১০। ওয়ারধা
৩। রোম	৭। টোকিও	১১। লণ্ডন
৪। মস্কো	৮। টিনসিন	১২। বার্লিন

ধাঁধার মধ্যে দুটি অক্ষর ভুল ছাপা হয়েছিল, একটি "লি" র স্থলে "র্লি" আর "ন্ত" র স্থলে "ণ্ড" হবে। যে সকল উত্তরদাতা আমাদের এ ভুল দুটি দেখিয়েছেন তাঁদের আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন :—

প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)। জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর)। অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)। মাণিক, বুলু, বাদল, বেবী, হাউলা ও জিম, (ভবানীপুর)। অরুণ, তপু, মেনা, ফিরিঙ্গী,

শামুক, নিনা, শোভা, ন'দা ও কিরণ শীল, (শ্যামবাজার)। অশোক, অসিত, গঁড়ু, তৃপ্তি, রণজিৎ, যূথিকা, সতীশ, ন'মামা ও অসীম, (পুরুলিয়া)।

প্রদীপ কুমার, মঞ্জুশ্রী ও জয়শ্রী সেন, (ভবানীপুর)। রজত নারায়ণ ঘোষ, (চুঁচুড়া)। কুমারী হাসি ও অশ্রু দেবী, (ময়মনসিংহ)। কিনু, মিনু, তোতা ও ময়না, (এলাহাবাদ)। অরুণ, বরুণ, করুণ, বুঁচি, (বনগাঁ)। দেবলকুমার, শ্যামল কুমার, গীতারাণী ও সবিতারাণী মুখার্জ্জি, (গীরাট)। কমলেশ কুমার চৌধুরী, (লাহোর)। প্রণব কুমার ও কুমারী মায়া গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)। কালীপদ, কৃষ্ণপদ ও হরিপদ গোস্বামী, (পাবনা)। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, (রাওয়ালপিণ্ডি)। নির্ম্মল কুমার সেন, (এলাহাবাদ)। বড়দা, মেজদা, বড়বৌদি, মেজবৌদি, রেণু, কণা ও দেবকীনন্দন রায়, (ভাগলপুর)। কৃষ্ণমালী ঘোষ, (ঘুসুরি)। কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জী, (শ্যামবাজার); নিলু, বুবু, মিন্টু ও ছবি, (ভবানীপুর)। নীলিমা, নির্ম্মল, নমিতা, অমল, (সিমলা হিল)।

যাঁদের অধিকাংশ নির্ভুল হয়েছে ঃ—

অজয় কুমার ও বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, (নবদ্বীপ)। গোপালচন্দ্র হালদার, (ভবানীপুর)। হরিপদ ও কালিপদ রায়, (বনহুগলী)। নীলিমা সেন, (পাটনা)। রমারঞ্জন রায়, (মির্জাপুর)। অশোক কুমার রক্ষিত, (চুণার)। বিমলারঞ্জন সেনগুপ্ত, (কটক)। মিসেস্ এস্, বি, রায়, (আহমেদাবাদ)। অণুদা, রাণুদি, টেপি, বুঁচি, খোকন, (পাইকপাড়া)। নান্কু, খুকু, দেবী ও সনাতন রুই, (কৃষ্ণনগর)। অসিত কুমার বোস, (লক্ষ্ণৌ)। হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, (রুড়কী)। শ্রীপতি চরণ দে, (পুরী)। অমরনাথ বসু ও অনাথনাথ বসু, (বেরিলী)। রাসু, নাসু, নারু, হারু ও বীণাপানি আঢ্য, (খুলনা)। অসিতরঞ্জন ও অমিতরঞ্জন তালুকদার, (চট্টগ্রাম)। চন্দ্রশেখর শ্রীমানী, (বিন্ধ্যাচল)। হেরম্ব, সাহানা, শ্যামল ও দেবল মিত্র, (শ্যামবাজার)। অশ্রুমতী দেবী, (ভবানীপুর)। স্মৃতি, আরতি ও রেখা বসু, (শালকিয়া)। পার্ব্বতী প্রসাদ পাইন, (বোম্বাই)। দীপ্তি ও আভা গুপ্তা, (নাগপুর)। রমণী সেন, গণপতি ও বিশ্বপতি রায়, (রাঁচি)। বনবিহারী ঘোষাল, (শিবপুর)। কুমুদবন্ধু দাস, (গয়া)। অবনী মোহন গুপ্ত, (পুরুলিয়া)। মনুজেন্দ্র রায়, (নাটোর)। ছবিরাণী মুখার্জ্জী, (দিল্লী); প্রণব কুমার নাগ, (ভবানীপুর)। গোপাল হালদার, (ভবানীপুর)। অঞ্জলি, লিলি, খেলা, কলি, জুইয়ের ছেলে, মেজদির ছেলে ও নীরেন্দ্রনাথ রায়, (আঠার বাড়ী)।

নূতন বছরের নূতন সংবাদ

তিন বছরের ইতিহাসে ছেদ পড়ল। সুরু হল নূতন যুগের নূতন অধ্যায়।

যে গ্রাহকগ্রাহিকাদের সহযোগিতায় রংমশাল এই তিনবছরে ছেলেমেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক হতে পেরেছে, যাদের সহযোগিতায় নূতন বছরে রংমশাল কল্পনাতীত অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠবে, সেই বন্ধুবান্ধবীদের আমাদের প্রীতিস্নিগ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য্য আয়োজন আমরা করছি।

বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক উদয়তীর্থ এদেশের ছেলেমেয়েদের জন্য 'পৃথিবীর কথা' নামে একসেট বই বার করছেন। এই সেটয়ের তুলনা হয়তো এদেশের শিশুসাহিত্যে আর থাকবে না। সেট-য়ে তিনখানা বই থাকবে। পৃথিবীর বিখ্যাত নরনারীদের কীর্ত্তিকাহিনী, জীবনের অফুরন্ত রহস্য, অ্যাড্-ভেঞ্চার, ভৌতিক কাহিনী, রহস্যকাহিনী, গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় এই সেটটি ছেলেমেয়েদের আনন্দ ও শিক্ষার স্বর্গস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। দেশবিদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের লেখা ও ছবি দিয়ে এই সেট অনিন্দ্য সুন্দর করা হবে। সুতরাং এই সেট-য়ের মূল্য কিছু বেশী না করে উপায় নেই। কিন্তু এই সেট রংমশালের **বার্ষিক** গ্রাহকগ্রাহিকাদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে!

বাজারে যে সেট বিক্রয় হবে তা থেকে রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকাদের সেট একটু স্বতন্ত্র হবে। উদয়তীর্থ রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকাদের জন্য বিশেষ সংস্করণ ছাপবেন।

৩০শে আশ্বিনের ভিতর উদয়তীর্থকে জানাতে হবে আমরা কত সংখ্যা সেট চাই। আমরা স্থির করেছি যে-গ্রাহকগ্রাহকারা ৫ই ভাদ্র থেকে ২৫শে আশ্বিনের ভিতর **বার্ষিক** চাঁদা (কার্ত্তিক ১৩৪৬—আশ্বিন ১৩৪৭) পাঠাবেন, আমরা তাঁদের জন্যই শুধু এই অপরূপ উপহারের ব্যবস্থা করব। ২৫শে আশ্বিনের পর যাঁদের টাকা আমাদের হাতে আসবে, তাঁদের এই উপহার দেওয়া সম্ভব হবে না। ডাকঘরের গোলমালে চাঁদা আসতে এক আধ দিন দেরী হলেও আমরা এই উপহার দিতে দায়ী থাকব না। যাঁদের চাঁদা আশ্বিন ১৩৪৭য়ের আগেই ফুরিয়ে যাবে, তাঁরা যে মাসে চাঁদা ফুরোবে সেই মাস থেকে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য চার আনা হিসাবে পাঠালে এই উপহার পাবেন।

আমাদের কথা

আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা হতে রংমশালের চতুর্থ বৎসর সুরু হবে। রংমশালের ভাদ্র সংখ্যা মাসের প্রথম তারিখেই বার হল। আশ্বিন সংখ্যা ২০শে ভাদ্রে ও কার্ত্তিক সংখ্যা ১৫ই আশ্বিন বার হবে। কার্ত্তিক সংখ্যাই পূজোর সংখ্যা হবে।

রংমশাল এখন হতে মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্বেই বার হবে।

গল্প, উপন্যাস, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে। বিখ্যাত লেখকদের রচনা প্রতিমাসেই প্রকাশিত হবে।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রাপ্য পুরস্কার পাঠান হল। ভাদ্রের ১০ তারিখের ভিতর পুরস্কার হস্তগত না হলে অবিলম্বে রংমশাল অফিসে অনুসন্ধান করতে হবে।

রংমশালের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারীদের কারো কারো শারীরিক অসুস্থতা ও দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য, এবং অফিস পরিবর্ত্তনের জন্য চিঠিপত্রের উত্তর, পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রেরণ ইত্যাদি ব্যাপারে ইতিমধ্যে বিলম্ব ঘটেছে। এখন হতে পুনরায় প্রতি বিষয়েই তৎপরতা দেখানো হবে। পত্রিকা প্রতিমাসে প্রথম তারিখের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হবে।

চিঠিপত্র টাকাকড়ি সবকিছুই ম্যানেজিং এডিটর, ১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ষাঁড়ে মানুষে